২য় খণ্ড

সচিত্র সাপ্তাহিক পত্রিকা

বাসন্তী

২য় বর্ষ] ১১ই আশ্বিন শুক্রবার ১৩৩০, ইং ২৮শে সেপ্টেম্বর। [১৩শ সংখ্যা

কংগ্রেস দিয়েছে রায়—আর কারে ভয়?—
ওরে যাদবের দল, পথ হতে সর্।

[অন সেবক সৌজন্যে

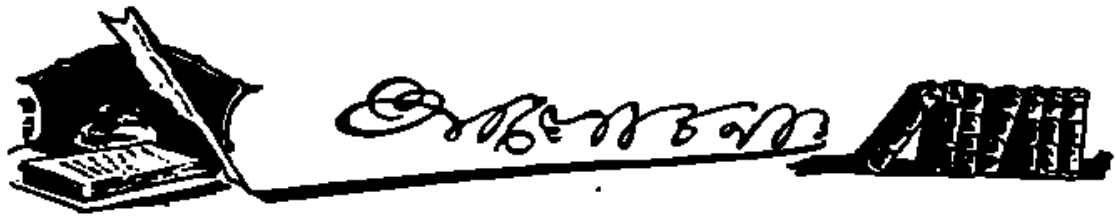

আমাদের দেশের যে রকম অবস্থা এ অবস্থায় স্বদেশ স্বদেশ করিয়া মরা, কিম্বা স্বদেশিতার ধুয়া ধরিয়া নির্য্যাতন গঞ্জনা, সংসার ও পরিবারবর্গকে অনাহারে রাখিয়া নিজেও অনাহারী থাকার যে ব্যবস্থা ইহা কি শুধু মাত্র সেন্টিমেন্ট! ভাবপ্রবণ জাতি সেন্টিমেন্টের ঝোঁকে অনেক রকম কাজই করিয়া থাকে—তাহার কোনটির পরিণাম যে ভাল হইবে আর কোনটির পরিণাম যে মন্দ হইবে তাহা তাহারা বুঝিতে পারে না। অনেক ত্যাগ ও মহিমা মণ্ডিত কার্য্যের পরিণাম ফল এ জীবনে শুধু দুর্ভোগ ভোগাতেই পরিসমাপ্তি হয়—পর জন্মে কি হইবে কে জানে! সেন্টিমেন্টের দোষ পরে অনেকেই গাহে বটে—কিন্তু ভাবের ঝোঁকে যখন কাজ করিতে হয়—সেই কাজের ফল যখন ব্যক্তিগত হিসাবে না থাকিয়া জাতিগত ও দেশগত হিসাবে ছড়াইয়া পড়ে—তখন তাহার ফল শুভও হইতে পারে অশুভও হইতে পারে। ভাগ্যগুণে সেন্টিমেন্টের গাহনা হয়—আবার ভাগ্যগুণে সেন্টিমেন্ট জয়-যুক্তও হয়। ভাবপ্রবণতা জিনিসটা মূলে খারাপ নয়—তবে ভাগ্যগুণে তাহা খারাপ হইয়া দাঁড়ায় বটে।

• • • •

যে সব কর্ম্মীর দল ভারতের নব যুগের সূচনায় জীবনের অবলম্বন তাঁত কাপড়ের সহজ জীবিকার ব্যবস্থা ছাড়িয়া দেশকর্ম্মে নামিয়াছিলেন—ভাবপ্রবণতার উৎসাহের আবেগে যাঁহারা নিজ ক্লেশ, পরিবার পরিজনের ক্লেশ অন্নবস্ত্রের অভাবের দিকে দৃষ্টিমাত্র না দিয়া পরিবার পরিজনের, আত্মীয় স্বজন প্রতিবাসীর গঞ্জনা উপহাসকে অক্ষুণ্ণ করিয়া ভাবপ্রবণতার এক লক্ষ্যে কর্ম্মের পথে চলিতেছিলেন—আজ ভাব-বিচ্যুত ও লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া তাঁহারা কি করিবেন। অবলম্বন হারাইবার জন্য অনুশোচনা—না লক্ষ্য স্থির রাখিয়া আবার নূতন উৎসাহে দেশের আত্মনিয়োগ।

দেশের অন্নাভাব বস্ত্রাভাব দিনের দিনই বাড়িয়া চলিয়াছে। লোকের জীবন অসহনীয় হইয়া উঠিয়াছে। দেশের সব সমস্যার চেয়ে বড় সমস্যাই হইতেছে আজ দেশের লোকে কি করিয়া জীবন চালাইয়া বাঁচিয়া থাকিবে। লোকের আশা উৎসাহের পথ, কর্ম্মের পথ সব দিক হইতে রুদ্ধ। দেশের লোকে যে দিকে যে কাজে হাত দিতে যায় সেই দিক হইতে প্রতিহত হয়—নিরাশার মৃত্যু কামনাই তাহাদের একমাত্র অবলম্বন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। দেশের এমন ভীষণ অবস্থা আর কতদিন থাকিবে তাহা বলা যায় না। না খাইতে পাইয়া—পরিবার পরিজন সংসার চালাইবার কোন ব্যবস্থা করিতে না পারিয়া উচ্চশিক্ষিত অনেক ভদ্রলোক আত্মঘাতী হইতেছে। পিতা—অন্ন বস্ত্রের অভাবে সন্তানদের গলায় ছুরি মারিয়া নিজে আত্মহত্যা করিতেছে। মাতা প্রাণের চেয়ে প্রিয় সন্তানদের মৃত্যু কামনা করিতেছে। দেশের যুবক-বৃদ্ধ পেটের দায়ে বিব্রত হইয়া পাগলের মত হইয়া উঠিয়াছে। আত্মহত্যা অনেকে করিতেছে—আরও কতজনে আত্মহত্যার সঙ্কল্প যে করিতেছে তাহার সংখ্যা নাই—এই দেশের একদিকের অবস্থা!

• • • •

দেশের সকল রকম অনর্থের মূল এই যে অভাব জ্বালা ইহা আজ সর্ব্বত্র তীব্রভাবে অনুভূত হইতেছে। ইহাই মূল—আবার আনুসঙ্গিক উপসর্গ ইহার সঙ্গে যাহা জুটিতেছে সে গুলিও ক্রমে ভীষণ হইয়া দাঁড়াইতেছে। দেশের উচ্চ শ্রেণীতে কন্যাদায় ক্রমেই ভীষণ হইতেছে, কন্যার বিবাহ দিতে না পারিয়া বহু পরিবার বিব্রত। মেয়ের বিয়ের জ্বালায় অনেক পিতা, মাতা আত্মহত্যা করিতেছেন। আবার সমাজের নিম্ন শ্রেণীতে কন্যা মেলা ভার। তাই অপ্রাপ্ত বয়স্কা, তিন চার বছরের মেয়েদের পর্য্যন্ত সে সব সমাজে পণ দিয়া বরপক্ষ কিনিয়া লয়। বিধবার সংখ্যা সে সব সমাজে খুব বেশী। দেশের নিম্ন শ্রেণী ক্রমেই

অভাবে ও অনাচারে ধ্বংসের পথে ধাইতেছে। সমাজ সব দিক দিয়াই রুগ্ন দুর্ব্বল, মানসিক ও শারীরিক তেজ বীর্য্যে হীন হইয়া পড়িতেছে। দেশের মানুষ যেন আর মানুষের মত নাই। মানুষের মুখে হাসি নাই, চিত্তে শান্তি নাই—সব ম্রিয়মান অবসন্ন!

•

শুধু মানুষেরই যে এই অবস্থা তা নয়। এ দেশের কুকুর বেড়াল অন্যান্য গৃহপালিত প্রাণীদের অবস্থা পর্য্যন্ত আর পূর্ব্বের মত নাই। দেশের গরু আর তেমন দুধ দেয় না। কুকুর আর তেমন বাঘের মত হয় না—সব কঙ্কালসার, জীর্ণ। কেন এমন হইল!

• • • •

দেশ স্বাধীনতা চাহিতেছে, স্বরাজই একমাত্র কাম্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছে—অথচ দেশ কি খাইয়া স্বরাজ সাধনা করিবে! দেশে ভাইয়ে ভাইয়ে মিল নাই, হিন্দুতে হিন্দুতে মিল নাই, হিন্দু ও মুসলমানে মিল নাই—মুসলমানে মুসলমানে মিল নাই। সব ছত্রভঙ্গ। সব আত্ম-সর্ব্বস্ব। এইভাবে দেশ আত্ম বলি দিবার পথে আপনাদের মধ্যে সহস্র ভেদ বিবাদের রেখা টানিয়া ক্রমে মরণের মুখে অগ্রসর হইয়া যাইতেছে।

• • • •

১৯২০ সালে দেশে জন্মের সংখ্যা ছিল ১৩, ৫০ ৯১৩ আর মৃত্যুর সংখ্যা ১৪, ৮১, ৬১২। ১৯২১ সালে জন্মের সংখ্যা ১৩,০১,০০০ আর মৃত্যুর সংখ্যা ১৪,০৩,০৬০। দেশের জন্ম মৃত্যুর হারের দিকে চাহিলে প্রাণ শীতল হইয়া যায় না কি! ক্রমে দেশে মৃত্যুর হার আরও বাড়িয়ে না চলিবে? অন্ন বস্ত্রের অভাবের জন্য দেশের লোকে এখন সন্তানের জন্ম দিতে ভীত হয় —অনিচ্ছায় সন্তান তাই অল্পায়ু হয়। দেশে নানা রকম যে রকমের রোগ নিত্য আমদানি হইতেছে। অন্নবস্ত্রের অভাব —আর তাহার আনুসঙ্গী রোগের তাড়ন দেশটাকে বেশ আরামে রাখিয়াছে। দুর্ভিক্ষ, মৃত্যু, আর যুদ্ধ এই তিনটাই এ যুগের কালান্তক যম। দুর্ভিক্ষ আর মৃত্যু এ তো ভারতে রাজ পাট লইয়াই জাঁকিয়া আছে। তবে যুদ্ধ বিগ্রহ নাই বটে! যুদ্ধ হইতেই এ সবের উদ্ভব না এই সব প্রাণান্তক উপসর্গ গুলি হইতেই যুদ্ধের উদ্ভব?

বাসন্তীর শারদীয়া সংখ্যা

চিত্র-বৈভবে উজ্জ্বল, সুখর পরিপুষ্ট

বাংলার শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকগণের রচনা সম্ভারে গৌরবান্বিত হইয়া বাংলার পাঠকপাঠিকাগণকে নূতন নূতন কার্টুনে (ব্যঙ্গচিত্র) সুসজ্জিত হইয়া অভিবাদন করিবে।

দাম চার আনা

মহালয়ার দিন প্রকাশিত হইবে।

বৃহৎ আকার, সুরঞ্জিত প্রচ্ছদ-পটে সজ্জিত

সমগ্র পৃথিবীর লোক সংখ্যা প্রায় ১৮০ কোটী। পৃথিবীর কয়টি মহাদেশে যত লোক এক এশিয়াতেই তার অর্দ্ধেক। এশিয়ার লোক সংখ্যা প্রায় ৯০কোটী। আফ্রিকার ১৫ কোটী —আর সমগ্র ইওরোপে ৫০ কোটী। ভারতবর্ষের লোক সংখ্যা ৩১ কোটী, গ্রেট বৃটেনের লোক সংখ্যা মাত্র ৫ কোটী। সমস্ত বৃটিশ সাম্রাজ্যের লোক সংখ্যা ৭৫ কোটী। আমারিকার লোক সংখ্যা ১০ কোটী, রুসিয়ার লোক সংখ্যা ১৩ কোটী, জার্মেণীর ৬ কোটি, ইটালীর লোক সংখ্যা প্রায় ৪ কোটী। এই লোকসংখ্যা আলোচনায় সহযোগী 'আনন্দবাজার' বলিতেছেন:—

• • •

সমগ্র ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের লোকসংখ্যা প্রায় ৪৫ কোটী। তার মধ্যে এক ভারতবর্ষের লোক সংখ্যাই ৩১ কোটীর উপরে। গ্রেটব্রিটেনের লোকসংখ্যা পাঁচ কোটীরও কম। এই পাঁচকোটী লোকই ভারতবর্ষের ৩১ কোটী লোক,—আর ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ৪৫ কোটী লোকের উপর শাসন দণ্ড ঘুরাইতেছে। জগতের ইতিহাসে এরূপ ব্যাপার খুবই বিরল। পৃথিবীতে যে কয়েকটী পরাক্রান্ত শ্বেত-জাতি বা শ্বেত-রাজ্য আছে, তাহার মধ্যে এই গুলিই প্রধান :—রাশিয়া—লোকসংখ্যা ১৩ কোটী, আমেরিকা যুক্তরাজ্য—লোকসংখ্যা ১০ কোটী, জার্ম্মাণী—লোকসংখ্যা ৬ কোটী গ্রেট ব্রিটেন—লোকসংখ্যা প্রায় পাঁচ কোটী, ইটালী—লোকসংখ্যা ৪ কোটী, ফ্রান্স—লোকসংখ্যা ৪ কোটীর কম। যুদ্ধের পূর্ব্বে জার্ম্মাণীর লোকসংখ্যা ৬৪ কোটী ছিল। এখন রাজ্যের কতক অংশ হারাইয়াও জার্ম্মাণীর লোকবল প্রায় তেমনই আছে। আর ফ্রান্স আলসেস লোরেইন ফিরিয়া পাইলেও, তাহার লোকসংখ্যা বাড়ে নাই। বস্তুতঃ ফ্রান্সের লোকসংখ্যা যেরূপভাবে কমিয়া যাইতেছে, তাহা আশঙ্কার কারণ। তাহার 'অতিরিক্ত' সভ্যতাই কি ইহার কারণ? যুদ্ধের ফলে আর একটা ব্যাপার ঘটিয়াছে। রাশিয়া ও অষ্ট্রীয়া সাম্রাজ্য লুপ্ত হইয়াছে। খাস অষ্ট্রীয়ার লোকসংখ্যা এখন ৬০ লক্ষ মাত্র, হাঙ্গেরীর লোকসংখ্যা প্রায় ৮০ লক্ষ। অপরপক্ষে অষ্ট্রীয়া ও রাশিয়ার ভাঙ্গা সাম্রাজ্যের মধ্য হইতে পোল্যাণ্ড ইউক্রেইন যুগোস্লাভিয়া, চেকোস্লোভিয়া, রুমানিয়া প্রভৃতি যেসব স্বাধীন রাজ্যের উদ্ভব হইয়াছে, তাহাদের প্রত্যেকের লোকসংখ্যা ১ কোটী হইতে ৪ কোটীর মধ্যে। একুনে প্রায় ১০ কোটী। রাজা রাজ্য সাম্রাজ্য প্রভৃতির ভাগ্য-বিবর্ত্তন যে কত অল্প সময়ে ও কেমন অদ্ভুতভাবে হয় ইহাতেই বেশ বোঝা যায়।

• • • •

বাংলা দেশে সম্প্রতি নারীর উপর অত্যাচারের যে ভীষণ ও বীভৎস সংবাদ আসিতেছে—তাহা পাঠ করিয়া আমরা লজ্জায় ও ঘৃণায় শিহরিয়া উঠিতেছি। পরপদদলিত জাতি যাহার নিজের মানুষ বলিয়া পরিচয় দিবার কোন অবস্থা নাই—জীবনে যাহার কোন গৌরব নাই সে কেমন ভাবে দুর্ব্বলের উপর অত্যাচার করিতে পারে তাহারই জলন্ত অমানুষিক দৃষ্টান্ত দেখাইতেছে। অরক্ষিতা অসহায়া নারীকে জোর করিয়া ঘরের বাহির করিয়া তাহার উপর বীভৎস অত্যাচার করিবার স্পৃহা এমন অমানুষ দেশের লোকেরই জাগিতে পারে। সেদিন একটি চৌদ্দ বৎসরের বালিকাকে এই ভাবে অত্যাচার করিয়া তিনটা পাষণ্ড প্রাণে মারিয়াছে। অত্যাচারীতা নারী অবশ্য মরিয়া বাঁচিয়াছে কারণ দুর্ব্বলা সে—অত্যাচারিতা অবস্থায় সমাজে ফিরিয়া আসিলেও সমাজ সেই দুর্ব্বলার উপরই অত্যাচার করিত। অত্যাচারী যাহারা তাহাদের সমাজ শাসন বা গ্রাম্য শাসন করিতে সমাজ ও গ্রামের লোক ভীত হইত! এমন অবস্থা বাংলার গ্রামে গ্রামে আজ হইতেছে—তবে কি বুঝিব বাংলা দেশের গ্রাম গুলি পুরুষশূন্য হইয়া গিয়াছে। বাংলা দেশে সমাজ নাই—গ্রাম্য বন্ধন নাই—মানুষ নাই—সবই আছে কিন্তু এই নারীর উপর অত্যাচারে দেশ তবে আজ কাহার পরনাপন্ন হইয়া দাঁড়াইবে। কে দেশের ভীতা ত্রস্তা মায়েদের রক্ষা করিবে?

• • •

বাংলার যুবকদের উৎসাহ নাই —দশ বৎসর পূর্ব্বে এমন ঘটনা ঘটিলেও বাংলার গ্রামে গ্রামে গ্রাম্য সমিতি স্থাপিত হইয়া এ নারী অত্যাচার নিবারণের ব্যবস্থা হইত—কিন্তু আজ গ্রামে গ্রামে এত নারী লাঞ্ছনা চলিলেও তেমন সঙ্ঘ প্রচেষ্টার কথা কোন স্থান হইতেই শোনা যাইতেছে না। বাংলার পুরুষ শক্তি নাই—তাহা পারে শুধু আজ ভয়ে ভীত হইয়া লালসার মুখে সন্ত্রস্ত থাকিতে—আর নারী নিগ্রহের বিধানের মাত্রা বাড়াইতে। বাংলার নারী শক্তিকে আজ সব দিক হইতেই সজাগ হইতে হইবে। দেশে যেমন দিন কাল পড়িয়া আসিতেছে ঘটি-বাটি, গহনাপত্র, টাকা কড়ির মত নারীও যে ভাবে চোর ডাকাতের, বদমাইসের ভক্ষ্য হইয়া উঠিতেছে তাহাতে দেশের নেতৃস্থানীয় পুরুষ ও মহিলারা এ বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ দিয়া যাহাতে দেশের নারীর—মাতার সম্মান রক্ষা হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করুন! ব্রাহ্মণ সভা, কংগ্রেস কর্ম্মী সংগঠন এ দিকে মনোযোগ দিন।

সমাজ যদি এ দেশে থাকে—তবে সমাজ আজ ঐ সব কামুকদের সমাজচ্যুত—দেশচ্যুত করুন!—এ লোভ এ মোহ নতুবা দেশের ভীষণ অমঙ্গল ঘটাইবে। দেশের লোকের আর মানুষ বলিয়া মুখ দেখাইবার যো থাকিবে না।

• • •

নাভার সামন্ত মহারাজা রাজ্যচ্যুত তাহা লইয়া দেশীয় সংবাদপত্রগুলিরই মাথাব্যথা খুব বেশী—এই ব্যাপারে দু' একখানা পত্রের প্রচারও নাকি বন্ধ হইয়াছে। ইহাতে সামন্তরাজাদের দেশীয় পত্রগুলির কাছে কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। কিন্তু বড় লোকের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের উপায়ও অন্য রকম। অনেক সামন্তরাজ এইভাবে কৃতজ্ঞতা দেখাইতে গিয়া নিজ নিজ রাজ্য হইতে দেশীয় সংবাদপত্র 'প্রবেশ নিষেধ' করিতেছেন। হায়দ্রাবাদ রাজ্য হইতে 'হিন্দু' পত্রিকা বিতাড়িত হইয়াছে। কেন—না সেট নেহাল সিং সেই পত্রে হায়দ্রাবাদ রাজ্যের বিবরণ লিখিয়াছিলেন এবং সেই প্রবন্ধের উপর হিন্দু সম্পাদকের মন্তব্য ছিল। সেট নেহাল সিং ভারতীয় লেখকদের মধ্যে বোধ হয় খুব সম্মানী লেখক। পাশ্চাত্যের প্রায় সব কাগজেই তাঁর লেখা বাহির হয়। ইনি সার আলি ইমামের অভিধিরূপে হায়দ্রাবাদ রাজ্যের সব ব্যবস্থা পরিদর্শন করিয়া তাহারই সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। শাসন ব্যাপারে ত্রুটি সর্ব্বত্র সব দেশে সব রাজ্যে আছে কিন্তু মতি থাকিলে তাহার সংশোধনও সম্ভব। বৃটিশ ভারতের শাসনের বিরূপ সমালোচনাও অনেক কাগজে হয়—কিন্তু তাঁহারা এত সহজে কাগজ বন্ধ করেন না। অটোক্রাট দেখিতেছি দেশীয়েরাই বেশী হয়—তবে হাতে ক্ষমতা থাকা চাই।

• • • •

কাউন্সিল প্রবেশের ধুম বেশ চলিয়াছে—যেন অনেকের ওইটাই মুখ্য। কিন্তু এই ব্যাপারেও দেশে নানা দল নানা মত ভেদ জাগিয়া উঠিয়াছে। বহু দল হইয়াছে—দলের দোহাই দিয়াও অনেকেই কৌন্সিলে যাইতে উদ্যোগী। কিন্তু এ অভাবের দেশে দলের মূল্য ও মর্য্যাদা চিরদিন ঠিক থাকিবে কি! ব্যক্তিগত স্বার্থের তাড়ায় দলের স্বার্থ ডুবিয়া না যায়। শাসন সংস্কারকে কৌন্সিলের মধ্য দিয়া পাইতে হইলে ধীর ভাবেই পাইতে হইবে—নতুবা কৌন্সিল দ্বারের সিংহ গর্জ্জিয়া উঠিবে।

• • • •

বাংলার কয়েকজন খ্যাতনামা লোক অকস্মাৎ গত মঙ্গলবার গ্রেপ্তার হইয়াছেন। ইঁহাদের অনেকেই স্বদেশী যুগের পাণ্ডা ছিলেন হঠাৎ ইঁহারা কেন গ্রেপ্তার হইলেন কি দোষে কোন অজুহাতে তাহা এখনও বিশেষ জানা যায় নাই। এ উপদ্রব দেশে অনেকদিন ছিল না—প্রকাশ্য বিচারে অপরাধী যে তার দণ্ড ভাল কিন্তু বিনা বিচারে এ ব্যাপার এ যুগেও আবার চলিবে কি?

• • • •

বিলাতের বিখ্যাত রাজনীতিক ও সাহিত্যিক লর্ড মর্লির মৃত্যু হইয়াছে। নানা দেশীয় বিখ্যাত স্বদেশ-প্রেমিকদের জীবনী রচনায় ইনি অসামান্য কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। অতি সামান্য অবস্থা হইতে ইনি নিজ যোগ্যতায় প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। ইনি উদার-নীতিক ছিলেন, এত উদার মত লইয়াও স্বাধীন দেশের স্বাধীন মনীষী কিন্তু ভারতের ভাগ্যে তেমন উদারতা বর্ষণ করিতে পারেন নাই। তাঁহার আমলেই ভারতে প্রথম শাসন সংস্কারের আমদানী হয়। শেষ জীবনে ইনি ইওরোপীয় যুদ্ধের তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। যুদ্ধ আরম্ভের পর হইতে পার্লামেণ্টের সংস্রব ত্যাগ করেন। ৮৪ বৎসর বয়সে ইঁহার মৃত্যু হইয়াছে। মর্লি বহু দিন ভারতের সেক্রেটারী অব ষ্টেট ছিলেন।

ইণ্ডিয়ান সোপ কোম্পানীর
মেসিনে প্রস্তুত
চন্দন, রয়েলবকুল, মাল্ক ও ভেলভেট সাবান
ব্যবহার করুণ। টেলিফোন, ২৪৯৬

বিলেতের নারী জাগরণ আন্দোলনের নেত্রী প্রসিদ্ধা সাফ্রেজিষ্ট শ্রীমতী প্যাঙ্কহার্ষ্টের নাম অনেকেই জানেন। ইনি নারীদের মুখপাত্র হয়ে বক্তৃতা করেছেন, যুদ্ধ করেছেন, জেলে গিয়েছেন। জেলে গিয়ে আবার অনশন ব্রত পর্য্যন্ত অবলম্বন করেছিলেন। সম্প্রতি ইনি এ সব ছেড়ে দিয়ে সন্ন্যাসিনী হয়েছেন—ভগবানের নামই এক-মাত্র সার করেছেন—এ ছাড়া নাকি জীবের মুক্তির আর অন্য গতি নাই।

• • • •

কর্ণেল কেনেডী নামে একজন ইংরেজকে কে চলতি রেলগাড়ীতে খুন করেছে। খুনী ধরবার জন্য বেহার সরকার ও আরো দুটো বিলেতী কোম্পানী পনের হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছেন। এইবার যদি এসব খুনজখমের দিকে কর্ত্তাদের নজর পড়ে। দেশী কতজন এভাবে মারা গেছে তার কোন হুরাহা হয় নাই—চেষ্টা তেমন হয়েছে কিনা জানিনা। সুখের বিষয় শোনা যাচ্ছে এটা নাকি রাজনৈতিক গুপ্তহত্যা নয়। হত্যা সব সময়ই হত্যা—এর শাসনের ব্যবস্থা হলেই ভাল!

• • • •

স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও দেখছি এবার থিয়েটার করে অশ্লীলতার দায়ে ধরা পড়ে গেছেন—সব শ্লীলবাদীদের হাতে। বিলেতী রঙ্গমঞ্চে ঘরের মেয়েদের নিয়ে অভিনয় করলেও কি অশ্লীলতা হয়? আর বিশ্বভারতীর জন্য অমন শ্লীল বক্তাই বা পাওয়া যাবে কোথায়?

• • • •

বাল্য বিবাহ ভাল না যুবতী বা প্রৌঢ়া বিবাহই ভাল এ নিয়ে দেশে অনেক আলোচনা হয়ে গেছে। শোনা যায় এ দেশের কোন মহর্ষিকে উনিশ বছর বয়সে তিনটি সন্তানের জনক হতে হয়েছিল। সে সব সন্তানও যথেষ্ট ক্ষমতাশালী হয়েছিলেন। আমেরিকার অনেক ষ্টেটেও মেয়েদের বিয়ের বয়স ১৮ বৎসর আর ছেলেদের ২১ বৎসর। ১৪ বছরের কম বয়স্কা বিবাহিতা মেয়ে আমেরিকায় হাজার হাজার আছে। তবে শুধু এক ভারতই বাল্য বিবাহের দায়ে অসভ্য নয় দেখছি।

আমেরিকায় প্রতি চার মিনিটে নাকি একটি করে বিবাহচ্ছেদ (Divorce) হয়ে থাকে। গেল বছর ১ লক্ষ ৩০ হাজার বিবাহচ্ছেদ হয়েছে আমেরিকায়। বিবাহ-চ্ছেদের সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই সভ্যতার পরিমাপ করা হবে নাকি?

• • • •

কাশীর কানাইয়ালালের মন্দিরে এক চামার প্রবেশের অধিকার পেয়েছে। চামারও হিন্দু বলেই নিজের পরিচয় দেয়—কিন্তু হিন্দুদের দেবীর মন্দিরে প্রবেশাধিকার তাদের ছিল না—এইবার হিন্দু সভার অনুগ্রহে পাবে কি? নমশূদ্র মালীদের কাছ হিন্দু নাপিত ধোপা করে না কিন্তু যদি তারা মুসলমান হয় তখন সেই নাপিত ধোপাই তাদের কাজ সাগ্রহে করে। তবু যে এতকাল এরা হিন্দু ছিল সেই ভাগ্য।

• • • •

বাংলার কংগ্রেস কমিটি এখন কার দখলে? সে দলের মালিক কে? রাষ্ট্রীয় সমিতির মন্দির কোথায়—মুকিয়া ষ্ট্রীটে না বৌবাজারে? এ কথাটা অনেকেই জিজ্ঞাসা করছেন—কিন্তু এর সঠিক উত্তর কে দিবে?

• • • •

নোবেল প্রাইজ শুনছিলাম কোন ভারতীয় পাবে—কার ভাগ্যে শিকে ছিঁড়বে এ নিয়েই জল্পনা কল্পনা চলছিল। কিন্তু সে সম্বন্ধে আর কোন খোঁজ তাঁস পাওয়া যাচ্ছে না। তবে নোবেল প্রাইজ পাবেন বলে রাষ্ট্র উপন্যাসিক শরচ্চন্দ্র এবার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগত্তারিণী স্বর্ণপদক পাবেন স্থির হয়ে গেছে। অনেকদূর এগিয়ে এসেছে বলতে হবে।

• • • •

একজন এম-এ পাশ কংগ্রেস কর্ম্মী বোধ হয় অ-সহযোগী, সঙ্গে ছিল তাঁর গীতা, পাতঞ্জল দর্শন আর চণ্ডী। কালনা মহকুমায় তিনি গিয়েছিলেন কি কাজে—মহকুমার মুন্সি-পালের রাস্তার ল্যাম্প বড় চুরী যায়। চোর সাব্যস্ত করা হোল এম-এ পাশ যুবককে—চেয়ারম্যান আর এক সম্পাদক চোর ধরে মহা আস্ফালন—পরে যখন সব কথা ফাঁস হোল তখন আর মুখ দেখানোর জো নেই। এরাই কিন্তু আবার মুখ মেখিয়ে বড় কথা করে সমাজে চলে!

নির্ব্বাচন-রঙ্গ

[শ্রীভবতোষ রায় বি-এল]

নির্ব্বাচনের দিন ক্রমশই নিকটবর্ত্তী হ'য়ে আসছে। এক একটি নির্ব্বাচন কেন্দ্রে ৩৪টি, কোনও স্থানে বা ৮।১০ টি পর্য্যন্ত "স্বায়ত্বশাসন শিক্ষার্থী ছাত্র" নির্ব্বাচনরূপ কঠোর অগ্নি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার জন্য তোড় জোর বেঁধে কোমর এঁটে আসরে অবতীর্ণ হচ্ছেন। কেহ ধীরপন্থী, কেহ স্বরাজ্যপন্থী, আবার কেহ বা স্বাধীন এবং উদার। এমনও অনেক ছাত্র আছেন যাঁরা দল বিশেষের খবর রাখেন না, এত দিন ধ'রে স্বায়ত্বশাসনের পাঠ মুখস্ত ক'রে পরীক্ষা কেন্দ্রে এসে উপস্থিত হ'য়েছেন। সমস্ত দেশে যেন একটু সাড়া প'ড়ে গেছে। তুমি যেতে পাও না পাও বুঝি না, তোমাদের টেনে নিয়ে যাব স্বরাজ্যের মন্দিরে। এই মিষ্টি বুলি সকলেরই মুখে—সকলেই একভাবে কি অন্যভাবে ভোট প্রাপ্তির জন্য বলছেন। এহেন মহেন্দ্র যোগে হস্ত কণ্ডুয়ন নিবারণার্থ এবং "বাসন্তীর" পাঠক পাঠিকাগণের চিত্ত বিনোদনার্থ আমরা কিছু কিছু মাল মসলা নিয়ে এসেছি। অবহিত চিত্তে আপনারা শুনুন। মজা অনেক আছে।

প্রথমতঃ আপনারা একটু অনুগ্রহ ক'রে কোনও শ্রেষ্ঠ জমিদার কেন্দ্রের শাহানশাহ মহারাজা বাহাদুরের নির্ব্বাচন পত্রখানি পাঠ করুন। ইনি শাসন সংস্কারের এম, এ, পি, এইচ্ ডি হ'য়ে এতদিন পাঁচ বৎসরের ষ্টেট স্কলারশিপ ভোগ করছিলেন। বিকৃত হ'য়ে বঙ্গদেশের ব্যবস্থাপক সভায় উমেদার ছাত্র। কলিকাতার নিকট-বর্ত্তী কতিপয় জিলার ভূম্যধিকারী ভোটারবর্গের নিকট ইহার—

নির্ব্বাচন পত্র

আমি জমিদার মহারাজা সীল শ্রীযুক্ত শ্রীশশাঙ্কশেখর প্রবল প্রতাপান্বিত মহাশয়—আমার শ্রীচরণে ভূমি ক, খ, গ, ঘ, ইত্যাদি এবং ঁ'রু। শক্তি, শক্তি, শক্তি! আমার নাম শুনেই আপনারা বুঝিতে পারেন, আমি একজন পরম বৈষ্ণব। ত্রিপাট নবদ্বীপে আমি একজন বড় রকমের ধান্ধা এবং আমার এ নাম সেবায়েতা কৃপায়ই প্রাপ্ত। কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং প্রতীচির কিরণ সম্পাতে করে বিশ্বভারতীর সৃষ্টি ক'রেছেন। আমি তার উপরে টেক্কা দিয়েছি। আমার মোসায় প্রেমে পাগল হ'য়ে আমি আমার বিপুল জমিদারীখানি পাশ্চাত্য কর্ণ-কর্ত্তারগণের হাতে সমর্পণ ক'রেছি। আমরা শাসন সংস্কার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেই আমাদের ভাগ্যে পরাণ। কিন্তু এ হচ্ছে বিরাট দেশের কথা। বেশুন, ইংরেজীতে সাহেব বলেছেন Charity begins at home (কথাটি ঠিক হয়েছে কি না আমার ইংরেজী নবীশ সম্পাদককে জিজ্ঞাসা করুন) আমি সর্ব্বপ্রথমেই এই নীতি অনুসারে আমার বিপুল জমিদারীটি সাহেবের হাতে তুলে দিয়ে নিজকে পরম কৃতার্থ জ্ঞান করছি। যে জমিদার মহাশয়, মোসার সেবায় মন্ত্র হ'য়ে কি ক'রে তিন লাখে পুরী বাকা যায় এইবার আপনারা তা দেখতে পাবেন। এবস্তাবস্থায়ও কি আপনারা ঐ মোসা—যে বলবেন, যে লাখি মেরে ক'রে আমার এখনকার পৃষ্ঠপোষক সর্ব্বোচ্চ ধর্ম্মাধিকরণের জজ সাহেবকে চটিয়েছে, তাকে ভোট দেবেন।

বেশুন, আমি ইংরেজী জানি বা আর লোকে বলে আমি অর্দ্ধ ঘি কিন্তু যা ব'লে কাউন্সিলে অর্দ্ধ ঘি (George V) বলেছি। আরও বলে যে আমি কাউন্সিলে আমার লিখিত বক্তৃতা উল্টো ক'রে ধরি এবং শেষে পড়তে পারি না। আপনারা জানেন না, আমার ঐ অজাত-শত্রু সেক্রেটারী কি পরিমাণ অর্থ দিয়ে আমার জন্য এই সব বক্তৃতা লিখে যেত। আপনারা জানেন না, তাকে আমি বিলেত পাঠিয়েছিলাম, এবং একটি বিলেতী কায়দায় সে কত সহস্র মুদ্রা খরচ করে আমার ছবি খেচ ক'রেছিল। আমার কোন দোষ নেই। দোষ হ'লে তারই, আমি মোসার সেবক, কেবল শুধের মুক্ত শুদ্ধ সত্য বৈষ্ণব। তবুও কি তাকেই ভোট দেবেন, যে লাথি বিলাতীয় ভাষা অবলীলা বলে এবং যন্ত্রীয়ের পরীক্ষায় আমার পরম সাধের লাখা সিভিলিয়ানদের উপর ছড়ুম ছাড়ায়! আরও শুনুন, আমি রাজা—প্রজাকালে পাত্রাপাত্র বিবেচনা করি না, ভিন্ন করি না—যে আমাকে খুসী করতে পারে আমি তাকেই দান করি। ক্রোড় টাকার উপর আমার মেলা,—কেন জানেন? ধান। ধান! ধরিত যেমে ছাড়া কিছুই আমি ক'রতে পারি নাই এবং জমিদারী পর-হস্তে দিয়েছি তথাপি স্থিরচিত্তে ভেবে দেখুন, আপনারা আমাকেই ভোট দিবেন না, যে লাথি বিলেত হ'তিনটি বিয়ে যেমে কেবল স্বার্থপরের ন্যায় আয় বৃদ্ধি করে এবং দশবার ভেবে দশের সঙ্গে কেবল স্বার্থী গঠন মূলক কাজ করে তাকে ভোট দেবেন? যেমন শুরুক শ্রীরাজচন্দ্রের জানবেন, খামিও তেমনি আপনাদের। বলুন, ভোট কে পাবে?

আমি অনেক বলতে পারি, কিন্তু আমার শেষ কথা এই, তিন লাখের উপর ওটাই হাজার ঘোল ভিন্ন পারলে আমার কেমন হ'ঘিয়া হয়? দেশে মানুষ কি নেই—দেশের জন্য প্রাণে আমার অমন সোনার জমিদারীর ২৫।৩০ লাখ কিম্বদন্তী দিয়ে দিয়ে আজ আমার ক্রোড় টাকার উপর ঋণ—তবুও দেশের জন্য ভেবে ভেবে আমি আজ বাংলাদেশের ব্যবস্থাপক সভার ছাত্রের মতন উমেদার—এতেও কি আমায় পায়ে চাইবে না—বল?

আমি আর বলতে পারছি না। অশ্রু লাখের ঠেকেছে। বেশুন, সিকলা ছেড়ে আমি ব্যবস্থার সভায় যেতে চাই, এর বড় ত্যাগ কি আর হ'তে পারে? আমি আপনাদের দাস। ভোট দেবেন না কি?

কি ভাবের মনোহর এবং প্রাণোন্মাদকারী নির্ব্বাচন পত্র সব আসছে তার একটি দেখেই আপনারা যেন ভাববেন না যে এ বৈচিত্র্যের এখানেই শেষ। এর অনেক রকমারী আছে। উত্তর কলিকাতার প্রিয় দর্শন, বীর

স্থির যতীন্দ্রনাথ এবং অবসর প্রাপ্ত হিসাব নবিশ কৃষ্ণলাল বাবুতে বেশ একটু জটিল রকমের দ্বন্দ্ব সুরু হ'য়েছে। এদিকে আবার ডাক্তার প্রমথনাথ এবং ব্যারিষ্টার সীতানাথ আসরে অবতীর্ণ। সহর মফঃস্বলে হৈ হৈ রব। টাঙ্গাইল এবং জামালপুরে আবার রাজা মন্মথনাথের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হ'য়েছেন ময়মনসিংহের অনন্যযোগী শ্রীযুক্ত মনমোহন নিয়োগী। রাজা বাহাদুরের রাজনৈতিক কার্য্যে উৎসাহ, দেশহিতকর কার্য্যে দান এবং শিষ্টাচার সৌজন্য সকলেরই সুবিদিত। স্বর্গীয় দ্বারকানাথ রায় চৌধুরী মহাশয়ের সুযোগ্য সন্তান, সন্তোষের তথা ময়মনসিংহের এই রত্নের নিকট মনোমোহনের স্থান হবে কি? কৃষ্ণনগরের মহারাজ কি শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমারের আগমনে ভীত? তারকবাবু কি বলেন! জনপ্রিয়, পরোপকারী লোকের জন্য দেশ আজ চেয়ে আছে যে!

সার সুরেন্দ্রনাথ দেশ মাতৃকার সেবায় সমস্ত জীবন অতিবাহিত করে অবশেষে যুবক বিধানচন্দ্রের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত! আমরা মজা দেখছি! ভিতরে অনেক ব্যাপার আছে। ধীরে ধীরে সব আমরা বের ক'রে আনবো। বিধান চন্দ্র যশস্বী চিকিৎসক কিন্তু সুরেন্দ্রনাথ অনাবশ্যক।

বাংলার সুরেন্দ্রনাথ, সুরেন্দ্রনাথ, এ বিষয় অনেক হাসি মস্করা এবং রঙ্গ রস আছে! সে সব সময়মত বের হবে।

বড় বাজারের মাড়োয়ারী রঙ্গলাল বাবু দাস সাহেবের বিরুদ্ধে লেগেছেন। বলিহারী মাড়োয়ারী! বাঙ্গলার বুকের উপর বসে আছ। বাঙ্গালীর সাহায্য ভিন্ন তোমার এক মুহূর্ত্ত চলা কঠিন। যে তোমাদের স্বার্থরক্ষার জন্য এত করেছে, আজ তুমি তার বিরুদ্ধে দাঁড়াচ্ছ! তোমারও অনেক কেলেঙ্কারীর খবর আমরা জানি। সব ধীরে ধীরে বের হবে;—বাঙ্গালীর ব্যবসা বানিজ্য সব হাত করে আবার রাজনীতির আসরও চাই না কি?

মিষ্টার পৃথ্বীশের রাজনীতির দল, "স্বাধীন উদার", অর্থাৎ রাজনৈতিক সার্ব্বভৌমিকের দল এখন বেশ চাল চালছেন। স্যর আশুতোষকে এঁরা আসরে নামাবেন ব'লে গুজব শোনা যাচ্ছিল, এখন দেখছি গুজবে সত্যের একটু আভা দেখা যাচ্ছে।

এইবার আমরা আমাদের রঙ্গ কথা ক্রমে বলবো। শুনে নির্ব্বাচন দ্বন্দ্বে আপনারা কার জন্য কি কর্ত্তব্য তা ভাববেন।

দেশ-বিদেশ

শাঁখারীটোলার হত্যাকাণ্ড। অতিরিক্ত দোষের ফাঁসীর আদেশ বহাল। আসামীপক্ষের উকীলের প্রতি তীব্র তিরস্কার। কলিকাতায় শাঁখারীটোলা পোষ্টাফিসকে ডিফেন্সের দ্বারা ডাকি করিয়া হত্যা করায় আসামী অতেন্দ্রকৃষ্ণ দোষের প্রাণদণ্ডের আদেশ হয় এবং মুলুককে এজন্য অন্যের উপর উহার পুনর্বিচারের আদেশ হয়, এই সমস্ত সংবাদ পাঠক অবগত আছেন। গত বুধবার এই মামলার পুনর্বিচারের রায় বাহির হইয়াছে।

সার আশুতোষের রায় পাঠ করিতে এক ঘণ্টা ২৫ মিনিট সময় লাগিয়াছিল। একতোকেট জেনারেল, ষ্টাণ্ডিং কাউন্সেলের পরামর্শ না লইয়া সার্টিফিকেটের অনুমতি দিয়াছেন বলিয়া ষ্টাণ্ডিং কাউন্সেল যে তর্ক উত্থাপন করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে তিনি বলেন যে আসামীপক্ষের ও সহকারীপক্ষের উকীলদের কথা শুনিয়া পরে একতোকেট জেনারেলের সার্টিফিকেটের অনুমতি দেওয়া উচিত ছিল। তৎপরে তিনি বলেন যে জজের আদালতে মামলা উঠিবার পূর্ব্বে এই মামলার রিয়াজত ও আসামী পক্ষের উকীলের মামলার বিষয়ে আলাপ হইয়াছিল, উহা একটী অত্যাশ্চর্য্য ঘটনা। এই বিষয়ে বিচারক শেষ এরূপ মৌখিক দিয়াছেন যে, আসামী পক্ষের উকীল আদালতে উঁহাকে দেখিতে পাইয়া বলেন যে, আসামী হত্যা ছাড়া অন্যান্য অভিযোগে দোষ স্বীকার করিতে রাজী আছে,—এই অবস্থায় তিনি আসামীকে ফাঁসীর হুকুম হইতে মুক্তি দিতে রাজী আছেন কি না? জজ শেষ উত্তরে অসম্মতি জানান। আসামীপক্ষের উকীল বলিয়াছেন যে, এই মামলা চালান অত্যন্ত কঠিন বলিয়াই তিনি জজের সঙ্গে দেখা করিয়াছিলেন। সার আশুতোষ এই বিষয়ে রায়ে দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন—আসামীপক্ষের উকীলের উদ্দেশ্য ছিল জজের সঙ্গে বিচার লইয়া একটা ঘরা করা। তিনি বলেন যে উকীলের এই ব্যবহার এত অন্যায় হইয়াছে যে, তিনি উহা মার্জনা করিয়া উঠিতে পারেন না। উকীলের জানা উচিত ছিল যে, আসামী ওকালতীর অন্তর্ভুক্ত নয়। শরণাপন্ন হইয়াছিল। আসামী সম্পর্কে কোন বিচার করা উকীলের ক্ষমতার বহির্ভূত। সার আশুতোষ বলেন—যদি আমি এই অবস্থায় পড়িতাম তাহা হইলে আমি উকীলের এই ব্যবহার প্রথম জজের কাছে জানাইয়া তাঁহাকে এই মোকর্দ্দমা চালাইবার অধিকার হইতে বঞ্চিত করিতাম এবং নিজেও এই মোকর্দ্দমার আর বিচার করিতাম না।

মন্মথনাথের শ্রীমতী গজরাজ এক অদ্ভুত উপায়ে আজ বিখ্যাত হইয়াছেন। তিনি খৃষ্টান মিশনারী স্কুলে পড়িতেন এবং কিছুদিন পূর্ব্বে তাহাকে কোন মিশন গৃহে আটক রাখিয়া, খৃষ্টান করিবার চেষ্টা হইয়াছিল। সুখের বিষয় শ্রীমতী গজরাজ আত্মীয় স্বজনের চেষ্টায় মুক্তি লাভ করিয়া স্বগৃহে ফিরিয়াছেন। আরও সুখের কথা, গত ১৪ই সেপ্টেম্বর শ্রীমতী গজরাজের একটী শিক্ষিত হিন্দু যুবকের সঙ্গে বিবাহ হইয়াছে। বিবাহ পুরা হিন্দু মতেই হইয়াছিল। ব্রাহ্মণ—হিন্দু সমাজের গৌড়ামীর দুর্গ। খৃষ্টান মিশনের 'আপত্তিজনক' শ্রীমতী গজরাজের বিবাহে যে কোন বাধা হয় নাই, ইহা নিশ্চিত শুভ লক্ষণ। এই বিবাহ শ্রীমতী গজরাজের আত্মীয় বিদুষী শ্রীমতী 'আনন্দময়ীদেবী' এর চেষ্টাতেই হইয়াছে। ইনিই শ্রীমতী গজরাজকে মিশনপুর হইতে উদ্ধার করেন।

'আনন্দবাজার'

বঙ্কিমচন্দ্র ও পরকীয়া ভাব

[শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ]

বাঙ্গালাদেশে গদ্য সাহিত্যের সৃষ্টির যুগে আধুনিক কথা-সাহিত্যের সৃষ্টিকর্ত্তা, আচার্য্য বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার গ্রন্থমালায় পরকীয়া ভাব, প্রয়োজনের মাত্রানুসারে, প্রয়োগ করিয়াছেন। তাঁহার রচনায় বিবিধ পরকীয়াই দেখিতে পাওয়া যায়; রোহিণী অপ্রজ্ঞা পরকীয়া, কুন্দ পরকীয়া ভাবপ্রজ্ঞা পুনর্ভূ; কিন্তু প্রকৃত পরকীয়া, অর্থাৎ—প্রজ্ঞার পরকীয়া শৈবলিনী। রোহিণী দারিদ্র্যের জন্য ইচ্ছা থাকিলেও প্রজ্ঞা থাকিতে পারে নাই; কুন্দ প্রবৃত্তি দমন করিতে না পারিয়া পরপুরুষের প্রতি আকৃষ্টা হইয়াছিল কিন্তু শাস্ত্র মতে পত্যন্তর গ্রহণ করিয়া পুনর্ভূ হইয়াছিল। প্রাচীন দেশীয় ও আধুনিক বিদেশীয় পণ্ডিতগণের মতে বিবাহবন্ধন ঘটিলে পরকীয়া ভাব থাকে না, কারণ নিত্য অবাধ সম্মিলনের সম্ভাবনা থাকিলে সোপনীয় বাধা-বিপত্তিবিশিষ্ট যৌন সম্মিলনের মাধুর্য্য বিলুপ্ত হয়। সুতরাং বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থমালার মধ্যে প্রকৃত পরকীয়া একমাত্র শৈবলিনী।

রমণীর অধঃপতনের যে সমস্ত কারণ কামসূত্রকার নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহার অনেকগুলিই শৈবলিনীর প্রথম জীবনে দেখিতে পাওয়া যায়। "চন্দ্রশেখর"-এর প্রথম সংস্করণে বঙ্কিমচন্দ্র, প্রতাপ ও শৈবলিনীর বাল্যজীবনের একটি ঘটনা চিত্রিত করিয়াছিলেন, পরবর্ত্তী সংস্করণে কোন অজ্ঞাত কারণে তাহা পুনর্মুদ্রিত করেন নাই। "চন্দ্রশেখর"-এর সপ্তম সংস্করণ, ১৩০৯ বঙ্গাব্দে মুদ্রিত হইয়াছিল। তাহার বিজ্ঞাপনে গ্রন্থকার বা তাঁহার স্বত্বাধিকারিগণ জানাইয়াছেন যে, "এক্ষণে ইহার অনেক অংশ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে; অনেক অংশ পরিত্যাগ করা গিয়াছে এবং কোন কোন স্থান পুনর্ব্বার লিখিত হইয়াছে।" এই সংস্করণের প্রথম পরিচ্ছেদ "দলনী বেগম।" প্রথম সংস্করণে গদাধরকে প্রতাপ ও শৈবলিনীর যে চিত্র বিচিত্র হইয়াছিল, যৌবনোদ্গমে শৈবলিনীর মানসিক বৃত্তির গতি নির্দ্দেশে তাহা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। শৈবলিনী প্রতাপের বাল্যসখী, সে কেবল সখী ছিল না, কৈশোরেই সে মুগ্ধা নায়িকায় পরিণত হইয়াছিল। এই অবস্থায় মাতৃ নির্দ্দেশে তাহাকে প্রায়বিগতযৌবন অধ্যয়নাধ্যাপন-তৎপরচিত্ত, অশেষশাস্ত্রদর্শী চন্দ্রশেখরকে পতিত্বে বরণ করিতে হইয়াছিল। ইহার পরিণাম কি? কৈশোরে যে তরুণী মুগ্ধ হইয়া তরুণের কণ্ঠে বরমাল্য প্রদান করিয়াছিল, (চন্দ্রশেখর, উপন্যাস-গ্রন্থাবলী, বসুমতী কার্য্যালয়, ১৩১৭, প্রথম পরিচ্ছেদ, পৃষ্ঠা ১২৫), যে একত্র মরণকে বাসরশয্যা মনে করিয়া গঙ্গাপ্রবাহে আত্মহত্যা করিতে গিয়াছিল, সে বহু আয়াসেও যৌবনোদ্গমে চিত্তবৃত্তি সংযত করিতে পারে নাই। কেন পারে নাই? কামসূত্রকারের মতে তাহার তিনটি কারণ উপস্থিত ছিল। প্রথম কারণ—প্রতাপের সহিত শৈবলিনীর বাল্যসখীত্ব, দ্বিতীয় কারণ—তাহার কৈশোরের মোহ, এবং তৃতীয় কারণ—চন্দ্রশেখরের প্রায়বিগত যৌবন। নরনারীর প্রবল যৌন সম্মিলনতৃষ্ণা হেয় হইলেও অধম্য, তাহাতে নায়ক-নায়িকার বয়োগত এবং আকারগত পার্থক্য থাকিলে সামঞ্জস্য অসম্ভব, ইহা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য কাম-বিজ্ঞান (Erotes) সম্বন্ধীয় লেখকগণ বহু পূর্ব্বেই নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। "তরুণবিনোদকার" স্পষ্ট নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন যে, আকারগত প্রভেদ চেষ্টা করিলে সামঞ্জস্য করা যায়। বয়োগত প্রভেদ যে কখনো সুখদায়ক হয় না তাহা প্রচলিত প্রবাদবাক্যেই প্রমাণ হইয়াছে;—যথা, বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্য্যা। এই তিনটি দোষ লইয়া পূর্ণ যৌবনে শৈবলিনী তাহার দেহে প্রবলবেগে সঞ্চারিত অতৃপ্ত লালসা দমন করিতে পারে নাই। যৌবনোদ্গমে শৈবলিনী কেন চিত্তবৃত্তি নিরোধ করিতে পারে নাই, আচার্য্য বঙ্কিমচন্দ্র তাহার একটি সুন্দর কারণ নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন; কিশোরী শৈবলিনীর সহিত গদাধরকে সন্তরণ করিতে করিতে কৈশোরের ঘুচ্চিত প্রতাপ ডুবিয়াছিল কিন্তু শৈবলিনী ডুবিতে পারে নাই, কারণ জীবনের প্রারম্ভে সমস্ত সুখসম্পদ উপভোগের আশা ভরসা পরিত্যাগ করিতে যে পরিমাণ মনের বল আবশ্যক তাহা তাহার

ছিল না। পিতৃহীনা শৈবলিনী মাতার আদরে যে ভাবে লালিত হইয়াছিল তাহাতে যৌবনোদ্গমেও তাহার মানসিক শক্তি দৃঢ়তা লাভ করে নাই।

আধুনিক পরকীয়াবাদী হয় তো বলিবেন যে, পূর্ণ-যৌবনে সহসা উদ্বেলিত অতৃপ্ত লালসা শৈবলিনীকে কি অভিভূত করিয়াছিল? উদ্ভিন্ন যৌবনের অন্ধ কামনাই তাহাকে বিদেশীয় ও বিজাতীয় ল্যাফ্টেন্ট কষ্টারের সহিত পতিগৃহ ত্যাগ করাইয়াছিল? তাহার সঙ্গে তাহার বাল্য জীবনের কোন সংস্রব ছিল না। কিন্তু একথা বলিতে গেলে Kraft-ebbing বা Havelock Ellis প্রমুখ আধুনিক যৌন-সম্বন্ধতত্ত্ববিশারদদিগকে প্রাচীন কামশাস্ত্রকারদিগের সহিত একত্র অবমাননা করা হয়। লালসার প্রেরণায় অস্থির হইয়া শৈবলিনী কাহার সন্ধানে বাহির হইয়াছিল? Kraft-ebbing বলেন যে, অতৃপ্ত লালসার দারুণ তাড়না নারীকে পতি বা পিতৃগৃহের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য পরিত্যাগ করাইয়া, প্রথমদৃষ্ট তরুণের নিকট আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য করে। শৈবলিনী তাহা করিয়াছিল কি?—না, সে ল্যাফ্টেন্ট কষ্টারের শিবিকায় আরোহণ করিয়া তাহার বাল্যসখার সন্ধানে বাহির হইয়াছিল? আচার্য্য বঙ্কিমচন্দ্র যে যুগে চন্দ্রশেখর রচনা করিয়াছিলেন, সে যুগে অবিকৃত অবস্থায় বাৎস্যায়ন বিরচিত কামসূত্র ভারতবর্ষে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল কিনা সন্দেহ; সুতরাং তিনি যে কামসূত্রকারের মতানুসারে শৈবলিনী-চরিত্র চিত্রিত করিয়াছিলেন তাহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করা যায় না। শৈবলিনী-চরিত্র স্বভাব-কবির স্বভাবসিদ্ধ নিপুণ হস্তের চিত্র, এই জাতীয় চিত্র আর একজন স্বভাব কবির গ্রন্থমালায় দেখিতে পাওয়া যায়—তাহা শরৎচন্দ্রের বিরাজ বৌ।

যেভাবে আচার্য্য বঙ্কিমচন্দ্র শৈবলিনীর চরিত্র অঙ্কন আরম্ভ করিয়াছেন, আধুনিক কবিগণের মতে তিনি তাহা সে ভাবে শেষ করিতে পারেন নাই। ইংরাজের বন্দী প্রতাপকে মুক্ত করিয়া শৈবলিনী যখন আবার সন্দাবকে প্রতাপের সঙ্গে সাঁতার দিতে আরম্ভ করিল, তখন প্রতাপ স্বয়ং স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাহাকে শপথ করাইল যে, শৈবলিনী তাহার চিতা পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিবে। মুগ্ধা কণ্ঠলগ্না অতৃপ্তযৌবনবালনা যুবতীর এই আত্মোৎসর্গ প্রত্যাখ্যান করাই কি আর্ট? আধুনিক কবি-কুলের মতে তাহা আর্ট নয়, কারণ তাহা অস্বাভাবিক! এ বিষয়ে ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্রের সঙ্গে হয় তো সকলে একমত হইতে পারিবেন না, কারণ লেখক স্বয়ং এই পাশ্চাত্য চিন্তাস্রোত বিধৌত বিংশতী শতাব্দীর প্রারম্ভে অবমাননা প্রপীড়িত আত্মহারা তরুণীর আত্মোৎসর্গের যে অপূর্ব্ব প্রত্যাখ্যান প্রত্যক্ষ করিয়াছেন তাহা কেমন করিয়া মিথ্যা বা অস্বাভাবিক বলিয়া স্বীকার করা যায়? প্রত্যাখ্যান এবং তাহার চিত্র অধিকতর সুন্দর কিনা তাহা জন-সমাজের রুচির উপর নির্ভর করে। প্রতাপ যদি তীরে উঠিয়া রামানন্দ স্বামীর তীব্র দৃষ্টি অতিক্রম করিয়া শৈবলিনীর সহিত পলায়ন করিত, সে যেমন শৈবলিনীর মানসিক ধার হইয়াছিল তাহা যদি বাস্তবে পরিণত করিতে পারিত, আধুনিক কবিকুলের মতে তাহা হইলেই বোধ হয় শৈবলিনীর চিত্র সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইত। একথা আমার স্বকপোল কল্পিত নহে, মাত্র তাহা প্রমাণ করিবার জন্যই পরম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মত উল্লেখ করিলাম। ১৩৩০ সালের শ্রাবণ মাসের "বঙ্গবাণী"তে "আধুনিক সাহিত্যের কৈফিয়ৎ" শীর্ষক প্রবন্ধে শরৎচন্দ্র লিখিয়াছেন, "রোহিণীর ভালবাসিবার অপরিসীম শক্তি। সে গোবিন্দলালকে এত ভাল বাসিয়াছিল যে, সাধারণ নারীতে তাহা অসম্ভব। উহাল বদলাইতে সে কৃষ্ণকান্তের মত বাঘের ঘরে ঢুকিয়াছিল গোবিন্দলালের ভাল করিতে। বারুণীর জলতলে প্রাণ দিতে গিয়াছিল সে এমনিই প্রিয়তমের জন্য। আবার সেই রোহিণীই যখন কেবলমাত্র সুনীতিমূলক উপন্যাসের উপরোধেই অকারণে এবং এক মুহূর্ত্তের দৃষ্টিপাতে সমস্ত ভুলিয়া আর একজন অপরিচিত পুরুষকে গোবিন্দলালের অপেক্ষাও বহুগুণে সুন্দর দেখিয়া প্রাণ দিল তখন পুণ্যের জয় ও পাপের পরাজয় সপ্রমাণ করিয়া সাংসারিক লোকের সুশিক্ষার পথে হয়ত প্রভূত সাহায্য করা হইল, কিন্তু আধুনিক লেখক তাহাকে গ্রহণ করিতে পারিল না।"

মনস্বী শরৎচন্দ্র যথোপযুক্ত কারণ নির্দ্দেশ না করিয়াই কথাটি বলিয়াছেন, কিন্তু ভাবপ্রবণতা উঁহাকে

আধুনিক যুগের প্রয়োজন বিস্মৃত করাইয়া দিয়াছিল। আপ্তবাক্যের যুগ যে গিয়াছে, প্রমাণ প্রয়োগ ব্যতীত ঋষিকল্প বা আচার্যকল্প ব্যক্তির উক্তিও যে মান্য হয় না তাহা তাঁহার স্মরণ করা উচিত। রোহিণী গোবিন্দলালকে ভুলিয়া একজন অপরিচিত পুরুষকে দৃষ্টিমাত্রই আত্মসমর্পণ করিল কেন, তাহার বিশ্লেষণ আবশ্যক। পরকীয়া-প্রকরণে কামসূত্রকার ইহার বিস্তৃত আলোচনা করিয়া গিয়াছেন। যে পরকীয়া একপুরুষে অনুরক্ত থাকে সে কালে পুনর্ভূ হইয়া দাঁড়ায় কিন্তু স্ত্রী-চরিত্র সর্বত্রই চারুচর্য্যাবিশিষ্ট নহে। কামসূত্রকারের উক্তি স্পষ্ট করিয়া ব্যাখ্যা করিতে গেলে অশ্লীল হইয়া পড়ে, সেইজন্য ইহিতে তাহার বিশ্লেষণ আবশ্যক এবং বর্তমান বাঙ্গালা-সাহিত্যে পারিভাষিক শব্দের অভাবে আচার্য্য বাৎস্যায়নের ব্যবহৃত শব্দ ব্যবহার করিতে বাধ্য হইলাম। রতিনিবৃত্তির সহিত পুরুষের লালসা তৃপ্ত হয় কিন্তু নারীর হয় না। এইজন্যই বাৎস্যায়ন প্রকৃত শারীরক-বিজ্ঞান অনুসারে নারীর লালসার বিধাভিন্ন গতি নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন এবং উপযুক্ত ভাষায় তাহা বিবিধ কণ্ডূতি আখ্যায় অভিহিত করিয়াছেন। রূপমোহে বা মানসিক লালসায়, নারী যখন প্রবুদ্ধ হইয়া উঠে তখন সেই সঙ্গে একটা পাশব উত্তেজনা সহজাত হয়, তাহা সময়ে সময়ে তৃপ্তির জন্য পাত্রান্তর গ্রহণ করে। রোহিণী বিধবা, তাহার আত্মোৎসর্গ কায়োৎসর্গে পরিণত হইয়াছিল, তাহার বিধাভিন্ন লালসা সর্বপ্রকারে পরিতৃপ্ত হইলেও নূতনত্বের আকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করিতে পারে নাই। ইহাই রোহিণী-চরিত্রের প্রকৃত বিশ্লেষণ। লালসা পরিতৃপ্ত হইলেও পদানত পুরুষপরিসেবিত হইলেও নারী সর্বত্র নূতনত্বের লোভ পরিত্যাগ করিতে পারে না, ইহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। আচার্য্য বঙ্কিমচন্দ্রের রোহিণী-চরিত্র-অঙ্কন তাঁহার সুদীর্ঘ জীবনের অভিজ্ঞতার ফলে এইজন্যই সুস্পষ্ট হইয়া ছিল, তাহা সমাজের মর্য্যাদা রক্ষার জন্য চিত্রিত হয় নাই। রোহিণীর চরিত্র-বিশ্লেষণ বর্তমান প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য বস্তু নহে সুতরাং শৈবলিনীতেই প্রত্যাবর্তন করা বিধেয়।

শৈবলিনী যদি প্রতাপের সহিত বাহির হইয়া আসিয়া আধুনিক প্রেমিক-প্রেমিকার মত কলিকাতায় ঘর-ভাড়া করিত এবং সহসাতৃপ্তস্বামী প্রতাপ যদি এক রাত্রিশেষে শৈবলিনীর অবশিষ্ট অলঙ্কারগুলি লইয়া নিরুদ্দেশ যাত্রা করিত তাহা হইলেই বিংশতী শতাব্দীর বাস্তবজীবনের চিত্র সম্পূর্ণ হইত। রোহিণী যদি গোবিন্দলালকে পরিত্যাগ করিয়া দ্বিতীয়বার গৃহত্যাগ করিত এবং ঐ জাতীয় প্রেমের ক্রমবিবর্তনানুসারে "বাঈ-ওয়ালীর" সাম্রাজ্যের শান্তশিষ্ট প্রজা হইয়া থাকিত তাহা হইলেই কি আধুনিক সাহিত্যিক আর্টের চরমোৎকর্ষ প্রসাধিত হইত? অথচ ইহাই স্বাভাবিক, ইহাই নিত্য নৈমিত্তিক, দেশের ও দশের চক্ষুর সম্মুখে ইহাই নিত্য প্রত্যক্ষ, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

আচার্য্য বঙ্কিমচন্দ্র এই অতৃপ্ত উদ্দাম লালসার অবাধ পরিতৃপ্তির পরিণাম বাস্তবজীবনে প্রত্যক্ষ করিয়াই শৈবলিনীর চরিত্রগতি ভিন্নপথে প্রবাহিত করিয়াছিলেন। বার বার বলিয়াছি যে, কোন্‌টা সুন্দর তাহার বিচার জনসমাজের প্রচলিত রুচির উপর নির্ভর করে। কোন্‌টা সুন্দর তাহা একবার বিচার করিয়া দেখ! গলাবন্ধে প্রতাপের কণ্ঠলগ্না শৈবলিনীর প্রত্যাখ্যান সুন্দর, প্রতাপ শৈবলিনীর অপূর্ব আত্মত্যাগ সুন্দর,না,বন্ধুবর নরেশচন্দ্রের "শাশ্বতে" মাতৃ সম্বোধনের পরে কমল-গোপার চুম্বনচিত্র সুন্দর? এখনও জগদীশ্বরের সৃষ্ট জগতে অন্ধ-কুক্কুর মাতৃদেহের পবিত্রতা রক্ষা করে না, আধুনিক সাহিত্যের বর্তমান প্রবাহে আধুনিক সমাজ অন্ধ-বৃত্তি অবলম্বন করিবে কি না তাহা জনসমাজের বিচার্য্য। তরুণ রবিকরবিরলা-লোকিত জগৎ যাঁহার অনুকম্পায় দর্শন করিয়াছি, বক্ষপুট কবির-ধারা-সিক্ত দেহ যিনি বর্দ্ধিত করিয়াও অজার ন্যায় পরিত্যাগ করিতে পারেন না, সেই পবিত্র মাতৃনামে যাঁহাকে অভিহিত করি তাঁহাকে কামজমোহে আলিঙ্গন ও রূপজমোহে চুম্বন উচিত কি না তাহা বিচারের শক্তি আমার নাই। জনসমাজের নিকট করজোড়ে নিবেদন করি, বিংশতী শতাব্দীর প্রথমপাদের গৌড়ীয় শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মানসিক শক্তিবিকাশের ইহাই কি প্রকৃষ্ট নিদর্শন? যদি তাহা না হয়, তাহা হইলেও ইতিহাসের জন্য মসৃণ পত্র এই কালিমার গভীর রেখায় রেখাঙ্কিত

হইয়া যাইতেছে, ভবিষ্যত অতীতকে এই গভীর কৃষ্ণ রেখাচ্ছন্নাকারে বিচার করিবে, তাহা কি চিকিৎসা সাধ্য নহে?

শৈবলিনী-চরিত্র উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদের যুগে দেশবাসীকে মোহিত করিয়াছিল, সে মনোমুকুরের দেবচরিত্র আধুনিক সাহিত্য রথকে কেন মোহিত করিতে পারে না, রোহিণী-চরিত্রে কটাক্ষপাত করিতে গিয়া শরৎ-চন্দ্র তাহা নির্দ্দেশ করেন নাই। প্রতাপ কেন্ শৈবলিনীকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল, তাহার কারণ কি সমাজে অজ্ঞাত আছে? রূপমোহে বিগতযৌবন চন্দ্রশেখরের পদ-স্খলন হইয়াছিল। তাহার প্রায়শ্চিত্ত কি সমাজ-শাসনের অন্তরাল পার্শ্বে আবদ্ধা অবলা শৈবলিনী একাকিনী করিয়াছিল? না, সহস্রবার না, চিত্তবৃত্তি সংযত করিতে প্রতাপ যে অসহ্য মানসিক দংশনের জ্বালা স্মিতমুখে সহ্য করিয়াছিল তাহা চন্দ্রশেখরের ছত্রে ছত্রে পরিস্ফুট হইয়া রহিয়াছে। প্রতাপ সে দুঃসহ যন্ত্রণা কেন সহ্য করিয়াছিল তাহা কি কেবল অষ্টাদশ শতাব্দীর কৌলিন্যমর্য্যাদা-ভিমানী টীকাতিলকের ভাগ্যবিধাতা গ্রাম্য সমাজ-নেতার অনুরোধে? না, দীক্ষা-গুরু চন্দ্রশেখরের সহস্র যন্ত্রণা উৎপীড়িত মানসিক শান্তির জন্য? অথবা পরিণীতা পত্নী রূপসীর অপরিসীম প্রেমের প্রতিদানস্বরূপ। কোন্‌টা সুন্দর? যাহার যেমন দৃষ্টি সেই ভাবেই সে তাহা দেখে। বাল্যসখী কৈশোরে মুগ্ধা, যৌবনে বাসনারপ্রপীড়িতা শৈবলিনীর আত্মত্যাগ সুন্দর, না, "চোখের বালির" বিনোদিনীর অতৃপ্ত বাসনাসাগরের উদ্দাম লহর সুন্দর? যে ভাস্কর Venus de Milo-র সৃষ্টি করিয়াছিল সে যদি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের আবরণ মুক্ত করিয়া দিত তাহা হইলে এই অপূর্ব্ব নারীমূর্ত্তি কি নূতনত্বের অনির্ব্বচনীয় সৌন্দর্য্যে সুধীজনবৃন্দের চিত্তাকর্ষণ করিত?

মিসেস্ নেলা, বি, মিলার

কোলোরাডোর প্রথম ও প্রধান রাজকবি। ইহার বিশেষত্ব—ইনি জীবনে, কখনও কাব্যগ্রন্থ প্রণয়ন করেন নাই।

কর্ম্মফল

(লেন্সপীয়র হইতে)

[শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী]

মধুর অমিয়া-ভাণ্ড
কার্য্যগুণে হয় হলাহল ;
আগাছা হইতে মন্দ
সততগুণে দুর্গন্ধ কমল।

কবি, পাঠক ও শ্রোতা

[শ্রীচণ্ডীচরণ মিত্র]

কবির যা বাণী—
সে যে শুধু রঙ,
পাঠকের ঘর—তুলায় তুলি ;
শ্রোতৃজনের পটুয়া সাজায়
ঘরে ঘরে আঁকি' চিত্রগুলি।

সাড়ে তিন বৎসর বয়স্কা বালিকা ফিল্‌ম্ ষ্টার বেবী পেগী মণ্টগোমারী

মেয়েটীর নাম বেবী পেগী। বয়স বেশী নয়, মাত্র সাড়ে তিনবছর। এই বয়সের মধ্যেই মেয়েটী ফিল্মের

অভিনয়ে বেশ নাম করে নিয়েছে এবং সম্প্রতি ৪৫০,০০০ লক্ষ টাকার একটা চুক্তিও এর হস্তগত হয়েছে।

বেবী পেগী এই চুক্তিটা গ্রহণ করেছে আর একজনের মারফতে—নিজে নয়। এর বাপ মা দুজনেই এখন মেয়েটীর উপার্জ্জনে নিজেদের জীবিকানির্ব্বাহ কোরছেন।

বায়োস্কোপ কোম্পানীর কর্ত্তৃপক্ষেরা একটী ষ্টুডিওতে একদল ছেলেমেয়ের মধ্যে থেকে বেবীকে আবিষ্কার করে ফেলেন। প্রথমে বেবীকে একটী সাধারণ শিশুর অংশ অভিনয় কোরতে দেওয়া হয়। তা'তে তার অভিনয় কৌশল এত সুন্দর ফুটে ওঠে যে—তার নাম সমস্ত আমেরিকায় ছড়িয়ে পড়ে।

বায়োস্কোপ কোম্পানীর কর্ত্তৃপক্ষেরা বেবীকে তিন বছর অভিনয় করবার চুক্তিতে আরও দেড়লক্ষ ডলার দিতে প্রতিশ্রুত হয়েছেন। বেবীর আয় এখন আমেরিকার প্রেসিডেন্টের আয়কেও ছাড়িয়ে উঠেছে। কারণ চার বছরের মধ্যে প্রেসিডেন্ট সর্ব্বশুদ্ধ উপায় করেছেন মাত্র ৯০০,০০০ টাকা।

মহৎ

(ডাঃ ক্রেন্স ক্লেস হইতে)

[শ্রীশ্রীপতিপ্রসন্ন ঘোষ]

যিনি মহৎ, জনসাধারণের ভাব প্রবাহের সহিত তাঁহার যথেষ্ট সংযোগ আছে, কিন্তু তাহা বলিয়া তিনি তাঁহার স্বীয় বৈশিষ্ট্য হারাইয়া সকলের গতি অনুসরণ করেন না।

যিনি মহৎ, তিনি যেমন চিন্তায় স্বাধীন তেমনি কার্য্যে স্বাধীন। কোন প্রতিকূল স্রোতই তাঁহার সেই স্বাধীনতাকে প্রতিহত করিতে পারে না।

মহৎ চিরদিনই শান্তিপ্রিয়। সংগ্রাম করা অথবা কোলাহল করা তাঁহার স্বভাববিরুদ্ধ।

শ্রেষ্ঠ যে, জীবনের কার্য্যাবলী তাঁহার অসাধারণ হইলেও, জীবন ধারণের প্রণালী তাঁহার অতি সাধারণ।

মহতের নিকট সকল জীবই সমান সহানুভূতি লাভ করে। করুণায় ও অনুরাগে তাঁহার হৃদয় শীতল। ক্রূরতা বা ঘৃণা তাঁহার অন্তর কলুষিত করিতে পারে না। হিংসা তাঁহাকে দাহ করে না। প্রত্যেক জীবেরই আত্মা পুণ্যময়, তাই তিনি সকলের মধ্যেই পুণ্যের ছবি দেখিতে পান। অর্থ বা সম্মানের মোহে তিনি কাহাকেও ভালবাসেন না; ভালবাসাই তাঁহার স্বভাব।

মহৎ, নীরবে আঘাত সহ্য করেন, ভগবানের কার্য্যের প্রতিবাদ করিয়া মনকে কখনও মিথ্যা সান্ত্বনা দেন না।

যিনি মহৎ তাঁহার ভিতরে আত্মম্ভরিতা নাই। জয়-পরাজয় অথবা প্রশংসা-নিন্দা তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারে না। তিনি অপরকে শিক্ষা দিতে উৎসুক নন কিন্তু অপরের নিকট হইতে শিক্ষা লাভ করিবার জন্য ব্যগ্র। ভুল সংশোধন করিতে তিনি বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হন না। বরং লোকমতের ভয়ে ভুলকে আঁকড়িয়া ধরিয়া থাকাকেই জীবনের মহাভুল বলিয়া মনে করেন।

শ্রেষ্ঠ যে, তিনি কোন পুরস্কারের আশায় পরিশ্রম করেন না। তিনি জানেন, পরিশ্রমের ভিতরই একটা বিশেষ আনন্দ আছে। সময়ের অপ্রাচুর্য্যের জন্য তিনি কখনও আক্ষেপ করেন না।

* * *

যিনি মহৎ, সত্য-শিব-সুন্দরের উপাসক তিনি। তিনি নিজে মধুর,—তাঁহার সমস্ত কার্য্যই একটা বিচিত্র মাধুর্য্য সৃষ্টি করে।

নানা কথা

ভারতবাসীদের প্রতি আমেরিকার ব্যবহার

বিগত দিল্লী কংগ্রেসে ভারতবাসীদের প্রতি আমেরিকানদের অন্যায় ব্যবহারের বিরুদ্ধে একটী প্রস্তাব উত্থিত হয়, শুনিতে পাই পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু তাহা গ্রহণের বিরুদ্ধে যুক্তিতর্ক দেখাইয়া উহা স্থগিত রাখিতে অনুরোধ করেন ও ঐ সম্বন্ধে আমেরিকানগণকে ধীরভাবে চিন্তা করিবার ও পুনর্বিচার করিবার জন্য অবকাশ দিতে বলেন। পণ্ডিতজীর উপর আমাদের প্রগাঢ় শ্রদ্ধা সত্ত্বেও আমরা তাঁহার সহিত একমত হইতে পারিলাম না বলিয়া সবিশেষ দুঃখিত। পণ্ডিতজী প্রবীণ রাজনৈতিক হইয়াও কি ইহা জানেন না যে পরাধীন ভারতবাসীর অদৃষ্টে সুবিচারের আশা আকাশকুসুমবৎ অলীক হইবে। উর্ব্বানা হইতে আমেরিকায় হিন্দুস্থান এসোসিয়েশনের ইলিনয় শাখার প্রেসিডেন্ট মিঃ জি কে দুবে লিখিয়াছেন :—সমগ্র জগতে ভারতবাসীদিগের সহিত ন্যায়সঙ্গত ব্যবহার করিবার জন্য আন্দোলন করা অত্যাবশ্যক হইয়াছে—এখনও নিশ্চিন্ত থাকিলে চলিবে না—ভিক্ষায় এ উদ্দেশ্য সাধিত হইবে না। আপনারা কি এখনও জানেন না যে সমগ্র জগতের চক্ষে ভারতবাসীগণ আজ অস্পৃশ্য! দক্ষিণ আফ্রিকা, কানাডা, নিউজীলাণ্ড, অষ্ট্রেলিয়ার প্রাণীগণ তাহাদের ছায়া মাড়াইতেও পরাঙ্মুখ! আমেরিকায়—তাহারা যোগ্যতাসত্ত্বেও কেবল বর্ণের জন্য অধিবাসিত্ব লাভের অযোগ্য—আমেরিকার স্ত্রীলোককে তাহারা বিবাহ করিবার অযোগ্য! এমন কি যাঁহারা এদ্যাবৎ অধিবাসীরূপে পরিগণিত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের অধিবাসিত্বসূচক কার্য্যাদি সকল আদালত কর্তৃক প্রত্যাহৃত হইতেছে। ফলে ভারতবাসীগণের দৌর্ব্বল্যেই আজ আমেরিকা প্রবাসী ভারতীয়গণ কোন দেশেই স্থান পাইবার অনুপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইতেছে।

* * *

এই সকল অন্যায়ের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইবার জন্য ভারতীয় কাউন্সিল সমূহে এমন প্রতিনিধিবর্গ কি নাই যাহারা আমেরিকা ও অন্যান্য দেশবাসীগণের বিরুদ্ধে এমন মত প্রচলিত করিতে পারেন যদ্দ্বারা তাহারা ভারতে অবস্থান করিয়া ভারতবাসীর শোণিত শোষণ করিবার সুযোগ আর না পায়।

* * * *

মিঃ দুবের উক্তি—চিন্তনীয়। তবে আমেরিকান পত্নীগ্রহণের অপারগতা সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই যে ভারতবাসীগণ কেনই বা আমেরিকান নারীর প্রণয়লাভে লুব্ধিত হইয়া নিজেদের আত্মমর্য্যাদা বিসর্জ্জন দিবেন। এরূপ কার্য্য করিলে নিজেই ইচ্ছা করিয়া ছোট হওয়া সুতরাং এই পত্নীগ্রহণ ব্যাপারটা সম্পূর্ণ উপেক্ষার ভাবে গ্রহণ করিলে অনেকটা আত্মমর্য্যাদা রক্ষিত হয়—কিসে চামড়ার রূপে মুগ্ধ হইয়া যিনি আত্মমর্য্যাদা বলি দিবেন তাঁহার স্বপক্ষে ভারতবাসী সাহায্য করিয়া ছোট হইতে যাইবে কেন?

অশ্লীল চিত্র প্রেরণ :—

ক্রয়ডনের ম্যাজিষ্ট্রেটগণ ২৯ বর্ষীয়া সম্ভ্রান্তাসুন্দরী সিসিলিয়া গাইলস নাম্নী মহিলাকে পাঁচ পাউণ্ড জরিমাণা ও খরচা স্বরূপ ২, গিনি প্রদানের আদেশ করিয়াছেন। তাঁহার অপরাধ তিনি আটখানি অত্যন্ত অশ্লীল ছবি ডাকযোগে প্রেরণ করিয়াছিলেন। এ সংবাদ দিবার উদ্দেশ্য সভ্যতা-গৌরব-দৃপ্ত-প্রতীচ্য নারীর পক্ষে কত নীচে নামিয়া যাওয়া সম্ভব তাহা দেখান এবং যাঁরা ঐ দেশের আদর্শে নারীসমাজ গড়িতে উৎসুক তাঁহাদের নেত্রোন্মীলন করা। আর একটা কথা ভারতেও ঐ সকল দেশ হইতে এই শ্রেণীর সভ্যতালোকদৃপ্ত চিত্রাবলী আসিয়া যাহাতে আমাদের দেশটাকে সভ্য করিয়া না তুলে তজ্জন্য সাধারণের মনোযোগ আকর্ষণ করা, কারণ ভীষণেরও আকর্ষণ আছে, বীভৎসতারও সম্মোহন আছে—আধুনিক বাংলা সাহিত্যের মধ্যে এই জিনিসটার উপরই বেশী জোর বাড়িতেছে দেখিয়া অনেক সময় ভয় হয় পাছে এই সকল উপসর্গ জুটিয়া আমাদের অধঃপতন আরও শীঘ্র সুসম্পন্ন করিয়া দেয়।

ব্যাঙ্গমাঙ্গী-সম্মন্ধ আইন—

বঙ্গবাসী পত্রিকার ৮নং পাগোডারোড রেঙ্গুন হইতে এসম্বন্ধে শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের একখানি পত্র প্রকাশিত হইয়াছে—উহা নিম্নে যথাযথ উদ্ধৃত হইল :—

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় যে বেশ্যাবৃত্তি রোধের আইন পাশ হইতেছে বা হইয়াছে তৎসম্বন্ধে আমার রেঙ্গুনের অভিজ্ঞতার ফল স্বরূপ কয়েকটী কথা বলিতে হইল। আশাকরি, ইহা বিশেষরূপে প্রণিধান পূর্ব্বক পর্য্যালোচনা করিয়া মতামত প্রকাশ করিবেন। ব্রহ্ম রেঙ্গুনে বেশ্যা-বৃত্তি রোধ আইন আছে। আইনানুসারে রেঙ্গুন সহরের এলাকায় মোটেই বেশ্যাগণ বসবাস করিয়া ব্যবসায় করিতে পারিবে না। কিন্তু পুলিস বেশ্যাগণকে সহরের মধ্যে থাকিতে দিয়া বেশ্যার ব্যবসায়ের সহায়তা করে বলিয়া অদ্য রেঙ্গুন সহরের বেশ্যাপ্রাবল্য কিছুমাত্র হ্রাস পায় নাই। কলিকাতা পিয়ালয়হে অনেক পুলিস বেমন প্রতি ঘোড়ার গাড়ীর মাথা পিছু ১০ হিঃ মাথট তোলে হাওড়ার পুলের সম্মুখে হ্যারিসন রোড ও ষ্ট্রাণ্ডরোডের সংযোগ স্থলে অনেক সার্জ্জেণ্ট যেমন রাস্তায় ফেরিওয়ালা ফল বিক্রেতাগণের নিকট তোলা তোলে। এখানেও অনেক পুলীস প্রতি বেশ্যার মাথা পিছু দৈনিক ৩৲ টাকা হিসাবে তোলা আদায় করিতেছে। কেবলমাত্র আপানী বেশ্যাগণ বিশ্রামাগার, বিলিয়ার্ডরুম প্রভৃতি সাইনবোর্ড টাঙ্গাইয়া এবং ইউরোপীয়ান এংলো ইণ্ডিয়ান বেশ্যাগণ midwife & Nurse নামে পরিচয় দিয়া এবং বাঙ্গালী বেশ্যাগণ গৃহস্থ সাজিয়া পুলীসের ঐ তোলা হইতে ফাঁকি দিতেছে। পুলিস যে আইনকে এইভাবে জনগণের সাক্ষাতে পদ-দলিত করে ইহা আইন কর্ত্তাগণেরও অজ্ঞাত নহে। কারণ ইতিপূর্ব্বে এ প্রকার ঘটনা আদালতে প্রকাশ পায়। ঘটনার বিবরণ সংক্ষেপে এই—পুলীস যখন বুঝিল যে কতকগুলি বেশ্যা তাহাদের চক্ষে ধূলি দিয়া পুলীসের প্রাপ্য ফাঁকি দিতেছে পুলীস তখন রাগে আঘাত লাগায় সজাগ হইয়া উঠে এবং খোঁজ খোঁজ রব পড়িয়া যায়। একদিন বেশ্যা আছে মনে করিয়া এক ভদ্রলোকের বন্ধ দরজা ধাক্কাধাক্কি করিতে থাকে। গৃহস্বামী তখন আফিসে গিয়াছেন, দরজা খোলা না পাইয়া পুলিসের সন্দেহ প্রবলতর হইয়া উঠে বেশ্যার দরজা ভাঙ্গিতে আর ভয় কি বলিয়া দরজা ভাঙ্গিয়া গৃহে প্রবেশ করিয়া ভদ্র-মহিলাকে নিতান্ত কুৎসিত বাক্য বলিতে থাকে এবং সে যে বেশ্যা ইহা স্বীকার করিতে বলে, ছেলে পুলে কাঁদিয়া আকুল। অন্য অভিভাবক কেহ নাই। যাহা হউক ইহা আদালতে যায় এবং আইন কর্ত্তাগণও ইহা অবগত, তথাপি পুলিসের এই মাথট তোলা এবং বেশ্যাপ্রাবল্য দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে সুতরাং এ আইনের ফলে রেঙ্গুনবাসীর কিছুমাত্র উপকার নাই। কেবলমাত্র শাসকগণের পেট ভরা এবং বেশ্যাগণের অপরিসীম দুর্দ্দশা ব্যতীত এই আইন মানব সমাজের মঙ্গলকর হইতে পারে না। প্রতিদিন ৩৲ হিঃ দিলে প্রত্যেক বেশ্যাকে অন্ততঃ প্রতিদিন ৫৲ উপায় করিতে হয়। ফলে রেঙ্গুনে দিবা-ভাগেও ব্যবসা চলিয়া থাকে।

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় যে সভ্য মহাশয় এই প্রকার বলিয়াছেন "জনসাধারণ সতর্ক দৃষ্টি রাখিলে পুলিস বেশ্যা পীড়ন করিতে সাহসী হইবে না।" ইহাতে এই মনে হয় পুলিসের উপর জনসাধারণের প্রভাব কতটুকু তাহা ঐ সভ্য মহোদয়ের জানা নাই এবং এই প্রকার অজ্ঞান বিশিষ্ট লোককে ব্যবস্থাপক সভায় সভ্য মনোনীত যদি দেশের লোক করিয়া থাকে, তবে বলিব, বাঙ্গালী ক্রমশঃ মস্তিষ্কশূন্য হইয়া পড়িতেছে।*

স্যার আশুতোষের পদত্যাগ—

সহযোগী 'বেঙ্গলী' জানিয়েছেন যে স্যার আশুতোষ তাঁহার অফিসিয়েটিং চীফ্ জষ্টীস গিরির পদত্যাগ পত্র গ্রহণ করিয়াছেন এবং আগামী নভেম্বর মাসে লেজিস-লেটিভ এসেম্বলীতে নির্ব্বাচন জন্য দণ্ডায়মান হইবেন। বঙ্গীয়তা অপেক্ষা এই কার্য্যে তাঁহার কৃতাম্বের পরিচয় দিবার স্থান যে প্রশস্ত হইবে তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই—অবশ্য যদি সরকারের মোহকাঁপ অন্য কোনরূপে তাঁহাকে বাঁধিয়া না ফেলে। আশা করি এসেম্বলীতে অধঃপতিত দেশবাসীর মর্য্যাদা পুনঃস্থাপিত করিয়া স্যার আশুতোষ ভবিষ্যৎ বঙ্গবাসীর জন্য একটী উজ্জ্বল নিদর্শন রাখিয়া যাইবেন।

---

* আমরা জানি এই শ্রেণীর কোরওয়ালাদিগকে অপসারিত করিবার জন্য স্থানীয় কোন লব্ধ প্রতিষ্ঠা ব্যবসায়ী ডেপুটী কমিশনারের নিকট আবেদন করায়ও কোন ফল পায় নাই। চেম্বার্ড সাহেবের মত যোগ্য কমি-শনারের আমলেও যদি এই ব্যাপার পূর্ব্বের মত চলিতে থাকে তবে ইহার কোন উপায় নাই জানিব।

সম্পাদক

ইরাণের নববর্ষ

[শ্রীহিরণ্ময় ঘোষাল]

ইরাণে "নওরোজ"টাই (নূতনদিন) হ'চ্ছে সব চেয়ে বড় আর প্রধান উৎসব। এই উৎসবটা মুসলমানদের না হ'লেও, ইরাণীরা এর মূলে একটা মনগড়া ভিত্তি আরোপ ক'রে এটাকে সম্পূর্ণ আপন ক'রে নিয়েছে। তা'রা বলে- এই উৎসবটা হ'চ্ছে মৎস্যদের মাতার জন্মদিন উপলক্ষে। কিন্তু যথার্থ এই উৎসবটা চ'লে আস্‌চে সেই পুরাণ কাল হ'তে,—যখন ইরাণীরা ছিল অগ্নিপূজারী; আর এর প্রারম্ভ হ'চ্ছে "জোরোস্তা"রের আমলে তাঁর শিষ্যদের থেকে—বর্ষের প্রথম দিন উপলক্ষে।

ইরাণে "নওরোজ" উৎসবটা দশদিন ব'রে হ'য়ে থাকে। এই দশটা দিন হ'চ্ছে যেন ইরাণীদের সারা বছরের পরিশ্রমের বিশ্রাম। এই উপলক্ষে সমস্ত কাজকর্ম দোকান পাট বন্ধ থাকে। যে যা'র আহার দশদিনের মতন সংগ্রহ ক'রে রেখে গানবাজনায় আমোদে, উৎসবে এই ক'টা দিন অতিবাহিত ক'রে দেয়। সব পরিবারেই, হোক্ না সে দরিদ্র—নৃত্যগীত,বন্ধুভোজের প্রচলন আছে। সে দেশ আমাদের এই প্রাণহীন শুষ্ক দেশের মত নয়, সে দেশের ওপর দিয়ে স্বাধীনতার প্রাণের হাওয়া ব'য়ে যায়, তাই সে দেশের অতি দরিদ্রেরও কিছু না থাকলেও সবই আছে, তাই তারা প্রত্যেকে প্রাণ ভ'রে বছরের এই ক'টা দিন বেশ আমোদে প্রমোদেই কাটিয়ে দিতে পারে। প্রত্যেকে নূতন নূতন বেশভূষায় সজ্জিত হ'য়ে আত্মীয় বান্ধবের কাছে যাওয়া আসা ক'রে থাকে, ঠিক আমাদের দেশের বিজয়ার দিনের মতন। উৎসবের শেষ দিনে প্রত্যেক ইরাণী আপন আপন পরিবারবর্গকে সঙ্গে নিয়ে প্রমোদোদ্যান ও নানা তামাসার স্থানে গিয়ে আনন্দ উৎসব ক'রে থাকে। ইরাণে শুধু এই একটী দিনেই পর্দানশীন স্ত্রীরা বাইরের জগতের একটু নির্মল আলোও হাওয়া উপভোগ ক'রতে পারে।

'নওরোজে'র পূর্ব্বে সাধারণ লোকেরা চাঁদা তুলিয়ে, "নওরুজ" ক'রে দেবতার মনস্তুষ্টি ক'রতে চেষ্টা করে। এই উৎসবটা যে সেই পুরাতন অগ্নিপূজার আমল হ'তেই চ'লে আস্‌চে, তা' এই আগুনের খেলাটাই প্রতিপন্ন করে দেয়।

রাজপ্রাসাদে এই 'নওরোজ' উৎসবটা বেশ জমকাল রকমের হ'য়ে থাকে। সূর্য্য বিষুবরেখা অতিক্রম কর্‌বার পূর্ব্বে, তা সে রাত্রেই হোক্ বা দিনেই হো'ক্ পারস্যের বড় বড় পদস্থ ব্যক্তিরা মূল্যবান পোষাকে ভূষিত হ'য়ে সভাগৃহে সমবেত হ'ন্ ও শাহের আগমনের পূর্ব্বেই পদানুসারে যে যাঁর আসন অধিকার করেন।

প্রথমে বসেন দেশের মহামোল্লারা তাঁদের সে পারলিক কায়দায় আশু পেতে, তার পর বসেন শাহের পরিবারবর্গ ও প্রধান প্রধান মন্ত্রীরা ও বড় বড় সেনাপতিরা। তার পর বসেন দেশের বড় বড় আমির ওমরাহরা। শাহের আগমন পর্য্যন্ত মোল্লারা ছাড়া সকলকেই দাঁড়িয়ে থাকতে হ'বে। শাহ ধীরে ধীরে সভায় প্রবেশ ক'রে ময়ূরসিংহাসনের সম্মুখে মণিমুক্তাখচিত আসন অধিকার করেন। সভায় সকলেই নানা মূল্যবান্ পাত্রে নানান্ রকমের ফল শাহের কাছে রেখে আসেন,—উপহার—স্বরূপ। পরে জ্যোতির্ব্বিদরা বিষুবরেখা অতিক্রমের সংবাদ দিলে শাহ একখানি সুরক্ষিত "কোরাণ" আপন কপালে, বক্ষে ও ওষ্ঠাধরে স্পর্শ করিয়ে মোল্লাদের বলেন—"আমার প্রতি সন্তুষ্ট হ'ন্"। এতে একজন বিশিষ্ট মোল্লা ঈশ্বরের স্তুতিগান করেন। তা'রপর পদানুসারে প্রত্যেকে শাহের সম্মুখীন হ'য়ে আশু পেতে, ব'সে শাহের কাছ থেকে নববর্ষের নূতন মুদ্রা গ্রহণ করেন। নববর্ষের দিনে মুদ্রাবিতরণ হ'চ্ছে দেশের পক্ষে একটা বিশেষ কল্যাণ। এই দানও আবার পদানুসারে বেশীকম হ'য়ে থাকে। দান গ্রহণের পর একে একে সকলেই রাজসভা হ'তে বিদায় হ'ন। শুধু থাকেন শাহ, একা,—দেশের কল্যাণ প্রার্থনার জন্যে।

ট্র্যাজেডী

[শ্রীশিবশঙ্কর রায়চৌধুরী বি-এ]

আমরা সবাই যখন আমাদের "উনপঞ্চাশী" ক্লাবে বসিয়া উমেশদার নিদারুণ অর্থনৈতিক আলোচনার জন্য প্রস্তুত হইয়া অপেক্ষা করিতেছিলাম তখন বাহিরের আকাশ মেঘে মেঘে ছাইয়া বাদলের হাওয়া বহিতে লাগিল। প্রথমে টুপ্‌টাপ পরে আকাশ ভাঙ্গিয়া বৃষ্টি আরম্ভ হইল। এই ঘন-গম্ভীর-মুখর সন্ধ্যায় সশঙ্কিত চিত্তে উমেশদার প্রতীক্ষা করিতে করিতেও যেন বার বার করিয়া মনে হইতে লাগিল এমন দিনে উমেশদার অনুপস্থিতিতে জ্ঞানের ভাণ্ডারে যতই টানাটানি পড়ুক তাতে তেমন মারাত্মক ক্ষতি হইবে না। কিন্তু উমেশদা লোকটী ছিলেন এমন রাসভারী গম্ভীর তার চালচলন ছিল এমনি নিয়মিত, আর কথাবার্ত্তা এমনি ওজনকরা, যে জোর করিয়া তার সম্বন্ধে এহেন অহেতুক আশঙ্কা করা যায় না।

কিন্তু পৃথিবীতে মাঝে মাঝে অঘটনও ঘটে। উমেশদা সেদিনের মত সত্যই গর-হাজির হইলেন।

ধীরেশ গুণ্ গুণ্ করিতে করিতে একটা তাকিয়া কোলের কাছে টানিয়া লইয়া কহিল "এমন দিনে তারে বলা যায়।" অবিন্ তাকিয়ার উপর তাল ঠুকিয়া সায় দিল "এমন ঘন-ঘোর বরিষায়।"

এই সূত্রটি টানিয়া বুনিয়া আর একজন উদাস ভঙ্গীতে কহিল "বিভব, ধন-মান, কিছুই চাহিনা।"

২য়—"শুধু যদি বিধি মিলাইত ভাল এক কাপ চা"

৩য়—"তার সঙ্গে যদি ফুলিঝিচুরি থাকে—"

৪র্থ—"আপত্তিকর নয় তা!"

শুরুমহাশয়ের অসদ্ভাবিতরূপে অনুপস্থিতিতে পাঠশালার অবস্থাটি যেমন দাঁড়ায়, ছেলেদের মনে বাঁধন-হারা মুক্তির আনন্দ যেমন করিয়া বাজিয়া উঠে, এই তিমিত সন্ধ্যার মেঘমেদুর আকাশের তলে আষাঢ়স্য কস্যচিদ্দিবসে কলিকাতা মহানগরীর তেমনি ছুটীর সাড়া পড়িয়া গেল।

এমন সময় এমন আসরের মান যদি কেউ রাখিতে পারে—সে অবিন্। অবিন্‌কে সকলে চারিদিক হইতে মৌমাছির মত বেড়িয়া ফেলিল। অবিন্ ছিল ডাক্তার। তবে ডাক্তারীর আওতায় পড়িয়াও যে তাহার প্রাণের উৎস একেবারে শুকাইয়া যায় নাই তাহা তাহার কথা শুনিলেই বুঝা যাইত। অবিন্ লোকটি যে কেমন সরস রসাল এবং তাজা তাহা তাহার কথা এবং কথা বলিবার ভঙ্গী যে না শুনিয়াছে এবং দেখিয়াছে সে ঠিক ধারণা করিতে পারিবে না। অবিন্‌কে কিছু গম্ভীর এবং তখন পর্য্যন্তও নীরব দেখিয়া ধীরেশ কহিল—প্রারম্ভেই আশা ভঙ্গ করে দিওনা দাদা,

—"আত্মরস রক্ষা করে বলে
ইক্ষুঘরে কিস্তুর করলে।"
অতএব—

মুখখানি আরও অনাবশ্যক গম্ভীর করিয়া অবিন্ কহিল—"গল্প আমি জানি না, তবে সত্য ঘটনা একটা বল্‌তে পারি বটে—"

"Truth is stranger than fiction—কোন আপত্তি নেই,—হাল ছেড় না দাদা—"

নেশাখোরেরা মৌতাতের সন্ধান পাইলে যেমন করিয়া ভিড় করিয়া কোল ঘেঁসিয়া আসিয়া বসে তেমনি করিয়া চারিদিক হইতে সকলে অবিন্‌কে ঘিরিয়া ধরিল।

অধিক গৌরচন্দ্রিকাদ্বারা মুখবন্ধ না করিয়া অবিন্ সোজাসুজি ভাবে আরম্ভ করিল "আমরা যখন মেডিকেল কলেজে পড়ি, সুরেশ ও রমেশ নামে দু'টী ছেলে আমাদের সঙ্গে পড়তো। তার মধ্যে সার্জ্জন সুরেশ প্রসাদের নাম তোমরা বোধ হয় সকলেই শুনে থাকবে।"

"কোন্ সুরেশপ্রসাদ হে ?"

"চক্রবর্ত্তী ! না—ও শুনতে পায়, কারণ একটী বৎসর মাত্র সে প্র্যাক্‌টিস্ করবার অবসর পেয়েছিল।"

একজন দীর্ঘশ্বাস ফেলার ভঙ্গীতে কহিল "মাত্র একটী বৎসর ! আহা বেচারা !"

আর একজন কহিল "এবে প্রায়শ্চেই ট্র্যাজেডীর গন্ধ বেরুচ্ছে হে।"

তৃতীয় কহিল "Hero এবং villain এর সন্ধান ত মিল্‌ল, কিন্তু নায়িকা সেই উদ্ভুল যৌবনময়ী নিষ্ঠুরা labelle dame sans merci তিনি কই ?" অবিন্ একথা কানে না তুলিয়া কহিল "ট্র্যাজেডী কমেডী বুঝিনা ভাই, তবে যা চোখের সাম্‌নে দেখেছি—"

দ্বিতীয়—"ব্যস্ চেপে যাও। তবে দাদা রং টং যেন বেশী চড়িও না, একটু কাট ছাট দিয়েই চালিও।"

অবিন্ কহিল—"আমি কিছু চড়াবও না কাটছাটও দেব না। তবে তাকে তোমাদের সাহিত্যিক ভাষায় উলঙ্গ বাস্তব বল্‌তে হয় বল, নগ্ন সত্য বলতে চাও আপত্তি নেই, তবে যা বল্‌বো তা সত্য ভিন্ন মিথ্যা হবে না—এ কথা পরমেশ্বরকে প্রত্যক্ষ জেনে হলফ করে বলতে পারি।"

"বহুৎ আচ্ছা ! অলমতি বিস্তারেণ ভূমিকয়া" বলিয়া বীরেশ ওষ্ঠে অঙ্গুলি দিয়া সকলকে রসনা সংযমের ইঙ্গিত করিল।

অবিন্ আরম্ভ করিল :—মুকুলিত গৌরব উন্মেষময় জীবনের প্রত্যূষে ডাক্তার সুরেশপ্রসাদের আকস্মিক অপঘাতে মৃত্যুতে কলিকাতাবাসী যে কিরূপ বিস্মিত ও বিচলিত হয়েছিল তা আমার সবিস্তারে না বল্‌লেও চল্‌তে পারে। কারণ সে সময়কার খ্যাত এবং অখ্যাত সকল প্রকার সংবাদপত্রেই এ নিয়ে তুমুল আন্দোলন এবং আলোচনা হয়েছিল। তা তোমরা সকলেই পড়ে থাকবে। তবে এই মেধাবী বাঙ্গালী সার্জ্জনের সহসা এই রহস্যময় আত্মঘাতের হেতু কি তা নিয়ে সরকারী ও বেসরকারী বহুবিধ অনুসন্ধিৎসু দ্বারা বহু উপায়ে চেষ্টা ও তদন্ত হ'লেও কেউ কোন নিশ্চিত সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারে নাই। বলা বাহুল্য 'করোনারে'র বিচারে মামুলী ভাবে সহসা মস্তিষ্কের বিকৃতিহেতু আত্মহত্যা বলে নির্দ্ধারিত হল। এই শোচনীয় অপঘাত মৃত্যু ব্যাপারটী সম্বন্ধে সকলে যা জানে আমিও তাই জানি এবে হত্যা। নয় আত্মহত্যা সে কথাও ঠিক, কিন্তু কার্য্য-কারণ সম্পর্কিত জগৎ ব্যাপারে কার্য্যটী সম্বন্ধে সাধারণ অপেক্ষা বেশী কিছু না জানলেও কারণটী সম্বন্ধে আমি এমন কথা জানি যা আর কেউ জানে না। এবং সেই কথাই আমি আজ বলবো।

"আমরা যখন মেডিকেল কলেজে পড়তুম ক্লাসে ও পরীক্ষায় সুরেশপ্রসাদ আর সকলকে এত পিছু রেখে চল্‌ত যে আর কেউ সহজে তার নাগাল পেত না। কেবল রমেশ বলে একটি ছেলে বহু আয়াসে তার পিছু পিছু উল্লম্ফনে পরীক্ষাসমূহ পার হ'য়েছিল। কোন কোন বার কোন কোন বিষয়ে ধরি ধরি ও যে না করছিল এমন নয়। এক কথায় রমেশ ছিল আমাদের মধ্যে সুরেশের একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের সরস্বতী সুরেশপ্রসাদকেই জয়মাল্য এবং পুরস্কার স্বরূপ তার স্বর্ণপদ্মের পাপড়িগুলি একে একে মেডেল রূপে উজার করে দিয়ে আসছিলেন। পরিশেষে শেষ পর্য্যন্ত সুরেশ ও রমেশের বিরল বন্ধুত্ব কালক্রমে বিদ্বেষে পরিণত হয়। তবে এক কথা এখানে বলা সঙ্গত যে উভয়ের সতীর্থ বান্ধব এবং পার্শ্বচরদের দ্বারা এ বিষয়ে কম সহায়তা হয় নি।

"সুরেশের জয়ের গৌরব বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিযোগীতা-ক্ষেত্রে সম্পূর্ণরূপে অপ্রতিহত রইল বটে, কিন্তু অপরদিকে সংসারক্ষেত্রে ভাগ্যদেবী তার অদৃষ্টলিপিতে রমেশের কাছে এমন নিদারুণ এবং মর্ম্মান্তিকভাবে তাকে পরাজিত করে রেখেছিলেন তা তখন কে অনুমান করতে পেরেছিল।"

"সে ঘটনাটি মোটামুটি এই—অনেকদিন হ'তেই সুরেশের বিবাহের সম্বন্ধ তাদের পাড়াতেই কোন্ এক ভদ্রলোকের কন্যার সহিত পাকা হয়েছিল। বছরে এক-বার যখন সুরেশের স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়, পশ্চিমের কোন সহরে স্বাস্থ্যান্বেষণে গিয়ে এই পরিবারের সঙ্গে তার পরিচয় এবং ক্রমে ঘনিষ্টতা জন্মে। ভদ্রলোকের এক অনূঢ়া

বিমুখী কন্যা ছিল। যা হ'ক ব্যাপারটা যে একটা ছোটখাট রোমান্সে পরিণত হয় একথা তোমাদের বিস্তারিত না বললেও নিজের নিজের মনে কল্পনার ভরাট করে নিতে পারবে এ বিশ্বাস আমার আছে।"

"ছাত্র জীবনে অধ্যয়নই যে তপ—একথা সুরেশ ছাড়া আর কে অধিক অনুভব করেছে? তার দুটী ক্ষীণ চক্ষু আগন্তিক সর্ব্বপ্রকার মনোরম বর্ণনীয় বস্তু উপেক্ষা করে একাগ্রভাবে পাঠ্য পুঁথির মধ্যে আবদ্ধ করে রেখেছিল। তবে এ কথা ঠিক সুরেশের জীবনের বৈচিত্র্যহীন অধ্যয়ন তপঃ আশ্রমের শান্তিভঙ্গের ভয়ে ঐ ক্ষুদ্র রোমান্সটুকুই প্রথম এবং শেষ।"

"আসন্ন পরীক্ষার চিন্তায় পুঁথি সমুদ্রের মধ্যে যখন সুরেশপ্রসাদ প্রায় সমাধিস্থ এমন সময় তার জনৈক পার্শ্বচর হিতৈষী ভরদূতের মত রমেশের সঙ্গে তার ভাবীপত্নীর উদ্বাহক্রিয়া যে মঙ্গল মত নির্ব্বিঘ্নে নির্ব্বাহ হয়েছে এই রুচিকর সংবাদটী তার গোচর করল। প্রমাণ প্রয়োগের জন্য একখানা দৈনিক সংবাদপত্রও সে সংগ্রহ করে আনতে ভোলেনি। তাতে সম্পাদক মহাশয় সংবাদটী উল্লেখ করে বিনাপণে এইরূপ বিবাহ শিক্ষিত বঙ্গীয় যুবকগণের মধ্যে যাতে আদর্শ হয় এইরূপ মন্তব্য করেছিলেন। রমেশ তার বিয়েতে যে সুরেশকে নিমন্ত্রণ করেনি এমন নয়। হয়ত তার শারীরবিদ্যা স্বাস্থ্যতত্ত্ব অথবা অস্ত্রোপচার শাস্ত্রের কোন এক পুঁথির মধ্যে সেই নিমন্ত্রণ পত্রখানা পত্র-চিহ্নরূপে বিরাজ করছিল। চোখ বুলাবার তার অবসরই হয়ত ঘটেনি।"

"বিয়ের পর আপন ঔদার্য্যগুণে রমেশ কিন্তু পূর্ব্ব মনোমালিন্য কিছুই মনে রাখল না। সে নিজে সপত্নীক সুরেশের বাড়ী গিয়ে দেখা করল। এবং পত্নীর সঙ্গে সুরেশের পরিচয় করে দিয়ে গৌরব অনুভব করল। এই অবসরে সে নবপরিণীতা পত্নীর কাছে সুরেশের বিদ্যা বুদ্ধির অপূর্ব্ব প্রখরতা কেমন করে যে সে প্রতি পরীক্ষায় প্রতিযোগীতাতেই তাকে হটিয়ে দিয়েছে সব কথার কোন অংশই সে বাদ দিল না। এইরূপে কিছুদিন সে সুরেশের সহিত এমন ঘনিষ্টভাবে মিশল যে উভয়ের পার্শ্বানুচরেরাও কোনও বৈচিত্র্য সম্পাদনের সুযোগ করে উঠতে পারল না। কেউ কেউ রমেশের তখনকার মনস্তত্ত্ব এইরূপে ব্যাখ্যা এবং বিশ্লেষণ করল যে, বিজেতা হয়ে যদি জয়পতাকা প্রতিনিয়ত পরাজিতের চোখের সাম্নে সুস্পষ্টভাবে উড্ডীয়মান না রাখা গেল তবে সে জয়ে গৌরব কোথায়! কারও কারও চোখে তাদের এই ঘনিষ্ঠতা যে বাড়াবাড়ি আতিশয্য বলে ঠেকেছিল সেকথা বলাই বাহুল্য। কিন্তু রমেশ সে সব প্রাহ্যের মধ্যে আনে এমন সঙ্কীর্ণমতি সে ছিল না।

সেটি অতি স্মরণীয় বৎসর। সেই বৎসরই পৃথিবী-ব্যাপী কুরুক্ষেত্র বেঁধে গেল। রমেশ বন্ধু সুরেশের হাতে সংসারের অভিভাবকত্বের ভার অর্পণ করে সকলের নিষেধ সত্ত্বেও অনাস্বাদিত এক নূতন জীবনের মোহে ব্রিটিশ পক্ষে ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীরূপে যুদ্ধাভিযানে যাত্রা করল। সে এমনভাবে ডুব মারল যে দু' তিন বৎসর পর সে তার আর কোন খোঁজই পাওয়া গেল না। তিন বৎসর তার স্ত্রীকে আর যাকে সেখানে গিয়ে যাবার জন্য দেশে ফিরল।

দেশে ফিরে সে আড়ালে অন্তরালে তার স্ত্রী ও বন্ধু ঘটিত এমন সমস্ত মন্তব্য শুনতে পেল, যা অকথ্য, অশ্রাব্য এবং আশাতীত রূপে অভাবনীয়!

কিন্তু রমেশ এতে বিন্দুমাত্রও বিচলিত অথবা চাঞ্চল্য প্রকাশ করল না। তার দু'একজন অনুচরের মুখে সে সুরেশ সম্বন্ধে অস্পষ্ট এমন সব ইঙ্গিতের আভাস পেত যার অর্থ রমেশের কাছে বেশ সুস্পষ্টই ঠেকত। পরিচিত জন সমাজে তাকে দেখে যে লোকে মুখ টিপে হাসত এমনও তার বোধ হ'তে লাগল। কেউ পরোক্ষে কিছু চুপি চুপি বললে সে স্পষ্টই বুঝতে পারত যে অন্যমনস্ক ও অতর্কিত ভাবে সে কথাটিকে শোনানই তাদের উদ্দেশ্য সে এ সম্বন্ধে কারও সঙ্গে কোনরূপ আলোচনা না করে একদিন হঠাৎ কলিকাতা পরিত্যাগ করল। ঠিক এই সময়েই সুরেশপ্রসাদও বিলাত যাত্রা করে সেখানকার সার্জ্জারীর সর্ব্বোচ্চ উপাধি নিয়ে বিপুল গৌরবে দেশে ফিরে প্র্যাক্‌টিস্ আরম্ভ করল।

সুরেশের সংযত বিনয়নম্র মধুর ব্যবহার, দরিদ্রের প্রতি করুণা, অস্ত্রোপচার শাস্ত্রে বিপুল অভিজ্ঞতা ও

স্থানাভিজ্ঞতা তাকে অতি অল্পকাল মধ্যেই কলিকাতা মহানগরীতে পরিচিত করল। অদূর ভবিষ্যতেই তার নাম ও যশ কলিকাতার বাইরেও যে ছড়িয়ে পড়বে সে বিষয়েও সন্দেহ রইল না। সুরেশ কিন্তু আত্মীয় স্বজনের বহু উপরোধেও দার পরিগ্রহে সম্মত হ'ল না।

এইরূপে সুরেশপ্রসাদ যখন বিশেষ প্রতিপত্তিলাভ করেছে একদিন হঠাৎ অনেক রাত্রিতে কলিকাতার উপকণ্ঠে এক সম্ভ্রান্ত মুসলমান পরিবারে সে এক জরুরী তার পেল। অধিক রাত্রি বলে সে প্রথমে অসম্মতি জানাল। কিন্তু লোকটীর সকরুণ অনুরোধ এবং উপরোধ সে কিছুতেই এড়াতে পারল না। কর্ত্তব্যপরায়ণ সুরেশ প্রসাদ অবিলম্বে প্রস্তুত হয়ে মোটরে উঠ্‌ল।

রাত্রি প্রায় সাড়ে বারটার সময় সুরেশপ্রসাদ নগরোপকণ্ঠে এক প্রকাণ্ড বাড়ীর ফটকে পৌছল। প্রবীণ গৃহস্বামী অতি সমাদরে তাকে নিয়ে বৈঠকখানায় বসালে। গৃহস্বামী বিশেষ ভূমিকা না করে মার্জ্জিত হিন্দী ভাষায় নিজের পরিচয় এবং তার স্ত্রীর রোগের বিবরণ বল্‌ল। তাঁর বংশ পরিচয় এবং রোগীর রোগের বিবরণ সংক্ষেপে এই :—তা'রা দিল্লীর বাদশাহ আমলের অতি সম্ভ্রান্ত এবং আভিজাত্য পরিবার! সেইদিন তা'রা কলকাতায় পৌছেছিল,—পরে তাঁর খ্যাতি এবং পারদর্শীতার কথা শুনে তাঁরই শরণাপন্ন হয়েছে। রোগিনী তার স্ত্রী। আবহমান কাল হ'তেই সাধারণের অজ্ঞাত, বাদশাহ ওমরাহ প্রভৃতি আভিজাত্য পরিবারে রূপ ও সৌষ্ঠব বৃদ্ধির কতকগুলি গুপ্ত প্রক্রিয়া প্রচলিত ছিল এবং আছে। ঐ প্রক্রিয়া মূলে বনৌষধি প্রয়োগে যুবতীগণের অধরোষ্ঠ স্থায়ী ভাবে রঞ্জন করবার একটি ব্যবস্থা আছে। কিন্তু ঐ ভেষজ অতি উগ্র এবং বিষাক্ত। অবশ্য তেমনি উহার প্রতিষেধক বিপরীত ক্রিয়া মূলক ব্যবস্থাও আছে। বিবিধ ভেষজের একটা প্রলেপ ওষ্ঠে কিছুদিনের জন্য পটি সাহায্যে বেঁধে রাখতে হয়। কিন্তু উক্ত পটি কয়েকদিন রাখবার পরই বর্ত্তমান ক্ষেত্র রোগিনীর ওষ্ঠ ভয়ানক স্ফীত ও দারুণ যন্ত্রণা আরম্ভ হয়। এতেই বিষক্রিয়া অনুমিত হয়, এবং আশু মৃত্যুই উহার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম। কিন্তু প্রতিষেধের এক উপায় আছে। ঐ বিষক্রিয়া সমস্ত শরীরে ছড়াবার পূর্ব্বে ওষ্ঠটী অস্ত্র হ'তে বিচ্ছিন্ন করে দিতে পারলে রোগিনীর জীবনের আশা আছে। কিন্তু তা অস্ত্রোপচার শাস্ত্রে নিপুণ এবং অভিজ্ঞ ব্যক্তির সাহায্য ব্যতিরেকে হওয়া অসম্ভব। ভদ্রলোকটী করুণ কণ্ঠে আরম্ভ করল "বুঝতেই পারছেন আমি কিরূপ বিপন্ন। এ সময় যদি—আপনি আমার স্বদেশবাসী, আমার পরিবারের মান সম্মান, আভিজাত্যের মর্ম্ম আপনি যেরূপ বুঝতে পারবেন কোন বিদেশীয় বিজাতীয় ডাক্তার তা পারবে না। এই জন্যই এই গভীর নিশীথেও আপনার বিশ্রামে ব্যাঘাত দিয়ে আপনাকে দুর্ভোগ ভোগাতে সাহসী হয়েছি।

সুরেশপ্রসাদ ধীরভাবে কিছুক্ষণ চিন্তা করে বল্‌ল—"আপনি ঠিক বলছেন যে ওষ্ঠে ঐরূপ অস্ত্রোপচার ব্যতিরেকে রোগিনীর জীবনের আশা নেই!"

ভদ্রলোকটী করুণভাবে সুরেশপ্রসাদের দুই হাত চেপে ধরে বল্‌ল—"দয়া করুন, আপনি আমার স্বদেশবাসী, আমার মান ইজ্জত রক্ষা করুন।"

সুরেশপ্রসাদ ধীরভাবে তাকে আশ্বাস দিয়ে রোগিনীর কক্ষে প্রবেশ করল।

রোগিনীর সর্ব্বদেহ বস্ত্রাবৃত ছিল। মুখখানিও একখানা রঙীন মস্‌লিনের ওড়নায় ঢাকা। শুধু ঠোঁট দুটী খোলা ছিল। অধরোষ্ঠ স্ফীত, একখানা ভেষজপূর্ণ পটী বাঁধা। রোগিনীর চৈতন্য ছিল না। ধীরভাবে নিশ্বাস-প্রশ্বাস বইছিল। ক্লোরাফরম প্রয়োগে যেমন অচৈতন্য করা হয়, অনেকটা সেই রকম।

ভদ্রলোকটী বলিল—"আপনি কিছুমাত্র দ্বিধা করবেন না। বিষক্রিয়ায় ঐরূপ অচৈতন্য আছে, বিষাক্ত অঙ্গ বিচ্ছিন্ন হওয়ামাত্র চৈতন্য হবে। ইহা পরীক্ষিত সত্য।"

সুরেশপ্রসাদ অধিক বাক্যব্যয় না করে অস্ত্রপাতি বের করে প্রস্তুত হ'ল, এবং নৈপুণ্যসহকারে অস্ত্রোপচার আরম্ভ করিল। অধরোষ্ঠ যখন প্রায় বিচ্ছিন্ন হয়েছে রোগিনী অস্ফুট ধ্বনি করে দু' হাতে মুখের ঢাকা ফেলে দিয়ে বিস্ময় বিস্ফারিত চোখে সুরেশপ্রসাদের দিকে চেয়ে রইল। ডাক্তার সুরেশপ্রসাদের বিস্ময়-বিমূঢ় দুটী পলকহীনভাবে রোগিনীর মুখের উপর নিবদ্ধ

হয়ে রইল। কম্পিত হাত থেকে ব্যবচ্ছেদের ছুরিকা ঝনৎকার করে কক্ষতলে পড়ে লুটাতে লাগল। সুরেশ-প্রসাদ পিছু হটিতেই দিল্লীর ওমরাহের পরিবর্ত্তে তৎস্থলাভিষিক্ত এক অর্দ্ধবয়সী বাঙ্গালী ভদ্রলোককে দেখতে পেল। তার সে সময়কার সেই মস্তিষ্কের বিভ্রান্ত অবস্থাতেও আকৃতির বহু পরিবর্ত্তন সত্বেও মহান্ত বিস্ফোরণের মুখে দণ্ডায়মান তার আবাল্য বন্ধু ও সতীর্থকে সে চিন্‌তে পারলে।

"হাঁ এইবার এই কণ্ঠে আর কামনালোলুপ চুম্বন অঙ্কন করবার সাধ হবে না।"

সুরেশপ্রসাদকে রমেশ সিঁড়ি বয়ে রাস্তা পর্য্যন্ত অনুগমন করে সসম্ভ্রমে বিদায় দিয়েছিল। তাঁর অস্ত্রোপচারের কৃতিত্বে ধন্যবাদ এবং নিপুণ অস্ত্রপ্রয়োগের জন্য পারিশ্রমিক বিশুণ 'ফি' ছাড়া অতিরিক্ত কি নেবার জন্যও সে বিস্তর সাধ্যসাধনা করেছিল।"

গল্পটী শেষ হওয়ার পর অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত কেউ কোন কথা বল্‌লে না। মানবজীবনে সাধারণের মধ্যেও যে কত দুর্ব্বোধ্য ট্র্যাজেডী লুকান থাকে এ নিয়ে তরুণ গল্প লেখক প্রেমাঞ্জনবাবু একটা আলোচনার সূত্রপাত করবার উপক্রম করতেই তাকে নিরস্ত করে দিয়ে অবিন্ পুনশ্চ দিয়ে আরম্ভ করলে। "উপসংহারে আমার নিবেদন এই যে কেউ হয়ত ওষ্ঠ রঞ্জন প্রণালী অথবা এই অভিনব অস্ত্রপ্রয়োগে সন্দিহান হয়ে আমায় নানা প্রশ্নে বিব্রত করতে পারেন এ আশঙ্কা আমার আছে। সোজাসুজি তাদের জানাচ্ছি সুরেশপ্রসাদ বা রমেশ বলে কাউকে আমি কেন, আমার ঊর্দ্ধতন চতুর্দ্দশ পুরুষেও চেনে না। তার একমাত্র কারণ ভূত ভবিষ্যৎ বা বর্ত্তমান কোন কালেই তেমন কেউ ছিল না।"

এরপর ক্লাবে বহুদিন পর্য্যন্ত বস্তুতান্ত্রিক গল্প লেখক প্রেমাঞ্জনবাবু এবং কবিতা বায়ুগ্রস্ত অলকবাবু অবিনের সহিত বাক্যবিনিময় করেন নাই।

অঙ্কুশ

অনেকদিন পূর্ব্বে আচার্য্য বঙ্কিমচন্দ্র বুঝতে পেরেছিলেন যে, সাহিত্যটা মদমত্ত মাতঙ্গের মত, নিরঙ্কুশ অবস্থায় তার গতি অতি বিপদজনক, সে বিপদ সাহিত্যের যতটা দেশের লোকেরও ততটাই। সেইজন্যেই তিনি সাবেক "বঙ্গদর্শনে" নিজের হাতে অঙ্কুশ ধরতে বাধ্য হয়েছিলেন। সে অঙ্কুশ ধারণের ফল বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে অক্ষয় অক্ষরে লেখা আছে। আচার্য্য বঙ্কিমচন্দ্র স্বর্গগত হলেও বাঙ্গালা সাহিত্যটা একেবারে নিরঙ্কুশ ছিল না। যতদিন "সাহিত্য" ছিল ততদিন তার "ছাইত্ব" প্রতিপাদনের হাজার চেষ্টা হলেও "সাহিত্য"-সম্পাদক ব্যক্তিগত বিদ্বেষ ভুলতে না পারলেও অঙ্কুশ ছিসেবে বাঙ্গলা সাহিত্যের অনেক উপকার করে গেছেন। সুরেশচন্দ্র স্বর্গগত হবার পরে সে অঙ্কুশটা একেবারেই হারিয়ে গেছে আর তার সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্য মদমত্ত মাতঙ্গের মত সর্ব্বনাশের নৃত্য আরম্ভ করেছে। সে মদস্রাবের পক্ষে যাঁরা মুখ তাঁরা অবশ্য সেই মাতঙ্গের মতই ক্ষেপে উঠবেন কিন্তু একথাটা তাঁদের অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে, এই কয় বছরের মধ্যেই সাহিত্যের আলোচনা বা সমালোচনা একেবারেই বন্ধ হয়ে গিয়েছে।

সমালোচনা যে আবশ্যক, সেটা যে সাহিত্যপুষ্টির একটা প্রধান অঙ্গ সে কথা বোধ হয় কেউ অস্বীকার করতে পারবেন না। সমালোচনা সম্বন্ধে যে যাঁরা গৎগুলি আছে সেগুলি আউড়ে মদমত্তের দল হয় তো বলবেন যে, সমালোচক বিচারকের মত নিরপেক্ষ বিদ্বেষবুদ্ধিবিহীন ও অপক্ষপাতী হওয়া প্রয়োজন। কথাগুলো শাস্ত্রের সূত্রের মত খুব ঠিক হলেও কখনো কার্য্যে পরিণত হয়েছে কিনা সন্দেহ। অপক্ষপাত আর বিদ্বেষবুদ্ধি বর্জ্জিত সমালোচক কোন দেশে কখনো হয়েছিল কিনা সন্দেহ,

তবে এ দুটো দোষে মাত্রাভেদ মাত্র আছে। অথচ এ দুটো দোষের দোহাই দিয়ে বাঙলাদেশের বড় বড় মাসিক পত্রের সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারীরা প্রবন্ধ সমালোচনা তুলে দিয়ে নিজেদের কাজের ভারটা হাল্কা করে ফেলেছেন। সুরেশচন্দ্র সমাজপতির মৃত্যুর পরে চিন্তাশীল সমালোচনা বন্ধ হয়ে গিয়েছে অথচ সমাজপতি মহাশয় যতদিন বেঁচে ছিলেন ততদিন মাসিক সাহিত্য সমালোচনা "সাহিত্য" পত্রের একটা পরম উপভোগ্য বস্তু ছিল। সমালোচনা উঠে গিয়ে বাঙলা মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্রের লেখকেরা একেবারেই নিরঙ্কুশ হয়ে উঠেছেন। সমাজ বন্ধন, শ্লীলতা ও সাহিত্যের পবিত্রতার খাতিরে একটা অঙ্কুশের নিতান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়েছে, সে অঙ্কুশটা দৃঢ়হস্তে ধারণ করতে হবে, তা নইলে উচ্ছৃঙ্খল সাহিত্যিকের দল ভ্রুকুটি করে সেটা সমালোচকের হস্তচ্যুত করে দেবেন।

মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্রের প্রবন্ধ সমালোচনার মত গ্রন্থসমালোচনাও এখন বাঙলা সাহিত্যে উপহাসাস্পদ হয়ে উঠেছে। প্রকৃত গ্রন্থসমালোচনা তো হয়ই না। গ্রন্থকার নিজে না হয় তাঁর কোন বন্ধুকে দিয়ে বা লিখিয়ে নেন দৈনিক সাপ্তাহিক ও মাসিক, ইংরেজী বা বাঙলা, পত্রের সম্পাদকেরা তা উদরস্থ করে অকীর্ণ অবস্থায় উদ্গীরণ করে থাকেন। অথবা সেই লেখকের পক্ষের দল কোন পত্র হস্তগত করে বইখানার গুণটুকু বাদ দিয়ে কেবল দোষের ফিরিস্তি ছেপে দিয়ে থাকেন। "প্রবাসী"র মত কোন পত্রের সম্পাদক বলতে পারেন যে তাঁরা লোক দিয়ে পড়িয়ে তবে বইয়ের সমালোচনা করিয়ে থাকেন কিন্তু "প্রবাসী" বা "মডার্ণ রিভিউ" সম্বন্ধে অনেক কথা শুনতে পাওয়া যায়, তার কতকগুলি সত্য বলে জানি। শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় খুব নির্ভীক লোক কিন্তু তা হলেও তিনিও অনুরোধ উপরোধ এড়াতে পারেন না, কোন বইয়ের কঠোর সমালোচনা হলে গ্রন্থকারের ক্রন্দনে অভিভূত হয়ে রামানন্দবাবুও তা দ্বিতীয়বার সমালোচনা করতে দিয়েছেন। অনেক সময় বাঙলা বইয়ের সমালোচনা যে সমস্ত লোক দিয়ে করানো হয় তারা সমালোচনা করতেই শেখেন নি এবং রবীন্দ্রির ধারায় এতটা অভিভূত যে, যাঁরা রবীন্দ্রনাথের বর্ত্তমানের ভাষায় লিখতে পারেন না কিংবা চান না, যাঁরা "নষ্টনীড়", "নৌকাডুবি", অথবা "ঘরে বাইরের" ঘোর বিরোধী তাঁদের প্রতি অবিচারই করা হয়ে থাকে, কখনো সুবিচার হয় না। "প্রবাসী" বা মডার্ণরিভিউতে যা হয় তা আবার অন্য কাগজে হয় না। "ভারতবর্ষের" মত শক্তিশালী মাসিক পত্রে বাঙলা বইয়ের যে রকম সমালোচনা হয় তা পড়তেও লজ্জা হয়, সমালোচনা পড়লে স্পষ্ট বুঝতে পারা যায় যে, সমালোচক বইখানা পড়বার অবকাশ পান নি। পরের মুখে শুনে দুকথা লিখে দিয়েছেন। আশ্বিন মাসের "ভারতবর্ষে" শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের "দিল্লীশ্বরী" বই সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় যা লিখেছেন "ভারতবর্ষের" রায়বাহাদুর সম্পাদকের তা ছাপা উচিত হয় নি। "দিল্লীশ্বরী" বইখানি হয়তো ভালই কিন্তু সমালোচনা দেখে স্পষ্ট বুঝতে পারা যায় যে, সম্পাদক নিজে বা সমালোচক—কেউ বইখানা পড়েন নি। "ভারতবর্ষের" সমালোচনা নূতন ধরণের গ্রন্থসমালোচনা, তা কেবল ধোপরী ছাপাখানার সমালোচনা, গ্রন্থের নয়।

অন্যান্য মাসিক পত্রেও সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রের সমালোচনা হয়ে থাকে, কি রকম সমালোচনা হয় তার উল্লেখ না করাই ভাল। মোটের উপর বুঝতে পারা যাচ্ছে যে, এখনকার বাঙলা সাহিত্যে প্রকৃত সাহিত্যের সৃষ্টি বা প্রবন্ধের সঙ্গে সঙ্গে সমালোচনারও আবশ্যক। সে সমালোচনা যে কতদূর সুখরোচক হতে পারে তার প্রমাণ স্বর্গগত "সাহিত্যের" মাসিক সমালোচনা আর সেই উপাদেয় পদার্থ অর্ব্বাচীনের হাতে পড়লে যে কি ছাকার রূপান্তর আকার ধারণ করে তার নিদর্শন "অমৃতবাজার আর "বেঙ্গলীর" গ্রন্থ সমালোচনা। 'বজ্রাঙ্কুশ'

প্রতীক্ষা

[শ্রীখুরসিদ জাঁহা বেগম]

এস, ওগো জীবন মরণের দেবতা আমার এস, আজ এই গভীর নিস্তব্ধ নিশীথে প্রাণ আমার আকুল হয়ে তোমায় ডাকছে। ওগো তুমি না এত প্রেমময়, এত স্নেহময়, তবে কেন এত নিষ্ঠুর নির্মম হ'লে? না না আমারই ভুল আমিই বুঝি ডাকবার মত তোমায় কখনো ডাকতে পারি নি, তাই আমার সর্ব্বস্ব তুমি এস নি, আজ আকুল হ'য়ে প্রাণ দিয়ে ডাকছি আমার প্রেমময় দেবতা এস, এই তৃষিত পিপাসিত বুভুক্ষু হৃদয়ে ফিরে এস। এই চূর্ণ বিচূর্ণ ভাঙা অন্তরে ফিরে এস।

ভুলে গেছ নাথ সেই দিনটী? যেদিন আজকারই মত বসন্ত হিল্লোলে পৃথিবী হাসছিল। ফুলে ফুলে ধরণী ফুলরাণী সেজেছিল, চারিদিকে মধুর সানাইয়ের মিঠে রাগিনীর আলাপ, ওপরে সুনীল আকাশে দশমীর চন্দ্র তার উজ্জ্বল স্নিগ্ধ কিরণ রশ্মি বিকীর্ণ করে সহচরী তারার দল নিয়ে আমাদের মিলনকে আনন্দে অভিনন্দিত করছিল। সেই সময়ে আমি ওগো, আজকের এই পরিত্যক্তা নিশীড়িতা লাঞ্ছিতা ঘৃণিতা অভাগিনী ক্ষুদ্র হৃদয় খানিতে অগাধ প্রেমের পসরা নিয়ে নয়নে শত সোহাগের সহস্র সরমের চকিত চুলু চুলু মোহমদিরা মিশ্রিত চাহনি নিয়ে মিসি রঞ্জিত পাতলা দু'খানি অধরে একটু মিষ্টি হাসির ক্ষীণ রেখা নিয়ে দুরু দুরু বক্ষে কম্পিত পদে ফুলে ফুলময় দীপালোকে উদ্ভাসিত ফুলশয্যার ঘরটীতে সঙ্গিনী পরিবেষ্টিত হ'য়ে তোমার হৃদয় আসনে চির অধিষ্ঠিতা হবার আশে দাঁড়িয়েছিলাম। তুমি ওগো—তুমিই অফুরন্ত প্রেম সোহাগ ভরা বুকে আনন্দের হাসির নির্ঝর মুখে নিয়ে স্নিগ্ধ পরাণে আমার হাতটি ধরে বিছানায় বসিয়ে সঙ্গিনীদের দিকে চেয়ে সপ্রতিভ মুখে বলেছিলে "এখন আমার জিনিস আমি বুঝে পেলুম তোমাদের ছুটী।' ভুলে গেছ বঁধু সেই দিনটা? সেদিন কত আনন্দ, কত আবেগ ভবিষ্যতের কত সুখের কল্পনা দু'জনের বুকে ছিল —আর আজ? নিষ্ঠুর একবার ভেবে দেখ সেই মধুর সুখময় ক্ষণটা? বিছানার পাশের জানালাটী খোলা ছিল, শুভ্র সুন্দর স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নায় ঘরটী আলোকিত হয়েছিল। শুভ্র দুগ্ধ ফেননীভ শয্যায় শুয়ে শুয়ে সানাইয়ের অপরূপ বেলা, দু'ই সোহাগের মাঝখানে চাঁদের কিরণ রশ্মির মাঝে তোমার চাঁদে আমায় আরও সুন্দর আরও মোহনীয় ক'রে তুলেছিল। তুমি কত সোহাগে আমার জ্যোৎস্না প্লাবিত চিবুকটী তুলে ধরে নির্নিমেষ নয়নে চেয়ে চেয়ে বলেছিলে "বিজলী তোমার নামটী যদি জ্যোৎস্না হ'ত— আহা তুমি যে জ্যোৎস্নারই মত সুন্দর কত ভাগ্যবান আমি তাই এই বুক বুকে ধরবার অধিকার পেয়েছি।' হায় কে জানত তখন যে তা ক্ষণিকের? চিরজীবন আমাকে শুধু তার স্মৃতিটুকুই সম্বল করে থাকতে হবে।

দুই

তারপর? তারপর দীর্ঘ পূর্ণ দুইটী বৎসর তোমার ওই বিশাল সুন্দর বিমল প্রেমে পরিপূর্ণ হৃদয় খানিতে একচ্ছত্রা অধিশ্বরী দেবী হ'য়ে আমার ক্ষুদ্র হৃদয়ে মনে প্রাণে বাহিরে তোমার রমণীয় মূর্ত্তিটীকে দেবতার আসনে বসিয়ে প্রেমের অঞ্জলি দিয়ে পূজা করেছি।

সে কি সুখের দিন গেছে, ভাবতেও প্রাণে আনন্দের তুফান বয়ে যায়, সমস্ত অঙ্গে প্রত্যঙ্গে পুলক শিহরণ ওঠে। প্রাণ আমার দেবতা গো, তারপর আজও মনে পড়ে, সেই সর্ব্বনেশে দিনটা? যেদিন জীবন মরণের সমস্ত সুখের যবনিকা পতনের পূর্ব্বাভিনয় হ'য়েছিল। তুমি সোহাগে আমায় বুকে জড়িয়ে ধরে কতই আদরে বলেছিলে "বিনু আমার মণি, আমাকে ছুটি বছরের ছুটী দাও, আমি রেঙ্গুণে যাব একটা চাকরী পেয়েছি" আমি ছল ছল চোখে তোমার মুখের দিকে চাইতেই তুমি চোখের জলে আমার চোখ দুটী চেপে ধরে বল্লে "লক্ষ্মীটি, তুমি অমন চোখের জলে আমায় বারণ কোরো না, তোমার ওই চোখের নীরব আদেশ এড়িয়ে তো আমি যেতে পারবো না। তুমি ওই দু'টী প্রেমভরা চোখ দিয়েই আমায় যাদুমন্ত্রে আবদ্ধ করেছ, শক্তি নেই বাইরে যাবার! প্রাণ আমার হাসিমুখে বিদায় দাও, মাঝে মাঝে দেশে এসে তোমায় দেখে যাব, কতদিন না-দেখে থাকতে পারব বিদেশে? তারপর একটু সুবিধা হলেই তোমায় নিয়ে যাব।

নাথ তোমরা পুরুষ, তোমরা আদরের আবরণ দিয়ে যে আদেশ কর, সেটী পালন না ক'রে কি আমরা চির-পরাধীনা চির চরণাশ্রিতারা পারি ? কাজেই বুক শতধা বিদীর্ণ হলেও হৃদয় বিচ্ছেদাশঙ্কায় চূর্ণ হ'য়ে গেলেও মুখে আর বারণ করবার যোটী ছিল না। সেই দিনই আমার জীবনের আনন্দ স্রোতে ভাঁটা পড়ল।

তারপর ? তার পরও দু'মাস ওগো নিষ্ঠুর ক্রূর দেবতা, আমি তোমার প্রেমের রাণী একচ্ছত্রা রাণী ছিলুম, প্রতি মাসে তোমার সহস্র সোহাগে ভরপুর, ভবিষ্যতের মিলনের শত কল্পনার চিত্রে চিত্রিত এক-খানি করে লিপি পেয়েছি ওগো কোথায় আজ আমার সেই সুখের সেই মধুমাখা দিনগুলি ?

বুকের সমস্ত অনুভূতা দিয়ে রমনীর প্রতি বিন্দু উষ্ণ রক্ত দিয়েও কি সেই সুখময় দিনগুলি কেরাণ যায় না ? হায়, নাথ যদি তুমি একটীবার ইচ্ছে কর। দু'বছরের ছুটী চেয়েছিলে তারপর আজ পাঁচ বৎসর অধি আমার জীর্ণ দীর্ণ ভাঙ্গা প্রাণটী নিয়ে অপেক্ষায় বসে আছি, আবার নাথ আসবে, আবার তেম্‌নি প্রাণ ভুলান সোহাগের হাসি হেসে আমায় ভুলাবে, আদরে বুকে তুলে নিয়ে বলবে, "প্রিয়তমে, দু'বছর বড্ড দীর্ঘ হ'য়ে গেল নয় ?" আমি সব যাতনা সব বেদনা ভুলে গিয়ে তোমার রাঙ্গা চরণে লুটাব, বুক চিরে দেখাব, তোমার বিরহে তোমার অপেক্ষায় এই বুকে কত ব্যথা পেয়েছি। হায়, সবই ভুল, আমি যে ভুলে যাচ্ছি, এখন তুমি অপরের, ওগো বলে দেও আমায় কেমন করে তা সম্ভব ?

কত শরতের সুখময়ী রজনীতে শিউলি ফুলের প্রাণ মাতানো সুমিষ্ট গন্ধে মোহিত হ'য়ে, কত শীতের কুয়াশা-বৃত শীতল জ্যোৎস্নায় রজনী গন্ধার তীব্র অথচ মিষ্টি গন্ধে পুলকিত হ'য়ে তাদের শুভ্র সুন্দর আকার দেখে আমার সঙ্গে তুলনা করে বলেছ "মণি তুমিই বেশী সুন্দর আমার চোখে বিশ্বে সমস্ত সৌন্দর্য্য একত্র হলেও তোমার মত মনোহর কিছুই লাগবে না।" হায় আজ সেই তুমিই অনায়াসে আমার স্মৃতিকেও সমুদ্রের অতলতলে বিসর্জ্জন দিয়ে সুদূর বিদেশে সুখে দিন কাটাচ্ছ কি করে !

তিন

ওগো একবারও কি তোমার স্বদেশ মনে পড়ে না ? মাতা পিতা ভাই বন্ধুকে মনে হয় না ? আমরাই যে তোমার জীবনের সর্ব্বস্ব ছিলুম, আমাদেরই অভাব মোচন করতে, আমাদেরই সুখের আশায় যে তুমি বিদেশে গিয়েছিলে। প্রিয়তম, কই তোমার সে প্রতিজ্ঞা ? আমি তোমার প্রেমের রাণী, প্রেমময় উপার্জ্জনক্ষম স্বামীর সৌভাগ্য শ্রীতে মণ্ডিতা হয়ে তোমার গরবে গরবিণী হব বৃদ্ধ পূজনীয় পিতামাতা উপযুক্ত পুত্রের সেবায় ধন্যে দিন কাটাবেন, না আজ সবই আমাদের চক্ষে স্বপ্ন মাত্র। সুখের স্বপ্নের স্মৃতিতেও প্রাণ নেচে ওঠে। কোন মায়াবিনীর মায়াজালে আবদ্ধ হ'য়ে সব ভুললে নাথ ? না জানি সে কত সুন্দরী, কত প্রেমময়ী, তাই এত সৌভাগ্যবতী।

উঃ প্রাণ ছিন্ন হ'য়ে গেল, বুক ভেঙ্গে গেল, আর সহ্য হয় না, প্রাণের তার যেন ধীরে ধীরে শিথিল হ'য়ে যাচ্ছে, জীবনী শক্তি যেন ক্রমে ক্ষীণ হয়ে আসছে তবুও তবুও প্রাণ আমার, আমি প্রতীক্ষা করব, আমার কামনায়, সাধনায়, প্রিয় ধন তুমি, তোমাকে না দেখলে আর একটী-বার না দেখলে প্রাণ আমার যাবে না। তাই ব্যাকুল হ'য়ে তাকছি বাহিত আমার এস।

যখন ঘোর বরিষার দিনে মেঘ মুহুর্মুহু ডাকে, বিদ্যুৎ ক্ষণে ক্ষণে চম্‌কে সমস্ত শরীর মনকে কাঁপিয়ে তুলে—প্রাণাধিক, সে সময়ে হৃদয় সম্ভ্রস্ত হ'য়ে তার একমাত্র আশ্রয়স্থল তোমার ওই বিশাল সুঠাম বাহুযুগে আশ্রয় লাভের জন্যে কেঁদে আকুল হয়।

এসো, ওগো এস, অত নিষ্ঠুর হ'য়ো না। আমার এ ব্যথিত নিবেদন শুনবে না ? তুমি এতই নিষ্ঠুর ? তোমার প্রাণ কি পাষাণে নির্ম্মিত ? আচ্ছা শুনো না, কিন্তু মিনতি রাখ যদি সেই দিনটীতে এস, যেদিন পৃথিবীর সকল দুঃখের জ্বালার অবসান হবে, সেই দিনে তোমার পবিত্র চরণ স্পর্শে আমার শুষ্ক মরুময় অন্তরে মিলনের রাগিনী বাজিয়ে তোমার পবিত্র পদরেণু মাখার দিয়ে অনন্ত পথের যাত্রী করে বিদায় কোরো। এ জীবনে যদি নাই পাই আর, পরকালে ও চরণ সেবা করবার সৌভাগ্য হ'তে যেন বঞ্চিতা না হই। সর্ব্বদুঃখহারী ভগবানের চরণে এই দুঃখিনী পরিত্যক্তা অভাগীর কামনা।

ব্যতিক্রম

(উপন্যাস)

[শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্-এ]

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

পরেশবাবু হিসাব দিতেছিল,—

বাবাজীর জন্য রাবড়ী	৸০
স্বামীজির গাড়ীভাড়া	৫৲
বড় তামাক	১৲

ভবসুন্দরী জিজ্ঞাসা করিলেন—"বড় তামাকটা কি পরেশ?" পরেশবাবু বলিলেন—"শুনলে কাজ নেই মা। সন্ন্যাসী ঠাকুরদের সেবায় হরেক রকম জিনিষ লাগে।" ভবসুন্দরী তখন বলিলেন—"তবে আর ও ফর্দ্দ পড়ে কাজ নেই; তুমি মোট কত খরচ হয়েছে বল?" "এই স্বামীজির বাবদ ১০৭৷৵১০ আর আমার নিজের রেলভাড়া ইত্যাদি ৮৷৵৫।" ভবসুন্দরীর মনে হইল যে স্বামীজির জন্য সাত দিনে ১০৭৲ টাকা খরচ হওয়া নিতান্ত অন্যায়, কিন্তু তিনি তখনই ভাবিলেন যে সাধু সন্ন্যাসীর সেবার খরচের কথা কহিলে মহত পাপ হইবে, তাহার উপর তীর্থস্থানে যখন আসিয়াছেন, তখন এ রকম খরচ হইবেই। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া তিনি বলিলেন—"তা বাবা যা হয়েছে তা হয়েছে তুমি এখন এই পত্রখানা পড়ে দেখ বেই মশায় কি লিখেছেন। আমি তো কিছু বুঝতে পারলুম না। বড় খুকী বলে ছোট খুকীর বর নাকি এইখানেই আছেন। এই নতুন জামাইটী, যেন কেমন ধারা। বেইটী বেশ, কোন কথা নেই, কিন্তু জামাইটী বাপু বেয়াড়া। তুমি একবার খোঁজ করে দেখ দেখি।" খোঁজ-খবরের কথা শুনিয়া পরেশচন্দ্রের শুষ্ক হৃদয় মাতিয়া উঠিল, কারণ খোঁজ মানেই গাড়ীভাড়া ইত্যাদি নানাবিধ সংগ্রামি খরচা। পরেশচন্দ্র তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিলেন, এখনই খুঁজে নিয়ে আসছি মা; আপনার জামাই এই কাশীতে অত ব্যবসায় থাকবেন এটা একটা কথা? তবে একটু দৌড়ঝাঁপ করতে হবে, কি জানেন গিন্নীমা! আপনার রাজসংসারে যেয়ে পরীবটা যেন হয়েছে হাতীর মত। এক্কাওয়ালা বেটারা নিতে চায় না।" ভবসুন্দরী হাসিয়া বলিলেন—"না বাবা তুমি গাড়ীতে চড়ে যেও; ভারী মানুষ কোন্‌দিন এক্কা থেকে পড়ে যাবে।" পরেশচন্দ্র প্রণাম করিয়া উঠিলেন। ভবসুন্দরী বলিলেন—'বাবাজীদের এখানে পৌঁছে দিয়ে তবে যেও।" পরেশবাবু উত্তর দিলেন—"সেই চেষ্টাতেই যাচ্ছি মা।"

তখন বাসার দুয়ারে বসিয়া বিনয় কি ভাবিতেছিল আর নির্জ্জন একটা পেনসিল ও কাগজ লইয়া তাহার প্রিয় শিষ্যের ছবি আঁকিতেছিল। পরেশচন্দ্রের মূর্ত্তিখানি বাসার দুয়ারের আলো বন্ধ করিয়া দেওয়ায় বিনয় চমকিয়া উঠিল; এবং মুখ তুলিয়াই দেখিল পরেশচন্দ্রই দাঁড়াইয়া আছে। সে উঠিয়া দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কি পরেশবাবু? গিন্নীমা খুসী হয়েছেন তো?' পরেশবাবু হাসিমুখেই বলিলেন—"আর খুসী বাবা, বড়লোকের খেয়ালেই গরীবের জান যায়। ছোট জামাই তারা কাশীতে আবির্ভাব হয়েছেন, এখন পরেশ তাকে খুঁজে বার করুক।" হঠাৎ বিনয়ের যেন ধম বন্ধ হইয়া আসিল, সে কথা কহিতে পারিল না। পরেশচন্দ্র সে দিকে লক্ষ্য না করিয়াই বলিয়া যাইতে লাগিলেন—"সে জামাইটা এমনি একবগ্‌গা যে বিয়ের পরে একদিনও আসে নাই, এখন তাকে চিনি কি করে? চলুন ছোট বাবাজী স্বামীজির আশ্রয় ভিন্ন গতি নাই।" বিনয় সরিয়া দাঁড়াইল কিন্তু সেই সঙ্ক গলির মধ্যে পরেশবাবুর বপুর সহিত আর একজনের দেহের স্থান হইবে না দেখিয়া সরিয়া গেল। স্বামীজির পদধূলি গ্রহণ করিয়া এবং তাহা যথারীতি মস্তকে, কপালে ও জিহ্বায় স্পর্শ করিয়া পরেশবাবু বলিলেন—"কি শুভক্ষণে শ্রীচরণ দর্শন পেয়েছিলুম বাবা?

ঐ শ্রীচরণের জোরে পরেশের হাতে ধুলো মুঠো সোনা মুঠো হচ্ছে, এখন আর একটা বিপথে পড়েছি বাবা; গিন্নীমার ছোট জামাইটী নাকি কাশীতে এসেছে আর পরেশের উপর হুকুম পড়েছে তাকে খুঁজে বার করা। এখন বাবা ভিন্ন পরেশের উপায় নাই।" কথাটা শুনিয়া নির্ম্মলের শরীরের মধ্য দিয়া যেন বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল। সে হাসিমুখে পরেশবাবুর পিঠ চাপড়াইয়া বলিল—"কুচ্ পরওয়া নেই বাবা সব ঠিক হয়ে যাবে।" আশ্চর্য্য হইয়া স্বামীজির পদপ্রান্তে বসিয়া পড়িয়া পরেশচন্দ্র তাহার মুখের দিকে ক্যাল ক্যাল করিয়া চাহিয়া রহিল; মিনিট পাঁচেক পরে সে বলিল—"বলেন কি বাবা?" স্বামীজি বলিলেন—"আমি কি মিথ্যা কথা বোলছি?" পরেশচন্দ্র মাথা নাড়িয়া জিব কাটিয়া নাক কাণ মলিয়া বলিল—"রাধে কৃষ্ণ রাধে কৃষ্ণ রাম রাম আমি কি এমন কথা বলতে পারি বাবা? তবে কি না"—চোখ রাঙাইয়া নির্ম্মল বলিল—'তবে কি না কি? ছোট জামাই আসবোৎ নিকলে যাবে।" সর্ষপ তৈল নিষিক্ত বিশাল মস্তকটী নির্ম্মলের পায়ের উপরে রাখিয়া ভক্তি গদগদ কণ্ঠে পরেশ-চন্দ্র বলিয়া উঠিলেন—'বাবা তবে একবার দয়া কর বাবা—ঐ শ্রীমুখের বচন একবার গিন্নীমা বেটীকে শুনিয়ে দাও বাবা!" নির্ম্মল হাসিমুখে বলিল—"দেখো যাই কি।' তখন পরেশবাবু নির্ম্মলের পা জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন—'তবে আর দেরী করো না বাবা, বেশী দেরী করলে খবরটা ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। জোহাই বাবা, চল বাবা।' ভক্ত পরেশচন্দ্র একরকম টানিতে টানিতে স্বামীজিকে ওরফে নির্ম্মলকে নতুন বাসায় লইয়া গেল।

নির্ম্মল পিছন ফিরিয়া দেখিল বিনয় আসে নাই। তখন সে কোন গতিকে পরেশবাবুকে নিরস্ত করিয়া পূর্ব্বের বাসায় ফিরিয়া আসিল এবং দেখিল যে বিনয় বাসায়ই আছে পালায় নাই, দেখিয়া তাহার মন অনেকটা আশ্বস্ত হইল। নির্ম্মল যখন জিজ্ঞাসা করিল তখন বিনয় বলিল—"যাচ্ছি এত ব্যস্ত কেন?" নির্ম্মল বলিল—"স্বামীজির কি একা যাওয়া ভাল দেখায়।" "দেখ্ নির্ম্মল তুই যে একেবারে অতি গম্ভীরভাবে বলে দিলি যে গিন্নীর ছোট জামাইকে খুঁজে বার করবি এর অর্থ কি?" "অর্থ আর কি? বিশেষ কিছুই নয়, দুচার দিন থেকে তারপর সরে পড়লেই হবে।" "ঠিক বলছিস্?" "যে দিব্বি করতে বলবি তাই কোরবো, তুই এখন চল তা নইলে আসর ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।"

বিনয়ের কাঁধে তাহাদের জিনিষপত্রগুলা চাপাইয়া নির্ম্মল হাসিমুখে যখন ফিরিয়া আসিল তখন পরেশবাবুর হাঁক ডাকে গিন্নীমা বাসার দুয়ারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। তিনি নির্ম্মলকে দেখিয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন—"বাবা, আমার ছোট জামাই নাকি পাওয়া গেছে?" নির্ম্মল বলিল—'পাওয়া যায়নি বটে তবে শীঘ্রই পাওয়া যাবে। জামাই যখন এত কাছের গোড়ায় এসেছে মা তখন সে আর কোথায় যাবে?' গিন্নীমা প্রীত হইয়া বাবাজীকে ৫৲ টাকা দিয়া প্রণাম করিলেন এবং গিন্নীমার অলক্ষিতে পরেশচন্দ্র সে টাকা কয়টী উঠাইয়া রাখিল।

স্বামীজি ও তাহার চেলাকে উপরের ঘরে বসাইয়া গিন্নীমা সাধু সেবায় মন দিলেন, তাঁহাদের পা ধোয়াইয়া যখন চুল দিয়া পা মুছাইতে গেলেন তখন বিনয় দূরে সরিয়া গেল; নির্ম্মল কিন্তু স্থির হইয়া বসিয়া রহিল। গিন্নীমা জিজ্ঞাসা করিলেন সরে গেলে কেন বাবা? এসব যে করতে হয় তা নইলে আমার সংসারে অকল্যাণ হবে। কত পুণ্যি করলে তবে তোমাদের মত লোকের পায়ের ধুলো পড়ে।" বিনয় বলিল—"আমি ও সব বরদাস্ত করতে পারি না মা। আপনি আমার মায়ের বয়সী।" অনেক অনুরোধ সত্ত্বেও বিনয় যখন পা ধোয়াইতে দিল না তখন ভবসুন্দরী বলিলেন—"তা হলে মুকীয়া পা দুইয়ে দিক?" বিনয় তাহাতেও রাজী হইল না।

পাদ্য অর্ঘ্যের পালা শেষ হইলে, ভবসুন্দরী সন্ন্যাসীদের সেবা করাইতে বসিলেন, বিনয় কিন্তু নির্ম্মলের সঙ্গে বসিল না সে দূরে দাঁড়াইয়া রহিল, মুখে বলিল—"আমি প্রসাদ পাবো।" যখন প্রসাদের সময় আসিল তখন বিনয় একটা মিষ্টার মুখে ফোয়াইয়াই উঠিয়া গেল। ভবসুন্দরী আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"ওকি যাওয়া হোল বাবা?" বিনয়ের তখন কাণে গেল "চেলা বিনয়ে কি কাল ভাই, ওর পা দুইয়ে দিতে হলে—আমি বমি করে মরদুম।" বিনয়ের কালো কাণ দুটো লাল হইয়া উঠিল, কিন্তু

বাড়ীর মধ্যে এক নির্ম্মলই তাহা দেখিতে পাইল। বাকী প্রসাদ শেষ করিয়া স্বামীজির অনুমতি লইয়া চেলাজীর সহিত ভক্ত পরেশচন্দ্র গিন্নীমার ছোট জামাতার সন্ধানে বাহির হইলেন আর নির্ম্মল হাসিমুখে ভক্তিপ্রদত্ত সিগারেট ধ্বংস করিতে লাগিলেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

গিন্নীমার ছোট জামায়ের সন্ধানে বাহির হইয়া পরেশচন্দ্র ধর্ম্মতলের রাস্তার উপরে একখানি গাড়ী ভাড়া করিল; ভাড়া হইল ১৷৷০। পরেশচন্দ্র একখানি নোট-বুক বাহির করিয়া তাহাতে লিখিল ছোট বাবাজীর গাড়ী ভাড়া বাবদ ৫৷৷৵০। বিনয় তাহা দেখিল এবং দেখিয়া ৫৷৷৵০ সহিত ১৷৷০ টাকার যে কি সম্পর্ক তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। পথে যাইতে যাইতে কুচুরি গলির মোড়ে পরে একটা পানের দোকান হইতে দুই প্যাকেট রেলগাড়ী মার্কা সিগারেট কিনিল, দাম ৵০; নোটবুকে লেখা হইল বাবাজীর জন্য সিগারেট ১৸৵১০। বিনয় দামের সম্বন্ধ নির্ণয় করিতে করিতে অন্য কথা ভাবিবার অবসর পাইল না। পুরাণো চকের সম্মুখে গাড়ী দাঁড় করাইয়া পরেশচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল "ছোট বাবাজী এইবার কোন দিকে যাবো? তিন দিকে রাস্তা আছে।" বিনয় কথা না কহিয়া ডান দিকের পথটা দেখাইয়া দিল। দুই জনে গাড়ী হইতে নামিয়া এক বিখ্যাত পানওয়ালার দোকান হইতে এক টাকার চারি খিলি পান কিনিল; আবার খাতা বাহির হইল, দামে ও হিসাবে ত্রৈরাশিক মিলিল না দেখিয়া বিনয় হোঁচট খাইয়া পড়িয়া গেল।

হাতে যে দুইটা পান বাকী ছিল তাহা তাড়াতাড়ি মুখে গুঁজিয়া পরেশচন্দ্র তাহাকে উঠাইল। পাথরে লাগিয়া বিনয়ের পা কাটিয়া গিয়াছিল, একখানা কাপড়ের দোকান হইতে একগজ ছিট কিনিয়া পরেশ বিনয়ের পা বাঁধিয়া দিল এবং বলিল—"বাবাজী! কোথায় হেঁটে যাচ্ছেন? গিন্নীমার ছোট জামাই সে বিলেত ফেরৎ সাহেব বল্লেই হয়, শুনেছি সে কলেজের ভয়ানক ইংরেজী-ওয়ালা, যে করতে এসে ফক্কাইতাড়ার মত ইংরেজী বলেছিল? সে কি আর এ গলিতে আসছে বাবা? সে হয়ত কোন সাহিবি হোটেলে উঠে ভ্যাম ওয়ার ষ্টুপিড করছে?" বিনয় হাসিয়া ফেলিল, তাহার পায়েও বিলক্ষণ লাগিয়াছিল সুতরাং সে ফিরিল। ব্যাণ্ডেজের কাপড় খরিদের বাবদে ৵০ স্থলে ১৷৷০ লেখাটা বিনয় দেখিতে পাইল না সুতরাং অক্ষত শরীরে গিয়া আবার গাড়ীতে উঠিল। রাজঘাটের রেলের পুল, শিকরোলের কলেজ ছাউনি, দুই একটা হোটেল ফিরিয়া আসিয়া পরেশ চন্দ্র ১৷ স্থলে ৪৷৷০ গাড়ীভাড়া দিয়া খাতায় লিখিল বকে ছোট বাবাজীর গাড়ীভাড়া ৭৷৷৵০।

একখানা মলিন রুমাল দিয়া কপালের ঘাম মুছিতে মুছিতে পরেশচন্দ্র যখন বাড়ীতে আসিয়া উঠিল তখন তাহাকে দেখিলে সত্য সত্যই দয়া হয়। গিন্নীমা সন্ধানের ফল জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়া বলিতে বাধ্য হইলেন—"বাবা তুমি একটু জিরিয়ে নাও তারপর কথা কয়ো।" পরেশচন্দ্র যতক্ষণ পাখার হাওয়ায় ক্লান্তি দূর করিতে-ছিলেন ততক্ষণ বিনয় নির্ম্মলকে জিজ্ঞাসা করিতেছিল, "তুই এতক্ষণ কি করলি?" নির্ম্মল বলিল—"গিন্নীমাকে তত্ত্বকথা শুনাচ্ছিলুম।" "সর্ব্বনাশ, কি শুনাতে কি শুনালি রে?" "বেশী কিছু বলিনি ভাই, কলেজের ডিবেটিং ক্লাবে সেই যে একটা বক্তৃতা দিয়েছিল তারই দুই চারটা পদ আওড়াপুম, বহুরূপ ঠাকুর সবই এক আমরা কেবল ভিন্ন ভিন্ন নামে পূজো করি'—"চুপ।" পিছন হইতে গিন্নীমা বলিয়া উঠিলেন—"কই বাবা আমার জামাই যে মিললো না?" নির্ম্মল হাসিমুখে বলিল—"মিলবে বই কি মা, আপনার জামাই আমি নিশ্চয় মিলিয়ে দেবো।" "তবে এতটু না হয় জিরা কর্ম্ম কর বাবা। পরেশ মোটা মানুষ একদিন ঘুরেই হাঁফিয়ে পড়েছে।" "ক্রিয়া কর্ম্মের দরকার হবে না, তবে আপনি বলছেন চলুন একবার আসন করে বসিগে।" গিন্নীমা পিছন ফিরিলেন আর বিনয় তাহার গুরুর পশ্চাদ্দেশে এমনি গুরু পদাঘাত করিলেন যে স্বামিজী পড়িতে পড়িতে রহিয়া গেলেন।

আসনে বসিয়া দুই পেয়ালা চা ও চারিটা সিগারেট শেষ করিয়া স্বামীজি বলিলেন—"যে জামাই তিন দিনের

মধ্যেই পাওয়া যাইবে, তখন বারান্দায় বসিয়া বিনয় ভাবিতেছিল যে নির্মলকে আর বেশী বিশ্বাস করা উচিত নয়। এই সময় তাহার শালী সারদাসুন্দরী একখানা খবরের কাগজ হাতে করিয়া আসিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল—"দেখুন তো ছোট বাবাজী এই বাঙলাটার নীচে ইংরেজীতে কি লেখা রয়েছে?" বিনয় দেখিল, "কাগজখানা বেঙ্গলী, প্রথম পাতেই একটা বড় বিজ্ঞাপন রহিয়াছে :—

বিজ্ঞাপন

বাবা নির্মল! যে দিন থেকে তুমি গিয়াছ সেই দিন থেকে তোমার মা অন্নজল পরিত্যাগ করিয়াছে। তুমি যেখানে থাকো এই বিজ্ঞাপন পড়িলেই চলিয়া আসিবে। তুমি যাহা ইচ্ছা করিও। আমি নিজের ভুল বুঝিতে পারিয়াছি।

"তোমার পিতা"

ইংরেজীতে লেখা ছিল "Any one bringing any information about my son Nirmalendu Mukherjee will be rewarded Rs. 5000. Any one restoring him to his family will get double that reward. Complexion fair height 5 ft." Scar over right eye, photographs on application. Gour Mohun Mukhurjee 203, Chitpur Rd. Calcutta.

বিজ্ঞাপন পড়িয়া বিনয়ের ভয়ানক হাসি আসিল, তাহার হাসিমুখ দেখিয়া বুদ্ধিমতী সারদা জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি হাসছেন কেন?" বিনয় বলিল—"হাসছি কপালের কথা ভেবে।" সারদা আবার জিজ্ঞাসা করিল—"কেন?" "একজনের ছেলে হারিয়েছে, তার খবর পেলে তার বাপ ৫০০০৲ টাকা পুরস্কার দেবে। আহা তার মা একেবারে অন্ন জল পরিত্যাগ করেছে, আজকালকার ছেলেগুলো কেন বাড়ী ছেড়ে পালায়।" হঠাৎ বিনয়ের মাথার মধ্যে আগুন জ্বলিয়া উঠিল, সে বলিয়া উঠিল—"ছেলেটী দেখছি সুন্দর, হয়তো তার কালো মেয়ের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল!" সারদা হাসিয়া বলিল—"ঠিক বলেছেন, দেখুন আমার সোয়ামীতো মরেই গেছে আমার ছোট বোন আমার বর এমন কালো যে তাকে দেখলেই আমার ঘেন্না হয়। মা যে কি করে অমন বাঁদরের সঙ্গে এমন সোনার পুতুলের বিয়ে দিলেন তা বুঝতে পারলুম না।...আহা অবিশ্যি মুখে কিছু বলে না, কিন্তু আমার মনে হয় বরটাকে দেখলেই সে জ্বলে যায়।" বিনয় কিছুমাত্র অপ্রতিভ না হইয়া বলিল—"ঠিক কথা, আমার মতও তাই। সাদায় কালোয় বিয়ে ভয়ানক অন্যায়। এই দেখুন আমি কালো আমার কোন মতেই সুন্দরী প্রার্থনা করা উচিত নয়।" "এই দেখুন অন্নদা যেমন সুন্দরী তাতে তার সঙ্গে যদি এই জামাইর বিয়ে হতো তা হলে কেমন সুন্দর মানাতো?"

খবরের কাগজখানা কিন্তু বিনয় আর ফিরাইয়া দিল না; এই সময় নির্মল আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কি হে?" বিনয় সবিনয়ে বলিল—"আজ্ঞে এই দিদি বলছেন যে গিন্নীমার ছোট জামাইটী ভয়ানক কালো, তিনি যে রকম সুন্দরী তাতে মহারাজের মত একটী পাত্রের সঙ্গে যদি তার বে হতো তা হলে ঠিক হরগৌরীর মত মানাতো।" নির্মল বিনয়ের পদাঘাতটা প্রত্যার্পণ করিতে গিয়া লাফাইয়া গেল, মুখে বলিল—"দেখ বাপু! ও সকল চিন্তা গৃহত্যাগীর পক্ষে মহাপাপ। বিনয় আবার সবিনয়ে বলিল—"যে আজ্ঞে!"

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

নির্মলকে নির্জ্জনে পাইয়া বিনয় যখন তাহাকে বিজ্ঞাপন দেখাইল তখন নির্মলের ফূর্ত্তি উবিয়া গেল, সে বলিয়া বসিল, "আমি যাবো না ভাই?" বিনয় বলিল 'যাবি কি? এখানে গিন্নীমার ছোট জামাইকে খোঁজবার জন্য যে রকম লাফাঝিস্ তাতে তোকে আজকেই পার করতে হবে। আমি টেলিগ্রাম লিখে রেখে এসেছি কেবল বড় বেশী বিশ্বাসঘাতকতা হবে বলে এতক্ষণ পাঠাইনি।" নির্মল একেবারে নরম হইয়া বলিল—"ভাই আমি আর বাড়ী যাবো না তুই আমায় ছেড়ে দে, আমি বরং চলে যাই।" "কোথায় যাবি? মার মুখখানা একবার মনে কর নির্মল। জগতে সব কঠিন হয় কিন্তু মার মন কখনও কঠিন হয় না। নিজ এই মা

কথাটা যত মিষ্টি এত মিষ্টি জগতে আর কিছুই নয়। শুধু মার মুখখানা মনে করে ভেবে দেখ,' ফিরে যাবি কিনা? মা অন্ন জল ত্যাগ করেছেন, মার চোখের জলে বুক ভাস্‌ছে, যতদিন মা মনে ব্যথা পাবেন ততদিন তুই কি ভেবেছিস্, স্বর্গে গেলেও শান্তি পাবিনে।" নির্ম্মল বলিল—"মা—মা?" বিনয় জিজ্ঞাসা করিল—"মাকে মনে পড়েছে? মা কাঁদছেন, নিরু ফিরে আয়!" নির্ম্মল হঠাৎ কাঁদিতে কাঁদিতে বিনয়ের গলা জড়াইয়া ধরিল, সে বলিল -"ফিরে যাবো, এখনই যাবো বিনু! আমি এখনই ফিরে যাবো।" বিনয় বলিল—"এখন তো গাড়ী নেই নির্ম্মল!" "তবে কখন গাড়ী আছে?" "কাল সকালে।" হতাশ্বাস হইয়া নির্ম্মল বলিল—"তবে এত আগে থেকে আমায় এমন করে দিলি কেন বিনু? মা হয়তো মরে গেছে।' নির্ম্মল আবার কাঁদিয়া উঠিল। অনেক কষ্টে তাহাকে শান্ত করিয়া বিনয় বাহিরে চলিয়া গেল।

সদরের ঘরে বসিয়া পরেশচন্দ্র হিসাব লিখিতেছিল, বিনয় তাহাকে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল—'পরেশবাবু টাইম টেবল আছে?" পরেশবাবু বলিলেন—"হাঁ আছে বই কি বাবা।" এই বলিয়া তিনি নাকের চশমা খুলিয়া রাখিয়া টাইম টেবল খুঁজিতে প্রবৃত্ত হইলেন, সেই অবসরে বিনয় দেখিল, যে হিসাবের কাগজের উপরে লেখা—"হিসাব স্বামী নির্ম্মলানন্দের সেবা," কাগজের নীচে লেখা আছে—একুন ৩৫৭৸৫" স্বামী সেবার খরচের বহর দেখিয়া শিহরিল বটে, কিন্তু সে তখন কোন কথা জিজ্ঞাসা করিল না। পরেশবাবু কিন্তু টাইম টেবলখানা তাহার হাতে দেবার পূর্ব্বে জিজ্ঞাসা করিল টাইম টেবল কি হবে বাবা? কোথাও কি যাবেন নাকি?" বিনয় বলিল 'না, লক্ষ্ণৌ থেকে বাবার একজন ভক্ত আসবার কথা আছে।" টাইম টেবল লইয়া বিনয় চলিয়া গেল, তখন পরেশবাবু আপন মনে একটু হাসিয়া নাকে চশমা আঁটিয়া হিসাব লিখিতে বসিলেন। ভক্ত পরেশচন্দ্র হিসাবী লোক, জমিদারী সেরেস্তায় দীর্ঘকাল কর্ম্ম করিয়া তাহার অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছিল।

টাইম টেবল চাহিতেই তাহার সন্দেহ হইয়াছিল, সুতরাং তিনি ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলের টাইম টেবল না দিয়া আউধ ও রোহিলখণ্ডের টাইম টেবল দিয়াছিলেন।

নির্ম্মল যে ঘরে বসিয়াছিল সে ঘরে ঢুকিতে গিয়া বিনয় দেখিল যে নির্ম্মলের কাছে সারদা বসিয়া আছে, দূর হইতে সারদাকে দেখিয়াই বিনয় থমকিয়া দাঁড়াইয়া গেল, সে আর নিকটে না গিয়া আস্তে আস্তে পা টিপিয়া টিপিয়া ফিরিয়া আসিল। পরেশচন্দ্র ভাবিলেন যে তাহার চালটা ধরা পড়িয়া গিয়াছে সুতরাং তিনি বিনয় কিছু বলিবার পূর্ব্বেই বলিয়া উঠিলেন, "এই টাইম টেবিল আর একখানা ছিল বাবা, বুড়ো মানুষ চোখে দেখতে পাইনি, শ্রীচরণে অপরাধী করো না বাবা।" বিনয় তখন হাতের টাইম টেবলখানা দেখিয়া বুঝিল যে সে খানায় তাহার কাজ হইবে না। সে কিন্তু নূতন টাইম টেবল না লইয়া পরেশচন্দ্রের সহিত গল্প করিতে বসিয়া গেল।

বিনয় ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেই সারদা ঘরের মধ্যে ঢুকিয়াছিল, তখনও নির্ম্মলের চোখের জল মোছা হয় নাই। সারদা তাহা দেখিয়া বলিল—"স্বামীজি বুঝি সাধনা করছেন? আমি তবে বাহিরে যাই?" নির্ম্মল তাড়াতাড়ি চোখের জল মুছিয়া বলিল—"না না বসুন আমি কিছুই করিনি।" সারদা অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়া বসিল, কারণ সে দুদণ্ড বসিবার মতলব আঁটিয়াই আসিয়াছিল। ঘরের মাঝখানে নির্ম্মল একখানা মৃগচর্ম্মের উপর বসিয়াছিল, তাহা দেখিয়া সারদা অনেক দূরে মাটীতেই বসিল, নির্ম্মল যে পরমহংস সাজিয়া আছে সে কথা ভুলিয়া গিয়া তাড়াতাড়ি একখানা আসন পাতিয়া দিতে গেল, সারদা তাহা দেখিয়া একটু হাসিয়া বলিল,—"ছি ওকি করছেন? আমাদের কি আসনে বসতে আছে?" নির্ম্মল আশ্চর্য্য জিজ্ঞাসা করিল—"কেন নেই? এ যে কুশাসন?" সারদা একটু মাথায় কাপড় টানিয়া দিয়া বলিল—"আপনার দেওয়া আসনে কি আমাদের বসতে আছে?" "বসুন না, এতে কোন দোষ নেই; না বসলে আমি বড় দুঃখিত হবে।" মনে মনে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া সারদা বলিল—"আপনি বোলছেন তখন বসি। কিন্তু মা দেখলে বড় রাগ করবেন।" বলা বাহুল্য আসনখানা মৃগচর্ম্মের নিকটেই পাতা হইয়াছিল।

আসনে বসিয়া সারদা বলিল—"আজ মা আপনার কথা বলছিলেন, আপনার কথাগুলি কি সুন্দর জ্ঞানগর্ভ, তাই মাকে বোলে আপনার কাছে উপদেশ নিতে এলুম। আচ্ছা সকল দেবতাই কি এক ?" নির্ম্মল একটু বিপদে পড়িল কারণ সে অদ্বৈতবাদ সম্বন্ধে গিন্নীমাকে কি বলিয়াছিল এখন আর তাহা সে মনে করিতে পারিতেছিল না ; সুতরাং সে অন্য কথা পাড়িবার জন্য ব্যগ্র হইল। সে বলিল—"দেখুন সমস্তই মানুষের মনের ভুল এই দেখুন না আমাকে ? আমি কেন সংসার ত্যাগ করে চলে এলুম ?" সারদা একেবারে নির্ম্মলের মুখের কাছে ঝুঁকিয়া পড়িয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কেন এলেন, আপনার এই বয়সে এত কি বৈরাগ্য হলো যে সংসার ত্যাগ করলেন ? আহা আপনার স্ত্রী না জানি কি অবস্থাতেই আছেন ?" নির্ম্মল হঠাৎ বলিয়া ফেলিল, "আমার স্ত্রী নেই, বিয়ে করতে হবে বলে চলে এসেছি।" সারদা মনের আনন্দে বলিয়া ফেলিলেন "বটে কি সুন্দর।" এই সময়ে বিনয় তাহাদের ঘর হইতে দেখিয়া ফিরিয়া গেল। নির্ম্মল সহানুভূতি পাইয়া একেবারে গলিয়া গেল, সে নামগুলা গোপন করিয়া তাহার আত্মকাহিনী বলিতে আরম্ভ করিল। যখন ছবি আঁকার কথা আসিল, তখন সারদা আগ্রহ চাপিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া ফেলিল—"ছবি দুখানা কি সঙ্গে এনেছেন ?" নির্ম্মল উঠিয়া তাহার চামড়ার ব্যাগ হইতে ছবি দুইখানা বাহির করিয়া সারদার হাতে দিল। ছবি দুখানা নির্ম্মল যেভাবে আঁকিয়াছিল তাহাতেই মোহিনীর রূপ সুন্দর ফলিয়াছিল। সে রূপ দেখিয়া কিন্তু রূপসী সারদা জ্বলিয়া গেল, সে ভাবিল, এতই কি রূপ মোহিনীর ? রঙটা একটু লালচে, সারদার রঙের বর্ণ বুদ্বুদের ন্যায় শুভ্র, মোহিনী যেন একটু বেশী মোটা, তাহার তুলনায় তাহার নিজের অঙ্গ সৌষ্ঠব কি সুন্দর, নিকটে যদি একখানা আরসি থাকিত তাহা হইলে সে তাহার ভ্রূণ হীন অপ্রসাধিত অঙ্গের লালিত্য দেখিয়া লইত। সারদা ভাবিল পুরুষজাতি অন্ধ তাহারা কি প্রকৃত রূপের মর্য্যাদা করিতে জানে ? এই সময় ঘর হইতে ভবসুন্দরী ডাকিলেন, "সারি ? ও সারি ?"

সারদা দ্রুতপদে উঠিয়া গেলেন।

(ক্রমশঃ)

মিলন

[শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী]

প্রকৃত মিলন হয় বিপদের মধ্যে। সম্পদে সুখে প্রকৃত মিলন হইতে পারেনা কারণ পরস্পর পরস্পারের সান্নিধ্য লাভ করিতে পারে না। পরস্পরের মাঝখানে অনেকখানি দূরত্ব থাকিয়া যায় তাই কাছে আসিয়াও দূরে সরিয়া যাইতে হয়। বিপদের মধ্যে যে মিলন হয় তাহাই প্রকৃত মিলন নামে কবি প্রচার করিয়াছেন।

ভাবিয়া দেখিলেও তাহাই সত্য বলিয়া মনে হয়। প্রণয়ের গভীরতা সেই বিপদরাশির মধ্যেই অনুভূত হয়, সেখানে আমরা অনায়াসে পরস্পরকে পাইতে পারি। সেখানে সে বিপদ তখন সুখময় বলিয়াই মনে হয় এবং সেই স্মৃতি আমরণকাল মনে গাঁথা থাকে।

বিপদ আসে গভীরতা নির্দ্দেশ করিয়া দিতে, মিলন অভেদ অভেদ করিয়া দিতে।

আমার প্রিয়তম আমায় বুঝাইয়াছে সে আমায় ভালবাসে, আমিও তাহার কথায় বিশ্বাস করিয়াছি, তাহার সে ভালবাসায় ভুলিয়া রহিয়াছি। এই সময়ে একটা বিষাদের ঝড় মাথার উপর দিয়া বহিয়া গেল। এই বিপদের ঝড় যদি আমাদের মিলনকে দৃঢ় করিয়া দেয় জানিব এই সত্য, কিন্তু তাহা হয় কদাচিৎ।

অনেক সময় দেখা যায় পরস্পর পরস্পর হইতে তফাতে সরিয়া যায়, সংসার ছেলে মেয়ে প্রভৃতি মাঝখানে একটা প্রাচীর গঠন করিয়া ফেলে। স্নেহ ভালবাসাও ক্রমে সরিয়া যায়। থাকে না সে এমন কথা সাহস করিয়া বলিতে পারি না, কিন্তু সে পুঞ্জীভূত ভাবে আর থাকে না ; অনেকটা বিস্মৃতি লাভ করে।

সংসারে কত বিপদ আসে যাহা শুধু বিচ্ছিন্ন করিয়া দিবার জন্য সৃজিত হইয়াছে। সেই সব বিপদের মধ্যে যে অটুট থাকিবে জানিব সত্য তাহার প্রেম, সত্য সেই মিলন, নচেৎ সবই মিথ্যা, জীবনটাই মিথ্যা।

নাট্যামোদী

এক শ্রেণীর রুচিবাগীশ মনের অনেকেই ছাড়া সকলেই দেশীয় রঙ্গালয়ের উন্নতি কামনা করেন। রুচিবাগীশদের রুচিতে যে শ্রেণীর অভিনেত্রীদের লইয়া অভিনয় করাতে আঘাত লাগে সে শ্রেণীর অভিনেত্রী ভিন্ন অপর কোন উন্নত শ্রেণীর অভিনেত্রী এদেশে পাওয়া সম্ভব আজও হয় নাই বলিয়াই এই শ্রেণীর অভিনেত্রীদের লইয়াই অভিনয় চালাইতে হইতেছে। দেশীয় রঙ্গালয় রাখিতে হইলে ইহা ভিন্ন অন্য উপায় নাই। অভিনেত্রীরাই পুরুষদের রুচি বিকৃতি ঘটাইবার জন্য দায়ী না কোন কোন শ্রেণীর পুরুষেরাই অভিনেত্রীদের নাট্য জীবনের উচ্চ আদর্শ বিকৃত করিয়া বিলাস ব্যাভিচারের পক্ষে নিমন্ত্রিত করিবার জন্য দায়ী ইহাও অনেক স্থলেই বিচার্য্য। আজ কাল জীবন সংগ্রামের তাড়নায় আমাদের দেশীয় কাল্পনিক শ্লীলতা অশ্লীলতার বন্ধনও অনেক স্থানে শিথিল হইয়া গিয়াছে। দেশের পুরুষেরা যেমন জীবন সংগ্রামে বিব্রত হইয়া যে কোন দিক হইতে অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা করিতেছে দেশের শিক্ষিতা আত্মবোধ সম্পন্ন নারীরাও তেমনি স্বাধীনভাবে উপার্জ্জনের চেষ্টা করিতেছেন। নারী ও পুরুষের এ চেষ্টা হইতে শীঘ্রই হয়তো আমরা কলাজ্ঞান সম্পন্ন ভদ্র মহিলাদেরও দেশীয় রঙ্গমঞ্চে দেখিতে পাইব। পাশ্চাত্য অনেক অভিনেত্রী বড় বড় সম্ভ্রান্ত ঘরের গৃহিণী হইয়াছেন—আমাদের দেশেও তেমন দিন আসিতে পারে।

ভদ্রবংশের অনেক শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত লোকেরাও আজ অভিনেতা হিসাবে রঙ্গালয়ে নামিতে দ্বিধা করিতেছেন না। ইহা রঙ্গালয়ের পক্ষে শুভ লক্ষণ। কিন্তু খতাইয়া দেখিতে গেলে আমাদের দেশীয় রঙ্গালয় ইহার বর্ত্তমান অবস্থায় স্থাপিত হওয়ার সময় হইতে আজ পর্য্যন্ত উন্নতির দিকে কতটা অগ্রসর হইয়াছে? অবশ্য রঙ্গালয়গুলি যখন ধ্বংস হইয়া যায় নাই এবং এখনও যখন কোনরূপে চলিতেছে তখন সময়ের গুণে যতটুকু সাধারণ ভাবে চলা দরকার তাহা চলিতেছে স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু উন্নতির অভিমুখে তেমন বিচিত্র পরিবর্ত্তন বাংলার রঙ্গালয়ে আসে নাই। জাতীয় মনের উপর রঙ্গালয়ের প্রভাব যে যথেষ্ট তাহা স্বদেশী যুগে বাংলার রঙ্গালয়ও দেখাইয়াছিল। রঙ্গালয় দেশকে মাতাইয়া উঠাইয়াছিল। সে সব নাট্য কতক আজ আইনে আটক হইয়া আছে—দেশের রঙ্গালয়ে তাহা অভিনয় করিবার উপায় নাই। তার পরও দেশের উপর দিয়া নানা ভাবের বন্যা চলিয়া গেল—কিন্তু সে সব ভাব লইয়া নাটক একখানিও রচিত হইল না। জাতীয় মনোভাবকে এমন সজ্ঞা দেশেও রঙ্গালয়ে প্রবেশ নিষেধ রাখিবার জন্য কে দায়ী? যে নাট্যগুলি জাতীয় ভাব প্রচারের জন্য এখনও অভিনয় নিষিদ্ধ এবং পুস্তকগুলি পর্য্যন্ত প্রচার নিষিদ্ধ হইয়া আছে তাহা লইয়াও তো দেশীয়দের কোন আন্দোলন শুনিতে পাই না—ইহা কি জাতির পক্ষে অসম্মানকর নহে? পাশ্চাত্য আদর্শে আমাদের বর্ত্তমান রঙ্গালয় গঠিত হইলেও সে সব দেশে যখন যুগে যে সব ধরণের নাট্য অভিনয় হইত তেমন ধারা নাট্যই আমাদের দেশে আজও অভিনীত হইতেছে। পাশ্চাত্যে দেশ-সমস্যা সমাজ সমস্যা প্রভৃতি লইয়া নিত্য যেমন নূতন নূতন ধরণের নাট্য রচিত হইয়া দেশের উপর রঙ্গালয়ের ও নাট্য সাহিত্যের প্রভাব বিস্তার করিতেছে—আমাদের রঙ্গালয়ে যেন সে হাওয়াই আসিতেছে না।

আমরা এখনও নাটকীয় ঘাত প্রতিঘাত বলিতে বন্দুক পিস্তলের দুরুম দুরুম আওয়াজ—ছোরা ছুরা, তলোয়ার ঘুর্ণি আর খুন জখমের প্রাচুর্য্যই বুঝিয়া থাকি। মনোবৃত্তির বিচিত্র বিকাশের উপর নাটকীয় ঘাত প্রতিঘাত কতটা নির্ভর করে তাহা আমরা এখনও বুঝিতে পারি নাই। তেমন নাট্য দু'একখানা অভিনয়ার্থ দেশীয় রঙ্গালয়ে আসিলেও কেন যেন চলে নাই। দ্বিজেন্দ্রলালের দুরন্তাহানের মত নাটক তেমন চলে নাই। কেন এমন নাটক চলে নাই তাহার অনেক কারণ আছে। এমন নাট্য অভিনয়ে অভিনেতা অভিনেত্রীর যোগ্যতা যথেষ্ট থাকা চাই। সহজ হাততালী ও বাহবা যেমন আকস্মিক হত্যা ও রক্ষা করার মধ্যে পাওয়া যায়—এমন নাট্যে হাততালি পাইতে হইলে তার চেয়ে যথেষ্ট যোগ্যতা দেখানো প্রয়োজন। রবীন্দ্রনাথের নাট্য সাধারণ রঙ্গালয়ে জমে না—কেন? এই যোগ্যতার অভাবেই।

এমন ধারা নাট্যও যে জমিতে পারে তাহাও যে অভিনয়ের যোগ্য তাহা স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ দেখাইয়াছেন অনেক বার। আর একজন অভিনেতার অভিনয়েও তাহা দেখিয়াছি—তিনি শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ভাদুড়ী। গিরিশ বাবুদের যুগের কথা ছাড়িয়া দিলে বাংলাদেশে দু'টি মাত্র অভিনেতা নিজ নামে দর্শকদের আনিতে পারিতেন। একজন ৺অমরেন্দ্রনাথ দত্ত আর একজন শ্রীযুক্ত ধাণীবাবু। অভিনেত্রীদের মধ্যে শ্রীমতী তারাসুন্দরী, ৺তিনকড়ি, কুসুম কুমারী ৺সুশীলাসুন্দরীরও এই গুণ ছিল। ইহারা সকলেই প্রায় গিরীশবাবুর যুগের। ইহাদের কেহ আজ মৃত, কেহ বা রঙ্গালয় ছাড়িয়াছেন।

সকল জিনিসেই মানুষ ক্রম উন্নতি ক্রম বিকাশ দেখিতে চায়, এবং তাহাই স্বাভাবিক। বিংশ শতাব্দীর উন্নতির হাওয়া অপরাপর দেশে লাগিয়াছে—আমাদের আশা আকাঙ্খা ক্ষুদ্র দেশের নানা বিভাগে তাহা যেমন লাগে নাই রঙ্গালয়েও তেমনি লাগে নাই। রঙ্গালয়ে উনবিংশ শতাব্দীই চলিতেছিল। সেই উনবিংশ শতাব্দীর অভিনেতা অভিনেত্রী—এখনও অনেক ক্ষেত্রে তাহাই। এমন সময়ে বাংলার রঙ্গালয়ে একটা নূতন যুগ প্রবর্ত্তক অভিনেতা হিসাবে আসিয়াছিলেন—শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ভাদুড়ী। নানা ভাষার সাহিত্যে ইহার বিস্তৃত জ্ঞান অভিনয়ে অপরিসীম দক্ষতা—তার উপর আর একটা ক্ষমতা দেখিয়াছি—ইহার শিক্ষা দানের। রঙ্গালয়ে সকল বড় ছোট অভিনেতা অভিনেত্রীর উপরই ইহার শিক্ষার ছাপ উজ্জ্বল হইয়া ফুটিত। শিশির বাবুর অভিনয় কৃতিত্ব ও শিক্ষার প্রভাবে বাংলার নাট্যমোদী সকলেই আশা করিয়াছিলেন আবার বাংলাদেশের নাট্যকলা ও নাট্য সাহিত্য নূতনরূপে জাগিতে পারে। শিশির বাবুর সঙ্গে আরও যে সমস্ত শিক্ষিত ও যোগ্য কলাকুশলীগণ নামিয়াছেন তাঁহারা ভাল অভিনেতা কোন কোন অংশে হইতে পারেন—কিন্তু রঙ্গালয়ে একটা নব যুগ প্রবর্ত্তনের ক্ষমতা কাহারও মধ্যে দেখি নাই—স্বারান্তরে এ সম্বন্ধে আরও আলোচনার ইচ্ছা রহিল।

কবি ও প্রকৃতি

[শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী]

প্রকৃতির পাশে চাহি কবি
কহে, "যেন দেখেছি এ ছবি,
এর আগে একবার হায়!
মনে নাই কি জানি কোথায়:"

প্রকৃতি কহিল হাসি তারে,
"এ রমণী ব'লে দিতে পারে,
হেরিয়াছ এই ছবি হায়!
তোমারি ও রূপ—কল্পনায়।"

Printed by Bijoy Krishna Dass at the Lakshmibilas Press,
14, Jagannath Dutta Lane, Calcutta.

সচিত্র সাপ্তাহিক পত্রিকা।

বাসন্তী

২য় বর্ষ] ১৮ই আশ্বিন শুক্রবার ১৩৩০, ইং ৫ই অক্টোবর। [১৪শ সংখ্যা

চৈতন্য বিলাস মহারাজার ভোট ভিক্ষা

ভোটের ভিখারী আমি, ভোট দিবি কে আয়।
(আহা) নইলে প্রাণ যায়।

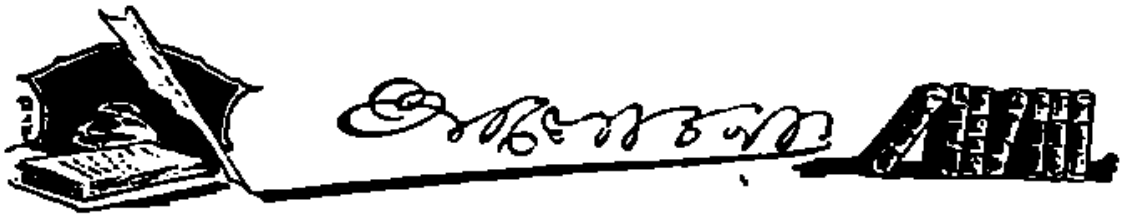

গত সপ্তাহে ১৮১৮ সালের তিন আইন অনুসারে কলিকাতা ও কলিকাতার বাহিরের কয়েকজন ভদ্রলোককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। এই উপলক্ষে দেশে বহুদিন ছিল না আবার আরম্ভ হওয়াতে সকলেই শঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছে। এ সম্বন্ধে ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র চৌধুরী সার্ভেণ্ট পত্রে যাহা লিখিয়াছেন তাহার মর্ম এই :—এই ভাবের গ্রেপ্তারের কথা শুনিয়া প্রথমে বিশ্বাস হয় নাই। বাংলার সরকার ভারত সরকারের অনুমতি ভিন্ন এ আইন নিশ্চয়ই প্রয়োগ করেন নাই। কিন্তু ভারত সরকার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন এ আইন সীমান্ত প্রদেশ ছাড়া আর কোথাও প্রয়োগ করা হইবে না। যাহাদের গ্রেপ্তার করা হইয়াছে তাহারা যদি সত্যই বিদ্রোহী হয় তবে প্রকাশ্য আদালতে যথারীতি তাহাদের বিচার হওয়া কর্ত্তব্য। যে আইন উঠাইয়া দেওয়ার প্রস্তাব বড়লাট, তাঁহার শাসন পরিষদ ও ব্যবস্থাপক সভা গ্রহণ করিয়াছেন তাহা আজ এভাবে উড়াইয়া দেওয়া আশ্চর্য্যের বিষয়। এক ইহাদের প্রকাশ্য আদালতে বিচার করা উচিত—আর কমিটির প্রস্তাব গ্রাহ্য না করিলে বড়লাট ও লর্ড লিটন সকলের বিশ্বাস হারাইবেন।

• • • •

বিপ্লবের যুগ দেশে একবার আসিয়াছিল—সে অশান্তির কথা দেশবাসী এখনও ভুলিতে পারে নাই। দেশ প্রীতি ও দেশ উদ্ধারের নামে বিপ্লববাদ এখন সংহতি শূন্য দেশে চলিতে পারে না—একথা পূর্ব্বোক্ত বিপ্লবপন্থী নেতারাও স্বীকার করিয়াছেন। তাহার পর মহাত্মা গান্ধীর আন্দোলনে দেশের বিপ্লববাদ ধুইয়া মুছিয়া গিয়াছিল। উচ্ছৃঙ্খল বিপ্লবমতি সম্পন্ন লোকেরাও মহাত্মার শান্তোজ্জ্বল পতাকাতলে সমবেত হইয়া গঠন মূলক কার্য্য ও দেশের বিচ্ছিন্ন শক্তি সংঘবদ্ধ করিবার প্রয়াস পাইতেছিলেন। তারপর দেশের কর্ণধেরা হইতে মহাত্মা সরিয়া যাইতে দেশে আবার বিপ্লবের একটা আশঙ্কা ও ভীতি জাগিয়া উঠিয়াছে। দেশে অল্প দিনের মধ্যে কয়েকটি অতি জঘন্য হীন প্রবৃত্তির ডাকাতি খুন জখম হইয়াছে। ধরা পড়িয়া ইহারা যে ভাবে আত্মদোষ বিবৃত করিতেছে তাহাতে দেশবাসী ঘৃণায় ও শঙ্কায় শিহরিতেছে। তারপর সরকার পক্ষ হইতে দেশের প্রায় একাদশজন খ্যাতনামা লোককে ১৮১৮ সালের তিন আইনে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। ইহারা পূর্ব্বযুগের বিপ্লব পন্থী হইলেও বর্ত্তমানে ইহারা কোন অপকর্ম্ম করিয়াছেন কিনা তাহা দেশবাসী জানে না। তাই দেশবাসী প্রকাশ্য বিচারে জানিতে চাহে ইহাদের অপরাধ কি? এই সব ধরপাকড়ে দেশে ভীতি ও অবসাদ আরও বাড়িয়াছে। মৃত ব্যক্তিদের সম্পর্কীয় কাগজপত্র দুইজন বিচারকের কাছে উপস্থিত হইবে সরকার পক্ষ নাকি এই ব্যবস্থা করিয়াছেন। সরকার বিনা খবরে ইহাদের ধরেন নাই—হয় তো গুপ্ত ষড়যন্ত্র থাকিলে গুপ্তচরেই তাহা প্রকাশ করিয়াছে। তবে সে প্রকাশ প্রমাণসহ কিনা তাহা বিচারকের বিচারে সাব্যস্ত হইতে পারিবে কিন্তু সে বিচারে আত্মপক্ষ সমর্থনের ব্যবস্থা থাকিবে কি? যাহা হউক আমরা অরাজক চাহি, সুশাসন চাহি—তাহা দেশবাসী মাত্রেই চাহে কিন্তু তাহা কি এই ধরণের লুটা বিপ্লবে আসিবে? দেশের নামে এই যে দেশবাসীর নির্ম্মম হত্যা—লুণ্ঠন, নারীর উপর বলপ্রয়োগে অলঙ্কার ছিনাইয়া লওয়া ইহা কি দেশবাসী কেহ সমর্থন করিতে পারে? শত বিচ্ছিন্ন দুর্ব্বল দেশবাসী ইহাতে মরিবে—বিপ্লবের নামে এই অপকর্ম্মের অনুষ্ঠাতারাও শাসন শক্তির সম্মুখে চূর্ণ বিচূর্ণ হইবে। আমাদের কিছুতেই বিশ্বাস হয়না যে কিছুমাত্র বুদ্ধি ও বিচারশক্তি সম্পন্ন লোক এমন জঘন্য ব্যাপারে আছেন এবং দেশে আবার সেই বিপ্লব যুগের কাণ্ড ঘটিতে পারে। যদি কিছু তেমন ঘটে তবে দেশবাসী তাহা কিছুতেই

সমর্থন করিবে না। মূল ত্রিমাত্রিক বিধানের আভ্যন্তিক আবির্ভাবে দেশবাসী ভাবিতেছে দেশে এ আবার কি দিন আসিল?

• • •

আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদকও ১২৭ক, রাজদ্রোহের ধারায় পড়িয়া গ্রেপ্তার হইয়াছেন। মোকর্দ্দমা বিচারাধীন।—অতি অল্প সময়ের মধ্যেই আনন্দবাজার দেশে যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিয়াছে। বাঙ্গালী পরিচালিত কোন ইংরেজী বা বাংলা কাগজই এমন নব প্রচেষ্টা ও উদ্যমের সঙ্গে চলিতে পারে নাই। আশা করি আনন্দবাজার মহাত্মা-পন্থী থাকিয়া দেশবাসীকে দেশাত্মবোধ ও গঠনমূলক কার্য্যে প্রবুদ্ধ রাখিতে পারিবে।

• • •

কবীন্দ্র রবীন্দ্রের প্রিয় ভক্ত সখা ভারত হিতৈষী শ্রীযুক্ত পিয়ার্সনের হঠাৎ ইতালীতে মৃত্যু হইয়াছে। ইনি বোলপুরে বিশ্বভারতীর অধ্যাপক ছিলেন—বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সহিত ইহার ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। রবীন্দ্রনাথের বহু উপন্যাস ও কবিতা ইনি ইংরেজীতে ভাষান্তর করেন। ভারতীয় ভাষার বৈদেশিক প্রতিষ্ঠার সহিত ইহার নাম এ দেশে অমর থাকিবে।

• • • •

যুদ্ধের পরেও ইওরোপের অশান্তি যেমন ছিল তেমনি আছে। যে দুর্ব্বল সেই লাঞ্ছিত হইতেছে যে শক্তিশালী সেই গর্জ্জন করিতেছে। আজ ফরাসীর দাপটে জার্মেন মরণাপন্ন। কেহ কাহারও সাহায্যের জন্য আসিতেছে না—যে যাহার সুবিধা রাখিতে ব্যস্ত। কেহ শিল্প-বাণিজ্যে কেহ বা কাঁচা মালে এই সময় বাজার অধিকার করিতেছে—কেহ বা রাজ্যের সীমা বাড়াইতেছে। শক্তির কাছে ন্যায় অন্যায় সব তুচ্ছ—এ ব্যাপার এ ভাবে কত কাল চলিবে?

জাপানীজ রিলিফ ফণ্ড

জাপানের দুরবস্থার কথা আমাদিগের পাঠক পাঠিকাগণের নিকট অপরিচিত নহে। প্রকৃতির নির্ম্মম ধ্বংসকার্য্য পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ এবং এশিয়ার গৌরব জাপানকে কিভাবে ক্ষতিগ্রস্থ করিয়াছে তাহা সকলেরই বিদিত। আমরা অত্যন্ত আনন্দিত হইতেছি যে জাপানের সাহায্যের জন্য যে জাপানিজ্ রিলিফ্ ফণ্ড খোলা হইয়াছে তাহার বঙ্গদেশীয় শাখাতে সুন্দরভাবে কাজ হইতেছে। এই ফণ্ডের সেক্রেটারী-মহোদয়গণের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মিঃ ডবলিউ ডবলিউ কানিংহাম, এবং সম্ভ্রান্তবংশীয় রাজা মন্মথনাথ রায় চৌধুরীর চেষ্টায় এই কার্য্য অতিশয় সুন্দরভাবে অগ্রসর হইতেছে। মিঃ কানিংহাম ভিক্টোরিয়া স্মৃতিসৌধের কার্য্যে স্বকীয় অসাধারণ কর্ম্মপ্রতিভা এবং নিঃস্বার্থ কার্য্যকারীতার পরিচয় দিয়াছিলেন। আরও অনেক দেশহিতকর কার্য্যে আমরা মিঃ কানিংহামের নামের সহিত সুপরিচিত। আজ তিনি এসিয়ার শ্রেষ্ঠ শক্তি জাপানের দুরবস্থার সময় যে ভাবে অক্লান্ত পরিশ্রম করিতেছেন, তাহা এসিয়ার অধিবাসীগণ ভুলিবে না। আশা করি রাজাবাহাদুর এবং মিঃ কানিংহামের সমবেত চেষ্টার ফলে এই ফণ্ডে এমন টাকা উঠিবে যাহা জাপানের প্রকৃত উপকারে লাগিতে পারে।

ইণ্ডিয়ান সোপ কোম্পানীর
মেসিনে প্রস্তুত
চন্দন, রয়েলবকুল, মাস্ক ও ভেলভেট সাবান
ব্যবহার করুণ। টেলিফোন, ২৪৯৯

নির্ব্বাচন-প্রসঙ্গ

[শ্রীভবতোষ রায় বি-এল]

এবারকার প্রথমেই আমাদের একটি কর্ত্তব্য পালন করতে হবে। কাগজে এতদিনে সত্য খবর বেরিয়েছে। মধ্য কলিকাতার নির্ব্বাচন-কেন্দ্র হতে আমাদের অশেষ শ্রদ্ধার পাত্র নিষ্কলঙ্কচরিত্র কর্ণধারের দেশপ্রাণ নির্ম্মলচন্দ্র চন্দ্র মহাশয় ব্যবস্থাপক সভার নির্ব্বাচন-প্রার্থী। নির্ম্মল-চন্দ্র বাস্তবিকই রাজনৈতিক গগনের নির্ম্মলচন্দ্র। আমরা তাঁহাকে সাদরে আমাদের অভিনন্দন জানাচ্ছি। নির্ম্মল-চন্দ্র যেখানে নির্ব্বাচন-প্রার্থী সেখানে আর কাহারও স্থান হওয়া অসম্ভব। যুবক নির্ম্মলচন্দ্র যে শোকক্লিষ্ট অন্তরেও দেশমাতার জন্য কাজ করতে আসবেন এ কথা সকলেই জানতেন। তিনি যে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্যপদ-প্রার্থী এ খবরে দেশের ও দশের মনে আশার সঞ্চার হবে। আমরা আশা করি নির্ম্মলচন্দ্রের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার মতন অসীম সাহস কেউ কর্ব্বেন না। যদি কেউ তা করেন, তবে আমাদের লেখনী নির্ম্মম-ভাবে তাকে আঘাত ক'র্ব্বে। এ কথা পূর্ব্বেই জানিয়ে রাখ্‌ছি।

• • • •

স্যর রীলরতন সরকার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্ব্বাচন চান। গতবারেও চেয়েছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ হ'তে পারেন নি। এবারও কি চেষ্টা ক'রে বিফল মনোরথ হ'তে চান নাকি? স্যর আশুতোষ দেখ্‌ছেন ভাল। কিন্তু কোন দিকে বাতাস বইছে তা কি তিনি দেখ্‌ছেন? আমরা ধীরে ধীরে সব স্পষ্ট ক'রে দিব।

নির্ব্বাচন-মঞ্চ

(এক অঙ্ক নাটক)

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

মহারাজ চৈতন্যবিলাস—বাসন্তীর পূর্ব্ব সংখ্যার দ্রষ্টব্য বৈরাগ্য—নেতা

বিচক্ষণ বৈদ্যরাজ—ভূতপূর্ব্ব অসহযোগী এবং জেল-প্রত্যাগত।

বজবজ কচকচওয়ালা—অনৈক মাড়োয়ারী সভ্য-পদপ্রার্থী

চিরবসন্ত দিকপাল—বৈরাগ্য দলভুক্ত।

মিঃ জানমহম্মদ খাঁ—কোনও মুসলমান কেন্দ্র হতে।

মিঃ দিগিন্দ্র শর্ম্মা—সম্পাদক এবং সভ্যপদপ্রার্থী।

ভোটারগণ, ক্যানভাসারগণ,—খবরের কাগজওয়ালা।

স্থান গোলদিঘী। উপলক্ষ নির্ব্বাচন-সভা।

বিচক্ষণ বৈদ্যরাজ—উপস্থিত ভোটার মহোদয়গণ, আজকার এই সভায় একজন সভাপতি নির্ব্বাচন কর্‌তে হবে। আপনারা সকলেই ভোটার, এবং এদিকে আমরা সকলেই আপনাদের নিকট ভোটপ্রার্থী। যাঁহার কৃতিত্ব কাহিনীতে বিগত সংখ্যার "বাসন্তী" কাগজ আপনাদের নিকট অতিশয় তুচ্ছ, হেয় এবং কুরুচিসম্পন্ন—

অনৈক ভোটার—উচিত কথা, মশাই, উচিত কথা, এই বলুন।

বিচক্ষণ—আচ্ছা, যে উচিত কথা পাঠ ক'রে আপনারা এত সুখী হ'য়েছেন, সে কথা যাঁর সম্বন্ধে বলা হ'য়েছে আমি প্রস্তাব করি, সেই শ্রদ্ধেয় মহারাজা চৈতন্যবিলাস মহোদয় আজকার সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ ক'রে আমাদের কৃতার্থ করুন।

চৈতন্যবিলাস—ভোটার মহোদয়গণ, আজ আমি ভরবিগলিত হৃদয়ে আপনাদের সম্মুখে আসছি। কারণ, আপনারা আমার যে কৃতিত্বের পরিচয় বাসন্তীতে পেয়েছেন তা আমার সকল কৃতিত্বের এক তৃতীয়াংশ বললেও অত্যুক্তি হয় না। আমার কার্য্যকাহিনী জান্‌তে হ'লে আমার সেক্রেটারী মিঃ দিগিন্দ্র শর্ম্মার কাগজ পড়বেন। তাতে সাত্ত্বিক সব খবর পাবেন। মিঃ চিরবসন্ত দিকপাল মহাশয় তাঁর প্রোগ্রাম আপনাদের সাম্‌নে উপস্থিত ক'র্ব্বেন।

চিরবসন্ত দিকপাল—হে ভোটার মহোদয়গণ, আমি আর কি ব'ল্‌বো। বলার এখন কিছু নাই। তবে এই বল্‌ছি, যে আমি যুবক এবং দেখ্‌তে আমার চেহারা মন্দ নয়। কেবল রমণীর প্রেমলাভার্থে আমি ঘুরছি এ কথা মিথ্যা। আমি জেলেও গিয়েছি। আমাকে পাঠালে আর কিছু আমি রাখ্‌বো না। সব ভেঙ্গে দেবো। চুরমার, চুরমার, চুরমার!

অনৈক ভোটার—মশাই বসুন, আপনাকে আমরা চাই না।

সভাপতি—মিঃ দিগ্বিজয় শর্ম্মা তাঁর প্রোগ্রাম বলুন।

দিগ্বিজয়—ভদ্রমহোদয়গণ, আমি সুবিধাবাদী। যখন যে পথে গেলে কিছু মেলে এবং আমার একটু নাম হয় আমি সেই দিকেই যাই। আমি নাকি "অজাতশত্রু"। যারা এ কথা বলেন তারা জানেন না এ ভগবানের দান। আমি যখন যাকে ধরি তাকে কেমন করি মহারাজ চৈতন্য বিলাসের অবস্থাতেই তা বুঝ্‌তে পার্ব্বেন।

অন্যতম ভোটার—অযাত্রা। অযাত্রা। বসুন।

দিগ্বিজয়—তবেরে শালারা—

সকলে—বের ক'রে দাও, বের ক'রে দাও ইত্যাদি।

সভাপতি—ভোটার মহানুভবগণ, যদি আপনারা বলেন, তবে দিগ্বিজয়কে বের কচ্ছি। মিঃ জানমহম্মদ খাঁন তাঁর প্রোগ্রাম বলুন।

জান মহম্মদ—আমি কিছু জানি না, কেবল এই কথা ব'লতে চাই, যে হিন্দু মুসলমানে যাতে মিলন না হয়, সে জন্য আমি প্রাণপণে চেষ্টা ক'র্ব্ব এবং আমাকে পাঠালে আমি যেমন ক'রে হয় কিছু ক'রে নেবার চেষ্টা ক'র্ব্ব। আমি আর কিছু জানি না। কেবল জানি কেমন ক'রে দু'পয়সা হয় এবং দু'পয়সা আসে। আপনারা আমাকে পাঠালে দেখ্‌বেন আমি কেমন ক'রে মতলব হাসিল করি।

সভাপতি—মিঃ বিচক্ষণ বৈদ্যরাজ।

বিচক্ষণ—আমি অসহযোগী হ'লেও এখনও স্বাধীন জাতির প্রধান আহার মদ পরিত্যাগ করি নাই। সুতরাং স্বাধীনতার জন্য আমি কেমন ভাবে উদ্গ্রীব হ'য়ে আছি সেটা বুঝ্‌তে বিলম্ব হবে না। (গোলমাল)

সভাপতি—শান্তি! শান্তি!! শান্তি!!! বজবজ সাহেব বলুন।

বজবজ—আমি চাই যথাসাধ্য বিলাতী মালের পসার যাতে দেশে বাড়ে সেজন্য চেষ্টা কর্‌তে। যদিও আমার নাম আপনারা জানেন না, তথাপি আমার দুঃখ হয়, যে আমার মারোয়ারী ভাইগণ পর্য্যন্ত আমার বিপক্ষে বাঙ্গালীর সঙ্গে যোগ দেয়। এ সব মারোয়ারী স্বার্থপর। এঁরা বঙ্গদেশে থেকে আমার বাঙ্গালীর সঙ্গে মিল কর্‌তে চায়! আমি তা কখনও হ'তে দেব না।

ভোটারগণের প্রতিনিধি—আপনারা যে ভাবের সব কথা বল্লেন, তাতে আমাদের অনেক চিন্তা ক'রে ভোট দিতে হবে। (সভাভঙ্গ এবং যবনিকা পতন)

আমাদের বলার কিছু এখনও আসে নি। ঠিক ক'রে ভোট দিতে হবে এ কথা সব নির্ব্বাচকই জানেন। আগামী ৮ই অক্টোবর সমগ্র দেশের সব নির্ব্বাচকের তালিকা আমাদের হস্তগত হবে। যা ব'লবার এবং দেখ্‌বার তা আপনারা দেখে যান, কিন্তু আমাদের ব'ল্‌বার অনেক বিষয় আছে সে সব আমরা সম্পূর্ণ তালিকা পেলে ব'ল্‌বো।

আমরা প্রত্যেক নির্ব্বাচন-কেন্দ্র নিয়ে বিশদ-ভাবে আলোচনা ক'র্ব্ব। সে সব কাহিনীর ভিতর অনেক জান্‌বার এবং বুঝ্‌বার বিষয় থাক্‌বে।

গ্রন্থ-আলোচনা

সিরাজীখান্নী—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। প্রকাশক গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, আট আনা সংস্করণের গ্রন্থ। এই গ্রন্থে দিল্লী সিংহাসনের দুইটি খ্যাত-নামা সম্রাজ্ঞী রাজিয়া ও নূরজাহানের জীবন কথা বর্ণিত হইয়াছে। সম্রাজ্ঞী রাজিয়া ও নূরজাহান মুসলমান যুগের রাজনীতিতে ভারতীয় নারীদের গৌরব হইলেও সত্য ইতিহাস বজায় রাখিয়া ইঁহাদের সম্বন্ধে কোন ঐতিহাসিক গ্রন্থ রচিত হইতে পারে এরূপ উপাদান অতি সামান্যই পাওয়া গিয়াছে। সমসাময়িক প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদিগের চরিত কথার উপাদান পাশ্চাত্যে যেমন সংগৃহীত হইয়া থাকে আমাদের দেশে তাহা হয় নাই—এখনও হইতেছে না। তাই খাঁটি চরিত কথা আমাদের দেশে হয় না। ইতিহাস সম্বন্ধেও ঐ কথা। তবু আমাদের দেশে ঐতিহাসিক যাহা কিছু হইতেছে তাহা পাশ্চাত্য মনীষীদের চেষ্টার ফলেই। ইতিহাস এই দুইটি সম্রাজ্ঞী সম্বন্ধে যতটা বলে লেখক তাহা ক্ষুণ্ণ না করিয়া বা ইহা বেশী না ফলাইয়া এই দুইটি জীবনী সরস ভাষায় মনোরম করিয়া বলিয়াছেন। ইহা উপন্যাসও নয় ঘটনাপঞ্জীর ইতিহাসও নয়—ঐতিহাসিক ঘটনার সুসঙ্গত বিন্যাসে দুইটি জীবনকে রূপ দেওয়ার চেষ্টামাত্র। এ চেষ্টায় লেখক সফলকাম হইয়াছেন।

শুনছি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস ধুরন্ধর ভাঁড়ার কর সাহেবকে বিলেত পাঠিয়ে তার গবেষণার অমূল্য রত্নের সাগর পারে পাড়ি দেওয়াবার ব্যবস্থা চলছে! সত্য কথা—যখন কাশীমুদ্দিন মার্কার পণ্ডিতের স্থান কি আর অপণ্ডিত বাংলাদেশে হতে পারে? তবু অনেকে পণ্ডিত বাংলা দেশে ছিলেন তাই রক্ষে—তাই তো দেশ বিদেশে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাঁড়ারের রত্নের পরিচয় চলতে পাচ্ছে।

• • • •

এদেশে ছছুন্দর অনেক ওঠে আবার দেখতে দেখতে তলিয়ে যায়। বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির সেই সব ঐতিহাসিক-প্রত্নতাত্ত্বিক খোঁড়া-খুঁড়ির অভিযানের ব্যাপার দেশবাসীর মনে এখনো আবছায়ার মত কখনো আসে বটে। কিন্তু অনুসন্ধান সমিতির কি দশা এখন! মৈত্রেয় মশায় ছি—আই ই আর চন্দ মশায় মোটা মাইনের কাজ পাবার পরই বরেন্দ্র-সন্ধান অসন্ধান হয়ে গেল কি? বুলাবার কুমার রায় মশায় কি বলেন?

• • • •

বাংলা দেশের সাহিত্য পরিষদের উদ্দেশ্য কি? বাংলা সাহিত্যের জন্য এঁরা সম্প্রতি কি কাজে লিপ্ত আছেন। সম্পাদক পরিবর্তন আর কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির পরিবর্ত্তনের সময় মাঝে মাঝে এদের ম্যানিফেষ্টো পাই বটে—তারপর আর সাড়া নেই! সাহিত্য-পরিষদের পক্ষ থেকেও কেউ বলতে পারেন বটে—আমরা কি করি না করি তার খোঁজই বা কে নেয়! কিন্তু এ উত্তর ও তো ওঁদের গুণের পরিচয় দেবে না!

• • • •

বিলেতে এখন ছোট ছোট নাট্য অভিনয়েরই মরসুম। এই ছোট নাট্যের যুগেও বিলেতী থিয়েটারে যার্ণার্ডশ'র এক যুগান্তরকারী নাটকের অভিনয় হচ্ছে। এর অভিনয় চলবে পঞ্চরাত্রিব্যাপী। এই যেমন যারা বায়স্কোপে ইনটারভেলে যে চলে।

• • • •

অনেকে বলে থাকেন এ দেশীরা বড় কোন-ঠাসা। ঘরের কোণে থাকতে পারলে এরা বিদেশ যেতে চায় না। ব্যবসায় বাণিজ্য করতে বা কলনিবেশ স্থাপনা করতে এরা ঘর ছেড়ে নড়তে চায় না বটে কিন্তু যাঁরা মাইনের চাকরী পেলে এরা সাত সাগরের পারে যেতেও রাজী। চাকরী এরা বড় ভালবাসে তা নানা কাজেই বোঝা যায়। একটা গুজব রটে জাপানে কাজের জন্য অনেক লোক নেওয়া হবে। অমনি দলে দলে হাজারে হাজারে লোক গিয়ে শ'ওয়ালেস আর এক্সপ্রেস কোম্পানীর দোরে ধরা। তারা বললে মিথ্যা কথা—জাপানে লোক চাই না—তাই কি আর চাকরীর উমেদারেরা নড়ে?—তবু বাংলার এ দশা নয়,—মাদ্রাজেও এই ব্যাপার। এমন হুজুগের চাকরীর গুজব রটিয়েছিল খুব রগড়ে লোক বোধ হয়।

রঙ্গালয়

আর্টস্ লিমিটেড্ পরিচালিত ষ্টারে রবীন্দ্রনাথের রাজা ও রাণী প্রতি বুধবারে অভিনীত হইতেছিল। আগামী বুধবার হইতে দ্বিজেন্দ্রলালের চন্দ্রগুপ্তের অভিনয় চলিবে। রাজা ও রাণীতে সময়োপযোগী দৃশ্যপট ও পোষাক পরিচ্ছদ নির্ব্বাচনে ষ্টার থিয়েটার যথেষ্ট কৃতিত্ব ও রসগ্রাহীতার পরিচয় দিয়াছে। পোষাক পরিচ্ছদ ও দৃশ্যপটের এমন স্বাভাবিক সুনির্ব্বাচন বাংলা রঙ্গমঞ্চে পূর্ব্বে হইয়াছে কিনা জানি না। অভিনয় সুন্দর করিবার জন্য চেষ্টার ত্রুটি হয় নাই, মোটের উপর অভিনয় ভাল হইয়াছিল। তবে এ ধরণের নাট্য রঙ্গালয়ে নিখুঁত অভিনয় হওয়ার আশা করা যায় না। কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধনে অভিনয়োপযোগী করিয়া লইতে পারিলে তবেই এ কাব্য নাট্য রঙ্গালয়ে অভিনীত হইতে পারে। দেশের অনেকে এখন খুন জখম, আকস্মিক হত্যা, আবির্ভাব অন্তর্ধান দেখিতে দেখিতে বিরক্ত হইয়াছে—এখন লোকে এমন কিছু চাহে যাহাতে বুদ্ধিবৃত্তির খেলা, মনোভাবের বিকাশ দেখা যাইতে পারে,—দেশের সমাজ, সমস্যা, বিভিন্ন জিনিসের উপর নাট্যের প্রভাব লোকে দেখিতে চাহে। ইহাতে অভিনয়ে নূতনত্ব আসিবে,—উচ্চশ্রেণীর অভিনেতা অভিনেত্রী তৈরী হইবে। ষ্টার এ প্রচেষ্টায় অগ্রণী হইলে সুখের বিষয় হইবে।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা

ভারতবর্ষ, একাদশবর্ষ, প্রথমখণ্ড, আশ্বিন ১৩৩০।

আশ্বিন মাসের "ভারতবর্ষ" খানা একটি মাতালকল. প্রচ্ছদপটের ছাপাটি বড়ই সুন্দর, মো-পাতার পাশে ছাপাটি বড়ই সুন্দর ছাপা হয়েছে, তবে মনে হয় যে, মাতৃমূর্ত্তির মুখে ভারতবর্ষের নৈতিক মতের মত বাঙ্গালা সাহিত্যের আধুনিক মাতৃভাবই ফুটে উঠেছে। আমাচারী তান্ত্রিকেরা দেখলে বলবেন যে, অমাবস্যে এটা মাতৃভাব নয়, অন্নভাব। প্রথম চিত্রের বিষয় 'শাপ বিমোচন' চিত্রকর শ্রীযুক্ত রামেশ্বর প্রসাদ বর্ম্মা। অনেককাল আগে দেশের পটুয়ারা যেমন গ্রামপট এঁকে গ্রামে গ্রামে দেখাত চিত্রখানা সেই জাতীয়। রামের দাইটু কু বর্ণ অবশ্যও নয়, ঠাকুর বড়োও হাঁটও নয়। যে বর্ণটা এমনি অস্বাভাবিক যে, বাস্তব জীবনে তা খুঁজে পাওয়া ভার। অহল্যা ছোনিবড় নাম হলে পাথরের উপর যেভাবে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করছে সেভাবে এখনকার মা ঠাকরুণরা কেউ প্রণাম করতে গেলে বোধ হয় ডিগবাজী খেতেন। বর্ণাশ্রীর মুখিতে অস্বাভাবিকতাটাই পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে।

অনেককাল পরে ভারতবর্ষের প্রথম প্রবন্ধটি পাওয়া গেছে, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রদ্যুম্নকুমার সরকার "ভারতীয় চিত্র পরিচয়" নাম দিয়ে প্রাচীন সাহিত্য থেকে যে সমস্ত প্রমাণ সঙ্কলন করেছেন তা সুখপাঠ্য, অবশ্য প্রত্নতত্ত্বের কয় কটি কলে তা আধুনিক পাঠক আর সমালোচকের একেবারেই পছন্দ হবে না। তার পরই শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী সরস্বতীর ক্রমশঃ প্রকাশ্য উপন্যাস 'বিজিতা' এই চরিত্রহীন পাণ্ডিত্যপূর্ণ পত্রিকাটির মুখে জমকেতে বুলস্যাট্ট এই উপন্যাসটি যে কেমন করে ছাপালেন তা বুঝতে পারা গেল না। উপন্যাস যখন ক্রমশঃ প্রকাশ্য তখন তার সম্বন্ধে বেশী কথা বলা উচিত নয়। তৃতীয় প্রবন্ধ অধ্যাপক শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দারের গোয়ালিয়র দুর্গ। প্রবন্ধটি সুলিখিত কিন্তু ছাপাটা ভার হাবে। ছবিগুলি যেন স্পষ্ট উঠেছে, তা বোধ হয় His Highness Maharaja Scindhia বাহাদুরের বদৌলতে। অধ্যাপক সমাদ্দারের নামে যে সমস্ত বই বা প্রবন্ধ বার হয়েছে তার সবগুলিই সম্ভবতঃ তাঁর লেখা নয়, কারণ তাহলে তাঁর মত বিদ্ব পণ্ডিত কখনই মোগা কলমের মুখে মক্কা লিখতেন না। অধ্যাপক সমাদ্দার বা তাঁর আড়াতে লেখক যিনি গোয়ালিয়র দুর্গ সম্বন্ধে এ প্রবন্ধ লিখেছেন তিনি কখনো গোয়ালিয়র যান নি। গোয়ালিয়র দুর্গটি একটি পর্ব্বতের উপর অবস্থিত অথচ বর্ত্তমান গোয়ালিয়র নগরটি বা স্থানীয় লোকের কাছে লক্ষর পাশে পরিচিত তা সবগুলি ছবিতে নির্দ্দিষ্ট হোয়েছে। মন্দির গোবের সমাধি মুসা মসজিদ গুজরীমহল (গুজরীমহল নয়) এগুলি সবগুলি ছবিতে অবস্থিত, গোয়ালিয়র দুর্গের অংশে নয়। একথা অধ্যাপক সমাদ্দার অথবা তাঁর আড়াতে লেখক একেবারে ভুলে গেছেন বলতে বেরিয়ে আসেন না। গুজরী মহলটা এখন আর গোওলা নেই, তার ভিতরটা গরুমুক কলিজের মত পড়ে আছে এবং সেটা গোয়ালিয়র দুর্গের আসলাসলি কটকের নিকটেই অবস্থিত। গোয়ালিয়র দুর্গটা যে কি,লেখক তা নিজে বোঝেন নি বলে মোটেই বোঝাবার চেষ্টা করেন নি। গোয়ালিয়রে যে দুটি প্রধান প্রবেশের পথ আছে তার মধ্যে একটির নাম আলমগিরি দরজা আর উপরে হাতীপোল। আর একটি কটকের কথা বা ছবি সমাদ্দার মশাই দেন নি, কারণ তার অস্তিত্বের কথা বোধ হয় তিনি জানেন না।

"এমুল ভক" আর একটি ক্রমশঃ প্রকাশ্য উপন্যাস সুতরাং অস্পৃশ্য। শ্রীমতী জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর "উদ্বোধন" কবিতাটি এখনকার যুগের লেখা নয়, সুতরাং এটি ভারতবর্ষে ছাপা উচিত হয়নি। কারণ ভাষায় ও ভাবে এ কবিতাটি ভারতবর্ষ কাগজখানা এখন যে ভাবে চালানো হচ্ছে তার সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ। শ্রীযুক্ত দিলীপ কুমার রায় "য়ুরোপের সভ্য সমাজের কথাবার্ত্তা" সমাজের এক শ্রেণী লোকের উপভোগ্যবস্তু, চালাতে পারলে এ জিনিষটা সাহিত্যের একটা উপভোগ্য বস্তু বলে দাঁড়িয়ে যেতে পারে। "বিদর্ভ" প্রতিভাশালী লেখক ডাক্তার মহেন্দ্রচন্দ্র সোমের ক্রমশঃ প্রকাশ্য উপন্যাস প্রত্নতত্ত্বে অস্পৃশ্য। শ্রীযুক্ত কবিরাজ বাসন্তীর প্রস্তাব বিষয়ক আইন সভায় ও বঙ্গদেশের ভবিষ্যত আর্থিক অবস্থা" নামক প্রবন্ধটি বিবিধ প্রসঙ্গের মধ্যে ঠেলে ভারতবর্ষের সম্পাদক অপর পক্ষের কথাও লিখতে করেছেন। জমিদার ও প্রজার খাজনা-খারিজ সম্বন্ধ, সুতরাং এ সম্বন্ধে প্রবন্ধের অভাব হবে না। সকল দেশেই জমির খাজনা সম্বন্ধ রাজার কিন্তু বাঙ্গালাদেশে তা জমিদারের। বাংলাদেশের মাটী কি ভাবে জমিদারের হল এটা একটু তলিয়ে দেখলেই প্রস্তাবিত আইন সম্বন্ধে কারোর মনেই কোন গোল থাকবেনা। লেখকেরা যদি ১৭৮৯ সাল থেকে ১৭৯২ সাল পর্য্যন্ত বাঙ্গালাদেশের জমিদার বা ইজারাদারের অবস্থা আর তাঁদের হক্ বিচার করে লিখতে আরম্ভ করেন তাহলেই প্রবন্ধগুলি ছাপাবার যোগ্য হবে, আর তা নইলে জমিদার বনাম প্রজার মামলার নিরর্থক ওকালতি দাঁড়িয়ে যাবে। শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ মিত্রের "পদ্মবন মিত্র" ও শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রক মুখোপাধ্যায়ের "সহজিয়া" ভারতবর্ষের আশ্বিন সংখ্যার উল্লেখ যোগ্য প্রবন্ধ। ভারতবর্ষের সম্পাদক এগুলি আর কোন মাসিক থেকে সঙ্কলন করে চালিয়েছেন কি না তা বুঝতে পারা গেল না, কারণ সে কথা তিনি স্পষ্ট খুলে লেখেন নি; কিন্তু বর্জ্জাইন অক্ষরে ছাপা দেখে তাই মনে হয়। এই প্রবন্ধগুলি যদি ভারতবর্ষের নিজস্ব হয় তাহলে ত' বর্জ্জাইন অক্ষরে লেখক লেখকদের প্রতি যথেষ্ট অবিচার করা হয়েছে। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রকুমার রায়ের "নারেবরদাই" ছাপা বন্ধ করে দিয়ে এই দুটি প্রবন্ধ বড় অক্ষরে ছাপানো উচিত ছিল। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রকুমার রায়ের ক্রমশঃ প্রকাশ্য উপন্যাসটি অস্পৃশ্য হলেও তার সম্বন্ধে দু'একটি কথা না বলে থাকতে পারলুম না। লেখাটি রবীন্দ্রবাবুর অন্যান্যপন্যাসিকের মত বিশেষত বর্জ্জিত। শ্রীযুক্ত বাসিলীন্দ্রলাল সেনগুপ্তের ঠাকুরের রথা' "একটি রাখিল ভাতীর কবিতা, মাধুর্য্য হলেও এর ভাবের লেখনায় এতে খুঁজে পাওয়া ভার। এখনকার মাসিক পত্রের কোথা মিলাতে বোধ হয় এগুলি গল্পের হিসেবে নেওয়া যেতে থাকে। "সমস্যার প্রাচীনত্বের নিদর্শন" কবিরঞ্জন উপাধিকারী অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মিত্রের পেটিকেন্দ্রের প্রবন্ধ, এর মধ্যে কতটুকু লেখকের নিজের আর কতটুকুই বা সঙ্কলন তা বুঝতে পারা গেল না, কারণ এ শ্রেণীর পেটীতত্ত্ববিষয়ের মত ঝিক্ক ঝনাইও ফুট নোট দেন নাই। এই জাতীয় পণ্ডিতগণ বলে বেড়ান যে, ফুট নোট দিলে লেখাটা দেখতে অত্যন্ত বিশ্রী দেখায় কিন্তু তার আসল কারণ, ফুটনোট দিলে চুরী ধরা পড়বার সম্ভাবনা। অধ্যাপক মিত্র কথাই প্রবন্ধের শেষে চতুর্দ্দশ বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের ইতিহাস পাবার সম্ভাপত্তি দুখার ডাক্তার ধরেন্দ্রনাথ লাহার কাছে বিদ্যাপত্তিয়ার প্রাতঃস্মরণীয় দুখার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায়ের মজর যেখিয়ে যে বরখাস্ত করেছেন তার বোধ হয় কোন কলই হয় নি। শ্রীযুক্ত প্রবোধনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের "আমল মিলন" নামক কবিতাটি প্রেমের যোগোবর সিরিজে ছাপা হলে বোধ হয় মন্দ হত না। কবি লিখছেন—

'ঐ দেখ সখি! সরসার পাখা মেলিয়া'
ঐ দেখ সখি! অমরক যেন্দ্রিয়া
প্রিয়ের বক্ষে প্রেয়সী সোহাগে ঘুমিয়ে,
সকল দ্বার খুলিয়ে।

লিখবার আগে কবির ভাবা উচিত ছিল যে, আমাদের ভাঁতি কি ব্যবসায়ের মেরুদণ্ড সোজা করতে গেলে একটু বড় সাইজের মাসিকা প্রয়োজন, সে সাইজের মাসিকা আমাদের দেশে পাওয়া যায় না। কবি হয়তো মনে করতে পারেন যে, তিনি মাসিক পত্রিকাতে সহকারের কথা লিখেছেন কিন্তু লিখিবার বেলায় সে কথাটা একেবারেই ভুলে গেছেন। এ রকম অবাস্তবতা কবিতার প্রতি চরণে লক্ষ্য করতে পাওয়া যায়। অকালবৃদ্ধ ও বাল্যবিবাহে শ্রীযুক্ত অনুরূপা দেবীর ক্রমশঃ প্রকাশ্য প্রবন্ধ। প্রবন্ধটি এই সংখ্যার বর্তমান কালের লেখার মত জোরালো। পূর্ব হিন্দুসমাজ একটা ভীষণ আবর্তনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ থেকে পঞ্চম জর্জের রাজ্যভিষেক পর্যন্ত এই পাঁচ হাজার বছর হিন্দুসমাজ যেভাবে চলেছে সেভাবে চলা যে অসম্ভব তা অতীত আর বর্তমান নানা রকমে সমাজকে জানিয়ে দিয়েছে, ভিতরে ভিতরে খৃষ্টান মিশনারী আর ব্রাহ্ম সমাজ অনেক পরিবর্তন ঘটিয়ে দিয়েছে এবং আরো পরিবর্তন যে নিবারণ করতে পারা যাবে না তাও স্পষ্ট বুঝতে পারা যাচ্ছে। লেখিকা বলছেন, "যদি বাল্যবিবাহকে বন্ধকই করতে হয়, তবে তার পূর্বে বিদেশের দীর্ঘজীবি করবার চেষ্টা করা।" লেখিকা চাকরী করেন না সুতরাং বাংলা দেশের পঞ্চাশ্ন বিয়াল্লিশজন লোকের দীর্ঘজীবি হবার চেষ্টা যে সফল হবে না, এ কথা তিনি বুঝতে পারবেন না। আমি চাকরী করি—বেতন পাই পঞ্চাশ টাকা, ঘরে স্ত্রী, তিনটী কন্যা, পাঁচটী পুত্র, একটী বিধবা বোন, এবং দুটি বিধবা খুড়ী বেঁচে আছেন, সুতরাং চাউল কিনতে পঞ্চাশ টাকার উপর লাগে। উপরন্তু বাসে দুটি টিউশনি করতে হয় সুতরাং লেখিকা যে সময় অবসর পাচ্ছেন তার সময় কোথায়। আছা যা হোক তাই ধরি, এখন কলেজের আমলের অবস্থা আমাদের পঞ্চাশ অবধি হোক না। বাবা যদি পয়সা খরচ করে বিয়ে না দিতেন তাহলে হয়তো "আদর প্রাণায়াম, মুক্তি প্রভৃতি ব্যায়াম" এসব অবশ্য খুব ব্যায়ামের ব্যবস্থা করতে পারতুম। লেখিকা আর একটী কথা বলেছেন, সেটী কলকাতা সহরের আশেপাশের গ্রামে সম্ভব কিন্তু সকল পল্লীগ্রামে সম্ভব নয়। তিনি বলেন অপরিচিত, বন্ধু ও অপরিচিত মুখে পরস্পর বাদের প্রাণঘাতী মনস্তাপ পরিত্যাগ করে, পল্লীর মুক্ত মেহে স্ত্রীদের সকলে করিয়া তোলে, সে হয় বিলাতী ব্যাপার বিলাতী জীবন-যাত্রার সমুদয় বিভিন্ন প্রণালীর মধ্যে বিয়েকে বাঁধিয়া ফেল।" কথাটা বলা যত সোজা, কাজে পরিণত করা তত সোজা নয়। আমার নিবাস যশোর জেলায় এক পল্লীগ্রামে বাবো ১২৫৩ সালের মহামারীর পূর্বে এইগ্রামে এক হাজার ব্রাহ্মণের বাস ছিল কিন্তু এখন এক ঘর ব্রাহ্মণ বরণে বাসী অথবা মুসলমানের গরুর গাড়ী করে পোড়াতে নিয়ে যেতে হয় তাদের কাঁধে দেবার চারজন ব্রাহ্মণ মিলে না। গ্রামের কবিরাজ-বংশ অনেকদিন নির্মূল হয়ে গেছে অথচ চিকিৎসকের মধ্যে ডাক্তার নেই। গ্রামে একঘর মুদীর দোকান নেই বাজার তিনক্রোশ দূরে সপ্তাহে তিনদিন। পরিবারের মধ্যে আমি একাই পুরুষ, চাকরী করি কলকাতায় সুতরাং এই চারটি স্ত্রীলোককে বাসগ্রামে কেমন করে রেখে আসি, লেখিকা সে কথাটি বলে দেবেন কি? বিলেতী ব্যায়াম করা হিসেবে চলতে খুবই ভালবাসি কিন্তু পূর্বেই বলে রেখেছি বেতন পঞ্চাশ টাকা আর দুটো টিউশনি করে আরো তিন টাকা পাই, শ্রীমতীর বাজারের বাবদ চিংড়ির পাঁচসিকে সের হওয়ায় গৃহিণী ছেঁচাইবার ছেঁড়া খবরের উপরে ছেঁড়া পাড় বসিয়ে পরিধান করেন, সেক্ষেত্রে অব্যবহিত বাঙ্গালীর পরিবারে যোগ, বিয়োগ, গুণফল বাবুটি পরিত্যক্ত হয়ে গেলে কতদূর সম্ভব তা লেখিকাই বিবেচনা করবেন। অন্ত একথা এদেশে ইংরেজি ও মুসিং মেয়ে যেবার ফার্স্টক্লাস ফার্স্টে আধাআধী হয় নি, সেবারের সময় যে বেতন বেড়েছিল তা আবার কমে গিয়েছে, কারণ রান্নাই যখন সাতবাতি জ্বালাবার যোগাড়ে থাকেন তখন কিরিঙ্গি বণিকের আয় কা কথা। লেকচার দেওয়া বড় সোজা, কিন্তু কথা কাজে পরিণত করা বড় শক্ত। পূর্বেই বলেছি যে হিন্দুসমাজ পাশ্চাত্য শিক্ষা ও ভাবের ধাক্কায় একটা ভীষণ বিবর্তনের মধ্য দিয়ে চলছে। আমরা সাবেকটা ছেড়েছি কিন্তু নূতনটা ধরিনি, সুতরাং কি ভাব যাবে তাও এখনো ঠিক করি নি। এখন সমাজ সমস্যার মধ্যে কবিতার মতন বা সাবেক সমাজের নমুনা ধরে চলতে গেলে বিশতী শতাব্দী ছেড়ে সপ্তম শতাব্দীতে যেতে হবে, সেটাও যেমন কার্যতঃ অসম্ভব লেখিকার কথা অনুসারে চলাও সেইরকম অসম্ভব একটু তলিয়ে দেখে দেখলে লেখিকা নিজেও তা বুঝতে পারবেন। শ্রীযুক্তা পদ্মাবতী দেবী চৌধুরাণীর "হিন্দুমহিলার কর্তব্য" সুখপাঠ্য প্রবন্ধ কিন্তু বড়ই ছোট। শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ রায়ের "বাঙ্গালাদেশের মহিলা দিগের অন্তর্শিক্ষা" প্রবন্ধের আবশ্যকতা কিছুই নেই, লেখক ঘোর ভ্রম বিভ্রান্তির হিসেবে প্রবন্ধটা লিখেছেন, কাজের পরিণত করা সম্ভব কিনা ভাবেন নি। উপবিষয়ে সাধারণ ও বিশেষ শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ ঘোষের বাঙ্গীয়ের মূলিখিত প্রবন্ধ তবে ভারতবর্ষের মত দেশের এযোগ্য অনুপযুক্ত, এটা সাবেককালের ওষুধোপিনী বা এখনকার উপন্যাসে ছাপলে ভাল হয়। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র ঘোষের "ধনাগম শাস্ত্রের বিকাশ" ও শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বেদবেদান্ত প্রবন্ধ প্রকাশ সুতরাং অস্পৃশ্য ভারতবর্ষের বিদ্বান কতকগুলি গায়ারাহিত সজ্জন। তার মধ্যে শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্রের ইঙ্গিত সুচিন্তিত লেখা কিন্তু এর ফল কি তা বলা কঠিন শ্রীযুক্ত অমল্য ঘোষের "দেশ বিদেশের চিত্র" ঘোষদের খুসি রাখুন, এই ইংরেজীর তরজমাগুলির ফলতঃ আবশ্যক হয়ে আসছে। কবিতার মধ্যে শ্রীযুক্ত কালীদাস রায়ের "শারৎ-প্রাতে" পড়তে ইচ্ছা হয় কিন্তু শ্রীযুক্ত সতীন্দ্রমোহন বাগচীর "শ্রাবণ নিশি" ও শ্রীযুক্ত মুনীন্দ্রজন মল্লিকের "প্রণয় কলুষ" একেবারে অপাঠ্য। ভারতবর্ষের আশ্বিন-সংখ্যার যে কটী ছোট গল্প আছে তার মধ্যে শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র বসুর 'চাঁদের পাড়াটী ছোট গল্প নয় এটী একটী বাঁধা মা হেঁয়ালী। এইজাতীয় Sexual Psychopathy বিশেষজ্ঞ তা যখন চক্ষীয়া দিয়ে তা ঘোর হয় বর্তমান যুগে একেবারেই মুখরোচক হবেনা। শ্রীমতী নারায়ণবালা বসুর "মার্সেল ও" অনেকটা গল্পের মত,সুতরাং এই বিদেশী সভ্যতাকে একটা আধটা গল্পী বাহির করতে পারে। ভারতবর্ষের গল্পগুলির মধ্যে এটীই সুখপাঠ্য। শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ কাব্য পুরাণতীর্থের "বিধবা" গল্পের বাহার না হলেই ভাল হত, কারণ এটি গল্পলেখকের স্বপ্ন। চপলা আর কমলা দুই সই সুবিমলের সঙ্গে যৌ যৌ খেলত, তার মধ্যে চপলা "বিধবা"। হঠাৎ একদিন সুবিমলা চপলাকে জানিয়ে দিল যে সে বিধবা এবং অভিভাবক বিধবা বিবাহের জন্যে সুবিমল আর চপলার সঙ্গে যৌ যৌ খেলতে রাজী হলেন তারপর কমলার বিয়ের দিন রাত্রি নিশি চপলাকে ডাক করে জানিয়ে দিলেন যে সে বিধবা। সুবিমল চপলার অবস্থা দেখে তার পরিবর্তে সে চপলার বাপের কাছে এসে বিয়ের প্রস্তাব করল কিন্তু চপলা তাকে প্রত্যাখ্যান করল। গল্পটি শেষের উপর শেষ হয় নি, এতে আখ্যান বস্তু আছে কিন্তু আখ্যায়িকা নেই।

প্রবন্ধ নির্বাচনের দোষে ভারতবর্ষের আশ্বিন সংখ্যাটি মোটেই সুখপাঠ্য হয় নি, দু'একটী ভাল প্রবন্ধ যা আছে তা বাহিরের ভূলে ভিতর নিতান্ত অস্পষ্ট হয়ে আছে।

প্রবাসী—

নির্বংশ

[শ্রীবিনয়কৃষ্ণ চৌধুরী]

২

পটলডাঙ্গার একটা গলির মোড়—ছোট দোতালা বাড়ীর সম্মুখে একখানি সাইনবোর্ডে লেখা,—

গবর্ণমেণ্ট ডিপ্লোমাপ্রাপ্তা ধাত্রী

শ্রীযুতী সরোজিনী বসু

ঐ বাড়ীর সম্মুখ দিয়া যাইতে সকলেই একবার চোখ তুলিয়া 'সাইনবোর্ড'টা চাহিয়া দেখিত। কেবল 'ডিপ্লোমা-প্রাপ্তা' বলিয়া নহে সরোজিনী একজন নামজাদা ধাত্রী। এক বিশেষ প্রকার ব্যাধির চিকিৎসায় সে খুব পারদর্শী বলিয়া তাহার খ্যাতি বা অখ্যাতি ছিল। সৌখীন বড় লোকদের বাড়ীর বিলাসিনীরা, যাঁহারা মা হওয়াটা বিড়ম্বনা মনে করেন,—মাতৃত্বের কর্ত্তব্য ও অধিকার যাঁহাদের নিকট তুচ্ছ—তাঁহাদের মধ্যে সরোজিনীর খুব পসার।

একদিন অপরাহ্নে একখানি গাড়ী আসিয়া সরোজিনীর বাড়ীর সম্মুখে থামিল। একটী যুবতী গাড়ী হইতে নামিয়া সলজ্জ সঙ্কোচে সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিলেন। দু'চারজন পথিক তাঁহার দিকে তৃষিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল—যুবতী তাহা দেখিতে পাইলেন না।

একটী ঝি আসিয়া যুবতীকে বসিবার ঘর দেখাইয়া দিল। প্রায় ১৫ মিনিট পর সরোজিনী আসিয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইল। বয়স প্রায় চল্লিশের কাছাকাছি, দোহারা গঠন—দয়াহীন দৃষ্টি চশমার মধ্য দিয়া অতি নির্ম্মমভাবে যুবতীকে আঘাত করিল। নূতন রোগিণীর সম্মুখীন হইলেই সরোজিনী কয়েক মিনিট নিতান্ত খাপ-ছাড়া ভাবে তাহার প্রতি অঙ্গে তীক্ষ্ণদৃষ্টি নিক্ষেপ করে—এটা তাহার অভ্যাস।

যুবতীর বয়স বিশের বেশী নহে—সুন্দর মুখখানি অধীর উৎকণ্ঠায় কাতর, চোখে মিনতিমাখা অসহায় দৃষ্টি মাঝে মাঝে লজ্জায় ম্লান হইয়া উঠিতেছিল।

সরোজিনী দু'একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াই গম্ভীরভাবে তাহাকে পরীক্ষা করিতে লাগিল। তরুণী গর্ভবতী ইহা বুঝিতে সরোজিনীর বেশী বিলম্ব হইল না। পার্শ্বস্থ চেয়ারখানিতে বসিয়া পড়িয়া সে সহজভাবে বলিল,—আমাকে কি কর্ত্তে হবে বলুন? যুবতী ভাবাবেগে অতি কষ্টে রুদ্ধ করিয়া বলিল,—আপনি তো সবই বুঝ্‌তে পারছেন। লজ্জার মাথা খেয়ে আপনার শরণ নিয়েছি! কতদিন আপনার কাছে আস্‌বো আস্‌বো মনে করেছি.. সাহসে কুলায় নি! এ আর কতদিন ঢেকে রাখ্‌বো···আমি উপায়হীনা...আপনি আমায় রক্ষা করুন। আমি অবিবাহিতা কুমারী, একথা প্রকাশ হ'লে আর আমি লোক-সমাজে মুখ দেখাতে পারবো না...আমার বাবা লজ্জায় অপমানে মারা যাবেন!

সরোজিনী নেহাৎ ভালমানুষের মত বলিল,—এ সব কথা তোমার মার কাছে খুলে বলনি কেন? বোকা মেয়ে...এতো অনেকেরই হয়! মাকে বলে নবদ্বীপ কি কাশী চলে যাও! ছেলে হয়ে গেলে ফিরে এসো···এই কল্‌কাতা সহরে কে কার খবর রাখে! সকলে তো—

আমার মা নেই। বাবাকে এ কথা বলার চেয়ে বিষ খেয়ে মরা ভাল। বাবার আমার ওপর অগাধ বিশ্বাস... নেহাৎ ভালমানুষ বাবা...এ কথা লজ্জার মাথা খেয়ে তাঁকে কোনমতেই বল্‌তে পার্‌বো না!

সরোজিনী মাথা নাড়িয়া বলিল,...এ কাজ যার, তাকে বল। এখন তারই তো কর্ত্তব্য.....

যুবতী উত্তরহস্তে মুখ ঢাকিল। রুদ্ধকণ্ঠে বলিল,—তিনি অভাগীকে ফাঁকী দিয়ে চলে গেছেন। তিনি যদি বেঁচে থাক্‌তেন, তাহলে···

—মারা গেছেন? ক'দিন্?

—প্রায় চার মাস হল।

—আহাহা...যাক্...তুমি যদি আর দু'মাস আগেও আমার কাছে আস্‌তে···চিন্তিতভাবে সরোজিনী ভ্রূ-কুঞ্চিত করিল।

—আমি সাহস পাইনি, এ রকম যে হবে বুঝ্‌তে পারি নি!

—তা বটে! এই প্রথম বার বুঝি?...গোড়াতে এলে কোন গোলযোগ হত না। আমি একটা উপায় কর্‌তে পারতাম। সাতমাস! বড় দেরী হয়ে গেছে!

যুবতী সহসা উঠিয়া তাহার পায়ে পড়িয়া কাঁদিয়া বলিল,—আপনি আমার বাঁচান···দয়া করুন...আপনি ইচ্ছে কর্‌লেই পারেন। আপনি চেনেন বোধ হয়··· তাঁর কাছেই আপনার নাম শুনি! তিনি বল্‌লেন, তাঁর নাম কর্‌লেই আপনি···আপনি...

সরোজিনী চক্ষু কপালে তুলিয়া বলিল,—কি আমি এই নীচ কাজ করি, কোন বাঈজীর মেয়ে আমার নামে এ বদনাম দেয়? আমি তার নাম পর্য্যন্ত শুনিনি...আমি এ সবের কিছু জানিনে বাপু···তুমি বিদেয় হও!

—না, না...আমি—আপনার মেয়ে। আমার মান ইজ্জত রক্ষা করুন। আমার কোন অপরাধ নেই... আপনি যা চান, তাই দেবো...নইলে আমি বিষ খেয়ে মরবো...

এতক্ষণে সরোজিনীর মুখ প্রফুল্ল হইল। নৈরাশ্য ও ভীতি যত তীব্র হইবে, টাকার অঙ্কও সেই অনুপাতে বাড়িবে, ইহা সরোজিনী জানিত। 'ব্লাকমেল' দিতে সে সিদ্ধহস্ত···সে ডিগ্রোমাপ্রাপ্তা ধাত্রী!

পদতলে পতিতা যুবতীকে সে সস্নেহে তুলিয়া বসাইল। আদর করিয়া পিঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল,—আমি নিজে আর তো পারিনে মা...তোমায় দেখে বড় মায়া হচ্ছে, আমার জানা একজন ডাক্তার আছেন। কিন্তু অনেক টাকা...

যুবতী কাঁদিয়া বলিল,—কত টাকা? বলুন, যেমন করে পারি জোগাড় কর্‌বো!

সরোজিনী আপন মনেই বলিতে লাগিল,—তিনি ইচ্ছে কর্‌লেই পারবেন,...তুমি টেরও পাবে না...কিন্তু তিনি ৩০০৲ টাকার কম যে রাজী হবেন...

—আমি তিনশো টাকাই দেব...আপনি দয়া করে...

তা'হলে কাল সকালবেলায় একবার এসো...আমি খবর দেব'খন।

অস্বাভাবিক উত্তেজনায় আরক্ত মুখখানি তুলিয়া যুবতী কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিল। সরোজিনী তাহার হাত ধরিয়া বলিল...কেঁদোনা বাছা...কেঁদোনা...এমন অনেকেরই হয়...কত দেখ্‌লাম...তোমার কোন ভয় নেই। দু'চারদিনের মধ্যে সব ঠিক করে দেবো আমি...আমার কথা বিশ্বাস কর!

২

ডাক্তার ইউ, মিত্র চিন্তিতভাবে তাঁহার 'কন্‌সাল্টিং রুমে' বসিয়া আছেন, পার্শ্বে একখানি চেয়ারে বসিয়া সরোজিনী তাঁহাকে কেস্‌টা বুঝাইয়া দিতেছিল।

ডাক্তার মিত্র, গত ৪০ বৎসরকাল সহরের বুকে বসিয়া এই কার্য্য করিতেছেন, প্রচুর অর্থ, প্রকাণ্ড বাড়ী, মটর—সমাজে তিনি একজন গণ্যমান্য লোক। ভ্রূণহত্যায় তিনি "স্পেশালিষ্ট"—বিশেষজ্ঞ—একথা অনেকেই জানিত।

ডাক্তার মিত্র চিন্তিতভাবে বলিলেন,—তাইতো সাতমাস, ওষুধে কিছু হবে না, এ অপারেশান্ কর্‌তে হবে।

—তা' বৈ কি? আর আপনার হাতে কতক্ষণেরই বা মামলা।

দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া ডাক্তার কহিলেন,—জানতো সরো, আমি, নরেন যাবা যাবার পর থেকে নিজে হাতে ও কাজটা করি না। তাই বলছিলাম কি···

এ সংসারে ডাক্তার মিত্রের প্রচুর ঐশ্বর্য্য ছাড়া আর কিছু নাই। পুণ্যবতী পত্নী, স্বামীকে অযথা পাপ-ব্যবসায় হইতে নিবৃত্ত করিতে না পারিয়া বহু পূর্ব্বেই আত্মহত্যায় নিষ্কৃতি পাইয়াছেন। একমাত্র পুত্র, সেও ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে। সহস্র জীবনের ভ্রূণহত্যা যে অকম্পিত করে নিভাইয়া দিয়াছে, সে এই সংসারে মাত্র একটী জীবন দীপ জ্বালিয়াছিল,—কালের ফুৎকারে তাহা নিভিয়া গিয়াছে। শোক! অনুতাপ? ডাক্তার মিত্রের হৃদয়ে স্নেহ, মায়া, দয়া কোন কোমল বৃত্তি নাই। এ যুগের শিক্ষা ও সভ্যতা তাঁহাকে সমস্ত 'সেন্টিমেন্ট' হইতে মুক্তি দিয়াছে। অর্থ-লোভ ছাড়া আর কোন প্রবৃত্তি ডাক্তার মিত্রকে চঞ্চল করিতে পারে না। তবু কোন নূতন 'কেস' হাতে আসিলেই চকিতে একবার মৃত পুত্রের কথা মনে পড়িত

—কিন্তু নরেন তো আর ফিরিবে না—তাহার কেহ নেই... দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া ডাক্তার মিত্র আত্মসম্বরণ করিতেন।

এমন সময় 'জুনিয়র' ডাঃ রায় কক্ষে প্রবেশ করিলেন। ইনি ৪ বৎসর ডাঃ মিত্রের শিষ্যত্ব করিতেছেন। ইতিমধ্যেই পৈশাচিক নিষ্ঠুরতার গুরুর সহিত সমান তালে চলিতেছেন। আজকাল 'অপারেশন' বেশীর ভাগ ইনিই করেন, গুরু কেবল সাক্ষী থাকেন মাত্র। ইনি অস্ত্রচিকিৎসায় বিশেষজ্ঞ—পরের অঙ্গে ছুরী চালাইবার জন্ত, গর্ভস্থ ভ্রূণের সুকোমল অঙ্গ সুকৌশলে খণ্ড খণ্ড করিয়া বাহির করিবার জন্ত, সর্ব্বাগ্রে নিজের বুকে ছুরী চালাইয়া হৃদয়টা কাটিয়া বাদ দিয়াছেন, তাহা না হইলে নাকি ভাল 'সার্জ্জন' হওয়া যায় না।

ডাক্তার মিত্র ইহাকে 'কেস্‌'টা বুঝাইয়া দিয়া বক্রকটাক্ষে চাহিয়া বলিলেন,—কিহে, তুমি কি বল? অপারেশান ছাড়া অন্ত কোন উপায়ে···

তাচ্ছিল্যভরে মাথা নাড়িয়া ডাঃ রায় বলিলেন,—আর দেরী করা সঙ্গত নয়। যত দিন যাবে, ততই সঙ্গীন হয়ে উঠ্‌বে। আমার মতে...কেমন সরো, সেই দর্জ্জিপাড়ার কেস্‌'টা মনে আছেতো?

ডাক্তার মিত্র বলিলেন, আমার কিন্তু সন্দেহ হয়... যদি...

ডাক্তার রায় বলিয়া উঠিলেন, আমি তো কোন 'যদি' দেখ্‌ছিনে। সে সুন্দরী,—যুবতী; তার জীবনে অনেক সুখের আশা আছে, খামাখা ছেলের মা হয়ে কে ঝামেলা কর্‌তে চায় বলুন?

ডাঃ মিত্র হাসিয়া বলিলেন,—যুবতী ও সুন্দরী বলেই তোমার বুঝি এত আগ্রহ?

—না, ঠিক তা' নয়—এতো আমাদের 'প্রফেসান,' (ব্যবসায়) এতে এফিসিয়েন্সী (কুশলতা) না দেখাতে পারলে কেস্‌ আস্‌বে কেন?

—তাতো বটেই! তবে আমি বলি কি যে—

—অতো ভাব্‌তে গেলে কি আর আমাদের চলে? 'কেস্‌' হাতে পেয়েছি, মোটা 'ফি'—ব্যস্‌, চুলোয় যাক্‌ আর সব...আপনি ভাব্‌বেন না।

ডাক্তার মিত্র উঠিয়া দাঁড়াইয়া চলিতে চলিতে বলিলেন, তাই হোক্‌, তোমার বাড়ীতেই পরশু সকালে সব ঠিক করে রেখো। আমরা দু'জনে ৭॥ টায় সময় যাব।

৩

নিরূপিত সময়ে শয়তান-যুগল, শয়তানীর গুরুকে দেখা দিলেন, সরোজিনী পূর্ব্বেই সব ঠিক করিয়া রাখিয়াছিল। ডাক্তার রায় যুবতীর সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া অতিরিক্ত আগ্রহের সহিত তাহাকে সম্ভাষ্য অভিবাদন করিল; যুবতী তাহা লক্ষ্য করিল না; ডাক্তার মিত্রকে দেখিবামাত্র সে অস্ফুট আর্ত্তনাদ করিয়া ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া গেল। সরোজিনী তাহাকে সান্ত্বনা দিতে দিতে শয্যার উপর শোয়াইয়া দিল,—যুবতী, কোন কথা বলিল না,—তাহার চোখে মুখে ঘৃণা ও বিদ্রূপ যেন ঠিকরাইয়া পড়িতেছিল। ডাক্তার মিত্র একটু বিরক্ত হইয়া অস্ত্রশস্ত্রগুলি পরীক্ষার ছলে মুখ ফিরাইলেন। ডাক্তার রায় 'ক্লোরফর্ম' প্রয়োগ করিতে করিতে বলিল,—আপনি কোন ভয় করবেন না—এ আমরা অহরহ কর্‌ছি—আপনি টেরও পাবেন না...এর পর পুরস্কার দাবী করবো কিন্তু...

• • • •

৪

একমাস কাটিয়া গিয়াছে। একদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে ডাক্তার মিত্র তাঁহার কনসালটিংরুমে বসিয়া আছেন, এমন সময় যুবতী আসিয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিল।

ডাক্তার মিত্র কৃত্রিম দম্ভ বহির্গত করিয়া সহাস্তে বলিলেন,—নমস্কার, ভাল আছেন তো!

যুবতী হাসিয়া বলিল,—আপনার অনুগ্রহ!

কুশল প্রশ্নাদির পর যুবতী একখানি মোটা খাম ডাক্তারের সম্মুখে ধরিয়া বলিল,—দয়া করে নিন, অবসর মত—

—না, না, আমি আপনার কাছে আর কিছু চাইনি! আপনি তো উপযুক্ত 'ফি' দিয়েছেন।

যুবতী ব্যঙ্গভরে হাসিয়া উঠিল, ডাক্তার মিত্র অপ্রতিভ হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিলেন। এই নারী—নিজেকে জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আনন্দ পুত্রস্নেহ হইতে বঞ্চিত করিয়া সুখী ও নিরাপদ,—সংসারের আজ কি অবস্থা!

—আপনি ভুল কর্‌ছেন...ডাক্তারবাবু, একখানা চিঠি,

অবসর সময়ে পড়ে দেখ্‌বেন ;—যুবতী পুনরায় ক্রুর হাতে ডাক্তার মিত্রকে বিদ্ধ করিয়া বিদায় লইল।

একাকী চিঠিখানি হাতে করিয়া ডাক্তার মিত্র যুবতীর সুন্দর মুখখানি ভাবিতে লাগিলেন। সাতমাসের পুত্র—পূর্ণাবয়ব শিশু—তাঁহার কল্পনায় জীবন্ত হইয়া উঠিল... এই হতভাগিনী নারী অমন পুত্রের মা হইতে পারিল না··· আশ্চর্য্য!

আনমনে বামহাতি ছিঁড়িয়া ডাক্তার রায় প্রসারিত চিঠিখানির উপর—চোখ বুলাইতে লাগিলেন,—সন্ধ্যার মৃদু আলোকে ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া পত্রখানি পড়িবার চেষ্টা করিলেন। একি?—ডাক্তার উঠিয়া 'সুইচ্' টিপিয়া দিলেন। কম্পিতহস্তে চশমা পরিয়া চিঠির উপর ঝুঁকিয়া পড়িলেন।

ডাক্তারবাবু,

আমাকে লজ্জা ও অপমান থেকে আপনি রক্ষা করেছেন, সেজন্য আজীবন কৃতজ্ঞ থাক্‌বো। • • • আপনি আমাকে আরও সাহায্য করেছেন, যা আপনি ছাড়া পৃথিবীর আর কোন জীবিত মানুষের পক্ষে অসম্ভব। • • • ওঃ প্রতিহিংসা কি প্রবল প্রবৃত্তি—আমার আগে জানা ছিল না। যেমনি আপনাকে দেখ্‌লাম,—তখনি শিরায় শিরায় সে কি চাঞ্চল্য—প্রতিহিংসা প্রেমের মতই মধুর-মধুর, প্রতিহিংসার চরিতার্থতা প্রেমের মতই তীব্র-কামনার—আতঙ্কার! যাক্ সে কথা! আপনার পুত্র আমাকেই বিবাহ কর্‌তে চেয়েছিলেন,—আপনি ধনী, বড় লোক—তাই গরীবের মেয়ে বলে ঘৃণার সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন,—আমার বাবাকে ছেলেরা ব্রাহ্ম বলে অপমান করেছিলেন—মনে আছে বোধ হয়! বেশী-দিনের কথাতো নয়! আমি লজ্জার মাথা খেয়ে আপনার দয়াভিক্ষা করে পত্র লিখেছিলাম—আপনি উত্তর দিয়ে-ছিলেন—আমরা হিন্দু, কুলীন কায়স্থ...বিবাহ অসম্ভব! মনে আছে তো? কিন্তু অর্দ্ধেক রাজত্ব সহ রাজকন্যা ঘরে আনবার পূর্ব্বেই আপনি পুত্র হারালেন...আমারও কপাল পুড়লো! আপনার অর্থলিপ্সা ও অহঙ্কারের মূল-কারণেই না আমাকে পুত্রবলি...হয়তো তিনি বেঁচে থাকলে আমায় বিবাহ কর্‌তেন! কিন্তু কুমারীর সামাজিক সম্মান রক্ষার জন্য আমি যখন সরোজিনীর মরণ নিয়ে-ছিলাম, তখন জান্‌তাম না, আপনার মত একজন নাম-জাদা সার্জ্জনের এই ব্যবসায়...কি আশ্চর্য্য, চার মাস পূর্ব্বে একমাত্র পুত্র হারিয়েও আপনার চৈতন্য হয়নি! আমার গর্ভে যে এসেছিল, সে আপনার পুত্রের পুত্র না? আপনি স্বহস্তে আপনার বংশধরকে টুঁটী চেপে হত্যা করেছেন! ওঃ প্রকৃতির কি নির্ম্মম প্রতিশোধ! পাপের ফলে আপনি আপনার একমাত্র পুত্রকে হারিয়েছেন, তারপর, তা'হতে যে ক্ষুদ্র জীবনের স্ফুলিঙ্গটুকু—তাও আপনার প্রলয় ফুৎকারে নিভে গেছে...এ পাপের শাস্তি!! আপনাকে প্রথম দেখে আমি ভয়ে বিস্ময়ে আড়ষ্ট হয়ে গিয়েছিলাম। কলিকাতা সহরের খ্যাতনামা সার্জ্জন...অতুল আপনার ঐশ্বর্য্য, প্রতিষ্ঠা, যশঃ, আমার মত উপায়হীনার প্রতিহিংসা সাধনের কোন উপায় ছিল না—সে কথা আমার মনেও পড়েনি। এক রহস্যময় দৈব উপায়ে আমার প্রতিহিংসা চরিতার্থ হয়েছে! আপনি যেমন আমায় স্বামীসুখ থেকে বঞ্চিত করেছেন, আমিও আপনাকে তেমনি নির্ব্বংশ করেছি! আপনি ভগবান মানেন; না শয়তান মানেন, ডাক্তার বাবু?—ইতি

ডাক্তার মিত্র অবসন্নভাবে চেয়ারের উপর এলাইয়া পড়িলেন। মৃত পুত্রের স্মৃতিচিহ্ন—তাঁহার মনে পড়িল, সেই পূর্ণাবয়ব শিশুদেহ—তাঁহারই পৌত্র!! শিহরিয়া ডাক্তার মিত্র আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেন—আ—হাহা! আমার বংশধর—আমার অজ্ঞাত উত্তরাধিকারী আমার পুত্রের পুত্র—সেই স্বর্গীয় জীবনের উন্মেষটুকু নির্ম্মমহস্তে ছিঁড়িয়া ফেলিতে একটুও বেদনা পাই নাই তো—আজ... আজ আমি নির্ব্বংশ!! এক অন্তহীন নৈরাশ্যের মধ্যে অতীত ভবিষ্যৎ হারাইয়া জীবন্ত শয়তান জীবন-সায়াহ্নে প্রথম আঘাত পাইল।

আত্মোৎসর্গ ও কায়োৎসর্গ

[শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ]

যে শক্তি কায়া পরিত্যাগ করিলে আমরা তাহাকে মৃত আখ্যা দিয়া থাকি বেদান্তের তর্ক পরিত্যাগ করিয়া তাহাকেই আত্মা বলিয়া লওয়া যাইতে পারে। আত্মনের সহিত জীবনের পার্থক্য আছে কিনা সে তর্ক অনাবশ্যক। যে শক্তি দেহ নামক জড়পিণ্ডটাকে তন্মধ্যে বাসকালে চেতন ও গতিশীল করিয়া রাখে স্থূলভাবে সেই শক্তিটাই আত্মা। সৃষ্টি প্রক্রিয়ার সোপানাবলীর অতি নিম্নেও সে শক্তির সহিত চেতনার সম্বন্ধ আছে এবং উচ্চতর সোপানাবলীতে চেতনাই সেই শক্তিকে উদ্বুদ্ধ করে। বিশ্বস্রষ্টার সৃষ্টি প্রক্রিয়ার সর্ব্বোচ্চ-সোপান-পরিস্থিত যে জীব তাহাই মানব এবং মানবের বিশেষত্ব তাহার চেতনার বিশিষ্ট অভিব্যক্তি। মানব-সমাজের ওর বিশেষে প্রবুদ্ধ মানব ঔচিত্য বিচার করিয়া থাকে। সৃষ্টির-সোপানের দ্বিতীয় স্তরে দীর্ঘাকার বানর যে একেবারে ঔচিত্য বিচার করে না তাহা নহে। কিন্তু মানব চেতন অবস্থায় প্রতি পদ বিক্ষেপে ঔচিত্য বিচার করিয়া চলে, এই ঔচিত্য বিচার মানবের স্থিতির সহিত অতি ঘনিষ্ট-রূপে সংশ্লিষ্ট তাহা পরিত্যাগ করিয়া মানব জগতে ও সমাজে তিষ্ঠিতে পারে না। জীবের গন্তব্য পথের সম্মুখে যদি অগ্নি থাকে তাহা হইলে সৃষ্টির উচ্চতম সোপানের সমস্ত জীবই বিবেচনা করিয়া দেখে যে পথে তাহার যাওয়া উচিত কিনা, সে পথে চলিতে হইলে ক্ষতি ও বৃদ্ধির সম্ভাবনা কতদূর,—সর্ব্বোচ্চ সোপানের নিম্নের জীব-গুলি বনবাসকালে বাড়বানল সম্বন্ধে যেমন ঔচিত্য বিচার করিয়া থাকে মানব তেমনি জীবনের প্রতি পদে প্রাগ্-ঐতিহাসিকযুগ হইতে বর্ত্তমানকাল পর্য্যন্ত চেতন অবস্থায় প্রতিমুহূর্ত্তে ঔচিত্য বিচার করিয়া থাকে।

নিত্য যাহা করি যাহা না করিয়া এক পদ চলিতে পারি না সহসা তাহাতে অধীর হইয়া পড়িয়াছি কেন? আধুনিক সাহিত্যের কৈফিয়তে পরম প্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছেন—"সেই ভাল মন্দ, সেই উচিত অনুচিতের প্রশ্ন; শুধু এই উচিত অনুচিতই রোহিণীকে গোবিন্দলালের পিস্তলের লক্ষ্য করিয়া দাঁড় করাইয়াছিল। যেখানে ভালবাসা উচিত নয় সেখানে ভালবাসিবার অপরাধ যতই হোক,—বিশ্বাসহন্ত্রীর চেয়ে বড় অপরাধ মৃত্যুকালে হতভাগিনীর কপালে বঙ্কিমচন্দ্রকে দাগিয়া দিতেই হইল। (বঙ্গবাণী, শ্রাবণ ১৩৩০, পৃঃ৬৮৫)

'ভালমন্দ' অর্থাৎ উচিত অনুচিতের প্রশ্ন পরিত্যাগ করিয়া চলা যায় কি? শরৎ বাবুই কি সকল সময়ে ভালমন্দ বিচার ছাড়িয়া চলিতে পারেন? তর্কের খাতিরে তিনি মুখে একটা কথা বলিলেও তাহা বিশ্বাস করা যায় না। নিত্য জীবনের এই কঠোর সত্য মানিয়া চলিতে আধুনিক সাহিত্যসেবীর এত আপত্তি কেন? যাহা সুন্দর তাহা সকল সময়ে সুন্দর নহে, ইহা মায়াবাদের কথা নহে—ইহা প্রত্যক্ষবাদীর নিত্য জীবনের কথা। একটা বীভৎস দৃষ্টান্ত দিয়া তাহা বুঝাইতে হইবে—আসব-রক্তনেত্রা প্রায়-বিবসনা বক্ষ নাসিকা ভল্লুকের নিকট যত সুন্দর সেই নায়কের নিকটে মাতৃত্ব লাভ করিলে সেই একই নায়িকার ছিন্ন বসন ও মলিন ধূলিযুক্ত নেত্র তেমন সুন্দর নহে। ভাবও পরিবর্ত্তনে সুন্দর হইতে পারে, অর্থাৎ আসবপানে নায়কের মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটিলে তিনি সন্তানের মাতাকে কাম্য বস্তু জ্ঞানে পূর্ব্ব প্রেমের অভিজ্ঞানে সুন্দর দেখিতে পারেন কিন্তু স্ব-ভাবের স্বভাবে তাহা নিত্য সুন্দর নহে। অথচ বসন্তকালে সর্ব্বজীবের প্রেমাভিযানের সময়ে নগ্না নায়িকা সুন্দরী এবং অতীত-বসন্তে পূর্ণবসনা মাতৃমূর্ত্তি সমস্ত জগতের নিকট সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দরী।

আধুনিক সাহিত্যের কৈফিয়তে ফিরিয়া গেলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, বর্ত্তমানকালে ঔচিত্য বিচারে অসহিষ্ণুতার কারণ সাহিত্যসেবীর সহিষ্ণুতার অভাব, ধৈর্য্যধারণে অসামর্থ্য এবং অতিরিক্ত লোভ। সাহিত্যসেবী বোধ হয় বিস্মৃত হইতেছেন যে, মিষ্টান্নে মিষ্টত্ব থাকিলেও ঔদরিক অবস্থান্তরের পরে তাহা বিষবৎ, সর্ব্বকার্য্যে মাত্রাভেদ প্রয়োজন। প্রয়োজনানুসারে মাত্রা প্রয়োগ করিতে হইলে ঔচিত্য অনুচিত বিচার প্রয়োজন সুতরাং আধুনিক বাঙ্গালী সাহিত্যসেবীও ঔচিত্য বিচার অবহেলা করিয়া

চলিতে পারেন না। আধুনিক সাহিত্যের বৈকিয়তে পরম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত পরমেশ লিখিয়াছেন,—"একজিকে ঘাটাইয়ার ওজন করিয়া সাহিত্যের মূল্য নির্দ্দেশ করিতে গেলে কি হয় তাহার একটা উদাহরণ দিতেছি। একটু বাদ্রি ব্যক্তিগত হইলেও আমাকে আপনারা ক্ষমা করিবেন। পত্নীসমাজ বলিয়া একটা প্রশ্ন আছে। তাহাতে বিদ্যা রমা রমেশকে জানবাসিয়াছে দেখিয়া দেখিয়া একজন প্রবীণ সাহিত্যিক ও সমালোচক সাহিত্যের খাতা হাতে লইয়া এইরূপে রমাকে তিরস্কার করিয়াছেন—তুমি না অত্যন্ত বুদ্ধিমতী, তুমি বুদ্ধি বলে পিতার জমিদারী পাশন করিয়া থাক, কিন্তু নিজের চিত্ত দমন করিতে পারিলে না? তুমি একমুহূর্ত্ত সতর্ক থে রমেশের চাকরের বয়স পুনিশে তাহারী করাইয়া রাখিলে অথচ তুমি শিব পূজা কর তাহার সার্থকতা কোথায়? তোমার এই পতন নিতান্তই ইন্দ্রাকৃত। এই অভিযোগের কি কোন উত্তর আছে—বিশেষ করিয়া সাহিত্যিক হইয়া সাহিত্যিককে বাঁহারে রমন এমনি করিয়া জবাবদিহী করিতে চায়?"

বিবেক বুদ্ধি এবং উচিত্য বিচার সম্বেও প্রবৃত্তিবশতঃ অসবর্ণা বিবাহ অত্যন্ত কোন দেশেই নাই। যে নারী পতি বর্ত্তমানে অথবা অবর্ত্তমানে অন্যাসক্তিনী হয় সে সাধুসমাজে ঘৃণিতা বা পুনর্ভূ। দেশে এমন বিন ছিল যখন পুনর্ভূ'র পুত্র পৌনর্ভবী পুত্র হইয়াও নিজ সম্পত্তির অধিকার লাভ করিত। যেমন, পুত্রিকা পুত্র এবং অন্যান্য অনেক আরও অনেকগুলি পুত্র ছিল যাহারা এই হিন্দু সমাজেই স্থান লাভ করিয়া যাইত, যেমন বিবাহের পূর্ব্বে স্ত্রীর গর্ভজাতপুত্র তাহার নাম সহোঢ়, অবিবাহিতা স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্র, কন্যাকালে জাত বলিয়া তাহার নাম কানীন, স্বামীর নিরোগ অনুসারে বিবাহিতা পত্নীতে অথবা স্বামীর অনোচরে অন্য পুরুষের দ্বারা জাতপুত্র, স্ত্রী স্বামীর অনিচ্ছায় দেবর বলিয়া তাহার নাম দেবর, স্বামী বর্ত্তমানে বা অবর্ত্তমানে যে স্ত্রী পরপতি গ্রহণ করে সে পুনর্ভূ'র হয় বলিয়া তৎগর্ভজাত পুত্রের নাম পৌনর্ভব, স্বেচ্ছাবিবাহজাত পুত্রের নাম পারশব। এই সকল পুত্র শিক্ষাবিহীনা এবং সম্পত্তির উত্তরাধিকারী ছিল, ইহা ঔপন্যাসিকের কল্পনাপ্রসূত নহে, ঐশ শিক্ষা সমন্বিত কোন পাশ্চাত্য ইহাদের পুরুষ অস্বীকার করিতে পারিবেন না অথচ ইহারা এখন পুত্র নয় কেন? এখনও কি অবিবাহিতা কন্যার পুত্র হয় না, বা বিধবার গর্ভসঞ্চার হয় না। হিন্দু সমাজে কি সকলেই নারীর বিবাহের পূর্ব্বে পাওয়া যায় না,—না হওয়ায় পুত্র পিতাকে পিণ্ড সম্বোধন করে না? অথচ সমাজ দেখিয়া জানিয়া ইহাদের প্রাচীন পুরুষত্ব কেন অস্বীকার করে কেন? ইহাদের ঔচিত্য বিচার সমাজের উপর নির্ভর করে তাহা রাজশাসনের উপরেও নির্ভর করে না। প্রাতঃস্মরণীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এই দেশেই বালবিধবার দুঃখে কাতর হইয়া বিধবা বিবাহ পুনঃ প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। সমস্ত বাধা বিপত্তি সত্ত্বেও তাহা রাজ বিধিই বিধিতে পরিণত হইয়াছিল কিন্তু তাহা চলিয়াছে কি? স্বামীজী বিদ্যাপতি তত্ত্ব আত্মতত্ত্বে মুখোপাধ্যায় বালবিধবা কন্যার বিবাহ দিয়া যে সৎসাহসের পরিচয় দিয়াছিলেন বাঙ্গালা দেশে কয়জন তাহার অনুকরণ করিতে সমর্থ হইয়াছে? কেন হয় নাই? বিদ্রুপকারী বলিবেন, বিধবা বিবাহ এ দেশে চলে নাই হিন্দুর শিক্ষার দোষে, পক্ষপাতী হিন্দু সমাজের রক্ষণশীলতার দোষে। কিন্তু তাহা সত্য কি? উচিত অনুচিত বিচার করিয়া দেখিতে গেলে স্পষ্ট করিয়া মনের কথা খুলিয়া বলিতে গেলে, সত্যকথা মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিতে গেলে বলিতে হয় যে, পুনর্ভূ অর্থাৎ পুনর্বিবাহিতা বিধবা শিক্ষিত ও অশিক্ষিত হিন্দুর আদর্শের সহিতে মেলে না বলিয়া বিধবার বিবাহ চলে নাই। ইহাতে নারীত্বের আদর্শ ক্ষুণ্ণ হয় নাই—নারীত্বের যে আদর্শ নির্দ্দিষ্ট করিয়া আমরা তাহাকে এতদিন পূজা করিয়া আসিয়াছি, সতীত্বের যে মর্য্যাদা ভারতবর্ষে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহাকে কোন দেশে তাহা হয় নাই বলিয়া হিন্দুর সমাজের এই আদর্শ পাশ্চাত্য জগতের নিকট বিরুদ্ধ, মাত্র পাশ্চাত্য শিক্ষাভিমানীর নিকট নিন্দিত ও কঠোর ও হিংসার অভাবে প্রকৃত নারীত্ব ও সতীত্বের আদর্শ নয়। প্রকৃত নারীত্ব বনাম সতীত্বের মামলা পরবর্ত্তী অধ্যায়ে উপস্থিত করিতে হইবে বলিয়া এ প্রবন্ধের আকার বর্দ্ধিত করিলাম না।

যে ঘরে ঘনিয়াছিল যে আত্মা কায়া পরিত্যাগ করিয়া আবার ফিরিয়া আসিতে পারে তাহা নির্ণীত হয় নাই। কোন জ্ঞানী ঘরে আগোর অন্তরে বিজ্ঞাপন করিয়াছিল যে কায় ক্লেশ অতিক্রম করিয়া আত্মা ঊর্দ্ধে উত্থিত হইতে পারে তাহাও অদ্যাপি নির্ণীত হয় নাই কিন্তু সর্ব্বজ্ঞ এক দিন না একদিন বিজ্ঞাপিত হইয়াছিল যে কায়া আত্মার সম্পত্তি তাহা জড় এবং তাহার কোন শক্তি নাই। ইতিহাসের ছত্রে ছত্রে অঙ্কিত হইয়া আছে যে পাশব শক্তি আত্মাকে বশীভূত করিতে পারে কিন্তু আত্মিক শক্তি কখনও আত্মার পরাজয় হয় না এই কথাটী আমরা যখন বিস্মৃত হইয়া যাই তখনই আত্মার আদর্শ নারীত্বকে কায়ার আদর্শ নারীত্বের নিম্নে বসাইতে চাই। বিষয় হয় যে অপর পুরুষকে জানবাসিয়াছিল তাহা জান কি মন তাহা বিচার করিয়া দেখিতে পারে দুইজন। প্রথম দেখে সমাজ কারণ যদি সহস্র সহস্র নরনারীর মত সমাজ শাসনে আবদ্ধ সে শাসনের গণ্ডীর মধ্যে বাস করিতে হইলে তাহাকে সমাজের শাসন অনুসারে চলিতে হইবে, কেবল রাজশাসন মানিলেই চলিবে না কারণ এ বিষয়ে সমাজ রাজা অপেক্ষা প্রবল। সে কথা বিচার করিতে পারে মন যদি সে যদি সমাজের শাসন না মানিয়া ব্যবহার গণ্ডীর সমাজের মধ্যে বাস করিতে না চায় তাহা হইলে তাহার দেহটী সে কি ভাবে ব্যবহার করিবে সে বিচার শক্তি তাহার সম্পূর্ণ আছে। সাহিত্যের আলোচনার যাহা করিতে গিয়া হিন্দুসমাজের পক্ষপাতী সমালোচক যারা বলিয়াছেন সমাজ হয়তো তাহাও মানিয়া চলিবে না কারণ যৌনমিলন স্থির রাখিয়া সমাজের অন্তর প্রয়োজনীয়তা অনুসারে নিত্য পরিবর্ত্তিত হইতেছে অন্ত সমাজ প্রকাশে সে পরিবর্ত্তন সত্য বলিয়াও স্বীকার করে না। আর অস্বীকার করিতে পারে মন নিজে কারণ ইংরাজ রাজার আদালত কেন্ ম'র বিধান বিধাতেন যে স্ত্রীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিবাহিত স্বামীও তাহার সহিত বাস করিতে পারিবে না। ইংরাজ রাজার সর্ব্বোচ্চ আদালত বিধান দিয়াছেন যে বিবাহ কর্ত্তব্যিক হইলেও সে স্বামীর সম্পত্তির অধিকারিণী এবং স্বামীর জীবদ্দশায় পুনর্ব্বিবাহ গ্রহণ করিলেও নারী নিজ সম্পত্তি হইতে বঞ্চিতা হয় না।

এত বিধি ও বিধান সত্ত্বেও পুরুষান্তরগামিনী নারীকে হিন্দুসমাজ গ্রহণ করে না কেন? তাহা সমাজের রক্ষণশীলতাও নহে শিক্ষার অভাবও নহে। অনেকের সহিত বিচার করিয়া দেখিয়াছি যে তাহার একমাত্র কারণ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সতীত্ব ও নারীত্বের আদর্শের বৈষম্য। পরপুরুষে কায়া নিয়োগ করিলে যে দোষ হয় সমাজ তাহা একবাক্যে ঘৃণা করিয়া আসিতেছে, এখনও করে। গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে পুরুষের পরস্ত্রীগমনের ন্যায় নারীর পরপুরুষের দৃষ্টান্তের অভাব নাই, পুরুষের পরস্ত্রীগমনে যে সমাজ নাশে যে কারণপরম্পরার প্রয়োজন যে সমস্ত ঘটনার আবশ্যক নারীর পরপুরুষ গমন হইতে তাহার এক চতুর্থাংশেরও প্রয়োজন হয় না। অথচ পুরুষ পরস্ত্রীগামী নারীর চরিত্র কাহিনী গোপন করিয়া রাখে। কেন রাখে তাহা হিন্দুর সমাজের সহস্র সহস্র কন্যার পিতা পত্নীর পতি ও মাতার পুত্রকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখ। যে দেশে ভরদ্বাজকার প্রকাশ্যে বলিতেন যে তাহার গোপন রাখিবে কেমন করিয়া?—সেখানে করিয়া পুত্র মাতার উপপতির কথা গোপন করে। 'গোপনে যাতু ভারবং'

পুরুষ কেন গোপন করে? কেবল জনসমাজের চক্ষুর অগোচর করিয়া রাখে না সর্ব্বপ্রকারে নারীর কলঙ্ক কথা ও তাহার দুর্ব্বল চিত্তের কথা তাহার দৃঢ় বাহুপাশের বেষ্টনের মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখে? কেন রাখে, সমাজ তাহাকে দায়ী করা সত্ত্ব করিয়া একথা গোপন করিতে কেন বাধ্য করে তাহা উচিত অনুচিত বিচার না করিলে কেমন করিয়া বোঝা যাইবে? দেশাচার ও কুলাচারের পার্থক্য ছাড়িয়া দিলে হয়তো একথা গোপনীয় নহে কিন্তু দেশের সমাজগত আচার ও ব্যবহার যুক্তিপথে সর্ব্বদা উচিত থাকিলে উচিত্য বিচারের বিলয় হইবে না। আমাদের নারীত্ব ও সতীত্বের আদর্শে প্রভেদ আছে। তারা নারীত্ব কিন্তু স্ত্রী পুরুষ ভেদে আত্মার বৈষম্য নাই ইহা কেবল আমাদের দেশের কথাই নহে যে দেশে ক্রমাগতবাদ প্রচলিত আছে সেই দেশেই এই কথা প্রমাণ্য। তারা আত্মার সম্পত্তি প্রাচীন খৃষ্টীয় সাধুগণও তারতীয় আর্য্য দর্শনের অনুসারে 'Mortification of the Flesh' অভ্যাস করিয়া কায় কর্তৃক (Lust of the

Flesh) নিবারণ করিতেন। স্বেচ্ছাচার বহুল সমাজে প্রাচীন ও আধুনিক যুগে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য জগতে নর নারীকে আত্মার উচ্চ আদর্শের কথা বিস্মৃত করাইয়া দিয়া কাম কণ্ডুতিতে অভিভূত করিয়া রাখিয়াছিল কিন্তু জগতের ইতিহাসে প্রাচ্যে ও প্রতীচ্যে এই বহুল কাম কণ্ডুতির যুগ কি স্থায়ী না হেয়? দেখিয়া জানিয়া অতীতের দৃষ্টান্ত চক্ষুর সম্মুখে রাখিয়া আমি কোন পথে চলিব তাহা বিচার করা উচিত না আমার মিষ্ট লাগে বলিয়া বহুমূত্র রোগ সত্ত্বেও প্রচুর পরিমাণে মিষ্টান্ন ভোজন উচিত? শরচ্চন্দ্রের শ্রীকান্তের প্রথম পর্ব্বের অন্নদা যিনি স্ত্রী সমাজের অলঙ্করণীয়া না দ্বিতীয় পর্ব্বের রোহিনী 'দাদার' প্রেম মুগ্ধা অভয়া আমাদের আদর্শবন্ধ হওয়া উচিত?

সকল সময়ে সকল স্থানে একই জিনিস সুন্দর নহে। অন্নদা কেবল পতিগতচিত্তা হইয়া সর্ব্বার্থ কামমন তাহার সেবায় নিয়োজিত করিয়াছিল বলিয়াই কি মানসপটে সে সুন্দরী না কামমনোসংযমের জন্য পাত্রাপাত্র বিচারের জন্য অস্পৃশ্য বিধর্মী কদাকার কদাচারী পুরুষের সার্ব্বজনীক অনুগমনের জন্য শ্মশানের পার্শ্বে কাল ব্যাল সুশোভিত জীর্ণকুটীর প্রাঙ্গনে তাহার অমর লেখনী গৌড়ীয় সাহিত্য অন্তর্ভূত করিয়া ফেলিয়াছে? অন্নদার সহিত অভয়ার তুলনা করিলে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে অভয়ার স্বামীর কথা নিতান্ত বিশ্বাস নহে সে কাম কণ্ডুতির বশীভূত হইয়া পুরুষান্তর গ্রহণ করিয়াছিল। অন্তঃপ্রাণ স্বামী তাহা জানিয়া তাহাকে গ্রহণ করে নাই এবং সে অবস্থায় সে স্বামীর পদস্খলিতা পত্নীর অঙ্গে ক্ষণাঘাত নিতান্ত স্বাভাবিক। অভয়া যে ভাবে রোহিণী দাদার সঙ্গে পতি অন্বেষনে আসিয়াছিল সে ভাবটা অনেকটা মন্ডেল ভগিনীর পত্নীর শুশ্রূষার ভাব। কবি কেবল কান্ত কথার পাঠকের ভাব বিপর্য্যয় ঘটাইয়া কলঙ্কিনীকে আত্মনিভরের স্বর্গের আশ্রয় প্রদান করিয়াছেন। অভয়ার কায়োৎসর্গ আত্মোৎসর্গ নহে তাহা প্রবৃত্তি দমনে সামর্থের অভাবের জন্য পুরুষান্তর গ্রহণ। পাশ্চাত্য আদর্শে তাহা সুস্পষ্ট নারী চিত্র হইলেও কলা কুশল কবির সহস্র বাধা বিপত্তি সত্ত্বেও তাহা অসতীর চিত্র। কিন্তু একই কবির চিত্রিত দেবদাসের পার্ব্বতীর তুলনায় সে মসি মলিনা। পতি বর্ত্তমানে প্রথম নায়ক দেবদাসের চরণপ্রান্তে স্বেচ্ছায় উৎসর্গীকৃতা পার্ব্বতী বিবাহের পরেও দেবদাসের চিত্র চিত্তে সুচিত্রিত রাখিয়া সতী। এই স্থানে হয়তো আমার মতির সহিত সমাজের মতদ্বৈধ ঘটিবে কিন্তু প্রকৃত আদর্শ ধরিয়া বিচার করিতে গেলে সাধনাদ্বারা সর্ব্বসম্পদসেবিতা হৃত-ভাগিনী পার্ব্বতী প্রকৃত সতী, শ্রীকান্তের প্রথম পর্ব্বের অন্নদার মত সতী। কবি যে ঔচিত্য বিচার অনাবশ্যক মনে করিয়াছেন বিচার করিয়া দেখুন তিনি তাহা ব্যবহার করিয়াছেন কি না।

কথা সাহিত্যে সতীত্বের মর্য্যাদা ও নারীত্বের মূল্য সে একদিন বিংশতি শতাব্দীর প্রথম পাদে বাঙ্গালা দেশের সমাজের প্রকৃত চিত্র বলিয়া গৃহীত হইবে, ইতিহাস সে একদিন এই চিত্র প্রত্যক্ষ প্রাকৃতিক চিত্র বলিয়া তদনুসারে সমাজের ঔচিত্য বিচারের মূল্য নির্দ্ধারণ করিবে সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহাই কি সত্য? অধঃপতিত প্রবৃত্তি বলে নিবৃত্তিমার্গচ্যুত প্রজ্ঞাপরমীতিনির্দ্দিষ্টমার্গ অনুসরণকারী বিংশতি শতাব্দীর বাঙ্গালা দেশের হিন্দু-সমাজ তাহার উত্তর দেয় না কেন? সে সমাজ নির্ব্বিষ ভুজঙ্গের মত কাম-সুখকামী সাহিত্যসেবীর লেখনীর আঘাত নির্ব্বিবাদে সহ্য করে কেন? এ প্রশ্নের উত্তর দিবার অধিকারী কি কেহ নাই? বর্ত্তমান হিন্দুসমাজে কি প্রকৃত পুরুষ নাই? স্বার্থত্যাগ ও আত্মত্যাগ কি কথাসাহিত্যের পত্রাঙ্কেই পর্য্যবসিত হইয়াছে? প্রাচ্য নারী কি প্রাচীন আদর্শ বিস্মৃত হইয়া বহু বর্ণে চিত্রিত পাশ্চাত্য নারীত্বের দুষ্প্রাপ্য দ্রাক্ষাফলের লোভে উধাও? আমার ঘরে আমার সমাজে আমার নিজের চোখ দিয়া দেখিলে প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইবে দৃষ্ট ও অদৃষ্ট কলঙ্ককালিমা রেখার মধ্যে মহীয়সী মাতৃমূর্ত্তি এখনও অক্ষুণ্ণ। বৈষ্ণব কবি-বিরিঞ্চি প্রেমের আদর্শ ত্রিবিধ এখনও প্রাচীন প্রাচ্যের গৌরব গরিমায় উদ্ভাসিত; প্রতীচ্যের বাত্যাতাড়িত কশাঘাত তাহার পবিত্র পাদপীঠ স্পর্শমাত্র করে নাই। যে দেশে মাতা ভগিনী ও কন্যা অমরত্ব লাভ করিয়াছিলেন সে দেবত্বের ভাব পাশ্চাত্যের অপ্রাকৃত আলোকেও মধ্যাহ্নমার্ত্তণ্ড-দীপ্ত দিবসের ন্যায় অমলিন। তাহা সত্য কি না নিজের মাতা ভগিনী ও কন্যার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বিচার করিও। তাঁহারা আত্মার বলে কামকে জয় করিয়াছেন কি না, তাঁহাদিগের দৃষ্টান্তে কামসুখকামিনী পদস্খলিতা নারী পাশ্চাত্য নারীত্বের মোহ মহিমা বিস্মৃত হইয়া প্রকৃত সতীত্বের আদর্শ চিনিয়াছে কি না তাহা নিজের সমাজের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখ। তাহার পর, হে জড় নিশ্চল সমাজ এক মুহূর্ত্তের জন্য চিরনিমীলিত নয়ন উন্মেলন করিয়া বিচার করিও কোন্‌টা উন্নত কোন আদর্শ উর্দ্ধে স্থিত—কে মনের প্রাণ বিমোহন করে—কায়োৎসর্গ না আত্মোৎসর্গ?

ধ্যেৎ

(ছোট গল্প)

[শ্রীদেবী মুখোপাধ্যায়]

সন্ধ্যার আবছা অন্ধকারটা যেন একটু ঘন আঁধার ধারণ করেছিল। টেবিল ল্যাম্পটা জেলে দিয়ে যতীন রমেনকে ডেকে বলল—"ওহে একটা গল্প বল শুনি।" ঘরের ভিতরকার অপর সবাই সেই সঙ্গে মহা উৎসাহিত হয়ে বলে উঠল "বল বল।" রাস্তার নির্দোষ লোককে অন্যায় জুলুম করে হঠাৎ ধরে ফেলে যেমন হয়, সেই রকম কিছুত কিমাকার, হতভম্ব অবস্থা প্রাপ্ত হয়ে রমেন একটু করুণ সুরেই বলে উঠল—কি গল্প আর বলব ভাই তোমাদের কাছে। সে ব্যাঙমা ব্যাঙমীর গল্প বা রাজ-পুত্তুরের গল্প তোমরা শুনবে না নিশ্চয়। সকলে সমস্বরে বলে উঠল,—নিশ্চয় নয়, নিশ্চয় নয়—" "তবেইত মুস্কিল' —বলে রমেন খানিকক্ষণ চুপ করে রইল। একজন বলে উঠল—আচ্ছা যা হয় একটা বল—"

রমেন প্রসন্ন মুখে বললে—তবে শোন,—

—প্রকাণ্ড এক বটগাছের তলায়, পাড়ার মধ্যে যারা একসঙ্গে খেলা করত, তার মধ্যে তাদের দুজনার ছিল বড় ভাব। এক পাড়ারই দুই প্রান্ত থেকে তারা দুজনে এসে জুটতো। সারা দিনের অনেকখানি সময়ই, তারা দুটিতে দুজনার মধ্যে একজনার বাড়িতে গিয়ে হাজির হয়ে, খেলায় আর গল্পে কাটিয়ে দিত। সৌন্দর্য্য তাদের দুজনের শরীরেই মোহন শ্রী ফুটিয়ে তুলেছিল; কোঁকড়ান কোঁকড়ান চুলগুলি, তাদের একজনের সুন্দর মুখখানির ওপর এসে পড়েছিল। আর একজনের সুন্দর ভাসা ভাসা চোখ দুটি, বিশ্বের সৌন্দর্য্য তাহার লুণ্ঠন করে, তার সুন্দর কান্তিকে আরও মনোরম করে তুলেছিল। তাদের বাড়ীর অভিভাবকেরা, তাদের দুটির এই অবাধ মিলন দেখে বিশেষ আনন্দ উপভোগ করতেন। এই দুখানি বাড়ীর মধ্যে রাজনীতির বিদ্বেষ যেন কখনও না ঘটে, এই ছিল তাদের ঐকান্তিক অভিলাষ।

বর্ষণক্লান্ত আকাশের সূর্য্যকিরণের মত সেদিন সকালে আলোর বিচিত্র খেলা আকাশে ছড়িয়ে পড়ে ধূসর মলিন নানা রং সাজাগিকেই একটা সৌন্দর্য্যের লহর তুলেছিল। সূর্য্যের কিরণ প্রখর হলেও,বাতাস তখনও যেন স্নিগ্ধতাই দান করছিল। এমনি একটা সকালে তারা দুজনে এসে জুটেছিল, তুলে ভরা মস্ত এক গাছের তলায়। রূপার টুকরার মত ধব-ধবে সাদা ফুল, গাছের তলায় বিছিয়ে পড়েছিল। গাছের ওপর তোমরা আর মৌমাছিরা নাচতে নাচতে আনন্দের গান গাইছিল। পাখীরা সব গাছের মাথায় বসে আনন্দের সুর ছড়াচ্ছিল। এমনি একটা মধুর ক্ষণে, তারা এল সেইখানে ফুল কুড়ুতে। তাদের মধ্যে যে ছিল ছোট, সে এনেছিল লুকিয়ে, তার দিদির পূজার ফুল তোলার বড়, সুন্দর সাজিটি।

একবার প্রাণখোলা মিষ্টি হাসি হেসে সাজিটি গাছের তলায় রেখে তার কোঁকড়ান চুলগুলি কপাল থেকে সরিয়ে দিয়ে, ছোটটি অপরের মুখের পানে চেয়ে বলল—দুজনে মিলে ফুল কুড়িয়ে এই এক সাজি করব, কেমন? যার উদ্দেশে বলা হল; সে একটু প্রসন্ন মুখে হাসতে হাসতে বললে—আচ্ছা তাই হবে, এখন তাড়াতাড়ি ফুল কুড়োতে আরম্ভ কর দেখি। এই বলে সে ব্যস্তসমস্ত হয়ে ফুল কুড়োতে লাগল।—"

এই পর্য্যন্ত বলেই, রমেন হঠাৎ চুপ করল। যতীন বলে উঠল—তারপর?

—তার পর আর তেমন কিছু ঘটে নি—সেদিন তারা বাড়ী ফিরে সেই ফুল দুজনে ভাগ করে নিলে; তারপর তারা—"

রমেনের কথায় বাধা দিয়ে আর একজন হেসে বলে উঠল "তারপর আর কি—দুজনে মালা গেঁথে পরস্পর গলায় পরিয়ে দিলে এই ত?"

তার জিজ্ঞাসু চোখের দিকে চেয়ে, একটুখানি চুপ করে থেকে রমেন বললে—"না তার কিছুই ঘটে নি,—কেননা তারা কুড়চ্ছিল সমনা ফুল,—আর যে দুটি ছেলে কুড়চ্ছিল ও রকম রোমান্স তখনও তাদের মাথায় গজিয়ে ওঠে নি।

"ধ্যেৎ". বলে অটল একখানা নভেল নিয়ে আলোটার দিকে এগিয়ে বসল। ঘরখানা তারপর কিছুক্ষণের জন্য নীরব হয়ে রইল।.....

কিশোর-কিশোরী

(সমালোচনা)

[শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার]

কিশোর-কিশোরী—একটা কবিতা। একখানি পুস্তকে সন্নিবদ্ধ। অনেকগুলি ইতি-কবিতার সমাবেশে যেরূপ কাব্যগ্রন্থ আমরা সম্প্রতি সচরাচর দেখিতে পাই,—কিশোর-কিশোরী সে শ্রেণীর এক কিম্বা একাধিক কবিতার সংগ্রহ পুস্তক নহে।

ইহা একটা বড় কবিতা। কিন্তু ইহাকে শুধু কবিতা বলাও চলে না। ইহাকে একটা ছোট গল্পও বলা যাইতে পারে। সব গল্পের গঠন এক নয়। সব কবিতার গঠনও এক নয়। যেখানে গল্পের উপাদান কবিতার ভাব ও ভাষায় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে,—সেখানে ইহাকে কি বলা যায়? কিশোর-কিশোরীতে গল্প আছে, কাব্যও আছে। বর্ত্তমান বাঙ্গলা সাহিত্যের একজন অতি সুদক্ষ সমালোচক ও কবি বলিয়াছেন যে আধুনিক বাঙ্গলা কবিতার মধ্যে Hack work—(মামুলী রচনা) অত্যন্ত বেশী। কিশোর-কিশোরী Hack work নহে। ইহার বাহিরের গঠন ও ভিতরের ভাব দুই-ই, গতানুগতিক প্রথার একান্ত অনুকূল নহে। যেখানে প্রাণের আবেগ অকৃত্রিম,—সেখানে ভাব ও ভাষার প্রবাহে যে চাঞ্চল্য দেখা যায় তাহা অনেক সময়েই নিজের পথ নিজে করিয়া লয়। কিশোর-কিশোরীর পথও স্বতন্ত্র। কিশোর-কিশোরীর গল্পের অংশ আর কাব্যের অংশ, কাটিয়া ছাটিয়া দুইটা পৃথক পৃথক পাত্রে তুলিয়া দেখান যাইবে না। ইহার গল্পের মধ্যেই কাব্য এবং কাব্যের মধ্যেই গল্প। বরং আরও একটু অগ্রসর হইয়া বলা যাইতে পারে যে ইহার গল্পটাই কবিতা, আর ইহার কবিতাটাই একটা গল্প।

'কিশোর-কিশোরীর' গল্পের মধ্যে 'আষাঢ়ে' রকমের কিছু প্রত্যাশা করা নিষ্ফল, কেন না তাহা নাই। ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতও এত অল্প এবং এত অস্পষ্ট, যে তাহাও উল্লেখের মধ্যেই নহে। 'আষাঢ়ে' কিছু নাই,—ঘটনা নাই—যাহা আছে তাহাও আবার অস্পষ্ট,—তবে গল্পের আর থাকিল কি। এবং তবে ইহাকে গল্প বলাই বা কেন? গল্প, যাহা উপন্যাস ও নাটকে বহু বিচিত্র ঘটনার সমারোহের মধ্যে একের পর আর পাঠকের মনে নব নব উদ্ভাবনা সৃষ্টি করিয়া তুলে ও চলে—তাহা সাধারণতঃ বাহিরের জগত ও সংসার হইতে মানুষের অন্তঃপ্রকৃতিকে ফুটাইয়া তুলে। আর গল্প,—যাহা সাধারণ এক অতি তুচ্ছ ঘটনাকে অবলম্বন করিয়া—যে ঘটনা প্রায় প্রত্যেক মানুষের জীবনেই অন্ততঃ এক আধবার করিয়া ঘটে,—একের পর আর অন্তর্জীবনের পরম গোপনীয় ইতিহাসকে রমণীয় বর্ণে ও রূপে চিত্রিত করিয়া তুলে ও দেখায়,—তাহাও গল্পই। নিতান্ত আনাড়ীর হাতে না পড়িলে তাহাকে কেবল মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ বলা যায় না; বলিলে কবিকে অমর্য্যাদা করা হয়। কিশোর-কিশোরী যিনি লিখিয়াছেন, তিনি আনাড়ী নহেন। তিনি একজন কবি।

কিশোর-কিশোরী—ঘটনার দিক হইতে এই রকমেরই একটা তুচ্ছ গল্প। কিন্তু সেই গল্পের ভিতর দিয়া যে প্রেমের ইতিহাস ও পরিণতি,—তাহা তুচ্ছ নয়—অসাধারণ।

একজন প্রেমিক "বিগত যৌবনে"—যখন 'হৃদয় শিথিল'—'নয়ন নিষ্প্রভ'—'বক্ষমাঝে রক্তধারা আর তেমন ছুটে না', 'পাতার মর্ম্মরে নির্ব্বোধ বাসনাপুঞ্জ অন্তরে আর তেমন কাঁপিয়া উঠে না' তখন তাঁহার সেই প্রথম যৌবনের অতীত ভালবাসার একটী ছবিকে—কল্পনালোকে চিত্রিত করিয়া তাহার ধ্যানে এমন তন্ময় হইয়া গিয়াছে যে, অতীতের সেই তরুণী কিশোরীকে প্রতি মুহূর্ত্তে জীবন্ত ও প্রত্যক্ষ বলিয়া মনে হইতেছে। এই মায়াকে সত্য বলিয়া সৃষ্টি করার মধ্যেই শিল্পীর আত্মপ্রতিষ্ঠা। এই মায়াকে সত্য বলিয়া উপলব্ধি করার মধ্যেই প্রেমিকের প্রেমসাধনার সার্থকতা। কিন্তু ইহাই কিশোর-কিশোরীর সব কথা নয়,—শেষকথা নয়,—এমন কি সকলের চেয়ে বড় কথাও নয়। এই প্রেম সঙ্গীতের মধ্যে অস্পষ্ট ইঙ্গিতে আর একজনের কথা আছে, যাহাকে কাব্যের প্রথম

হইতেই বলি বলি করিয়া কবি বলিতে পারেন নাই ; —অথচ শেষাশেষি যাহার কথা চাপিয়া রাখাও একেবারে অসহ্য ও অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে—এবং সকলের কথা ডুবাইয়া, সেই আর একজনের কথাই মূর্ত্তরাগিণীতে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

নরনারী দুইজনকে লইয়াই প্রেম ও দ্বন্দ্ব। কিন্তু তার মাঝে ও শেষে—প্রাণের রঙ্গবেদীর উপর এ নূপুর ধ্বনি বাজে কাহার ?

এই ইঙ্গিতের মধ্যেই কিশোর-কিশোরীর পরিসমাপ্তি শিল্পের দিক হইতেও এই ভাবের দ্যোতনার মধ্যেই কাব্যের শ্রেষ্ঠ রূপান্তর।

আমরা গল্পের কথা বলিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম, কিন্তু কাব্যের কথায় আসিয়া পড়িলাম। ইহার কারণ আগেই বলিয়াছি যে কিশোর-কিশোরীতে কাব্য ও গল্প দুইভাগ করিয়া দেখান যায় না।

বিগত যৌবনের প্রেমিক তাঁহার অতীত ও বর্ত্তমানের একখানি প্রেমের ইতিহাস বলিতে বসিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন,—আর তাঁহার মায়ালোকের তরুণী কিশোরী শুনিতেছেন। কখনো কখনো মনে হয় দুইজনে পরস্পর নিবিড় মুখোমুখী ভাব। কিন্তু এই প্রেমের স্বর্গ পৃথিবীর সকল প্রকার বৈষম্য ও সুখ দুঃখের অতীত নয়। ইহা এত অপ্রাকৃত নয় যে উট্‌ অথবা পাখীর মত একেবারে অস্পষ্ট। ইহাতে বাস্তবও আছে, কল্পনাও আছে। কল্পনা বাস্তবকে স্থানে স্থানে অতিক্রম করিয়াছে, এমন কি অস্পষ্টও করিয়াছে। কিন্তু বাস্তবের সহিত সর্ব্বপ্রকার সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করে নাই। বাস্তব, কল্পনার আলোকে রূপান্তরিত হইয়াছে, কিন্তু মুরীভূত হয় নাই। অনেক স্থলে কল্পনা ও বাস্তব এমন মেশামেশি হইয়া গিয়াছে,—যে কোথায় কল্পনার শেষ,—আর কোথাই বা বাস্তবের সীমা, তাহা স্পষ্ট করিয়া নির্দ্দেশ করা কঠিন। "প্রাকৃত অপ্রাকৃতের জন্ম একই ক্ষণে"—কিশোর-কিশোরী কাব্যের রূপান্তরে তাহা বারবার আমাদের স্মৃতিপথে উদয় হইয়াছে।

আমরা তাহাকেই মনে করি স্বর্গের, যাহার মধ্যে পৃথিবীর কোন অসম্পূর্ণতা আছে বলিয়া ভাবিতে পারি না। কিন্তু বিগত যৌবন এই প্রেমিকের ভালবাসার চিত্রখানি,মর্ত্ত্যের অপূর্ণ ও পূর্ণতায়,—পাওয়া ও না-পাওয়ায়, আলো ও অন্ধকারের উপর্য্যুপরি সংমিশ্রণে এমন করুণ হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে যে,—ইহা শুধু কোন একজন প্রেমিকের নয়, পরন্তু অল্পাধিক প্রত্যেক প্রেমিকেরই হৃদয়ের প্রতিচ্ছবি।

সর্ব্বশেষে প্রেমিক সমস্ত সৃষ্টিকে ডাকিয়া বলিতে পরিয়াছেন যে, হে সৃষ্টি তুমি ধন্য। 'ধন্য আমি, ধন্য তুমি' কিন্তু ইহা সব শেষের কথা। ইহার আগে অনেক কথা আছে,—মাঝেও অনেক কথা আছে। সেই কথাটাই একটা গল্প—সেই কথাটাই একটা কাব্য।

এই তরুণী কিশোরী কে ? অনিত্য কালের স্রোত মূর্ত্তার বেগে বহিয়া চলিয়াছে, কত সূর্য্য চন্দ্র তারা ভাসিয়া গিয়াছে,—কত পাহাড় পর্ব্বত ধসিয়া খসিয়া চূর্ণ হইয়া গিয়াছে, কত সমুদ্র শুখাইয়া মরুভূমি হইয়াছে, এই অনিত্য কালের স্রোতে সহসা একদিন একটা "নিমেষ" আসিয়া দেখা দিল।

"অনিত্য কালের মাঝে একটী নিমেষ"—
সেই নিমেষের মধ্যে লুকাইয়া ছিল এই চির কিশোরী।

'কোন মহাপরাণের বাঁশরী' শুনিয়া সেই তরুণী, আপনার আবরণ খুলিয়া ফেলিয়াছিল এবং তারপর হইতে চিরকালের জন্য গৌরবভরে ফুটিয়া উঠিল। তাহার চারিদিকে অনিত্য কালস্রোত বহিয়া যাইতে লাগিল—কিন্তু এই চির কিশোরী সেইদিন সন্ধ্যাতলে যে অক্ষয় মহিমায় দেখা দিল,—তাহা মহাপ্রলয় পর্য্যন্ত অক্ষয় হইয়া রহিল।

কবি দেখিতেছেন,—

—"ঘিরি তারে কালস্রোত বেতেছিল বয়ে,
ফুটিল গৌরব তার চির নিত্য হয়ে।"

আবার দেখিতেছেন,—

"পদতলে কলকলে কাল ঊর্ম্মি মালা
শিরে কোন দেবতার নিত্য দীপ জ্বালা।"

তাই দেখিয়া কবি বলিতেছেন,—

"কোন মহাপরাণের বাঁশরী শুনিলে,
আপনার আবরণ খুলে ফেলে দিলে।"

আবার বলিতেছেন,—

"অফুরন্ত চির সত্য অনন্ত অশেষ
অনিত্যকালের মাঝে সেই সে নিমেষ।"

আরও বলিতেছেন,—

"চিরদিন জাগিবে সে আপন সৌরবে,
তুমি আমি যতদিন, ততদিন রবে।"

A thing of beauty is Joy for ever—ইহা কেবল তাহাও নয়। ইহা আরও কিছু, যাহার জন্ত সমস্ত সৃষ্টি অনাদিকাল হইতে পরিবর্ত্তিত হইতেছে, অথচ কোথাও ইহার শেষ নাই। কাব্য হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া এই তরুণীর আর অধিক পরিচয় দেওয়া সম্ভব নয়। অনেক স্থানে অস্পষ্টতার হেঁয়ালীর মত হইয়া পড়িয়াছে, —কিছুই স্পষ্ট করিয়া বুঝা যায় না,—কিছুই ধরা ছোঁয়া যায় না। তারপর আবার হঠাৎ একস্থানে আসিয়া একটা স্থিরভূমি পাওয়া যায়, যাহার উপর ভর করা চলে। যেখানে নিঃশ্বাস ফেলিবার জন্ত দুদণ্ড দাঁড়ান যায়।

তরুণীর নিজের বলিবার কোন কথা নাই। প্রেমিক নিজেই একলা সবকথা বলিয়া যাইতেছেন। কিন্তু একলা কি প্রেম হয়? না, প্রেমের ইতিহাস একলার কথাতেই পরিসমাপ্ত করা চলে? তাই তরুণী কিশোরী কোন কথা নিজে না বলিলেও প্রেমিকের কথার মধ্য হইতেই তরুণীর কথার ও চাহনির আভাষ পাওয়া যায়। তরুণীর মুখের কথা, মনের সন্দেহ, বারবার হাসি—তার চক্ষের চাহনি, বক্ষের দোলানি, সমস্তই—প্রেমিকের কথার মধ্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই তরুণীকে আমরা একেবারে ছায়া-মায়া পরিচ্ছিন্ন অমৃতালোকের পরী বলিয়া মনে করিতে পারি না। এই তরুণী কথা কয়,—গ্রীবা বাঁকাইয়া তাকায় প্রেমিকের কথায় কখনো বা সন্দেহ করে, সেই সন্দেহের মন্দ হাসি সন্ধ্যালোকে প্রেমিকের হৃদয়ে তীক্ষ্ণ ছুরীর মত আঘাত করে,—এই সমস্তই নিপুণ চিত্রকরের তুলিকায় নানাবর্ণে রঞ্জিত হইয়া আমাদের মন মুগ্ধ করে। কিন্তু তরুণী নিজে মুখ ফুটিয়া সমস্ত কাব্যের মধ্যে একটী কথাও বলে না। তরুণীর কথা,—প্রেমিকের কথার মধ্যে বুঝিয়া লইতে হয়। কাব্যের পরাংশের এই আর-প্যাচটুকু না অনেকের পক্ষে মারাত্মক হয়—তাই এই স্থানে আমরা পাঠককে একটু সাবধান হইতে বলি।

প্রেমিক তরুণীকে কি কথা বলেন? যা চিরকাল তাঁহারা বলিয়া আসিয়াছেন। যদি সংসারে কোন প্রাচীন কথা আজ পর্য্যন্ত নূতনত্বের দাবী করিতে পারে, তবে তাহা এই যে,—'আমি তোমাকে ভালবাসি।' যে বলে তার কাছেও একথা নূতন, যে শুনে তার কাছেও তাই। ছুরীর মত আঘাত করে, এই সমস্তই নিপুণ চিত্রকরের তুলিকায় নানাবর্ণে রঞ্জিত হইয়া আমাদের মন মুগ্ধ করে। কিন্তু তরুণী নিজে মুখ ফুটিয়া সমস্ত কাব্যের মধ্যে একটী কথাও বলে না। তরুণীর কথা,—প্রেমিকের কথার মধ্যে বুঝিয়া লইতে হয়। কাব্যের পরাংশের এই আর-প্যাচটুকু না অনেকের পক্ষে মারাত্মক হয়—তাই এই স্থানে আমরা পাঠককে একটু সাবধান হইতে বলি।

প্রেমিক তরুণীকে কি কথা বলেন? যা চিরকাল তাঁহারা বলিয়া আসিয়াছেন। যদি সংসারে কোন প্রাচীন কথা আজ পর্য্যন্ত নূতনত্বের দাবী করিতে পারে,তবে তাহা এই যে,—আমি তোমাকে ভালবাসি। যে বলে তার কাছেও একথা নূতন, যে শুনে তার কাছেও তাই।

প্রেমিক বলিল,—

'কোন দেবতার কোন মন্দিরের গায়,
ভুলে ভুলে এলিতেছি দিবস নিশায়?"

এ এক আশ্চর্য্য উপমা।

কেমন করিয়া যে তরুণীকে দেখিয়া প্রেমিকের মনে প্রথম প্রেমের সঞ্চার হইল,—তাহার বর্ণনাটী অতি সুন্দর।

"জলন্ত প্রদীপ হতে যেমন জ্বালায়,
আর একটী প্রদীপ আনি তাহার শিখায়,
তেমনি আমারে পরে ধরিল যখনি,
তব রূপ-শিখা-পরে জ্বলিনু তখনি!"

তরুণী কিন্তু কথাটা খুব বিশ্বাস করিল না। তাহার অধরপ্রান্তে একটু হাসির রেখা দেখা দিল। মুগ্ধ প্রেমিক চঞ্চল হইয়া উঠিল। বলিল,—

"কেন হাস? মিথ্যা একি? অলীক ঘটনা?
আমি কি করেছি শুধু স্বপন রচনা?"

তা হ'লে সবই মিথ্যা।

"আমি নাই।—তুমি নাই, কিছু নাই ভবে।' তোমার বিশ্বাধরে সেদিন যে হাসি লেখা দিয়াছিল, তবে তাও মিথ্যা!

"তাও ভুল, তাও স্বপ্ন! তাও মিথ্যা তবে?
চোখের চাহনি সেই? তাও মিথ্যা হবে।"

এত কথার পরও তরুণী আবার হাসিল, এবার কিন্তু প্রেমিক সত্যই উত্তেজিত হইয়া উঠিল,—বলিল,—

"আরে আরে অবিশ্বাসি! আরেরে নির্দ্দয়!
ওই তব বক্ষতলে নাহি কি হৃদয়?
সেদিন কি প্রাণে তোর তাকে নাই বাধ?
ভুলে ভুলে উঠে নাই সকল পরাণ?'

এরপরে হয়তো বা তরুণী আর অবিশ্বাসের হাসি হাসে নাই। প্রেমিকের বুকের মাঝে একান্ত নির্ভরে মুখ লুকাইয়া পড়িয়াছিল।

কিন্তু এই মিলনের মাঝেই যেন আবার কি বিরহ ব্যাথা জাগিয়া উঠিল। এ প্রেমও শুধু দুজনের মুখোমুখী নিবিড়তায় নিঃশেষ হইতে পারিল না। থাকিয়া থাকিয়া ঘুরে, পত্রের মর্ম্মরে যেন কাহার পায়ের ধ্বনি শুনা যায়।

"কে যেন গো এসে এসে ফিরে চলে যায়,
হেসে হেসে জীবনের বিজন তলায়।"

—এ কে?

—তরুণীও জিজ্ঞাসিল,—এ কে?

প্রেমিক বলিল,—"বুঝিতে পার না কিছু?"

আমিও যে ঠিক বুঝিতে পারি তা নয়। তবে,—

'তোমারে হৃদয়ে রাখি মোর মনে হয়,
কে যেন আমার মাঝে সদা কথা কয়।'

—এখানেও কথাটা পরিষ্কার বুঝা গেল না, আরও হেঁয়ালী ঘনীভূত হইয়া উঠিল মাত্র। তরুণীও কিছু বুঝিতে পারিল বলিয়া মনে হইল না। কেবল সে হয়তো বা কতক ভয়ে কতক আবেগে প্রেমিকের বক্ষের মাঝে লতাইয়া রহিল। প্রেমিক শুধু আশ্বাস দিয়া বলিল—"ওগো, মর্ম্মলতা আমার মর্ম্মের মাঝে জড়াইয়া থাক।" আরো বলিল, যদি আমি শুনিতে পাই; তবে তুমিও শুনিতে পাইবে, যদি আমি দেখিতে পাই, তবে তুমিও দেখিতে পাইবে।

"তুমিও শুনিবে প্রাণ? আমি যদি শুনি,
সেই তার নূপুরের মধু রুনু রুনী,
তুমিও হেরিবে প্রাণ! আমি হেরি যদি,
চিত্তমাঝে রবে বাঁধা নিত্য নিরবধি।"

এই পর্য্যন্ত এক অধ্যায় শেষ।

তারপরের অধ্যায়ে যেখানে কবি বলিতেছেন,—

"কেমনে উঠিবে ফুটি শুধু একদিনে
• • •
ফুটেনা ফুটেনা ফুল শুধু একদিনে।

এইখান হইতে আর এক নূতন প্রসঙ্গের অবতারণা দেখিতে পাই। গল্পের মধ্যে এ আর এক গল্প। কাব্যের মধ্যে এ আর এক কাব্য। ফুলের মধ্যে এ আর একটী কোরক। কবি এখানে তাঁর পূর্ব্বজন্মের কত রহস্যের কথা বলিতেছেন, বলিতে বলিতে এক একবার থামিতেছেন, মনে হইতেছে হয়তো বা ফুরাইয়া গেল।

"যোগস্থই আমি! কেমনে বর্ণিব বল,
অনন্তকালের সেই মাধুর্য্য কাহিনী।"

যুগে যুগে তোমায় পরশ লাভ করিয়াছি, আবার জনমে তাহা হারাইয়া ফেলিয়াছি। এমনি করিয়া কত জন্মের কথা জগতের অভিব্যক্তির কত বিচিত্র স্তরের সহিত যাহা জড়িত ছিল, একে একে তাহা সমস্তই ফুটিয়া উঠিল।

"সৃষ্টির প্রথম হ'তে চির প্রসারিত
মোর বাহু দুটী, জন্ম জন্ম করি স্নেহ
বিশ্ব করি, ব্যাপ্ত করি যুগ যুগান্তর
তারি আলিঙ্গন মাঝে, ধরা পড়ে স্নেহে
সেই দিন! যেন কোন মহাদেবতার
মহামিলনের তরে মিলেছি আমরা
যুগে যুগে জনমে জনমে বারবার।"

কাব্যের দিক হইতে এই অংশটী অত্যন্ত মনোরম বোধ হইবে। কিন্তু এ অধ্যায়ের শেষেও সেই কথা, সেই অতৃপ্তির রেশ,—

—"যেন কোন মহাদেবতার—
মহামিলনের তরে মিলেছি আমরা।

প্রেমিক ও তরুণীর মধ্যে এই মহাদেবতাটী কে ?

এর পরের এবং শেষ অধ্যায়ে জন্ম জন্মান্তরের প্রণয়িণীকেই যখন আবার এ জন্মেও নূতন করিয়া পাওয়া গেল, তখন প্রেমিক আনন্দে আত্মহারা হইয়া উঠিলেন। কিন্তু সেই মিলন এবারেও কেবল দুইজনের মিলনে পর্য্যবসিত হইতে পারিল না। মিলন যখন গভীর হইয়া উঠিল—কবি তখনি আনন্দে মত্ত হইয়া গাহিয়া উঠিলেন,—

"ওরে দেখ্ দেখ্ দেখ্ কি জানি জেগেছে,
হৃদয় কমল মাঝে কি ঘুম লেগেছে।'

দুজনের মিলনের মাঝে এ আবার কার আবির্ভাব ? কবি এবার আর বীণা ফেলিয়া দেন নাই। এ নূতনের আবির্ভাব ক্রমে তাঁহার সহ্য হইয়া উঠিয়াছে, তিনি ধীরে গভীরে গাহিতেছেন,

—"কে নেয় রে মধু লুটি
হেসে হেসে কুটি কুটি
তালে তালে মধু ঢালি
কে দেয় রে করতালি
মধুর তরঙ্গে
কে নাচে রে রঙ্গে ?
ওরে দেখ্ দেখ্ দেখ্ কি ঘুম জেগেছে
পরাণ কমল মাঝে কে জানি জেগেছে।'

প্রেমিকের অনুভূতি এইবার চরমে উঠিল। প্রেমিক কবি স্থির কণ্ঠে বলিলেন,—

"যুগে যুগে পাওয়া পাওয়া না-পাওয়া মিলন,
কেন রে সার্থক হল ! পূরিল জীবন !"

কবি সমস্ত সৃষ্টির দিকে চাহিয়াই ধন্য ধন্য করিয়া উঠিলেন। অমনি সহসা শুনিতে লাগিলেন, কে যেন তাঁহারই মধ্যে থাকিয়া করতালি দিতেছে, আর বলিতেছে —ধন্য ধন্য ! ইহা কি প্রতিধ্বনি না আরও কিছু ?

'কে বলে রে ধন্য ধন্য, কে দেয় রে করতালি ?' তরুণী কিশোরীকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন,—

"তোমার আমার মাঝে
অপর কেহ কি আছে ?"

তরুণী কি বলিবে ? কিছুই বলে না। সন্দেহ প্রায় কাটিয়া আসিয়াছে। আবার কাণ পাতিয়া শুনিলেন, কে যেন বলিতেছে,—'ধন্য ধন্য।' শুধু কি তাই ?

এ কার নূপুর বাজে ?
কার পদরজ—
পরাণ—পঙ্কজ
শোভা করে——* *

কবি এবার সত্যই চিনিলেন যে এই সেই চির কিশোর। আর জীবনে যে প্রেমের অভিযান সে কেবল দুইজনকে উপলক্ষ্য করিয়া ইহারি লীলা।*

---

* (কিশোর-কিশোরী—সুকবি শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাস মহাশয়ের সর্ব্বশেষ গীতি-কবিতা।)

লজ্জাবতী

[শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী]

বিস্ময় ভরে কহিল সখীর "একি গো লজ্জাবতী !
আমারে হেরিয়া কেন এ লজ্জা ! আমি যে তোমার পতি।
কোন দিনও কই দেখিনি এমন বসনে ঢাকিতে মুখ।
একটী নিমেষে ভুলে কি গিয়েছ আমার পরশটুক !!"

সরম জড়িত মৃদুল বচনে কহিল লজ্জাবতী,
"প্রেয়সী তোমার প্রিয়ের পরশ ভোলেনি, ভোলেনি পতি।
বুকে করে হায় ! এনেছ তুমি যে ধূলিকণা, আবিলতা,
তাহারি পরশে তোমার কবিতা বন্ধ কোরেছে পাতা।"

৺তারকেশ্বরের মোহান্তের অপবাদের ইতিহাস

মাননীয় বাসন্তী সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—

৺তারকেশ্বরের মোহন্তের নামে কিছুদিন হইল একটী অপবাদ কলিকাতায় প্রচারিত হইয়াছিল। তৎসম্বন্ধে আপনার সুবিখ্যাত পত্রে প্যারা বাহির হইয়াছিল। শ্রীরামপুরের মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট,পুলিসের ডেপুটী সুপারিণ্টেনডেণ্ট, গভরমেণ্টের সহকারী পাবলিসিটি অফিসার, সরযুপারীন ব্রাহ্মণ সভার মন্ত্রী, রাজা মনিলাল সিংহ এম্, এল্, সি, সংবাদ পত্রের সম্পাদক প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও স্থানীয় অধিবাসীগণ বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া উহা সর্ব্বৈব মিথ্যা বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু এই মিথ্যা গুজবের কারণ কি তাহা জানিবার জন্য সকলেই উৎসুক রহিয়াছেন। গভরমেণ্ট ও দেশের লোকের এই উৎসুকতা দেখিয়া আমরা নিম্নে গুজব উৎপত্তির কিঞ্চিৎ বিবরণ প্রদান করিতেছি।

মোহন্তের দুইদল শত্রুর আবির্ভাব হইয়াছে। দেড় বৎসর পূর্ব্বে (১৫ই মাঘ ১৩২৮ সাল) উত্তরপাড়ার প্রথম দলটী সভা বদ্ধ হয়। এইদলে জমিদারী সূত্রে ক্ষতিগ্রস্ত কয়েকজন জমিদার আছেন। ইঁহারা প্রথমতঃ উত্তরপাড়ায় সভা করিয়া মোহন্তের অযথা কুৎসা করিয়া সাধারণকে তাঁহাদের দলভুক্ত করিবার চেষ্টা করেন, এবং মোহন্তের নামে বাঙ্গালার লাট বাহাদুরের নিকট অভিযোগ করেন। পরে উভয় প্রচেষ্টায় নিষ্ফল হইয়া প্রকাশ্য আদালতে মোহন্তকে পদচ্যুত করিবার এক মোকর্দ্দমা দায়ের করিয়া বসেন। মোকর্দ্দমা এখন বিচারাধীন। প্রথম দলের সংবাদ যথা সময়ে পত্র বিশেষে প্রকাশিত হইয়াছে।

দ্বিতীয় দলটীতে জন কয়েক শিক্ষিত লোক আছেন। ইঁহারা বহুরূপী। ইঁহাদের মধ্যে এক ঘড়িবাবু সভা করিয়া মোহন্তের সদ্গুণ বর্ণনা করা, জীবনী ছাপাইয়া তাঁহার গুণের পরিচয় দেওয়া, আদালতী বিজ্ঞাপনের সংবাদ পত্রকে মোহন্তের মুখপত্র করিয়া দেওয়া, প্রভৃতি বহু প্রলোভন দেখাইয়া মোহন্তের নিকট অর্থলাভ প্রাপ্তি অন্তে বৈরাগ্য অবলম্বন পূর্ব্বক সম্প্রতি অপর কয়েক জনকে জুটাইয়া ছয়মাস কাল (গত মাঘ মাস হইতে) দেশের কাজে মন দিয়াছেন, পাঠক! হেদোর ধারে বিরাট সভা মনে পড়ে কি? ইহার অনুষ্ঠাতা এই অভিনব দেশহিতৈষী। দুইটি সভায় মোহন্তের কার্য্যের প্রতিবাদের পর তৃতীয় সভায় কোন সেনাপতি রাজপুত্রের আবির্ভাব হইল। রতনে রতন মিলিল। আদালতের টাউটকে বিশ্বাস করে কে? রাজপুত্তর ছেঁড়া জুতা পায়ে দিয়া চেয়ারের উপর দাঁড়াইয়াই মোহন্তের কুৎসা আরম্ভ করিয়া দিলেন ইতিপূর্ব্বে যে কুৎসা কলিকাতায় সর্ব্বত্র রটিয়াছিল, ঠিক সেই কুৎসা। এই সময়ে উদ্যোক্তা প্রধান কোন পত্রের বেত্রাঘাতে জর্জ্জরিত হইয়া প্রায় তিনমাস কাল সুবিধা করিতে পারে নাই। ইহার কিছুদিন পূর্ব্বে এই দ্বিতীয় দলের একব্যক্তি একখানি পত্র হাতে পান। দলের লোক পত্রের নায়ক হওয়ায় সে তখন পত্র হাতে পাইল, হেদোয় আবার সভা হইল, এবং পত্র বিশেষে মোহন্তের কেচ্ছা গাওয়া হইবে ঐ সভায় প্রচার করা হইল। ইহারা পাড়ীতে বর্দ্ধমান পর্য্যন্ত গিয়া মোহন্তের কুৎসা প্রচার করিয়া বেড়াইয়াছে। উক্ত দলের লোকেরাই কয়েক দিন হেদো, গোলদীঘি, এসপ্লানেড, শিয়ালদহ ষ্টেশন প্রভৃতি স্থানে পূর্ণ উৎসাহে মোহন্তের কুৎসা রটাইয়া বেড়াইয়াছে। পত্রগুলির আগে পিছে আইনের ফাঁকি বসাইয়া বেশ জমাইতে লাগিল। যে পত্রে কিছুদিন পূর্ব্বে -মোহন্তের স্বপক্ষে বহু প্রবন্ধ বাহির হইত, তাহাতেই কত মিথ্যা প্রচার হইতে লাগিল। এই সময়ে আমাদের একবন্ধু এসপ্লানেডে এইরূপ একব্যক্তি মহান্তের অযথা কুৎসা রটাইতেছে শুনিয়া তাহার গ্রীবা আকর্ষণ পূর্ব্বক রেটসম্যান অফিসে লইয়া গিয়াছিলেন। সে হাত যোড় করিয়া বলিল, হুজুর আমরা আর কি করিব কাগজের আফিসের বাবুরা ইহা শিখাইয়া দিয়াছেন, পেটের দায়ে করিতেছি। তাহার নাম ঠিকানা লিখিয়া লওয়া হইয়াছে। যাহা হউক, মোহন্তের প্রতিবাদ বাহির হওয়ায় গুজব থামিল বটে, কিন্তু কোন কোন পত্র এখন এই বলিয়া মোহন্তকে ফাঁদাইবার জন্য চাহেন, (১) বাঙ্গালী (২)মহিলা

ও (৩) সংস্কার কমিটী। মালদী রাজা মনিলাল সিংহ তো উল্টা বুঝিল রাম—এখন কমিটি কাহার দ্বারা হইবে? মহিলার সম্বন্ধে আর কি বলিব। দুই তিন মাস পূর্ব্বে কোন পত্রে মহাত্মারা মোহান্তের নামে এই প্রকার অপবাদ রটাইবার ব্যাপারে এক ইংরাজী দৈনিক পরামর্শ দিয়াছিলেন, স্বীয় আত্মীয়দের তারকেশ্বরে লইয়া গিয়া মোহন্তের গতিবিধি প্রমাণ করিলেই ভাল হয়। তবুও লজ্জা নাই।

মোহান্ত মহারাজের তরফ হইতে প্রায় সকল বিশিষ্ট পত্রগুলিকে সংবাদ দেওয়া হইয়াছে। আশা করি সংবাদ-পত্র সেবীগণও সকল ব্যাপার অবগত হইয়াই কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিবেন।

আমরা আশা করি প্রজারঞ্জক সরকার বাহাদুর উপযুক্ত উক্তি গুলির তদন্ত করিয়া দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করিবেন। আমরা যাহা শুনিয়াছি ও স্বচক্ষে দেখিয়াছি তাহা ব্যক্ত করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলাম।

শ্রীবিভূতিভূষণ বসু

এই পত্রখানির বাহুল্য অংশ ছাঁটকাট দিয়া আমরা ইহা প্রকাশ করিলাম। তারকেশ্বর হিন্দুদের একটি প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান—এই তীর্থ স্থানের ভার প্রাপ্ত হইয়া যিনি আছেন তাঁহার নামে কোন অপবাদ শুনিলে লজ্জায় আমাদের মাথা হেঁট হয়। প্রতিবাদ সত্য হইলে আমরা সুখী হইব।

সম্পাদক।

গবেষণার তদন্ত

[শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক]

১

গো বরগণেশ গিয়েছিলেন
গবেষণার তদন্তে
তর্ক হলো মৌমাছিরা
ফলতি না মোহন্তে।
শুন্‌ছি তিনি মুগ্ধবোধে
পান করেছেন দুগ্ধ বোধে,
ভাষ্য পড়ে হাস্য করেন
আপন মনে অন্তে।

২

মধুর সাথে হুধুর তিনি
মিল পেয়েছেন অনেকি
সকল জিনিষ সকল সময়
রয় মনীষার মনে কি?
পড়ে ছিলেন 'পঞ্চদশী'
পঞ্চাধ্যায়ী রাসের কুঁসি,
'পঞ্চতন্ত্র' পড়েই বটু
পটু হলেন বেদান্তে।

৩

মীমাংসাতে ঠিক করেছেন
ওই যে মধুর মধুক্রম,
গোবর দিয়ে তৈরী ওটা
মোমের কথা ভীষণ ভ্রম।
মৌমাছিরা চৌর সবে
যাক্ত পাবে, কি গৌরবে
খামার ভরা বন্‌কণানি
শুদ্ধরণে কে, জান্‌তে।

৪

সত্যেরি হায় ভিন্নিত পিথা
তোমরা পার কি করতে
গুবরে পোকা নিজের দিলে
চলেই গেলেন নেপথ্যে।
মিথ্যা সোণার ঝাপ্‌টা পরে
উঠলো গিয়ে ছায়ের ঘরে
পাকস্পর্শে শুদ্ধি দিলে
মিথ্যারাণী মন্ত্রে।

ব্যতিক্রম

(উপন্যাস)

[শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্-এ]

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

সকাল বেলায় উঠিয়া বিনয় গিন্নীমাকে বলিল—"আজ আমরা একটু বাজার বেরোবো।" গিন্নীমা বলিলেন—"বেশতো চলুন আমরাও যাই?" বিনয় হাসিয়া বলিল—"সে কি হয়, আপনারা গৃহী আর আমরা সন্ন্যাসী আপনাদের সঙ্গে যাত্রা কি আমাদের সম্ভব?" গিন্নীমা মনে সন্তুষ্ট হইলেন, কারণ সারদার ব্যবহার তাঁহার চোখে ভাল ঠেকে নাই। গিন্নীমার অনুমতি লইয়া নির্ম্মল ও বিনয় যখন বাহির হইল তখন তাহাদের বিছানা ও জিনিষপত্র বাড়ীতেই পড়িয়া রহিল। দশাশ্বমেধ ঘাটের কাছে আসিয়াই নির্ম্মল একখানা গাড়ীভাড়া করিল, দুই জনে তাহাতে উঠিতে যাইতেছে এমন সময়ে পিছনে ভক্ত পরেশচন্দ্রের গলার আওয়াজ পাইয়াই বিনয় চমকিয়া উঠিল। পরেশবাবু বলিলেন—"বাবা আমিও ষ্টেশনে যাচ্ছিলুম, আমায় একটু দয়া করে ছিচরণে স্থান দিয়ে নিয়ে যাবেন?' নির্ম্মলের মুখ শুকাইয়া গেল, কিন্তু বিনয় বলিল—"আসুন আসুন।" ঘর্ম্মাপ্লুত কলেবর পরেশচন্দ্র বপুখানি বহুকষ্টে ভাড়াটিয়া গাড়ীতে উঠাইয়া রুমালে মুখ মুছিয়া নির্ম্মলকে বলিলেন—"বাবা এমন করেই কি ফাঁকি দিতে হয়? পরেশ ঐ ছিচরণের দাস, ভক্ত ভিন্ন কি দেবতার গতি বুঝতে পারে? যেই দেখিছি আপনারা দুজনে এক সঙ্গে বেরিয়েছেন তখনই বুঝেছি যে গিন্নীমার ছোট জামাইকে আনতে যাচ্ছেন। ভক্তকে কি এমন করেই বঞ্চিত করতে হয় বাবা?" পরেশবাবুর কথা শুনিয়া নির্ম্মল ও বিনয় হো হো করিয়া একচোট হাসিয়া লইল। পরেশচন্দ্র কিন্তু অপ্রতিভ হইবার পাত্র নহেন, তিনি বলিলেন—"কেমন বাবা মনের কথাটা ঠিক ধরেছি কিনা?" নির্ম্মল হাসিয়া বলিলেন—"ঠিক ধরেছেন পরেশবাবু?"

রাজঘাট ষ্টেশনের কাছে গাড়ী ছাড়িয়া দিয়া পরেশবাবু যখন ভাড়া চুকাইয়া দিলেন এবং যথারীতি নোটবুক বাহির করিয়া খরচটা টুকিয়া রাখিলেন, তখন বিনয় আর কিছু বলিল না। গঙ্গার ধারে বেড়াইতে বেড়াইতে বিনয় নির্ম্মলকে ইংরাজীতে বুঝাইয়া বলিল—"দেখ তুই গঙ্গার ধারে নেমে গিয়ে একখানা নৌকা ভাড়া কর, নৌকায় পার হয়ে ও-পারে চলে যা, পুল থেকে মোগলসরাই ষ্টেশন আন্দাজ তিন মাইল, তুই অচ্ছন্দে হেঁটে চলে যেতে পারবি। ডাকগাড়ী চারটের সময় আসে, যদি আমি ততক্ষণ পৌঁছতে না পারি তা হ'লে তুই একাই চলে যাস। আমি যেমন করে পারি সরে পড়বো।" বিনয় পরেশবাবুর সহিত কথা কহিতে কহিতে আদি কেশবের মন্দিরের দিকে চলিল, নির্ম্মল ক্রমশঃ পিছাইয়া পড়িল। পরেশ ও বিনয় কথা কহিতে কহিতে উত্তর দিকেই চলিয়া গেল। নির্ম্মল সেই অবসরে পার হইয়া চলিয়া গেল।

ফিরিবার সময় পরেশবাবু দুই একবার ক্যাল ক্যাল করিয়া এদিক ওদিক চাহিলেন, কিন্তু নির্ম্মলকে দেখিতে পাইলেন না। তাহার মনটা নিতান্ত অস্থির হইয়া উঠিল, তখন বেলা বিলক্ষণ বাড়িয়া উঠিয়াছিল, বিলক্ষণ গরম পড়িয়াছিল সুতরাং ভক্ত পরেশচন্দ্র ক্রমশঃ গলিতে আরম্ভ করিয়াছিল। ভ্রিয়মান পরেশচন্দ্রকে ফেলিয়া বিনয় অচ্ছন্দেই পলাইতে পারিত, কিন্তু সে পলাইল না। ভক্ত পরেশচন্দ্র মনে করিয়াছিলেন যে স্বামীজি যখন ধরিয়া পড়িয়াছেন তখন ছোট বাবাজীও বোধ হয় দয়া দিবেন, এই জন্য তাহার এক একবার ইচ্ছা হইতেছিল যে বিনয়ের কোঁচার কাপড়টা চাপিয়া ধরেন। বিনয় যখন পলাইল না তখন পরেশচন্দ্র আশ্বস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"ছোট বাবাজী! বাবা কোথায় গেলেন?" বিনয় একটু এদিক ওদিক চাহিয়া বলিল—"তাইতো।" পরেশচন্দ্রের মস্তকে বজ্রাঘাত হইল, নির্ম্মলকে খুঁজিবার ছলে বিনয়

ক্রমশঃ পরেশবাবুর সহিত ষ্টেশনে ফিরিয়া আসিল এবং একখানা ঘোড়ার গাড়ী দেখিয়া বলিল—"পরেশবাবু এই রৌদ্রে আর কত ঘুরবেন, চলুন এই গাড়ীখানা ভাড়া করা যাক!" কথাটা পরেশবাবুর মনঃপূত হইল সুতরাং তিনি কৃষ্ণ বাক্যব্যয় না করিয়া গাড়ীতে উঠিয়া বসিলেন। বিনয়ও গাড়ীতে উঠিয়া চালককে দশাশ্বমেধ ঘাটে যাইতে বলিল। তখন পরেশচন্দ্র কাতর কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন—"ছোট বাবাজী কি হবে?" বিনয় তাহাকে আশ্বাস দিবার জন্য বলিল—"ভাবছেন কেন? তিনি আর যাবেন কোথায়? গেলেও কি আমাকে ছেড়ে যাবেন? তিনি নিশ্চয় বাড়ী ফিরে গিয়েছেন, হয়ত গিন্নীমার ছোট জামাইকে এনে হাজির করেছেন।' ছোট জামাতার আগমনের সম্ভাবনা শুনিয়া পরেশচন্দ্র নির্ব্বাক হইলেন কারণ তদ্দণ্ডে তাহার মনিবের নিকট বিলক্ষণ দু' পয়সা পাইবার আশা ছিল। দুই জন যখা সময়ে বাড়ী আসিয়া দেখিল নির্ম্মল তখনও আসিয়া পৌছান নাই। ভবসুন্দরী ও সারদার প্রশ্নের যথা সম্ভব সন্তোষজনক উত্তর দিয়া বিনয় স্নান করিতে গেল; স্বামীজির অভাবে তাহার চিন্তার একান্ত অভাব দেখিয়া গিন্নীমাও কতকটা আশ্বস্ত হইলেন। আশ্বস্ত হইল না কেবল সারদা আর ভক্ত পরেশচন্দ্র। নির্ম্মলের অনুপস্থিতির জন্য কোনওরূপ উৎকণ্ঠা প্রকাশ না করিয়া বিনয় সারাটা দিন নিশ্চিন্ত মনে কাটাইয়া দিল। বাড়ীর সকলেই তাহার উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়াছিল, কারণ তাহারা স্থির করিয়াছিল যে শিশু যতক্ষণ ধরা থাকিবে গুরু ততক্ষণ কিছুতেই পালাইতে পারিবে না।

দিন শেষ হইল, রাত্রি আসিল তখনও স্বামীজির দেখা নাই; ছোট জামাতার সন্ধানের চেষ্টাও বন্ধ হইয়া গিয়াছে। সন্ধ্যার সময় উৎকণ্ঠিতা হইয়া ভবসুন্দরী বিনয়ের নিকট আসিয়া বসিলেন। সমস্তটা দিন সে ভবসুন্দরীকে আশ্বাস দিয়া আসিতেছিল যে স্বামীজি নিশ্চয়ই সন্ধ্যার পূর্ব্বে ফিরিবেন, সুতরাং সন্ধ্যা বেলায় সে আর কথা খুঁজিয়া পাইল না। ভবসুন্দরীর অনুরোধে তাহাকে নির্ম্মলের সন্ধানে বাহির হইতে হইল, সঙ্গে কড়া পাহারা, স্বয়ং পরেশচন্দ্র ও একজন দরোয়ান। গাড়ী করিয়া নানা স্থানে ঘুরিয়া রাত্রি ১টার সময় বিনয় বাসায় ফিরিয়া আসিল। তাহার মুখ দেখিয়া ভবসুন্দরী মনে করিলেন যে বোধ হয় স্বামীজির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, কারণ বিনয়ের মুখে বৈরাগ্যের চিহ্নমাত্রও ছিল না।' স্বামীজি ফেরেন নাই শুনিয়া তিনি দুঃখিত হইলেন বটে কিন্তু তাঁহার প্রত্যাবর্ত্তনের আশা একেবারে পরিত্যাগ করিতে পারিলেন না। সেদিন বিনয় ফিরিবার পরে তাহাদের পূর্ব্বের বাসায় একটী স্ত্রীলোক আসিয়া একখানি পত্র দিয়া গেল, পত্রখানি পড়িয়া বিনয়ের চক্ষু স্থির হইয়া গেল:—

হরিহরপুর
২২শে জ্যৈষ্ঠ ১৩০৮

চিরজীবেষু—

তোমার পূর্ব্বের পত্র পাইয়াছি বটে কিন্তু ঠিকানা না জানা থাকায় ইহার পূর্ব্বে উত্তর দিতে পারি নাই। তুমি লিখিয়াছ লক্ষ্ণৌ গিয়াছ কিন্তু লক্ষ্ণৌর ঠিকানা হইতে পত্র ফিরিয়া আসিয়াছে। সেইজন্য পুনরায় ৺কাশীধামের ঠিকানায় পত্র দিলাম। বহুদিন যাবত তোমাকে না দেখিয়া তোমার শাশুড়ী ঠাকুরাণী অত্যন্ত উতলা হইয়াছেন; অতএব তুমি পত্রপাঠ ৺কাশীধাম বাঙ্গালীটোলা মোকামে শ্রীযুক্তা বৈবাহিকা ঠাকুরাণীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া পত্রদ্বারা আমাকে জানাইবা। অন্যথা আমি সাতিশয় বিরক্ত হইব জানিবা। অত্র মঙ্গল, তোমার কুশল জানে সুখী করিবা।

আশীর্ব্বাদক—শ্রীহরশঙ্কর দেবশর্ম্মনঃ।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

সেদিনও স্বামীজির সন্ধানে বাহির হইয়া বিনয় রাজঘাট ষ্টেশনের ধারে দাঁড়াইয়াছিল, যত দিন যাইতেছিল পাহারা ততই কড়া হইতেছিল সঙ্গে সঙ্গে আদরের মাত্রাটাও বর্দ্ধিতেছিল। এখা ভবসুন্দরী ছাড়া বাড়ীর আর কেহ তাহার সহিত বড় একটা কথা কহিত না। কেবল পরেশচন্দ্রের জন্য তাহার উপর কড়া পাহারা ছিল। অন্যান্য বিষয়ে এই দুই দিনের মধ্যেই সে বাড়ীর সংসারে অবশ্য প্রতিপাল্য দরিদ্র কুটুম্বের মত হইয়া

পড়িয়াছিল। রাজঘাট ষ্টেশনের ধারে দাঁড়াইয়া বিনয় ভাবিতেছিল, সে আর কতদিন এমন করিয়া কাটাইবে। সেই সময় একখানা ট্রেণ আসিয়া ষ্টেশনে দাঁড়াইল, দুই চারিজন আরোহী নামিল, তাহাদিগের মধ্যে একজনকে দেখিয়া বিনয়ের মাথা ঘুরিয়া গেল, সে পড়িতে পড়িতে রহিয়া গেল। দরোয়ান তাহার নিকটেই দাঁড়াইয়াছিল, বিনয় তাহাকে এক ঘটি জল আনিতে বলিয়া বসিয়া পড়িল। তখন তাহার মুখখানা এত সাদা হইয়া গিয়াছিল যে দরোয়ান ভয় পাইয়া জল আনিতে ছুটিল। গাড়ীখানা তখন রাজঘাট ষ্টেশন হইতে ছাড়িতেছিল, সম্মুখে একটা দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরার দরজা খোলা ছিল, বিনয় সেই কামরাটায় উঠিয়া একেবারে বাথরুমে গিয়া দরজা দিল। গাড়ী রাজঘাট ছাড়িয়া শিকরোল ষ্টেশনের দিকে চলিল।

বিপুলকায় পরেশচন্দ্র দরোয়ানের নিকট বিনয়কে রাখিয়া ষ্টেশনের ছায়ায় একটী হাওয়াগাড়ী সিগারেট ভোগ করিতে ছিলেন। সহসা বিধি বাদ সাধিলেন, মুখের সিগারেটটা পথে পড়িয়া গেল, পরেশচন্দ্র একজন যাত্রীর পদধূলি লইয়া বলিলেন—"আজ্ঞে এটা আপনি?" আগন্তুক পরেশচন্দ্রকে না চিনিতে পারিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি কে বাবু?' দ্বিতীয়বার পদধূলি গ্রহণ করিয়া পরেশচন্দ্র বলিলেন—"আজ্ঞে আমি পরেশচন্দ্র, নাকশিপাড়া ছোট তরফের আমলা।" আগন্তুক বলিলেন 'ওঃ!' পরেশবাবু তখন তাড়াতাড়ি গাড়ী দেখিতে ছুটিলেন, এই সময় হঠাৎ দরোয়ান আসিয়া জানাইল যে ছোট বাবাজী অন্তর্ধান। পরেশবাবু বড়ই বিপদে পড়িলেন, তিনি তখন ছোট বাবাজীর সন্ধান করিবেন কি আগন্তুকের খাতির যত্ন করিবেন তাহা স্থির করিতে পারিলেন না। আগন্তুক তখন গাড়ীতে উঠিয়া পরেশচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি হে তুমি যাবে নাকি?" তখন দরোয়ান গাড়ীর উপর উঠিয়া বসিয়াছে দেখিয়া পরেশবাবুও উঠিয়া পড়িলেন।

ট্রেণ যখন শিকরোল ষ্টেশনের কাছে পৌঁছিয়াছে তখন বিনয় পকেটে হাত দিয়া দেখিল যে তাহার নিকট একখানি দশ টাকার নোট ও একটি টাকা রহিয়াছে। ষ্টেশনে গাড়ী থামিবামাত্র সে সঙ্কোচ একখানি দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকিট কিনিয়া আনিল তাহার পরে তাহার নিকট একটী টাকা ও কয়েক আনা পয়সা বাকী রহিল। গাড়ী ঘোড়ায় সারাদিন চলিয়া সন্ধ্যাবেলায় হরশঙ্কর ষ্টেশনে পৌঁছিল। বিনয় বাহির হইয়া আশ্রয়ের সন্ধানে চলিল। পথে যাইতে যাইতে তাহার সহিত তিন চারি জন বাঙ্গালী ভদ্রলোকের সহিত দেখা হইল, তাঁহাদের মধ্যে একজন বিনয়কে তাঁহার নিজের গৃহে লইয়া গেলেন। তিন চারিদিন তাঁহার আশ্রয়ে থাকিয়া কলিকাতা হইতে টাকা আনাইয়া বিনয় এলাহাবাদের পথে কলিকাতায় ফিরিয়া গেল, মোগলসরাইয়ের পথে ফিরিতে তাহার ভরসা হইল না। দশাশ্বমেধ ঘাটের নিকট পৌঁছিয়া পরেশচন্দ্র দরোয়ানকে বলিলেন সে যেন ছুটিয়া গিয়া গিন্নীমাকে জানায় যে ছোট দিদির শ্বশুর আসিয়াছেন। দরওয়ান চলিয়া গেলে জিনিসপত্র গুছাইয়া লইয়া পরেশচন্দ্র হরশঙ্করের পিছন পিছন যাইতে আরম্ভ করিলেন পথের মাঝখানে হঠাৎ হরশঙ্কর জিজ্ঞাসা করিয়া বসিলেন—"বিনয় এসেছে?" ছোট দিদির স্বামীর নামটা পরেশবাবুর তখন স্মরণ ছিল না সুতরাং তিনি একটু বেকুব হইয়া বলিলেন—"আজ্ঞে?" হরশঙ্করের মেজাজটা তখন অতি রুক্ষ, তিনি জবাব শুনিয়া বুঝিলেন যে কথাটা পরেশচন্দ্রের বৃহৎ মস্তকের মধ্যে প্রবেশ করে নাই। তিনি রাগিয়া আবার জিজ্ঞাসা করিলেন—"কিহে হাঁ কি না, বল না"? পরেশচন্দ্র হাসিবার চেষ্টা করিয়া অতি করুণদৃষ্টিতে হরশঙ্করের দিকে চাহিয়া রহিলেন, কিন্তু এই বৃহদাকার ব্যক্তিটীর দুর্দ্দশা দেখিয়া হরশঙ্করের মনে দয়ার পরিবর্ত্তে ক্রোধের উদ্রেক হইল, তিনি বলিলেন—"কি হে বাপু তোমাদের জামাই এসেছে কি না, বল না"? পরেশচন্দ্র সহসা অকূলে কূল পাইলেন, তিনি অতি করুণস্বরে বলিলেন—'আজ্ঞে না'। হরশঙ্কর তখন আর কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া পথ চলিতে আরম্ভ করিল।

বৈবাহিকের শুভাগমনে স্বামী শিষ্যের নিরুদ্দেশ যাত্রাটা চাপা পড়িয়া গেল, হতাশ হইল কেবল দুইজন। সারদা আর পরেশচন্দ্র। বৈবাহিককে দেখিয়া হরসুন্দরী মনে করিয়াছিলেন, যে জামাতাও বোধ হয় সঙ্গে আসিয়া-

ছেন, সঙ্গে জামাতা আসে নাই দেখিয়া তাহার আশা হইয়াছিল যে বৈবাহিক যখন আসিয়াছেন তখন জামাতা দুই এক দিনের মধ্যে আসিবে। চারি পাঁচ দিন পরেও যখন বিনয়ের দেখা পাওয়া গেল না তখন হরসুন্দর পুত্রের সন্ধানে লক্ষ্ণৌ রওনা হইলেন আর ভবসুন্দরী হতাশ হইয়া তীর্থ ধর্ম্মে মন দিলেন। বিনয় কলিকাতায় পৌঁছিয়াই পিতাকে পত্র লিখিল—

শ্রীচরণ কমলেষু

একদিন লক্ষ্ণৌ থাকিয়া অত্যন্ত জ্বর হওয়ায় দেশে ফিরিয়া আসিয়াছি। কয়দিন যাবৎ অত্যন্ত পীড়িত থাকায় আপনাকে সংবাদ দিতে পারি নাই। এখন জ্বর ছাড়িয়াছে কিন্তু শরীর অত্যন্ত দুর্ব্বল। শীঘ্র কলেজ খুলিবে বলিয়া বাড়ী যাইতে পারিলাম না। ইতি

সেবক বিনয়।

হরসুন্দর লক্ষ্ণৌ হইতে কাশীতে ফিরিয়া আসিয়া পত্র পাইলেন এবং বৈবাহিককে পড়িয়া শুনাইলেন। দুইদিন পরে তিনি যখন কলিকাতায় আসিলেন তখন বিনয় মাথা কামাইয়া ফেলিয়াছে, দিবারাত্রি মাথায় উপর একটা ভিজা কাপড়ের পটি দিয়া রাখে এবং সর্ব্বদা একটা নীল রঙের বসন পরিয়া থাকে। তাহার অবস্থা দেখিয়া হরসুন্দর প্রথমে ভয় পাইলেন এবং তাহাকে দেশে লইয়া যাইবার জন্য জেদ করিতে আরম্ভ করিলেন। কলেজ খুলিবার অছিলায় বিনয় কোন মতে দেশে গেল না। হরসুন্দর চিন্তিত মনে দুইদিন পরে দেশে ফিরিয়া গেলেন বিনয় নিশ্চিন্ত মনে পাঠে মন সংযোগ করিল।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

বিনয় কলিকাতায় ফিরিলেই নির্ম্মল তাহাকে ডাকিতে আসিল কিন্তু বিনয় গেল না। সে কেন গেল না নির্ম্মলের তাহা বুঝিতে বাকী রহিল না সুতরাং সে আর বিশেষ অনুরোধ করিল না। ক্রমশঃ সে নিজের চেহারাটা বদলাইয়া ফেলিল; সে মাথায় লম্বা লম্বা চুল রাখিল, তাহা আবার মাঝে দুইবার কোঁকড়াইয়া আনিত, গোঁফের দুই পাশ কামাইয়া দাড়িগানটা ছোট করিয়া ছাঁটিল। কাপড় কোঁচাইয়া পরিত, মাথায় সুগন্ধী তৈল ব্যবহার করিত এবং সর্ব্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিত। এইরূপে দুইমাসের মধ্যে বিনয়ের চেহারা এতদূর পরিবর্ত্তন হইয়া গেল যে যাহারা তাহাকে কাশীর স্বামী নির্ম্মলানন্দের বড় চেলা বলিয়া জানিত তাহাদের আর প্রেসিডেন্সী কলেজের চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র শ্রীমান বিনয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়কে চিনিবার কোনই উপায় রহিল না। নির্ম্মল দিনের পর দিন তাহার পরিবর্ত্তন দেখিয়া মাঝে মাঝে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিত—"কিরে তোর হলো কি?" বিনয় হাসিয়া বলিত—"স্বামিজীর চেলাগিরির পুরস্কার।" 'তোলটা এমনই বদ্‌লে ফেলেছিস্ যে সকল সময় আমিই তোকে চিন্‌তে পারি না।"

দেখিতে দেখিতে পূজা আসিয়া পড়িল, পূজার ছুটি যত নিকটে আসিতে লাগিল—ততই বিনয়ের ভয় বাড়ীতে লাগিল। অবশেষে বিনয় একদিন নির্ম্মলকে জিজ্ঞাসা করিয়া বলিল—"নিরু এবার কি করি বল্ দেখি?" নির্ম্মল তখন কলেজের সম্মুখে এক পানওয়ালার দোকানে দাঁড়াইয়া সিগারেট টানিতেছিল, সে জিজ্ঞাসা করিল—'কেনরে?" "পূজার ছুটি ত সম্মুখে, এবার বাড়ী যেতেই হবে, তার পর?" "তার পর আর কি? শ্বশুর বাড়ী—যে রকম তোল ফিরিয়ে ফেলেছিস্ তাতে নির্ম্মলানন্দও তোকে চিন্‌তে পারবে না।" "চেনার কথা নয় তাদের যে রকম আচরণ দেখেছি তাতে তাদের সঙ্গে যে আমার একটা নিকট সম্পর্ক আছে সে কথা মনে করতেও আমার ঘৃণা হয়।" "কেন? গিন্নিমা—তোর শাশুড়ীত বেশ লোক?" বিনয় একটু দুঃখের হাসি হাসিয়া বলিল—"নিরু ওদের তোর বিয়ে হলেই ভাল মানাত। ওরা সব সুন্দর, ওরা সবই ওদের গায়ের রঙের মত সুন্দর চায়, সেই জন্যই দুজনের মধ্যে তোকে সব চেয়ে ভাল লেগেছিল।" নির্ম্মল একটু মুখ বাঁকাইয়া বলিল—"সে যা হোক্ বিয়ে যখন হয়ে গেছে তখনত আর ফেরাবার যো নেই। হিন্দু ম্যারেজ্ আইনের যতদিন পাশ না হচ্ছে ততদিন শ্রীমতী অন্নদাসুন্দরীকে তোমার ধর্ম্মপত্নী বলে মেনে নিতেই হবে। বিনু বউটি দেখ্‌তে শুন্‌তেও বেশ তবে তোর মনে ধরে না কেন?" "নিরু বাহির সুন্দর হলেই সকল সময় ভিতর সুন্দর হয় না একথাটা মানিস্ কি?"

নির্মল উত্তর না দিয়া পানওয়ালার দোকান হইতে পান কিনিল এবং আর একটা সিগারেট ধরাইয়া বলিল—"ও কথাটার মীমাংসা এত সহজে হয় না ক্লাসে শাস্ত্রী মেঘদূত পড়াবে, তুই যাবি নি?' বিনয় ম্লানমুখে বলিল—"আমার আজ রঙ্গরস ভাল লাগ্‌ছে না ভাই। তোর যে হঠাৎ সংস্কৃতের উপর এত টান?" "আমি ভাই সাহিত্য শাস্ত্রের চেয়ে রসশাস্ত্রটা ভাল বুঝি সেইজন্য স্বামিজীর উপর এ টান, হরিশ কবিরত্নটা কাটখোট্টার মত কি বলে যায় আমার মোটেই ভাল লাগে না।" নির্মল উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া বিনয়ের হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া চলিল, কিন্তু কলেজের ফটকের কাছে গিয়া দুই বন্ধুই থমকিয়া দাঁড়াইল। বিনয় দেখিল যে কৃষ্ণকায় একটা বৃহৎ বপু তাহাদের পথরোধ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। নির্মল একটু রাগিয়াই বলিল—"পথটা ছাড়ুন না মশাই?" বপুপ্রস্থ মানুষটি আমূর্ণ বিস্তৃত রসনাবর বিস্তার করিয়া বলিল—"এজ্ঞে বাবাজি?" বিনয় আরও রাগিয়া বলিয়া উঠিল—"পথ ছাড়ুন না মশাই ক্লাসের যে দেরী হয়ে গেল?" পরেশচন্দ্র একটু অপ্রস্তুত হইয়া একটু সরিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন—"এজ্ঞে আমি হুজুরের ছিচরণের দাস পরেশচন্দর।. নির্মল সিগারেটটা পরেশচন্দ্রের মুখে গুঁজিয়া মারিয়া বলিল—"ভ্যাম্।" আর বিনয়ের হাত ধরিয়া টানিয়া কলেজের ভিতর চুকিয়া গেল। ভক্ত পরেশচন্দ্র সিগারেটের আঘাত সহ্য করিয়া নির্ব্বাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

সেইদিন বাসায় ফিরিয়া নিজের ঘরে চুকিবার আগে বিনয় হাতীর শুঁড়ের মত একখানা পা দেখিতে পাইয়া বুঝিতে পারিল যে ভক্ত পরেশচন্দ্রের আবির্ভাব হইয়াছে। সে বিনয় না করিয়া ঘরে চুকিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"আপনি কে, কোথা থেকে আস্‌ছেন্?" অস্বীকার পরেশচন্দ্র বহুকষ্টে বরবপু উত্তোলন করিয়া বিনয়কে প্রণাম করিলেন, তাঁহার ঘর্মাক্ত মলিন জামার গন্ধ বিনয়ের নাসিকায় প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে অস্থির করিয়া তুলিল। পরেশচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল—"এজ্ঞে আপনি বোধ হয় ছোট জামাইবাবু?" বিনয় গম্ভীরভাবে বলিল—"দেখুন একটা বিবাহ করেছি বটে সেটা আপনাদের ঘরে কি না সেটা হলপ্ করে বলতে পারি না। আপনাদের ঘরে হলেও সেটা বড়দরকা কি ছোটদরকা সেটা ঠিক মনে নাই।" জবাব শুনিয়া ভক্ত পরেশচন্দ্র থমকিয়া গেলেন, দুই মিনিট পরে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনি কি হরশঙ্কর বাবুর পুত্তুর?" বিনয় একটু হাসিয়া বলিল—"আমার পিতার নাম শ্রীহরশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় নিবাস হরিহরপুর।" পরেশচন্দ্র চরিতার্থ হইয়া বলিল—"এজ্ঞে দেবতা তবে ঠিকই হয়েছে, কেন আর ছলনা করেন আপনিই আমাদের ছোট জামাইবাবু।" বিনয় প্রসন্ন হইয়া বলিল—"আপনি যখন নিজেই মেনে নিচ্ছেন্ তবে আর আমার অস্বীকার করে লাভ কি? বসুন।" চাদর দিয়া কপালের ঘাম মুছিয়া পরেশচন্দ্র একখানা চৌকীতে বসিলেন, কিন্তু চৌকীখানা তীব্র কাতরস্বরে নিজের দুর্ব্বলতা জ্ঞাপন করায় তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইল। বিনয় তখন পরেশবাবুকে তক্তপোষের উপর বসাইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কল্‌কাতায় কি কোন কাজে এসেছেন্?" পরেশবাবু বলিলেন—"এজ্ঞে বিশেষ কাজ, আপনাকেই নিয়ে যেতে আসা হয়েছে।"

(ক্রমশঃ)

ব্যর্থ

(ইংরাজি হইতে)

[আবুলফজল্ মোঃ আব্দুল হক]

বঁধুর গলে মধুর তালে দুলেনা যে বাহুলতা
ব্যর্থ তাহার শোভার বাহার ব্যর্থ চারু কোমলতা।
অন্ধ—মধুর মৃগ-নয়ন হেরেনি যা' প্রিয়-মুখ,
সার্থকতা হয়নি তাহার পায়নি কভু ধরি-সুখ।

মধু-বসন্ত এল কতবার, পুনঃ ফিরে গেল চলে,
সুবাসিত ফুল হাসিয়া ফুটিয়া, দুলিল প্রেমিক-গলে।
মম হৃদয়ের প্রেমের কুসুম ফুটিল না কভু হায়,
শোভিল না কারো কণ্ঠের হার বৃথাই শুকিয়ে যায়!

মিতিয়ার স্বপ্ন

(কেরর ভোইভোদ্ধি)

[শ্রীমতী সরস্বতী দেবী]

রমণী দীর্ঘাঙ্গী ; তার সেই আজন্ম শুষ্ক শরীর ভেদ করে পিঠের পাঁজরাগুলি আবরণমুক্ত হয়ে পড়েছিল। তাকে দেখলে মনে হয় যেন বয়স তার চল্লিশ পার হয়ে গেছে, আসলে সে কিন্তু বিশ বছরের অধিক হবে না। মুখ পাতলা ও নাতিদীর্ঘ। তার উভয় বাহুমধ্যস্থিত শিশুর ক্রন্দনরোল ধ্বনিত হয়ে আশে-পাশের নীরবতায় গতিরোধ করছিল। বালকের চিৎকার ক্রমশঃ বেড়ে যেতে লাগল, আর মাঝে মাঝে সে তার শৈশব-বিজড়িত ক্ষুদ্র নীলাভ দীর্ঘ হাত দুখানি তুলে ধরছিল।

..."ওরা অত চিৎকার করচে কেন? বলনা কেন কেঁদে মরচে?" মিতিয়া ভ্রাইভারকে জিজ্ঞেসা করলে।

"ও একটা শিশু কাঁদচে, টের পাচ্ছনা?"

জাতিন-মুখে 'শিশু' কথাটা শুনতে মিতিয়ার বড় মিষ্টি লাগত। এতে আরও যেন কিছু দুঃখ মাখান আছে বলে তার মনে হত।.....

..."কিন্তু কাঁদচে কেন? মিতিয়ার জিদ বেড়ে গেল। সে বললে, "ওর ওই কচি হাতদুখানা অনাবৃত কেন? ওরা কি এ-ও ঢেকে রাখতে পারেনা?"

"ভ্রাইভার বললে "দেখচনা, ছেলেটার ঠাণ্ডা লেগেচে তার বদন ভুবার-সিক্ত, সেত ওটা সহ্য করতে পারে না।"

..."কিন্তু করতে পারবে না কেন? ও গো বলনা কেন? মিতিয়ার জিদ এখনও প্রশমিত হয় নি।

"শুনবে কেন? ওরা হতভাগা, জলে পুড়ে থাক্ হচ্ছে। ওদের একখণ্ড রুটী নাই যা খেয়ে ওরা বেঁচে থাকে। ওরা ভিক্ষে করচে, কেন না ক্ষুৎপিপাসায় ওদের দেহমন দগ্ধ হয়ে যাচ্ছে।"

..."না না" মিতিয়া তখনও যেন কিছু বুঝতে পারেনি তাই বিচলিতস্বরে বললে, "ওগো, বল আমায় কেন ওই সমস্ত দীনহীন মানেরা ওখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে? মানুষ এত নীচ প্রবৃত্তির বশীভূত হয় কেন? ছেলের হতভাগা কিসের জন্য? ঐ অনুর্বর প্রান্তর শস্যদানে পরাঙ্মুখ কেন? কেন ওরা উভয়কে উভয়ে বাহুপাশে বদ্ধ করে চুম্বন দানে তৃপ্ত করে না? প্রফুল্ল সঙ্গীত শ্রবণে ওদের মন এত উচাটন কেন? ভীষণ দুঃখে ওরা এত গভীর কালো আঁধারে ঢাকা কেন? ওরা নিজেদের শিশুগুলিকে অভুক্ত রাখে কেন? বল আমায়.....

অবোধ্য

[শ্রীলীলা দেবী]

ভক্তি আকুল অন্তরাকাশ
প্রতিমার আবাহন
ফুল চন্দন ধূপাগুরু বাস
বোধনের আয়োজন
সেই অন্তর ভক্তিও সেই
বদল হয়নি তার
ভাসান দিতে সে চলিল কেমনে
মর্ম যে বোঝা ভার!

সেই ভালবাসা সেই সাধ আশা
বদল হয়নি তার
পাশরিয়া সব কেমনে চলিল
মর্ম বোঝা যে ভার
সজল কমল নয়ন তুলিয়া
বারেক না চায় তারে
বদন আঁচল ঢেকে নিল সব
গহন অন্ধকার।

গুচ্ছ

[শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার গুপ্ত]

জীবন্তের শ্রাদ্ধ :—

শোনা যায় জাপানের না-কি সবই অদ্ভুত। কি খাওয়া কি শোয়া সব জিনিষের মধ্যেই একটা বৈচিত্র্য আছে। জাপানের কোচ সহরে সম্প্রতি আর একটী বেশ আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটেছে। একটি জীবন্ত বৃদ্ধ দম্পতীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া নির্ব্বাহ হয়ে গেছে।

বৃদ্ধ ভদ্রলোকটী সহরের অনেক ধনবান ব্যক্তি। তাঁর এবং তাঁর স্ত্রীর বয়স এখন সত্তর বছর। তাঁদের উভয়ের ইচ্ছানুক্রমেই অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাপন করা হয়েছে। উক্ত ব্যাপারটা বৌদ্ধমতে কোচির ইয়াংকিউ পার্কে মহাসমারোহে হয়ে যাবার পর ভদ্রলোকটী নিজের হোটেলে দুঃখপ্রকাশক ও উৎসবে যোগদানকারীদের একটী সুন্দর ভোজ দিয়েছিলেন। তাঁদের বিশ্বাস যে এই উৎসবই তাঁদের জীবনকে আরও দীর্ঘ করে দেবে। খেয়াল মন্দ নয়! আমাদের দেশে এ রকম খেয়ালী মানুষ কেউ আছেন কি?

বোবা ও কালার কৃতিত্ব :—

ব্রাইটনে একটী বোবা—ও—কালা ভদ্রলোকের সন্ধান পাওয়া গেছে। তিনি কোন মোটর নির্ম্মাতার দোকানে কাজ করেন। কাজকর্ম্মে তাঁর কিছুই অসুবিধা হয় না। অন্যান্য অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি তাঁর অসাধারণ কর্ম্মদক্ষতা দর্শনে অত্যন্ত প্রীত হ'য়ে একটী উপহার প্রদান করেছেন। ভদ্রলোকটীর বয়স এখন সাইত্রিশ বছর।

বিখ্যাত বায়স্কোপ ষ্টুডিও :—

আমরা বায়স্কোপ দেখি বটে কিন্তু ছবিগুলো কোথা হতে তোলা হয় তা অনেকেই জানি না। পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্ববৃহৎ ও সর্ব্বপ্রধান ষ্টুডিওটী বার্লিনের কাছেই ষ্টাকেনে ষ্টুডিওটী একটী প্রকাণ্ড হলের মধ্যে অবস্থিত।

হলটী লম্বে ১৫১৬ ফুট। আর ওই স্থানটুকুর মধ্যেই বায়স্কোপের উপযোগী সমস্ত রকম দৃশ্যই সাজান আছে। এপর্য্যন্ত যত ভাল ভাল দৃশ্য বায়স্কোপে দেখান হয়েছে তার অধিকাংশই 'দ এঞ্জেলে' তোলা হয়েছে। ডেনিস্ কিম্ব অভিনেতা Asta Nielsen এর অধীনে এখনও অনেক বড় বড় ধনাঢ্য অভিনেতা ও অভিনেত্রী যিশুখৃষ্টের জীবন সম্বলিত একখানা ছবি তুলছেন। ছবিটী নাকি আগামী বছরের সময়ে জগতের বড় বড় স্থানে দেখান হবে।

কোকেনের জন্ম :—

এ দেশে কোকেন প্রথম আনা হয়েছিল ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে। তার পর থেকেই ঔষধ বিশেষে লোক থেকে এদেশে সরবরাহ হয়ে আসছে। এখন জাভা দেশে কোকেনের লতা যত জন্মায় পৃথিবীর আর কোনো অংশেই তত জন্মায় না। এ বৎসরও প্রায় ২, ২৫০, ০০০ সের পাতা সরবরাহ করা হয়েছে।

হাসির ভাষা :—

অনেক ইতালিয়ান রাজনীতিক বলে গেছেন—কি হাতের লেখা, কি চলন,—যাই বল না—হাসি দেখে মানুষের চরিত্র যতটা জানা যায়, আর কিছুতেই ততটা জানা যায় না।

যারা খুব জোরে হা হা ক'রে হাসে তাদের মনটা খুব খোলা থাকে। তারা বেশ উদার আর আমুদে। যারা দিনরাত ভাবনার বোঝা মাথায় নিয়ে চলে তাদের হাসিটার একটু বেশ বৈচিত্র্য আছে, তারা প্রায়ই আস্তে আস্তে হে হে করে হাসে—অনেকে কাষ্ঠ-হাসি বলেও বলতে পারেন। যারা খুব উদাস—মনে যথেষ্ট সাহস আর শক্তি আছে—তারা সকলেই প্রায় হো হো করে হাসে—নির্ভাবে! কিন্তু যারা হু হু করে হাসে তাদের আদৌ বিশ্বাস করতে নেই। কূটনীতিজ্ঞদের মধ্যেই এ হাসিটা একটু বেশী চলে। বাসস্তীতে বিনয়বাবুর লাফিং গ্যালারীর দিকে তাকালে তার অনেকটা আভাস পাওয়া যায়। মেয়েদের মধ্যেও যারা খুব দাঁত বার করে হাসে—তারা সচরাচর বাচাল বলেই অভিহিত। আর যারা বেশ মুখ টিপে টিপে হাসতে পারে তারা সাধারণতঃ নম্র আর লাজুক হয়। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে পরীক্ষা করলেই—সব ধরা পড়ে যায়।

বিয়ের স্বপ্ন :—

স্বপ্ন অনেক রকমেরই হয়—কিন্তু বিয়ের বিষয়েও যে লোকে স্বপ্ন দেখে তা অনেকেরই জানা নেই। বিলাতে একটা প্রবাদ আছে যে যদি কোন অবিবাহিতা মেয়ে কোন ব্যক্তিকে স্বপ্ন দেখে তা হলে বুঝতে হবে যে নিশ্চাই কোন ধনী যুবক সাগরপার থেকে তাকে বিয়ে করতে আসছে। মন্দ নয়!

পুরাণো কারখানা :—

জাপানে একটী জাহাজ তৈরী করার কারখানা আছে। সেটি উনিশ শত বছর আগে স্থাপিত হয়েছিল। এখনও তাতে বেশ কাজকর্ম চলছে।

কলির ভাষ্য :—

স্ত্রীলোকের সঙ্গে বাস করা ত দূরের কথা স্ত্রীলোককে দেখবামাত্রই সমস্ত গা জ্বলে ওঠে এমন পুরুষ এদেশে নেই বললেই চলে—কিন্তু কিছুদিন আগে আমেরিকায় একজন ছিলেন যিনি স্ত্রীলোককে দু'চক্ষে ছাড়া একচক্ষেও দেখতে পারতেন না। তিনি আমেরিকার সুবিখ্যাত বৈজ্ঞানিক—ডাঃ হেনরী ক্যাভেণ্ডিস। তাঁর নিজের বাড়ীতে অনেক দাসদাসী থাকত বটে—কিন্তু তারা সকলেই তাঁর চোখের আড়ালে থাকত। কারও সঙ্গে চোখোচোখী হলেই—তাকে চাকরী হতে বিতাড়িত করা হোত। তাঁর লিখিত বই দেখেই তারা সকলে কাজকর্ম করত। পুরাণের ভীষ্ম ছাড়া এ রকম লোক এই প্রথম।

লিলিপুটিয়ান গ্রন্থ :—

গত ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে প্যারিসের প্রদর্শনীতে মহাকবি ডান্টের রচিত Divine Comedyর এক ক্ষুদ্রতম সংস্করণ দেখতে পাওয়া গিয়াছিল। কাব্য গ্রন্থখানি ফরাসী ভাষায় মুদ্রিত। বইখানির আকার ছিল মোটে আধ ইঞ্চি, পাতাও বড় কম ছিল না—পাঁচশ'র কিছু বেশী হবে। বইখানির জন্যে দু-তা কাগজও খরচ হয়নি! নস্যির ডিবে করেও নেওয়া যায়—সন্দেহ নেই।

* * * *

বছরে শুধু ভারতবর্ষে ৭৫০,০০০'০০০ লক্ষের চেয়েও বেশী বাতী জ্বালানো হয়।

* * * *

একবর্গ মাইলের মধ্যে ৭,২৬৫০০০ জন লোক পাশা-পাশি দাঁড়াতে পারে।

* * *

ফ্রান্সের অর্দ্ধেক অধিবাসীই কৃষিজীবি।

* * * *

একটা পেন্সি থেকে ৪,৭০০ ফিট লম্বা তার প্রস্তুত হয়।

আঁধার রাতের শিউলি

[শ্রীচণ্ডীচরণ মিত্র]

আলোকি' বন ফুটলি তোরা
শিউলি আঁধার-রাতের,
তোদের পানে চাইলে তুলি'
কাজটি আমার হাতের।
রক্ত-বোঁটায় শুভ্র দল,
চন্দন দিস্ নিঃশ্বাস!
কা'র তরে? ওরে কই সে বল্—
প্রলেপ দুঃখ-তাপের?

পুলকি' মন ফুটলি তোরা
শিউলি আঁধার-রাতের,
তোদের পানে চাইলে তুলি'
কাজটি আমার হাতের।
রক্ত-লোহিত শুভ্র-রূপ,
সঘুন-শিখার আল্‌পনা চুপ!
কা'র পায়ে? ওরে কই সে চুপ—
মরম-ব্যথা সাথের?

Printed by Bijoy Krishna Dass at the Lakshmibilas Press,
14, Jagannath Dutta Lane, Calcutta.

সচিত্র সাপ্তাহিক পত্রিকা

২য় বর্ষ] ২৫শে আশ্বিন, শুক্রবার ১৩৩০, ইং ১২ই অক্টোবর। [১৫শ সংখ্যা

অজ্ঞানের জন্মভূমি

স্ত্রী—হ্যাগা মাটীর উপর শুয়ে কেন?

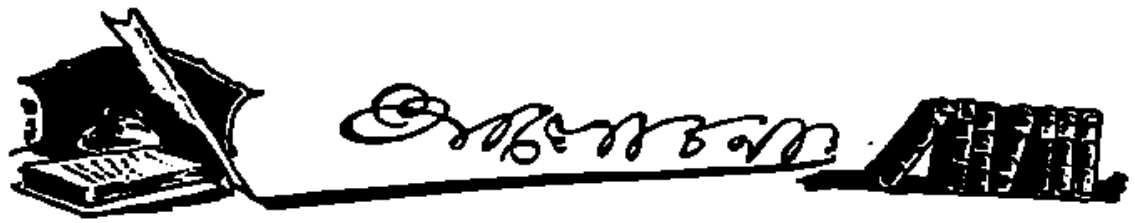

এ দেশের কেহ কেহ জীবনে আশা আকাঙ্ক্ষার সাফল্য না দেখাইতে পারিয়া, মানুষের স্বাভাবিক অভিব্যক্তির প্রকাশ পথ সব দিকে রুদ্ধ দেখিয়া নানা দিকে ব্যর্থ প্রয়াস করিতে যায়। শক্তিশালী অথচ বিপথগামী এইরূপ কয়েকটি যুবকের এই প্রচেষ্টাই একদিন বাংলায় বিপ্লববাদ আসিবার প্রয়াস পাইয়াছিল। তাঁহাদের সেই প্রচেষ্টার কাহিনী গ্রন্থ আকারে কয়েকখানি বাহির হইয়াছে—সেই বিপ্লব যুগের ইতিহাস-কাহিনীগুলি পাঠ করিলে দেখা যায় তাহাতে তাঁহারা তাঁহাদের কলা-কৌশল চিন্তা সব একেবারে খুলিয়া বলিয়াছেন। যতটুকু হইয়াছে আরো কত কি কি উপায়ে হইতে পারিত সবই তাহাতে আছে। মন্ত্র-গুপ্তি এতটুকু নাই। যে রাজাট বিলকে দেশের লোকে নিন্দা কত করিয়াছে—বিপ্লব-দগ্ধ-মুক্ত লেখকেরা তাহাই আবার প্রামাণ্য গ্রন্থ ধরিয়া লইয়া নিজেদের বিপ্লবযুগের কর্ম বর্ণনা করিয়াছেন। বিপ্লব নেতাদের গ্রন্থগুলি পাঠ করিলে দেখা যায় আর একটি বৎসর যদি ভারতের আরাম-মুগ্ধ বৃটিশ সিংহ সুপ্ত থাকিত তবে সেই সুপ্ত অবস্থায়ই হয়তো তাহারা এখান হইতে বিদায় হইতেন। কিন্তু সিংহের জাগরণে তাহা ঘটে নাই—দু'দিনে বিপ্লব নিভিয়া যায়। দেশে বিপ্লব বন্ধ হইল বটে—কিন্তু বিপ্লব-উদ্ভবের মূল কারণ গেল না। দেশের অভাব ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিল। মহাযুদ্ধে ভারত অর্থ দিল প্রাণ দিল কিন্তু রাজ প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী মানুষের অধিকার পাইল না। ব্যথিত ভারত মহাত্মার শরণাপন্ন হইল—দেশের বিপ্লব মহাত্মার প্রভাবে অন্তর্হিত হইল—দেশবাসী মনুষ্যত্ব অর্জন করিয়া সমাজ, পরিবার, জনজীবন গঠন করিয়া দেশবাসীর ন্যায্য অধিকারের দাবী করিবার জন্য প্রস্তুত হইল। মহাত্মার কারাদণ্ডের পর আবার সব ছত্রভঙ্গ—দেশবাসী বিপ্লব চাহে না তাহারা মহাত্মার কর্ম পদ্ধতি চাহে, মহাত্মাকে তাহাদের ভিতরে চাহে—কিন্তু তাহা হইতে কোন অপরাধে তাহারা বঞ্চিত?

• • • •

বিপ্লব সম্ভাবনায় ধৃত ৩ আইনে আটক বন্দীদের সম্বন্ধে সরকার কমিনিক বাহির করিয়াছেন। জানি না ইহাদের কি অপরাধ—তবে বিপ্লব সাহিত্যের আলোচনায় দেখা যায় কমিনিকে ইহারা যে সব যুক্তি দেখাইয়া দেশবাসীকে সরকারের সুবিবেচনা সম্বন্ধে সন্দিহান হইতে নিষেধ করিয়াছেন সে যুক্তি সহজে খণ্ডন করা যায় না। কিন্তু বিপ্লব তো দেশবাসী চাহে না—আর এই নিরস্ত্র দেশে বিপ্লবের নামে দেশের লোকের উপরই যে অকথ্য অত্যাচার ইহা কে সমর্থন করিবে? কিন্তু শক্তিশালী বৃটিশরাজের ইহাতে বিব্রত হইবার কি আছে? বিপ্লব কেন আসিবে দেশে—কি কারণ,অসন্তোষ কেন? সত্যই যদি বিপ্লব সম্ভাবনা তাঁহারা দেখিয়া থাকেন তবে ইহার মূল কারণ দূর করুন দেশবাসীকে মানুষের অধিকার দিন—মহাত্মাকে মুক্তি দিন। রাজা প্রজার তিক্ত সম্বন্ধে কাহারও মঙ্গল নাই—অথচ মধুর সম্বন্ধে দু'পক্ষেরই মঙ্গল—দেশেরও মঙ্গল। দেশ তাহাই চাহে। সে সম্বন্ধ আসিলে বিপ্লব সত্য থাকিলেও তাহার মূল দূর হইবে।

• • • •

মহাত্মা বলিয়াছিলেন সব জিনিসের চেয়ে সত্যের মর্যাদা আগে রক্ষা করিতে হইবে। স্বরাজ বা স্বাধীনতার চেয়েও তিনি সত্যের স্থান উচ্চে দিয়াছিলেন। সত্য কথা—জীবনে সত্য যখন সুপ্রকাশ হইয়া উঠে তখন অপর সমস্ত গ্লানি লজ্জা ভয় মৈত্র আপনা হইতেই দূর হইয়া যায়। জীবনে মিথ্যার প্রশ্রয় কে

বেশী দেয়—স্বাধীন না পরাধীন? সত্য মিথ্যা অবশ্য পাশা-পাশি ভাবেই বাস করে—একের অভাবে অপরে ফুটিতেও পারে না। কিন্তু পরাধীনের দেশে, সমাজে রাষ্ট্রে, ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনে মিথ্যা যেমন তীব্র উজ্জ্বল হইয়া উঠে এমন বোধ হয় স্বাধীন জাতির মধ্যে হয় না। সত্য প্রকাশে ক্ষণিকের অপ্রীতি আসিবে, ব্যক্তিগত অসুবিধা হইবে এই মনে করিয়া সত্য চাপা দিতে দিতে অবশেষে তাহার পরিনাম এমন ভীষণ হইয়া দাঁড়ায় যে মিথ্যার বেড়াজালে একেবারে পিষ্ট করিয়া ফেলে। ইহা ব্যক্তিত্ব বিনাশ করে, সমাজ, পরিবার, রাষ্ট্র-জীবন সব আচ্ছন্ন করে। এই অবস্থা এদেশের সব দিকে সুপ্রকাশ।

বর্ষের পর আসিতেছে, চলিয়া যাইতেছে ভারতের জনগণের মনোমন্দিরের দেবতা মহাত্মা আজও এই শেষ বয়সে কারারুদ্ধ অবস্থায় রহিয়াছেন তাঁহার মুক্তির আন্দোলন দেশে কই?—তাঁহার কার্য্য প্রণালী ক্রমে লোকে ভুলিতেছে। দেশে আশার যে একটা আলো আসিয়াছিল তাহা ক্রমেই লুপ্ত হইতেছে। নূতন নূতন যে সব প্রচেষ্টা দেশে চলিতেছে তাহা দেশবাসী প্রাণ দিয়া গ্রহণ করিতে পারে নাই। অন্ন বস্ত্রের অভাব বেদনা দেশে ক্রমেই বাড়িতেছে—ইহা মিটাইবার কোন উপায় কোন দিক হইতে হইতেছে না। মরিবার যাহারা তাহারা ভুগিতেছে, মরিতেছে—কে তাহাদের পানে চাহিবে। অভাবের দেশে কোন উচ্চ কাজ সহজে হইতে পারে না, নিজে যে ক্ষুধার জ্বালায় সদা ব্যাকুল—পরিবার পরিজন যাহার না খাইয়া মরিতেছে দেশমাতৃকা দেশোদ্ধার প্রভৃতি বড় বড় কথা তাহার কাছে কিরূপ শোনায়? তবু ভাবপ্রবণ এদেশের লোক না খাইয়াও বার বার একথার মজিয়াছে—প্রাণ দিয়া যে দেশ মাতৃকার সেবা করিয়াছে সে ঠকিয়াছে যে জিতিবার উদ্দেশ্যে গিয়াছিল সে দেশের নামে জিতিয়া বসিয়া খাওয়ার উপায় করিয়াছে। তাই আজ অনেকেই ভাবে না খাইয়া মরিলেও ভাল তবু ও সব বড় বড় তত্ত্বকথার মেটিমেটে মজিব না। এখন কি পন্থা? দেশের ব্যাপারে রাজারও কর্ত্তব্য আছে, প্রজারও কর্ত্তব্য আছে। রাজার আর প্রজার সদা সর্ব্বদা এ উহার দোষ ত্রুটি ধরাইতে ব্যস্ত থাকিলে সে দেশে শান্তি সুখ আসিবে কোথা হইতে? দেশের লোকে না খাইয়া ক্রমাগত মরিতে রহিয়া শান্তিই বা দিবে কোথা হইতে! রাজবিধান দেশের অভাব আগে মিটাইয়া পরে অন্য দিকে দৃষ্টি দিলে দেশে অশান্তি উপদ্রব মোটেই থাকিবে না।

রাত শেষের গান

[শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর]

যাই যাই
আসি আসি
বাতাসে জানায়।
কে যেন আপন জনা
মিনতি জানায়—
যাই যাই।
আসি আসি—
হাসি বাঁশী
সখি যে গাগ্‌ছে বাঁশি—
মন উদাসী
বলছে তাই—
আসি আসি!

যাই যাই,
মিনতি জানাই
সারা রাতের
পরব শেষে,
রাতের বাতাস
চল্লো দেশে।
ডাকছে বুঝি
তাই কোয়েলা
বনের বাসায়
মিনতি জানায়।

নির্ব্বাচন-প্রসঙ্গ

[শ্রীভবতোষ রায় বি-এল]

৺পূজার ছুটী আগতপ্রায়। নির্ব্বাচনের জটিল ভাবও এখনই প্রকট হবে। স্থানে অস্থানে, মানুষ ও অমানুষ অনেকে দাঁড়াচ্ছেন। ধীরে ধীরে কোন বীর কোথা হ'তে আস্‌বেন তার খবর আমাদের হস্তগত হচ্ছে। বাসন্তীর সম্পাদক মহাশয়ও কয়েকদিনের অবসর নিয়ে একটু বাহিরে যাবেন। এ অবস্থায় যেমন ক'রে হোক একটু খবর পূজার সংখ্যায় দিতেই হবে। শ্রীশ্রীসারদীয়া পূজার সূত্রপাতে আমরা কাউকে কিছু ব'লব না, কারণ এ সময় সকলেরই নিকট আমাদের বন্ধুত্ব জ্ঞাপন ক'রতে হবে। নির্ব্বাচন-লেখকের এইটি বিষম অসুবিধা। নির্ব্বাচনে যদি একজন কেউ এক জায়গা থেকে উঠ্‌তেন তবে ত' ভালই হ'ত। এ যে মোটেই তা নয়। রীতিমত সমারোহের সহিত ব্যক্তিগত উচ্চতা এবং নীচতা চারিদিকে বিজ্ঞাপিত হ'চ্ছে। এমন সময় সকলেরই মনে স্বাধীন চিন্তার ফলে একটি কি আরেকটি লোকের স্বপক্ষে অথবা বিপক্ষে যেমনই হোক না কেন একটা ধারণা ঠিক হয়ে যাচ্ছে। আমাদের মনেও একটা কোন কিছু ভাব যে না আস্‌ছে তা নয়। তবে আমাদের এসব বিষয়ে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে আলোচনা কর্‌তে হবে—কাজেই যার যেখানে ত্রুটী কিম্বা ভুল সেটা আমরা বেশ স্পষ্ট ক'রে দেখিয়ে দিতে চাই।

স্বরাজ্য দল থেকে অনেক স্থানেই নির্ব্বাচন প্রার্থীগণ প্রতিযোগীতায় অবতীর্ণ হ'য়েছেন। শোনা যায় তাঁরা গূঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে সকল স্থান হ'তেই তাঁদের সিল মোহর দেওয়া রাজনীতিকগণ সাফল্যমণ্ডিত হবেন। কারণ—এঁরা সকলেই দেশের জন্য জেলে গিয়েছেন। কিন্তু জেলে যাওয়া আর গঠনমূলক কাজ করবার ক্ষমতা এ দুটি যে সম্পূর্ণ ভিন্ন পদার্থ সেকথা তো ভুললে চলবে না। এদের দল থেকে একটি একটি ক'রে যে সব তৃতীয় শ্রেণীর বস্তুকে খাড়া করা হচ্ছে, তাতে চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই বেশ বুঝতে পার্ব্বেন, যে সকলে চেয়ে গিয়ে কংগ্রেসকে লোক চক্ষুতে হেয় করা ভিন্ন এঁদের আর কোন উদ্দেশ্য নাই।

কনষ্টিটিউশনাল পার্টির নেতা এডভোকেট জেনারেল শ্রীযুক্ত সতীশরঞ্জন দাস মহাশয় বড়বাজারের ঐ দিকের অ-মুসলমান কেন্দ্র হতে নির্ব্বাচন-প্রার্থী। মাননীয় দাস মহাশয় সম্বন্ধে আমরা কাগজে অনেক কথা অনেক সময় দেখি। এমন কি, সেই যখন পুলিশ বজেট পুনরায় উপস্থিত করার জন্য কাউন্সিলে একটি প্রস্তাব ইনি ক'রেছিলেন, সেই বিষয় নিয়েই সতীশরঞ্জনের বিরুদ্ধে অনেকে অনেক কথা বলেন। আমরা একটি খুব সাধারণ কথা এই স্থানে জিজ্ঞাসা ক'রে রাখবো, এবং আশা করি শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ রায়, শিব শেখরেশ্বর রায়, ইন্দুভূষণ দত্ত, ফজলল হক্ প্রভৃতি আমাদের কথার জবাব দিবেন। এই পুলিশ বজেট বিষয়ে সতীশরঞ্জন কাউন্সিলের অন্যান্য কতিপয় সভ্যের মতানুসারে কাজ ক'রেছিলেন কি না? যদি আমরা এ বিষয়ের সন্তোষজনক উত্তর না পাই, তবে ভেতরের খবর জানলে তাঁরা বেশ দেখ্‌তে পাবেন, যে সভাই চৌড়াই বক্তৃতা ক'রেও অনেকে ভিতরে ভিতরে অনেক কাজ করেন। সতীশরঞ্জনের অপরাধ তিনি নির্ভীকচিত্তে, যেখানে অন্যান্য অনেকে সাহস পান নি, সেখানে তাদের মুখপাত্র হিসাবে বিষয়টির পুনরুত্থাপন করেন। এমনই অনেক বিষয়ে সতীশরঞ্জন নিজ স্কন্ধে গুরুতর কর্ত্তব্যভার সকল গ্রহণ ক'রে নিয়েছেন এবং দক্ষতার সহিত সে সব কাজ সম্পাদন করেছেন। আমরা সুখী হ'লেম শুনে যে সতীশরঞ্জনকেই ৫,৭নং ওয়ার্ডের সম্ভ্রান্ত বাঙ্গালী এবং মারোয়ারীগণ নির্ব্বাচন কর্‌তে উৎসুক।

কিন্তু যে দলের কোন আশা কোন দিকে নাই, তাঁরা অন্ততঃ সব স্থানেই একটু ক'রে গোলমাল কর্ব্বেন—নইলে যে সব ফুলই যায়। মেদিনীপুর হ'তে এঁরা খ'রে এনেছেন বাবু সাতকড়িপতি রায় নামক জনৈক লোককে সতীশরঞ্জনের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বীতার জন্য। শুনব যে এই মহাশয়টি নাকি এবার দেশমাতাকে একেবারে উদ্ধার ক'রে নিয়ে আস্‌বেন এবং ইত্যাদি অনেক রকম প্রলোভন এবং ভীতি প্রদর্শন ক'রে প্রজাদের কাছ থেকে অনেক

টাকা তুলে এনেছেন এই কাজে ব্যয় ক'র্বেন ব'লে। সে যাই হোক, বাবু সাতকড়িপতিকে যে কাবাকড়ি হ'য়ে ফিরে আস্‌তে হবে সে কথা আমরা বেশ জানি। নির্ব্বাচন-প্রার্থী সতীশরঞ্জনের কাছে বাবু সাতকড়ি-পতির মতন অজ্ঞাতনামা একজন ব্যক্তিকে ধরে বেঁধে দাঁড় করিয়ে কি কংগ্রেসের অপমান করা হবে না? ৫,৭ নং ওয়ার্ডের অধিবাসীগণ অনেকেই প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন এবং কাজের লোক। এঁদের চ'খে ধুলো দেবার চেষ্টা কি অত্যন্ত ভ্রান্ত ব'লে বোধহয় না? এ 'সো'র অর্থ কি—তা অনেকেই কিন্তু বুঝতে পাচ্ছে না।

ভবানীপুরের দিকে ভবানীপতি আশুতোষের চাকরী ইস্তফা দেওয়ার যে খবর রটেছিল, সে একেবারে মিথ্যা। অনিশ্চিত রাজনীতিক্ষেত্রে নেমে আস্‌বার জন্য কি কেউ কখন নিশ্চিত চাকরী পরিত্যাগ করে? আর এক কথা। চাকরীটি ছেড়ে দিয়ে শেষটায় যদি নির্ব্বাচনে পরাজয় হয়। এই সব নানা প্রকার চিন্তা ভাবনা করেই জজ সাহেব জজীয়তিতেই মনোনিবেশ করেছেন। আমাদের মনে পড়ে সেই সে রব যা সে নাকি নেটের দেওয়াল ভেদ করে সমগ্র ভারতে প্রতিধ্বনিত হয়েছিল,—Freedom first, Freedom second, Freedom always. অবশ্য অশ্বারোহী এবং বাদকের দল চিরদিনই এই সব কথার ভক্ত হয়েই আসবে। কিন্তু সার আশুতোষ এখন বুঝতে পেরেছেন, যে গোড়ার গলদ নিয়ে শিক্ষাসচিব প্রজাগচন্দ্র তাঁকে ব্যতিব্যস্ত করেছিলেন, তা এখনও সেই ভাবে সেইখানেই র'য়েছে। বুদ্ধিমান বিচারক, চাকরীটি আঁকড়ে ধরে সার নীলরতনকে আসরে নামিয়েছেন। সার নীলরতনের আশা অনেক, তবে ভরসা কি খুব বেশী আছে?

কিন্তু ভবানীপুরের প্রধান খবর এই, যে শ্রীযুক্ত দেশবন্ধু দাস অবশেষে তাঁর জ্ঞানক মিঃ এস, এন, হালদার মশাইকে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মল্লিকের সঙ্গে লড়তে পাঠাবেন। কি আর বলা এখন। কেবল এই একটি কথা বল্‌তে চাই, যে এই ভাবে সব লোক পাঠিয়ে দিয়ে দেশবন্ধু একটা প্রহসন ব্যতীত আর কিছুই করতে পার্ব্বেন না। যদি আজ চিত্তরঞ্জন স্বয়ং দাঁড়াতেন মল্লিক মশাইর বিরুদ্ধে তবে একটা কিছু হত। একটু দেখা যেত, এবং বিষয়টা বেশ্ মনোরম হত। যদি তিনি সাহস করতেন স্বয়ং দাঁড়াতে সতীশ রঞ্জনের ক্ষেত্রে তবেও দেখা যেত বাতাস কোন দিকে বইছে। কিন্তু একি? দেশবন্ধু দাশ! আজ তুমি কংগ্রেসের নেতা হয়ে যে সব নগণ্য লোককে ব্যবস্থাপক সভার জন্য মনোনীত কচ্ছ, তাহাতে আমাদের মনে হয় যে এই ছেড়মাস পরই সমগ্র ভারত-বর্ষের হাস্যবিদ্রূপ কটাক্ষ বঙ্গদেশের প্রতি নিক্ষেপিত হবে। আমাদের লজ্জার কথা এই, যে, তোমার জিদ্ বজায় রাখবার জন্য বাংলার মুখে তুমি চুণ কালী লেপন করতেও প্রস্তুত। যে পুলিশ বজেট সম্বন্ধে তুমি কথা তুলেছিলে অন্যতম কোনও জমীদার নির্ব্বাচনপ্রার্থীর সম্বন্ধে,—সেই পুলিশ বজেট সম্বন্ধে তোমার কুমিল্লার ইন্দুভূষণ কি নীরব থাকতে পার্ব্বেন? তিনি এ বিষয়ে কি করেছিলেন সে কথা কি তিনি সকলকে জানাবেন?

আমরা এবার আর কিছু বলব না? দেশবাসীর নিকট নিবেদন কর্ব্ব, সেটি এই, শ্রীশ্রীশারদীয়া পূজার ছুটির সময় ভোটাভোটি ব্যাপার খুব জটিল হয়ে উঠবে। সে সময় যেন তাঁরা ঠিক চিন্তা ক'রে কাজ করেন। নতুবা দেশময় অশান্তির কালমেঘ আবার ঘনিয়ে আস্‌বে। স্বরাজ আমাদের কল্পনারাজ্যের বস্তুর মধ্যে পরিগণিত হবে।

ভোট মঙ্গল

[শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত]

প্রথম দৃশ্য

(রাজপথ—ভোটপ্রার্থীগণ ভোটদাতাগণের সম্মুখে দাঁড়াইয়া কাকুতি মিনতি করিতেছিল)

গীত

আমরা সব ভোটের ভিখারী
কেবল খাঁটীর তরে আকুল প্রাণে ছোটে ব্রজের রজধারী।
আমরা তেমনি তেমনি করে দ্বারে দ্বারে ফিরি।
আমাদের দয়ার এই পণ
দেশের জিত অভিনয়ে দিব প্রাণ মন,
ভোলাবো ভাই, মুখ তুলে চাও, চরণ ধরে যে পলাবো,
আমরা সবার কাছে জানাচ্ছে—আমি কৃপার ভিখারী।

প্রথম ভোটার—ধর্লে আজ ও বড় বীরভাবে দোরগোড়ায় এসে হাজা দিচ্ছে। হাঁকিম যদি যে আর চিকিটি দেখায় তো পালাবে না;

ব্রহ্ম যদি সাধ্যস্ত একটু অন্যায়াচরণ দেখা যাইতে যাইতে তখন যে বড় ভাঁড় করে বলে বস, তুমনং নেই—আর আর কি বলা যাইবেন—"আমরা সব ভিখারী।"

ভোটপ্রার্থী— আমি তুণাদপি নীচ—গুরু বলে যায়,
লক্ষ্য মোর মোর শ্রীবৈকুণ্ঠধাম।
ভিক্ষা দিতেছে তিক্ত তিক্ত তিক্ত
গৌরবের সনে সব সঁপি দিনু।
এবে মুখে হাসিলাম প্রাণে ভক্তি যারা,
দীন দেশবাসী কেঁদে আত্মহারা
তাদের সেবায় দেহ বিলাইতে,
আসিয়াছি দ্বারে করুণা চাহিতে।

ভোটার— "চিনেছি তোমারি তোরা সোণার স্বপন ভেঙ্গে গেছে!
বাঙ্গল করতে পাইক পক্ষি - তুমি চেয়ে নাও।
বাঙ্গলাদেশের মুরুটমণি! জয় মহারাজ!
(ভোটপ্রার্থীর প্রস্থান)

চতুর্থ ভোটার—ওই মোটর গাড়ী হতে চড়ে কে আসিতেছে ওই?
রাজনীতির কিছিলিতে দেখে দেখি নাই।

ভোটার্থী— আমি চিকিৎসা শাস্ত্রে অভিজ্ঞ,
রোগের কথা মনে আছে, কথার কিংবা কাজে
ভুল নাই কিছু মনিব।
তবে—বুকের সঙ্গে মিতে পারা কোনও রোগ এসেছি,
হার্ট-ডিজিজ নাইকো লাজ, বুক বেঁধে এই দাঁড়িয়েছি।

একজন— বুকের রোগ বড়ুয় বড়
অতি মিষ্টি—দাদা,
পাতা ভাবে বত রস
তত ভালবাসা।

ভোটার্থী আমি—আসিব আবার চাহিতে করুণা,
দিও না দিও না বাধা! (ভোটার্থীর প্রস্থান)

(দলে দলে আরও অনেক ভোটার্থীরা আসিল এবং মিনতি জানাইয়া প্রবেশ করিল)

১ম ভোটার। ওরে বাবা! এ কি রে বাবা!

২য় ভোটার। একবার চেয়ে দেখ না?

৩য় ভোটার। (মেসমেরের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া) ওরে বাবা!

মেসমের সব দলে দলে আসুরেন।

সকলে। তবে আর ভয়না নেই, আয় ছুটে পালাই, এখানে থাকা—আইনমুরি খাটবে না। (সকলের প্রস্থান)

(তীব্র বাদ্য যন্ত্রে ভোটপ্রার্থিনী রমণীগণের গাইতে গাইতে প্রবেশ)

গীত

আমরা। নবীন বেশে এসেছি এক রমণী,
হাসাতে বসু হাতে বীণাপাণী ভোট বিজয়িনী।
মলয় কাঁদিয়া ফিরে হতাশে কুসুম লোটে,
সাজনা বিতানে ফুল সোহাগে আবেশে ফোটে।

আমরা নহি কোমলাকুসুমবালা রূপ বিলাসিনী!
চাঁদের জোছনা দেখে ফিরেনা কাঁদে প্রাণ,
পাপিয়া ফুকারে ফিরে গাহি রে বিষম গান।

আমরা পুরুষের ছলে ভুলিনা, পুরুষের কথা মানিনা,
জগতে আমরা বিজয়িনী—নারী মোরা ভোট বিজয়িনী।
(প্রস্থান)

বাউলগণ

মেসের কি দশা হল রে ভাই!
এখন মালসী মানে 'মালসী' হ'তে সবার প্রাণে চায়।
সহযোগী অসহযোগী জেল ফেল চলে,
স্বরাজ্য দল স্বরাজ দেবে কৌন্সিলে গেলে,
নাই ভেদাভেদ নাই কোন ভেদ বাঙ্গালী হতে সবে যে ঘায়।
রাজনীতির ধেতে চায় করেনাকি যারা,
তারা লম্বা কথায় লম্বা সুরে দিচ্ছে বেঁধেছে তাড়া।
'মুসোর চৌম' ভুলব কেহ বলে—মরি হায়! হায়! রে!
মেসের দুঃখ ঘুচবে এবার ভাবনা কি গো ভাই।
লাগলো এবার ভোটের বাড়াবাড়ি,
ভ্যালভালিএর বেজায় ভজুং,
টাকার ছড়াছড়ি!
মেস শুধু সেই মেস আছে পড়ে
তেমনি করে হায়! হায় রে!

তেমনি পথে ঘাটে নারী অপমান,
তেমনি অন্যায়ের হাহাকার চারায় মুখ ম্লান,
তেমনি সবের চারা দিঁতের মেহেন
খাবার পরার নাইকো সে বাহার।
আজ শুধু ভাই কার বাবাতে মেস বিভেদায় করিবার।
মরি মরে যায়! হায় রে! (প্রস্থান)

অভাবে

[শ্রীগিরিজাকুমার বসু]

নাহি রাখী, নাহি ঠোঁটে মধু
মনোভার আঁখি নাহি বহে,
শরতের সুখনিশি বঁধু
বৃথা যায়, তোমারি বিরহে।

যাচি যাচি তব দরশন
শুভ্রশির কাশ হোল সই
শেফালিকা খুঁজিয়া চরণ
ঝরি ঝরি, বলে "কই, কই!"

হাসিমুখে শশী কত আর
ব্যথা বল' করিবে গোপন
চেয়ে দেখ, অন্তরে তাহার
কালিমাখা—আমারি মতন।

দুখে ছিনা রবে কি মগন
সাথীহীন, নিশিদিনমান
চলে গেল কত সুজনগণ
কোথা মম, কোথা সন্ধান।

ধরি মাছ না-ছুঁই পানি

ব্যঙ্গ-চিত্র।

শিল্পী—শ্রীবিনয়কৃষ্ণ বসু।

লম্বা ছুটি পেয়ে বাবু শ্বশুরবাড়ী এসেছেন—জনৈক প্রতিবাসীর পুষ্করিণীতে মাছ (কি মাছ তা জানে না) ধরিতে বসিয়াছেন। জলার্থিনী বাবুরই পত্নী—তিনি মনে মনে ভাবেন যে এমন পত্নীগতপ্রাণ স্বামী আর নাই।

বদনাবৃতা সুন্দরীকে দেখিয়া বাবু একটু গা-ঢাকা হইলেন তবে দেখাটা বন্ধ[রহিল]না। তাহার অতৃপ্ত চাহনী দেখিয়া পত্নী ভাবিলেন "কি গভীর ভালবাসা! আমরি মরি!"

রমণীকে (অপরের স্ত্রী ভাবিয়া) বাবু মনে করিলেন "হুঁ, হুঁ, শিকার মেলেছে—লাগ্‌বে না, কি চেহারা-খানা !"

রমণী যখন পিছন ফিরিয়া চুল বাঁধিতেছিলেন, বাবু শিকারটী উত্তম-রূপে গাঁথিবার জন্য আবার ছিপ ফেলিতে বসিলেন।

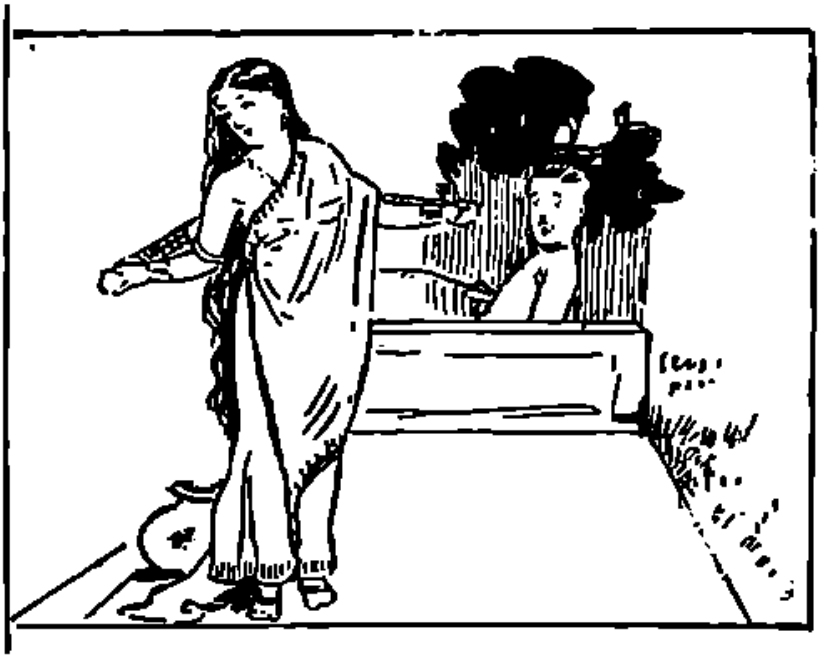

থ্যাট মারিতেই রমণীর বসনে বঁড়শী বিঁধিল— "এঁ্যা—এযে আমারই তিনি—কি কল্লম, ধরা পড়িয়া

আগমনী

[অধ্যাপক শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার এম-এ,]

হে অপূর্ব্ব হে অভিনব ক'বে ফুটবে সকল প্রাণে।
তান লয় সুর রাগিণী তোমার মিলিয়ে তোমরাই গানে॥

প্রলয় জল থেকে নব আর করে যেন প্রকৃতি দেবী উঠেছেন; কাল-মেঘ কেটে গিয়েছে, সূর্য্য হাসিতে হাসিতে ঝিকিমিকি কিরণ দিচ্ছেন; দখিণ হাওয়ার পরশে গাছের পাতাগুলি থরথর কাঁপছে; অনুরাগভরে তাঁর বাঁশীর রব শুনে পাখীগিয়ে পাখীরা কিচিমিচি করে' তাঁর আগমনী গাইল।

সে শুভ মুহূর্ত্তের আর দেরী নাই; তাঁর শুভাশীষ আজ আকাশ, বাতাস, আলোয় ছড়িয়ে পড়েছে; রৌদ্র রশ্মিজালে—তাঁর জগৎ ধরা পড়েছে; তাতেই অভিনব ভাবস্ফুরণ আজ সকলদিকে ও কাজে; সে মহাসম্মিলন ও শান্তির লীলা-আসন্ন; শক্তি সব চারিদিক থেকে তিনি ছেড়েছেন ও ছাড়ছেন—সকলেই এই কেন্দ্রে গিয়ে মিলবে যখন, তখন এক অপ্রতিহত মহাশক্তির খেলা দেখা যাবে—মানুষের কাজে ও প্রাণে এক নূতন বাতাস বইবে, বিশ্ব জুড়ে প্রাণ মাতানো ঢেউ উঠবে সে শান্তির রাজ্য প্রতিষ্ঠার প্রাক্‌কালে কয়েকটা প্রলয় তরঙ্গ যে না আসবে তা নয়—এ প্রলয় বাহ্য প্রকৃতির, সমাজের ও চিন্তারাজ্যের হ'তে পারে।

জগতের ভাবী কল্যাণের আকর, বিশ্বের অতিবিশালা ও তীর্থ এ পুণ্য ভারত ভূমির সে কিবা সৌভাগ্য তা আর বলা যায় না; আর, সেই ভারতের বাংলাই নব-যুগের কবিত্ব—এ ভাষা নয়, তাঁরই আভাষবাণী যিনি জগতের কল্যাণের জন্য নিজেকে ঢেলায়, বাতাস, আকাশ জলে ছড়িয়ে দিয়ে বিলিয়ে দিয়ে আপনি মিলিয়ে রয়ে নবলীলার কাজ-উদ্বোধনে ব্যস্ত, তাঁর আর অবসর নাই, পবিত্র হৃদয়ের প্রার্থনাই তাঁর প্রাণারাম, কীর্ত্তনই তাঁর বিশ্রাম, কীর্ত্তনেই তাঁর কাজের স্ফূর্ত্তি।

ঐ চিরব্যস্ততের অমর প্রাচীর মন্দিরে তাঁর মঙ্গল আরতির জন্য আলোয়া প্রাণের প্রদীপ জ্বালিয়ে দিল। ইসলামের অরুণালোকে প্রাচীর মূর্ত্তির আবাহন গাইল।

"Not a leaf rolling in the high way of Denmark but has Prvidence in it."

যে কারণে ইসলাম আজ জেগেছে ঠিক সে কারণেই হিন্দু মহাসভার কাজের বেগ ও প্রেরণা এসেছে। যুগ যুগ ধরে' চাপা বিস্ফোটক এখন ত' ফুটে উঠবেই। এতে ভয় কি? আজ হিন্দু যে তার ঘর পরিষ্কার ও বল সংগ্রহে আবিষ্ট হয়েছে তার উপলক্ষ্য যাই হোক্ না কেন চরম লক্ষ্য হচ্ছে বিশ্বের দরবারে তাঁর মুসলমান ভাইএর পাশা-পাশি দাঁড়িয়ে প্রেম বিলান। ভারতের অধিকাংশ লোকই হিন্দু, এ হিন্দু জাতি দুর্ব্বল ও অসংহত থাকতে বিশ্বের দরবারে ভারতের দাঁড়ানর সামর্থ্য কোথায়? 'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্য' অধ্যাত্ম বলের অবলম্বন দৈহিক বল না থাকলে কাজ চলবে কি করে! ধ্যান রাজ্যের স্বর্গ সমাজ-দেহে ত' সত্য হওয়া চাই, তবেই ত' দেবদুর্লভ আনন্দ রস এ লোকেও সুলভ হবে। পথে প্রলয় তরঙ্গাভিঘাত ও তো আছে, তা দেহ বলহীন সহ্য করবে কি করে? ইসলামের মুক্তিতে এশিয়ার মুক্তি। হিন্দু যে আজ শক্তি সংহত করতে চেয়েছেন তা তাঁর ভাই মুসলমানের বিপক্ষে আত্মরক্ষার জন্য বা বিরুদ্ধে প্রয়োগের জন্য নয়—এ বলবে কেবল অদূরদৃষ্টি যারা—বরং তা ইসলামের সাথে একযোগে জগতের নববিধানের নবযজ্ঞের সেই চরম লক্ষ্যের সাধনের জন্য, প্রাচীর বাণী জগতকে দান করিতে। কেউ চাক্ বা না চাক্ ভারতকে সে কার্য্য সাধনে অদূর ভবিষ্যতে বিশেষ ভাবে লিপ্ত হতে হবে; তারই উদ্যোগ পর্ব্ব এই। এতে মুসলমান কেন ভারতের বাইরেও অন্য কোন জাতিরও ভয়ের কারণ নাই, কারণ ভারতের অভিনব দান এবার ভ্রাতৃত্ব ও মিলনের মন্ত্রে পূত এ আয়োজন মহাযজ্ঞ সকল জাতির মহোৎসব—জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে সকলেই প্রেমানন্দ লুটবে বলে। সুতরাং ভয়ের কিছু নাই।

ভারতের কি আনন্দের দিন সমাগত-প্রায়, সে আনন্দ ভাণ্ডার চির-উদার ভারত আজ সকল বিশ্ববাসীর

অন্তই খুলবে—তৃষিত মানবাত্মার যুগ-যুগান্তের অতৃপ্তির অবসান হয়ে এল।

হে ভারতের—হে বঙ্গের—তরুণগণ, তোমরা নব-যুগের-নবলীলার কাজের জন্ত এখন থেকেই প্রস্তুত হও; সাধনের সুমহান্ কর্ত্তব্যের জন্ত যা নিয়ে এসেছ তার একবিন্দুও যেন বাজে খরচে না যায়। তাঁরই কাজের জন্ত তব মন গড়িয়ে তোল, তোমাদের বাক্য চিন্তা ও কাজে যেন তাঁরই বাণীর ও ভাবের অনুগ হও। বুকভরা বিশ্বাস নিয়ে, হৃদয়ের পবিত্রতার মহাযজ্ঞ সুরু করে সে মঙ্গল দেবতার ধ্যান করে লও—

'হে বিরাট, হে মহান্, হে সুন্দর তুমি চিরমঙ্গল, আমাদের হৃদয়ে বল দাও, আশা দাও, আজ সকল জাতিকে ধন্ত করতে সকল দিক আলো করে আমাদের মাঝে সকল কাজে উদয় হও, সত্য হও হে।'

ঐ তিনি আসছেন! তাঁর পথ ছেড়ে দাও। সে পথ যুদ্ধবিগ্রহের মধ্যে দিয়ে নয়, রক্তরাগেও সে নয় ক্ষেম ও ক্ষমাই এ তাঁর পন্থা, কল্যাণ ও প্রেমই তাঁর এখনকার অমোঘ অস্ত্র, ধীরতা ও পবিত্রতাই তার মন্ত্র; কিন্তু এ অস্ত্র, এ মন্ত্র-প্রয়োগে আগে সংহতি চাই—যা পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে হয় নাই, সে সংহতিবদ্ধ সাম্রাজ্যবাদিক উপলক্ষ্য নিয়ে হতে পারে তবে সঙ্কীর্ণ উদ্দেশ্ত নিয়ে নয়—উদারতায় তার প্রাণ প্রতিষ্ঠা চাই।

এ-কি দেখি আবার! দেশ-বিদেশের যাত্রীবাহী নৌবহর ভারতসাগর ছেয়ে ফেলল; জগৎব্যাপী আর একটা প্রলয়ের ঘনঘটা—না যুগ-দেবতার এ ভারততীর্থেই অভিষিকের আয়োজন?

আর কিবা এ চমৎকার! ভারতের দুয়ারে সকল জাতি বিশ্বদেবতার আশীষ মাগিতে বরণডালা নিয়ে হাজির। তাদের কত না ঐশ্বর্য্য বিপুলবাহিনী ও বহুর তারা সাত সাগর পারের থেকে এসে' এ দীনহীন কাঙাল ভারতের দুয়ারে দেবতার চরণধূলির আশে দাঁড়িয়েছে কেন? চির-অধমতারণ, পতিতপাবন কাঙালের ঠাকুরের পূর্ণ কৃপা যে আজ আবার এ দুর্ব্বল পতিত জাতির উপর পড়েছে; তাঁর চির-প্রচলিত প্রথা অনুসারে এ পতিত দেশের ধূলা তিনি আজ দয়া করে ধন্ত করেছেন।

সে অপূর্ব্ব সে অভিনব রূপ
ফুটেছে বিশ্বপানে।
কান দয় সুর রাগিণী তাঁর
বাজিয়ে সকল প্রাণে॥

বিরহের পর

(ভৈরবী—কাফা।)

[শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী]

বেণুর বনে বাজায় বাঁশী কালা।
সই রে, ওলো সইরে—
ঘরায় উঠে প্রদীপটারে জ্বালা।
প'রে নে সই রঙীন বসন,
বেঁধে নে সই চুল;
দুলিয়ে দে সই দুটী কাণে—
রুমকো ফুলের দুল;
সই রে, ওলো সই রে—
পেতে নে সই কুসুম-শয়ন,
গেঁথে নে সই মালা।
উড়িয়ে দে সই প্রণয়-কেতন,
ফুটীয়-দ্বারে আজ;
আসছে লো আজ হৃদয়ে তোর
হৃদয়-অধিরাজ;
সই রে, ওলো সই রে—
ঊষে দে সই সকল ব্যথা,
নিবে দে সই জ্বালা।

দুর্গোৎসব

[শ্রীশশধর রায় এম-এ, বি-এল]

আর কয়েকদিন পরে বাঙ্গালী হিন্দুর ঘরে দুর্গোৎসব পূজা আরম্ভ হইবে। এই সময় মনে কয়েকটী ভাব হইতেছে। তাহা অতি সংক্ষেপে প্রকাশ করিব।

পূজা করে কে? যাঁহার অর্থে পূজা হয়, যাঁহার নামে পূজার সংকল্প হয়, তিনি পূজা করেন না। তিনি অনেক সময় পূজার নিকটেও থাকেন না। কোন কোন ক্ষেত্রে পূজার সময় তিনি অতি সহিত কুকর্ম্মে নিযুক্ত থাকেন। পূজা প্রকৃত পক্ষে করেন পুরোহিত মহাশয়। অথচ যাঁহার অর্থে পূজা হয় তিনি টাকার জোরেই ফল লাভ করেন; টাকার জোরেই ধর্ম্মলাভ করেন।

ধর্ম্মের দিক দিয়া দেখিতে হইলে বর্ত্তমান সময়ে দুর্গোৎসব পূজার ইতিহাস এইরূপ। ইহাতে কি যজমানের ধর্ম্মলাভ হয়? পুরোহিত মহাশয়েরই কি ধর্ম্মলাভ হয়? তাঁহার অর্থলাভ হয় তাহা জানি; কিন্তু যজমানের অর্থ ব্যয় হয়।

যদি স্বীকার করি যে যজমানের ইহাতেই ধর্ম্মলাভ হয়, তবে মানিতেই হইবে যে পূজার মন্ত্র যে কোন প্রকারে উচ্চারিত হইলেই ধর্ম্মলাভ হয়। এ ধর্ম্মলাভ পক্ষে যজমানের কেবল অর্থব্যয় করাই আবশ্যক, কিন্তু পূজার সহিত তাঁহার অন্য কোন প্রকার সংশ্রব না থাকিলেও চলে। বরং তৎকালে তাঁহার চিত্তে নানাবিধ কু-প্রবৃত্তি থাকিলেও এবং তিনি কদাচারে রত থাকিলেও ঐ ধর্ম্মলাভের বাধা হয় না।

ইহা কি মন্ত্রশক্তি? পুরোহিত মন্ত্রগুলি উচ্চারণ করিলেই মন্ত্রবলে ধর্ম্ম তৎক্ষণাৎ অবশ্যই উৎপন্ন হইবে; এই কি প্রকৃত মীমাংসা? এ মীমাংসাও ত করিবার উপায় নাই। কারণ বর্ত্তমান সময়ের পুরোহিতগণ প্রায় কেহই সংস্কৃত শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন নহেন; এমন কি অনেকে ব্যাকরণও জানেন না। সুতরাং পূজার মন্ত্রগুলিও শুদ্ধরূপে উচ্চারণ করিতে পারেন না। মন্ত্র যথাযথরূপে উচ্চারিত না হইলেও কি মন্ত্রশক্তি ফলবান হইবে? তাহা ত সম্ভব বোধ হয় না। মন্ত্র কতকগুলি বাক্যসমষ্টি। সে বাক্যগুলি উচ্চারিত না হইলেও ফলোৎপন্ন হইবে, এমন কথা স্বীকার করিতে যাহারা অসমর্থ তাঁহাদিগের উপায় কি? তাঁহারা দুর্গোৎসব পূজা কি উদ্দেশ্যে করেন? অর্থব্যয়ই বা কি কারণে করিয়া থাকেন?

মক্কেলের পক্ষে উকিল যাহা হইয়াছে, কতিপয় বাক্য উচ্চারণ করতঃ ইংরাজের আদালতে কখন বা ফললাভ করেন, কখন বা করেন না। কিন্তু প্রতিমার সম্মুখে যজমানের পক্ষে পুরোহিত মহাশয় কতিপয় বাক্য উচ্চারণ করতঃ সর্ব্বদাই যজমানকে ফলদান করিতে সমর্থ হন! মা জগন্মাতা দুর্গা যজমানের চিত্তশুদ্ধি অথবা চিত্তের মলিনতা কিছুই দেখেন না; কেবল একজনের পক্ষে আর একজন অর্থাৎ যজমানের পক্ষে পুরোহিত কয়েকটী ভ্রম প্রমাদপূর্ণ-বাক্য উচ্চারণ করিলেই অমনি তিনি ফলদান করেন। এই কি দুর্গোৎসবের সার তত্ত্ব?

এই দরিদ্রের দেশে তিন দিনে লক্ষ লক্ষ টাকা বাড়ি পোড়াইয়া, যাত্রা ও বাই শুনিয়া, খেমটা নাচ দেখিয়া থিয়েটারে বাহবা দিয়া উড়াইয়া দেওয়া কেহ কি সঙ্গত বলিয়া সমর্থন করিতে সাহসী হইবেন? যাহার চিত্তে ভক্তি নাই, দুর্গোৎসবে ধর্ম্মবোধ নাই, সে কেন শুধু রঙ্গ তামাসা করিবার নিমিত্ত দুর্গোৎসব করে? যিনি ধর্ম্মপ্রাণ, দুর্গোৎসবে বিশ্বাসী, স্বয়ং পূজা করেন—প্রতিনিধি যেন না অথবা দিলেও ভক্তিযুক্ত হৃদয়ে পূজার সময়ে সমস্ত অনুষ্ঠানে যোগদান করেন, তাঁহার কথা আমি বলিতেছি না। কিন্তু যাঁহাদিগের অবস্থা ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত, যাঁহাদিগের মনে একরূপ কর্ম্মে অন্যরূপ, তাঁহারা শুধু মামুলি রক্ষার নিমিত্ত পূজা করেন কেন? পুরুষানুক্রমে চিরদিন পূজা হইতেছে হউক; এই ইহাদিগের উত্তর। এ উত্তর জড়তার নামান্তর বলিয়াই বোধ হয়।

বাঙ্গালী কি কেবল ধর্ম্ম বিষয়েই জড়? সে যে সকল দিক দিয়াই জড় হইতে চলিল। যাহা হইতেছে হউক, যাহা চলিতেছে চলুক, যাহা যেমন আছে তেমনই থাকুক. ঈদৃশ জড়ভাব সর্ব্ববিষয়েই বাঙ্গালীকে অধঃপতিত করিয়া রাখিয়াছে। চিন্তা করিয়া কর্ম্ম করা নাই। গড্ডালিকা প্রবাহ কতদিন চলিবে?

হাসি

[শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী]

পাশা-পাশি বাড়ী আমাদের। সে ছিল আমার খেলার সাথী, অসুক্ষণের সঙ্গী—বন্ধু! হাসি বয়সে আমার সমান না হলেও মাত্র চার পাঁচ বছরের ছোট। সে ছোট ছিল—আমার কাছে আবদার কোরত, আমি তার আবদার রাখতে পারলে খুসী হতুম। আমি হেসে ভাবলে, কথা কইলে হাসি খুসী হোত। আমার কথা মত কাজ করবার জন্য সে প্রাণপণ কোরত। হাসি দু'দণ্ড চোখের আড়ালে থাকলে আমার কিছু ভাল লাগত না—মন কেমন অস্থির হয়ে উঠত। হাসিকে বকতুম, গাল দিতুম—অনন্তী হতভাগী বাঙ্কে তাই বলতুম। কিন্তু হাসির সেই মুখভরা হাসি আর অশ্রু ছল ছল চোখ দু'টি দেখবার আশা আমার কিছুতেই মিটতো না।

হাসি আমার পাশের বাড়ীর প্রতিবেশীর মেয়ে। তাদের আর আমাদের মধ্যে সম্পর্কের বাঁধ বিশেষ কিছু না থাকলেও হাসি আমায় দাদা বলেই ডাকত। আমি তাকে হাসিই বলতুম্। হাসির গায়ের রং ছুধে আলতায় মেশান নয়—তবে সে কালোও ছিল না। বেশ মিষ্টি রংটি। মাথা ভরা তার কালো একরাশ ঢেউ খেলানো চুল। ঠোঁট দু'খানি রসে ভরা টুলটুলে। কাণ দুটি ছোট ছোট। নামটি যেমন তার হাসিরাশী—মুখখানি আর চোখ দুটি তার তেমনি মধুর হাসি ভরা। দেহের গঠন নিটোল, পা দু'খানি আর হাত দু'খানি বেশ মাংসল—যেন বেলনে বেলা। সে চলতে মনে হোত সৌন্দর্য্যের একখানি প্রতিমা যেন চলে যাচ্ছে। যতক্ষণ সে পাশে থাকত ততক্ষণ নিরানন্দ আর কাছে ঘেঁসতে পারত না। হাসি চলে যেতে চোখের সব আলো নিভে যেত—মন নিরানন্দে আচ্ছন্ন হয়ে পড়তো।

এমনি করে আমাদের জীবনের কতদিন কেটে গেল। সে যেন একটা মধুর স্বপ্ন ঘুমন্ত জীবনের উপর দিয়ে বয়ে গেছে। সে স্বপ্নে আবেশ আছে ভোগ নাই—আনন্দ আছে মাদকতা নাই।

আমি বড় হয়েছি—হাসিও বড় হয়েছে। হাসির বিয়ের বয়স হয়েছে। হাসির মা বাবা মেয়ের বিয়ের জন্য অস্থির হয়ে পড়লেন। বারো পার হয়ে মেয়ে তেরোয় পা দিয়েছে—আর কি তাকে ঘরে রাখা যায়। হাসি আজ তার মা বাবার গলায় ঠেকা দায়! মেয়ের কত সম্বন্ধ আসে আর ঘুরে যায়। মেয়ের বর কেতে হলে যত টাকার দরকার তত টাকা তাদের নাই।

যা হোক করে অনেক কষ্টে জমিজমা বন্ধক রেখে হাসির মা বাবা তার জন্য এক বর ঠিক করলেন। বর কলকাতা সহরে কেরাণীগিরি করেন। মাসিক আয় পঞ্চাশ ষাট টাকা—শোনা গেল উপরি পাওনা নাকি কিছু আছে। দেশে বাড়ী ঘর সম্বল কিছু নাই—চাকরীই তার একমাত্র ভরসা। ছেলেটি নিজে এসে হাসিকে পছন্দ করে গেল।

হাসির বিয়ে ঠিক হয়ে গেলে মনে হোল—তাইতো আমার হাসি পরের হয়ে যাবে! কেন আমিই তো তাকে বিয়ে করতে পারতুম। এমনি তখন মনে হয়েছিল, বটে—কিন্তু সে চিন্তা মনের উপর তেমন ভাবে কোন দাগ বসাতে পারে নি। আমার হাসি—সে আগেও যেমন আমারি ছিল—এখনো তো তাই আছে। হাসি আমার পরের হবে কি—তাও কি হতে পারে।

তারপর হাসির বিয়ের দিন এল। বর এসেছে তার—আজ হাসি তার হবে তাই মুখভরা তার হাসি। কিন্তু হাসির মুখের হাসিটি আজ কে যেন কেড়ে নিয়েছে। শিশির ভেজা ফুলের মত টল টলে মুখখানা—আজ যেন শুকনো ম্লান। হাসির মনের কোণে এত চিন্তাভার লুকোন ছিল এ আমি কোন দিন ভাবতে পারি নি। আজ তার মুখ দেখে আমি অবাক্ হয়ে কি যেন কি—কত কথা ভাবতে লাগলুম।

বিয়ের আসরে হাসির বাবা যখন হাসির হাতখানি তুলে নিয়ে তার বরের হাতে রেখে তাকে সম্প্রদান করলেন তখন আমি দাঁড়িয়ে দেখছিলুম। হাসির হাত খানা তার বরের হাতে—মাথাটি মাটিতে নোয়ান—দেখে

বুকটা আমার ছ্যাৎ করে উঠল। তখন আমি বুঝতে পারলুম—এই তো আমার হাসি আজ পরের হাতে গেল, আর তার সঙ্গে আমার কোন সম্বন্ধের দাবী নাই। বাল্যের ও কিশোরের এত মেশা-মেশি শুভ্র ভাব আজ এক নিমিষের মধ্যে তার সব শেষ!

আর আমি সে বিবাহ আসরে দাঁড়াতে পারলুম না। আলোক থেকে ছুটে এসে আঁধার ঘরের কোণে লুকিয়ে রইলুম। প্রাণের হাসি আমার নিতে গেছে।

মনে হয়েছিল—আর না, আর তার সঙ্গে দেখা কোরব না। যার উপর অধিকারের দাবী আমি নিজের ইচ্ছায় বা ভুলে বিসর্জ্জন দিয়েছি—দেখে আর তাকে পাবার লোভ বাড়াব না। কিন্তু মনকে বাঁধতে চাইলেই কি আর বাঁধা যায়! মনে হোল যাবার আগে একটিবার হাসিকে দেখতে হবে। একবার—তার হাসি মুখখানা দেখবো।

বর হাসিকে নিয়ে যাত্রা করে যাবে—সময় হয়ে এসেছে। হাসি আমাকে ডেকে পাঠালে। দেখা করতে গেলুম—কিন্তু যে হাসির মুখখানা দেখবার আমার এত ইচ্ছা সে মুখের পানে চাইতে পারছিলুম না আমি। মাথা আমার নীচু—চোখ দুটি মাটির পানে।

হাসি বললে—দাদা যাবার বেলায়ও আমার সঙ্গে একটি কথা কইবে না। একবার হাসি বলে ডাকবে না? মাঝে মাঝে ছোট বোনটিকে মনে করে এক আধখানা চিঠি লিখো।

হাসির মুখের পানে চাইলুম—সে মুখে হাসি নাই। যাত্রীরা তখন সব যাবার তাড়ায় ব্যস্ত—আর সময় নাই। হাসি আমায় ফেলে চলে গেল। বিয়ে করে স্বামী পেয়ে সে সুখী হয়েছে কি না কিছু তার মুখ দেখে বুঝতে পারলুম না। সে সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞেস করবারও সময় পেলুম না।

তারপর কতদিন চলে গেছে। বিয়ের পর একবার শুধু হাসি তার বাপের বাড়ী এসেছিল। কিন্তু তখন আমার সঙ্গে তার দেখা হয় নাই। সে যখন বাপের বাড়ী এল আমি তখন দূর বিদেশে দেশভ্রমণ করে বেড়াচ্ছিলুম। বাড়ী আমার কেন যেন আর ভাল লাগত না। হাসির কথা মনে পড়তে প্রাণ আমার কত পুলক আনন্দে ভরে উঠতো—আবার তার স্মৃতি আমায় তেমনি ব্যথা দিত। চারদিকে তার স্মৃতি দিয়ে ঘেরা বাড়ীখানা—বসবার ঘর, বাগান, ঘরের দেয়ালে টাঙ্গান ছবিগুলো, আলমারীতে সাজানো বইগুলি, বাগানের ফুলের গাছগুলি সব যেন হাসির স্নেহের পরশের অভাবে ম্লান—ধূলি মলিন হয়ে পড়ে আছে। হাসি যেমনভাবে যেটি রেখে গেছে সব তেমনি রয়েছে—সেগুলি ছোঁবার সাধ্য আর আমার হয় নি।

হাসির চিঠি মাঝে মাঝে পেতুম। দু'চার ছত্রে লেখা সে চিঠিগুলো। দু'চার ছত্রে তার কোন খানার উত্তর হয়তো কখনো দিতুম—কখনো হয়তো তার তিন চার খানা চিঠি এসে অমনি পড়ে থাকতো—উত্তর দেওয়া আর হোত না। কি উত্তরই বা দেব—প্রাণের কথা দু'-এক ছত্রে লিখতে ভয় হোত। এমনি করে প্রাণের কথা চেপে রেখে—তুমি ভাল আছো তো—আমি ভাল আছি, এ আর বার বার লিখতে ইচ্ছা হোত না।

হাসির চিঠিতে জানলুম—সে তার স্বামীর সঙ্গে কলকাতায় চলে গেছে। তার একটি মেয়ে হয়েছে। কলকাতায় একটা বাড়ীতে আরো পাঁচ ছ'ঘর ভাড়াটের সঙ্গে তারা ছোটো কোঠা নিয়ে বাস করে। যদি একবার কলকাতা যাই তো হাসি আমায় তার সঙ্গে দেখা করতে বলেছে।

কতদিন চলে গেল। বোধ হয় হাসির বিয়ের পর ছ'সাত বছর হয়ে গেছে। দু'তিন খানা পত্রে হাসি লিখলে তার স্বামী সতীশের বড় অসুখ। অতিরিক্ত খাটতে খাটতে আর ভাল খাবার না পেয়ে তার স্বাস্থ্য একেবারে ভেঙে গেছে। ডাক্তার বলেছে এমনি শরীরের অবস্থা নিয়ে সে যদি কাজ করে যায় তো তার যক্ষ্মা হবার আশঙ্কা আছে। কিন্তু কাজ না করলে তো আর সংসার চলবার উপায় নাই। তাই হাসির স্বামীকে এই শরীর নিয়েও কাজ করে যেতে হচ্ছে—হাসি বড় চিন্তায় পড়ে গেছে। হাসি যেমন প্রাণ খুলে আমায় তার জীবনের সুখ দুঃখের কথা জানালে আমি তেমনভাবে তাকে সান্ত্বনা বা বল ভরসা কিছু দিতে পারলুম না। আলগা আলগা ভাবে সান্ত্বনা দিয়ে দু'চার ছত্রে জবাব দিলুম।

এর পরে অনেক দিন আর হাসির কোন চিঠি পেলুম না। তার চিঠি না পেয়ে সব কথা জানতে চেয়ে তাকে ক'খানা পত্র লিখলুম—চিঠি ফিরে এল। অ-গোলা অবস্থায় চিঠির পর চিঠি আমার ফিরে আসছে—বুঝতে পারলুম তারা সে বাসা ছেড়ে কোথায় চলে গেছে। হাসির চিঠিপত্র যা কোন খবর নাই—একেবারে চুপচাপ।

পুরো একটি বছর চলে গেছে। সেদিন সকালে বসে হাসির কথাই ভাবছি—আজ যদি তার কোন খবর পেতুম। যদি একবার সে আমায় যাবার কথা লিখতো। এক বছর আগে সে যখন আমায় তার দুঃখের কথা জানিয়ে চিঠি লিখেছিল তখনি তো তাকে দেখতে যাওয়া উচিত ছিল। তা যাই নি—তাই হাসি অভিমান করে আমায় আর চিঠি লিখছে না—আর লিখবেও বোধ হয় না। এমনি কত কথা ভাবছি—এমন সময় একখানা টেলিগ্রাম্ এল—'আমি মরছি—যদি পার একবার এস। হাসি।'

হাসির সঙ্গে দেখা হোল। একটা খোলার বাড়ীতে ময়লা অপরিষ্কার বিছানায় সে শুয়ে আছে। ঘরে খাট নাই—মাদুরের উপর বিছানা পাতা। সে যেন বিছানার সঙ্গে একেবারে মিশে গেছে। সেই খোলার বাড়ীতে আরো পাঁচ সাত ঘর ভাড়াটে বাস করে। হাসির পাশেই তার ছোট্ট তিন বছরের মেয়েটি বসে মায়ের আঁচল ধরে মুখে পুরে খেলছিল।

আমায় দেখে হাসির ম্লানমুখে যেন একটু হাসি ফুটে উঠল। গলার স্বর তার কাঁপছিল। হাসি বললে—বড় ভয় হয়েছিল মনে—যদি তোমার আসতে দেরী হয়ে যায়! মরবার আগে তোমায় কত কথা যে বলবার আছে। তুমি ছাড়া আর কাকে বোলব সে কথা—এই বলে হাসি তার শীর্ণ হাত খানি আমার হাতে রেখে বলতে লাগল—সেই যে শেষ চিঠিখানা তোমায় লিখেছিলুম তারপর আর চিঠি লিখি নি। স্বামীর আমার অসুখ হোল—সেই অসুখেই তিনি মারা গেছেন। আজ বলতে কোথাও আমার কিছু নাই—সে তুমি জান। আজ মা বাবা থাকলেও তাঁদের কাছে গিয়ে দাঁড়াতে পারতুম।

হাসির অবস্থা দেখে আমার চোখ ফেটে জল আসছিল। এই হাসি—আমার জীবনের হাসি তার আজ এই অবস্থা! আমি এসেছি তার মরবার সময়। জীবনের শেষ বাঁধন-টুকুও তার যেন আলগা হয়ে গেছে—শুধু আমায় কটি কথা বলবার জন্যই যেন সে বেঁচে আছে। আমার হাতে হাত রেখে সে বুঝি তার শেষ নিঃশ্বাসটি মিলিয়ে দিতে চায়!

হাসি বললে—এক বছর স্বামীর অসুখ। কাজটি তাঁর অসুখের আরম্ভেই গিয়েছিল। তারপর হাতে-পাতে যা ছিল সব একে একে স্বামীর চিকিৎসায় আর সংসার খরচে চলে যেতে লাগল। খুকীটার গরুর দুধ খাওয়া আর জ্বরে ঘটে উঠে নি। তারপর ক্রমে এমন অবস্থা হোল যে দিন আর চলে না। ঘটি-বাটি যা ছিল সব বিক্রী করে ফেললুম। সংসারে খাবার কিছু নাই—স্বামী মৃত্যু শয্যায় এ অবস্থায় কি কোরব আমি! খুকীকে নিয়ে বসে বসে আসন বুনতুম কি শেলাইয়ের কাজ করতুম—যদি তাতে কিছু পাওয়া যায়। দু'চার পয়সা যা পেতুম তাতে কিছু পোষাতো না। মনে হোত কারো বাড়ী রাঁধুনীগিরী করে বা ঝি হয়েও যদি তিন জনার পেট চলবার মত কিছু পাওয়া যায়। কিন্তু ঘরে রুগ্ন স্বামী—একদণ্ড তাঁর কাছ ছাড়া হবার যো নাই। কোলে মেয়ে এ অবস্থায় কোথায় আমি কাজ কোরব!

এই দুরবস্থায়ও তোমাদের কাকো কিছু জানাতে পারি নি। নিজের দারিদ্র্যের কথা কে কি ভাবে নেবে বুঝতে পারি নি। এমনি অবস্থায় নিজে না খেয়েও স্বামী আর খুকীর আহারের জোগাড় কচ্ছি—কিন্তু ঘরের অশান্তি ক্রমেই বেড়ে চলল। অসুখে ভুগে ভুগে স্বামীর মেজাজ ক্রমেই খিটখিটে হচ্ছিল। ঘরে খাবার নাই—তাঁর পথ্য দুধ কল জোটাতে পারি না সে যেন সব আমার দোষ! আমি কোত্থেকে যে টাকা পাব সে তিনি কিছু বুঝতেন না। স্বামী আগে এমন ছিলেন না—অসুখে অসুখেই তাঁর মেজাজ এমন হয়ে গিয়েছিল।

তারপর এক রাত্রে কি ব্যাপার হোল জান। হাতে আমার একটি পয়সা নাই—বিক্রী করতে পারি এমন জিনিসও ঘরে কিছু নাই। খুকী ক্ষিদের জ্বালায় শুকনো

মাই চেটে চেটে কেঁদে ঘুমিয়ে পড়েছে—এক জল ছাড়া স্বামী বা আমি সারাদিন কেউ কিছু মুখে দিতে পারি নি। বাড়ীওয়ালা তাড়ার তাগিদ দিয়ে গেছে। আজ তাড়া না দিতে পারলে কাল ঘর থেকে দূর করে দেবে।—কোথায় যাব আমি—কি কোরব!

দাওয়ায় বসে বসে বাড়ীওয়ালার বকুনি শুনে ঘরে এসে স্বামীর পাশে বসলুম। তিনি হেসে উঠে যা তা বলে বকতে লাগলেন। তাঁরই যেন অসুখ হয়েছে—আমার তো আর কোন অসুখ হয় নি! হাতীর মত শরীর আমার আর আমি তাঁর সামান্য খাবার কিছু যোগাড় করতে পাচ্ছি না! তাই তো এ শরীর নিয়ে কি কিছুই রোজগার করা যায় না! অন্ধকার রাত্রে—আকাশ ভরা মেঘ আর বিদ্যুতের চমক—বাইরে এসে দাঁড়ালুম। চোখে কিছু দেখা যায় না—চারদিকে অন্ধকার! বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়লুম—কোথায় যাব—কোথায় মরণাপন্ন স্বামী আর মেয়ের খাবারের জন্য দুটো পয়সা পাব!

জানি না—এ ভাবে কখন গঙ্গার ঘাটের কিনারায় এসে পৌঁছেছি। কাঁধের উপর একখানা হাত পড়লো। ফিরে চাইতে দেখি—বেশ ভদ্রবেশে সজ্জিত একটি সুন্দর যুবক আমার পানে চেয়ে হাসছে। আমি তার পানে মুখ ঘুরিয়ে চাইতেই সে বললে—এই যে, এমন জায়গায় এত রাত্রে এমন সুন্দর চেহারা নিয়ে বসে রয়েছ সুন্দরী! কি হয়েছে তোমার বল—এস আমার সঙ্গে। এই চেহারা নিয়ে এখানে বসে থাকলে বিপদ ঘটতে পারে।

ইচ্ছা হোল তার কাছ থেকে ছুটে পালাই। তার নিঃশ্বাসে আর দৃষ্টিতে আমার সারা গায় যেন বিষের হল্কা লাগছিল। কিন্তু তার স্বরে যেন দয়া মাখান ছিল। হয়তো আমার এই দুঃসময়ে সে কিছু সাহায্যও করতে পারে। দারিদ্র্য আর পেটের জ্বালা—আমার অহঙ্কার গর্ব্ব সব ভেঙে দিয়েছিল। এমন রাত্রে এই অবস্থায় পড়ে যে কেউ হোক সে তার সাহায্য কি আমি না নিয়ে থাকতে পারি। তার সঙ্গে সঙ্গে কোথায় গেলুম। বৃষ্টিতে সর্ব্বাঙ্গ আমার ভিজে গেছে—শীতে কাঁপছি, মুখে কথা বেরুচ্ছে না। সে আমায় একখানা শুকনো কাপড় এনে দিলে। আমি তাকে আমার দুঃখের কথা সব জানালুম।

সব শুনে সে বললে—তাইতো বড় দুঃখের কথা। এই বয়সে তোমার মত সুন্দরীর কপালে এত দুঃখের ভার জমেছে—কিন্তু কি করবে বল। দুঃখে হতাশ হতে নাই—সব কেটে যাবে। তা আপাততঃ একরকম করে আমিই তোমাদের চালিয়ে নেব। ও—তুমি বড্ডো ভিজে গেছ, কিদের জ্বালায় সেবে অজ্ঞান হয়ে পড়বে। একটু কিছু খেয়ে নাও—নইলে তো চলতে পারবে না।

আমারও মনে পড়ল তখন—দু'দিন আমি কিছু খাই নি। সে আর রসে সরবৎ এনে বললে—আগে এটুকু খেয়ে গলাটা ভিজিয়ে নাও—তারপর টাকা নিয়ে বাড়ী যাও।

সরবৎ দিতে খেলুম। লাল সরবৎ—মিষ্টি মিষ্টি কেমন যেন স্বাদ! খেয়ে কেমন নেশা নেশা ভাব বোধ হতে লাগল। বিশ্ব-সংসার স্বামী মেয়ে সব যেন ভুলে গেলুম। জ্ঞান হারালুম। জেগে উঠে দেখলুম—মেজের উপর পড়ে আছি—কোলের উপর দশ টাকার একখানা নোট!

ও—জেগে উঠে কি জ্বালা যে বোধ হতে লাগল আমার। তার উপর হাতে নূতন নোটখানি লাগতে মনে হতে লাগল শরীর যেন জলে পুড়ে খাক্ হয়ে গেল। একা আমি সে ঘরে—আর কেউ কোথাও নাই। তখন সব কথা আমার মনে পড়ল। জোর করে নিজেকে দাঁড় করালুম। হাতের নোটখানা খণ্ড খণ্ড করে ছিঁড়ে মেজেয় ফেলে দিলুম। ইচ্ছা হোল—ঘরখানা সমস্ত বাড়ীটা আমার শুদ্ধ মাটীর নীচে বসে যাচ্ছে না কেন? ধীরে ধীরে স্বামীর কথা, খুকীর কথা মনে পড়ল—সেই অন্ধকার রাত্রে ছুটে বেরিয়ে পড়লুম আমি!

পথে বেরিয়ে পড়ে কি ভাবে কোথা দিয়ে চলেছিলেম মনে নাই কিছু। স্বপ্নের ঘোরে কত পথ বিপথ ঘুরে বাড়ীর দোরে ফিরে এলুম। এসেই মেজে ঘরে ঢুকে দেখলুম খুকিটা পড়ে ঘুমুচ্ছে—আমার পায়ের শব্দ শুনে স্বামী চমকে উঠলেন। ভোরের কাক কা কা ক'রে ডেকে উঠল।

স্বামী বোধ হয় জেগেই ছিলেন। জ্বরে আর ক্ষিদের জ্বালায় কাঁপছিলেন তিনি। জল জল চোখ দু'টো নিয়ে আমার পানে চেয়ে জোরে বললেন—কোথায় ছিলে এতক্ষণ মরতে গিয়েছিলে?

কি বোলব তাঁকে আমি। সত্যকথা বোলব কি—যদি না বলি আরো এর চেয়েও ভয়ানক কত কি হয়তো তিনি ভাবতে পারেন। রোগে দুঃখে আমার চরিত্রের উপরেও তাঁর যেন সন্দেহ জন্মেছে।—না যা হয় হোক—সত্যি কথা বোলবো।

জীবনের সেই ভীষণ রাত্রের যে সব কথা মনে ছিল আমার সব তাঁকে খুলে বললুম। আমার কথা শুনে তাঁর কাঁপুনি আরো বাড়ল। মুখ একেবারে ছাইয়ের মত পাণ্ডু হয়ে এল, চোখ দু'টো আরো যেন জ্বলে উঠল। ঐ অসুখ শরীরে তাঁর যা রাগ আর ঘৃণা সেদিন দেখেছি তেমন জীবনে আর কোন দিন দেখি নি।

তিনি বললেন—বা বেশ গল্প তৈরী হয়েছে তো! এই তো চাই—তোমার মত অসতীর কাছ থেকে আর কি আশা করা যায়। তবে অমন সুখের সে কোঠা বাড়ী ছেড়ে আবার কুঁড়েয় কেন—যা—যা তোর মুখ দেখলেও পাপ!

এত কথা শুনেও আমার চোখে জল নাই। শুধু মনে হচ্ছিল হৃদয়টা যেন আমার কেটে দেহ থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছে। খুকী কেঁদে উঠল। স্বামীর মুখ দিয়ে ঝলকে ঝলকে রক্ত উঠতে লাগল। আমি ঠাঁয় দাঁড়িয়ে রইলুম—স্বামীর মুখটা পাশের ছেঁড়া বালিসে লুটিয়ে পড়ল।

দু'দিন পরে স্বামী মারা গেলেন। আমার জ্বালার কথা শুনে আমার উপর সন্দেহে তিনি জ্বলে মরলেন। থাক তাঁর সন্দেহ আমার উপর—তিনি স্বর্গে গিয়ে শান্তি পান। কিন্তু আমি জানি এই পৃথিবীতে তাঁকে সব চেয়ে ভালবাসতুম। এক খুকী ছাড়া এমন ভাল বুঝি আর কাউকে বাসি না। জানি না এ পাপের ক্ষমা আছে কি না—যদি থাকে তবে আবার শান্তি পাব।—যারা আমি-মরে গেলে আমার খুকীর ভার তুলি নিতে পারবে না।

হাসির বলবার যা ছিল তা ফুরিয়েছে। আরো দুদিন আমায় সেখায় থাকতে হোল—হাসির শবের সঙ্গে শ্মশান যাত্রী হতে। হাসির ভস্মরাশি গঙ্গার জলে ধুয়ে খুকীকে নিয়ে বাড়ী ফিরে এলুম।

মরবার সময় যে আশা ক'রে সে আমায় ডেকেছিল সে আশা তার আমি পূর্ণ করেছি। যে আনন্দ-হারা উদাস জীবন হাসি ছাড়বার পর থেকে কেটেছে আমার হাসি মরবার সময় সেই উদাস জীবন আবার তারি আনন্দ ধারায় কেমন যেন বড় সজাগ করে গিয়েছে। একদণ্ড খুকী আমার কাছ ছাড়া হয় না। আমিও তাকে ছেড়ে থাকতে পারি না। জানি না আবার কে কবে একেও হাসির মতই আমার কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে যাবে।

জেল-কয়েদী

[শ্রীসতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়]

থেকে থেকে পড়ছে মনে সেই সে শ্যামল মাঠ,
সেই সে বনের বাঁকরে আমার বলেশ্বরীর ঘাট!
খলখলে মোর বলদ দুটী, নূতন-গড়া হাল,
ঝুরঝুরে মোর হাঁসের ছানা, বুরবী কেড়ার পাল।
খাই বা না খাই তাইতে কিগো সেইতো আমার সুখ;—
গাঁয়ের শ্যামল বুকরে আমার গাঁয়ের শ্যামল বুক!
থাকতে পেলে এমন স্থানে যেতাম না হয় মাসি'
হায়রে কেন ভাবনু মাথা দু'হাত জমির লাগি!
রক্ত তখন গরম ছিল, করনু অবহেলে,
তাইতে আজি পাঁচটী বছর পচতেছি হায় জেলে।
খাই বা না খাই তাইতে কিগো সেইতো আমার সুখ;—
গাঁয়ের শ্যামল বুকরে আমার গাঁয়ের শ্যামল বুক!
কোথায় ব'লে মেহের বিবি কোথায় ছেলে পেলে,
ভাবতে গেলে তাদের কথা চোখগুঁরে যায় জলে।
আল্লা আমার দোয়া করো যাওগো এবার ছুটি
সোণার ধনে দেখব চোখে, পড়ব ক্ষেতে লুটি—
খাই বা না খাই তাইতে কিগো সেইতো আমার সুখ;—
গাঁয়ের শ্যামল বুকরে আমার গাঁয়ের শ্যামল বুক!

নিরুপমা দেবীকৃত ছবিটি হইতে

শিক্ষা

[শ্রীপ্রভাবতী দেবী]

১

শিউলি ফুলের মত শুভ্র শয্যাটীর উপর শুইয়া সরোজিনী অস্থিরভাবে এপাশ ওপাশ করিতেছিল; কারণ তাহার স্বামী অরুণকুমার এখনো বহির্ব্বাটী হইতে গল্পের মজলিশ ছাড়িয়া শুইতে আসে নাই।

সরোজিনী এ বাড়ীর বড় আদরের একমাত্র পুত্রবধূ। তাহাকে সংসারের কাজ বড় বেশী কিছু করিতে হয় না, ঠাকুর চাকরেরাই করিয়া থাকে। কাজেই স্বামীর কথা ভাবিবার, স্বামীর জন্য অস্থির হইবার তাহার যথেষ্ট সময় ছিল।

তাহার শয়ন কক্ষটী বেশ সাজানো গুছানো। দেয়ালের গায়ে ফ্রেমে আঁটা সারি সারি চিত্র। কোনটা মানভঞ্জন, কোনটা যুগলমিলন, কোনটা বস্ত্রহরণ, কোনটা বা কোন বিদেশী রূপসীর আলোক চিত্র। পার্শ্বস্থ পাশবালিশটাকে আকড়াইয়া ধরিয়া সরোজিনী কয়েকমুহূর্ত্ত একখানি চিত্রবিশেষের দিকে চাহিয়া রহিল; এখানি তাহাদেরই বিবাহবাসরের চিত্র। অরুণকুমারের হাসি হাসি মুখখানির পার্শ্বে তাহারই লজ্জারুণ মুখখানি! সরোজিনী একটা ছোটখাট দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া টেবিলের উপরিস্থ ঘোমবাতীটার দিকে চাহিল। মাথার কাছের জানালা দিয়া হাস্‌নাহেনার গন্ধে ভরা মৃদু মৃদু হাওয়া আসিয়া দীপশিখাটীকে কাঁপাইয়া কাঁপাইয়া তুলিতেছিল। সরোজিনী ভাবিল, সেটীও বুঝি কোন অজানা প্রণয়ীর বিরহে তাহার মত কাতর হইয়া পড়িয়াছে!

হঠাৎ কি যেন একটা জানালা দিয়া উড়িয়া আসিয়া তাহার আবরণহীন মুখখানির উপর পড়িল। সরোজিনী চম্‌কিয়া উঠিল, আস্তে উঠিয়া বসিয়া দেখে একখানি চিঠি! —উপরে তাহারই নাম লেখা। বিস্মিতা সরোজিনী কম্পিত হস্তে সেখানি কুড়াইয়া লইয়া খোলা জানালার দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টি নিক্ষেপ করিল, কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পাইল না। এক ঝল্‌কা পাগল বাতাস আসিয়া তাহার খোলা চুলগুলি উড়াইয়া দিয়া গেল। মুখের উপর হইতে চুলের গোছাগুলি সরাইতে সরাইতে কৌতূহলী সরোজিনী রঙ্গীন খামখানির একপার্শ্ব ধীরে ধীরে ছিঁড়িয়া ফেলিল। তারপর পত্রখানি টান দিয়া বাহির করিতেই ছোট ছোট দুটী হিরকখচিত সুন্দর এয়ারিং বিছানার উপর গড়াইয়া পড়িল। ক্ষিপ্রহস্তে চিঠিখানির ভাঁজ খুলিয়া সরোজিনী দেখিল, মুক্তার মত ছোট ছোট অক্ষরে লেখা—

সরো!

ঈশ্বর সব জিনিসের ওপোরই মানুষের প্রভুত্ব দিয়েছেন, শুধু যেননি মনের ওপোর। সেদিন প্রথম যখন অরুণের সাথে এসে তোমাকে দেখি—তখন থেকে মনটা তোমার কাছেই প'ড়ে র'য়েছে। কি কোরবো বল, আমি তোমাকে ইচ্ছে ক'রে ভালবাসিনি। জানি এতে লাভ নেই—জানি এ ভালবাসার কোন প্রতিদান পাবো না—কিন্তু তবু! তবু!—চিঠিখানির দুরুহ উত্তরও কি পাবো না? আমার এই ক্ষুদ্র উপহারটুকুও কি গ্রহণ কোর্ব্বে না? তুমি কি এতদূর নিষ্ঠুরা হবে? না—না, আমি জানি তুমি তা হ'তে পার না। অমন সুন্দর তনুর ভেতর অমন পাষাণ প্রাণ থাকতে পারে না। ইতি

তোমার হতভাগ্য প্রণয়াকাঙ্ক্ষি অজিত।

পুঃ—যাক্ যদি এই হতভাগোর ওপোর দয়া ক'রে চিঠিখানির উত্তর দাও, তবে কাল রাত্তে সেখানা তোমার এই মাথার কাছের জান্‌লা দিয়ে বাইরে ফেলে দিও,—তাহলেই আমি পাবো জান্‌বে।

কম্পিত হস্তে সরোজিনী শয্যার উপর হইতে এয়ারিং দুটী তুলিয়া লইল। উজ্জ্বল গিনি সোণার উপর সুন্দর কাজ করা। মাঝে মাঝে ছোট ছোট হীরার তারাগুলি

চিক্ চিক্ করিতেছে; তাহার ঠিক মাঝখানে একটী তারার চাঁদ ঠিক চাঁদেরই মত স্নিগ্ধ আলো বিকীর্ণ করিতেছে। সরোজিনী এয়ারিং জোড়ার দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল কি সুন্দর এই এয়ারীং জোড়া।

হঠাৎ সে কি এক অজানা ত্রাসে চমকিয়া উঠিল,—তাহার কম্পিত হস্ত হইতে এয়ারীং জোড়া পড়িয়া গেল। হিঃ! হিঃ! সে করিতেছে কি? এযে পাপের ধ্যান। জানালা দিয়া এক ঝলক জ্যোৎস্না আসিয়া সেই হীরক চন্দ্র দুইটীর উপর ঝল্ ঝল্ করিয়া উঠিল। সরোজিনীর বোধ হইল যেন একটা মাংসলোলুপ ব্যাঘ্র তাহার দিকে ক্ষুধ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিয়াছে। তাহার উজ্জ্বল চক্ষু দুটী হইতে আগুণের হল্কা ঠিক্‌রাইয়া পড়িতেছে। সরোজিনীর চক্ষে আগুনের চিহ্ন পরিস্ফুট হইয়া উঠিল, সে সেই তীব্র দৃষ্টি সহ্য করিতে পারিল না। এয়ারীং জোড়া ও চিঠিখানি উপাধানের নীচে রাখিয়া সে তাড়াতাড়ি শুইয়া পড়িল। ভাবিল, স্বামীকে সব কথা খুলিয়া বলিবে।

এমন সময় ধীরে ধীরে কক্ষে প্রবেশ করিয়া হাস্যমুখে অজয়কুমার ডাকিল "সরো।"

সরোজিনীর বুকটা কেমন যেন দুরু দুরু করিয়া উঠিল—সে তাহার চিন্তাকাতর মুখখানি তুলিয়া স্বামীর দিকে চাহিল।

অজয় হাসিয়া বলিল, "এখনো জেগে ব'সে আছ? ঘুমোও নি আমার জন্যে!" হঠাৎ তাহার মুখের দিকে দৃষ্টি পড়িতেই অজয় বলিয়া উঠিল, "একি! মুখখানি ভার ভার যে! মাথা ধোরেছে বুঝি! আমার আসতে একটু দেরী হোয়ে গেছে—না? তা—কি করি বল অফিসটা কিছুতেই ছাড়তে না, বলে, বৌ তো সারারাতই আছে, আমাদের কাজে নয় দুদণ্ড থাকলি! তাই কি করি, দুখানি বেশীই দেখতে হোলো।"

সরোজিনী কোন কথা কহিল না। এই সন্ধ্যাকর ব্যাপারটা স্বামীর কাছে প্রথমে কি বলিয়া উত্থাপন করিবে তাহাই ভাবিতে লাগিল।

সরোজিনীকে নীরব দেখিয়া অজয় বলিল, "বাঃ! অফিস কে ভেলোনা! আমার বন্ধু সে বন্ধু। সেদিন [illegible] তাকে? কিন্তু সে তো তোমায় দেখেছে। ঐ যে সেদিন হাতের আংটীর ডোপে বই পড়ছিলে! কেন। তার কথাতো তোমায় কতদিন বোলেছি।—মস্ত অফিসারের ছেলে।—লাখ টাকা আয়। আর চেহারাখানি যা—ঠিক যেন রাজপুত্তুর!" তারপর হাসিতে হাসিতে বলিল, "সেইজন্যেই তো তোমায় তাকে দেখাইনি,—দেখে যদি আমায় ভাঁকি দাও।"

সরোজিনীর ফুলের পাপড়ীর মত অধর দুখানি একটু নড়িয়া উঠিল, কিন্তু একটী কথাও ফুটিয়া বাহির হইল না। কি জানি! স্বামী যদি শেষে তাহাকেই সন্দেহ করিয়া বসেন—তাহাকেই অপরাধী করেন! তাহা হইলে! তাহা হইলে সে কোথায় দাঁড়াইবে!

২

পরদিন রাত্রে অজয়ের বাড়ীতে অফিসের নিমন্ত্রণ ছিল। মহতে বাঁধা দুখানা অত্যন্ত পুর্ণ থালা দুইখানি দুই বন্ধুর সম্মুখে নামাইয়া রাখিয়া সরোজিনী ঘাম ঢাকিয়া বাঁচিল। তারপর মাথার কাপড়টা তুলিয়া দিয়া বারান্দার দিকের জানালাটা একটু ফাঁক করিয়া দেখিল, অফিসের মুখখানি—হাঁ, রাজপুত্তুরের মতই বটে।

আহারের পর শয্যায় শুইয়া শুইয়া তাহার হৃদয়তারে কেবল ঐ দুইটী কথাই বাজিয়া বাজিয়া বাজিয়া উঠিতেছিল,—লাখটাকা আয়, রাজপুত্তুর। সরোজার কাছে যেখানে খাঁটী খবরটী বুঝি সরোজিনীর মনের কথা বুঝিয়া লইয়া বলিতেছিল "ঠিক। ঠিক।" সরোজিনী চাহিয়া দেখিল ১১টা ৩ মিনিট। কাল এমন সময়েই সে চিঠিখানি পাইয়াছিল না?

সরোজিনী ধীরে ধীরে উঠিয়া তাহার হাতবাক্সটী খুলিয়া ফেলিল। তাহার পর সযত্নে এক কোণে লুক্কায়িত একটী হাতীর দাঁতের ক্ষুদ্র কৌটা খুলিয়া সেই চিঠিখানি ও এয়ারীং দুইটী বাহির করিয়া ফেলিল। চিঠিখানি আর একবার পড়িল, এয়ারীং দুটী আর একবার প্রদীপমান দৃষ্টিতে দেখিল; তারপর সেগুলি পুনরায় যথাস্থানে রাখিয়া দিয়া টেবিলের পার্শ্ব চেয়ারটীতে বসিয়া পড়িল; ভাবিল, আজই চিঠিখানির উত্তর দিবে। চিঠি লিখিবার প্যাড হইতে একটা কাগজ টান দিয়া বাহির করিয়া সরোজিনী লিখিল:—

প্রিয় অজিত বাবু,—

ঈশ্বর বাস্তবিকই মনের ওপোর মানুষের প্রভুত্ব দেননি। নইলে আজ আপনাকে দেখে আমার হঠাৎ এ ভাবান্তর—

এই পর্যন্ত লিখিয়াই সরোজিনী চিঠিখানি কুচি কুচি করিয়া ছিঁড়িয়া বীণপিণার উপর ধরিল। তাহার মর্ম্মের মর্ম্মে মৃদু বিবেকটা তাহাকে হঠাৎ তীব্র দংশন করিয়াছিল। ছিঃ! ছিঃ! সে এ করিতেছে কি! পরপুরুষের কাছে প্রেমপত্র! ছিঃ!—তাহার একখানি অঙ্গ ধিক্কৃত হইয়াছে। মনের সব কালিমাটুকু মোছ করিয়া ফেলিয়া সরোজিনী পত্রার দিকে অগ্রসর হইল।

পত্রার কাছে যাইতেই চম্‌কিয়া উঠিয়া দেখে, তেমনি রঙীন খামে আঁটা আর একখানি পত্র। মুহূর্ত্ত মধ্যে সে কর্ত্তব্য স্থির করিয়া ফেলিল,—এ প্রয়োজন দূর করাই ভাল; চিঠিখানি তুলিয়া লইতে সেখানি যেন কেন একটু ভারী ঠেকিল; সরোজিনীর চোখের উপর হীরকখচিত এয়ারিং দুইটী ঝক্ ঝক্ করিয়া হাসিয়া উঠিল। না—এ মৌভূহল দমন করা তাহার পক্ষে দুঃসাধ্য। তাড়াতাড়ি খামখানা ছিঁড়িয়া উপুর করিতেই পড়িল একখানি চিঠি আর একছড়া নেক্‌লেস্। ছোট ছোট সোনার মোলাগুলি একছড়া মালার মত করিয়া গাঁথা। প্রত্যেক মুক্তার মধ্যে একটী রক্তাভ পাথর বসান। আলো পড়িতেই সেগুলি জ্বলিয়া উঠিয়া তাহার পদ্মের কুঁড়ির মত আঙ্গুল দুটি ঝল্‌সিয়া উঠিল। মূঢ়া সরোজিনী হাতদুটার দিকে কতক্ষণ অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিল, তারপর চিঠিখানি তুলাইয়া লইয়া মনে মনে পড়িতে লাগিল,—

আলোর মতো!

আমার চিঠিখানির উত্তর দিলে না! ছি!—তুমি এতদূর নিষ্ঠুরা হবে তা আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি! কাল সারাটা রাত, আজ সারাটা দিন শুধু তোমার চিঠিখানিরই প্রতীক্ষা ক'রছিলুম। কল্পনায় কত কি লেখা ভাবছিলুম। কিন্তু আজ এখানে এসে দেখি—উঃ! এখানার হাওয়াটা কেমন খোলুটে।

যাক্, আমারই যাবার দোষ থাকে, আমিও তাই থাকলুম; এবার নিশ্চয় উত্তর পাবো। আচ্ছা সরো, ভালবাসাটা কি পাপ? তার জন্য কি ঈশ্বরের কাছে অপরাধী হ'তে হয়? কখন না। ভালবাসা সব সময় ভালবাসা—সব সময় পবিত্র। তাইলে ঈশ্বর আমাকে দিয়ে তোমায় ভালবাসালেন কেন? ভালবাসলেই তার প্রতিদান পাওয়া যায় না, তা জানি। তা যদি হেত তাহলে তুমিও আমায় ভালবাসতে। কিন্তু তাই ব'লে কি আমাকে একটু দিয়ে ভালবাসাও দেখাতে পার না? আমি কি এতই নগণ্য যে সেটুকুও পাবার উপযুক্ত নই? লক্ষ্মীটি, তাই দিও—আমি তাই নিয়েই সুখী হব। তোমার জন্য একছড়া নেক্‌লেস্ পাঠালুম; দেখো ফিরিয়ে দিয়ো না যেন।

তোমারই অজিত।

সরোজিনী ভাবিল, "তাইত! ভালবাসা যদি পাপই হবে তবে আমারই বা অজিতবাবুর মুখখানা কেবল মনে পড়ছে কেন? কখন না, ভালবাসা পাপ হ'তে পারে না। ভালবাসা সব সময় ভালবাসা, সব সময় পবিত্র,—সব সময় স্বর্গের জিনিস। এর সঙ্গে আমার বিয়ে না হ'য়ে অজিতবাবুর সঙ্গেও তো—" সরোজিনীর সমস্ত মুখখানা তার অধর দুটীর মত রাঙ্গা হইয়া উঠিল। সে ভাবিতে লাগিল, "তাহ'লে?—তাহ'লেতো কেউ এ ভালবাসাকে দোষটীয় মনে কোরতে পারতো না! তবে অন্য কারো সাথে বিয়ে হোলেই বা দোষ কি? নিশ্চয় না,—কোন দোষ নেই। বিয়ের সাথে ভালবাসার কি সম্পর্ক? বিয়ে হ'লেই কি ভালবাসা হয়?"

সরোজিনীর কাণে ঘুরিয়া ফিরিয়া বাজিতে লাগিল, ভালবাসা সব সময়ই ভালবাসা—সব সময়ই পবিত্র। ফুল সব সময় ফুল—সব সময় পূজার জিনিস। সরোজিনী ভাবিল, কাল নিশ্চয় সে চিঠিখানির উত্তর দিবে,—যে ভালবাসে, তাকে ভালবাসাই ঠিক্।

ঘড়িটা যেন নীরবে সরোজিনীর ভালবাসার কাণ পাতিয়া ছিল,—একক্ষণ পরে আবার মাথা নাড়িয়া বলিল, ঠিক্! ঠিক্! ঠিক্! ঠিক্!

৩

সাতদিন পরের কথা বলিতেছি.....।

তখন বেলা অপরাহ্ণ। ঊর্দ্ধাকাশে বাষ্পরাশির হাত

কোলাহলে গোলদীঘির পার্কটী মুখরিত। স্থানে স্থানে কচি দূর্ব্বাঘাসের উপর ঘটনা করিয়া বসিয়া স্কুল কলেজের ছাত্রবৃন্দ ভি, এল, রায় ও রবিঠাকুরের প্রাধান্য বিষয়ে উচ্চকণ্ঠে তর্ক জুড়িয়া দিয়াছে। চারিপার্শ্বস্থ বেঞ্চগুলির উপর দলে দলে বসিয়া অফিসের বাবুর দল উর্দ্ধতন সাহেব কর্ম্মচারীদিগের সাতপুরুষের প্রেতোদ্ধার করিতেছেন। মাঝে মাঝে গুচ্ছ গুচ্ছ ফুলের গাছে রঙ বেরঙের বিলাতি ফুলগুলি হাসিয়া হাসিয়া চলিয়া পড়িতেছে। এমনই একটী ফুলবনের পার্শ্বে নিভৃতে বসিয়া দুইটী নব্য-যুবক গল্প করিতেছিল।

"তারপর?"

"তারপর দুই মাথার ওদের জানালার পাশে গিয়ে আস্তে আস্তে তিনবার শিষ্ দিবি। শিষ্ দিলেই খানিকক্ষণ পরে সরোজ ঘরময় খুলে বাড়ী থেকে বার্ হোয়ে আসবে।"

"যদি না আসে?"

"নিশ্চয়ই আস্‌বে। সে বিষয়ে তুই নিশ্চিন্ত থাক্‌তে পারিস্ অজিত। হ্যা—তারপর বেরুলেই দুই হাত ধ'রে মোটরকারে তুলে একেবারে ষ্টেশনে নিয়ে যাবি।"

অজিত বলিল, "হাত টাত আমি ধর্‌তে পারবো না ভাই।"

অপর যুবক ধমক্ দিয়া বলিল, "ধ্যেৎ! ষ্টুপিড—নার্‌ভাস্! একটা মেয়ের হাত ধরার নামেই দাঁত্‌কে উঠ্‌লি? তাওতো এখনো ধরিস্ নি।"

অজিত হাসিয়া বলিল, "আচ্ছা বেশ, হাত যেন ধ'র্‌লুম,—কিন্তু অত রাত্তিরে মোটরকার পাব কোথা?"

অপর যুবক ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিল, "কেন তোরইতো কার রোয়েছে!"

"ওঃ—তা বটে! বেশ, আর কি কোর্‌তে হবে বল্।"

"তারপর ট্রেণে চেপে পঞ্চাসর নৈহাটী ষ্টেশনে নিয়ে গিয়ে কিষেন্ ওয়েটিং রুমে বসিয়ে রাখ্‌বি। আমিও পেছনে পেছনে যাবো'খন ঐ ট্রেণেই, নৈহাটী ষ্টেশনে আমার সাথে দেখা হবে। শেষে যা কিছু ক'র্‌বার তা আমিই কোর্‌বো, তোকে আর কিছু কোর্‌তে হবে না।"

"ট্রেণ কটায় আসিস্?"

অপর যুবক চিন্তিতভাবে বলিল, "হ্যা—আমি টাইম টেবল্ দেখেছি,—ঠিক রাত তিনটেয়। তুই ২৷৷ টের সময় সরোজকে নিয়ে রওনা দিস্; বেশী আগে গেলে হয়ত মন ব'দ্‌লে যেতে পারে। বুঝ্‌লি?"

অজিত গম্ভীর হইয়া বলিল, "হ—তাই ভাব্‌ছি।"

অপর যুবকটী ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিল, "এর ভেতর আবার ভাবাভাবি কি?"

"ভাব্‌ছি শেষে যদি সব ঘোরাল হোয়ে দাঁড়ায়?"

সশব্দে মাথা চাপ্‌ড়াইয়া একটু জোরের সহিত অপর যুবক বলিল, "যা কিছু খরচ-খরচা, বিপদ-আপদ সব আমার! আমি ব'ল্‌ছি তোকে।"

অজিত বলিল, "বেশ, তা যেন হোলো,—কিন্তু আমি যদি শেষে ফাঁকি দি?"

অপর যুবক হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল; তারপর অজিতের মুখের দিকে চাহিয়া মাথা নাড়িতে নাড়িতে বলিল, "বেশ, তাতে আমি রাজি আছি; অমন বদল হোলে আমার বিশেষ কিছু লোকসান নেই।"

অজিত হাসিয়া বলিল, "আমারও নেই।"

"তোর নেই কি রকম? রীতিমত আছে, বাড়ী গেলেই অমিয়াসুন্দরীর খ্যাংরার গুতো।"

অজিত কৃত্রিম ক্রোধে চোখ রাঙাইয়া কহিল, "চোপ্‌রও বান্দা! অমিয়াকে অপমান! কুত্তাও কোথাকার! আমার বৌ কোনদিন ওসব ছাটি জিনিস হাতে করে?"

অপর যুবক তৎক্ষণাৎ যোড়হস্তে বিনীতভাবে বলিল; "খুসি! ওম্ শ্রীবিষ্ণু!—বান্দার গোস্তাকি মাফ্ হয় জাঁহাপনা। আপনার বেগম অমন ক্ষুরধার কটাক্ষবান থাকতে খ্যাংরা ছুঁতে যাবেন কেন? ওটা মুখ দিয়ে ফস্‌কে বেরিয়ে গেছে। দোহাই জাঁহাপনা, ভুলে নেবেন না। চিরদিন বেগম সাহেবার গোলাম হ'য়ে থাক্‌বে।"

অজিত হাসিয়া বলিল, "বটেরে পাজি। নে নে আর ভাকামো ক'র্‌তে হবে না, দাঁড়া আজই অমিয়াকে বোলে দিচ্ছি।"

অপর যুবক জিব্ কাটিয়া বলিল, "সর্ব্বনাশ! অমন কাজও করিস্ নে! তাহ'লে কাল থেকেই পা অবধি ঘোম্‌টা দেওয়া সুরু হবে।"

ধীরে ধীরে সন্ধ্যার আঁধার ঘনাইয়া আসিল। পার্কটীর চারিপার্শ্বস্থ পথের ধারে ধারে গ্যাসের আলোগুলি জ্বলিয়া উঠিল। দীঘির কালো জলের উপর আলোর ঢেউ খেলিয়া গেল। বেঞ্চগুলি খালি করিয়া আফিসের বাবুর দল গৃহিণীর গঞ্জনার ভয়ে একে একে বাড়ী ফিরিতে লাগিলেন।

অজিত তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িয়া বলিল, "তবে আসি ভাই।"

অপর যুবকটী ধীরে ধীরে দাঁড়াইয়া সার্টটা ঝাড়িতে ঝাড়িতে বলিল, "এত সকালেই? বাসায় যাবিতো?"

"তা ছাড়া আর কি? সকাল সকাল চারটি খেয়ে ঘুমুতে হবেতো! নৈলে রাত্তির ২৷৷ টের ওঠা আমার কর্ম্ম নয়।"

"আচ্ছা যা—গুড্ নাইট।"

অজিত বলি, "হাঁ—গুড্ নাইট।" তারপর ধীরে ধীরে ট্রাম লাইনের দিকে অগ্রসর হইল।

অজিত কিছুদূর যাইতেই অপর যুবকটী একটু উচু গলায় বলিল, "দেখিস্‌রে যা যা বল্লুম সব ঠিক্ ঠিক্ মনে থাক্‌বে তো?"

যাইতে যাইতে মুখ ফিরাইয়া অজিত বলিল, "হাঁ খুব থাক্‌বে।"

রাত্রি একটা। টেবিলের কাছে চেয়ারে বসিয়া অরুণকুমার গভীর মনোযোগের সহিত একখানা উপন্যাস পড়িতেছিল। পার্শ্বস্থ শয্যায় শুইয়া সরোজিনী ব্যাকুল-ভাবে একবার ঘড়ির দিকে একবার স্বামীর মুখের দিকে চাহিতেছিল, আর মাঝে মাঝে কেমন যেন অস্থির হইয়া উঠিতেছিল। ক্রমে ক্রমে দেড়টা বাজিল। প্রথম পরিচ্ছেদ শেষ করিয়া অরুণকুমার হঠাৎ মুখ তুলিয়া পত্নীর দিকে চাহিল। সরোজিনীর মুখখানি মলিন, আঁখি যুগলে আতঙ্কের চিহ্ন পরিস্ফুট। অরুণকুমার প্রেমপূর্ণ কণ্ঠে ডাকিল "সরো!"

সরোজিনী চমকিয়া স্বামীর দিকে চাহিল।

"এখনো ঘুমোওনি যে?"

সরোজিনী বলিল, "ঘুম পাচ্ছে না মোটে।"

"অসুখ কোরেচে কোন?"

সরোজিনী অন্যদিকে চাহিয়া ধীরে ধীরে বলিল, "কই? না!"

"তবে কি? দিনে খুব ঘুমিয়েচ বুঝি?"

"না!"

প্রশ্ন নেত্রে পত্নীর দিকে চাহিয়া অরুণ বলিল, "তবে ঘুম পাচ্ছে না কেন? আমার অভাবে নাকি!"

সরোজিনী অস্ফুটস্বরে বলিল, "কি জানি!"

অরুণ হাসিয়া বলিল, "নাও, আর রাত জেগো না; এখন ঘুমিয়ে পড়,—নৈলে অসুখ বিসুখ কোর্‌বে।" তারপর আবার উপন্যাস পাঠে মনঃসংযোগ করিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ শেষ করিয়া অরুণকুমারের তৃতীয় পরিচ্ছেদের কয়েকটা লাইন মাত্র পড়া হইয়াছে, এমন সময় পত্নীর গলায় ঘড়িটা বলিয়া উঠিল চং চং। কক্ষটীর পাশ দিয়া একটা পেচক কর্কশস্বরে চীৎকার করিয়া উড়িয়া গেল। জানালা গলাইয়া ছুটিয়া আসিয়া একটা চামচিকা সশব্দে দেয়ালের গায় মাথা ঠুকিতে লাগিল। উপন্যাসখানি বন্ধ করিয়া রাখিয়া আলস্য ত্যাগ করিতে করিতে অরুণকুমার বলিল, "দুটো! ওঃ—ঢের রাত হ'য়ে গ্যাচে, এখন শোয়া যাক্।" তারপর সরোজিনীর দিকে দৃষ্টি পড়িতেই হাসিয়া বলিল, "বাপ্! এখনো জেগে ব'সে আছ! আমি ভেবেছিলুম ঘুমিয়ে পড়েছ বুঝি। আমার তো ভয়ঙ্কর ঘুম পাচ্ছে। এই বইখানা না হ'লে এত রাত কক্ষণো জাগ্‌তে পাত্তুম না। বেশ বইখানি! না?"

সরোজিনী পাশ ফিরিয়া বলিল, "হ'তে পারে।"

অরুণকুমার ধীরে ধীরে সরোজিনীর পার্শ্বে শুইয়া বলিতে লাগিল, "কেন! পড়নি বুঝি বইখানা? পড়ে দেখো চমৎকার বই। তোমার তো সব চেয়ে রাগ হবে ঐ কমলিনীটার ওপোর যখন সে তার স্বামী মিহিরের অতখানি ভালবাসা পায়ে ঠেলে রাতারাত অজয়ের সাথে বেরিয়ে যাচ্ছে। আর পরদিন মিহিরের অবস্থাটা দেখ্‌লে মন্ ফেটে হাসিও আসে আবার কাঁদ্‌তেও ইচ্ছে হয়।" বলিয়া অরুণ হো হো করিয়া হাসিতে লাগিল।

কিছুক্ষণ নীরবে গত হইলে চক্ষু বুজিয়া অরুণ বলিল, "সরো।"

স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া সরোজিনী উত্তর দিল, "কি ?"

অরুণ তন্দ্রার ঘোরে ধীরে ধীরে বলিল, "আমার ঘড়ি খুব ভোরে তুলে দিও তো, বুঝলে ? একটু কাজ আছে।"

সরোজিনী তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে ঘড়ির দিকে চাহিয়া বলিল, "আচ্ছা।"

কয়েক মিনিট পরেই ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস অরুণকুমারের গভীর নিদ্রার সূচনা করিয়া দিল। তাহার অবশ বাহুখানি সরোজিনীর কাঁধের উপর হইতে গড়াইয়া পড়িল। হতভাগা চামচিকাটা অনেকক্ষণ ছট্‌ফট্ করিয়া ঘরের এককোণে বসিয়া বসিয়া হাঁকাইতেছিল ; সরোজিনী আন্‌মনে তাহাই দেখিতেছিল, আর ভাবিতেছিল আকাশ পাতাল কত কি কথা ! হায় ! সেও বুঝি এই বন্ধ ঘরের ভিতর হাঁকাইয়া উঠিয়াছে !—তার মনটাও বুঝি বনবিহঙ্গমের মত আকাশে বাতাসে উড়িয়া বেড়াইতে চায় ! এ সোণার খাঁচাও—উঃ অসহ্য !

চং করিয়া ৯।০টা বাজিয়া গেল। সরোজিনী ব্যাকুল হইয়া স্থির দৃষ্টিতে ঘড়ির দিকে চাহিয়া রহিল। ক্রমে ক্রমে এক—দুই—তিন—চার—পাঁচ মিনিট অতীত হইয়া গেল। কিন্তু কই ? তাহার সাধ কি মিটিবে না ! তবে কি—তবে কি তাহাকে এই খাঁচার ভিতর পোষা পাখীটীর মতই থাকিতে হইবে ?

এমন সময় জানালার বাহিরে কি যেন বাজিয়া উঠিল।

সরোজিনী চম্‌কিয়া উঠিল, "ওই যে শিষ্ দিচ্ছে না ? আবার বাঁশীর মত সেই আওয়াজ ; "হাঁ—শিষ্‌ই বটে।" সরোজিনী উৎকর্ণ হইয়া রহিল। আবার—আবার সেই শব্দ ! তেমনি তীব্র অথচ মৃদু !—গম্ভীর অথচ মধুর ! সরোজিনী তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কয়েক মুহূর্ত্ত স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। অরুণকুমার অঘোরে ঘুমাইতেছে ; তাহার মুখে মৃদু মৃদু হাসির রেখা,—বোধ হয় কোন সুখের স্বপ্ন দেখিতেছিল। সরোজিনী শয্যা ছাড়িয়া ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইল ; ধীরে ধীরে টেবিলের উপর হইতে হাত বাক্সটা তুলিয়া লইল ; মুখ ফিরাইয়া আবার স্বামীর দিকে চাহিয়া কয়েক মুহূর্ত্ত ইতস্ততঃ করিল। তারপর কি ভাবিয়া হাতবাক্সটা আবার নামাইয়া রাখিয়া অরুণকুমারের পার্শ্বে আসিয়া শয়ন করিল। কয়েক মিনিট পরে আবার সেই শিষের শব্দ !—পূর্ব্বাপেক্ষা আর একটু গম্ভীর। সরোজিনী অধীরা হইয়া উঠিয়া বসিল ; টেবিলের উপর হইতে হাতবাক্সটা আবার ধীরে ধীরে তুলিয়া লইল ; পা টিপিয়া টিপিয়া দরোজার কাছে গিয়া নিঃশব্দে দরোজাটা খুলিয়া ফেলিল ; তারপর কোনদিকে না চাহিয়া তাড়াতাড়ি কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেল।

বাহিরের দরোজা খুলিতেই হাস্যমুখে অজিত আসিয়া তাহার হাত ধরিল। সরোজিনীর পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত শিহরিয়া উঠিল, মুখখানা গোলাপ ফুলের মত রাঙা হইয়া উঠিল,—কিন্তু কোন কথা কহিল না। নিকটেই একখানা সুদৃশ্য মোটর ছিল। অজিত কম্পিত ফুলের মত হাতখানি ধরিয়া, অন্য হাতে গহনার বাক্সটি লইয়া তাহাতে উঠিয়া বসিল ; তারপর 'সোফার' কে মৃদুস্বরে হুকুম করিল, "শিয়ালদা ষ্টেশন"।

৩

ধরণী রাণীর মুক্ত বক্ষে ভোরের আলো ফুটিয়া উঠিয়াছে। সারারাত্রি অঘোর ঘুমের পর রক্ত আঁখি সূর্য্যদেব পূর্ব্বদিকে ধীরে ধীরে তাকিয়া উঠিয়াছেন। গাছে গাছে রঙবেরঙের পাখীগুলি মনের সাধে প্রভাতী গাহিতেছে। নৈহাটী ষ্টেশনের প্ল্যাটফর্ম্মে দুই চারিটী ছাড়া লোক নাই। রেলিংএর ধারে ধারে শিশিরে ভেজা ফুলগুলির কাণে কাণে ভ্রমর বলিতেছে গুন্ গুন্ গুন্ ! ফুলগুলি তাহা শুনিয়া হাসিয়া এ উহার গায় ঢলিয়া পড়িতেছে।

প্ল্যাটফর্ম্মের এক কোণে একটী বেঞ্চের উপর বসিয়া একটী তরুণ যুবক ছড়ি ঘুরাইতে ঘুরাইতে চিন্তিতমনে শিষ্ দিতেছিল। ধীরে ধীরে তাহার নিকটে গিয়া অজিত হাসিয়া বলিল, "হ্যালো ! তুই এসেছিস্ তা হ'লে !"

যুবক হাসিয়া বলিল, "নিশ্চয় ! তুই কি মনে কোচ্ছিলি ?" অজিত বেঞ্চের একপার্শ্বে বসিয়া পড়িয়া বলিল, "আমি ভেবেছিলুম তুই বুঝি ট্রেণ মিস্ কোরে ব'সে আছিস্।"

"তাও ভাল! আমি ম'রেছি ভাবিস্‌নিতো?"

অজিত হাসিয়া বলিল, "না—তা আর ভাবিনি। এমন গুণ্ডা চেহারার লোকটা যদি এত হঠাৎ মারা যেতে পারে, তাহ'লে আমিতো এখন তখন।"

"আমি যদি হঠাৎ মারা যেতুম তাহ'লে তোর খুব সুবিধে হোতো;—না?"

অজিত ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিল,—"কি রকম?"

যুবক বলিল, "বেশ একটা বাঁও যেত!"

অজিত হাসিয়া যুবকের পৃষ্ঠদেশে একটী মুষ্টাঘাত করিয়া বলিল, "চুপ রাস্কেল!—ফের্ বোরে মুখ খেঁত্‌লে দোবো।"

যুবকটী হাসিতে হাসিতে বলিল, "আচ্ছা সে যাক্। তারপর?—এদিকে সব ঠিক্‌তো?"

"নিশ্চয়ই!"

"পথে গোলমাল হয়নি কোন?"

"না,—হ্যাঁ তবে ট্রেণে একবার ব'লছিল, আমায় বাড়ী রেখে আসুন।"

অজিতের মুখের দিকে চাহিয়া যুবক বলিল, "তারপর?"

"তারপর আমি যখন বেশ ক'রে বুঝিয়ে দিলুম যে এখন ফিরে যাওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব,—তার ইচ্ছে হ'লে সে একলা যেতে পারে, তখন চুপ মেরে গেল।"

যুবক হাসিয়া বলিল, "বেশ! তাইতো চাই! এখন কোথায় রেখে এলি?"

"কাকে? সরোজকে?"

"হ্যাঁ?"

"কেন? তুই যা বলে দিয়েছিলি,—ঘিয়েল ওয়েটিং রুমে।"

যুবক বলিল, "গহনার বাক্সটা?"

অজিত বলিল, "তারই কাছে।"

এমন সময় চং চং করিয়া কলিকাতাগামী মেল ট্রেণের প্রথম ঘণ্টা পড়িয়া গেল। যুবক উঠিয়া দাঁড়াইয়া অজিতকে বলিল, "আচ্ছা তুই একটু বোস্,—আমি আস্‌ছি এখুনি। তারপর প্লাটফর্ম্মের উপর দিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।

প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর মেয়েযাত্রীদের বিশ্রাম কক্ষে একটা ইজিচেয়ারে হেলান দিয়া সরোজিনী একলাটী কত কি ভাবিতেছিল। হায়! সে এ করিয়াছে কি! স্বামীর অগাধ বিশ্বাস, অফুরন্ত ভালবাসা পায়ে ঠেলিয়া সে পাপের পথে পা বাড়াইয়াছে! সরোজিনীর মনে পড়িল সেই কাল রাত্রের কথা। সেই যে উপন্যাসখানি পাঠ করিয়া অরুণ বলিয়াছিল "সরো! বইখানা প'ড়লে তোমার সব চেয়ে রাগ হবে কমলের উপর। কমল তার স্বামী মিহিরকে ফাঁকি দিয়ে অজয়ের সাথে পালিয়ে যাচ্ছে দেখলে তুমি নিশ্চয় কমলের ওপোর রেগে যাবে।" কিন্তু হায়! সে নিজেই বিশ্বাসঘাতিনী! রাগা দূরে থাকুক্, সে নিজেই কমলের পথ অবলম্বন করিয়াছে! সরোজ—সরোজিনীই কি কমল নয়? অরুণই কি মিহির নয়? আর অজয়? অজয় আর অজিত তো একই কথা! তবে—তবে কি স্বামী তাহার মনের কথা বুঝিয়াছিলেন? না—না—তাহা সম্পূর্ণ অসম্ভব! কই, স্বামীর মুখে সেতো সন্দেহের একটু ছায়াও দেখিতে পায় নাই। ওঃ! স্বামী যদি তাহাকে একটুও সন্দেহ করিতেন! একবারও ভর্ৎসনা করিতেন! তাহা হইলে? তাহা হইলে সে বোধ হয় এমন পাপের আগুনে পুড়িয়া মরিত না। কিন্তু হায়! সে যে নিজেই নিজের সর্ব্বনাশ করিয়াছে! স্বামীর দোষ কি? তিনিতো চিরপ্রসন্ন—চিরহাস্যময়;—এ যে তাহার স্বপ্নেরও অতীত ছিল!

সরোজিনী ভাবিল, যা হইবার হইয়াছে, আর নয়। সে আবার বাড়ী ফিরিয়া যাইবে; অজিতবাবু না যান সে একেলাই যাইবে। তারপর—তারপর স্বামীর পায়ে ধরিয়া ক্ষমা চাহিলে তিনি কি ক্ষমা করিবেন না? তাহার চরণ সেবার অধিকারটুকুও দেবেন না?—যদি না দেন? না—না নিশ্চয় দেবেন। অতদূর নিষ্ঠুর হওয়া যে তাহার পক্ষে একেবারে অসম্ভব! কিন্তু—

সরোজিনী ভাবিতে লাগিল, "কিন্তু এতক্ষণ তো সব জানাজানি হইয়া গিয়াছে! স্বামী ক্ষমা করিলেও লোকে ক্ষমা করিবে কেন? আমার জন্য স্বামীর মুখে কালি পড়িবে! আমার জন্য!—ওঃ!!"

হঠাৎ সম্মুখে চাহিয়া সরোজিনী দেখিল হাস্যমুখে

নিকটে দাঁড়াইয়া অরুণকুমার!—তেমনি উজ্জ্বল প্রশান্ত মূর্ত্তি! ভয়ে বিস্ময়ে অস্ফুট স্বরে চীৎকার করিয়া সে চেয়ারের উপরেই ঢলিয়া পড়িল।

অরুণকুমারের মুখ মলিন হইল। চকিতে পত্নীর দিকে চাহিয়া সে তাড়াতাড়ি বাহিরে গিয়া ডাকিল, "অজিত! —অজিত!"

অজিত তখনো বেঞ্চের উপর বসিয়াছিল; সারা রাত্রি জাগরণের পর তাহার চক্ষু দুইটী ঘুমে জড়াইয়া আসিতেছিল। সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া ছুটিয়া আসিয়া বলিল, "কি রে! কি হোয়েছে! ব্যাপার কি?"

অরুণ বলিল, "শীগ্‌গির জল নিয়ে আয়—সরো কিই গ্যাচে! যা—দৌড়ে যা।"

অজিত দৌড়িয়া গিয়া ষ্টেশন মাষ্টারের নিকট এই আসন্ন বিপদ জানাইয়া এক বাল্‌তী জল ও একটা মাদুর লইয়া আসিল। মাদুরটা তাড়াতাড়ি পাতিয়া দুই বন্ধুতে ধরাধরি করিয়া সরোজিনীকে তাহার উপর শোয়াইল।

অরুণকুমার সরোজিনীর মাথাটা কোলের উপর তুলিয়া লইয়া মুখে চোখে জলের ঝাপ্‌টা দিতে লাগিল। কিন্তু দশ মিনিট ক্রমাগত জলের ঝাপ্‌টা দিয়াও কোন ফল হইল না; অরুণকুমারের মুখখানি ভয়ে বিবর্ণ হইয়া গেল। পত্নীর মুখের দিকে চাহিয়া অরুণকুমার ডাকিল, "সরো!" কেহই উত্তর দিল না।

প্লাটফর্ম্মস্থিত যাত্রীদিগের মধ্যে সৌভাগ্যক্রমে এক-জন সিভিল সার্জ্জন ছিলেন; ব্যাপার শুনিয়া তিনি দৌড়িয়া আসিলেন। কিছুক্ষণ নীরবে পরীক্ষা করিয়া তিনি বলিলেন, "আমার বোধ হয় হঠাৎ কোনরকম মানসিক উত্তেজনায় এমনটা ঘটেছে।—তা ভয়ের কোন কারণ নেই, সন্ধ্যাবেলা—কি সন্ধ্যার কিছু পর নিশ্চয় জ্ঞান হবে। ষ্ট্রিট্‌মেণ্টের বিশেষ কোন দরকার দেখছি না।" তারপর অরুণের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "মেয়েটী আপনার ওয়াইফ্ বুঝি? কোথায় যাচ্ছেন আপ্‌নারা?"

অরুণ ধীরে ধীরে বলিল, "কোল্‌কাতা।"

সিভিল সার্জ্জন বলিলেন, "ও—জ্বালপ! তা এঁকে অরেঞ্জে ষ্টেশনে তুলে নিয়ে যেতে পারেন,—কোন আপত্তির সম্ভাবনা নেই: চাই কি ঝাঁকি ঝুঁকিতে হয়ত জ্ঞানও হ'য়ে যেতে পারে।"

এমন সময় সশব্দে প্লাটফর্ম্ম কাঁপাইয়া যেন ট্রেণ আসিয়া ষ্টেশনে থামিল। ইন্‌জিনটা একটা প্রকাণ্ড দস্যুর মত নিষ্ফল আক্রোশে গর্জ্জাইতে লাগিল। সিভিল সার্জ্জন বাক্স ছাট্‌টী ভাল করিয়া পরিতে পরিতে দ্রুত পাদ বিক্ষেপে ট্রেণের দিকে ছুটিলেন।

অজিত এবং অরুণকুমার দুইজনে ধরাধরি করিয়া সরোজিনী ও হাতবাক্সটীকে লইয়া সেকেণ্ডক্লাশের কামরায় উঠিয়া বসিল।

৬

সন্ধ্যা হয় হয়। আকাশের গায় দুই চারিটী তারা-ফুল ফুটিয়া উঠিয়াছে। এদিক ওদিক দুই একটা জোনাকী মুহূর্ত্তের জন্য আপনার স্নিগ্ধ আলোটুকু ছড়াইয়া দিয়া আবার নিভিয়া যাইতেছে।

শয়নকক্ষে টেবিলের কাছে বসিয়া অরুণকুমার পূর্ব্ব-দিনের অর্দ্ধপঠিত উপন্যাসখানির চতুর্থ পরিচ্ছেদ পড়িতে-ছিল। সম্মুখে বাতিদানীর উপর মোমবাতীটা পূর্ব্বদিনের মতই নিঃশব্দে জ্বলিতেছিল। পার্শ্বে কোমল শয্যার উপর তেমনিভাবে শুইয়া সরোজিনী নিদ্রা যাইতেছে—তাহার এখনো জ্ঞান হয় নাই। মাঝে মাঝে অরুণকুমার বহি-খানি বন্ধ করিয়া পত্নীর দিকে ব্যাকুল দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছিল।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সরোজিনী চোখ মেলিয়া উঠিয়া বসিল। তারপর কয়েক মুহূর্ত্ত নীরবে থাকিয়া স্বামীর দিকে চাহিয়া বলিল, "তোর হ'য়ে গ্যাচে বুঝি? তুমি এখনো পড়্‌ছো ব'সে ব'সে? ঘুমুওনি। ইঃ!—এমন একটা বিশ্রী স্বপন দেখ্‌ছিনু!"

অরুণকুমার পত্নীর দিকে প্রসন্ন দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল "বাবু,—তোমার যে জ্ঞান হ'য়েছে—আবার কথা ব'লতে পেরেছ, এই ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ সরো! আমিতো ভেবে-ছিলুম বুঝি—" অরুণকুমার আর বলিতে পারিল না। তাহার কণ্ঠে কথাগুলি আটকাইয়া গেল।

বিস্ময়মাখা দৃষ্টিতে স্বামীর দিকে চাহিয়া সরোজিনী বলিল, "কেন! আমার কি হ'য়েছিল।"

অরুণ বলিল, "তুমি অজ্ঞান হ'য়ে প'ড়েছিলে যে!"

"অজ্ঞান হ'য়ে পড়েছিলুম! তাহ'লে স্বপন নয়,—সব সত্যি?"

অরুণ কুমার ধীরে ধীরে বলিল, "হা—সব সত্যি।"

সরোজিনী কয়েক মুহূর্ত্ত অর্থশূন্য দৃষ্টিতে বিহ্বলের মত চাহিয়া রহিল। ধীরে ধীরে তাহার স্মৃতিশক্তি ফিরিয়া আসিতে লাগিল। তাহার একে একে মনে পড়িল সেই সব কথা!—সেই যে অজিতের সহিত সপ্তাহকাল ধরিয়া প্রেমপত্র বিনিময়;—গহনার বাক্স লইয়া রাতারাতি শৈহাটী ষ্টেশনে পলায়ন;—তারপর ওয়েটিং রুমে হঠাৎ স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ। তারপর? তারপর আর কিছুই মনে পড়েনা, বোধ হয় সে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিল।

সরোজিনীর মুখখানি মড়ার মত ফ্যাকাশে হইয়া গেল সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া অরুণকুমারের পা'দুটি দুইহাতে জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিয়া বলিল, "বল—বল আমায় ক্ষমা কোর্‌বে? আর কিছু চাইনে, শুধু ক্ষমা;—শুধু ক্ষমাটুকু আমায় দাও।"

অরুণকুমারকে নীরব দেখিয়া সরোজিনী আবার বলিল, "জানি আমি পাপিষ্ঠা—কিন্তু তবু তোমার স্ত্রী। তুমি ক্ষমা না ক'রলে যে আমার দাঁড়াবার স্থান নেই!"

স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে পত্নীর দিকে চাহিয়া অরুণ বলিল, "আমি তো তোমার উপর রাগ করিনি সরো। তবে যেটুকু দোষ কোরেছ তার ক্ষমা চাইবার অনেক আগেই তোমায় দিয়েছি।"

স্বামীর পা ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া সরোজিনী বলিল, "আমি জান্‌তুম আর কেউ না করুক তুমি আমায় ক্ষমা ক'রবেই। কিন্তু—কিন্তু আমি যে নিজেই নিজেকে ক্ষমা ক'রতে পাচ্ছিনে!"

অরুণকুমার ধীরে ধীরে বলিল, "মানুষের জীবনে অনেক ভুলচুক্ হয় সরো। ঈশ্বর তাই তোমার চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন। এতে নিজেকে ক্ষমা কর্‌বার মত কিছুই নেই।"

সরোজিনী ধীরে ধীরে হাতবাক্সটা খুলিয়া ফেলিয়া একতাড়া লাল ফিতায় বাঁধা চিঠি এবং কতকগুলি গহনা বাহির করিল। তারপর সেগুলি স্বামীর পায়ের কাছে রাখিয়া বলিল, "এইগুলোই আমায় দোষ দেখিয়ে পাপের পথে ভুলিয়ে নিয়েছিল। তুমি অজিত বাবুকে এসব ফিরিয়ে দিয়ে আমার প্রণাম জানিয়ে বোলো যে তিনি আমার দাদা,—আমার মার পেটের ভাই। তিনি যদি বোন ভেবে আমায় এসব দেন, নিতে পারি—নৈলে নয়!"

অরুণ মৃদু হাসিয়া বলিল, "অজিত? অজিত তো এসব আনেনি!"

সরোজিনী আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, "তবে?"

হাসিয়া অরুণকুমার বলিল "গহনাগুলো সব আমিই দিয়েছি তোমাকে। আর চিঠিগুলো? তাও আমারই লেখা। একটু বাঁকা বাঁকা ক'রে লিখেছি ব'লে তুমি ধ'র্‌তে পারোনি সরো!

সরোজিনী কয়েক মিনিট নীরবে গভীর বিস্ময়ে অরুণের দিকে চাহিয়া রহিল। তারপর স্বামীর পায়ের ধূলি মাথায় লইয়া বলিল, "আশীর্ব্বাদ কোরো আমার যেন আর অমন কুমতি না হয়!"

অরুণকুমার চাহিয়া দেখে তাহার দুই চোখে দুইফোঁটা অনুতাপের অশ্রু স্বচ্ছ মুক্তার মত টল্ টল্ করিতেছে। সে তাড়াতাড়ি পত্নীকে দুই বাহু বাড়াইয়া বুকে টানিয়া লইল।

ইণ্ডিয়ান সোপ কোম্পানীর
মেসিনে প্রস্তুত
চন্দন, রজেলবকুল, মাস্ক ও ভেলভেট সাবান
ব্যবহার করুণ। টেলিফোন, ২৪৯৬

গহনার তালিকা

[শ্রীঅমরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়]

এই যে রূপোর মল্-জোড়াটী নেইকো কারু-কার্য্য এর
তবু ত সই আমার কাছে মূল্য ইহার অনেক ঢের ;
বাপ-মা আমার গরীব বড় কোথায় পাবে পাঞ্জা পা'র
বিয়ের দিনে এই যে দেওয়া অনেক বড় অলঙ্কার।

বড় দিদির আশীষ-ভরা ভগ্নী স্নেহের চিহ্ন সই,
পাইনি কিছুই ছাল্না তবে যাইশ ভরি 'রেটটী' বই,
গেঁটে গেঁটের ভাইস্-কাটা ভালবাসার হিনির ঘায় ;
দু'টী বোনের বাঁধন যেন এর বাঁধনে জুড়িয়ে যায়।

বড় জা', মোর ধনীর মেয়ে দেমাক্ তবু নেইকো তার,
আপন ক'রে বাঁধ্তে পরে পাঠিয়েছে এই কণ্ঠহার।
ছিলাম মোরা কে কোথাকার ! হলুম আমি দুইটী বোন্
ভাই ভাবি মোর হরষ ভরে পেয়ে হারের আলিঙ্গন।

বিধির এমন শৃঙ্খলা সই মা'রে হ'ল দুইটীরে
নতুন মায়ের সোনার বালা—ভোরের যেন জুঁইটীরে ;
সুবাস-ভরা মায়ের প্রীতি কাঁকন্-বালা ছড়িয়েছে,
চিত্ত আমার নিতুই যেন মায়ের আশীষ কুড়িয়েছে।

দু'টী বাহুই সগৌরবে সোনার আভায় দীপ্তিমান্
ধোয়াই-করা সোনার অনন্ত—পিতৃ-সম-যত্ন-দান।
এর গায়েতে অমর-লেখা—এই গুলি মা ন'বৌর কাজ ?
দিবারাত্তিই তাই রেখেছি দুই বাহুতে—কিসের লাজ ?

ঠাকুরপোটী বয়স-ভোলা, মায়ের মতই ভক্তি ক'রে
অর্ঘ্য তাহার অঙ্গুরী এই অঙ্গুলিতে আছিই ধ'রে ;
ছোট বড় অক্ষরে সই কেমন লেখা, "দেবর তব"
তাকাই যবে এর পানেতে শুধুই আনে হরষ নব।

ছোট ননদ্ রসিকা খুব পাঠিয়েছিল নোলক্-খীন্
রসিকতার একটু কথা পেয়েছিলাম বিয়ের দিন ;
বাসর ঘরে যখন শুনি পড়ল মহা হাসির ঘুম
"নোলক দুলি' তোমার মুখে দিবে আমায় বোনের চুম।"

বড় জায়ের মেজো খুকী বছর পাঁচেক বয়স তার
খুকী মা মোর ধা' দিয়াছে—তুলনাই তার নেইক আর।
অস্ফুট ভাষায় ব'লেছে সে,—"খুলোমা মোল্ পল্বে তিপ্
কপালে তাল্ দল্বে যেন দেব-দেউলে খাঁদেল্ দীপ্।"

স্বামীটী মোর লাজুক ভারী, দেখ্না তবু এই যে নোয়া
সবার আগে বিয়ের দিনে এইটীই যে স্বামীর দেওয়া ;
নয়কো হীরা, নয়কো মতি, নয়কো সোনা-রূপার পাত,
এই নোয়াটী ব্যতিরেকে বল্ দেখি সই মানায় হাত ?

আর দিয়েছে জ্যেষ্ঠ ননি সিঁথীর সিন্দুর উজল দীপ্
ইহার মূলে সবই ছোট, সোনা-রূপায় হই না টীপ্।
দিবারাত্তি বলছি আমি হোক্ না এদের দাম-ই কম্,
নোয়া হাতে সিন্দুর সিঁথে যায় যেন সই মোর জীবন।

সাচ্চা কথা

(দ্বাদশবর্ষীয় জনৈক বালক)

[শ্রীশ্রীপতিপ্রসন্ন ঘোষ]

১। যাহার আত্মত্যাগ করিবার ক্ষমতা নাই, তাহার পক্ষে নেতা সাজা বিড়ম্বনা মাত্র।

২। দৃঢ়চিত্তে যিনি আদেশ মানিয়া চলিতে পারেন, ভবিষ্যতে অপরের চালক হওয়া তাঁহারই শোভা পায়।

৩। সংসারে যাকে লোকে 'প্রেম' বলিয়া চালাইতে চায়, নিবিড়ভাবে ভাবিয়া দেখিলে দেখিতে পাইবে ওটা আর কিছুই নহে, মনের একটা বিকৃত অবস্থা মাত্র।

৪। লম্বা দাড়ি লইয়া বেদীর উপরে বসিয়া অনর্গল লম্বা চওড়া বক্তৃতা দেওয়ায় অর্থই ধর্ম্ম নয়। উহাদের অনেকেই প্রচারকের 'সাজে' প্রবঞ্চক মাত্র। ভগবানের উপাসনার দোহাই দিয়া ইহারা ভগবানকে বিদ্রূপই করিয়া থাকেন।

পূজার উপহার

[শ্রীযোগেশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়]

এল পূজা চারি দিকে গোল
ব্যস্ত সবাই প্রিয়ার তরে আজি
ভাবটা মনে মুখেরকে জব্দ করি'
এনে দেবে অতুল রতন রাজি।

দীন দরিদ্র তোমার স্বামী যে গো
সে সব আশা নাইক কিছু তার,
নাইক কিছুই তোমায় দেবার মত
দেব তাই আজ নূতন উপহার।

একটী বাহু রাখব কটি ঘিরে
বহুমূল্য চন্দ্রহারের মত,
অপরটীতে ধ'রব কণ্ঠ বেড়ি'
লজ্জা পাবে স্বর্ণহারও কত,

স্কন্ধে আমার রাখব তোমার মাথা
কণ্ঠ দিয়ে কপোলখানি ঘিরে,
হীরার মুকুট হোক না যতই দামী
দেখে এ সব লাজে যাবে ফিরে।

দু'টী করই রাখব আমার হাতে
বলয় চুড়ি সবই তাতে পাবে,
স্নেহাশীষের লৌহ শঙ্খ দু'টী
জলবে হাতে সদাই উজলভাবে।

শতেক গুচ্ছ নেকলেশ্‌টীর মত—
হিয়ায় হিয়া রাখব যুক্ত ক'রে
সুখে দুখে চির দিনের সাথী,
চুমার নথটী রাখব অধর 'পরে।

প্রেমের গীতি নীলার দুলের মত—
তোমার কাণে দুলবে অনুক্ষণ
দু'জনাতে হ'য়ে যাব এক
বেণারসীর নাইক প্রয়োজন।

এ সব দানে তুষ্ট যদি হও—
প্রতিদান গো দিও কিছু মোরে
মুখের পানে তুলে ও মুখখানি
বেঁধো আমায় কোমল বাহু ডোরে।

হাস্য ও কৌতুক

[শ্রীমনোরমচন্দ্র গুহ ঠাকুরতা]

পর্দ্দানশীন

এক ভদ্রলোক তাহার সপ্তম বর্ষ বয়স্ক পুত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন বলত সুরেশ পর্দ্দানশীন স্ত্রীলোক অর্থ কি? পুত্র উত্তর করিল—যে সমস্ত মেয়েরা পর্দ্দার আড়ালে থাকেন।

পিতা—কোন্ কোন্ জাতির স্ত্রীলোক পর্দ্দানশীন? পুত্র পিতার প্রশ্নের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর দিল "কেন মেমসাহেবেরা—তাও জাননা তাদের বাড়ীর প্রত্যেক ঘরগুলা জানালা গুলিতেই যে পর্দ্দা টাঙ্গানো থাকে।"

অর্দ্ধমৃত

নেহাৎ বেরসিক লাইফ এসিওরেন্স কোম্পানীগুলিতেও মাঝে মাঝে বেশ রসিকতার আমদানী হইয়া থাকে। সেদিন বীণা এসিওরেন্স কোম্পানীতে এক ভদ্রলোক বেশ সুন্দর একখানা পত্র লিখিয়াছিলেন। পত্রখানাতে লেখা ছিল মহাশয় আমার পিতা মোটরগাড়ী হইতে পড়িয়া গিয়া অর্দ্ধমৃত তাঁহার লাইফ আপনাদের কোম্পানীতে ইন্‌সিওর করা আছে অতএব আমার পিতার প্রাপ্য টাকার অর্দ্ধেকটা এখনই দিয়া দেওয়া উচিত কারণ তিনি এখন অর্দ্ধমৃত। সম্পূর্ণ মৃত হইলে সম্পূর্ণ টাকাই আমরা এখন একেবারে দাবী করিতাম।

সুন্দর মুখ

[শ্রীপ্রভাতকিরণ বসু]

দেখার চার-পাশের এই সব বিটকেল মুখগুল' দেখে যদি বাপু তোমার ভয় করে, তাহ'লে এ পাতাটা বাদ দিয়ে যেও! কিন্তু ব্যাপারটা কি, জানবার জন্ত যদি বিশেষ কৌতূহল হয়, তাহ'লে আমি এমন একটা সুসংবাদ দিতে পারি, যা শোনবার আগ্রহ মেয়ে-পুরুষ সকলেরই আছে। জিনিসটা আর কিছু নয়, এটা হচ্ছে, নানারকম মুখভঙ্গীর সাহায্যে মুখের রক্ত চলাচল বাড়িয়ে, কি ক'রে মুখের শ্রী ও রংএর স্থায়ী উন্নতি করা যায় তারই খবর। শুনবে, না চলে যাবে?

মাঝে মাঝে এক একটি লোক দেখা যায়, যাদের শরীরের গড়ন মন্দ নয়, কিন্তু মুখখানি এমনি, যে সে খালি তার মার চোখেই ভালো লাগবে! এক একজন মেয়ের রং হয়ত খুব কর্সা, গলাটি হয়ত খুব মিষ্টি, চলনটি হয়ত খুব সুন্দর কিন্তু খোমটাটি খুলেছে কি, চাই-নিজ প্যাটার্নের মুখখানি দেখে তোমার ভক্তিও উড়ে গেছে। সম্প্রতি যখন এমন প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে, যে, শরীরের মতন] মুখের উন্নতিও ব্যায়ামের দ্বারা সম্ভব হ'তে পারে, তখন এদের নিরাশ হওয়া উচিত নয়।

স্বাস্থ্যের প্রসন্ন জ্যোতিঃ মুখে সমস্তক্ষণ জল্‌জল্ করছে, তার চেয়ে সুন্দর জগত পৃথিবীতে আর কি আছে? ঠিক তার উল্টোটি—অর্থাৎ বিষণ্ণ মুখের নিস্তেজ ভাব, সেই বা কখনো দেখতে চায়? অস্বিচর্মসার লোকের মুখ—হাড়বাড়-করা, গাল-চড়ানো, কোটরগত-চোখ,—তাতে যেন জীবনের কোন সাড়া নেই; সে মুখ সহজে কাউকে আনন্দ দিতে পারে না। আর মোটা লোকের গোল চন্দ্রবদন, পাউরুটির মতন ফোলা-ফোলা, সে যেন বিনা-পয়সায় পেলে একখানা নিয়ে রেগে দেওয়া যায়! কিন্তু সে জিনিস পছন্দ বেশী কেউ করে না।

সমস্ত শরীরের মতন, মুখেরও শিরা-উপশিরা এবং মাংস-পেশী আছে। বয়স হ'লে মুখের চামড়া যে ঝুলে পড়ে, আর জায়গায় জায়গায় টোল খেয়ে যায়, তার কারণ কিছু নয়, ঐ সব মাংস-পেশীর জোর কমে যায় বলে। নিয়মমত ব্যায়ামের সাহায্যে মুখের এই সব পেশীর কাজ বাড়িয়ে দিলে, মুখের গড়ন ক্রমে নিখুঁত হয়ে আসে, আর মুখের রংটাও অনেকটা উজ্জ্বল হয়।

সেই ব্যায়ামের প্রণালী কি রকম, এক-খানা মুখেরই নানা রকম ছবি দিয়ে এখানে সেটা বোঝান হয়েছে। এই সব অদ্ভুত ভঙ্গীর দ্বারা, নাক, চোখ, ঠোঁট, গাল, ভুরু, কপাল —একবার মুখের সমস্ত জায়গারই 'এক্সার-সাইজ' হয়,এবং যেখানকার যা ত্রুটি সব আস্তে আস্তে সংশোধন হয়। এই সব ব্যায়াম একবার থেকে আরম্ভ করে,যেমন যেমন সুবিধা বোধ,আর্শির সামনে দাঁড়িয়ে করে যাও; কোনটি কিন্তু বাদ দিলে চলবে না। ব্যায়ামের পর মুখটা জল দিয়ে বেশ ক'রে ধুয়ে ফেলবে। ছমাস ধৈর্য্য ধরে ক'রে তারপর ফলটা দেখ!

অনেকের হয়ত মনে হবে, যে এ রকম ধারা মুখ বিকৃত করলে, মুখে অনেক রকম খাঁজ হ'য়ে যেতে পারে। এ আশঙ্কাটা যে অমূলক, তা কচি ছেলেদের দৃষ্টান্ত দেখলে বোঝা যাবে; তারা যখন কাঁদে, তখন মুখে কতই না দাগ থাকে! কিন্তু একবার চুপ করলেই তার একটি চিহ্নও খুঁজে পাওয়া যায় না। খোকাখুকুদের মুখ বোধ হয় অনবরত কাঁদবার দরুণই অত সুন্দর!

এই রকম ব্যায়ামে মুখের তারুণ্য অনেক বয়স অবধি ঠিক রাখা যায়। যারা ভাল বক্তা, কিংবা ভাল অভিনেতা, সহজে তাদের বয়স বার করা মুস্কিল!

একটি ব্যায়ামের ছবি এখানে দেওয়া হয়নি, সেটি হচ্ছে হাই তোলা। সকলেই হাই তোলে, কিন্তু কজন জানে, যে ভালো ক'রে হাই তুললে সমস্ত মুখেরই বেশ ভাল রকম পরিশ্রম হয়? তাহ'লে দেখতে পাচ্ছ ভুরু-কোঁচকানো, নাক সিঁটকানো, জিভ ভ্যাংচানো, মুখ-বাঁকানো, এসব বদ অভ্যাস মুখের কতটা উপকার করে? ঐ গুলো, আগে ক'রে, তারপর নিজের খুসি মতন মুখের ব্যায়ামটা আরম্ভ কোর, তাহলে ছেলেখেলা করতে করতে এমন একটা জিনিস লাভ হয়ে যাবে, যার মতন দামী আর কাজের জিনিস দুনিয়ায় দুটি নেই! সেটি হচ্ছে সুন্দর মুখ। এই প্রণালীতে যাদের মুখের উন্নতি হবে, তারা ফটো পাঠিয়ে দিলে আমরা ছাপবার ব্যবস্থা করতে পারি!

কর্ত্তা মোসাহেব সংবাদ

(বাঙ্গলার বহরূপী কর্ত্তা ও বহরূপী মোসাহেব)

(নক্সা)

(শ্রীবিনয়কৃষ্ণ চৌধুরী)

পয়লা নম্বর

কর্ত্তা—তুমি কি চাও ?

মোসাহেব—আপনি নাড়ু, নাড়িলে যে গুড়া পড়িবে, আমি সেই প্রসাদ পাইলেই কৃতার্থ হইব।

কর্ত্তা—আমার হাতে অনেক নাড়ু আছে, তুমি কোন নাড়ুর গুড়া চাও।

১ম মোসাহেব—আপনার হাতে যে শিক্ষামন্দির নাড়ু আছে সেই নাড়ুর একটু গুড়া হইলেই হইবে।

২য় মোসাহেব—আমাকে আপনার খাস খরবারে টানিয়া তুলিতে হইবে, আমি আপনার সকল কার্য্যে হাত তুলিব। আপনি আমার উপর পা তুলিলেও আমি মাথা তুলিব না।

কর্ত্তা—সাধু, সাধু, সাধু! বেশ তাহাই হইবে। তোমাদের দিয়েই আমার পসার। তোমরা জান আমি বক্তৃতার মেলো-ড্রামা করিয়া শিক্ষামন্দিরের জন্য যে টাকা সংগ্রহ করিব, তাহা 'ক্রিস্তবের' দোহাই দিয়া তোমাদেরই বিতরণ করিব। আমি বাঙ্গলার প্রকৃত ক্রিস্তবের জন্য চেষ্টা করিতেছি, আমি কাহারও নিকট হিসাব দিব না।

মোসাহেবগণ—আপনি দিবেন হিসাব ?' তাহা হইলে আমরা কি খাইয়া বাঁচিব। আপনি পরম দয়াল—আপনার জীবন দীর্ঘ হইতে দীর্ঘতর হউক। একটু বটের আঠা লাগাইয়া চুলগুলিকে আপনি জটায় পরিণত করুন। সে কালের বিধানদাতাদের মাথায় জটা,একালে আপনারও জটা হউক।

দোসরা নম্বর

কর্ত্তা—দেখ, আমি সব ছাড়িয়া দেশসেবা ধরিয়াছি। আমি বাঙ্গলার মহাত্মা।

মোসাহেবগণ—হে, হে, হে—তাতো বটেই তাতো বটেই।

কর্ত্তা—তাখো ত্রিলিক ফণ্ডের অনেক টাকা আমার হাতে আছে।

মোসাহেবগণ—হে, হে, হে—তার জন্যই তো আমরা লাঙ্গুল গুটাইয়া আপনার চারপাশে দাঁড়াইয়া আছি।

কর্ত্তা—আমি আজীবন দেশসেবা করিতেছি।

মোসাহেবগণ—হাঁ, হা—তার জন্যইতো শ্রীহীন 'স্বামী'গণ আপনার সঙ্গে যুঝিতে আসিয়া হটিয়া গেল।

কর্ত্তা—হটিল কৈ বাবা,—ছেলে ছোকরারাই তাদের কথাই বিশ্বাস করিতেছে—এই যে উত্তরবঙ্গে চিরন্তণ দুর্ভিক্ষ—আহাহা খবরের কাগজে আজিসে আজিসে ঘুরিয়া আমার যে কি হয়রাণী, তা কি কেউ বোঝে ? আবার বলে আমি নাকি দশজনের পয়সা ইচ্ছামত খরচ করিতেছি।

মোসাহেবগণ—(উত্তেজিতভাবে) কোন কম্‌বক্ত সে ? বহুম্ দিন, তার ছিন্নমুণ্ড আনিয়া দি।

কর্ত্তা—আবার সেই দুর্ভিক্ষের ফণ্ডের টাকার হিসাব চায়—

মোসাহেবগণ—(সমস্বরে) অসহ্য, অসহ্য, বাঙ্গলার কোন কর্ত্তাই হিসাব দেয় না। সেকালে অনেকে দেয় নাই, একালে দেয় না, দেশসেবীরা দেশের টাকার হিসাব কোন কালে কোন দেশে দেয় না—আপনি দিবেন কেন ? বিশেষতঃ আপনার টাকা আপনার হাতে তার আবার হিসাব কি ?

কর্ত্তা—আহাহা বেঁচে থাক বাবা সকল, বেঁচে থাক—আমি তোমাদের নিয়েই আছি।

তেসরা নম্বর

কর্ত্তা—তোমরা বল আমি দেশের এক ও অদ্বিতীয়, —কিন্তু অনেকে কেবল আমাকেই গালাগালি করে।

মোসাহেবগণ—ওরা সব পাজী, উঁহু,—এবার ওদের সারা করে দিয়েছি ! আর গাইতে হয় না—হাঃ হাঃ।

কর্ত্তা—দেখ, আমি সব ছেড়েছি তোমাদের জন্য।

যে করেই হোক বশ চাই। টাকাও পাব না, নামও পাব না—এমন ভাবে কেউ কখনো খাটে? এত বোকা আমি নই। তোমরা সমস্বরে আমার জয় গান কর।

মোসাহেবগণ—(সমস্বরে) জয়, জয়, জয়—তোমার জয়ে—তোমারি গো জয়।

কর্ত্তা—ব্যস্ আমি সন্তুষ্ট হ'লাম। হাঁ দেখ, একটা কথা। ওরা সব হিসাব চায়, তাও আবার আমার কাছে! আমি কোন কাজে কোন দিন হিসাব রাখি নাই, আর দেশের টাকার হিসাব রাখবো। আমি জান্‌তে চাই, আমি তোমাদের হিসাব-সরকার না নেতা?

মোসাহেবগণ—নেতা, নেতা, নেতা!

কর্ত্তা—তবে তোমরা গৃহে যাও, গঙ্গ কদলী ভক্ষণ কর!

চৌঠা নম্বর—

কর্ত্তা—দেখ, তোমার গলায় সোণার শিকল দিয়া আমরা তোমায় বাঁধিয়া রাখিয়াছি।

মোসাহেব—কর্ত্তার অসীম কৃপা! আমি কর্ত্তার কম করি নাই।

কর্ত্তা—তোমার উপর আমি খুসী আছি। ভাখো, আমার কুটুম্ব স্বজনেরা যদি তোমায় জুতা মারে, তবে তুমি কিছু মনে করিও না। আমি তোমায় ভালবাসিব।

মোসাহেব—সেই ভরসাতেই তো কর্ত্তা আছি। আপনারা জুতা মারুন, সে সহ্য হয়, কিন্তু আর কেউ যদি আমাকে অপমান করে, সেই দুঃখে আমার কলিজা কাটিয়া যায়।

কর্ত্তা—না, আমার লোকেরা তোমাকে জুতা মারিলে, আমি শোকপ্রকাশ করিব। কেউ কিছু বলিলে সাধ্যমত রক্ষা করিব।

মোসাহেব—সেই সুবিবেচনার জন্যই তো পায়ের তলায় পড়িয়া আছি। কর্ত্তা—দেখিবেন কর্ত্তা—আমি আপনারই।

কর্ত্তা—না, আমি অভয় দিয়াছি।

ইতি নব্য বাঙ্গলার চতুরঙ্গ কর্ত্তা-মোসাহেব সংবাদ সমাপ্ত।

সাত-রাজার-ধন

[শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়]

ঘর গেছে সে, ঘর গেছে সে—কোন্ বিকেলে কল্‌সী ভ'রে,
ভিজে-পায়ের আল্‌তা মুছে ঘাটখানিকে রাঙা ক'রে।
আজ্‌কে ভরা-সাঁঝের বেলায়,
পবন এসে ঢেউকে খেলায়,
উড়ো-পাখী মন রে আমার! হায় কেমনে বুঝাই তোরে!
ঘর গেছে সে কল্‌সী ভ'রে।

•

তালপুকুরের এই জলেতেই আছে যে তার বুকের ছোঁয়া,
কাইতে সাঁতার এর ভেতরে শিউরে ওঠে গায়ের রোঁয়া!
তাল-বেতালে বাউল-নাচে,
ঢেউরা যেন তাকেই যাচে,—
চোখদুটি যায় চল্‌কে পড়ে, ঠোঁট-দুখানি কমলা-কোয়া,
এই জলে তার বুকের ছোঁয়া!

রাঙা সাঁঝ কালো আঁচলে নেমে পদ্মগুলির লাল-প্রাণেতে,
পূবের শশী উঠ্‌বে না আজ তারার হাসির রূপ-টানেতে!
নেইকো রাখাল মাঠেতে আর,
বাঁশের বাঁশী ঘুমোয় যে তার—
একলা চকোর ডুক্‌রে ওঠে কে জানে হায় কোন্‌খানেতে,
লুকোয় কমল লাল-প্রাণেতে।

•

চুপটি ক'রে দেখ্‌ছি ব'সে—সে গেছে,তার আল্‌তা আছে!
সাত-রাজার-ধন মাণিক ওরে—মাণিক ওরে আমার কাছে!
ওর ওপরেই বুকটি পেতে,
রইব জেগে রাত্তিরেতে,
বাদ্‌লা মেঘের মাত্‌লামিতে যায় উঠে ঐ বাগ্‌টি গাছে—
দুখীর সুখ এই আল্‌তা আছে!

সংবাদ দাতা

(ডিটেক্টিভ গল্প)

[শ্রীশ্রীপতিপ্রসন্ন ঘোষ]

দুই বন্ধুতে বসিয়া আরাম করিয়া চা পান করিতেছিল। হঠাৎ নগর রাস্তায় ভারী গোলমাল শোনা গেল। অকথ্য গালাগালি আর সহস্র লোকের বিকট হাসির মধ্যেও একটা লোকের করুণ আর্ত্তনাদ চাপা পড়িয়া গেল না।

জানালার ভিতর দিয়া এক বন্ধু উঁকি মারিয়া দেখিল বহুলোকে একত্র হইয়া নির্ম্মমভাবে একটা লোককে প্রহার করিতেছে।

অপর বন্ধু উত্তেজিতভাবে বলিল—"ওটা কি খুনী? তা যাই হোক্, এভাবে ওকে কিছুতেই মার খেতে দেওয়া হবে না। আমরা ওর পক্ষ নেব।"

অপর বন্ধু উত্তর দিল—"ওটা খুনী নয়।"

'খুনী নয়? তবে চোর নিশ্চয়ই? দুয়ের ভিতর কোন তফাৎ নেই। চল, আমরা গিয়ে ওকে বাঁচিয়ে দি।

'কিন্তু ও চোরও নয়।'

'চোরও নয় তবে ওটা কি? হয় উকীল, না হয় একরোখা সম্পাদক, না হয় ধর্ম্মপ্রচারক! তা যাই হোক চল, আমরা ওর সাহায্য করি।"

"না—না, একটা কাগজের সংবাদ দাতাকে ওরা সবাই মিলে সাবাড় করে দিচ্ছে।"

'সংবাদ দাতা? তাই বল। পোড়া কপাল! চা বুঝি বাজে গোলমালে একেবারে ঠাণ্ডা হয়ে গেল। ওসব ব্যাপারে কাণ না দিয়ে এস এখন চা'টা শেষ করা যাক্।'

সুষমাময়ী

(গান)

[শ্রীচণ্ডীচরণ মিত্র]

কি সুষমা বাংলা দেশের
দেখেছে কেউ সকাল বেলা?
পূর্ব্ব-আকাশ রাঙি' যখন
বসে প্রথম সোণার খেলা।
আঁধার বসন ঘুরে টানি'
নব নীলাম্বরীখানি
পরি' মা হ'ন বাহির যখন
খেলতে সাথের মেয়ে-খেলা।
বনগহনে জাগে প্রীতি :—
হয় মুক্ত সব-পাখীর গীতি,
ভাসে রূপ-নদীতে রূপার ভেলা,—
মধুর গন্ধ ছিটায় ফুলের কার্ব্বা রে।
তা'রি আভাস পাঠা'তে চাই
বিশ্বজনের দরবারে।

২

কি সুষমা বাংলা দেশের
দেখেছে কেউ দিন-দুপুরে?
যাদে যখন কাজের সাড়া
চলত মা'র স্নেহ-দুপুরে।
গতির ছন্দ সকল-খানে,
গোঠে মাঠে চাষার গানে
আনন্দ-রস টুপটুপ রে।
সবুজ ধানের শীষের কাছে
শালিখ যাতে ফিরে নাচে
শুধু সূর্য্য বসে ঠায়-উপুরে,—
বেণুর রন্ধ্র তান উঠোলে তা'র ঘর-বা'রে।
তা'রি আভাস পাঠা'তে চাই
বিশ্বজনের দরবারে।

কি সুষমা বাংলা দেশের
দেখেছে কেউ বিকালটিতে?
মায়ের হাসি মুখের ছবি
এঁকেছে তা'র নিজের চিতে।
শাড়ীর-খোলে আঁচল-ভাঁজে
চালা-সিঁদুর রংটি রাজে,
মধুরকণ্ঠী-মেয়ের ঘটা
বিলায় ছটা চারিভিতে!
কলভাষা দিন-শেষের
বিরতি-সুর নানা বেশের
বাজে বেহাগ-পরজ-পূরবীতে,—
ঘুমপাড়ানি গানে মিঠা গার্ব্বা রে!
তা'রি আভাস পাঠা'তে চাই
বিশ্বজনের দরবারে!

গরীবের মেয়ে

(গল্প)

[শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রনাথ পাল]

মিত্রদের বড়বৌ সেদিন মেজবৌকে বলিতেছিলেন, "সেজবৌয়ের মানের ঘটা দেখিলে ভাই, বাপ বেচারী দু'টী ভাল মন্দ খাইবার জন্ত আসে মনে মনে সেজবৌ ত তা জানে, আর কেই বা তা না জানে বল, তবু বাপকে দু'কথা বলিয়াই বিদায় করিয়া দিলে। তাও বলি বাপু, গরীব মানুষ যাহা জোটে তাহাই খাইবি, অত লোভই বা কিসের।"

মেজবৌ তাহার উত্তরে কি বলিতে যাইতেছিলেন, এমন সময় সেজবৌ আশালতা ঝড়ের মত কক্ষমধ্যে আসিয়া দাঁড়াইয়া বলিয়া উঠিলেন, ও কথা বলিতে তোমার মুখে বাধিল না দিদি। কেন, আমার বাবা কি বাড়ীতে খাইতে পান না যে, এখানে দু'টী ভাতের জন্ত আসিয়াছিলেন। তোমাদের ভাত খাইয়া কি এত বড় হইয়াছেন ?"

বড়বৌ ভ্রূকুটি কুটিল কটাক্ষে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "তোমার বাপের বাড়ীর অবস্থা ত কাহারও জানিতে বাকি নাই সেজবৌ, যে, কথা শোনাইতে আসিয়াছ। গরীব মানুষ, দু'টী ভাল মন্দ খাইতে আসে,—"

তাঁহাকে কথা শেষ করিতে না দিয়া আশালতা তীক্ষ্ণ-কণ্ঠে কহিলেন, "বাবা বাড়ীতে অমন্ ঢের ভাল মন্দ খাইয়া থাকেন দিদি। তাঁহার জন্ত তোমার দরদ দেখাইতে হইবে না।"

মেজবৌ হাসিয়া কহিলেন, "তুমি রাগ করিলে কি হইবে সেজবৌ, আমরা কি কেহ কিছু বুঝি না, দু'টী ভাল মন্দ খাইবার জন্তই ত এখানে আসিয়া থাকেন। তুমি তাঁহাকে খাইতে না দিয়া বিদায় করিয়া দিলেই কি লোকে মনে করিবে তোমার বাবা খুব বড় লোক! লোকের চোখে ধূলা দেওয়া কি এত সহজ সেজবৌ।"

আশা বিদ্রূপ করিয়া কহিলেন, "রক্ষা কর মেজদিদি। তোমরা বড় লোকের মেয়ে তোমাদের চোখে কি আমি ধূলা দিতে পারি। আচ্ছা মেজদি তোমার বাবা, ভাইরা ত প্রায়ই আসিয়া থাকেন, তাঁহারাও তাহা হইলে দু'টী ভাল মন্দ খাইবার জন্তই আসেন।"

মেজবৌ গালে হাত দিয়া বিস্ময়ে একটা ভঙ্গিমা সহকারে বলিয়া উঠিলেন, "শুনিলে একবার সেজবৌয়ের কথা দিদি। সত্যি ভাই সেজবৌ তুমি আমাদের একবারে অবাক করিয়া দিয়াছ, ওঁরা কাহার সহিত কাহার তুলনা কর! আমার বাবা ভাই আসেন, তাঁহাদের মেয়ে বোনকে দেখিতে, ভালমন্দ খাইতে নহে ?"

আশালতা খোঁচা দিয়া কহিলেন, "তাহা কি করিয়া বুঝিব ভাই। খাওয়ার ঘটা ত কম হয় না! তবু ভাই নয় যাইবার সময় ত আবার হাঁড়ি হাঁড়ি মিঠাই মোণ্ডা লইয়া যাইবারও ত কসুর নাই।"

বড়বৌ হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন, "না, তোমরা আরে আরে ঝগড়া কর, আমি চলিলাম।"

এই বলিয়া তিনি সে স্থান ত্যাগ করিতে উদ্যত হইলে সেজবৌ কহিলেন, "পলাইতেছ কেন দিদি, তব ত ই তোমার বাবা আর কাকার কথা তুলিব না।"

বড়বৌ ফিরিয়া দাঁড়াইয়া গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন, "ছোট মুখে বড় কথা, আমার বাপ তুলিস্।"

আশা—রোষের স্বরে কহিলেন, "সে পথ ত তোমরা দেখাইয়া দিয়াছ দিদি। এখন পথ হাইলে চলিবে কেন ? তোমার বাবার সম্বন্ধে কিছু বলিলে, তোমার বুকে যেমন ব্যথা বাজে, অন্যেরও ঠিক তেমনই বাজে, এ কথাটা মনে রেখ দিদি।" এই বলিয়া আশা কক্ষান্তরে চলিয়া গেল।

বিপ্রদাস আশাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "সেজমা, তোমাকে নাকি বড়বৌমা আর মেজবৌমা আজ অপমান করিয়াছেন ?"

আশালতা কহিলেন, "বাবা, আপনি ও সব কথায় কাণ দিবেন না। দিদিদের কথায় আমি কিছু মনে করি নি বাবা।"

বিপ্রদাস আর কিছু বলিলেন না, নিঃশব্দে ধূমপান করিতে লাগিলেন। অল্পক্ষণ পরে নলটী মুখ হইতে সরাইয়া লইয়া মৃদু হাসিয়া কহিলেন, "এবার পূজায় কি রকম আয়োজন হইবে, তাহা কিছু শুনিয়াছ কি সেজমা ? লোকে কাহাদের বাহবা দিবে, বাবুদের না মিত্রদের ?"

বিপ্রদাস বার দুই নলে টান দিয়া কহিলেন, "কিন্তু মিত্রদের চারিদিকে কি রকম নাম পড়িয়া যাইবে বল দিকি, কলিকাতা হইতে ঝাঁকে ঝাঁকে বড় লোকেরা আসিয়া আমার গৃহ পবিত্র করিবে, কলিকাতার সেরা থিয়েটার আমার গৃহে আসিয়া অভিনয় করিয়া বহুবাবুদের তাক্ লাগাইয়া দিবে, আরও কত রকমের নৃত্যগীত হইবে, বড়মা আমার তাহার একটী ফর্দ্দ দেখাইয়াছেন।"

আশালতা কহিলেন, "না বাবা, এ সবে কাজ নাই, আপনি মানা করিয়া দিন।"

বিপ্রদাস হাসিয়া কহিলেন, "আজ না হয় আমি মানা করিয়া দিলাম সেজমা, কিন্তু আমার দিন ত ফুরাইয়া আসিয়াছে, দু'দিন পরে তোমারই ত এ সব বিষয় সম্পত্তির মালিক হইবে, তখন ত মানা করিবার কেহ থাকিবে না। আমি বাঁচিয়া থাকিতে থাকিতে দেখিয়া যাইতে চাহি, আমার এই কষ্টোপার্জ্জিত অর্থের বিনিময়ে আমার পুত্রেরা কলিকাতা ও আশপাশের নামজাদা বড় লোকদের পর্য্যায়ভুক্ত হইতে পারে কি না।"

আশালতা কি বলিতে গিয়া হঠাৎ থামিয়া গেলেন। বিপ্রদাস তাহা লক্ষ্য করিয়া তেমনই ভাবে হাসিয়া কহিলেন, "তুই যে গরীবের মেয়ে সেজমা, তুই ত বড় লোকের মেয়ে নস্, বড়লোকদের চালচলন তুই বুঝিবি কোথা হইতে?

উদ্বেল আনন্দে আশালতার দুই আকুল চক্ষুর কাণায় কাণায় জল ভরিয়া উঠিল।

বিপ্রদাস নলটী মুখে দিয়া জমাগত টানিতে লাগিলেন। তাঁহার মুখনিঃসৃত ধূম্ররাশি, তাঁহার মুখির সম্মুখে আস্ফালন করিয়া কুণ্ডলী পাকাইয়া ঘুরিতে লাগিল। খানিক পরে তিনি কহিলেন, "এখনও পূজার মাস দিনেক দেরী আছে, না সেজমা?"

আশালতা কহিলেন, "হ্যাঁ বাবা, কাল ত সবে আষাঢ়ের সংক্রান্তি।"

বিপ্রদাস মিত্র দরিদ্রের সন্তান ছিলেন। নিজের চেষ্টায় ও বুদ্ধিবলে তিনি আজ বহুক লক্ষ টাকা নগদ ও অগাধ বিষয় সম্পত্তির মালিক হইয়াছেন। তাঁহার চারি পুত্র, তিন জনের বিবাহ হইয়াছে, ছোটটী বি এ পড়িতেছে এবং অবিবাহিত। আজ এক বৎসর হইল, তাঁহার সাধ্বী পত্নী স্বামী পুত্রদের রাখিয়া পরলোকে গমন করিয়াছেন। পত্নী বিয়োগের মাস ছয়েক পর জ্যেষ্ঠ পুত্রের উপর সমস্ত ভার অর্পণ করিয়া সংসারের ঝঞ্ঝাট হইতে দূরে থাকিয়া একান্তমনে ভগবানের নাম করিতেছিলেন। এমনই সময় পূজা লইয়া পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের বাবুদের সহিত তুমুল প্রতিযোগিতার কথা এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার বড়বধূ ও মেজবধূ কর্ত্তৃক সেজবধূর পিতার অপমানসূচক বাক্য প্রয়োগ করিবার কথা তাঁহার কর্ণগোচর হইল।

আশালতা শ্বশুরের কক্ষ হইতে বাহির হইয়া নিজের কক্ষাভিমুখে যাইতেছিলেন। এমন সময় বড়বধূ তাঁহার পথরোধ করিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন, "শ্বশুরের কাছে সোহাগ করিয়া আমাদের নামে লাগাইতে গিয়াছিলে সেজবৌ? লাগাইয়া আমার করিলে কি, আমি কি ছোটলোক গরীবের মেয়ে যে শ্বশুরের ভয়ে একেবারে মরিয়া যাইব।"

আশালতা কহিলেন, "দিদি, গরীব হইলেই ছোটলোক হয় না; আর বড়লোকের মেয়ে হইলেই ভদ্র হয় না এটা জেন।

বড়বৌ চক্ষু পাকাইয়া কহিলেন, "কি তুই আমায় ছোটলোক বলিলি?"

আশালতা কহিলেন, "শ্বশুরকে উপেক্ষা করিয়া কথা বলিলে, তাহাকে ভদ্র না অভদ্র বলিতে হয়, তাহা তুমি ভাবিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবে।"

বড়বৌ গর্জ্জন করিয়া কহিলেন, "তবে রে ছোটলোকের মেয়ে, যাহা মুখে আসিবে তাহাই বলিয়া আমায় গালি দিবি। ইহার শোধ যদি আমি না তুলি তাহা হইলে আমি—"

তাহাকে কথা শেষ করিতে না দিয়া আশালতা কহিলেন, "তোমাকে আর দিব্য করিতে হইবে না দিদি! তুমি বড়লোকের মেয়ে হইতে পার, কিন্তু এ বাড়ীতে তোমার আমার সমান অধিকার সে কথা ভুলিয়া যাইও না দিদি। এখানে শোধ তুলিতে গেলে, সুবিধা হইবে না। অপমানের শোধ লইবার অধিকার আমারও

আছে, থাম দিদি মিথ্যা চীৎকার করিও না। বাবার ঘুমের ব্যাঘাত হইবে।"

বড়বধূ থামিলেন না, গলার স্বর আরও উঁচু করিয়া কহিলেন, "তোর হুকুমে চুপ করিয়া থাকিব নাকি! সত্তরের উপর তারি মায়া দেখিতেছি যে, আমার চোখ রাঙাইতে আসিয়াছিস্ ছোটলোকের মেয়ে—"

আশালতা আর সহ্য করিতে পারিলেন না, তীব্রকণ্ঠে কহিলেন, "বারবার তুমি আমার বাবাকে ছোটলোক বলিও না, বলিতেছি—আমার বাবা—"

বড়বৌ কর্কশকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "তোর বাবা আমার করিবে কিরে! এঁর বাবাকেই তারি—"

সম্মুখের দিকে দৃষ্টি পড়িতেই আশালতা ব্যগ্রভাবে বলিয়া উঠিলেন,"বাবার ঘুম ভাঙাইয়া তবে ছাড়িলে দিদি। এখন যত পার তুমি চীৎকার কর, আমি চলিলাম।"

এই বলিয়া তৎক্ষণাৎ নিজের কক্ষাভিমুখে চলিয়া গেলেন।

বড়বধূ চাহিয়া দেখিলেন, তাঁহার শ্বশুর ঘর হইতে বাহির হইয়া সম্মুখের বারান্দার উপর পায়চারী করিয়া বেড়াইতেছেন। বড়বধূ নিঃশব্দে শয়ন কক্ষে প্রবেশ করিলেন।

গরীবের মেয়ে বলিয়া বড়বৌ, আশালতাকে নিজেদের একজন বলিয়া কিছুতেই মনে করিতেন না এবং সব সময় তাঁহাকে কেমন এক অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখিতেন। আশালতা তাহা বুঝিতেন, এবং বুঝিয়াও এতদিন চুপ করিয়া ছিলেন, কিন্তু আজ তাঁহার পিতার সম্বন্ধে কথা উঠিতেই আর নীরবে সহ্য করিতে পারিলেন না। ইহার ফল এই দাঁড়াইল যে বড়বধূ তাঁহাকে জব্দ করিবার জন্য নানা উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন।

এই ঘটনার দিন দুই পরে বড়বৌ উপরের বারান্দা হইতে চীৎকার করিয়া কহিলেন, "হ্যা লা বিন্দি অত সব জিনিস পত্তর লইয়া কাহার হুকুমে বাড়ীর বাহিরে যাইতেছিস্?"

বিন্দি দাসী আশ্চর্য্য হইয়া কহিল, "আজ কি নূতন দেখিলে বড়মা, রোজই ত লইয়া যাই। সেজমার বড়ার শরীর, তিনি পাঁচজন গরীবকে খাইতে দেন।"

বড়বৌ গর্জ্জন করিয়া কহিলেন, "বটে! তোমার সেজবৌ যত বড় দাতা হইয়াছে দেখিতেছি। সমস্ত জিনিসই এখনই তাঁড়ারে রাখিয়া আয়। তোর সেজমাকে বলিস্ অত যদি তাঁর দান করিবার সখ হইয়া থাকে, বাপের বাড়ী হইতে জিনিষ পত্তর আনাইয়া যেন তিনি দান করেন।"

বিন্দি ভ্রূকুটি করিয়া কহিল, "আচ্ছা জিনিষ পত্তর রহিল এখানে আমি সেজমাকে ডাকিয়া আনিতেছি।" এই বলিয়া দ্রব্যগুলি সেখানে নামাইয়া রাখিতে যাইবে, এমন সময় আশা সেখানে উপস্থিত হইয়া কহিলেন, আমি এখানে দাঁড়াইয়া রহিলাম তুই ঐগুলি লইয়া আয়, দেখি কে তোর যাওয়া বন্ধ করিতে পারে।"

বড়বৌ উপর হইতে হাঁকিয়া কহিলেন, "রাধার মা, ছুটিয়া গিয়া রামকিশনকে বলিয়া আয় ত, আমার হুকুম বিন্দিকে যেন সে ফটকের বাহিরে যাইতে না দেয়।"

রাধার মা চলিয়া যাইতেই বিন্দি আশার দিকে চাহিয়া কহিল, "কি করিব এখন সেজমা।"

বড়বৌ এখন সংসারের কর্ত্রী, দাস দাসী দরওয়ান সকলেই তাহার অনুগত। কেবল বিন্দি বাড়ীর বহু পুরাতন দাসী বলিয়া, সে তাঁহাকে গ্রাহ্য করিত না এবং আশারই খাস দাসী ছিল সে। রামকিশন যে বিন্দিকে বাহিরে যাইতে দিবে না, তাহা বুঝিয়া আশা স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিল, সে এখন কি করিবে। দাসদাসীর সম্মুখে এ অপমান সে কেমন করিয়া মুখ বুজিয়া সহ্য করিবে।

বিন্দি কহিল,"সেজমা তুমি হুকুম দাও দেখি রামকিশন কি করিয়া আমায় আটকাইয়া রাখে!"

আশালতা উৎসাহভরে কহিলেন, "বিন্দি আমার হুকুম ত দেওয়াই আছে।"

বিন্দি কহিল, "তবে আর আমি কাহাকেও ভয় করি না, রামকিশন যদি আমায় যাইতে না দেয়, তুমি দেখিও সেজমা আমি এমন কাণ্ড করিব, যাহাতে বড়মার মুখখানা এতটুকু হইয়া যাইবে।"

আশালতার বুকটা ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল। হাজার হউক বিন্দি এই সংসারের দাসী। সে বড়বৌকে অপমান করিবে!

আশালতা ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া কহিলেন, "না বিন্নি, থাক্, তোর আর যাইয়া কাজ নাই।"

উপর হইতে বড়বৌ গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন, "বিন্নি যত বড় মুখ নয়, তত বড় কথা, এখনই বাড়ী হইতে দূর হইয়া যা।"

আশালতা কহিলেন, "ওকে এবারকার মত মাপ কর বড়দিদি।"

বড়বৌ ক্রুদ্ধকণ্ঠে কহিলেন, "গরীবের মেয়ে বড়লোকের মানসম্ভ্রম রাখিবে কোথা হইতে!"

সে কথার উত্তর না দিয়া আশালতা বিন্নির দিকে চাহিয়া কহিলেন, "তুই চলিয়া আয় বিন্নি।"

এমন সময় রাধার মা ফিরিয়া আসিয়া কহিল, "রামকিশন বলিতেছে সে বিন্নিকে আট্‌কাইয়া রাখিতে পারিবে না। আমি বলিলাম বড়মার হুকুম, সে তবুও বলিল, "আমি পারিব না।"

অপমান ও ক্রোধে বড়বৌ দুলিতে লাগিলেন। একজন দরওয়ান তাঁহার হুকুম অমান্য করিয়া এত বড় কথা বলিল! তিনি চীৎকার করিয়া কহিলেন, "আজ এই সব বেয়াদব ঝি-চাকরের দলকে বিদায় করিয়া তবে জল গ্রহণ করিব। এই ছোটলোকের মেয়ে সংসারে ঢুকিবার পর হইতেই এই সব ছোটলোকের দলের স্পর্দ্ধা বাড়িয়াছে দেখিতেছি। আচ্ছা!" কিন্তু বড়বৌয়ের এ আস্ফালন বৃথাই হইল। রামকিশন ও বিন্নি তাহাদের কাজে বাহাল রহিয়া গেল এবং বড়বৌ যথাসময়ে আহারও করিলেন।

পরদিন বিপ্রদাস জ্যেষ্ঠপুত্রকে কহিলেন, শুনিতেছি এবার পূজা লইয়া বন্ধুদের সহিত তোমাদের প্রতিযোগিতা চলিবে, তাই কাল হইতে কাজকর্ম্ম সব আমিই দেখিব, আর দেখ—বড়বৌমাকে বলিবে, তিনি যেন সংসারের ভার মেজমাকে বুঝাইয়া দেন।"

খানিকপরে ভিতর হইতে ঘুরিয়া আসিয়া পুত্র পিতাকে কহিলেন, "মেজবৌমাকে সমস্ত ভার ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। আজই সন্ধ্যার সময় বড়বৌ ও মেজবৌ বাপের বাড়ী চলিয়া যাইবে এখানে তাহারা আর থাকিতে পারে না।"

বিপ্রদাস গম্ভীর মুখে কহিলেন, "বেশ, এখানে থাকা যদি তাঁহাদের মনঃপূত না হয়, তাঁহারা অনায়াসে পিত্রালয়ে গিয়া থাকিতে পারেন, কিন্তু তাঁহাদের একটা কথা বলিয়া দিও, এ গৃহে তাঁহাদের আর স্থান হইবে না।"

পুত্র বিষণ্ণমুখে অন্দরে চলিয়া গেলেন। বড়বৌ ও মেজবৌয়ের আর পিত্রালয়ে যাওয়া হইল না।

রাত্রে আশালতা বিপ্রদাসকে কহিলেন, "বাবা সংসারের ভার বড়দিদির হাতেই রাখুন। আমি—"

তাহাকে কথা শেষ করিতে না দিয়া, বৃদ্ধ হাসিয়া কহিলেন, "বেশ তাহাই হইবে মেজমা।"

বড়বৌ দাসী-চাকরকে শুনাইয়া বলিলেন, গরীবের মেয়ের কাজ কিনা এই সংসার চালান। এক রাত্রেই তাহা বুঝা গিয়াছে।"

একদিন বড়বৌ আশালতাকে শুনাইয়া শুনাইয়া মেজবৌকে বলিলেন—"বুড়ার ভিমরতি হইয়াছে,না হইলে এ বয়সে কোথায় ঈশ্বরের নাম করিবেন, আজ বিষয় সম্পত্তি লইয়া মাতিয়াছেন। বাবা বলিয়াছেন তিনি পূজার সম্পর্কে থাকিবেন না। বন্ধুদের কাছে কি ভাবে দাঁড়াইয়া অপমানিত হন, তাহা দেখিও মেজবৌ।"

মেজবৌ কহিলেন, "আমার বাবাও ত ইহার ভিতর থাকিবেন না। বুড়োকে অপমান হইতেই হইবে। বেশ মজা হইবে।"

আশালতা আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না, কহিলেন, "দিদি, মেজদিদি, কেন মুখে তোমরা অমন কথা বলিলে। শ্বশুরের অপমান হইলে তোমাদের কি খুব মান বাড়িবে? বাপের বাড়ীর পরিচয়ে কি তোমাদের পরিচয়?

বড়বৌ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া কহিলেন, "আমাদের যাহা খুসী তাহাই বলিব, তোমার তাহাতে কি। তোমার মুরুব্বির মধ্যে এইটুকু এখনই গিয়া শ্বশুরের কাছে লাগাবে এই ত, আমরা অত ভয় করি না।"

আশালতা কহিলেন, "মিথ্যা কথা বলিতেছ কেন দিদি। ভয় কর কি না কর, তাহা আর মুখ ফুটিয়া বলিতে চাহি না। আর দেখ দিদি লাগান ভাঙ্গান সে

অভ্যাস তোমাদেরই। আমার অভ্যাস নয়"—এই বলিয়া আশালতা চলিয়া গেলেন।

দেখিতে দেখিতে পূজার উৎসব শেষ হইয়া গেল। বন্ধুদের বাড়ীতে কলিকাতা হইতে ইংরেজী বাজনা আসিল, তিনটী নামজাদা থিয়েটার আসিল, বড় বড় যাত্রার দল, বাই,খেমটা আসিল আর আসিল দলে দলে বড় বড় লোক। কিন্তু মিত্রদের গৃহে এসব কিছুই হইল না। গ্রামে এক সখের যাত্রার দল ছিল, তাহারা পূজার তিন দিন তিনটী নূতন পালা গাহিল, চিরপুরাতন ঢাক ঢোল কাঁসির বাদ্য বাজিল; এবং বিপ্রদাস স্বয়ং আশালতাকে সঙ্গে করিয়া নিজগ্রাম আশপাশের কয়েকটী গ্রামে বাড়ী বাড়ী গিয়া দরিদ্র গৃহস্থদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া পরিপাটিরূপে খাওয়াইলেন। তাহা ছাড়া গরীব দুঃখীর মধ্যে বহু কাপড়ও বিতরিত হইল।

বড়বৌ নাক সিঁটকাইয়া কহিলেন, "দেখিলে ভাই মেজবৌ, পূজার শ্রী দেখিলে। কতকগুলো কাঙাল খাওয়াইয়া পয়সার শ্রাদ্ধ করা হইল, আর সেই সঙ্গে সঙ্গে মিত্রদের মাথা হেঁট হইয়া গেল। "সাধে কি বলিয়াছিলাম বুড়ার ভিমরতি হইয়াছে। আমি নিজের কাণে শুনিয়াছি মেজবৌ পরামর্শ দিয়া এই কাঙ্গালী ভোজনের আয়োজন করিয়াছে।"

মেজবৌ কহিলেন, "সে কথা আর বলিতে দিদি। ঐ হাবাতের ঘরের মেয়ে সংসারে আসিয়া সংসারটা একেবারে ছারখার করিয়া দিলে। জান ত আমার এক পিসতুতো বোনের বন্ধুর বাড়ী বিবাহ হইয়াছে। তাহার সহিত দেখা হইলে আমার মাথা কাটা যাইবে। কি কপাল করিয়াই আসিয়াছিলাম দিদি।"

বড়বৌ এদিক ওদিক চাহিয়া চাপা গলায় কহিলেন, মেজবৌকে বিদায় করিতে না পারিলে, আমাদের মান সম্ভ্রম আর বজায় থাকিবে না।"

দিন সাতেক পরে বিপ্রদাস, তাঁহার তিন বৈবাহিককে নিমন্ত্রণ করিয়া গৃহে আনিলেন। মধ্যাহ্নে আহারের পর তাঁহাদের সম্মুখে পুত্রদের ডাকাইয়া আনিয়া তাঁহার উইলের মর্ম শুনাইয়া দিলেন। সকলে নিঃশব্দে বসিয়া রহিলেন। সেই উইলে বিপ্রদাস তাঁহার স্বোপার্জিত সমস্ত সম্পত্তি দেবব্রত করিয়া মেজবধূ আশালতাকে তাঁহার সেবারেত নিযুক্ত করিয়াছেন। পুত্রদের যে মাসহারা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহাও আশালতা ইচ্ছা করিলে কমাইতে বাড়াইতে পারিবেন।

দেখিতে দেখিতে বাড়ীময় এ সংবাদ রাষ্ট্র হইয়া গেল।

বড়বৌ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, "দেখে রাক্ষুসী আমাদের এমনই সর্ব্বনাশ করিল। আর ত এ বাড়ীতে কিছুতেই থাকা হইতে পারে না।"

মেজবৌ কহিলেন, "কিন্তু এ বাড়ীতে না থাকিলে, শুনিলাম, বিষয় হইতে কিছুই পাইব না দিদি।"

বড়বৌ কহিলেন, "তাহাই ত শুনিতেছি। এ অপমান সহ্য করিয়া কেমন করিয়া এখানে পড়িয়া থাকিব ভাই।"

এমন সময় বিন্দি কি সেখানে আসিয়া হাসিতে হাসিতে কহিল, "কিগো বড়মা, এইবার কি হইবে? মেজমাকে আর অপমান করিবে।"

বড়বৌ ক্রোধে চীৎকার করিয়া কহিলেন, "বাড়ীর ঝিকে দিয়া আমাদের অপমান! এ তেজ সহিবে না মেজবৌ।"

বিন্দি হাসিয়া কহিল, "গাল দিয়া কোন ফল হইবে না বড়মা।" বলিয়া সে হেলিতে দুলিতে চলিয়া গেল।

কক্ষের বাহিরে যাইতেই আশালতা তাহাকে ডাকিয়া কহিলেন, "বিন্দি, তোকে আর আমি রাখিতে পারিব না। তুই এখনই বাড়ী চলিয়া যা। তুই যাহা মাহিনা পাইতিস্ তাহা আমি তোকে পাঠাইয়া দিব।"

বিন্দি হাঁ করিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

আশালতা শান্তভাবেই কহিলেন, "বিন্দি আর দেরী করিস্ নি, তোর জিনিস পত্তর গুছাইয়া লইয়া যত শীঘ্র হয় বাড়ী চলিয়া যা। তোর মাহিনার টাকা ও আরও দুড়িটি টাকা তোকে আমি দিতেছি, আয় আমার সঙ্গে।"

অপরাহ্নে বিপ্রদাস ভিতরে আসিতেই আশালতা তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বিনতিভরা দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে চাহিয়া কহিলেন, "বাবা এ কি করিয়াছেন!"

বিপ্রদাস কহিলেন, "কি করিয়াছি মেজমা। এই ব্যবস্থা না করিলে যে আমার এই কষ্টোপার্জ্জিত বিষয় সম্পত্তি সাত ভূতে নষ্ট করিয়া ফেলিবে।"

আশালতা কহিলেন, "বাবা মাসহারার ব্যবস্থাটা বদলাইয়া দিতে হইবে যে!

বিপ্রদাস হাসিয়া কহিলেন, "তুমি যে এ কথা বলিবে তাহা আমি জানি মেজমা। বেশ, তুমি যাহাতে বাধা পাও, সে কাজ আমি করিব না। তবে এ কথাটা আমি সকলকে জানাইয়া দিতে চাই যে, কেবল তোমারই অনুরোধে উইলের ঐ সর্ত্তটী বদলাইয়া দিলাম।"

আশালতার দুই চোখ ছলছল করিয়া উঠিল। গাঢ়-স্বরে সে কহিল, "না বাবা, ও কথা আপনি বলিবেন না।"

'নাচের কথা'

[শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার গুপ্ত]

বিদেশীদের মধ্যে নাচের কথা বলতে হ'লে প্রথমে রুশদের কথাই বলতে হয়। রুশজাতি নাচে যাদুকে নাম করেনি, পাঁচশ বছর আগে থেকেই তারা এ বিষয়ে সিদ্ধহস্ত। রুশের রাজারাই বংশানুক্রমে নিজের প্রজাদের নাচ শেখবার ব্যবস্থা করে থাকেন। তা ছাড়া তাঁরা নাচের আদরও খুব বেশী কোরতেন। যখনই তাঁরা শুনতেন যে অমুক দেশে অমুক নট নাম কিনতে পেরেছে তখনই তাকে নিমন্ত্রণ করে সসম্মানে দেশে এনেছেন।

নাচ অনেক দেশেই আছে বটে, কিন্তু ঠিক অর্থাৎ নির্দোষ নাচ একমাত্র রুশিয়া ছাড়া আর কোথাও দেখতে পাওয়া যায় না। এই বিদ্যে শেখাবার জন্যে গবর্ণমেণ্ট যেমন করেন নি এমন জিনিষ খুব কম। রুশিয়ার সমস্ত বড় বড় সহরেই নাচ শেখার জন্যে গবর্ণমেণ্ট স্কুল স্থাপিত হয়েছে। নাচ বলে যে ছাত্র তাতে কম হবে তা নয়—এক একটা স্কুলে প্রায় সাত আট হাজার ছাত্র নাচ শেখে।

আদরের চেয়ে নাচের আদর রুশিয়ায় আরও বেড়েছে বই কমে নি! রুশিয়ার অপেরা হাউস ফ্রেঞ্চ থিয়েটার আরও অন্যান্য স্কুলের জন্যে রুশ সম্রাট প্রতিবছরে প্রায় বাটলক্ষ টাকা খরচ করতেন।

নাচ শেখবার সময় ছেলেদের সর্ব্বদা চোখে চোখে রাখা হয়। যাতে ভাল করে শিখতে পারে, বিগড়ে না যায়। কারণ জিনিষটা এমন যে একবার মাথা বিগড়ে গেলে আর তাকে কিছুতেই শেখা'না যায় না।

রুশ-নাচের এই একটা বিশেষত্ব যে নাচের ভেতর দিয়েই তারা তাদের সুখ দুঃখ বৈচিত্র্য বেশ স্পষ্ট করে ফুটিয়ে তুলতে পারে। প্রমজীবি সম্প্রদায়ের মেয়েরাও নাচের মধ্যে দিয়ে তাদের ভাব অভিব্যক্ত করে। পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠা নর্ত্তকী আনা প্যাভলোভা তাঁর কোন প্রবন্ধে লিখেছেন :—

আমাকে যদি জিজ্ঞেস করা হয় কোন দেশের লোকেরা —কোন দেশের নটেরা নাচের ভেতর দিয়ে আনন্দ ও বিষাদকে সব চেয়ে ফুটিয়ে তুলতে পারে তার উত্তরে আমাকে বলতেহবে যে বিষাদ আনন্দ, উল্লাস ইত্যাদি রুশ দেশের নর্ত্তকেরা যতটা ভাল করে ফুটিয়ে তুলতে পারে অন্য কোন দেশেই তা পারে না।

রুশিয়ায় নয় থেকে বার বছরের ছেলে-মেয়েদেরই নাচ শিখতে পাঠানো হয়। তারা শুধু নাচ গানই শিখে না সাধারণ শিক্ষাও সেই সময়ে তারা পায়। প্রতি বৎসরে একটা পরীক্ষা হয়—তাতে যারা অকৃতকার্য্য হয় বিদ্যালয় থেকে তাদের চিরদিনের জন্যে বিদায় দেওয়া হয়। আনা প্যাভলোভা আর এক জায়গায় বলে গেছেন যৌবনের প্রারম্ভেই যারা পূর্ণ উদ্যমে নাচ শিক্ষা করেন দেখা যায়, নাচের সঙ্গে শুধু তাঁদের পা নাচে না, সঙ্গে সঙ্গে মাথা চোখ, বাহু, হাত গলা ও মুখও নাচে—অর্থাৎ নাচের প্রতিছন্দে তাদের সর্ব্বাঙ্গ নাচে!

স্কুলের ছাত্রেরা নিজে নিজে নাচ শেখবার জন্যে বড় অল্প সময় কাটায় না। আমার মনে আছে একজন যুবক দিনে ছয়ঘণ্টা করে নাচতেন। সাধনা ব্যতিরেকে সিদ্ধি সুদূর পরাহত।

রুশ দেশে বৃদ্ধ নটের আদর নেই। সাধারণতঃ কুড়ি বছর নাচের পরেই নাচের বয়স চলে যায়—সাইত্রিশ বছর বয়সে পেন্সন প্রাপ্ত হয়।

বিদেশী নাচের মধ্যে রুশদেশ যেমন নাচের জন্যে ইতিহাস প্রসিদ্ধ—ব্রহ্মদেশের নাচও আমাদের দেশী নাচের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বপ্রধান। জগতের শ্রেষ্ঠা নর্ত্তকী আনা প্যাভলোভা যেমন বিদেশীদের গৌরবস্থান গওহরজান ও তেমনি আজ এদেশের মুখোজ্জল করেছেন—তাঁর নৃত্য ভঙ্গীতে দালিয়ায়। কিন্তু তবুও আনা প্যাভলোভা আজ নৃত্যজগতের কত উচ্চে। নাচকে এরপরও আর অবহেলা করা যায় না। অন্যান্য বিদ্যার এও একটি উচ্চ অঙ্গ।

অভিশপ্তা সুন্দরী

[শ্রীখুরশিদ আঁহা বেগম]

গ্রীসের সুন্দরী রাণী ট্রয়ের হেলেনের কাহিনী লইয়া বহু সঙ্গীত, উপকথা ও সাহিত্যের সৃষ্টি হইয়াছে। হেলেনের সৌন্দর্য্য কাব্য ও সঙ্গীতে অমর হইয়া রহিয়াছে। জগত এই অপরিসীম সৌন্দর্য্যের কথা কখনও বিস্মৃত হইতে পারিবে না।

প্রায় তিন সহস্র বৎসর পূর্ব্বে এই অপূর্ব্ব সুন্দরী গ্রীক্ রমণী আপন সৌন্দর্য্যে পুরুষের চিত্তে উন্মাদনার সৃষ্টি করিয়াছিলেন—নিজ সংসার ও স্বামী ছাড়িয়া অপর পুরুষের সঙ্গিনী হইয়াছিলেন—তাঁহার জন্যই যুগান্তব্যাপী মহা সমর ও লক্ষ লক্ষ প্রাণ বিসর্জ্জিত হইয়াছিল—তবু সুন্দরী হেলেনকে কেউ ঘৃণা করে না। কাব্যে, সাহিত্যে চিত্রে সকলেই সুন্দরীর কাহিনী উপভোগ করিয়া থাকে।

প্রায় তিন হাজার বৎসর পূর্ব্বে হেলেন এক গ্রীক্ রাজার ঘরে জন্মগ্রহণ করেন। হেলেনের অসাধারণ সৌন্দর্য্যের খ্যাতি শুনিয়া দূর ও নিকট হইতে বহু প্রেমিক তাঁহার প্রণয় প্রার্থী হইয়া তাঁহার পিতার দরবারে আসিতে লাগিলেন। সুন্দরী দেখিতে তন্বী ও একটু লম্বা ছিলেন। লাল কেশদাম তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে এলাইয়া পড়িত। নয়নে অপূর্ব্ব মোহিনী শক্তি বিরাজ করিত। যে কোন পুরুষের পানে তিনি চাইতেন সেই তাকে লাভ করবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠত।

সে যুগে প্রেম ও প্রণয় ব্যাপার নিয়ে রঙ্গ-ব্যঙ্গ করা নিরাপদ ছিল না। হেলেনের প্রণয়াকাঙ্ক্ষী বহু যুবক তাই সুন্দরীর উপর কোন অত্যাচার করে বসে এই ভয়ে তাঁর বুদ্ধিমান পিতা একটা উপায় অবলম্বন করলেন। তিনি কন্যাকে আপন ইচ্ছা অনুসারে স্বামী নির্ব্বাচন করে নিতে বললেন আর এই স্বেচ্ছাবরণের পর যদি প্রয়োজন হয় তো স্বামীর পক্ষে অন্যান্য প্রণয়াকাঙ্ক্ষীরাও থাকবেন এ প্রতিজ্ঞাও অপরাপর বিবাহার্থীদের দিয়ে করিয়ে নিতে বললেন।

সেকালে এখনকার মত আইন কানুন কিছু ছিল না —কোন পুরুষ কোন নারীর প্রেমে পড়লে ক্ষমতা থাকলে নারীর ইচ্ছা না থাকলেও সে তাকে জোর করে ধরে নিয়ে যেতে পারত। তাই হেলেনের পিতা এই পন্থা অবলম্বন করেছিলেন।

নারীচিত্ত কখন যে কি ভালবাসে কি যে চায় তা বলা যায় না। অনেক অনেক যোগ্য ধনী ও সুন্দর প্রণয়ীদের মধ্যে হেলেন মেনিলাস নামে এক যুবককেই পতি নির্ব্বাচন করে ফেললেন। হেলেনের স্বেচ্ছাবরিত স্বামী মেনিলাস অন্যান্য প্রণয়াকাঙ্ক্ষীদের চেয়ে রূপে-গুণে, ধনে সর্ব্বাংশেই নিকৃষ্ট ছিলেন। তাঁদের বিয়ে হয়ে গেল বটে, কিন্তু বিবাহিত জীবন বড় সুখের হোল না। তবু তাঁরা দু'জনে একসঙ্গে অনেকদিন ঘর-বাস করতে লাগলেন, বিশেষ উল্লেখযোগ্য তেমন কিছু ঘটলো না। হেলেন তাঁর স্পার্টার প্রাসাদে শান্তিতে বাস করছিলেন এমন সময় অপর একটি পুরুষ এসে এই সুন্দরীর জীবন পথে দাঁড়ালেন। ইনি ট্রয়ের যুবরাজ—পরম সুন্দর পুরুষ—ইনি নিজের যোগ্য পরমাসুন্দরীর সন্ধানে বিশ্বভ্রমণে বের হয়েছিলেন। হেলেনকে দেখে ইনি এর আকাঙ্ক্ষিত সৌন্দর্য্যের সন্ধান পেলেন।

হেলেনের বয়স তখন প্রায় চল্লিশ বৎসর। ছেলে পিলে, সংসার স্বামী সব তাঁর নিজের। সব ছেড়ে সুন্দরী ট্রয়ের যুবরাজ প্যারিসের সঙ্গে পলায়ন করলেন। সেখায় গিয়ে স্বামী বেঁচে থাকা সত্ত্বেও যুবরাজ প্যারিসের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়ে গেল। এই সময় হতেই হেলেনের জীবনের বিচিত্র নাটকীয় ঘটনার আরম্ভ।

পত্নী-হারা ম্যানিলাস ক্ষোভে দুঃখে বিবাহের পূর্ব্বে যাঁরা হেলেনের প্রণয়াকাঙ্ক্ষী হয়েছিলেন তাঁদের প্রতিজ্ঞার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে এ বিপদে সাহায্য চাইলেন। প্যারিসের সঙ্গে যুদ্ধ করে, ট্রয় ভস্মীভূত করে ফেলে তাঁর সুন্দরী পত্নীকে ফিরিয়ে আনবার আয়োজন চলতে লাগল। সমগ্র গ্রীস্ রণোৎসবে মেতে উঠল।

বারো হাজার যুদ্ধ জাহাজ সজ্জিত হয়ে ট্রয় ধ্বংসের জন্য ছুটল। এই যুদ্ধ শেষ হতে দশ বৎসরেরও বেশী সময়

লেগেছিল। হেলেনের যৌবন ও সৌন্দর্য্য তখনও অটুট। এমন কি বৃদ্ধেরা পর্য্যন্ত তাঁর সৌন্দর্য্যে এমন মুগ্ধ ও অন্ধ যে এই সুন্দরীর জন্যই যে তাঁদের সন্তানদের জীবন-যাচ্ছে ও দেশ ধ্বংস হচ্ছে সে দিকে কারও লক্ষ্য ছিল না।

এর মধ্যে হেলেনেরও আর প্যারিসের সঙ্গ ভাল লাগছিল না। হেলেন বোধ হয় এই ধরণের নারী ছিলেন এক পুরুষে যার চিত্ত অধিক দিন স্থায়ী হয় না। তাই যুদ্ধে আহত প্যারিস যখন মৃত্যুশয্যায় হেলেনের দাসিরা মুখ একবার দেখতে চাইলেন ও সরল অধরের একটি চুম্বন প্রার্থনা করলেন—হেলেন তখন যেন প্রণয়ীর শোকে বড় অধীর হলেন না—সুন্দরীর হাসিমুখের চুম্বো পেয়ে ট্রয়ের যুবরাজ সংসার খেলা সাঙ্গ করলেন। দ্বিতীয় স্বামীর মৃত্যু হোল—প্রথম স্বামীও বাইরে অস্ত্র হাতে দাঁড়িয়ে এই অবস্থায়ও হেলেন তাঁর দ্বিতীয় স্বামীর ভ্রাতাকে বিয়ে করলেন।

যুদ্ধ আর মেটে না—এই সময় হঠাৎ গ্রীকেরা অবরোধ ছেড়ে দিয়ে জাহাজের নোঙর উঠাতে লাগল। জাহাজ ছাড়বার আগে তারা তীরে প্রকাণ্ড একটা কাঠের ঘোড়া রেখে গেল। ট্রয়ের লোকেরা এই আশ্চর্য্য ব্যাপার কিছু বুঝতে পারলে না তারা শুধু অবাক্ হয়ে সেই অতি প্রকাণ্ড কাঠের ঘোড়া দেখতে লাগল। গ্রীকদের জাহাজ দূরে চলে গেলে ট্রয়বাসীরা আনন্দে অধীর হয়ে সেই কাঠের ঘোড়া বহু কষ্টে সহরের প্রাচীর ভেঙে নগরের মধ্যে আনল। হেলেনও কৌতূহলে সেই ঘোড়া দেখতে গিয়েছিলেন. এমন সময় হঠাৎ যেন হেলেন তাঁর বহুকাল পূর্ব্বের প্রণয়াকাঙ্ক্ষীদের একজনের স্বর শুনতে পেলেন।

দেখতে দেখতে কাঠের ঘোড়া থেকে অসংখ্য গ্রীক্ সৈন্য বের হয়ে পড়ল। দেখতে দেখতে ট্রয় নগর গ্রীক্ সৈন্যে ভরে গেল। নরহত্যা, লুণ্ঠন অবিরাম চলতে লাগল। পুরুষ, নারী, বালক বালিকা নির্ব্বিচারে হত্যা হতে লাগল। সুন্দর ট্রয় নগরী ধ্বংসাবশেষে পরিণত হোল। বিনা দোষে আর সকলের প্রাণ গেল কিন্তু সুন্দরী হেলেনের উপর—কোন অত্যাচার হোল না। তাঁর জন্যই কিন্তু দুই রাজ্যের এই মনোবাদ—এত অসংখ্য হত্যাকাণ্ড! হেলেনের বয়স তখন পঞ্চাশের উপর। প্রথম স্বামী মেনিলাস হেলেনকে সাদরে নিজগৃহে নিয়ে গেলেন। যে পত্নী নির্দ্বয়ের মত স্বামীকে এত কষ্ট দিয়েছেন সেই স্বামী আজ তাঁর হারানো পত্নীকে পেয়ে পত্নীর সৌন্দর্য্য প্রাণভরে আবার দেখতে লাগলেন।

স্বামী পত্নীর রূপে মুগ্ধ হয়ে সব ভুলতে পারেন বটে কিন্তু স্পার্টার অধিবাসীরা হেলেনকে ক্ষমা করবেন কি করে! এই সুন্দরীর জন্য কত অভাগিনী মাতা পুত্রহারা হয়েছেন, কত স্ত্রী স্বামীহারা হয়েছেন, কত ভগিনী ভাইহারা হয়েছেন, তাই দলে দলে লোক হেলেনকে হত্যা করবার জন্য যুক্তি করতে লাগল। কিন্তু যিনিই হত্যা করতে যান হেলেনের পানে একবার চাইলে আর তার হাত উঠে না—সৌন্দর্য্যের জ্যোতিতে হাতের অস্ত্র হাত থেকে পড়ে যায়—মরণও সৌন্দর্য্যের ভয়ে সুন্দরীর কাছ থেকে সরে যায়। পুরুষেরা হেলেনের সৌন্দর্য্যে জল হয়ে গেলেও নারীরা এই অভিশপ্তা সুন্দরীকে কখনো ক্ষমা করতে পারে নাই।

যতদিন স্বামী জীবিত ছিলেন ততদিন স্বামীর আশ্রয়ে হেলেন তাঁর প্রাসাদে নিরাপদ ছিলেন। স্বামীর মৃত্যুর পর তাঁকে স্পার্টান নারীদের ভয়ে স্পার্টা ছেড়ে পালাতে হয়। অবশেষে সুন্দরী হেলেন রোডসের রাণীর হাতে পড়েন। এই রাণী ট্রয়ের যুদ্ধে তাঁর স্বামীকে হারিয়েছিলেন, হেলেনের উপর এঁর ভীষণ ক্রোধ ছিল। রাণী হেলেনের হত্যার আদেশ দিলেন। বুদ্ধিমতী রাণী হত্যাকারীদের চক্ষু এমনভাবে বেঁধে দিলেন যে তারা যেন হেলেনের রূপ-সৌন্দর্য্য চোখে দেখতে না পায়—একবার সে সৌন্দর্য্য চোখে দেখলে আর সুন্দরীকে হত্যাকারীরাও হত্যা করতে পারবে না যে।

এইভাবে সুন্দরী হেলেনের জীবন-লীলার অবসান হয়।

খোঁপার তত্ত্বকথা

অবগুণ্ঠনাকার পূর্ণব্রহ্মের পবিত্র নামোচ্চারণ করিয়া আদ্যাশক্তিস্বরূপিণী নারীগণের মহিমাকীর্ত্তন করিয়া তাঁহাদেরই শিরোভূষণের বৈচিত্র বর্ণনায় পবিত্র হইব। অতি প্রাচীনকাল হইতে বোধহয় রাজা রাজাতার আমলেরও পূর্ব্ব হইতে এখন এই বিংশ শতাব্দী অর্থাৎ এই নারীদের এই হঠাৎ জাগরণের দিন পর্য্যন্ত কবরী সম্রাজ্ঞীরই কেবল আধিপত্য করে না তাহার দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে জীব শিব জল স্থল দিবানিশি ভূচর খেচর প্রভৃতি সকলেই সন্ত্রস্ত ভীত শঙ্কিত। এহেন খোঁপার মাহাত্ম্য বর্ণনা করিলে সর্ব্বপাপ ক্ষয় হয়, শ্রবণে সপ্তস্বর্গ লাভ হয় ও সেই জীব আগামী জন্মে নারীকুলের প্রিয়পাত্র হয় অতএব ভো ভো সুধীর নরগণ তোমরা অকুণ্ঠিতচিত্তে অঘটন ঘটন পটীয়সীগণের এই কবরী বৈভবের কীর্ত্তি শ্রবণ কর।

কবি গাহিয়াছেন—

"কাল কেশে নানা ছাঁদে যখন নারী খোঁপা বাঁধে"

সেই ফাঁদে পড়িয়া কত পুরুষ পাগল হয় ইত্যাদি—অতএব ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে নারীগণের সদাসর্ব্বদা 'কবরী আবরী' না রাখিলে দৈবদুর্ঘটনা (accident)র মাত্রা প্রচুর বাড়িয়া যাইত লোকে যেমন উপর দিকে চেয়ে যেতে যেতে মোটর চাপা পড়ে, গবেষণা কর্ত্তে কর্ত্তে যেতে গরুর গাড়ী চাপা পড়ে ফাইন দেয় তীক্ষ্ণ-বুদ্ধিশালীগণ যেমন রিক্সা চাপা পড়েন তেমনি অনেক কবি হয়ত 'খোঁপা হত' হয়ে ভেটারনারি হাসপাতালে আশ্রয় নিতে বাধ্য হতেন।—তবে ক্রমশঃই পর্দ্দার কর্দ্দা ফাঁক হয়ে নারীজাগরণ দেখা যাচ্ছে বলে ভয় হয় এতটা ধাতে সহ্য হলে হয়। সার সুরেন মন্ত্রীত্ব নিয়ে কিছুই কর্ত্তে পারেন নি বলে দেশের লোকে তাঁর নিন্দা না করে জলগ্রহণ করে না বটে তিনি মুন্সীপালের খোঁয়াড়ের আগড়টা খুলে দিয়ে নারীদের চোকবার রাস্তা করে দেওয়াতে তাঁর এক অদ্ভুত কীর্ত্তি থেকে যাবে এটা এখন কেউ ভেবে দেখ্‌ছে না বটে তবে মিটিংএ সিটিং করে কমিশনারগণ (না সি—কমিশনার বলা হবে—এটা ভোটে ঠিক করে লওয়া উচিত।) যখন বক্তৃতার আবেগে রেগে যাবেন তখন খোঁপা যদি এলিয়ে পড়ে তাহলে কিন্তু বলা বাহুল্য হি—কমিশনারগণকে তাঁদের তরফেই ভোট দিতে হবে—এরকম কত ঘটবে হয়ত কলিকাতা মুন্সীপালটাই খোঁপার দ্বারাই চালিত শাসিত হবে। যাক্ খুব পুরাকালেও যে খোঁপার কারিকুরী চলতো তার প্রমাণ পাওয়া যায় অজন্তার গিরিগুহা গাত্রস্থ কোদিত চিত্রে—নিম্নে তাহার একটী চিত্রে দেওয়া হইল—

১। এ খোঁপা খুব কম হাজার বছরেরও বেশী আগে চলিত ছিল। তারা খোঁপায় সোণার চিরুণী সোণার সিঁথি সোণার কাঁটা পরতো না দুটো বনের ফুল গুঁজে

দিয়ে চঞ্চলা হরিণীর ন্যায় তারা বনে বাদাড়ে ছুটে বেড়াত "ফুলের বালা ফুলের তাগা ফুলের চন্দ্রহার মুদিত কুঞ্জে বাঁধা বাহু বেহদ বাহার।" তারপর যে কি ফ্যাসান খোঁপা ছিল তা বলা যায় না—তবে ভবিষ্যতে চারিদিকে যেরূপ প্রবলবেগে খনন কার্য্য চলছে তাতে হয়তো খোঁপা শুদ্ধ মধ্যযুগের মাথাও আবিষ্কার হতে পারে। অনেক দিনের পরে প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে

এ খোঁপার পূর্ব্বে কি পরে একটা বেণীর (চলিত কথায় যাকে বিউনী বলে) চলন ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে না। ভারতচন্দ্র বিদ্যার বেণী বর্ণনায় লিখেছেন "বিননিয়া বিনোদিনী

পেটোপড়া খোঁপায় সিঁথিতে "সিঁদুর জলজলে এবং আছে ঝুমকো ঢেঁড়ী দলদলে" থাকিত

নং ২

২। পেটোপড়া খোঁপা—তারপর চৈতন্যদেব যখন নদে মজিয়ে কৃষ্ণপ্রেমে ভারতবর্ষ ভাসালেন সেই বন্যাপ্রবাহে এল চূড়ো বাঁধা খোঁপা

৩। কুক্ষরচূড়া—এখনও সকালে চট্ করে নেয়ে নিয়ে রাঁধতে বসবার সময় অনেক কর্ম্মকুশলা ভগিনীগণ এই পদ্ধতিতে চুলটা জড়িয়ে রাখেন তাতে যে মন্দ দেখায় তা নয় বরং কেশের সদ্ব্যবহার হয়। এই অযত্নরক্ষিত ভাবটা খুব মারাত্মকই হয়—

৪। হাফ্ চূড়া—পাড়ায় বেড়াবার সময় ঠানদি, রাঙাদিদিরা অনেকটা এই ধরণে খোঁপা বাঁধেন এটায় একটু মুরুব্বি ভাব বর্ত্তমান থাকলেও সৌন্দর্য্য খুব বেশী পরিমাণে বেড়ে যায়।

৫। প্যারিসিয়ান চূড়া—আমরাই চূড়াধরা পরে ধরা পড়ে যাই নি—বিলাসিনী ফরাসী রমণীরাও চূড়াটাকে অনেক উন্নত করে ব্যবহার করেন তা দেখা-দেখি আমাদের ব্রাহ্মিকা মহলেও এ ফ্যাসানের আবির্ভাব হয়েছে তবে মটর না চড়ে বেড়ালে এরকম খোঁপা বাঁধা চলে না।　　নং ৬

৬। টপ্‌নচ্‌—(Top-Notch) চূড়ার চরমোৎকর্ষ এতে চূড়াটী খুব কায়দাকরে মাথার উপর তুলে রাখা হয় এটা এদেশে এখনও তত জোর চলিত হয় নাই তবে আগরণ যত বাড়বে তত্তই যে চলবে এ ভরসা আমরা রাখি—কারণ নারীরা যা ধরেন তা সম্পূর্ণ কর্ত্তে পারেন এবং পুরুষেরা—(স্বরাজ প্রাপ্তিতেই প্রত্যক্ষ প্রমাণ।)

৭। এলবার্ট ফ্যাসান—মহারাণীর স্বামী এলবার্টের ধরণে বাবুরা যখন আবার এলবার্ট তুলিতে ব্যস্ত হইল তাহার ঢেউ তখন অন্ধ্র পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছিল। নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের 'লীলা' উপন্যাসের নায়িকা লীলার মাথায় এলবার্ট দেখিয়া তাহার ঠাকুমা বলিতেন "কাকের বাসা"—এই কাকেরবাসা আজ কমিয়া গেলেও একে বারে লুপ্ত হয় নাই।

৮। **ফিরিঙ্গী খোঁপা**—চারপর আদর তখনকার ফিরিঙ্গী খোঁপা এটী না দেশী না বিলাতী ঢংয়ে বাঁধা। বাবুরা যখন সাহেবদের পোষাকের অনুকরণ করিতে সুরু করিলেন তখন মেয়ে মহলে এই খোঁপার রেওয়াজ হইল

নং ৮

এখনও ইহা সাধারণ খোঁপা হিসাবে বাঙ্গলার অন্তপুর উজ্জ্বল করে।

প্রভৃতি ভাবে দেখা দিতে লাগল আর কতক গুলি খোঁপা অনেকদিন থেকেই চলে আসছে সে গুলো ডবল পয়সার মত অচল হয়ে যায় নাই।

নং ৯

৯। **পাতার আরম্ভ**—চারপর পাতার আরম্ভ হল—ক্রমশঃ পাতা আড় পাতা (১০) ও ঝাপী পাতা (১১)

নং ১২

বেণেবউ

এলো খোঁপা

এগুলির ঐতিহাসিক না পাওয়ার ঠিক বিভাগে ফেলা শক্ত হল—খোঁপাবিলাসিনীদের মধ্যে যদি কেউ প্রত্ন-তাত্ত্বিক থাকেন তাঁরা এ সম্বন্ধে রিসার্চ কর্ব্বেন এই ভরসায় এগুলোতে তাঁদের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াই ক্ষান্ত হইলাম।

নং ১৪

নং ১৫

আজকালকার Up-to-date খোঁপার মধ্যে ফিরিঙ্গী খোঁপা ভাঙ্গিয়া একটু আধুনিক ভাবে রচিত হইতেছে আধুনিক খোঁপা (১৪) তার উপর একটু চড়িয়ে উঠেছে বিবিয়ানা (১৫) এগুলি নব্যতন্ত্রের বিলাতী প্যাক-কুষ

হেয়ার-ব্রাশ প্রভৃতি সহযোগে রচিত হয় বার বার শিক্ষয়িত্রীমহলে ছোট ছোট মেয়েদের পো-আটা বেণী বাদ দিয়ে উপর দিকে পাওয়া যায় ইন্টারমিডিয়েট (১৬) তার পর আইএ পাশ হয়ে গেলে স্বভাবতঃই বুদ্ধি কমে আসে,

নং ১৬

নং ১৭

নং ১৮

চোখে এক জোড়া পাঁস-নে এটে আসেন থার্ডইয়ার খোঁপা (১৭) এই সময় পাশ বা ফেল হয়ে গেলে দেখতে পারা যায় লেডিটিচার খোঁপা (১৮) এই লাইনের শেষ হবে পি, আর, এস (১৯) আর পোষ্ট গ্রাজুয়েট (২০) খোঁপা এ প্রায় সবের জানা মেমসাহেবী চালে বাঁধা।

এই শ্রেণীর কিন্তু দু-একটা ছোট ছোট চালের খোঁপা আছে যেমন (২১) ফরগেট মি নট্ (২২) মালতী মালা—তবে মালাচড়াটী কেউ পরিয়ে দেওয়া চাই—নিজে পরলে মালা বড় জ্বালা করে।

নং ২৪

২৩। **হিন্দুস্থানী খোঁপা**—হাউইটজার কামানের মত এই খোঁপা দেখলে ভেতো বাঙালীর প্রাণে স্বতঃই ত্রাস সঞ্চার হয়।

২৪। **চিতোরের টেক্কা**—বড় ঘরে বাঁধা যে সে এ টেক্কার বাহার বুঝতে পারে না তবে তুরুপ ধর্ত্তে পারলে খুব কাজ দেয় এ গুলি প্রায় বাঙ্গলার নিজস্ব এ ছাড়া অন্য কয়েক রকম খোঁপার চিত্র ও প্রদর্শিত হইল।

নং ২৫

২৫। ব্রহ্মদেশীয়া—খোঁপায় ফুল না দিয়ে এঁরা গণে বেরোন না।

২৬। জাপানী খোঁপা—ছোট ছোট চোখ আর খাঁদা নাকের উপর অবয় খোঁপা বেঁধে জাপানী সুন্দরীরা ভুবন জয় করেন।

নং ২৭

২৭। ইংরাজী খোঁপা—আমাদের রাজার দেশের নারীদের খোঁপাকে যে রাজ ভক্তগণ সমধ্যাদায় গ্রহণ করবেন তা বলাই বাহুল্য।

ভাই-ফোঁটা

[শ্রীশৈলজা মুখোপাধ্যায়]

১

কলিকাতার একটা সরু গলির ভিতর একখানা বাড়ীর নিচের তলায় ছাপাখানার কাজ চলিত এবং সেই ছাপাখানার মালিক স্বয়ং গদাধর পৈতুণ্ডি মহাশয় সপরিবারে দোতালার উপরে বাস করিতেন।

সেদিন বৈকালে ছাপাখানার কাজ খুব জোর চলিতেছে। ছাপাকলের খট্, খট্, ঘর্, ঘর্, শব্দে সমস্ত গলিটা মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে। গদাধর বাবু ঘরের এককোণে একখানা টেবিলের সম্মুখে চেয়ারে বসিয়া নিবিষ্টমনে তামাক টানিতেছিলেন; এমন সময় একজন বিরল-শুদ্ধ চশমাধারী যুবক আসিয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া দাঁড়াইতেই গদাধরবাবু, তাঁহার ফরসীর নল-সমেত হাত দুইটা কপালে ঠেকাইয়া কহিলেন, বসুন, বসুন জীবনবাবু, এইমাত্র আপনার কথাই ভাব্‌ছিলুম।—ওহে ভূতনাথ, শুন্‌ছো,—আজ জীবনবাবুর 'প্রেম-নলিনী' বইখানার লাষ্ট্ কর্মাটা তুলে' দিতে হবে।···হাঁা, জীবনবাবু, একটা কথা আপনাকে বল্‌তে ভুলে' যাচ্ছি। আপনার 'প্রেম-নলিনী'খানা বাজারে কাটবে ভালো, এ আমি হাঁক্ মেরে' বলে' দিচ্ছি। ছাপা শেষ হতে-না-হইতেই বইখানা আমার আগাগোড়া পড়া শেষ হয়ে গেছে।

'বিলের' টাকা কিছু বাকী আছে বলিয়া, বইখানার শেষ কর্মাটা আজ মাসখানেক ধরিয়া ছাপানো হইতেছিল না, এবং সেইজন্য আজ গদাধরবাবুকে বেশ করিয়া দুইটা কড়া কথা শুনাইবার মতলব করিয়া জীবনবাবু আসিয়াছিলেন কিন্তু গদাধরবাবু এই কর্ম করিয়া কলিকাতা সহরে তিনখানা বাড়ী বানাইয়াছেন, হাতেও কিছু মোটা রকমের না করিয়াছেন এমন নয়,—কাজেই পাওনাদার এবং তাগিদ্‌দারের মুখ বন্ধ করা বিদ্যাটা তাঁহার বেশ করায়ত্ত হইয়া উঠিয়াছিল।

পুস্তকের প্রশংসা শুনিয়া এবং গদাধরবাবুর মত এক বীরল ব্যক্তিও যে পুস্তকখানা ইহারই মধ্যে পড়িয়া ফেলিয়াছেন জানিয়া, জীবনবাবুর মুখের কথা মুখেই রহিয়া গেল; বলিলেন, আজ্ঞে হাঁা, বইখানা খুব ভালোই হবে বলে আমারও মনে হয়। অথচ শুন্‌লে অবাক্ হবেন, ওটা আমি পাঁচদিনে লিখে ফেলেছি, প্রাণে এত Inspiration জেগেছিল আমার। আর, বুঝেছেন তো, Modern Society and culture নিয়ে—আজ আর বেশীক্ষণ বস্‌তে পার্‌বো না গদাধরবাবু, আর এক জায়গায় একটু কাজ আছে। আজ যেন আমার কর্মাটা ছাপা হয়ে যায়, বুঝলেন? আসি তবে, নমস্কার! বলিয়া জীবনবাবু উঠিলেন,—দরজা পর্য্যন্ত আসিয়াই তাঁহার গতিরোধ হইয়া গেল। বাহিরে অন্ধকার ঘনাইয়া আসিয়াছে, মেঘ ডাকিতেছে, বৃষ্টি নামিল বলিয়া!

জীবনবাবুর সঙ্গে ছাতি ছিল না, কাজেই ফিরিয়া আসিয়া পুনরায় চুপ করিয়া বসা ব্যতীত অন্য কোন উপায় ছিল না।

দেখিতে দেখিতে বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি নামিল! এমন সময় দশ-এগারো বছরের একটি বালক বৃষ্টিধারায় ভিজিয়া ছুটিতে ছুটিতে একেবারে ছাপাখানার ভিতর প্রবেশ করিয়া আশ্রয় লইল। ছেলেটির মাথাভরা ঝাঁকড়া-ঝাঁকড়া চুলগুলা ভিজিয়া জল গড়াইতেছে, পরণের শতচ্ছিন্ন বস্ত্রখানি ভিজিয়া গেছে, অনাবৃত বক্ষের উপর মুষ্টিবদ্ধ হাত দুইটা চাপিয়া শীতার্ত্ত ছেলেটি ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছিল!

সেদিকে গদাধরবাবুর দৃষ্টি পড়িতেই বলিয়া উঠিলেন, কেমন শয়তান ছেলে দেখেছেন জীবনবাবু,—বৃষ্টিতে ভিজ্‌বার জন্যেই ছেলেটা এতক্ষণ রাস্তায় ঘুরে' বেড়াচ্ছিল। ...আরে, এই ছোক্‌রা! কাপড় দিয়ে মাথাটা মুছে ফ্যাল্-না?

ছেলেটি একবার সকরুণ দৃষ্টিতে তাঁহাদের মুখের পানে তাকাইল, পরে নতমুখে একবার তাহার পরিধেয় বস্ত্রটির দিকে তাকাইয়া বলিল, এটা যে একেবারে ছিঁড়ে গেছে।

জীবনবাবু কহিলেন, তোর বাড়ী কোথা ?... এই পাড়ায় ?

—না।

—কোথা তবে ?

বালক ধীরে ধীরে উত্তর দিল, আমার ঘর নেই।

—বা রে ঘর নেই তো থাকিস্ কোথা ?

—ও-পাড়ায় এক বাবুর ঘরে ছিলুম।—

—সেখানে থেকে' চলে এসেচিস্ কেন ?

—তারা খুব মারে।

—তোর নাম কি ?

—ফটিক।

গদাধরবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন,—কাজ করবি ? ছাপাখানার কাজ জানিস্ ?

ফটিক আর একবার করুণ-দৃষ্টিতে তাকাইয়া কহিল, হ্যাঁ, করব, কিন্তু ছাপখানার কাজ জানি না।

গদাধরবাবু হাঁকিলেন, ওহে পরেশ, মাণিক,—ছাপাখানায় একটা ছেলে দরকার বলছিলে না ? একটা পাওয়া গেছে, একে দিয়ে কাজ চালিয়ে নিতে পারবে তো ভাখ।

পরেশ অনতিদূরে একটা টুলের উপর বসিয়া কাজ করিতেছিল, ফটিকের পানে একবার তাকাইয়া বলিল,—হ্যাঁ, তা চলতেও পারে।

জীবনবাবু বলিলেন, বাঃ! তোর খুব ভাগ্যি ভালো, তাই এখানে এসে' পড়েছিলি,—এইতো বাপু, চাকরী জুটে' গেল। দুদিন পরে আবার পালিয়ে যাবি না ত ?

ফটিক ঘাড় নাড়িয়া বলিল,—না।

জীবনবাবু পরেশের দিকে তাকাইয়া কহিলেন, ওহে, তোমাদের একটা পুরণো কাপড়-চোপড় আছে ত' দাও না,—ও মাথাটা মুছে' ফেলুক।

গদাধরবাবু একটা তাচ্ছিল্যের হাসি হাসিয়া বলিলেন, হেঃ, ক্ষেপেছেন জীবনবাবু, ও পাকা শয়তান ছেলে, জলে ভিজে ওর কিছু হবে না।...যা, এইদিক দিয়ে ওই ভিতরে পেরিয়ে যা। ওরা যা করতে বলে কর্। কি নাম বল্লি ?...ফটিক, নয় ?...আচ্ছা, আমি খাতায় আজ থেকে তোর নাম লিখে রাখলুম।

২

বৎসর খানেক পরের কথা।

পিতৃহীন, মাতৃহীন, নিঃসহায়, নির্ব্বান্ধব এই এতিম্-বালক ফটিক, গদাধরবাবুর বাড়ীতেই আশ্রয় পাইল। সমস্ত দিন ছাপাখানার কালি মাখিয়া কাজ করিয়া সন্ধ্যার পরে সে যখন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হইয়া উপরে উঠিয়া আসিত, তখন তাহাকে দেখিয়া আর সেই আগেকার ফটিক বলিয়া চিনিতে পারা যাইত না। তাহার সে রুক্ষ কেশ, মলিন বসন, দৈন্য-নিষ্পীড়িত হত-শ্রী আর নাই, কিন্তু এই স্নেহ-কাঙাল হতভাগ্যের সুন্দর মুখখানির উপর তাহার মৃদুমুগ্ধ অন্তরের যে মলিন দৈন্য এতাবধি ঘাঁটা আছে, সেটুকু আজিও কোনও করুণাময়ীর স্নেহস্পর্শে অমলিন হইয়া উঠে নাই!

গদাধরের পরিবারের মধ্যে ফটিক স্থান পাইয়াছিল বটে কিন্তু তাহার অনাবৃত উন্মুক্ত পৃষ্ঠে নির্য্যাতনের চাবুকগুলি বড় নিষ্করুণভাবে যখন-তখন আসিয়া পড়িত—হাত আড়াল দিয়া রক্ষা করিবার কেহ ছিল না। কেহ ছিল না বলিয়াই হয়ত' ফটিকের এই গৃহ-কারাগারে সামান্য দাসী চাকর পর্য্যন্ত তাহাকে নির্ম্মমভাবে পদাঘাত করিতেও কুণ্ঠিত হইত না।

অর্থ এবং স্বার্থ পূজারী গদাধরবাবুর নীরস শুষ্ক হিয়ার ভাণ্ডার হইতে কোনদিন যে এতটুকু স্নেহ মমতার অপচয় হইবে না, তাহা এই অভাগা ফটিকের বেশ জানা ছিল।

গদাধরবাবুর গৃহিণী, সর্ব্বদা গৃহকর্ম্মের খুঁটি-নাটি লইয়া ব্যস্ত থাকিতেন। কি-চাকরেরা কোথায় কি করিল, না করিল,—চৌবাচ্চায় জলধরা হইয়াছে কি না, বাজার করিতে গিয়া কে কোথায় কয়টা পয়সা চুরি করিল, সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত এই সবের তত্ত্বাবধান করিতেন এবং নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য পরণে পড়িয়া সময়-সময় ফটিককে দুটা মিষ্টি কথাও বলিতেন কিন্তু অন্তরের শূন্য বাহিরের এই মিথ্যা ভালোবাসা যে প্রাণের খাঁটি বস্তু নয় তাহা এই বালকের সুন্দর-নিকষে ধরা পড়িয়া যাইত। কাজেই তাঁহার নিকট হইতেও হতভাগ্য বলিয়া একবিন্দু করুণার ভাগী-ভাগওয়া ফটিকের ছিল না।

তবে এই বাড়ীর মধ্যে এমন একজন ছিল, যাহাকে

দেখিলেই ফটিকের মনে হইত, তাহার গোবি সাহারার মত তপ্ত মরুভূ বক্ষে সে-ই শুধু চেরাপুঞ্জির একখানি মেঘ ধার দিতে পারে! সে গদাধরবাবুর তরুণী কন্যা চারু। চারু যদি একটুখানি হাসিয়া কথা কয়, ফটিক তাহার সব-হারানোর দুঃখ ভুলিয়া যায়। স্কুলের গাড়ী যখন দরজায় আসিয়া দাঁড়ায়, চারু উপর হইতে চঞ্চল-চরণে সিঁড়ি বাহিয়া নিচে নামে, গাড়ী ছাড়িয়া দেয়—ফটিক ছাপাখানার কাজ ছাড়িয়া একদৃষ্টে সেইদিকে তাকাইয়া থাকে, কালো কালীর সঙ্গে ভুল করিয়া লাল রং মিশাইয়া ফেলে, কাগজ আনিতে বলিলে দোয়াত আনিয়া কম্পোজিটারের কাছে মার খায়। অপরাহ্নে চারু যখন ফিরিয়া আসে, ফটিক আহ্লাদে আটখানা হইয়া দ্বিগুণ উৎসাহে কাজ করিতে থাকে—কোথাও এতটুকু ভুল ত্রুটি হয় না! রাত্রে চারুর পাঠগৃহে তাহার গৃহশিক্ষক যখন তাহাকে পড়াইতে পড়াইতে ঘুমের ঘোরে ঝিমাইতে থাকে, ফটিক তখন রাগিয়া অস্থির হয়,—মাঝে মাঝে সে রাগ সংবরণ করিতে না পারিয়া মাষ্টার মহাশয়ের ঘুম ভাঙ্গাইয়া দিতেও কসুর করে না। মাষ্টার মহাশয়ের স্বার্থে ব্যাঘাত হয় বলিয়া তিনি প্রায়ই ফটিককে সেখান হইতে তাড়াইয়া দেন, ভয় দেখাইয়া বলেন, খবরদার ফটকে, তুই এ ঘরে থাকলে দিদিমণির পড়া হবে না, যেয়ো!

ফটিক ধীরে-ধীরে সেখান হইতে চলিয়া যায়, পাশের ঘরের ঘুলঘুলি দিয়া নির্নিমেষ নয়নে তাকাইয়া থাকে।

সমস্ত দিন ছাপাখানার পরিশ্রম করিয়া সেদিন রাত্রে ফটিকের ঘুম পাইতেছিল, তথাপি সে নির্মমভাবে নিদ্রার আরামটুকু জবাই করিয়া, চোখে জল দিয়া কোন রকমে লুকাইয়া লুকাইয়া পাশের ঘর হইতে দিদিমণির পাঠগৃহে চোরা-চোখের দৃষ্টি হানিতেছিল। চারু মাষ্টারের সহিত হাসিয়া কথা কহিল। ফটিকের সর্বাঙ্গ জ্বলিয়া গেল। তাহার আপাদমস্তক রি রি করিতে লাগিল। মাষ্টারমশায় হঠাৎ চারুর হাতখানা চাপিয়া ধরিল! ফটিক আর স্থির থাকিতে পারিল না। তাড়াতাড়ি উপরে গিয়া গিন্নি-মাকে সংবাদ দিল, আসুন মা, দেখ্‌বেন আসুন, মাষ্টারমশায়ের কাণ্ড দেখ্‌বেন।

গিন্নি-মা এই সব ব্যাপারের জন্য উৎসুক হইয়া বসিয়া থাকিতেন, তাড়াতাড়ি নিচে নামিয়া আসিয়া ফটিকের নির্দ্দিষ্ট গুপ্তস্থান হইতে যাহা দেখিলেন, তাহাতে সত্যই তাঁহার রাগ হইল। পরদিন চারুর অনিচ্ছাসত্ত্বেও মাষ্টারমশায়ের অভাব হইয়া গেল।

চারু বুঝিল, ফটিক এই কাণ্ড করিয়াছে। কিন্তু বুঝিয়াও কিছু করিতে পারিল না।

ফটিকের মনে প্রথমে যেটুকু আনন্দ হইয়াছিল, চারুর রাগ দেখিয়া সেটুকুও আবার নিরানন্দের হাহাকারে ব্যর্থ হইয়া গেল।

৩

কালীপূজার রাত্রে কলিকাতার যেখানে-সেখানে বাজী পুড়িতেছে! আশ্বিনের কল্যাণে ফুটপাথের উপর হাউই, পটপটি, পথযাত্রী পথিকের পায়ে-পায়ে ফুটিয়া উঠিতেছে। ধার-করা নকল সখে দুর্জনের প্রাণে ত্রাস সঞ্চার করিয়া ছেলেদের মুখে হাসি ফুটিতেছে, অনর্থক পয়সা নষ্ট হইতেছে ভাবিয়া বুড়োদের প্রাণে কষ্ট হইতেছে, আবার অহিফেন্-সেবী নেশাখোরের নেশা ছুটিয়া যাইবার ভয়ে তাহারা সতর্ক পদবিক্ষেপে পথ চলিতে চলিতে বোমাটে ছেলেদের গালাগালি করিতেছে। আজ এই উৎসব-রজনী ব্যর্থ শুধু ফটিকের কাছে! সে ছাপাখানার দরজায় দাঁড়াইয়া শুধু ক্যাল্ ক্যাল্ করিয়া এই আনন্দ-কোলাহল-মুখর রজনীর বক্ষ উৎসবে যোগ দিবার জন্য উৎসুক প্রাণে তাকাইয়া আছে। আজ একটি পয়সাও কেহ তাহার হাতে তুলিয়া দেয় নাই যে, বাজি কিনিয়া পোড়াইবে। গদাধরবাবুর কাছে চাহিয়াও পায় নাই, গিন্নিমায়ের কাছে চাহিতে ভয় করে, চারুতো আজ প্রায় দশদিন ধরিয়া তাহার সহিত বাক্যালাপ বন্ধ করিয়াছে।

গিন্নিমা ডাকিলেন, ফটিক।

ফটিক উপরে উঠিয়া গেল। তিনি তাহার হাতে চার আনা পয়সা দিয়া বই আনিতে আদেশ করিলেন।

ফটিক তিন আনার বই কিনিয়া এক আনার বাজী কিনিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় হাতে হাতে চোর ধরা পড়িয়া গেল। অগু চারুর পাঠাইয়া গিন্নি সংবাদ লইয়া সমস্তই টের পাইলেন। এ অন্যায় সহ্য করিবার ক্ষমতা

এ বাড়ীর কাহারও ছিল না। গদাধরবাবু তৎক্ষণাৎ এই চৌর্য্য অপরাধে মৃত বালককে বাড়ী হইতে দূর করিয়া দিতেও কুণ্ঠিত হইলেন না।

ফটিক শুধু চারুর মুখ চাহিয়া বাড়ী হইতে বাহির হইয়া যাইতে ইতস্ততঃ করিতেছিল। অবশেষে হতভাগ্যের সে মুখ চাওয়া নিষ্ফল হইয়া গেল। ফটিক শুনিল, চারু বলিতেছে,—ও হতভাগা চোরকে বাড়ী থেকে দূর করে দাও মা!

ফটিক ধীরে ধীরে বাহিরে আসিয়া পথে দাঁড়াইল। বাড়ীটার দিকে একবার ফিরিয়াও চাহিল না।

ভ্রাতৃ দ্বিতীয়ার দিন অপরাহ্ণবেলায় ফটিককে আবার ছাপাখানার দরজায় ঘুরিতে দেখা গেল। গত দুইটা দিন সে যে কেমন করিয়া কাটাইয়াছে সে নিজেই জানে না। পথে পথে ঘুরিয়া, কলের জলে পেট ভরাইয়া ফটিক ক্লান্ত দেহে আবার সেইখানেই ফিরিয়া আসিয়াছে। সে, ভাবিয়াছিল, আজ ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার দিন চারু তাহাকে কুকুরের মত বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দিতে পারিবে না। সাময়িক উত্তেজনায় হয়ত তাহার উপর সে অবিচার করিয়াছে, তাই বলিয়া, আজ আর সে তাহাকে বিমুখ করিবে না। ভগিনীর মত ভালোবাসিয়া, মাতার মত স্নেহ দিয়া চারু হয়ত তাহাকে ঘরে ডাকিয়া লইবে।

ফটিক বাড়ী ঢুকিতে পারিতেছিল না। গলি হইতে উপরের পানে তাকাইয়া ভাবিতেছিল, জানালার পথে একটি বারের তরেও কি সে চারুর মুখখানি দেখিতে পাইবে না!

সান্ধ্য ভ্রমণের নিমিত্ত মোটরখানা আসিয়া দরজায় দাঁড়াইল। ফটিকের মন আনন্দে নাচিয়া উঠিল। এইবার চারু নিশ্চয় আসিবে! তাহাকে ডাকিবে, হাসিবে, কথা কহিবে।

সিঁড়ির উপর চারুর পদশব্দ ধ্বনিত হইয়া উঠিল। ফটিকের মনে হইল এ তাহার বুকের শব্দ।... সন্ধ্যার ধূসর অন্ধকারে ধূপছায়া রঙের সাড়ী পড়িয়া চারু হাসিতে হাসিতে গাড়ীতে উঠিয়া বসিল। ফটিক সকরুণনেত্রে একবার সেইদিকে তাকাইল, একবার ছাপাখানার দরজায় করাঘাত করিল, কিন্তু চারু ফিরিয়াও চাহিল না—মোটর ছাড়িয়া দিল।

নির্ব্বাক হতবুদ্ধির মত ফটিক রাস্তার দিকে তাকাইয়া রহিল। উপর হইতে কে যেন থুথু ফেলিল। থুথুটা ফটিকের মাথার উপর আসিয়া পড়িতেই ফটিক হাত দিয়া তাহা মুছিয়া লইয়া আবার পথের উপর দিয়া চলিতে আরম্ভ করিল, উপরের দিকে একবার তাকাইয়া দেখাও প্রয়োজন মনে করিল না।

রাত্রি তখন কত হইবে, ঠাহর করিবার উপায় নাই। ফটিক একটা বড়রাস্তার বাড়ীর রকের উপর ঘুমাইয়া স্বপ্ন দেখিতেছে—চারু সেই ধূপছায়া রঙের সাড়ীখানি পরিয়া তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। বামহস্তে ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার চন্দন নির্য্যাস। কপালে চন্দনের ফোঁটা দিয়া চারু তাহার হাত ধরিয়া আদর করিয়া সোহাগ করিয়া ভাই বলিয়া উঠাইল।

স্বপ্ন ছুটিয়া গেল। চারিদিকে বিভীষিকাময়ী গভীর অন্ধকার থম্ থম্ করিতেছে। আকাশে মেঘে মেঘে ঘটনা বড় ভীষণ হইয়া উঠিয়াছে, গুরু গম্ভীররবে আকাশে বজ্র-ডমরু বাজিয়া উঠিল। অগ্নিবরণী বিদ্যুতের রেখা সেই অন্ধকারের বুক চিরিয়া দিগন্তে মিলাইয়া গেল। ফটিক মাথার উপরে তাকাইয়া দেখিল, বারিধারা রোধ করিবার মত আশ্রয় নাই। না থাকুক,—নিদ্রাজড়ের পর ফটিক সেই রুদ্রমণ্ডলের নৃত্যকম্পিত তমসাবৃত নিশি-যামিনীর প্রলয়ান্ধকারের মধ্যে স্তব্ধভাবে বসিয়া রহিল,—সকলের অলক্ষে চোখ দিয়া দু'ফোটা অশ্রু ঝরিয়া পড়িল মাত্র।

গান

[শ্রীশ্রীপতিপ্রসন্ন ঘোষ]

গন্ধ মদির ভুবনে এ কার
ললিত মধুর অভিযান।
পুলকিত বন, ব্যাকুল পবন,
শিহরিত সারা প্রাণ।
এসেছে সে আজ এসেছে—
স্মৃতির মুরতি বহিয়া,
এসেছে সে আজ এসেছে—
মন-মধুপা প্রেমে ভরিয়া।
এসেছে ফিরিয়া বীণা ঝঙ্কারে
হারানো সুখের গান।

ভীনা-বাদাম

কাজের লোক !

প্রভু (কর্ম্মচারীর প্রতি) দেখ বাপু! এখানে তোমার পোষাবে না আমার চাই খুব চটপটে কাজের লোক যাদের মুখে কথা নেই অথচ হাত পা চলে খুব জোর। তোমার মত বেদামারা লোকের দ্বারা—

কর্ম্মচারী—যে আজ্ঞে—তাহলে আমার ভাইকে এনে দেব তার মিরগীর ব্যামো আছে—একবার জাগলে মুখে রা বেরুবে না—অথচ হাত পা চলে যেন কলের গাড়ী।

প্রেমের অন্ধত্ব।

বিবাহ-পণ-নিবারণী সভার বক্তৃতা প্রসঙ্গে যোগেন-বাবু বলিলেন "প্রেম যে অন্ধ তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ—পাশ্চাত্যে কেন আমাদের ভারতেও দুর্লভ নহে। তাহা না হইলে কন্যার পিতার গলায় গামছা দিয়া বিবাহের পণ স্বরূপ প্রচুর অর্থ আদায় করিবার অব্যবহিত পরে ফুলশয্যায় শুইয়া সেই মেয়ের সহিতই প্রেমালাপ করিতে নিশ্চয়ই চক্ষুলজ্জা হইত"

অকাট্য যুক্তি শ্রবনে শ্রোতৃবর্গ তুষ্ণীম্ভূত।

কাণ্ডজ্ঞানের বিকাশ।

মানুষের আক্কেল দাঁত বাহির হইবার সময় প্রভূত যন্ত্রণা সহ্য করিতে হয় এ সকলেই জানে। একজন প্রত্ন-তত্ত্ববিৎ গবেষণায় স্থির করিয়াছেন যে মানুষের কাণ্ডজ্ঞান বিবাহের পরই জন্মায়, সেই জন্য বিবাহের পর হইতেই জীবনটা যন্ত্রণাময় হইতে আরম্ভ হয়।

জনৈক সমালোচক তাহাতে টীকা করিলেন—বিবাহের পর জ্ঞান চক্ষু উন্মীলিত হয় বটে তবে তখন আর তাহার সার্থকতা থাকে না অর্থাৎ সে জ্ঞান না থাকায় যা দুঃখ তাহা তৎপূর্ব্বেই সংঘটিত হয়।

হৃদয়ের সন্ধান।

আচার্য্য ভবশঙ্কর—আজকাল অনেক তরুণীরই হৃদয় প্রেমের আক্রমণে অপহৃত হয় কারণ অনেকেরই মুখে আমি রবীন্দ্রনাথের "কি হলো আমার বুঝিবা সখী হৃদয় আমার হারিয়েছি" গানটী শ্রবণ করিয়াছি—এ সকল অপহৃত হৃদয় যায় কোথায়? এর অনুসন্ধান করিতে না পারিলে আমাদের সমাজ হৃদয়-হীন নারীতে পূর্ণ হইয়া যাইবে।

নবদীক্ষিত শিষ্য—আজ্ঞে সে আর বেশী শক্ত কথা কি—তাঁদের হৃদয়গুলি প্রায়ই নভেলের পাতার মধ্যে থাকে—বিবাহের পর আবার হৃদয়গুলি ধীরে ধীরে ফিরে আসে!

হাতবুলিয়ে চিকিৎসা।

প্রত্নতাত্ত্বিক—পুরাকালে আমাদের দেশে একরকম চিকিৎসা প্রচলিত ছিল যাতে ব্যাধি-দুষ্টস্থানে হস্তামর্ষণ করে আরোগ্য করা হতো, এতেই বোঝা যায় যে হাত-বোলানর শক্তি অদ্ভুত—

জনৈক বন্ধু—তাতে আর কোন ভুল নেই—আমার ছোট ছেলেটা খালি খেলে বেড়াত, পড়াশুনা মোটেই কর্ত্তো না—দিন দুইচার তার কাণে বসে হাত বোলাতে সে ব্যায়রাম সেরে গেল, মেজটা সিগারেট ধরেছিল—তার গালে চটাপট্ করে হাত বোলাতে এখন দুধপান পরিত্যাগ করে ঠাণ্ডা হয়েছে—বড়টা লক্ষীছাড়া হয়ে বেজাবাড়ী যাতায়াত সুরু করেছিল—একদিন তার গলায় হাত বুলিয়ে মরজার বের করে দিতে ব্যাধি মুক্ত হয়েছে,

প্রত্নতাত্ত্বিক—নিবিষ্ট মনে ঘিসিসের উপকরণ ভাবিয়া সব নোট করিয়া লইলেন।

অর্থ মাহাত্ম্য।

"টাকা—টাকাতে কি সুখ হয়—যদি জমাই, লোকে কৃপণ বলবে, যদি খরচ করি—উড়ন্ চণ্ডে বলবে, যদি দান করি—বোকা ঠাওরাবে—যদি টাকার লোভে বড় লোকের মেয়ে বে করি—তার কথার জ্বালায় শেষটা গলায় দড়ি দিতে হবে—" জনৈক লক্ষীছাড়া ভাবেরী হইতে।

বহুবিবাহের কুফল।

সংস্কারক—বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলিলেন—বহুবিবাহ বাঙ্গালাদেশ হইতে ক্রমে উঠিয়া যাইতেছে ইহার কারণ কি কেহ বলিতে পারেন।

জনৈক শ্রোতা—আজ্ঞে হাঁ, বহু বিবাহ কর্লে অনেক শালা-সম্বন্ধীর চাকরী যোগাড় করে দিতে হয়—চাকরীর বাজার আজকাল বড় মন্দা—জানেন তো—

অপর শ্রোতা—কন্যাদায়ের সংখ্যা বেশী হয়ে যায় বলে।

সংস্কারক—তাই ত হয় বিনা পণে বিবাহ সুরু হলে আবার বহুবিবাহ পুনঃ প্রচলিত না হয়ে পড়ে—

স্ত্রী চরিত্রের বিকাশ।

প্র—স্ত্রী চরিত্রের পূর্ণ বিকাশ কখন দেখিতে পাওয়া যায়?

উঃ—যখন তিনি কাহার সহিত কলহে নিযুক্তা থাকেন নতুবা যে জিহ্বা সাধারণতঃ মধু বর্ষণ করে কলহ-কালীন তাহা হইতে উচ্চারিত বিষের তীব্রতা ঠিক অনুভব করা যায় না।

নারীদের কর্ত্তব্য।

নারী জাগরণী সভার সভাপতিনী (পত্নী বলিলে একজন পতির অস্তিত্ব সম্ভাবনা থাকে বলিয়া উহা ব্যবহৃত হইল না) উচ্চকণ্ঠে কহিলেন "কুমারীগণ! জাগো, নারীমর্য্যাদারক্ষার্থ বদ্ধপরিকর হও—পুরুষদের স্বার্থপর অহেতুক কর্ত্তৃত্বের বিরুদ্ধে অভিযান কর—কেহ আর বিবাহ করিও না এবং নিজেদের কন্যাদের বিবাহ দিও না—পুরুষদের দর্প চূর্ণ কর—"

একজন কুমারী অপরের কাণে কাণে কহিল "আমরাই যদি বিবাহ না করি তবে আমাদের কন্যা আসিবে কোথা হইতে যে তাহাদেরও বিবাহ দিব না!

যুক্তিতর্কের অতীত।

মাতাল (বন্ধুর প্রতি) "তুমি যাদি আমারই দোষ দেখ—বল, বুঝিয়ে বললে তোমার স্ত্রী ঠিক বুঝবে—কিন্তু যেদিন আমি লুকিয়ে একটু আধটু মদ খেয়ে আসি সেদিন এসে কত যুক্তি দেখিয়ে তর্ক করি,—বুঝিয়ে দিই যে আমি মদ খাইনি, সে তা বিশ্বাসই করে না।"

বয়স নির্ণয়।

তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী—হাঁ গা, তোদের বাবুর বয়স কত হবে?

ঝি—আজ্ঞে তার সাক্ষাতে আমরা বলি পঁয়ত্রিশ, আর আড়ালে বলি পঁয়ষট্টি—আর আপনার সামনে বলতে বলে দিয়েছেন পাঁচশ।

পরিবর্ত্তন।

নারীজাগরণী সভার সভাপতিনী—না বাংলাদেশের পুরুষদের কিছুতেই সন্তুষ্ট রাখা যায় না—যখন আমরা কেবল সংসারধর্ম্ম কর্ত্তুম তখন তাঁরা কবিতা লিখতেন—"না জাগিলে সব ভারতললনা ভারত কখনো স্বাধীন হ'বে না—"

আবার যেমন এই নারী-স্বাধীনতার আন্দোলন সুরু হয়েছে অমনি তাঁরা শঙ্কিত হয়ে গেল ধর্ম্ম গেল যান" করে চেঁচাচ্ছেন, এরকম করেতো কোন কাজই হবার যো নেই—নূতন যে একটা কিছু হোয়বে—

জনৈক পুরুষ শ্রোতা—কারণ কি জানেন—প্রকৃতি পরিবর্ত্তনশীল আর আপনারা প্রকৃতিরূপিণী তাই পুরুষেরা নিত্যই আপনাদের পরিবর্ত্তন দেখতে চান।

সাক্ষী উকীল।

উকিল (দাঁত খিচাইয়া) সত্যি বলছো তো—

বিরক্ত সাক্ষী—হাঁ গো হাঁ-এযাবৎ তো সত্যই বলছি তবে এই খিঁচুনীর পর আর সত্য বেরোয় কি না তাই ভাবছি।

নীলার আংটী।

স্ত্রী—ব্যস্ত হইয়া স্বামীকে বলিলেন,—"ওগো, শীগ্‌গির একটা ডুবুরী ডাকতে পাঠাও—কাল যে নীলার আংটী এনে দিয়েছিলে—নাইতে গিয়ে সেটা পুকুরে পড়ে গেছে।

স্বামী—বলিলেন, আচ্ছা ভেবে দেখি, খানিক পরে স্ত্রী আসিয়া আবার তাগাদা করাতে স্বামী বলিলেন—ভেবে দেখলুম ডুবুরী এনে কাজ নেই—সে এলে একটা টাকার কম জলে নামবে না—তার চেয়ে আট আনা দিয়ে আবার একটা ঐ রকম নূতন আংটীই এনে দেব—

স্ত্রী—(বিস্মিতভাবে) কি সর্ব্বনাশ! তবে কি সেটা গিল্‌টীর নাকি—

স্বা—প্রেয়সী পৃথিবীটাই যে গিল্‌টী করা।

শশীবাবু, সত্যই আপনার স্ত্রীর নজর খুব উঁচু এ রকম করে অতিথি অভ্যাগতকে খাওয়ান দাওয়ান কর্ত্তে আজকালকার স্ত্রীলোকদের দেখা যায় না—আমি এটা খুব পছন্দ করি।

শশীবাবু—তবে আপ্যায়নের খরচপত্র বহন কর্ত্তে হলে বোধহয় এতটা পছন্দ কর্ত্তেন না।

কথায় বলে যে টাকার পালক আছে—সেটা সত্য তবে, তাকে এমন করে যে উড়তে শেখায় যাতে তারা শিক্ষকের কাছেই উড়ে আসে—তারই বাহাদুরী।

দুঃখ জ্ঞাপন।

মিঃ চক্রবর্ত্তী—রাস্তায় পরিচিত বন্ধুকে দেখিয়া—কৈ অতীনবাবু আমার বিবাহে গেলেন না—কার্ড পাঠালুম। অতীন চৌধুরী—কৈ আর পাল্লুম—সময় করে উঠ্‌তে পাল্লুম না।

মিঃ চক্রবর্ত্তী—তা একটা দুঃখজ্ঞাপক পত্র দিলেও তো পার্‌তেন।

অতীন চৌধুরী—তেবে দেখ্‌লুম—বিয়ের পর থেকেই যত রাজ্যের দুঃখ নিজেরা এসেই আপনাকে সব জ্ঞাপন কর্ত্তে—আমার জ্ঞাপন করবার আর আবশ্যক হবে না।

বসিয়ে দেওয়া।

ট্রামে খুবই ভীড় হইয়াছিল—একটী মোটা বাবু হাঁফাতে হাঁফাতে এসে দরজার সাম্‌নে দাঁড়ালেন—দরজার পাশেই একটী খুব রোগা কিটকিটে ফুলবাবু বসে ছিলেন—তিনি একটু সরে বল্‌লেন—বসুন না মশাই কতক্ষণ আর দাঁড়িয়ে থাক্‌বেন—ভদ্রতা রক্ষার্থে মোটা বাবুটী বল্‌লেন—না-না আপনি বসুন আমি বেশ আছি ফুলবাবুটী নাছোড় বান্দা—নিজে উঠে—নিজের জায়গায় তাঁকে বসিয়ে দিলেন ও একটু পরেই নেমে গেলেন। মোটা বাবুটী হাসিয়া একটু সুস্থ হইবার পর পকেটে হাত দিয়া—"এ্যাঁ আমার নোটের তাড়া" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন—ব্যাপারটা সকলেই বুঝিতে পারিলেন—ও তাঁহাকে সহানুভূতিসূচক সান্ত্বনা দান করিতে লাগিলেন—একটী ছেঁপো ছেলে কোণে দাঁড়িয়েছিল—সে বল্‌লে "সে বাবুটী সত্যি সত্যিই ওঁকে বসিয়ে দিয়ে গেছেন।"

হিসাবী লোক।

পথে যাইতে যাইতে রামবাবুর সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায় শ্যামচরণ বলিলেন—"আচ্ছা, আপনার কাছে আমার কিছু ধারটার নেইতো?" রামবাবু বিস্মিত হইয়া কহিলেন, "না—আপনার কাছে আমার কিছু পাওনা আছে বলেতো মনে পড়ে না—কেন আপনি এখন দেনা শোধ কর্ত্তে বেরিয়েছেন নাকি?" হাসিয়া শ্যামবাবু বলিলেন—"না না—না দেনা আমি কখন শোধ করি না—তবে দেখ্‌ছি এখনও কার কার কাছে দেনা করা হয় নাই অর্থাৎ কারো কাছে যেন অকটী না থাকি—" রামবাবু ততক্ষণে পাশ কাটাইয়া অনেকটা অগ্রসর হইয়া পড়িয়াছিলেন।

ফলিত জ্যোতিষ।

মুণ্ডিত শ্মশ্রুগুম্ফ—বিপুল শিখাশোভিত চন্দন-চর্চ্চিত-বপু জ্যোতিষী মহাশয় গরদের ধুতি পরিধান করিয়া শীতের চাদর গায়ে দিয়া ব্যাঘ্রচর্ম্মাসনে স্বীকারের জন্য ওৎ পাতিয়া বসিয়াছিলেন, এমন সময় উড়িয়া ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল—"সাব আসিছু"। নেত্রোন্মীলিত করিয়া জ্যোতিষী মহাশয় বলিলেন—যা একটা চেয়ার ওখানে এনে দে—চেয়ারও আসিল, সাহেবও আসিলেন—আগন্তুক একজন নামজাদা সাহেব ব্যারিষ্টার, চতুর জ্যোতিষী একবার তাঁহাকে দেখিয়া লইয়াই আবার চক্ষু মুদ্রিত করিয়া বলিতে লাগিলেন,—ধন সম্পত্তি সম্বন্ধীয় বিচার—এই বলিয়া আগন্তুকের মুখের দিকে চাহিলেন—কোন সাড়াশব্দ পাওয়া যায় কিনা—আগন্তুক ঈষৎ হাসিয়া একখানা পাঁচ টাকার নোট বাহির করিয়া বলিলেন—দেখুন ওসব আবশ্যক নেই—ব্যবসার অনেক রকম Tricks থাকে, তা যাক্ আমার স্ত্রী মিসেস রায়চৌধুরী একটু পরেই আপনার কাছে হাত দেখাতে আসবেন সে সময় অন্যান্য কথার পর বল্‌বেন যে মোটর চাপা দিয়া মানুষ মারিয়া ফাঁসি যাইবার মত একটা ফাঁড়া তার আছে, তবে তিনি যদি কখন মোটর না কেনেন তবে সেটা কেটে যেতে পারে। জ্যোতিষী মহাশয় নোটটী টেঁকস্থ করিয়া বুঝিলেন, "পাঁচটাকায় পাঁচ হাজার টাকা বাঁচাবার জন্য tip।

ভালবাসার স্তর।

স্ত্রী (স্বামীর প্রতি) হাঁগা তুমি যে প্রায়ই বল সতীশ-বাবু তার স্ত্রীকে ভয়ানক ভালবাসেন—তবে বিয়ে আজ ১৫ দিন বাড়ী ছাড়া তা বৌটাকে একখান' চিঠিতো দেয়ই নি, এমন কি কিছু খরচ পত্র পর্য্যন্ত ও দিয়ে যায় নি—বেচারা কি খেয়ে বাঁচে বল দেখি? এ আবার কি রকম ভালবাসা জানিনে বাবু—

স্বামী (সহাস্যে) একে বলে নিষ্কাম প্রেম—প্রেমের খুব উচ্চস্তর।

স্ত্রী—তাহলে আমাদের নীচের স্তরে থাকবারই ব্যবস্থা করো।

মিথ্যাকথা।

"সদা সত্য কথা কহিবে—মিথ্যা বলা বড় দোষ—যে মিথ্যা বলে সকলে তাহাকে ঘৃণা করে—"

ব্যতিক্রম—তবে তালমাফিক একটা মিথ্যা বলিতে পারিলে পুনঃ পুনঃ অনেক মিথ্যাকথা বলার হাত হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায়।"

হিসাবী স্বামী।

স্ত্রী—হাড়ীতে শুনি যে বিয়ের আগে তুমি খুব বিয়েটার দেখ্‌তে—এখন তো কৈ আর যেতে দেখি না—

স্বামী—এখন যেতে গেলে খরচ বেশী বাড়্‌বে বলে ও কাজটা বিয়ের আগে সম্পন্ন করে রেখেছি—

বাবু (ঝির প্রতি) আমার কাল রাত্রে ফিমুতে দেরী হয়েছিল—তা গিন্নীকে কে বল্লে।

ঝি—আমি বলিনি বাবু—আমি খালি বলেছি যে কর্ত্তাবাবু যখন এলেন তখন আমি উনানে আঁচ দিছলুম।

বাবু হোটেলে খেতে গিয়ে বল্লেন—ওহে ছোক্‌রা গরম কাটলেট্, দুটী গরম কাটলেট্ দিয়োতো।

খাদ্য আসিলে বাবু এক কামড় খাইয়া বলিলেন,—"ওহে এ কাটলেট্ চাট্‌কা তো?"

ছোক্‌রা—সবিনয়ে বলিল—"আজ্ঞে আপনি তো গরম কাটলেট্ চেয়েছেন—কাল থেকে ঐ কাটলেট্‌খানা অন্ততঃ আমি ঘণ্টাখানেক গরম করেছি তাতেও যদি—

বাবু—উঠিয়া দাঁড়াইয়া "থাক্—থাক্, আর বল্‌তে হবে না" বলিয়া দাম দিয়া চলিয়া আসিলেন।

স্ত্রী—আমি কিছু বল্‌তে এলেই তোমার অমনি ঘুম পায়—একি অভ্রতা?

স্বামী—কি করবো বল—না ঘুমুলে তোমার বক্তব্য শেষ হবার কোন আশা থাকে না যে।

ফরিয়াদী পক্ষের সাক্ষীকে জেরায় জেরায় আসামী পক্ষের উকিল ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছেন। একবার জোর গলায় একটা ধমক্ দিতেই সাক্ষী বলিল—"অত ধমকাবেন না হুজুর, তা'হলে সব ভুলে যাব।"

রাম হরি চৌধুরী একটা জমি সংক্রান্ত ব্যাপারে সাক্ষী দিতে গিয়াছেন। তাঁহার পেশা কি জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন, "জমিদার।" উকীল জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনি সকালে কখন শয্যাত্যাগ করেন।" উত্তরে তিনি বলিলেন, "জমিদাররা যেমন সময় উঠে থাকে—এই ধরুণ গিয়ে ৯টা, ১০টা" উকিল বলিলেন, "তবে ভোরবেলায় উভয়পক্ষে যে মারামারি হয় তা আপনি কেমন করে দেখ্‌লেন—বিব্রত হইয়া চৌধুরী মহাশয় বলিলেন—"স্বপ্নে"। মামলা ডিস্‌মিস্ হইয়া গেল, যার তরফে তিনি সাক্ষ্য দিয়াছিলেন তিনি বলিলেন—"কি কল্লেন চৌধুরী মশাই।" চৌধুরী মহাশয় ক্রুদ্ধ মুখভঙ্গী করিয়া বলিলেন,—"কি আর কর্‌ব বাবা—এদিকে আবার জমীদার সাজতে বলেছ—ওদিকে তোর বেলায় তাদারূপ করেছ—তুমিও রাখি কি করে—তা'বলে জমীদারীটাতো নষ্ট কর্ত্তে পারিনি!"

Printed by Bijoy Krishna Dass at the Lakshmibilas Press,
14, Jagannath Dutta Lane, Calcutta.

কিশোরী

"শিল্পসভা কর্তৃপক্ষ হইতে শিল্পী – শ্রীহেমেন্দ্রনাথ মজুমদার কর্তৃক গৃহীত"

সচিত্র সাপ্তাহিক পত্রিকা

২য় বর্ষ] ১৭ই আশ্বিন শনিবার ১৩৩০, ইং ৩রা নভেম্বর [১৬শ সংখ্যা

আলোচনা

শ্রীশ্রীদুর্গাপূজার পর আমরা আমাদের দেশের ভাই বোনেদের প্রীতি আলিঙ্গন ও অভিবাদন জানাইতেছি। দেশে শরৎলক্ষ্মীর আগমন উৎসব এবারকার মত হইয়া গেল। আবার বছরের পর বছর বহিয়া এমনি শরতের আগমন সম্ভাবনায়—দেশের লোকে আশা উৎসাহে মাতিয়া উঠিয়া শারদলক্ষ্মীর আবাহনের জন্য প্রস্তুত হইবে। কত যুগ যুগান্ত হইতে বাংলার শরৎ-শ্রীর এই বন্দনা চলিয়া আসিয়াছে তাহা কেহ জানে না। নানা সরস বৈচিত্র্যোভরা এই সুজলা সুফলা বাংলা দেশের, সাগরগর্ভ হইতে উত্থানের পর হইতেই বুঝি বা দেশে শরৎ স্তুতি চলিয়া আসিতেছে। রামায়ণী যুগে শ্রীরামচন্দ্র রামায়ণী সভ্যতার দেশে বসন্ত উৎসবের পরিবর্ত্তে শারদ-লক্ষ্মীর অপূর্ব্ব মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া তাহা গড়িয়া তুলিয়া-ছিলেন। দেশলক্ষ্মীর অন্তরের রূপের এমন প্রকাশ এমন সুস্নিগ্ধ-মধুর অথচ এমন জীবন্ত-করাল রূপ-কল্পনা আর কোথাও হইয়াছে কিনা জানি না। এই রূপ-কল্পনার প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য শ্রীরামচন্দ্র নীলোৎপলের পরিবর্ত্তে নিজ চক্ষু বিসর্জ্জন দিতে উদ্যোগী হইয়াছিলেন। দেশবাসী দেশলক্ষ্মীর এই মূর্ত্তি পাইবার অধিকারী হইয়াছে একটা বিরাট সাধনার গুণে—সে সাধনা এত উচ্চ ও মহান যে কত যুগ-যুগান্ত, এক একটা কালের আরম্ভ ও বিলয়েও তাহা ধ্বংস হইয়া যায় নাই—চলিতেছে। কত ইতিহাসহীন অতীত আজ স্মরণাতীত—কত অনাগত ভবিষ্যত বর্ত্তমান ছাড়িয়া অতীতে মিশিয়া গেল তবু ইহা চলিতেছে। রামায়ণী যুগের আদর্শের ছাপ সারা ভারতের উপরে পড়িলেও—ত্রেতার নায়ক শ্রীরামচন্দ্রের দেশমাতৃকার বন্দনা বাংলা দেশ যেমন আন্তরিকতার সহিত গ্রহণ করিয়াছিল এমন বুঝি ভারতের আর কোন দেশ করে নাই। বুঝি বা চির শ্যামল শরৎ-সুন্দরী বাংলা-দেশে যেমন ভাবে আত্মপ্রকাশ করেন এমন আর কোনো দেশে করেন না। সত্যযুগে রাজা সুরথের বসন্ত লক্ষ্মী বাসন্তীর আবাহন বন্দনা—ত্রেতার শরৎ বন্দনায় রূপান্তরিত হইল। দেবী এখনও অক্ষয়—মূর্ত্তি পরি-কল্পনাও অনেকাংশে এক—কিন্তু শারদলক্ষ্মীই দেশকে কি যেন এক আশার সঞ্জীবনী সুধায় জীয়াইয়া রাখিয়াছেন। সত্যের ও ত্রেতার সেই প্রাণ-প্রতিষ্ঠা সাধনার ফল

দেশবাসী আজও মাতৃ-মূর্ত্তির মুখের হাসি স্নেহ করুণা ধারার উপভোগ করিতেছে। কিন্তু দেশবাসী প্রাণ-সাধনায় এ যুগে বুঝি বা আর অগ্রসর হইতে পারে নাই—তাই মাঝে মাঝে দেশ-মাতৃকা তাঁর করাল-রূপের ছায়াও দেশের উপর ফেলেন—যদি দেশের সন্তান আত্মস্থ হয়, যদি তাদের ঘুমঘোর ভাঙে—যদি তাহারা জাগিয়া উঠিয়া আবার মায়ের চিরসুন্দর রূপের মাধুরী মহিমা উপভোগ করিতে পারে!—

• • • •

শারদীয়ার পর নিশির-স্নেহা পরিপূর্ণ জ্যোৎস্না-ধারার মধ্যে দেবী লক্ষ্মীর আবাহন হইয়াছে। দেশবাসী চিরপ্রচলিত প্রথা অনুসারে আজও দেশের ধান্য সম্পদ, শ্রী ঐশ্বর্য্যদায়িনী দেবী বন্দনা করিয়া থাকে। কিন্তু দেশের কি ভাগ্যদোষে জানি না এই সব বন্দনায় দেশবাসীর প্রাণের অভাব যেন ক্রমেই স্ফুট হইয়া উঠিতেছে। অভাবের তাড়নায়, প্রাণের ঐকান্তিক উৎসাহের অভাবে এ সব পূজাপার্ব্বণের সৌন্দর্য্য-শ্রী যেন ক্রমেই হ্রাস পাইতেছে। আগে বাংলার গ্রামে গ্রামে ঘরে ঘরে দেবী পূজা হইত—আজ অনেক গ্রামই পূজা পার্ব্বণহীন। বাংলার প্রাণের সঙ্গে, দেশের প্রাণশক্তির বিকাশের ও হ্রাসের সঙ্গে দেশের পূজাপার্ব্বণগুলিরও ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আছে। তাহার প্রমাণ আমরা পদে পদে পাইতেছি—অভাব বোধ করিতেছি। দেশবাসীর মধ্যে কিন্তু আজও দেশলক্ষ্মীর—দেশের ধান্য শ্রী, সৌন্দর্য্যের বন্দনার জন্য উন্মুখ হইয়া উঠে—দেশবাসী এখনও আশা করে দেশের হারানো শ্রী আবার ফিরিয়া আসিবে। আবার দেশ তাহার নষ্ট গৌরব ফিরিয়া পাইয়া দেশলক্ষ্মীর বন্দনা করিতে পারিবে।

• • • •

দেশের অভাব অভিযোগ—ব্যাধি পীড়া, তেমনি আছে। দেশের ব্যক্তিগত জীবনে, সামাজিক জীবনে, রাষ্ট্রজীবনে কোন দিকেই বিশেষ কোন আশার চিহ্ন পরিলক্ষিত হইতেছে না। লোকে আশা করিতেছে—একটা কিছু নিশ্চয়ই আসিবে যাহাতে দেশের এই বিষাদ-ভিমিত মরণোন্মুখ অবস্থা দূর হইয়া যাইবে—দেশবাসীর মুখে আবার হাসি ফুটিবে। কিন্তু কতদূর—সে দিন কতদূর!

• • • •

মহাত্মার মন্ত্রশিষ্য আলি ভ্রাতৃদ্বয়ের জ্যেষ্ঠভ্রাতা মৌলানা সৌকত আলিও কারা-মুক্ত হইয়াছেন। মহাত্মা আত্মশক্তিতে এই দুই ভ্রাতাকে দক্ষিণ ও বামবাহু রূপে গ্রহণ করিয়া ভারতব্যাপী অসহযোগ আন্দোলনের এই রূপ দিতে পারিয়াছিলেন। সত্যকথা স্পষ্টভাবে বলিবার সৎসাহস আলি ভ্রাতৃদ্বয়ের আছে। দেশকে মাতাইবার ক্ষমতাও আছে। দেশ ইঁহাদের আন্তরিকতায় বিশ্বাস করে। যে অবস্থায় দেশকে রাখিয়া ইঁহারা দেশ-সাধনার কারাবরণ করিয়াছিলেন আজ সে অবস্থা নাই। আজ মহাত্মা কারাগারে সাধন-সমাহিত। দেশ মুহ্যমান, শক্তির মূল উৎস রুদ্ধ, তাই আগাছায় সব ছাইয়া ফেলিয়াছে। দেশের এই আগাছার বন সরাইয়া ফেলিয়া আলি ভ্রাতৃ-দ্বয়কে এখন উৎস-মুখ ঠিক করিতে হইবে। দেশের লোক অনেক নেতার উপর অনেক আশা করিয়া বিফল মনোরথ হইয়াছে—দেশ ক্রমশঃ আরও পিছাইয়া গিয়াছে। আজ এই নিরাশচিত্তে আশা আনিয়া আমরা মৌলানা সৌকত আলিকে অভিনন্দন করিতেছি।

• • • •

আনন্দবাজার পত্রিকার নামে রাজদ্রোহের মোকদ্দমা উত্থাপিত হইয়াছিল। কলিকাতার প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ রস্সবার্গ এই মামলার বিচার করিয়া পত্রিকাসম্পাদক ও মুদ্রাকরকে মুক্তি দিয়াছেন। মিঃ রস্সবার্গ নানা ভাষাবিদ্ সু-পণ্ডিত ও দক্ষ রাজকর্ম্মচারী এইহা অনেকেই জানেন—কিন্তু ইনি এই মামলায় যে বিচারনৈপুণ্য ও পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়াছেন তাহা সত্যই অপূর্ব্ব। স্বাধীন ইংরেজ স্বাধীনতা ও বীরত্বের মর্য্যাদা বোঝেন, শিক্ষিত ইংরেজের সংবাদপত্রসেবীদের কতটা স্বাধীনের মধ্য দিয়া যাইতে হয় সে জ্ঞানও আছে—মিঃ রস্সবার্গ প্রবন্ধটি ধৈর্য্য ধরিয়া পড়িয়াছেন, তাহার দোষ গুণের নিরপেক্ষ সুন্দর প্রকৃত সমালোচকের মত সমালোচনা করিয়াছেন—সুবিচারের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রাখিয়াছেন।

আমাদের দেশে জেলের অবস্থা ভাল নহে—জেল সংস্কার লইয়া বহু আলোচনা হইলেও জেলবন্দীদের অবস্থার উন্নতি বিশেষ হয় নাই। অথচ কয়েদীরাও মানুষ—তাহারাও মানুষের প্রতি মানুষের ব্যবহারের দাবী করিতে পারে। শুধু অল্প লোক চুরী ডাকাতির দায়ে যতদিন জেলে যাইত ততদিন এ সম্বন্ধে বিশেষ কোন কথা উঠে নাই কিন্তু আজ দেশের নামে অনেক দেশমান্য লোক কারাগারে আবদ্ধ। ইহাদের প্রতি অন্য আচরণ জেলে হইবে ইহা দেশবাসী আশা করিতে পারে। মৌলানা সৌকত আলির মত লোকের পরিধেয় জেল-বাস খুলিয়া বিড়ি অনুসন্ধান সঙ্গত কি? যে সমস্ত উচ্চশিক্ষিত ভদ্র ব্যক্তিদের তিন আইনে আটকরাখা হইয়াছে খবরের কাগজের সংবাদে প্রকাশ তাঁহাদেরও আহার ও বাসের বন্দোবস্ত সুবিধাজনক নহে। রাজবন্দী কতকটা সুবিধা সব দেশেই পাইয়া থাকে—এদেশে তাহা হইতে বঞ্চিত রাখিবার আবশ্যক কি?

* * * *

হাইকোর্টের খ্যাতনামা ব্যবহারজীবী রাসবিহারী সান্যাল মহাশয় পরলোক গমন করিয়াছেন। আইনে ইহার গভীর জ্ঞান ছিল, স্বাধীন চিন্তার জন্য ইনি খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। গত ২৮শে অক্টোবর দার্জ্জিলিংয়ে ইহার মৃত্যু হইয়াছে। আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিজন-বর্গের সহিত সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

* * * *

বিলাতের বর্ত্তমান প্রধান মন্ত্রীর পূর্ব্ববর্ত্তী প্রধান মন্ত্রী মিঃ বোনারল আজ পরলোকে। স্বাস্থ্যভঙ্গ হওয়ার দরুণই ইনি প্রধান মন্ত্রীত্ব হইতে অবকাশ গ্রহণ করেন। ইনি সত্যভীরু সরলচিত্ত ছিলেন। মৃত্যুকালে ইহার বয়স ৬৪ বৎসর হইয়াছিল। এই রাজনীতিকের মৃত্যুতে ইংলণ্ডের ক্ষতি হইল সন্দেহ নাই।

নির্ব্বাচন রঙ্গ

[শ্রীভবতোষ রায় বি-এল,]

পূজাবকাশের পর আমরা আবার নির্ব্বাচন রঙ্গের সাজি নিয়ে দেশবাসীর সম্মুখে উপস্থিত হলেম। আমাদের রঙ্গকথা এতদিন বন্ধ ছিল বটে তবে রঙ্গের নায়ক যারা তাঁরা এই পূজোর সময়েও রঙ্গে কসুর দেন নি একটুও। বরঞ্চ রঙ্গ তাঁদের বিশেষ জোরই চলেছিল এই অবকাশের সময়। এই সময়ে দেশের অনেক গূঢ় গুহ্য কথাই বেফাঁস হয়ে গেছে—ঘরের কথা বের হয়ে পড়েছে। রঙ্গনায়কেরা কেউ সহরে কেউ মফঃস্বলে ভোটদাতাদের দ্বারে দ্বারে ঘুরে ভোট ভিক্ষে করছেন। কেউ মহাত্মার দোহাই দিচ্ছেন, কেউ দেশের দোহাই দিয়ে—পার্টির দোহাই দিয়ে দেশকে কৌশলের মারপ্যাঁচে ঘুরিয়ে স্বরাজ এনে দেবেন ভরসা দিচ্ছেন। ভরসা যাদের নিজেদেরই এতটা অপরের হাতে তাঁরা আবার পরকে এত ভরসা দিচ্ছেন কোন সাহসে তা বোঝা যাচ্ছে না কিন্তু। স্বরাজ্য দল বলে যে একটা দল খাড়া হয়েছে তা স্থান ঐস্থান হ'তে জন কত লোক ধরে ধাঁড় করিয়ে মহাত্মার দোহাই—দেশের দোহাই দিয়ে কাজ গুছিয়ে নিতে সচেষ্ট। কিন্তু দেশবাসী এদের ফুরো কথার চাল অনেকটা বুঝতে পেরেছে—তাই কোন জায়গায়ই আর এরা আসর জমকাতে পাচ্ছেন না। তার উপর কুমিল্লার শ্রীযুক্ত অখিল দত্ত স্বরাজ্যদলের মনস্তত্ত্ব ও উদ্দেশ্য, প্রণালী—সব ব্যক্ত করে হাটে হাঁড়ি ভেঙে দিয়েছেন। স্বরাজ্য দল-নেতা দত্ত মহাশয়ের কাছে টাকা চেয়েছেন, টাকা পেলে তাকে ধাঁড় করাবেন, নইলে ইন্দুবাবুকে ধাঁড় করাবেন ইত্যাদি অনেক কথা বলেন। এ নিয়ে খবরের কাগজে অনেক লেখা-লেখি হয়েছে।—আমরা নীচে পত্রবিনিময়ের কথা এ বিষয়ে উঠিয়ে দিলেম—তা থেকেই পাঠক ভেতরের মজা বুঝতে পারবেন।

শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু ও শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমার সরকার, শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্র দত্তের পত্রের যে উত্তর দিয়াছেন, তাহা

না দিলেই ভাল হইত। তাঁহাদের উত্তরে, বস্তু মহাশয়ের অভিযোগের নিরসন হওয়া দূরে থাকুক, সেগুলি আরও কদর্য্যভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। সুভাষ বাবু ও মিঃ জে, এম, সেনগুপ্ত, অখিল বাবুকে যে টেলিগ্রাম করিয়াছিলেন, সে বিষয়ে একদম চাপিয়া যাওয়া হইয়াছে। দিল্লী-কংগ্রেসে প্রতিনিধি পাঠাইবার গাড়ী ভাড়া বহন না করাতেই যে অখিল বাবুর বর্ত্তমান দুর্দ্দশা, একথারও কোন প্রতিবাদ হয় নাই। এ ছাড়া শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমার তাঁহার পত্রে মিথ্যাকে সত্য প্রমাণ করিবার জন্য যে সব কসরৎ করিয়াছেন, তাহা দেখিয়া হাস্য সম্বরণ করা যায় না! সর্ব্বোপরি—সুভাষ বাবু ও শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমার —স্বদেশ-প্রীতি ও যৌবনের উৎসাহাধিক্যবশতঃ, প্রবীণ অখিলচন্দ্রের উপর যে সব মধুর বিশেষণ প্রয়োগ করিয়াছেন ও তাঁহার সম্বন্ধে যে সব ইঙ্গিত করিয়াছেন, তাহাতে শ্লীলতা ও সৌজন্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছে!

আনন্দবাজার

• • • •

অখিলবাবুর পত্রের জের চলিয়াছে। স্বরাজ্যদলের এক একজন করিয়া ধীরে ধীরে প্রতিবাদ বাহির করিতেছেন। শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমার সরকারও প্রতিবাদপত্র পাঠাইয়াছেন। তিনি বলিতেছেন যে, সুভাষবাবুর কথাই ঠিক; অখিলবাবুর বেয়াড়া ভাবের জন্যই, তিনি মনোনীত হন নাই। কিন্তু জনসাধারণ অখিলবাবুর মনোনয়ন লইয়া তেমন মাথা ঘামায় না। অখিলবাবু নিজেও বোধ হয় জানেন যে, স্বরাজ্যদলের দ্বারা মনোনীত হইলেই তাঁর হাতে প্রার্থিত বস্তু আসিত না। জনসাধারণ জানিতে চাহে যে, টাকার দাবী স্বরাজ্যদল করিয়াছিলেন কি না। টাকা খরচ না করিলে অখিলবাবুকে অকূলে ভাসিতে হইবে কি না। যাহাই হউক সুভাষবাবু যেমনই হউক একটা প্রতিবাদ করিয়াছেন। কিন্তু মিঃ সেনগুপ্ত ও মিঃ দাস এখনও প্রতিবাদ করিতেছেন না কেন? চিত্তরঞ্জন এইবেলা চুপ করিয়াছেন কেন? অখিলবাবু যদি তাঁহার নামে এমন মিথ্যাই রচনা করিয়া থাকেন, চিত্তরঞ্জন তাহার প্রতিবাদ করেন না কেন? তাঁহার সহকর্ম্মীরা ও প্রতিবাদ করিতেছেন, সেই সঙ্গে তাহার মতামতটাও চলিয়া হয় না কেন? চিত্তরঞ্জন পূর্ব্বে আপশোষ করিতেন যে, দেশের সব কাগজই অন্ততঃ বঙ্গীয় কাগজগুলি তাঁহার কথা ঠিক ঠিক উঠায় না—তাঁহার মত ঠিক ঠিক প্রকাশ করে না। কিন্তু সে দুঃখ শেষ হইয়াছে। চিত্তরঞ্জনের 'ফরওয়ার্ড, বাহির হইয়াছে। এই পত্রেই তিনি অখিলবাবুর অভিযোগের উত্তর দিন না? দেশের লোকের শ্রদ্ধা দাবী করিলে, দেশের লোকের কাছে কাজের কৈফিয়ৎ দিতেও প্রস্তুত থাকা চাই।

স্বরাজ

• • •

(ধর্ম্মতলার পথে খোল নিধিরাম
বৈরাগী খঞ্জনীতে তাল ঠুকে গান ধরলেন,)—

তোরা কে বাসন্তী হবি আয়,
'আন-কন্‌টেষ্টেড,' এড়িয়ে যাবি
ভোটাভুটির দায়।
ওরে নগদ দিবি পাঁচটী হাজার,
তার কমে হয় দশটী বেজায়,
জান তো খরচা আছে,—
(আমার) ভেড়া গরু পারের বেলায়।

(রাজনীতির নবরসিক স্বরাজীয়া চেলারা সমস্বরে ধুয়া ধরিল,)—

তোরা কে বাসন্তী হবি আয়, ইত্যাদি—

লোর গোলে রাস্তায় লোক জমে গেল, সবাই বলে, "লীলাময়ের মধুর লীলা"।

এক ছিল বেয়ার ন্যাঠা ঠাঁটা ক্যানভাসার। এগিয়ে এসে বললে প্রভু,—পেরণাম হই; আমার কথাটার কি হল। নিধিরাম উচ্চাঙ্গের কটাক্ষ হেনে বললেন,—হাঁ হ'তে পারে, যদি তোমাদের রাজা দশ হাজার টাকা দেয়, তাহ'লে আমি স্বরাজ্য-মোহনীয়াকে সরিয়ে নেব।"

ক্যানভাসার—"আজ্ঞে আপনার লোকটীর ত কোন আশা নেই—তবু আপনার খাতিরে এক হাজার— ১০০৯

তীব্র কটাক্ষে ক্যানভাসারকে বিদ্ধ করে, নিধিরাম খঞ্জনীতে তালি দিলেন,—আর সঙ্গে সঙ্গে সম্মিলিত গর্জ্জন উঠ্‌লো—

তোরা কে যাবসী হবি আয়,
মরমনসিংহে যাতাযাতি
　　ঘুমিয়া ভেসে যায়,—
ছুটে আয় সব লক্ষীমন্ত,
প্রাণের কর্ত্তা হনুমন্ত—
নথর বপু দুলিয়ে দিয়ে
　　নেচে চলে নদীবায়।
তোরা কে যাবসী হবি আয়।

—•—

(২)

('স্বরাজার্জ্জের' প্রথম 'ইলেক্সান' সঙ্গীত)—

আজোধিয়া! আজোধিয়া,—
'হুইকেকুকা' মাফিক্ তোম কাহে গির গিয়া?
ইয়া বড়ি তাজ্জব কা বাৎ
　　দোস্তি কিয়া কি, এস, আর, কো সাথ?
পিছু সে কি তোর বিঁচা দেবীপ্রসাদিয়া।
　　আজোধিয়া, আজোধিয়া!
মেদিনীপুরসে যাবারা কৌড়ি,
　　দুই আরগা লড়ে চৌড়ি,—
সেইজন্ত হোগা মাড়োয়ারী কাঁদি-লালচিয়া!
যব খাড়েহোকর ওহি দেখ্‌তা,
দেশকে লিয়ে কেয়া কর শক্‌তা,
কৌড়ীজীতো দেশকে লিয়ে জান্ দে দিয়া,—
　　আজোধিয়া। আজোধিয়া।

আনন্দবাজার,

—•—

'স্বরাজ্য' পত্রের সংবাদদাতা স্বরাজ্যদলের পরাজয়ের সম্বন্ধে মনোনয়ন সম্বন্ধে বলিতেছেন—

The people in general are disposed to kick it what they consider the highhanded action of the Sawraj party in thrusting such men for there acceptance, যাহারা দেশের লোকেরাও অবশ্য নিজেদের হিতাহিত বেশই বুঝে, তাহারাও স্বরাজ্যদলের মনোনীত তেমন সব লোককে ঐ দৃষ্টিতেই দেখিবে। যাহারা রাজনীতি ক্ষেত্রে কাজ করিয়া যোগ্যতা দেখাইয়াছেন, কেবল তাহাই নহে, দেশের জন্ত কাজও কিছু করিয়াছেন, তাঁহাদিগকেই সকলে নির্ব্বাচিত করিবে।

মহাত্মার ভূতপূর্ব্ব শিষ্যেরা কেবল মহাত্মার অসহযোগ ছাড়িলেন তাহা নহে, কিন্তু মহাত্মার নীতিজ্ঞান, সত্যপ্রিয়তাও ছাড়িলেন। ধর্ম্মের নূতন ব্যাখ্যা, দেশাত্মবোধের নূতন ব্যাখ্যা আরম্ভ হইল।

স্বরাজ্য দল মহাত্মার অসহযোগ ছাড়িয়াছেন। সেই স্বরাজ্য দলের 'Forward' তাঁহার দলের আদর্শের পরিচয় দিতে গিয়া লিখিয়াছেন, the methods by which we are to stretch out on the path of porgress must therefore vary according to varying circumstances. No method is too mean so long as it advances the nation's plans to reach its goal.

স্বরাজ্য দল কোন পন্থাই নীচ মনে করেন না, যদি তাহাতে করিয়া স্বরাজ্য পথে দেশ অগ্রসর হয়। জানি না, স্বরাজ্য দল মহাত্মা হইতে সম্পূর্ণ নূতন এই প্রকার নীতিজ্ঞানের জন্তই অখিল বাবুর কাছে, মনোনয়নের বিনিময়ে টাকা চাহিয়াছিলেন কিনা। শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জনও বলিয়াছিলেন যে, টাকা পাইলে নির্ব্বাচন 'সিট' বিক্রয় করিবেন। এই নব নীতিজ্ঞানের জন্তই বুঝি দিল্লীতে অধিবেশনের জন্ত ভাড়া করিয়া দেশের অনির্ব্বাচিত প্রতিনিধি (ডেলিগেট) দের লইয়া যাওয়া হইয়াছিল! নাম ভাঁড়াইয়া অন্যের নামে প্রতিনিধিত্ব করিবার উপায় আবিষ্কৃত হইয়াছিল! কোন পন্থাই নিন্দনীয় নহে, এই কথা বলিয়া অনেক অন্যায় ও মিথ্যাচরণ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু তাহাতে যে দেশের কল্যাণ হয় না, তাহা সত্যপ্রিয় যাঁহারা তাঁহারাই জানেন। তাঁহাদের উক্তি—"মিথ্যার দ্বারা কখনো মঙ্গলের, সত্যের প্রতিষ্ঠা হয় না।" কিন্তু স্বরাজ্যদল বলিতেছেন, কোন পন্থাই নীচ নহে। বোধ হয়, দেশের মঙ্গল হইবে ইহা মনে করিয়াই অখিল বাবুর কাছে মনোনয়নের বিনিময়ে স্বরাজ্যদল, অর্থ বা ডেলিগেট প্রেরণ দাবী করিয়াছিলেন। তাইত বলিতে হয়, স্বরাজ্যদল মহাত্মার অসহযোগই কেবল ত্যাগ করেন নাই, মহাত্মার নীতি, যাহা ভিন্ন মতাবলম্বীও শ্রদ্ধা করিত, সেই নীতিই ত্যাগ করিয়াছেন। স্বরাজ

স্বরাজ্য দল এখন নিত্য নূতন কাঁদুনী গেয়ে ভোট ভিক্ষে কচ্ছেন। এক দিকে কাঁদুনী—আবার এক দিকে বলছেন আমরা কার্য্য উদ্ধারের জন্য যে কোন নীচ উপায়ও অবলম্বন কোরবো। উপায় অবশ্য এর মধ্যে তাঁরা অনেক রকমই অবলম্বন কচ্ছেন কিন্তু কোনটাতেই আর হালে পানি পৈ পাচ্ছেন না। আর কোন দিন পাবে যে সে ভরসাও নেই। এত গাঙ্গায় গাঙ্গায় বলে চেঁচিয়ে দেশকে একটা আধ্যাত্মিক তত্ত্ব কথার হেঁয়ালীতে ভুলিয়ে রেখে কংগ্রেসে দলবিচ্ছেদ ঘটিয়ে আত্মম্ভরী চিত্তরঞ্জন আজ অহংএর অহঙ্কারের যে কি মজা সে বেশ ভুগছেন। মহাত্মার আমলের বাংলা দেশের ডিক্টেটর-গিরী দেশবন্ধু আজ অহংএর বিকারে দেশ বিদ্রোহ কর্ম্মের নেতা সেজেছেন। তা বেশ—ফল এর হাতে হাতেই মিলবে।

বড় বাজারের ধনী মাড়োয়ারী জাজোদিয়া মহাশয় শ্রীযুক্ত সতীশ রঞ্জনের নির্ব্বাচন ক্ষেত্র হতে সরে দাঁড়িয়েছেন। খদ্দর পরা সাতকড়ি দীন ভিখারী সেজে দেশের নামে এখন সতীশ রঞ্জনের প্রতিদ্বন্দ্বী। কিন্তু নিজেরাই তারা বলছেন এ যেন হাতীর পাশে মশা দাঁড়িয়েছে। কিন্তু মশা মেদিনীপুরের সিট ছেড়ে এখানে কেন! মশকের চিহ্নও যে থাকবে না! মেদিনীপুরের বন্যার তহবিলের টাকাগুলো কার হেফাজাত ছিল—তার হিসাব—মশা খরচের তালিকা আছে কি! এ কথার উত্তর কে দেবে! মেদিনীপুর বন্যার অর্থভাণ্ডের ভাণ্ডারী—সাতকড়ি পতি রায় ছিলেন না? তার খবর কি? সে ভাণ্ডার কি উবে গেছে?—আজ কড়ির ব্যাঙ্কাস খরচা জুটছে কোত্থেকে? কে তা বহন করে! দেশ কি? দেশ সবে আছে অনেক কিছু—কিন্তু দেশের নামে এ সব আর সইবে কি? সহযোগী নায়ক লিখছেন—

খেজুরাপটী অঞ্চলের দুই একজন মেদিনীপুরবাসী দোকানদার শ্রীযুক্ত সাতকড়ি পতি রায় মহাশয়কে ভোট নাকি দিবেই দিবে।—তবে আর ভাবনা কি? দেশ-বন্ধুর নূতন দলের মুখ ত রক্ষা হইবে! নেই মামার চেয়ে কাণা মামা ভাল নয় কি? সাতকড়ি পতি বাবু কি বলেন? একবার বুকে হাত দিয়া দেখুন—তাঁহার আত্মা তৃপ্ত হইতেছে ত? তিনি মেদিনীপুরের যে অঞ্চলের অধিবাসী—সেই অঞ্চলে তাঁহার প্রভাব প্রতি-পত্তি থাকিতে পারে। কারণ, তাঁহার পল্লীতে, তাঁহার আয়তনে তিনি এরণ্ড হইলেও মহাদ্রুম। তাঁহার মনে রাখা উচিত ছিল—তিনি এমন বড় কাজ কিছুই করেন নাই যে, তিনি তাহার জন্য বড় বাজারের ব্যবসায়ী মহলেও পরিচিত হইয়া পড়িয়াছেন। আমরা জন-কয়েক খবরের কাগজওয়ালা ছাড়া তাঁহার নাম এই কলিকাতা সহরে জানেই বা কে? মিছামিছি এ দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হইয়া তিনি নিজে অপদস্থ ত হইয়াছেনই, পরন্তু কংগ্রেসকেও খাটো করিয়াছেন।

এ ছাড়া বসুমতী, আনন্দ বাজার, হিন্দুস্থান-বাংলার সবগুলো কাগজই দেশ বন্ধুর এই অহংএর অভিযানের বিরুদ্ধে লিখছেন। ক্রমে আমরা সব জানাব—আরো মজা আছে।

গ্রন্থ-আলোচনা

'নিরুপমা বর্ষস্মৃতি'...প্রকাশক বাংলার প্রসিদ্ধ সুরভি দ্রব্য ব্যবসায়ী শর্ম্মা ব্যানার্জ্জি এণ্ড কোং—৬০ ষ্ট্রাণ্ড রোড, কলিকাতা। কলিকাতার প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে ও উপরোক্ত ঠিকানায় প্রাপ্তব্য—মূল্য ১।০ বৎসর বৎসর এই নিরুপমা পুরস্কার বাহির হয়—কিন্তু এবার ইহাঁরা এই বর্ষ-স্মৃতির যে অভিনব প্রকাশ করিয়াছেন তাহা সত্যই অপূর্ব্ব। এমন বিচিত্র সুন্দর নানাবর্ণের ও এক-বর্ণের প্রসিদ্ধ চিত্রকরগণের চিত্র ও বাংলা দেশের খ্যাত-নামা লেখক লেখিকাদের এত সুন্দর লেখা লইয়া আর কোন বর্ষস্মৃতি বাহির হইয়াছে কিনা জানি না। বর্ষ-স্মৃতির ভূমিকায় ঔপন্যাসিক ডাঃ শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সেন ভরিয়া দিয়াছেন। এবার যাঁদের লেখার মালায় 'নিরুপমা' বর্ষকে অমর করিবার আয়োজন করিয়াছেন—তাঁরা অন্ধকারের মুকান আলো নন, অনেকেই কৃতী সাহিত্যিক।...এমন সুন্দর চিত্র বহুল বই বাংলা ভাষায় দুর্লভ। নিরুপমা নামমাত্র মূল্যে পাঠকের হাতে যে সৎসাহিত্য ও মনোজ্ঞ চিত্র তুলিয়া দিতেছেন বাংলায় বোধ হয় তার উপমা নাই।' ভূমিকালেখক নরেশবাবুর সঙ্গে আমরাও একমত। এমন সুন্দর চিত্র ও গল্পের মজুরা নিরুপমা বর্ষস্মৃতি এই সামান্য মূল্যেও হাতে পাইয়া যিনি ঘরে না তুলিবেন তিনি অতি বড় একটা সুন্দর জিনিস হইতে বঞ্চিত রহিলেন সন্দেহ নাই।

নূতন ভাসান

শুধু আমরা ক'জনায় মিলি
অ-সহযোগের গঙ্গা-যাত্রা আর—
ঢাল্লি-কাশী অবর দস্ত
ভাসানে বাধা দেবে যে—তারে করবো খান-খান,
চুর-বিচুর নাম আমাদের—বল লোক-হাসান।।

গাহিব নূতন ভাসান—
দেশ কর্ম্মের অবসান।।
দেশ করবো হেস্ত-নেস্ত

[ভোট রঙ্গ সৌজন্যে

দেশ বিদেশ

কলিকাতায় লাঠি ব্যবহার করা আপাততঃ নিষিদ্ধ হইল। কলিকাতা পুলিসের সরকার ঘোষণা করিয়াছেন যে, ১লা নভেম্বর হইতে ১৯২৪ সালের অক্টোবর মাস পর্য্যন্ত কটিদেশ অপেক্ষা উচ্চ ও ৩ পৌনে এক ইঞ্চির অধিক মোটা লাঠি লইয়া কেহ পথচলাচল করিতে পারিবে না। অর্থাৎ যে লাঠি বাঙ্গালীর একদা প্রধান অস্ত্র ছিল, তাহাও আর বাঙ্গালী ব্যবহার করিতে পারিবে না। বঙ্কিমচন্দ্র এই লাঠির কত গুণই না বর্ণন করিয়াছিলেন। আজ তাঁহার সেই লাঠি হইতেও বাঙ্গালী বঞ্চিত হইল। বঙ্কিমচন্দ্র 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্রের ঋষি বলিয়াই কি তাঁহার লাঠিও নিষিদ্ধ হইল? বস্তুতঃ লাঠি অনেক সময়ে বাঙ্গালীর বল-বুদ্ধি-ভরসা—মান-ইজ্জৎ-রক্ষার প্রধান উপায়। সে লাঠিও গেল। তবে রহিল কি? সরকার শুভাদমনের উদ্দেশ্যে যদি এই ব্যবস্থা করিয়া থাকেন, তবে জনসাধারণের পক্ষে এই অভিনব আইন সহজে হইল কেন? লোক কি এখন হইতে বন্দুকের সাহায্যে শুভাতীতি নিবারণ করিবে? আত্মরক্ষারও কি লোকের কোন অধিকার থাকিবে না? সরকার এক কাজ করুন না। এখন আইন করিয়া দিউন, যাহাতে সহরের লোক ঘরের বাহির হইতে পারিবে না, সর্ব্বদা পর্দ্দানশীল হইয়া থাকিবে, তাহা হইলে সকল গোল চুকিয়া যায়।

বঙ্গবাসী

ম্যাটীয় খবর বিজ্ঞেরেন পেনার্ড আর ইহ জগতে নাই। তিন দিনের ইন্ফ্লুয়েঞ্জা জ্বরে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

৩০এ অক্টোবর ফ্রান্সের ইতিহাসে একটী স্মরণীয় দিবস। ঐ দিন ফ্রান্সে সাধারণ ছুটী ঘোষিত হয়। ফ্রান্স-গণতন্ত্রের প্রথম রাষ্ট্রপতি হইলেন বীরাগ্রগণ্য কার্নোপাস্থ। এই উপলক্ষে ১০১টি তোপধ্বনি হয়। ঐদিন সমস্ত সহরে অতিরিক্ত রক্ষী ও সামরিক আয়োজন প্রয়োজনের ব্যবস্থা হইয়াছিল।

ফরাসীর অবস্থা দিন দিন খারাপ হইয়া উঠিতেছে। একে অন্নবিনের তীব্র হাহাকার ও অর্থসঙ্কট। রাইনল্যাণ্ডের দামোদরে পৃথক পৃথক রাষ্ট্রীয় বন্ধীভূত হইবেন এমনী ভাবের প্রস্তুত স্থানে তাহারা এবনত হোষণা করিতেছে। তাহাদের যে রাজ্যাভ চলিতেছে তাহাদেরও বড় দুরবস্থা হইতেছে।

ইটালীতে ফ্যাসিষ্টি আন্দোলনের ক্রমশঃ প্রসারবৃদ্ধি হইতেছে। গত বৎসর ২৮এ অক্টোবর মুসোলিনির নেতৃত্বে ফ্যাসিষ্টিগণ রোমে অভিযান করিয়া শাসনভার গ্রহণ করে। এক বৎসরে তাহাদের কার্য্যক্ষেত্র অনেক বিস্তৃত হইয়াছে।

এক আমেরিকান গণক ভবিষ্যৎবাণী করিতেছেন ১৯২৫ সালে বহু রাজনৈতিক পরিবর্ত্তন সাধিত হইবে। তন্মধ্যে ফ্রান্সে বিপ্লব ইটালীর পতিবৃদ্ধি, কনষ্টাণ্টিনোপলচ্যুত আমেরিকার সাম্রাজ্যভুক্ত, টার্কের ঐক্যতা-বন্ধন ও আপানের উপর অর্থাৎ এবং তাহার আধীন হইবে।

আবার হিন্দুমুসলমান সংঘর্ষ। ফিরোজপুরে এক কালীবাড়ির হিন্দুরা পূজা করিতেছিল এমন সময় প্রায় ৫০ জন মুসলমান তাহাদের আক্রমণ করে। দেশের লোকের কি কিছুতেই চৈতন্য হইবে না?

সিরাজগঞ্জে পাটের চাষ কমাইবার জন্য মিঃ রে, চৌধুরীর নেতৃত্বে এক সভা হইয়াছিল। পাট যে বঙ্গে কি অনিষ্ট সাধিত করিতেছে, দেশবাসী তাহা বুঝিলেই মঙ্গল।

বেনারসে একব্যক্তি একজন ডাক্তারের নামে এই বলিয়া নালিশ করে যে তিনি আমেরিকান্ বিশ্ববিদ্যালয়ের এল্ বি উপাধি পাইবে বলিয়া তাহার নিকট ১০০৲ লইয়া ৩০৲ মাত্র তদর্থে ব্যবহার করিয়া বাকী ১০০৲ আত্মসাৎ করিয়াছে। প্রতিবাদী বলে তাহার সহিত সর্ত্তই ছিল যে পারিশ্রমিক স্বরূপ সে ঐ টাকা পাইবে। অধিকন্তু বাদী তাহাকে লিখিয়াছিল যে তাহার মাস মোহরাল হইতে সে টাকা দিয়া, সে যেন আমেরিকা হইতে ঘুরিয়া আসিয়াছে। ম্যাজিষ্ট্রেট প্রতিবাদীকে খালাস দিয়াছেন এবং তাহাকে বিদ্যা উপাধি দ্বারা জনসাধারণকে প্রতারিত করিবার অভিযোগে অভিযুক্ত করিয়াছেন।

আগামী বৎসর জামালপুরে একটি মেডিক্যাল স্কুল খোলা হইবে।

আগামী ১৩ই ডিসেম্বর লর্ড রোনাল্ডসে সস্ত্রীক কলিকাতায় আগমন করিবেন।

মৌলভীবাজার থানার অন্তর্গত একটি গ্রামে মোল্লা নামক এক ব্যক্তির গৃহে সম্প্রতি ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। ১০ জন বন্দুক সজ্জিত হইয়া পরিবারবর্গকে মারধর করিয়া নয় টাকা কড়ি ও জিনিষপত্র লইয়া পলায়ন করিয়াছে।

পাঞ্জাবের মন্ত্রী লালাধনিকলাল পদত্যাগ করিয়াছেন। তাঁর স্থানে মোটরের লালা লালচাঁদ মন্ত্রী হইলেন।

গত শাসনীয় সংখ্যা বাসন্তী আমরা অনেক বেশী ছাপিয়াছিলাম কিন্তু অতি অল্প সময়ের মধ্যে শাসনীয় সংখ্যা সব বিক্রয় হইয়া গিয়াছে। সুতরাং শারদীয়ার সংখ্যা কিঃ পিতে পাঠাইবার জন্য কেহ অনুরোধ করিবেন না।

কাশ্মীরের একটি মনোরম দৃশ্য।

সেক্স-সাইকোলজি

[শ্রীঅনিলা দেবী]

উপক্রমণিকা

একদিন একখানি সাপ্তাহিক পত্রের নবীন সম্পাদক পদ্মিনী বিলাসকে বলিলেন, "আপনি এমন সুন্দর লিখিতে পারেন, এমন চমৎকার মিঠা হাত আপনার অথচ আপনি সেই সেকেলে পুরাতন আদর্শ লইয়াই গল্প লিখিতেছেন, সেই হিন্দু বালবিধবার নিষ্ঠা, হিন্দু স্ত্রীর স্বর্গীয় পতিভক্তি, দরিদ্রের উপর প্রবলের অত্যাচার, স্বার্থত্যাগ, এখনকার যাহা যাদুকারী সমস্যা সে সম্বন্ধে যে কিছুই লিখিতেছেন না। আপনি এখন ত সাহিত্য সমাজে সুপরিচিত হইয়া উঠিয়াছেন, এখন সাইকোলজি, বিশেষতঃ সেক্স্ সাইকোলজির উপর গল্পের বনিয়াদ গড়িতে আরম্ভ করুন। বন্ধুর পরামর্শ শুনুন, দেখিবেন অচিরে বাঙ্গালার গৃহে গৃহে আপনার যশসৌরভ ছড়াইয়া পড়িবে। কিন্তু দেখুন প্রথম যে গল্প লিখিবেন, তাহাতে আর কাহারও লাবি-দাওয়া থাকিবে না, সেটীর উপর আমার সম্পূর্ণ অধিকার।

এ সম্বন্ধে আপনাকে আর একটা কথা বলিতে চাই, অবশ্য আধুনিক সমস্ত উপন্যাস নিশ্চয়ই পড়িয়াছেন। তবে আর একবার অমুকের অমুক, অমুকের অমুক, অমুকের অমুক—বইগুলি সেক্স্ সাইকোলজির দিক দিয়া পড়িয়া দেখিবেন। আমার—এ অনুরোধ উপেক্ষা করিবেন না।"

প্রথম পর্ব্ব

পদ্মিনী স্ত্রীভক্তে তখনই সাইকোলজি ও সেক্স্ সাইকোলজির অনুসন্ধানে পুস্তকালয়ের অভিমুখে ধাবিত হইল। সে অনেকদিন হইতে 'সাইকোলজি' ও 'সেক্স্ সাইকোলজি' কথাটি শুনিয়া আসিতেছে—তাহা যে কি জিনিষ তাহা জানিবার কৌতূহল হইলেও, তাহা সংগ্রহ করিবার তেমন আগ্রহ তাহার ছিল না। কিন্তু উক্ত সাপ্তাহিকের সম্পাদকের সৎপরামর্শে সে সচেতন হইয়া উঠিল।

পুস্তকালয়ে গিয়া ক্যাটালগে ঘাগ দিয়া প্রথমে একখানি সাইকোলজি লইয়া পাতা উল্টাইয়া দেখিতে লাগিল। দুই পাতা পড়িয়া বইখানি মুড়িয়া ফেরত দিল। সেক্স্ সাইকোলজির নাম শুনিয়া তাহা কিনিবার উৎসাহ তাহার রহিল না। তবে ক্যাটালগখানি সে সংগ্রহ করিয়া লইয়া গেল।

গৃহে ফিরিয়া সে স্থির করিয়া রেখিল, ও সব ছাই বই নাই পড়িলাম, নাই বুঝিলাম—নামগুলি মুখস্থ করিয়া রাখিলেই কাজ চলিবে। সে দরজা বন্ধ করিয়া ক্যাটালগ লইয়া গ্রন্থকারের নামগুলি পাঠশালার পড়োর মত মুখস্থ করিতে লাগিয়া গেল। প্রথমটা উচ্চারণ লইয়া গোলে পড়িল। তারপর তাহাও এক রকম আয়ত্ত করিয়া ফেলিল, —সে এক মনে কেবলই বলিয়া যাইতে লাগিল, হ্যাভিলক ইলিস, হ্যাভিলক ইলিস, হ্যাভিলক ইলিস—মেরী-ইষ্টপ—

যাহা হউক নামগুলি কোন রকমে ত কণ্ঠস্থ হইয়া গেল, কিন্তু এই সাইকোলজি ও সেক্স্ সাইকোলজি কি যে পদার্থ, তাহাই বুঝিবার জন্য সম্পাদক উপদিষ্ট পুস্তকগুলি আবার গভীর মনোযোগ সহকারে পড়িতে আরম্ভ করিল। পদ্মিনী বিলাসের একটা মস্ত বড় গুণ ছিল, সে চট করিয়া কাহারও লেখার খাঁজটি নিজস্ব করিয়া লইতে পারিত। এইবার তাহার চোখ খুলিয়া গেল।

মাসখানেক পরে পদ্মিনীর এক বন্ধু কহিল, "কি হে তোমার গল্প যে আর বাহির হইতেছে না।"

পদ্মিনী গম্ভীর ভাবে কহিল, "আমি এখন সেক্স্ সাইকোলজির চর্চ্চা করিতেছি। এইবার আর পূর্ব্বেকার মত লেখা বাহির হইবে না।"

বন্ধু হাসিয়া চলিয়া গেল।

দ্বিতীয় পর্ব্ব

ঠাকুরমার পরলোকপ্রাপ্তির পর পদ্মিনী বিলাস নিজের গৃহ হইতে বাস উঠাইয়া লইয়া শ্বশুর গৃহেই অবস্থান করিতে লাগিল। তাহার শ্বশুর সম্প্রতি মারা গিয়াছেন। কাজেই সেখানে সেই কর্ত্রী। সংসারের মধ্যে তাহার ষোড়শী যুবতী স্ত্রী লাবণ্য, দ্বাবিংশ বৎসরের এক বিধবা ননদিনী নিভা ছাড়া আর কেহ ছিল না। নিভা বৎসর দুই হইল বিধবা হইয়া পিতৃব্যের গৃহে আশ্রয় লইয়াছেন। তিনি রূপসী, বিদুষী, তীক্ষ্ণ বুদ্ধিশালিনী, আচার-পরায়ণা। ইতিপূর্ব্বে এই পদ্মিনী নিভাকেই আদর্শ করিয়া হিন্দু-বিধবার চরিত্র নিপুণ তুলিকায় ফুটাইয়া তুলিয়াছে। সত্যই সে নিভাকে বরাবর গভীর শ্রদ্ধার চোখেই দেখিয়া আসিয়াছে। এইভাবে বৎসর দুই কাটিয়া যাইবার পর সাপ্তাহিক সম্পাদক পদ্মিনীর মাথায় সাইকোলজি ও সেক্স্ সাইকোলজি ঢুকাইয়া দিলেন।

নিভা হঠাৎ একদিন পদ্মিনীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "পদ্মিনীবাবু আপনার কি হইয়াছে বলুন ত? আপনি যেন আমার ভিতর কিসের অনুসন্ধান করিতেছেন।"

পদ্মিনী কহিল, "আপনি ঠিক ধরিয়াছেন নিভা দিদি। আমি আপনার সাইকোলজি অনুসন্ধান করিতেছি।"

নিভা হাসিয়া কহিলেন, "আমি বিধবা মানুষ আমার ভিতর আর কি সাইকোলজি পাইবেন।"

পদ্মিনী ব্যথিত কণ্ঠে কহিল, "বলেন কি নিভা দিদি, বিধবা হইয়াছেন বলিয়া কি সাইকোলজি পাথর হইয়া গিয়াছে, তাহার কি আর কোন ক্রিয়া নাই?"

নিভা চট করিয়া ব্যাপারটি বুঝিয়া লইয়া কহিলেন, "ও হরি, এইবার বুঝিলাম বাছিয়া বাছিয়া ঐ সব উপন্যাস পড়িবার এত ঝোঁক হইয়াছে কেন? দেখা যাক্, আপনার সাইকোলজির দৌড় কত দূর।"

দিন দুই পরে বাড়ীর পুরাতন ভৃত্য সনাতনকে উদ্দেশ করিয়া লাবণ্য কহিল, "সনাতনদা—সাবুটুকু খাইয়া ফেল, কিছু না খাইলে যে বড় দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে।"

কথাটা পদ্মিনীর কাণে গেল। সে তড়াক করিয়া লাফাইয়া উঠিয়া এমন এক স্থানে গিয়া দাঁড়াইল, সে স্থান হইতে লাবণ্য ও সনাতনকে বেশ সুস্পষ্টভাবে দেখা যায়। পদ্মিনীর মনের মধ্যে ক্রিয়া চলিতে লাগিল। এইরূপ চাহনি ও অনুরোধের সাইকোলজি কি? সেক্স্ সাইকোলজি কি বলে, অনুরাগের সূচনা, ইহার ক্রিয়া অতি দ্রুতগামী। আচ্ছা দেখা যাক্। পদ্মিনী সতর্ক হইয়া রহিল।

ঘণ্টা দুই পরে লাবণ্য আর একবার সনাতনের শিয়রের কাছে দাঁড়াইয়া কহিল, "সবই ত পড়িয়া রহিল—সনাতনদা খেয়ে ফেল।"

সনাতন রুদ্ধ কম্পিত কণ্ঠে কহিল, "খাচ্ছি দিদি।"

পদ্মিনী মাথা নাড়িতে নাড়িতে আপন মনে বলিতে লাগিল, ওসব দাদা দিদি বলিলেও সেক্স্ সাইকোলজির মধ্যেই পড়িতে হইবে।—'মা', 'বাপ আমার' বলিয়াও পরিত্রাণ পায় না—তার দাদা আর দিদি। আচ্ছা দেখা যাক্।

গভীর রাত্রে বিনিদ্র পদ্মিনী দেখিল, তাহার পত্নী শয্যা ত্যাগ করিয়া কোথায় যাইতেছে। পদ্মিনীর মাথার মধ্যে সেক্স্ সাইকোলজি তখন বোঁ বোঁ করিয়া পাক খাইতে লাগিল। নিশ্চয়ই সনাতনের কাছে যাইতেছে? ঐ ত সনাতনের কাতর কণ্ঠস্বর—ও আঃ মাগো! পদ্মিনী পা টিপিয়া টিপিয়া অতি সন্তর্পণে পত্নীর অনুসরণ করিল।

লাবণ্য সনাতনের শিয়রের কাছে বসিয়া পড়িয়া তাহার কপালে হাত দিয়া কহিল, "সনাতন দাদা এই যে আমি, বড় কষ্ট হইতেছে, না?"

পদ্মিনী আপন মনে বলিয়া উঠিল, "তাই ত, সেক্স্ সাইকোলজির ক্রিয়া বাষ্পীয়যান অপেক্ষা দ্রুতগামী, না আর না।

ঘরিয়ার মত ছুটিয়া গিয়া লাবণ্যর সম্মুখে দাঁড়াইয়া পদ্মিনী বলিয়া উঠিল, "তবে রে—ছলনাময়ী নারী, আমি—আমি কি সেক্স্ সাইকোলজির কিছু বুঝি না? আমার চোখে ধূলি প্রদান। এখনই গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিব।"

নিভা আসিয়া কখন তাহার পিছনে দাঁড়াইয়াছেন পদ্মিনী তাহা দেখে নাই। হঠাৎ তাঁহার কণ্ঠস্বর শুনিয়া সে চমকিত পুলকিত হইয়া উঠিল।

নিত্য হাসিয়া কহিলেন, "পল্লিনীবাবু ঐখানেই ত, সেক্স্ সাইকোলজির পিণ্ড প্রধান করিলেন।"

পল্লিনী ফিরিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন, "আপনি কি বলিতে চান এই জন্য—"

তাহার কথা শেষ করিতে না দিয়া পল্লিনী তেমনই হাসিমুখে কহিলেন, "নিশ্চয়ই, জন্য আসিয়াও যদি তাহাকে সসম্ভ্রমে গৃহে স্থান না দেন, তাহা হইলে আপনার সেক্স্ সাইকোলজির সাধনা যে বৃথাই হইল।"

পল্লিনী খুসী হইয়া কহিল, "আপনি ঠিক ভুল ধরিয়া দিয়াছেন নিত্য দিদি। এস আমার—ভৃত্য চেয়ে মুক্ত পত্নী, এস, এ গৃহ তোমারই।"

নিত্য হাসিয়া কহিলেন, "কিন্তু ঐ জায়গায়ই আপনার আর একটী ভুল হইয়া গেল, সাবণ্য যে পুরু সনাতন দাসীর সেবা করিতে আসিয়াছে। অদ্য বিশ্রাম করুন, কাল আপনার জন্য মন্বন্তরায়ণের ব্যবস্থা করিব।"

তোমার মুরদ

(বেতালভট্ট)

তুমি নির্মম করে আনচান কর
নারীর মর্ম খোঁচায়ে,
অন্ন বসন দিতে অক্ষম
রয়েছ শাসন উঁচায়ে।
তুমি—লক্ষ্যশূন্য বাক্যবাণীশ ঘুরিয়া বেড়াও পাড়াতে
জাননা কেমন কত ঠেলা ধন দুইবেলা ভাত বাড়াতে।
আমি—পুঁথি তোমার কেমন তা
ছুটো, ছুটো ঘটি, ছেঁড়া কথা,
মাইনেত জানি, তবু ঘরবাকী কোন রূপে রাখি গুছায়ে।

টাকা,—বেশী না আনিলে লয়ে ছেলেপিলে
স্বচ্ছলে চলে কেমনে?
বেটা গয়লার জলো দুধ দেয়
মোরে বকো কোন্ কারণে?
আমি—ধোঁয়ায় কাশিয়া কাঁদিয়া
নিত্য—মরছি রাঁধিয়া রাঁধিয়া
তবু যশ নাই, দোষ দাও, কেন
কাপড় যেইনা কেঁচোয়ে।

রণসমুদ্যমে রুশিয়া

(olga metchnikov হইতে)

[শ্রীমতী সরস্বতী দেবী]

মহামতি টলষ্টয় বলেছেন, 'সমস্ত সৌভাগ্যশালী পরিবারবর্গ তুল্যরূপ। প্রত্যেক দীনপরিবার আপনার বিশেষত্বে হতভাগ্য।' ভগবান করুন যেন একথা জাতি নির্ব্বিশেষে সত্যে পরিণত না হয়।

যুদ্ধ সব সময়ে ভয়ঙ্কর ও বিপদ আপদে পরিপূর্ণ। প্রত্যেক সমরাসক্ত জাতি একথাটা বেশ উপলব্ধি করতে পেরেছেন, আর যুদ্ধ বিভিন্ন জাতির মনে বিভিন্ন প্রকার প্রতিক্রিয়াও আনয়ন করেছে।

রুশির লেখকদিগের মধ্যে টলষ্টয় ও ডোষ্টেভস্কি শ্রেষ্ঠ। তাঁরাই রুশিয়ার স্বরূপ পাশ্চাত্য জাতিবর্গের মধ্যে বিকশিত করেছেন, তাই এই ক্লেশপ্রদ ভীষণ বিপ্লব সময়েও রুশিয়ার অন্তর বিনা আয়াসে বুঝতে পারা যায়।

স্বদেশ হতে আগত কতকগুলো স্মৃতি নিয়ে লিপিবদ্ধ করা গেল, সম্ভবতঃ তার থেকে কিছু আপনারা অবগত হতে পারবেন।

একটা ঘূর্ণিবায়ুর মত যুদ্ধ ঘোষণার বার্ত্তা রুশিয়ার বিস্তৃত ভূখণ্ডের মধ্য দিয়ে ছাড়িয়ে পড়ল।

অসীম নীলিমা বিকট ও ভীষণ কৃষ্ণবর্ণ মেঘে পরিব্যাপ্ত হইল। আর এই অমঙ্গলসূচক অন্তরীক্ষে সম্মিলিত অষ্ট্রো জার্ম্মেন একটা ক্ষুধার্ত্ত গৃধ্রের ন্যায় উড়ে বেড়াচ্ছে; কখন যে হীনবল সাভিয়ার উপর এসে পড়বে তার স্থিরতা নেই।

হঠাৎ এই মেঘ বাত্যা সঙ্ঘোরে ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। ঘটনাবলী বিস্ফোরকারী ক্ষিপ্রতাসহকারে একটির পর একটি দ্রুত অনুধাবন করলে। বেলজিয়াম ও ফ্রান্স অবরুদ্ধ হল; আমাদের পুণ্য মাতৃভূমিকে আক্রমণের ভয় প্রদর্শন করা হল। তারপর আমরা দেখতে পেলাম, এক নিশ্বাসে সমগ্র রুশিয়া নিজেকে শত্রুকবল হতে ত্রাণ করতে এবং বিজয়ী হতে বদ্ধপরিকর হল।

যুদ্ধ চলতে লাগল। দেশের ভেতর দিয়ে একটা উন্মত্ততার গতি প্রবাহিত হল; সেটা কেবল যুদ্ধের উত্তেজনায় নয় তবে একটা কর্ত্তব্যসাধনের আত্মজ্ঞানে।

জনসাধারণের মনে একটা গাম্ভীর্য্য দেখা দিল। প্রত্যেক আননে একটা উৎকণ্ঠার ভাব প্রকটিত হল। তাদের মুখের মৃদুহাসিটুকুও কে যেন চুরি করে নিয়েছে, আর প্রথম থেকেই তাদের কণ্ঠস্বর নেবে এসেছে।

যখন আজ্ঞানুবর্ত্তী হয়ে সৈন্যেরা একটা সঙ্গীতলহরী তুলে পথ দিয়ে চলে যেত তখন যারা দাঁড়িয়ে থেকে তাদের দেখত তাদের নীরব অশ্রুধারায় উভয় গণ্ড সিক্ত হত। সৈন্যেরা মরণকে ভয় করত না কিন্তু একটা রণোন্মত্ততার ভাব ভীষণরূপে তাদের মন অধিকার করেছিল, যদিও তাদের মহানুভাবতা সেটাকে অনেকটা চেপে রেখেছিল। এমন কি সমর বিজয়ী হয়েও তাদের মনে বিন্দুমাত্র শান্তি ছিল না।

জীবন উৎসর্গ করবার বলবতী ইচ্ছা সাধারণের হৃদয় অধিকার করলে। ইহা কেবল পুরুষের নয় স্ত্রীলোক ও বালকদিগের মনও দখল করে বসল। ছেলে, চৌদ্দ, পনের বছরের বালকেরা স্বেচ্ছাসেবক দলে নাম লিখিয়ে উত্তম কার্য্য সম্পাদনে সহায়তা করলে। কখনও তারা যুদ্ধ-ক্ষেত্র লাভ করে সম্মানিত হল, কখন বা বীরের মত প্রাণ-বিসর্জ্জন করে স্বদেশের গৌরব বাড়িয়ে দিলে।

স্ত্রীলোকেরা যুদ্ধক্ষেত্র সৈন্যশ্রেণীমধ্যে কেবল আহতব্যক্তির শুশ্রূষা করে পরিতৃপ্ত হতে পারলেন না, তাঁরা আরও ভীষণ বিপদের সম্মুখে ছুটলেন। শত্রুসৈন্যের গোলা-বর্ষণের মধ্য দিয়ে তাঁরা তাঁদের করুণার কণা বিলাতে লাগলেন। অনেকেই গুপ্তচরের কার্য্য গ্রহণ করলেন, কেহ কেহ আবার ধ-পোত চালকের এমন কি সৈন্যেরও কার্য্য করতে লাগলেন। কোনপ্রকার আত্মদানে তাঁরা নিজেকে কৃতার্থ বলে মনে করতে পারলেন না।

যুদ্ধের সমগ্র বিভীষিকা সত্ত্বেও হিংসা রুশিয়ার লোকের মনে নীচপ্রবৃত্তি আনয়ন করে নি। হৃদয়ের অমূল্যরত্ন সেই মহানুভাবতাকে সমভাবে তাদের মনকে প্লাবিত করতে লাগল।

এইরূপে সীমান্ত হতে অগ্রিবিস্তৃত হয়ে সৈন্যেরা ফিরে

এল। আমি জোর করে বলতে পারিনা যে সেই যুদ্ধের উত্তাপে কখনও সহানুভূতি স্বীয় কার্য্য সম্পাদনে অকৃতকার্য্য হয়েছে। কিন্তু রণধ্বনিকার যখন পতন হল, যখন প্রাণের নবজাগরণ হল তখন শত্রুদিগের ইন্ধনল নির্ব্বাপিত হয়ে গভীর অনুকম্পা ও মর্ম্মভেদী করুণা তার স্থান অধিকার করলে।

অত্যাশ্চর্য্য নম্রতায়, গভীর সহানুভূতিতে এবং নিশ্চিত সহজজ্ঞানে এই সমস্ত সরল, অশিক্ষিত জনসাধারণ জার্ম্মানদের ব্যবহার, বেলজিয়ানদের ও মিত্রশক্তিবর্গের বীরত্ব সম্বন্ধে অশেষ বিবেচনা করে আপনাদের কার্য্য সুসম্পন্ন করেছিল। আসল বন্ধুত্বের আদানপ্রদান তাহাদিগের ও উচ্চতম কর্ম্মচারীবৃন্দের মধ্যে তৎকালে বর্ত্তমান ছিল। রুষ-জাপান যুদ্ধের সময়কার বিরুদ্ধভাব এসময়ে কিছুই ছিল না। কেবল তারা বাধ্যতার ও বলপ্রকাশের বিরুদ্ধে উত্তর করতে ছাড়ত না।

যুদ্ধের প্রকৃত কারণ সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ হয়েও তারা যে উত্তেজিত হয়েছিল তা কেবল যুদ্ধের উৎসাহে নয়। এখন তাদের মত তারা এক উদ্দেশ্য অবলম্বন করেছে। ঔদ্যুসঙ্গিক ভাবে এখন সৈন্য ও কর্ম্মচারীর মধ্যে প্রীতিবন্ধন দৃঢ় হয়েছে।

"অল্পবয়স্ক বালকেরা যেমন তাদের পিতাকে সর্ব্বদাই ঘিরে থাকে তেমনই আমরা আহত কর্ম্মচারীকে বেষ্টন করে থাকি। আমরা প্রত্যেকে জীবন উৎসর্গ করব তথাপি কদাচ তাহাকে পরিত্যাগ করে কোথাও যাব না। আমাদিগের কর্ম্মচারীবর্গ সদাই আমাদের সাথী। কখন কখনও এমন হয় যে আমরা ক্ষুধা তৃষ্ণা নিবারণ করে আরাম উপভোগ করচি কিন্তু তাঁরা তখনও অভুক্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছেন। আমরা যখন তাঁদের খাদ্য নিয়ে এসে দিতাম তখনই তাঁরা অতি আগ্রহের সহিত তাহা গ্রহণ করতেন।" রুশিয় সৈনিকেরা এই কথা বলে গর্ব্ব অনুভব করে থাকে। একটা আত্মদানের সার্ব্বজনিক অভিপ্রায়ে, একটা অন্যের সাধারণ ইচ্ছাশক্তিতে তারা সকলে বদ্ধ হয়েছিল।

যুদ্ধের প্রথমমাসে গভর্ণমেণ্ট জনসাধারণের সঙ্গে নিজেকে সম্মিলিত করে ফেললে।...বিভিন্ন সম্প্রদায় এবং শ্রেণী অভিমান অন্তর্হিত হল। সমস্ত দেশের মধ্যে একই চিন্তা, একই ইচ্ছাশক্তির তরঙ্গ প্রবাহিত হল।

পক্ষান্তরে নৈতিক আচার ব্যবহারেরও কিছু পরিবর্ত্তন সাধিত হল। সুরাসার প্রতিষ্ঠানগুলি উঠে গেল। আমোদপ্রমোদের স্থানগুলিতে লোকসমাগম বিরল হয়ে উঠল। অমায়িকতা ও কার্কশ্য এই সাথীযুগলের সঙ্গে মনোমালিন্যও দেশ হতে অন্তর্হিত হল।

জনসাধারণের হৃদয়ের গুপ্তপ্রদেশে এই ভাবের উদয় হল যে যুদ্ধসময়ে—যেমন পবিত্র উৎসবের পূর্ব্বে—করুণাবিতরণ একান্ত কর্ত্তব্য। আর সেই সময় আমরা লক্ষ্য করেছিলাম যে রুশিয় জনসাধারণ কেমন অপরিসীম সাধুতা ও নৈতিকশক্তিসম্পন্ন ছিল।

রক্তপিপাসু, নিষ্ঠুর, বর্ব্বরোচিত যুদ্ধ এসেছে; এবং দেশবাসীরাও সাহসের একতানে, আত্মদানে, বলে ও মহানুভাবতার সঙ্গে তার সম্মুখীন হয়েছে।

রণসমুদ্যত রুশিয়ার ব্যক্তিবিশেষের হৃদয়ের পরিচয় এই পর্য্যন্ত আজ পেয়েছি।

সমাজ দু'টো বড় ভাগে বিভক্ত :—এক যাদের খিদে কম অথচ খাবার আছে প্রচুর, আর যাদের খিদে খুব বেশী অথচ ঘরে খাবার নেই।

—•—

কতকগুলি ব্যক্তির সমষ্টিই একটা জাতি।

—•—

ব্যবসা বাণিজ্যও একটা খেলা—জিতলেই এর আনন্দ—হারলে নয়।

অধিকাংশ সংস্কারকদের নিয়েই মুস্কিল হচ্ছে এই যে তাঁরা অপর কারো সংস্কারের চেষ্টা নিয়েই নিজেদের সময় আর উৎসাহ বায় করে থাকেন।

—•—

জীবনে যে দুর্ভাগ্যের হাত এড়াইয়া চলিতে পারে—সেই হাসিতে পারে, যে তাহা পারে না তাহার হাসি আসে না।

সংগ্রহ

[শ্রীমানবেন্দ্রনাথ বসু]

কয়েদীর বিয়ে :—কয়েদীদের শুধু কয়েদই খাটতে হয় না, ভাল হয়ে থাকলে বিবাহও কোরতে পারে। ভারতবাসীদের জন্তে যে প্রসিদ্ধ কারাগার সেটা আন্দামানের পোর্টব্লেয়ারে অবস্থিত। যাবজ্জীবনের জন্তেই অধিকাংশ কয়েদী সেখানে প্রেরিত হয়। কোন কয়েদী যদি কিছুকাল বেশ ভদ্রভাবে থাকে তবে তা'কে বিয়ে করবার অনুমতি দেওয়া হয়। ব্যাপারটা একটু যদিও জটীল তবু তাদের কাছে সেটা ভারী মিষ্টি। প্রধান ওয়ার্ডারকে বিয়ের অভিলাষ জানালে, ওয়ার্ডার সাধারণতঃ তা'কে মেয়েদের জেলে নিয়ে যায়। বিবাহার্থী পুরুষ ও মেয়েদের সেখানে সার বেঁধে দাঁড় করানো হয়। পরে পুরুষ কয়েদী তার পছন্দসই কনে বা'র কোরলে স্ত্রী-ওয়ার্ডার মেয়েটীকে জিজ্ঞেস করে ঐ বিবাহে তার মতআছে কিনা। মেয়েটী যদি অমত দেখায় তবে পুরুষ কয়েদী যতক্ষণ না পর্য্যন্ত নির্ব্বাচিত হয়, সকলকে বিবাহের জন্ত অনুরোধ করে। স্ত্রী-কয়েদীরা সাধারণতঃ ওয়ার্ডারদের কাছ থেকে জেনে নেয়, কোন্ দোষের অপরাধে তার নির্ব্বাচিত প্রণয়ীটী অভিযুক্ত হয়েছিল। খুনী, ডাকাত হলে তা'রা তৎক্ষণাৎ সরে পড়ে। প্রেমত বটে!—বিবাহের পর কয়েদী দম্পতীকে কমিশনারের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়। তিনি গাঁট-ছড়া বেঁধে দিলে তা'রা সুখে কালযাপন করে।

—•—

জন্ম-চিহ্ন :—ইল্যাণ্ডের অন্তর্গত কয়েকটা দেশে এখনও ছেলেমেয়েদের জন্ম-চিহ্ন ব্যবহার করা হয়। হয়ত কারুর বাড়ীতে খোকা হয়েছে অমনি সেখবে বাড়ীর দরজায় খানিকটা পশম বাঁধা আছে। পশমটা যদি লাল হয় তাহ'লে বুঝতে হবে খোকা হয়েছে—আর সেটা যদি সাদা হয় তাহলে বুঝতে হবে—খুকী! আমাদের এদেশে—বাড়ীর পুরুষদের মুখ প্রসন্ন থাকলে বোঝা-যায় ছেলে হয়েছে কিন্তু মেয়েদের আনন্দ হলে বুঝতে হবে—মেয়েই হয়েছে।

অদ্ভুত সখ :—ফুটবল খেলা দেখবার সখ এদেশে বড় কম নয়, সেটা জানা যায় ফাটনালের দিন সহরের ট্রামগাড়ীর অবস্থা দেখে। শুধু এদেশ কেন, এমন এক একটা জায়গা আছে যেখানে ঝোঁকটা আরও বেশী! চার্লস মান্‌লি নামক একজন যুবক গতবছরে ফুটবলম্যাচ্ দেখবার জন্তে নিউক্যাসল থেকে কার্ডিফএ গিয়েছিলেন, তা'ও কোন গাড়ীতে নয়, পায়ে হেঁটে। এবারেও তিনি খেলা দেখবার জন্তে ২৯০০ হাজার মাইল ঘুরে একটী জায়গায় পদব্রজে যাত্রা করেছেন।—অন্ত অন্ত পোষাকের মধ্যে তার জুতো চার জোড়া বেশী নিয়েছেন। সখ মন্দ নয়, তবে একটু বিকট—এই যা।

চোখের দ্বারা চরিত্র পরীক্ষা

মানুষের চোখ দেখিলেই তাহার চরিত্র পরীক্ষা করা যায়। মনের ভিতর মানুষের কি ভাব হইতেছে বা হইতেছে তাহা তাহার চোখ দেখিলেই বেশ স্পষ্টতঃ বুঝা যায়। যাহাদের চোখ বড় তাহারা উদার প্রকৃতির। যাহাদের চোখ খুব ছোট ছোট তাহারা অবিশ্বাসী ও লোভী। তাহারা প্রতিবেশীর কেবল অমঙ্গলই চিন্তা করে। যাহাদের চোখ একেবারে ঢুকিয়া গিয়াছে তাহারা বড় চিন্তাশীল। ডারউইন ও গ্লাডষ্টোনের চোখ দূর হইতে দেখিলে বোধ হইত যেন তাহা ভ্রূতে ডুবিয়া গিয়াছে। গোল চক্ষু সুখী ও কর্মপটু লোকের লক্ষণ। যে স্ত্রীলোকের চোখ গোল, তার সৌন্দর্য্য তত বেশী; কিন্তু পুরুষের বড় বড় গোল চক্ষু থাকিলে তাহাকে অব্যবস্থিতচিত্ত বলিয়া বোধ হয়। নীলবর্ণ চক্ষু যাহাদের তাহারা প্রেমিক আবার সেই নীলবর্ণ যদি গাঢ় না হইয়া ফিকেভাবে কোন স্ত্রীলোকের চোখে থাকে, তবে সে স্ত্রীলোক নিষ্ঠুর বলিয়া জানিবে। ধূসরবর্ণ চোখবিশিষ্ট লোক বড়ই বন্ধুপ্রিয় হয়।

থিয়েটার ম্যানেজারের চাতুরী

লণ্ডনের একটি থিয়েটারে প্রথম প্রথম আদৌ লোক হইত না। ম্যানেজার লোক জুটাইবার নানারূপ ফন্দী খুঁজিয়া শেষে বন্ধের টিকিট বিক্রয় বন্ধ করিয়া দিল। যে কেহই থিয়েটারের দিন বন্ধের টিকিট কিনিতে আসিত, টিকিটবিক্রেতা বলিত বন্ধ ভর্ত্তি, সুতরাং টিকিট মিলিবে না। হতাশ হইয়া লোকটী ফিরিয়া গিয়া প্রচার করিত যে, অমুক থিয়েটার এমন ভাল হইয়াছে যে, আজ টিকিটই পাওয়া গেল না। এই ভাবে প্রচার হইতে হইতে সেই থিয়েটারটী বেশ জাঁকালো হইয়া উঠিল।

মাথার ভিতরের ফটো

পাশ্চাত্য চিকিৎসা প্রণালী দিন দিন যেরূপ উন্নতি হইতেছে, তাহা শুনিলে অবাক্ হইতে হয়। সম্প্রতি নিউইয়র্কের হাসপাতালে একটী শিশুর মস্তিষ্কের রোগ হয়। শিশুটির বয়স দশ মাস মাত্র। ডাক্তার বৈদ্যুতিক আলোকের সাহায্যে শিশুটির মস্তিষ্কের ভিতরকার ফটো তুলিয়া তাহাকে তদুপযোগী ঔষধ দিয়া আরাম করিয়া তুলিয়াছেন। এই ভাবে মস্তিষ্কের ফটোগ্রাফ তুলিতে পারিলে মস্তিষ্কের ব্যারাম নির্দ্ধারণে আর কষ্ট পাইতে হইবে না।

পাখী তাড়াইবার আয়না

ইংলণ্ডের লোকে ফলের গাছ হইতে পাখী তাড়াইবার জন্য গাছে আয়না ঝুলাইতে আরম্ভ করিয়াছে। সূর্য্যের কিরণ দোদুল্যমান আয়নায় পড়িয়া নানাপ্রকার বিচিত্র ভঙ্গী করে। তাই দেখিয়া বিহঙ্গকুল ভয়ে উড়িয়া যায়। আয়নার অভাবে পাতলা পরিষ্কার টিনের দ্বারাও এ কার্য্য চলিতে পারে।

• • • •

মহামান্য আগা খাঁ। ভারতের মুসলমানদিগের গুরু। তিনি সম্প্রতি মমতাজ মহল নামে এক ঘোড়-দৌড়ের ঘোড়া ক্রয় করিয়াছেন। মমতাজ ভারতের এক সম্রাটের পত্নী ছিলেন। সম্রাট সাজাহান মমতাজের এমন স্মৃতি রাখিয়া গিয়াছেন যে, ভারতবর্ষ সমুদ্রে তলাইয়া যাইলেও জগতে মমতাজের স্মৃতি থাকিয়া যাইবে। মহামান্য আগা খাঁ মুসলমান হইয়া ঘোটকীর সেই নাম রাখিলেন কিরূপে? মুসলমানেরা আপত্তি করিতে পারে।

হিন্দুস্থান

'নিউ এম্পায়রে' খবর বাহির হইয়াছে, কোলোনের নিকট হোয়েনবার্গ নামক স্থানে ৬৮ বৎসর জনৈক বিপত্নীক একটী ২২ বৎসরের যুবতীর পাণিগ্রহণ করেন। এখন রটনায় বলিতেছেন, ঐ বিপত্নীকের ৪০ বৎসর বয়স্ক পুত্র ঐ যুবতীর মাতাকে বিবাহ করে! এক্ষণে মাতা হইতেছে পুত্রবধূ আর কন্যা হইতেছে শাশুড়ী। তারপর আরও মজা আছে, এই ২২ বৎসরের যুবতী ইতিমধ্যেই একটী কন্যা সন্তান প্রসব করিয়াছে! এই কন্যাটির দিদিমা তাহার ভ্রাতৃবধূ হইলেন। এক্ষণে এই শিশু কন্যার দিদিমা ভ্রাতৃবধূ যদি একটী সন্তান প্রসব করেন, তবে উহার সঙ্গে ঐ শিশু কন্যার ও তাহার মাতার কি সম্বন্ধ হইবে? ঠিক এক এমনই ধাঁধার প্রশ্নই বেতাল পঞ্চবিংশতিতে আছে। বেতালের সেই প্রশ্নের উত্তর রাজা দিতে পারেন নাই, যদিও রাজা আর রাজপুত্র উক্ত রূপেই কন্যা ও মাতাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। সেই বেতালের ভূত কি আবার আসিবে?

• • • •

একজন অতি শিক্ষিত (highly educated) বাঙ্গালী যুবক দয়া করিয়া একটী পাত্রীর সন্ধান করিতেছেন, বিবাহ করিবেন। ইংরেজী কাগজে বিজ্ঞাপন ছাপাইয়াছেন। তিনি ভাগ্য অন্বেষণে বিদেশ যাত্রা করিবেন সে জন্য কন্যার পিতার ধনসম্পত্তি এমন কিছু থাকা চাই যাহাতে তাঁহাকে বিলাতে পাঠানো যায়, রাখা যায়, আবার জাহাজ ভাড়া করিয়া আনা যায়। আর কন্যাটিও হওয়া চাই অপ্সরীর মত সুন্দরী, সব দিকে চোখা শিক্ষিতা। ভাবী বর রাজার অর্দ্ধেক রাজত্ব ও রাজকন্যাই দাবী করিতে পারিতেন।

স্বরাজ

দীপালী

[শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায় বি,এ—কবিগুণাকর]

দীপ্ জ্বালারে দীপ্ জ্বালারে
আজ্‌কে দেওয়ালি—
কালী পূজো শব সাধনা—
কেবল হেঁয়ালি।
পারিস্ যদি আন্‌রে ডেকে
খেম্‌টাওলী—এঁকে বেঁকে
নাচুক তারা গাউক্ তারা
ইমন্ কাওয়ালি!
তবু পিয়ালায় 'কারণ' বারি
পান ক'রে তাক্ প্রাণ পিয়ারি—
দেয়াল ঘরে খেয়াল গারে
ওরে খেয়ালি।
জ্বালিয়ে দেরে বিজ্‌লি বাতি
বিজ্‌লি পাখা খোল্!
খেম্‌টাওলীর পায়ের ঘুঙুর
বলুক্ মিঠে বোল্।
তাদের রাঙা অধরপুটে
হাসির জোস্‌না উঠ্‌ক্ ফুটে—
অমার আঁধার পড়ুক টুটি
কারস্‌নাক গোল!
'মেরিজানের' দীপক গানে
জাগ্‌বে তড়িত তোদের প্রাণে—
মরা চ'রেও উঠ্‌বি জেগে
করি কলরোল।

শব সাধনা কালীপূজো
বর্ব্বরতাই খালি,
সত্য কেবল 'কারণ' বারি—
—আর সব কাঁকা বালি।
সত্য কেবল রং তামাসা
খেম্‌টাওলীর চাউনি খাসা—
ওরা ছাড়া দেব দেবী কে?—
ওদের পায়ে ঢালি,
বাওনা বুকের রক্ত দাদা,
হোথা চতুর্ব্বর্গ সাধা—
বাছা বাছা সোনা দিয়ে
সাজাও অর্ঘ্যডালি।
দীপ জ্বালারে দীপ জ্বালারে
আজকে দেওয়ালি—
খেম্‌টাওলী নাচুক্ গাউক্
ইমন কাওয়ালি।
রূপসাগরে ঢেউটী তুলে
পীবর কটি উঠ্‌ক্ দুলে—
শক্তিপূজার প্রধান পীঠ ও
স্বর্গ সোপালি—
কে বলে এ বাংলা শ্মশান?
অমন সুখের অমন নিশান—
সকল মুস্কিল হবে আসান
তবু কি বাজালি!

নারী ও পুরুষের জীবনে—শোনা যায় সত্যি ভালবাসা শুধু একবারই আসে—কিন্তু সে সত্যি কোন্‌টা তাহা বোঝাই যায়।

সত্যি কথা বলবার একটা বিশেষ বিশেষত্ব আছে—সত্যি কথা প্রায়ই—কমই হোক আর বেশীই হোক অপ্রীতিকর হয়।

ব্যতিক্রম

(উপন্যাস)

[শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্-এ]

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

নির্ম্মল বাড়ী ফিরিয়া দেখিল যে তাহার পিতা মুখখানা অন্ধকার করিয়া বসিয়া আছেন, সে বাড়ীর ভিতর গিয়া দেখিল যে তাহার মাতা বসিয়া কাঁদিতেছেন। সে কলেজ হইতে ফিরিয়া আসিলে ইন্দু তাহার খাবার লইয়া আসিত কিন্তু সে দিন নির্ম্মল চারিদিক খুঁজিয়া দেখিল, ইন্দুকে দেখিতে পাইল না। সে তখন বাহিরে গিয়া তাহার পিতাকে জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা, কি হয়েছে?" গৌরমোহন মুখখানা ভার করিয়াই বলিলেন, "আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত কেবলই আরম্ভ হইয়াছে বাবা।" নির্ম্মল বুঝিল যে কোন একটা গুরুতর ঘটনা ঘটিয়াছে, তখন সে আর কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া মায়ের নিকটে গিয়া বসিল এবং তাঁহার চোখের জল মুছাইয়া দিয়া তাঁহাকে শান্ত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। মাতা শান্ত হইলে সে তাঁহার নিকট জানিয়া লইল যে গৌরমোহন বাবুর নিকট টাকা চাহিয়া না পাওয়ায় ইন্দুর স্বামী নলিনাক্ষ ইন্দুকে মারিয়া তাহার হাতের চুড়ি খুলিয়া লইয়া গিয়াছে। নির্ম্মল তখন মাকে ছাড়িয়া ভগিনীর সন্ধানে চলিল। ইন্দুর শুইবার ঘরের দুয়ারে ঘা দিয়া নির্ম্মল ডাকিল, "ইন্দী, ও ইন্দী, দোর খোল্না দিদি? আমার যে বড় খিদে পেয়েছে? তুই না উঠ্‌লে যে কেউ খেতে দেয় না?" ইন্দু দুয়ারের পাশেই পড়িয়াছিল, সে চাপা গলায় বলিল, "আমার শরীর বড্ড অসুখ দাদা, আজ তুমি নিজে দেখে শুনে খাও।" নির্ম্মল তখন দুয়ারের সম্মুখে পা ছড়াইয়া বসিয়া বলিল, "লক্ষ্মী দিদিমণি আমার, একটিবার ওঠো। মা কেবল কাঁদ্‌ছে, আমার কথাযতো উঠ্‌ল না। আমি সব শুনেছি দিদি, আমায় লুকিয়ে আর কি হবে বল? লক্ষ্মী দিদিটি আমার ওঠো দোর খোল।"

ভ্রাতার উপরোধ এড়াইতে না পারিয়া ইন্দুলেখা যখন ঘরের দুয়ার খুলিয়া দিল তখন তাহাকে দেখিয়া নির্ম্মল রাগে জ্বলিয়া উঠিল। ইন্দুর পরণের শাড়ীখানা প্রায় রক্তে ভিজিয়া গিয়াছে, তাহার নাকের উপর রক্ত জমিয়া আছে, কপালে প্রহারের চিহ্ন আর হাতের মণিবন্ধ কাটিয়া ছিঁড়িয়া গিয়াছে। নির্ম্মল চারি পাঁচ মিনিট ধরিয়া একদৃষ্টিতে তাহার আদরের ভগ্নীর অঙ্গে পতি প্রেমের চিহ্নগুলি দেখিল, তাহার পরে কোন কথা না বলিয়া ইন্দুর হাত ধরিয়া তাহাকে টানিয়া লইয়া চলিল। ইন্দু চিরকাল নির্ম্মলকে ভয় করিত, তাহার হাত ধরিতে সে একবার যন্ত্রণায় উহু করিয়া উঠিয়াছিল কিন্তু দাদার মূর্ত্তি দেখিয়া সে ভয়ে আপত্তি করিতে সাহস করে নাই। নির্ম্মল ইন্দুকে তাহার নিজের ঘরে লইয়া গিয়া তাহার ক্ষতস্থানগুলা ঔষধ দিয়া ধুইয়া দিল এবং মায়ের একখানা কাপড় আনিয়া তাহাকে কাপড় ছাড়িতে বলিয়া নিজে বাহিরে চলিয়া গেল।

বাহিরে তাহাকে দেখিয়া গৌরমোহন বলিলেন, "নির্ম্মল বাবা একবার আমার কাছে বসত!" অনেকদিন গৌরমোহন এত আদর করিয়া পুত্রকে ডাকেন নাই, পিতার মনের গভীর বেদনা বুঝিয়া নির্ম্মলের চোখে জল আসিল, সে কোন কথা না বলিয়া পিতার নিকট আসিয়া বসিল। গৌরমোহন পুত্রের মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল, "বাবা রাগের মাথায় না বুঝে সোনার প্রতিমা সমুদ্রের জলে ফেলে দিয়েছি এখন ত আর উপায় নেই। এখন তুই যা বলবি তাই কোরবো। নির্ম্মল কোথায় কার মেয়ে দেখে মোর পছন্দ হয়েছে, আমাকে খুলে বল্ আমি চেষ্টা করে দেখি পারি কি না?" বাপের কথা শুনিয়া নির্ম্মলের চোখ কাটিয়া জল বাহির হইল, সে কথা কহিতে পারিল না। নিজের কাপড় দিয়া তাহার চোখের জল মুছাইয়া গৌরমোহন আবার জিজ্ঞাসা

করিলেন, "তুই না হয় বিনয়কে একবার ডেকে নিয়ে আয়! সে কি আর আমাদের বাড়ী আসবে না? সে যদি না আসে আমিই না হয় তার কাছে যাব।" নির্ম্মল রুদ্ধকণ্ঠে কহিল, "বিনু যে আর এ বাড়ীর ত্রিসীমানায় আসবে তা বলে বোধ হয় না।" "তবু তুই একবার যা, একবার আমার করে বোলে দেখ্! তখন যদি বিনয়ের বাপকে জিজ্ঞাসা না করে ইন্দুকে তার হাতে সঁপে দিতুম তাহলে আর বৃদ্ধ বয়সে আমার সোনার প্রতিমার লাঞ্ছনা দেখতে হোত না।" বলিতে বলিতে বৃদ্ধ গৌরমোহনের চোখ দিয়া স্রোতের মত জল বহিতে আরম্ভ করিল, নির্ম্মল তাহা দেখিয়া জড়ভরতের মত বসিয়া রহিল।

অনেকক্ষণ পরে গৌরমোহন বলিলেন, "নির্ম্মল তুই তবে বিনয়ের কাছে যা।" নির্ম্মল কলের পুতুলের মত উঠিয়া গেল এবং গাড়ী ডাকাইয়া বিনয়ের বাসায় চলিল। সে যখন বিনয়ের ঘরের কাছে গিয়া উপস্থিত হইল তখন দূর হইতে পরেশবাবুর গলার আওয়াজ পাইয়া দাঁড়াইয়া গেল। নির্ম্মল শুনিল তাহার পরম ভক্ত পরেশচন্দ্র বলিতেছে, "আপনারই রাজ্যি হুজুর, রাজ্যি, পাটরাণী সব হুজুত কেবল হুজুর গিয়ে রাজা হোয়ে বোসলেই হয়। গিন্নিমাও প্রাচীন হয়েছেন এখন আপনাকে সংসারী কোরতে পারলে তিনি বড় দিদিমণিকে নিয়ে কাশীবাস করেন। বড় ভুল হয়ে গেছে হুজুর বড় ভুল হয়ে গেছে। এই ছোট দিদিমণি বুঝলেন কিনা, অতি গোপনে বুঝলেন কিনা, এই চিঠিখানা বুঝলেন কিনা আপনার হাতে দিতে বলেছেন।" পরেশচন্দ্র তাহার ধর্ম্মপিতা আমার পকেট হইতে তাহার নোটবুকখানি বাহির করিয়া একখানি লেপাফা বাহির করিল; লেপাফাখানিতে আতরের গন্ধ এবং তাহার উল্টাপিঠে একটি ছোট কবিতা লেখা—"যাও পাখী উড়ে যাও, পবন গমনে, প্রাণনাথের হাতে দিও অতি সঙ্গোপনে।" লেপাফাখানা খুলিয়া বিনয় দেখিল যে চিঠির কাগজখানা পাতলা তাহার উপরে অত্যন্তাধিক কুহুমবিনে নায়ক নায়িকার চিত্র। চিত্রের নীচে আর একটি ছাপা কবিতা,—

"তুমি হে তমালতরু প্রেম অধিকারী—
আমি যে মাধবীলতা আশ্রিত তোমারি।"

ছাপা কবিতার নীচে বিনয় সম্বোধন দেখিল, "প্রাণেশ্বর!" বিনয় আর পড়িতে পারিল না। এই সময়ে বাসার চাকর আসিয়া বিনয়ের হাতে আর একখানা পত্র দিল, বিনয় পড়িল, "একবার কোন রকমে উঠে এস আমি অনেকক্ষণ বোসে আছি—নির্ম্মলানন্দ।" বিনয় পরেশকে বসাইয়া রাখিয়া উঠিয়া চলিয়া গেল।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

"তোকে একবার আমাদের বাড়ী যেতেই হবে বিনু। বাবা নিজে আমাকে পাঠিয়ে দিলেন।" বিনয় বলিল, "সব বুঝেও তুই কেন অবুঝ ভাই? আর যা করতে বলছিস সবইতো করছি, কেবল ঐটী পারবো না।" "দেখ্ বিনু বিশেষ কোন কারণ না থাকলে আমি তোকে যেতে বলতুম না। আজ আমাদের বাড়ীতে এমন একটা ঘটনা হয়ে গেছে যার জন্য বাবার মত আরও বদ্‌লে গেছে, তিনি তোর সঙ্গে একবার দেখা করবার জন্য বড়ই ব্যস্ত হয়েছেন। তুই না হয় বাড়ীর ভিতর যাস নি?" অনেকক্ষণ ভাবিয়া বিনয় বলিল, "আচ্ছা যাব বাইরের বৈঠকখানা পর্য্যন্ত। যেতে কিন্তু আমার একটু রাত্তির হবে নির্ম্মল।" নির্ম্মল বলিল, "তুই যখন হয় যাস্। আমায় বাঁচালি, তুই না গেলে বাবাকে এখানে নিয়ে আসতে হোতো। ভক্তটিকে বিদেয় করে আসছিস্ তো?" বিনয় বলিল, "তোমার ভক্তটি আজ দূত সেজে এসে উপস্থিত; দেখি কোন রকমে বিদেয় করতে পারি কিনা, তা নইলে তোমার ভক্তের সেবার ব্যবস্থা করে যেতে হবে।" "আমি তবে ঘণ্টা নাগাদ গাড়ী পাঠিয়ে দেবো।" "গাড়ী আর পাঠাতে হবে না আমি নিজেই যাব।"

নির্ম্মল চলিয়া গেল। বিনয় যখন ঘরে ফিরিল তখন পরেশবাবু একটি বিড়ি শেষ করিয়া আর একটা ধরাইয়াছেন, তিনি বিনয়কে দেখিয়া বিড়িটা তাড়াতাড়ি নিবাইয়া ফেলায় বিনয় বলিল, "ওকি করছেন আপনি বিড়ি নেবালেন কেন?" এই বলিয়া সে নিজের পকেট হইতে

সিগারেট বাহির করিয়া পরেশবাবুর মুখে ধরিল। পরেশচন্দ্র চরিতার্থ হইয়া ধূমপান করিতে আরম্ভ করিলেন। সিগারেটটা যখন প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে তখন পরেশবাবু কাজের কথা পাড়িল, তিনি বলিলেন, "গিন্নিমা এবারে বড়ই ব্যস্ত হোয়ে পড়েছেন, দিদিমণিরাও বলে দিলেন আপনাকে একবার যেতেই হবে।" বিনয় একটু হাসিল, সে তখন মনে মনে পরেশচন্দ্রকে অতি শীঘ্র তাড়াইবার উপায় সন্ধান করিতে ছিল; উপায় সন্ধান পাইয়া সে বলিল, "এখন কি কোরে যাই এ বৎসর গরমের সময় অসুখ কোরে পড়া শুনা কিছুই হয়-নি বাড়ী অবধি যেতে পারিনি। আপনি ঘড়িটাকুরপকে বুঝিয়ে বোলবেন এখন গেলে পরীক্ষায় পাশ হবার আশা খুবই কম।" পরেশচন্দ্র কাজের লোক তিনি আদরটা জমাইবার জন্য পূর্ব্ব হইতেই দুচার ফোঁটা চোখের জল যোগাইয়া রাখিয়াছিলেন, এইসব সময় পাইয়া সে অস্ত্রটা ত্যাগ করিলেন; তিনি বিনয়ের হাত ধরিয়া কান্নার সুরে বলিয়া উঠিলেন, "আহা এতটা নিষ্ঠুর হোয়োনা জামাইবাবু দিদিমণি আমাদের বড়ই দুঃখিনী ছ'ছ মাস বয়েস মাথা নেই মুখখানি এমন ছোট কোরে ব্যাড়ায় সেবলে বুক ফেটে যায়।" কথাটা শুনিয়া বিনয় একটু হাসিল—পরেশচন্দ্র তাহা দেখিয়া মনে করিলেন যে বিনয়ের মন টলিয়াছে, তিনি তখন উঠিয়া দাঁড়াইয়া নাকি কান্নাতে কান্নিতে বলিলেন, "একবার চল জামাইবাবু তুমি যাও না বোলে বড় দিদিমণি অবধি কেঁদে সারা।" সারদা সুন্দরী যে তাহার জন্য কতদূর কাঁদিয়া আকুল বিনয় তাহা নিজেই কাশীতে শুনিয়া আসিয়াছিল সুতরাং পরেশচন্দ্রের দুইটা চালই ব্যর্থ হইয়া গেল।

বিনয় উঠিয়া গিয়া বাসার চাকরটিকে পরেশবাবুর জন্য খাবার আনিতে বলিল এবং ফিরিয়া আসিয়া পরেশবাবুকে বলিল, "একটু জল খেয়ে যেতে হবে।" ধূর্ত্ত পরেশচন্দ্র এই সুসংবাদের অপেক্ষা করিতেছিল, তিনি সানন্দে সম্মতি দিলে বাসার চাকর একখানা অসম্ভব বড় থালায় —অতি সুক্ষ্ম দুইটি সন্দেশ লইয়া আসিল; থালার বহর দেখিয়া পরেশচন্দ্রের মুখমণ্ডল আনন্দে দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল কিন্তু সন্দেশের আকার দেখিয়া তাহা আবার সেই অনুপাতে ছোট হইয়া গেল। এই সময়ে বিনয় তাহার ব্রহ্মাস্ত্র ছাড়িল, সে বলিল, "বাসার বামুনটা আবার দুদিন আসেনি আমরা বাজারের খাবার খেয়ে আছি। তা নইলে আপনাকে এই বাসাতে থাকতেই বলতুম্। আপনার বাসাটা কতদূরে?" সন্দেশের আকার দেখিয়া পরেশচন্দ্রের মন এতই ছোট হইয়া গিয়াছিল যে ব্রাহ্মণের পলায়নের কথা শুনিয়া একদণ্ড সে বাসায় তিষ্ঠিতে চাহিল না। তাহার মানসপটে তখন রাত্রিতে ভূরিভোজনের পরিবর্ত্তে এই আকারের দুইটি সন্দেশের চিত্র উদিত হইয়াছিল, পরেশ ভয়ে ভয়ে বলিল, "আমি বড়বাজারের এক আড়তে উঠিছি জামাইবাবু আমার জন্য আর চিন্তা কোরবেন না, আমি আবার কাল আসব, গিন্নিমা অনেক জিনিষপত্তর দিয়ে পাঠিয়েছেন সেগুলা আজ আর বোয়ে আনতে পারিনি।" নিজের ব্যাগটি নীচে রাখিয়া পরেশ যখন উপরে উঠিয়াছিল তখন সে গিন্নিমার আদেশ অবহেলা করিয়াছিল। গিন্নিমা তাহাকে জামাইয়ের সওগাদের কর্দ্দ দিয়া বার বার বলিয়া দিয়াছিলেন যে এই সমস্ত জিনিষ কিনিয়া ছোট জামাইয়ের সম্মুখে হাজির করিয়া তবে যেন সে তাহাকে কোন কথা বলে। বাসা খুঁজিতে বিলম্ব হইয়া যাওয়ায় পরেশ আর বাজার করিতে বাহির হইতে পারে নাই, সে মনে করিয়াছিল যে আজ রাত্রিটা ছোট জামাইবাবুর বাসায় কাটাইয়া সকালে বাজার করিতে যাইবে। পাছে বিনয় মত বদলাইয়া তাহাকে সে রাত্রিতে সেই বাসায় থাকিতে অনুরোধ করে এই ভয়ে পরেশ একসঙ্গে দুইটা সন্দেশ মুখে ফেলিয়া দিয়া বলিল, "আমি তবে এখন আসি জামাইবাবু।" জলের গ্লাসটা শেষ করিয়া পরেশচন্দ্র উর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল, যাইবার সময় ছোট জামাইবাবুর পায়ের ধুলাটা পর্য্যন্ত লইতে ভুলিয়া গেল।

পরেশের পায়ের শব্দ মিলাইয়া গেলে বিনয় খুব একচোট হাসিল, হাসিতে হাসিতে হঠাৎ অন্নদার চিঠিখানার উপর নজর পড়িল, নজর পড়িতেই তাহার হাসি শুকাইয়া গেল। সে পত্রখানা টুকরা টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া একটা পাত্রে রাখিল; তাহার পর প্রত্যেক টুকরা তাল করিয়া জমাইয়া ছাইগুলা একটা পাত্রের

জলে ফেলিল সমস্ত ছাই জলে ভাল করিয়া মিশাইয়া জলটা রাস্তায় ফেলিয়া দিল। তখন সে কাপড় ছাড়িয়া বাহির হইল যাইবার সময় বাসার চাকরকে বলিয়া গেল যে পরেশচন্দ্র আসিলে তাহাকে যেন নীচে বসাইয়া খবর দেয়।

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ

নিশ্মলদের বাড়ীটার নম্বর যদিও ২০৩ চিৎপুর রোড তবুও বাড়ীটা একটা গলির ভিতরে। রাত্রি প্রায় দশটার সময় বিনয় যখন সেই গলির মোড়ে আসিয়া দাঁড়াইল তখন সেখানে লোক জমিয়া গিয়াছিল। ভিড় ঠেলিয়া বিনয় দেখিল যে ভিড়ের মাঝখানে একজন মাতাল হইয়া বক্তৃতা করিতেছে। সে একপাশ দিয়া গলির ভিতরে ঢুকিলে লোকটি তাহার হাত ধরিয়া বলিল "কি হে ইয়ার যাচ্ছ কোথায়? এটা গৌর মোহন মুখুর্জ্জের বাড়ী তা জান?" বিনয় বলিল, "জানি আমি সেইখানেই যাচ্ছি।" মাতাল তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া বলিল, "কেন যাচ্ছ বাবা? এত রাত্রে গৌর মোহন মুখুর্জ্জের বাড়ী যাবার কি প্রয়োজন? রাত্রির নটার পরে সেখানে যাবার কেবল আমারই অধিকার আছে কারণ আমি তার পাড়ে বসে তারই ছোলা খাই, সে অধিকার আর কারও নেই, কারণ তার ছেলে এখনও উড়তে শেখেনি। তুমি এত রাত্রে গৌর মোহন মুখুর্জ্জের বাড়ী যাবে কেন বাপ্? আমার নাম নলিনাক্ষ চাটুজ্জে-বুঝলে কিনা বড় বড় খাম দেখে মহাপ্রসাদ খেয়ে মাথা মুড়িয়েছি। বিনয় তাহার বচন সহ্য করিতে না পারিয়া হাত ছাড়াইয়া চলিয়া গেল মাতাল টলিতে টলিতে তাহার পিছন পিছন গেল। বাড়ীর দুয়ারে নির্ম্মল দাঁড়াইয়া ছিল সে বিনয়কে দেখিয়া বলিয়া উঠিল, "শিগ্‌গির চলে আয়—আজ নলিন বড়ই বাড়াবাড়ি করেছে, আজ টেম্পুকে এমন মেরেছে যে তার ভয়ানক জ্বর এসেছে।" এই সময় নলিনাক্ষ বাড়ীর দুয়ারের কাছে আসিয়া বলিয়া উঠিল, "কি হে নির্ম্মল বাবু কাগজে কি বিজ্ঞাপন দিয়েছিলে? এত উমেদার কেন?" নির্ম্মল বলিল, "নলিন চুপচাপ করে বাড়ীর ভিতর চলে এস, বেশী গোলমাল কোরো না? নলিন দুয়ারের কাছে আসিয়া বলিল, "ঠিক ঠাউরেছি বাবা হা বলিছি ত যে বড় বড় খাম দেখে মহাপ্রসাদের পাত পেতেছিলুম"—নির্ম্মল আর কোন কথা না বলিয়া তাহার হাত ধরিয়া হিড়হিড় করিয়া টানিতে টানিতে বাড়ীর ভিতর লইয়া চলিল, নলিনাক্ষ প্রাণপণে চীৎকার করিতে লাগিল, পাহারাওলা পাহারা-ওলা এই পাহারাওলা, শিগ্‌গির আও আমার হাত মার দিয়া—নির্ম্মল তাড়াতাড়ি বাড়ীর দুয়ার বন্ধ করিয়া দিলে নলিনাক্ষ বিনয়ের মুখের কাছে হাত নাড়িয়া বলিতে লাগিল, "কত অধর্ম্মই করেছিলে চাঁদ এক মহাপ্রসাদ তার ওপর এটোপাত।" নির্ম্মল আর থাকিতে না পারিয়া নলিনের মুখে একটা চড় মারিল, নলিনাক্ষ তৎক্ষণাৎ চিৎ হইয়া পড়িয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিয়া দিল। নির্ম্মল একজন চাকরকে নলিনের মাথায় জল ঢালিতে বলিয়া বিনয়কে লইয়া চলিয়া গেল।

গৌর মোহন বাবু নীচের বৈঠকখানায় ছট্‌ফট্ করিয়া বেড়াইতে ছিলেন কারণ জামাতার সুমধুর বচনগুলি সমস্তই তাহার কাণে পঁহুছিয়াছিল। তিনি নির্ম্মলকে দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন, "ওকে মারলে কেন বাবা? নির্ম্মল মাথা হেট করিয়া বলিল, "আর সহ্য করিতে পারলুম না।" "যে বাঁদরের গলায় মুক্তোর মালা দিয়েছি বাবা এখনও ঢের সহ্য করতে হবে।" এই সময়ে হঠাৎ পিছনে জামাতার কণ্ঠস্বর শুনিয়া গৌর মোহন চমকিয়া উঠিলেন, নলিনাক্ষ ভিজা কাপড়ে চাকরদের হাত ছাড়াইয়া পলাইয়া আসিয়াছিল সে একটা আধা প্রণাম করিল বলিল, "শ্বশুর মশাই শুনিয়াছি দময়ন্তী পুনঃ স্বয়ম্বরা হয়েছিলেন গরীবের চাকরীটি কি গেল বাবা?" গৌরমোহন বাবু অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া চলিয়া যাইবার উপক্রম করিলেন তখন নলিনাক্ষ টলিতে টলিতে পথ আগলাইয়া আবার বলিল,"—

"দময়ন্তী পুনঃ স্বয়ম্বরা?
নিশ্চয় জানেন সমাচার?
বাকি যে মনে পড়ছে না বাবা প্রসঙ্গটার?"

নির্ম্মল আর সহ্য করিতে না পারিয়া, নলিনাক্ষের দিকে ছুটিয়া গেল, গৌর মোহন বাবু হা হা করিয়া উঠিলেন, বিনয়

তাড়াতাড়ি নির্ম্মলকে ধরিয়া ফেলিল। তখন নলিনাক্ষ বলিয়া উঠিল, "মেরনা বাবা মেরনা মনে পড়েছে।"

"পুনঃ স্বচক্ষে—
হেন কথা শুনি নাই কভু"

হাঁ বাবা সত্যর মশাই এখনও স্বস্থর, কি অপরাধ করেছি বাবা মনের দুঃখে বনে যাই তেষ্টা পেলে বনের মধু খাই, মাঝে মাঝে নেশা করে।" এই সময়ে মাথার কাপড় টানিয়া দিয়া ইন্দু সেইখানে আসিয়া নলিনাক্ষের হাত চাপিয়া ধরিল, নলিনাক্ষ হাত ছাড়াইতে গিয়া বলিয়া উঠিল, "বুঝেচি পাজল, বুঝেছি বেজার মধ্যে সতী নাই।" তাহার কথাটা শেষ হইবার পূর্ব্বে নির্ম্মল বিনয়ের হাত ছাড়াইয়া ছুটিয়া আসিয়া নলিনাক্ষের গালে একটা প্রকাণ্ড চড় লাগাইল, ইন্দু সেই সময়ে স্বামীকে রক্ষা করিতে গিয়া তাহার অর্দ্ধেকটা লাভ করিল। ধাক্কাটা সামলাইতে না পারিয়া নলিনাক্ষ বলিয়া উঠিল,—

"শুন প্রিয়ে নহি অপরাধি,
কলির তাড়নে বরাননে।
বনে ফেলে পলাইনু,
জান তুমি—
কেন্দায় কি যেতে পারি তোমা ছেড়ে?"

ইন্দু আর সহ্য করিতে না পারিয়া নলিনাক্ষের দুই হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে লইয়া গেল। বৃদ্ধ গৌর মোহন তখন মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িয়াছেন তাঁহার চোখ হইতে জল পড়িতেছে, তাহা দেখিয়া নির্ম্মল বলিয়া উঠিল, "বাবা ইন্দুকে যাহা খুসি তাহাই বলুক তোমার এ রকম অপমান আমার সহ্য হচ্চে না।" বৃদ্ধ গৌর মোহন চোখ মুছিয়া বলিলেন, "কি করবে বাবা? ওতে ফেলিবার নয়। ইন্দু কোথায় যাবে?" নির্ম্মল উত্তেজিতভাবে বলিয়া উঠিল, "ওকে না হয় আলাদা বাসা কোরে দিন্?" "তা কি হয় একবার রাগের মাথায় ওর সর্ব্বনাশ করেছি এখন আর ওকে বাড়ীর বার কোরতে পারব না।"

নির্ম্মলের বিবাহের সম্বন্ধে গৌরমোহন বাবুর আদেশ লইয়া বিনয় যখন বাসায় ফিরিল তখন রাত্রি বারটা বাজিয়া গিয়াছে।

সুশীতলা

[শ্রীকালিদাস রায়।]

(রত্নাবলী হইতে)

হিমাক্ত বদন তব　　নয়ন উৎপল নব,　　একত্রে সম্ভূত এত　　স্নিগ্ধ শৈত্য গুণোপেত
ও ভুজ মৃণাল ;　　যিলিবে কোথায় ?
করতল রুবেদয়　　রক্তাতঙ্ক উদয়,　　দারুণ অনলদাহে　　তপ্ত তনু, শান্তি চাহে
নখর—প্রবাল।　　জুড়াও এ কায়।

ইণ্ডিয়ান সোপ কোম্পানীর
মেসিনে প্রস্তুত
চন্দন, রয়েলবকুল, মাল্ক ও ভেলভেট সাবান
ব্যবহার করুণ।　　টেলিফোন, ২৪৯৬

"মোসলেম" পত্রিকার সম্পাদক সম্প্রতি বিবাহ করিয়াছেন; বিবাহকালে বর-কন্যা তৃষিত হইয়া কণে: পাণিগ্রহণ করিয়াছেন।

• • • •

রামচরণ শিয়ালদহ ষ্টেশনের নিকট এক কুলীনিবাস হইতে রতনী নামে এক বালিকাকে হরণ করিয়া চম্পট দিয়াছে; বর্ত্তমানে উভয়েই নিরুদ্দেশ। কলিতে কি সকলই উল্টা! রামই করিলেন স্ত্রীহরণ! পুলিশ চুঁরিয়া ফিরিতেছেন!

• • •

সেখ-সাহী এক স্ত্রীলোকের গলা হইতে হার ছিঁড়িয়া লইয়াছিল। তাহার হারের প্রতি এই অনুরাগ দেখিয়া পুলিশ তাহাকে এক জোড়া বালা পরাইয়াছে। এখন তাহার অলঙ্কারের সাধ ইহাতেই মিটিলে বাঁচা যায়!

• • • •

রাধানলাল নামে একটা লোক একখানা জার্ম্মাণ তরবারির সাহায্যে ভয় দেখাইয়া পঞ্চাননের নিকট হইতে পয়সা আদায় করার অভিযোগে ধরা পড়িয়াছে। সর্ব্বনাশ আর কি! একে তরবারি, তাহে জার্ম্মান! বাপ্‌রে! তোমার অদৃষ্টে অনেক দুর্গতি আছে!

জর্ম্মনীর ক্ষতিপূরণ সমস্যার মীমাংসা করিবার জন্য আন্তর্জাতিক কমিটি বসিয়াছে। তাহারা আবার জর্ম্মনীর ধন শোষণের সামর্থ্য সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার জন্য এক কমিটি বসাইয়াছিলেন। সম্প্রতি এক ইস্তাহার বাহির হইয়াছে যে সামর্থ্যানুসন্ধান কমিটির নির্দ্ধারণ মানিয়া লইতে তাঁহারা বাধ্য নহেন। এঁড়ে গরু—না টেনে দোঁ।

অষ্ট্রেলিয়ার ম্যাক্স গর্ডন ও জ্যাক ডানস্টনের মধ্যে মুষ্টিযুদ্ধ হয়। তাহাতে শেষোক্ত ব্যক্তি পরাজিত হন; পরে আঘাতের ফলে হাঁসপাতালে যাইয়া বেচারীর মৃত্যু হইয়াছে। যুদ্ধে মৃত্যু হইলে স্বর্গে যায়; তবে ইহাকেই বলে সুখে থাকিতে ভূতে কিলোয়!

•

এক বক্তৃতায় পরিষদে বলিয়াছেন ক্ষতিপূরণ সমস্যা সম্বন্ধে মিত্রশক্তির যে কিছু একটা বোঝাপড়া হওয়া আবশ্যক এবং সে বিষয়ে আমেরিকার সহযোগ যে বাঞ্ছনীয়, তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু রুহ্রপ্রদেশ অরাজ্য-ভুক্ত না করিলেও পাকাপাকি বন্দোবস্ত না হইলে ফ্রান্স ঐ প্রদেশ হইতে, পামমেকং ন গচ্ছতি'। ভেল দাও ভুল দাও তবী জোলবার নয়।

ছার-কথা

[শ্রীগজেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ]

পাপ বা দোষও একরকম সদাশয়তা। পাপ—ছাড়া দোষ-ছাড়া লোক বড় সদাশয় হয় না।

—•—

শোনা যায় যে নারীর সপত্নী আছে—বা যদি কোন দুজন নারী একজন পুরুষকে ভালবাসে তেমন নারীদের মধ্যে বন্ধুত্ব বা ভাব হতে পারে না।

—•—

জীবনের কতকাংশ সবল পুরুষ নারীদাসত্বে ব্যয় করিয়াছে—আবার কতকাংশে দুর্ব্বল নারীসঙ্গ ত্যাগ করিবার জন্য ব্যাকুল হয়।

—•—

বাচের শক্ত লতা—বৌর শক্ত কথা।

কমেডী—যখন পুরুষ নারীকে ছলনা করে;—

ট্রাজেডী—যখন নারী পুরুষকে ছলনা করে।

—•—

পাশ্চাত্যনারীসমিতির 'হিরো'।

শ্রীমতী বেঁারার ও মেচনিকফ
চার্লস্ র‍্যান কেনেডী ও সেন্সপিয়র
রিচার্ড হার্ডিং ডেভিস ও ইবসেন
এলিসন লোরেট মার্ডেন ও মিলটন
পার্সি ম্যাক্স কর্ডাহাম ও
রিচার্ড ঘাটন ও ওয়েবষ্টার
সিলভানাস ডল, ও হ্যাভলক এলিস,
হপকিনসন স্মিথ ও ই ওবার্গ,

পত্রের চোখে

বরদার আদমসুমারী রিপোর্টে মহাত্মা গান্ধির প্রভাবের কথা স্বীকৃত হইয়াছে। রিপোর্টে লিখিত হইয়াছে যে,—মহাত্মার প্রভাবেই বরোদাবাসিগণের মনে ধর্ম বিষয়ে উদারতা ও পরমত সহিষ্ণুতার ভাব জাগ্রত হইয়াছে। মহাত্মার প্রভাবের আর একটা ফল—হিন্দু সমাজে "অস্পৃশ্যতার" গুরুত্ব অনেকটা হ্রাস হইয়াছে। বোধ হয় বরদারাজ্যে বহুযুগের সামাজিক বা ধর্ম-সংস্কারের আন্দোলনে যাহা হয় নাই,—মহাত্মার প্রভাবে তাহা হইয়াছে। এই মহাত্মা আজ চোর ডাকাতের মত কারাগারে বন্দী!

মহাত্মার প্রভাব ভারতবর্ষেই সীমাবদ্ধ নহে। প্যালেষ্টাইন হইতে এক মুসলমান-সঙ্ঘ ভারতবর্ষে আসিয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন যে,—মহাত্মার নাম প্যালেষ্টাইনের ঘরে ঘরে কীর্তিত হয় এবং তাঁহার প্রভাবেই প্যালেষ্টাইনে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার আন্দোলন শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছে। আর মহাত্মার জন্মভূমিতে তাঁহার প্রবর্তিত বিরাট অসহযোগ আন্দোলনের বেগ, আজ শিক্ষ-প্রতিষ্ঠানগণের অক্ষমতায় মন্দীভূত! অদৃষ্টের পরিহাস নয় কি?

হাঙ্গারীর বুডাপেষ্ট সহর নাকি The city of suicides বা আত্মহত্যার সহর হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তথাকার পুলিশ হিসাব করিয়া দেখিয়াছে যে, ১৯২৩ সালের ৮ মাসের মধ্যে ঐ সহরে ১১৩৪ জন আত্মহত্যা করিয়াছে; এবং প্রত্যহ গড়ে ৭।৮ জন লোক স্বেচ্ছায় জীবনলীলা সম্বরণ করে। ১৯১৭ সালে এই সহরে আত্মহত্যা করিয়াছিল ২৪০ জন। প্রতি বৎসর বাড়িয়া ১৯২২ সালে এই সংখ্যা দাঁড়ায় ১৪৩৮; আর এ বৎসর ৮ মাসেই ১১৩৪ জন মরিয়াছে। আত্মহত্যাকারীদের মধ্যে ছোট ছোট বালক-বালিকাও বিস্তর আছে। অধিকাংশ লোকেই দারিদ্র্য ও অনাহারের জ্বালাতেই না-কি আত্মহত্যা করে।

হাঙ্গেরীর একজন মনীষী (বুডাপেষ্টের প্রেসিডেন্ট ডাঃ ম্যাসারিক) বলিয়াছেন—এই আত্মহত্যার আধিক্য, সভ্যতার বিকলতা ও অধঃপতনই সূচনা করে। রোমক ও গ্রিসীয় সভ্যতার অধঃপতনের যুগেও নাকি এইরূপ আত্মহত্যা সংক্রামক হইয়া উঠিয়াছিল। আমাদের ভারতবর্ষে, বিশেষতঃ বাঙ্গালা-দেশেও আত্মহত্যার সংখ্যা দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে। আগে এদেশে মেয়েরাই বেশীর ভাগ আত্মহত্যা করিত এখন দারিদ্র্য ও অন্নাভাবে পুরুষেরাও আত্মহত্যা করিতেছে। ইহাও কি আমাদের দেশে বর্তমান সভ্যতার ব্যর্থতা ও অধঃপতনের পরিণাম নহে? জীবন-সংগ্রামে অধিকাংশ লোকের অক্ষমতা—জাতির স্বাস্থ্যই সূচিত করে না কি? আনন্দবাজার

'করওয়ার্ডে'র সম্পাদক দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন পৃথ্বীশ-চন্দ্রের জন্মপত্র তাঁহার নূতন কাগজের কপালে আঁটিয়া দিয়া তারনাকুলার কাগজ গুলার উপর চমৎকার সম্প্রীতির পরিচয় দিয়াছেন। আমরা যেজোপটির পৃথ্বীশকে জিজ্ঞাসা করিতেছি—কোন মুহূর্তের বলে যে বাঙ্গালা কাগজগুলা কেবল ব্যক্তিগত গ্লানি-কুৎসারই প্রচারক? 'সোমপ্রকাশে'র দ্বারকানাথ, 'সাধারণী'র অক্ষয়চন্দ্র, 'নববিভাকরে'র গঙ্গাধর, বঙ্গবাসী'র জ্ঞানেন্দ্র-লাল, ত্রৈলোক্যনাথ, যোগেন্দ্রচন্দ্র, হেমচন্দ্র কীরোদচন্দ্র 'হিতবাদী'র কৃষ্ণকমল, কাব্যবিশারদ ও চন্দ্রোদয়, দৈনিক চন্দ্রিকার ক্ষেত্রমোহন সেনগুপ্ত এবং বসুমতীর সুরেশচন্দ্র 'সন্ধ্যার' ব্রহ্মবান্ধব, শ্যামসুন্দর, নবযুগের মনোরঞ্জন-বিপিনচন্দ্র, 'ধর্মের অরবিন্দ ঘোষ প্রভৃতি বাঙ্গালা কাগজের মারফতে কেবলই ব্যক্তিগত নিন্দা ও গ্লানির প্রচার করিয়া গিয়াছে? ইহাদের পদধূলি পাইলে যে শত শত যেজোপটি কৃতার্থ হইয়া যায়। দেশে আজ যে নবভাবের স্রোত বহিতেছে, ইহার ধারক, বাহক ব্যাখ্যাতা ও প্রচারক—এই তারনাকুলার কাগজের দল? সত্যের মুহূর্তের—বাঙ্গালা কাগজওয়ালারা করিয়াছে

কি? একবার গবর্ণমেণ্টকে জিজ্ঞাসা করিও—তোমার কিরিঙ্গী-টোলার ইংরেজীর কদর এ দেশে বেশী, না মাতৃভাষার সেবক এই বাঙ্গালা কাগজওলার কদর বেশী? বাঙ্গালা কাগজওয়ালারা আর কি করিতে পারে ভাই—ঝাঁটার চোটে স্বজাতিনিন্দুক, মাতৃভাষার কলঙ্ককীর্ত্তনকারী ছুঁচারদলকে সাবেস্তা করিতে পারে। যে সুরেন্দ্রনাথের কাছে একদিন সাহেবের বন্ধুকতাঞ্জলি হইয়া বসিয়া থাকিতে, সেই সুরেন্দ্রনাথকে জিজ্ঞাসা করিও—বাঙ্গালা কাগজের কত শক্তি! যেদোপটির জীবকে অগ্রাহ্য করা যায়, কিন্তু তুমি দেশবন্ধু সম্পাদক হইয়া আসরে নামিয়াই মাতৃভাষার সেবক বঙ্গীয় সংবাদপত্রসেবীদিগকে গালি দেওয়া—ইহার চেয়ে দুঃখের বিষয় আর কিছুই নাই। ভারতে দ্বিতীয় চিত্তরঞ্জন—দ্বিতীয় দেশবন্ধু নাই!—অতিকষ্টে আজ তোমাকে 'ছি' বলিতে হইল! আমাদের দেশে প্রবাদ—'যাকে বলিল ছি, তার আর রহিল কি?' নায়ক।

পুলিসের সংখ্যা কমাও।

লক্ষ্ণৌয়ের ২৫ শে অক্টোবরের সংবাদে প্রকাশ, যুক্ত-প্রদেশের গবর্ণমেণ্ট পুলিসের সংখ্যা কমাইবার জন্য যে কমিটি নিয়োগ করিয়াছেন, সেই কমিটি প্রস্তাব করিয়াছেন যে, রেলওয়ে ব্রাঞ্চের ডেপুটী ইনস্পেক্টর জেনারেলের পদ তুলিয়া দিতে হইবে। গ্রাম্য চৌকিদারদের সংখ্যা ৭২হাজার হইতে ৫৩ হাজারে হ্রাস করা হইবে। ১২৩ জন সার্কেল ইনস্পেক্টরের স্থলে ৩৩ জন সার্কেল ইনস্পেক্টর রাখিতে হইবে এবং দেশের বড় বড় সহরে যে সাতটি বড় কোতোয়ালী আছে তাহাতে ইনস্পেক্টরের স্থলে ডেপুটী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট রাখা হউক।

স্ত্রীলোকের সাহস—বার্ম্মার পুলিস বিভাগের রিপোর্টে একটী বর্ম্মিণ স্ত্রীলোকের অদ্ভুত সাহসের কথা বর্ণিত হইয়াছে। একজন বয়স্ক কারেন জাতীয় লোক তাহার স্ত্রীর সহিত ঘরে ঘুমাইতে ছিল। এমন সময় একদল ডাকাত বন্দুক প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র লইয়া তাহার ঘরে ঢোকে। স্ত্রী, তীর ধনু দিয়া একজন ডাকাতকে আহত করে এবং সেই ভয়ে ডাকাতরা ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করে। দুর্ভাগ্যবশতঃ স্ত্রীর স্বামী হাসপাতালে মারা গিয়াছে।

চুম্বন।

(বেতাল ভট্ট)

ওষ্ঠ কম্প করে দেয় সে লো মুদিত-কোরক তন্থ
উষার ললাট মরু গগনে সে আগায় রামধনু।
ওষ্ঠ ধরে করে সে সরস সুধারস বরিষণে
শুওসারে ফুটায় কমল উষালোক পরশনে।
বিনত-চিবুক তুলে ধরে সে যে পুলকের গৌরবে
নাসায় পবন ভরে দেয় ঘোর পারিজাত-সৌরভে।
ওষ্ঠের পরে ওষ্ঠ মেলাক যেমন কনকের মুকুল
আঁখিপাতা হতে ঘুচায় অঙ্গ প্রমত্তবিশেষণ।
লেহন করে লো সে সুধা, অলক বেণীর বাঁধন খুলে
ভুজনব্যাকুল কলাপের মত কণ্ঠ উঠে লো দুলে।
মধুর হরষে নাচে যে পরাণ উরসের সাহসেতে
কোটী বাতায়ন আয়ত নয়ন, অঙ্গে আগায় মেয়ে।

Printed by Bijoy Krishna Dass at the Lakshmibilas Press,
76, Jagannath Dutta Lane, Calcutta.

প্রেমিকা

শিল্পী—শ্রীযোগীন্দ্রনাথ বিশ্বাস

(কমলিনী সাহিত্য মন্দিরের সৌজন্যে)

সচিত্র সাপ্তাহিক পত্রিকা

২য় বর্ষ] ২৪শে কার্ত্তিক শনিবার ১৩৩০, ইং ১০ই নভেম্বর [১৭শ সংখ্যা

আশাহতা

[শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী]

১

কার তরে আর গাঁথ্‌বো মালা বকুলে। \
কে আর আমার আছে সখি! গোকুলে,
কে আর মোরে বাস্‌বে ভাল,
হৃদি আমার কোর্‌বে আলো,
হারিয়েছি সবি সখি। একূলে ও ওকূলে;
গাঁথ্‌বো মালা কাহার তরে বকুলে!

২

কি আর কব, হায়রে! সখি বলিতে!
রাখিনিকো কিছুই আমার বলিতে;
কালো শঠের প্রেমে ভুলে,
সবই দিছি চরণ মূলে,
জানিনিকো আমার কালো আমায় পারে ছলিতে,
ভাবিনি তা, হায়রে! সখি বলিতে!

৩

গেছে কি হায়! একেবারেই কমিয়া,
সজনিলো! আমার বুকে অমিয়া?
রূপে রসে আমার হিয়া—
উঠ্‌ছে নাকি উছলিয়া?
যৌবনেতে দেহলতা পড়্‌ছে নাকি নমিয়া?
একেবারেই গেছে কি তা কমিয়া!

৪

তবে কেন কালো আমায় ভুলিল,
অপর নারী হৃদয় মাঝে তুলিল;
মোহন বাঁশী নিয়ে সাথে,
পালিয়ে গেল মথুরাতে,
কেমন কোরে ব্রজের বাঁধন আপন হাতে খুলিল
কেমন কোরে আমায় কালো ভুলিল!

৫

ব্রজেতে আর র'ইব সখি! কি নিয়ে?
হায়রে! আমি ব্রজের বিধু বিনি এ—
আঁধার ব্রজে, আঁধার মনে,
আধার শুধু তমাল বনে,
আন্‌তে তোরা পারিস্‌না কি চাঁদেরে মোর ছিনিয়ে?
র'ইব সখি! গোকুলে আর কি নিয়ে!

৬

কার তরে আর গাঁথ্‌বো মালা বকুলে?
কে আর আমার র'ইলো সখি! গোকুলে;
কুসুম রচা শয়ন পরে—
র'ইব ব'সে কাহার তরে?
হারিয়েছি সবি সখি! একূলে ও ওকূলে;
গাঁথ্‌বো মালা কাহার তরে বকুলে!

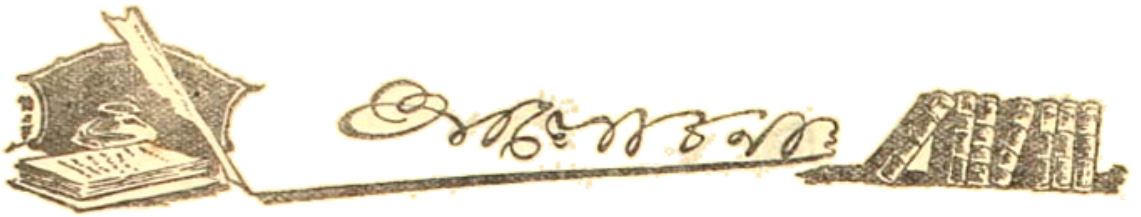

দেশের অন্যতম জননায়ক বরিশালের অশ্বিনীকুমার দত্ত মহাশয় আর নাই। দেশের এই একনিষ্ঠ কর্ম্মীর অভাবে দেশ ক্ষতিগ্রস্ত হইল সন্দেহ নাই। দেশ হইতে যেমন লোকের তিরোভাব ঘটিতেছে তেমন লোকের আবির্ভাব আর হইতেছে না। অশ্বিনীকুমার আদর্শ চরিত্রের পুরুষ ছিলেন, বাংলার রাজনৈতিক আন্দোলন ও সামাজিক আন্দোলনের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। দেশকে ইনি ভালবাসিতেন, শ্রদ্ধা করিতেন এবং ভালবাসা ও শ্রদ্ধার যোগ্য মর্য্যাদাও দেশকে তিনি

বরাবর জীবনে দিয়া আসিয়াছেন। মহাত্মার সত্যাগ্রহকে ইনি আন্তরিকতার সহিত বরণ করিয়া লইয়াছিলেন—দেশভক্তের সম্মান-গৌরব ও লাঞ্ছনা সমভাবেই ইনি জীবনে অবিচলিত নিষ্ঠার সহিত গ্রহণ করিয়াছেন। দেশবাসী অশ্বিনীকুমারের উত্তেজিত মূর্ত্তি কখনো দেখে নাই—শান্ত সুন্দর মূর্ত্তিই দেখিয়াছে। ভক্তিযোগ রচনা করিয়া অশ্বিনীকুমার দেশবাসীর চরিত্র গঠনের অপূর্ব্ব উপাদান রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার এই গ্রন্থ দেশ-বিদেশে সমভাবে আদৃত হইয়াছে। জাতির চরিত্র গড়িয়া উঠিলে জাতীয় দুর্দ্দশা অনেক হ্রাস পাইবে, অশ্বিনীকুমার তাহা বুঝিতেন বলিয়াই দেশবাসীকে এই ভক্তিযোগ দান করিয়া গিয়াছেন। ভগবান তাঁহার আত্মার মঙ্গল করুন। বাংলার জাতীয় জীবনের যে পুরোহিত বাঙ্গালী আজ হারাইল তেমন পুরোহিত সহজে আর দেশ পাইবে না। ১৮৫৬ খৃঃ ২৩শে জানুয়ারী এই দেশকর্ম্মীর জন্ম হইয়াছিল, মৃত্যু হইল ১৯২৩ খৃঃ ৭ই নভেম্বর।

• • • • • • • • • • •

এ্যাঙ্গোরা সম্মিলনের নির্দ্ধারণ ক্রমে তুরস্কে সাধারণ তন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হইল। সাধারণ তন্ত্রের ধর্ম্ম হইবে ইসলাম এবং ভাষা হইবে তুর্ক। সাধারণ তন্ত্রের প্রেসিডেন্ট ডেপুটীদিগের দ্বারা নির্ব্বাচিত হইবেন এবং নির্ব্বাচনের পর চারি বৎসর ঐ পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিবেন। নির্ব্বাচিত প্রেসিডেন্ট দেশের প্রধান হইবেন এবং জাতীয় সমিতি ও মন্ত্রী সভার উপর কর্ত্তৃত্ব করিবেন। কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট ইনিই নির্ব্বাচিত করিবেন। গাজী মুস্তাফা কেমাল পাশা সর্ব্ব সম্মতিক্রমে তুর্ক সাধারণ তন্ত্রের প্রথম সভাপতি হইলেন। ইসমেত পাশা কৌন্সিলের প্রেসিডেন্ট হইলেন। ইসমেত পাশা নূতন সভা সৃষ্টি করিয়া বলিয়াছেন—কথা অপেক্ষা কার্য্য দ্বারাই সাধারণ তন্ত্র লক্ষ্য-পথে অগ্রসর হইবে। প্রাচ্যে আজ এই নব ভাবের নূতন ইসলাম সাধারণ তন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হইল—সাধারণ তন্ত্র ধর্ম্ম-যুক্ত হইয়া জগতে জ্ঞান বিজ্ঞান ও মনুষ্যত্বের প্রচার করুন ইহাই কামনা। তুর্কের খালিফার অবস্থা এখন কি হইবে—তিনি কি শুধু ধর্ম্ম গুরু হইয়াই থাকিবেন—রাজনীতির সঙ্গে বোধ হয় তাঁহার আর কোন সংস্রব থাকিবে না।

• • •

তারতের বাহিরে তারতীয়ের কি অবস্থা হইবে ইহা ভাবিয়া ভাবিয়া অনেক বাক্য ব্যয় ও অশ্রুপাত করিয়া অবশেষে শাস্ত্রী-সাপ্রু প্রভৃতি রাজনীতিকগণ ইণ্ডিয়ান

কন্‌ফারেন্সেও কোন প্রতীকার করিতে না পারিয়া অবশেষে নিরাশ হইয়া পড়িয়াছেন। নিজের ঘর ঠিক না করিয়া বাহির ঠিক করিতে গেলে আশার চেয়ে নিরাশাই বেশী মিলিবে তাহাতে সন্দেহ কিছু নাই। ভারতের ভিতরে শিল্পে, বাণিজ্যে, ব্যক্তিগত ও রাজনৈতিক অধিকারে ভারতীয়ের অধিকার কতটুকু কি ভাবে আছে—তাহাই আগে দেখা হউক পরে ভারতের বাহিরে ভারতীয়ের সম্মান কতটা তাহা দেখিলেই চলিবে। ঘর ঠিক হইলে বাহিরও আপনা হইতেই ঠিক হইবে। নিজে সব ব্যাপারে পর-নির্ভর হইয়া থাকিয়া পরের কাছে মনুষ্যত্বের দাবী করা এ যুগে চলে না এবং তাহাতে কেহ কাণও দেয় না, ভারত আত্মনির্ভরশীল হইতে পারিলে তাহার ও দাবী আপনা হইতেই মিটিবে। ইহা ছাড়া ক্রমশঃ নিরাশা হইতে গভীর নিরাশায় যাইতে হইবে।

* * * * *

জাতি ডুবিল, দেশ ডুবিল, ধর্ম্ম ডুবিল, ভারতীয়েরা ক্রমশঃই ধ্বংসের মুখে অগ্রসর হইতেছে, এমনি নিরাশার কথা ভারতীয়ের অন্তর হইতে প্রতি নিয়তই ধ্বনিত হইয়া উঠিতেছে। দেশবাসী খাইতে না পাইলে পরিতে না পাইলে ভাল ভাবে মানুষের মত থাকিতে না পাইলে তাহাদের প্রাণে আশা উৎসাহ আসিবে কোথা হইতে? দেশের দৈন্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অবসাদ জড়তাও ক্রমে বাড়িতেছে। দেশবাসী দৈন্য মুক্ত হইয়া স্বচ্ছল হইতে পারিলে এ অবসাদ জড়তা ও নিরাশভাব হয়তো ঝাড়িয়া ফেলিয়া আবার সোজা হইয়া দাঁড়াইতে পারে। দেশের জননেতাগণ এজন্য অনেক পন্থা অবলম্বন করিতেছেন—আবার তাহা ছাড়িয়া দিতেছেন। কে জানে কোন পথে চলিলে এ দেশবাসীর মুক্তি আসিবে—কোন্ পথ ধরিলে ইহাদের হা-হুতাশ দূর হইয়া আবার মুখের হাসি ও প্রাণের উৎসাহ ফিরিয়া আসিবে!

* * * *

এবার সমগ্র ভারতব্যাপী কাউন্সিল প্রবেশ লইয়া খুব ধুম পড়িয়া গিয়াছে। ভারতের জননায়ক মহাত্মা গান্ধী বর্ত্তমান ব্যবস্থায় পারচালিত কৌন্সিলে প্রবেশের পক্ষে ছিলেন না। মহাত্মার কারাগমনের পর দেশের নেতৃবৃন্দের অনেকের আর কিছু করিবার নাই দেখিয়া কৌন্সিলে প্রবেশ করিয়া বর্ত্তমান শাসন নীতিকে পঙ্গু করিবার ইচ্ছা হইয়াছে। এ ইচ্ছার পরিণাম কি হইবে কেহ জানে না। তবে এই ব্যাপারে দেশে ছোট ছোট বলিয়া একটা তুমুল রব পড়িয়া গিয়াছে। দেশের ছোটার জনসাধারণ যদি ইহাতে একটু রাজনৈতিক জ্ঞানলাভ করে তবে তাহা মন্দ নহে। দেশের জনসাধারণের উপর যে দেশের শাসন কার্য্য কতকটা নির্ভর করে ইহা দেশবাসীর বোঝা ভাল। বাংলা দেশে এই কাউন্সিল প্রবেশ লইয়া দুইটি দল গড়িয়া উঠিয়াছে। স্বরাজ্যদল এবং কনষ্টিট্যুশনাল দল। দেশের দুইটি তীক্ষ্ণধী এবং কলাকুশলী ভ্রাতা শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন ও শ্রীযুক্ত সতীশরঞ্জন দাস এই দুই দলের নেতা। ইহাদের মধ্যে যিনিই জয়লাভ করুন কাউন্সিল দ্বারা যতটুকু দেশের মঙ্গল সম্ভব তাহা তাঁহারই উপর নির্ভর করিবে।

উচিত ও অনুচিতের প্রশ্ন

[শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়]

ভাল বা মন্দ, সুস্বাদ বা বিস্বাদ, পাপ বা পুণ্য যেমন কাল ও পাত্রের উপর নির্ভর করে। এককালে যেটা ভাল ছিল সেটা আমার মতে অথবা সমাজের অধিকাংশের মতে মন্দ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। শাস্ত্রকার একযুগে যে কার্য্যটাকে বৈধ বলিয়াছেন, যুগান্তরে আবার সেই কার্য্যটাই নিষেধ করিয়াছেন। শরীরের অবস্থার ব্যতিক্রমে কখনো মিষ্ট রস বিস্বাদ হইয়া ওঠে এবং তিক্ত রস সুস্বাদু বলিয়া বোধ হয়। সুতরাং সকল সময়েই দেশ কাল ও পাত্র বিবেচনা করিয়া ভাল ও মন্দের বিচার করিতে হয়, উচিত ও অনুচিতের বিচার করিতে হয়, তাহা না করিলে চলে না। লব্ধপ্রতিষ্ঠ উপন্যাস লেখক শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সুস্বাদুসুস্বরূপে উচিত্য

বিচার না করিয়া লিখিতেন না, তাঁহার "বিরাজবৌ" গল্পটি যখন ভারতবর্ষ পত্রে বাহির হইতেছিল তখন এ সম্বন্ধে "যমুনা" নামক মাসিক পত্রের কার্য্যালয়ে তাঁহার সহিত লেখকের আলাপ হইয়াছিল। দশ বৎসরের ঘটনা, তাঁহার স্মরণ না থাকিতে পারে কিন্তু লেখকের স্মরণ আছে যে, সে সময় তাঁহার যে মত ছিল, প্রতিষ্ঠা-লাভ করিয়া তাহার কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন হইয়াছে। "আধুনিক সাহিত্যের কৈফিয়ৎ"-এ শ্রাবণের "বঙ্গবাণীতে" চট্টোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছেন, "সেই ভাল মন্দ, সেই উচিত অনুচিতের প্রশ্ন; শুধু এই উচিত অনুচিতেই রোহিণীকে গোবিন্দলালের পিস্তলের লক্ষ্য করিয়া দাঁড় করাইয়াছিল। যেখানে ভালবাসা উচিত নয়, সেখানে ভালবাসিবার অপরাধ যতই হোক,—বিশ্বাসহন্ত্রীর ঢের বড় অপরাধ মৃত্যুকালে হতভাগিনীর কপালে বারুণচক্রকে বাসিয়া দিতেই হইল। এই অসঙ্গত অবতরণিকাই আধুনিক সাহিত্যিক স্বীকার করিয়া লইতে পারিতেছে না।"

এইস্থানে শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় দুইটা কথা বলিয়াছেন :—(১) ভাল ও মন্দ, উচিত ও অনুচিতের প্রশ্ন—এই জিনিষটা সাহিত্যসেবীর উচিত নয়; (২), বিশ্বাসহন্ত্রীর অপরাধের শাস্তি যেখানো অবতরণিকা, সেটা অসঙ্গত, হয়তো স্বাভাবিক নহে। এই লেখক রাবীন্দ্রিক ছায়াচ্ছন্ন মোহের ভাব অনুকরণ করিয়া বলিয়াছেন, "ভালমন্দ সংসারে চিরদিনই আছে। হয়ত চিরদিনই থাকিবে। ভালকে ভাল, মন্দকে মন্দ সেও (অর্থাৎ—সাহিত্যিক) বলে; মন্দের ওকালতি করিতে কোন সাহিত্যিকই কোনদিন সাহিত্যের আসরে অবতীর্ণ হয় না।" এই অংশ হইতে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে, ভাল ও মন্দ—এ দুইটা জিনিষ যে এক নয় এ কথাটা চট্টোপাধ্যায় মহাশয় একেবারে অস্বীকার করেন না। কিন্তু বঙ্গবাণীর ৬৮২ পৃষ্ঠার প্রথম প্যারাগ্রাফের আরম্ভেই শ্রদ্ধাস্পদ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় যেভাবে কথাটার অবতারণা করিয়াছেন তাহাতে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে, ভাল ও মন্দের বিচার এবং উচিত ও অনুচিতের প্রশ্ন তাঁহার নিকট এখন অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে। আট বৎসর পরে বাঙ্গালাদেশে ফিরিয়া আসিয়া পরম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের রচনাবলী আদ্যোপান্ত পড়িয়া দেখিলাম যে, তিনি প্রতিপদে ভাল ও মন্দ বিচার করিয়া থাকেন এবং উচিত ও অনুচিতের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা না করিয়া রচনায় প্রবৃত্ত হন না। সুতরাং বঙ্গবাণীতে তিনি যে কথাটা বলিয়াছেন তাহা তাঁহার বলা উচিত হয় নাই, কারণ তাঁহার রচনায় তাঁহার উক্তির মর্য্যাদা রক্ষিত হয় নাই। হইতে পারে মাননীয় শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এখন ভাল ও মন্দ সম্বন্ধে মত পরিবর্ত্তন করিয়াছেন কিন্তু সে পরিবর্ত্তনের কোন আভাস অদ্যাবধি তাঁহার রচনায় পাওয়া যায় নাই। শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের যে সমস্ত রচনা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইয়াছে তাহার বিশ্লেষণ করিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, "আধুনিক সাহিত্যের কৈফিয়তে" তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহা তাঁহার মুখের কথা, মনের কথা নহে। মানুষ যখন বড় হয় —নিজের কৃতিত্বের ও প্রতিভার বলে সে যখন জনসমাজে প্রতিষ্ঠালাভ করে তখন অনেক সময়ে মনের কথা গোপন করিয়া তাঁহাকে নূতন কথা বলিতে হয়। মনীষী শরৎচন্দ্র বঙ্গবাণীতে যে কথা বলিয়াছেন সেটা কি ভাবের কথা তাহা তাঁহার প্রকাশ করিয়া বলা উচিত। শরৎচন্দ্রের রচনাবলীর মধ্যে কোন্‌গুলি বাঙ্গালা সাহিত্যে চিরপ্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে বা করিবে সে সম্বন্ধে মতদ্বৈধ থাকিলেও ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য যে, 'বিরাজবৌ' বাঙ্গালা সাহিত্যের একখানি অতি উপাদেয় গ্রন্থ। তাঁহার সমস্ত রচনা অপেক্ষা 'বিরাজবৌ' বাঙ্গালাদেশে অধিক আদর পাইয়াছে কারণ ১৩২৯ সালের মাঘমাসে তাহার নবম সংস্করণ মুদ্রিত হইয়াছে। বিরাজ বৌ-এর পরিণামে কবির মনে উচিত ও অনুচিতের প্রশ্ন উদিত হইয়াছিল কি না তাহা বাঙ্গালী মাত্রেই বিবেচনা করিয়া দেখুন। এই গ্রন্থের চতুর্দ্দশ অধ্যায়ের প্রথমেই দেখিতে পাওয়া যায় যে,নীলাম্বর যখন বিরাজের কপালে পাপের ছিপ্পা ছুঁড়িয়া মারিল তখন বিরাজ কুটীনী সুন্দরীর বাড়ীতেই চলিয়া গেল, কবি তাহার মুখ দিয়া বলাইলেন "সাধু পুরুষ, আমার হাতের জল পর্য্যন্ত খাবেন না, কিন্তু ঐ পাপিষ্ঠ খাবে ত। বেশ।" সুন্দরী তাহাকে পানসা করিয়া একিবারের বজরায় দিয়া আসিল, বিরাজ তাহাতে আপত্তি করিল না। যে

পাপিষ্ঠের লালসা বিরাজের প্রিয় বিচ্ছেদের একমাত্র কারণ, যাহার মূর্ত্তিমান কাম রাক্ষসমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া পরম বৈষ্ণব নীলাম্বরের মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটাইয়া সতী সাধ্বী বিরাজকে নিদারুণ যন্ত্রণার পরেও পতিদেবতার পদচ্ছায়া-চ্যুত করিয়াছিল, সেই রাজেন্দ্র সেই বিরাজকে নিজের আয়ত্তের মধ্যে পাইয়াও তাহার সহিত প্রেমালাপ করিতে সাহস করিল না কেন? বিরাজ বজরার মধ্যে আসিয়া হঠাৎ ঘুরাম ও রাজেন্দ্রের চক্ষে রণচণ্ডীর মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিল কেন? কবি যদি এখন অস্বীকার করেন যে, তিনি ভালমন্দ বিচার না করিয়া এই অংশ রচনা করিয়াছিলেন তাহা হইলেও আমাকে মুক্তকণ্ঠে বলিতে হইবে যে, তাঁহার কথা সত্য নহে, যেভাবে প্রবুদ্ধ হইয়া তিনি এই গ্রন্থের এই অংশ রচনা করিয়া ছিলেন সেটা সহস্র সহস্র বর্ষ ব্যাপী উচিত অনুচিতের প্রশ্নের ফল, তাহা আর্য্য সভ্যতার ইতিহাসে সুপরিচিত, আর্য্যনারীর মহাআদর্শের অনুকৃতি মাত্র, কবির মানসপটে সতীর রেখাঙ্কিত আদর্শ সতীচিত্রের স্পষ্ট ছায়া।

বিরাজ মরিল কেন? যাহার কলুষিত সংসর্গের ভয়ে প্রবল প্রতাপান্বিত জমিদার রাজেন্দ্রকে সে পতি গৃহের সীমার মধ্যে আসিতে নিষেধ করিয়া দিয়াছিল, যাহার পাপমুখ দর্শনের আশঙ্কায় বিরাজ সরযূতী নদীর জলে অবগাহন পরিত্যাগ করিয়াছিল তাহার অধিকার মধ্যে আসিয়াও বিরাজ অবগুণ্ঠন টানিয়া দিল না কেন, তাহারই আহ্বানে তাহারই সুন্দর সুসজ্জিত বজরার মধ্যে আসিয়া বিরাজ মাতৃনাম উচ্চারণ করিয়া উঠিল কেন এবং অবশেষে আহ্নীর জলে আত্মবিসর্জ্জন দিল কেন? সকল "কেন"র উত্তর নাই। কিন্তু এ "কেনর" অতি সুন্দর উত্তর আছে। কবি হিন্দুর ঘরে ব্রাহ্মণের বংশে জন্মিয়াছেন, তাঁহার রচনা কৌশল সহজাত, যোপার্জ্জিত নহে। ভারতবাসীর মজ্জাগত সংস্কার হইতে তিনিও নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারেন নাই। বিরাজ সতী, তাহার দেহ ও মন পবিত্র। মনে দারুণ আঘাত পাইয়া সে পতিদেবতার চরণপ্রান্ত পরিত্যাগ করিয়াছিল বটে কিন্তু তাহার মন অপবিত্র হয় নাই। দারুণ মানসিক উত্তেজনার বলে সে বলিয়া ফেলিয়াছিল যে, "সাধু পুরুষ, আমার হাতের জল পর্য্যন্ত খাবেন না! কিন্তু ঐ পাপিষ্ঠ খাবে ত।" জাহ্নবীতোয়ঃ সংস্পর্শে শীতলবায়ু তাহার মস্তিষ্কের ক্ষণিক উত্তেজনা শান্ত করিয়া দিয়াছিল, সেইজন্য হিন্দুনারী হিন্দুর আদর্শ সতী সতীধর্ম্মানুসারে জাহ্নবীজলে আত্মবিসর্জ্জন করিতে গিয়াছিল।

যে কবি এখন বলেন যে, তিনি ভাল মন্দের বিচার করেন না, উচিত ও অনুচিতের প্রশ্ন এখন যাঁহার কাছে অনর্থ তিনি তো লালসার লোল রসনার আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী বিরাজ চরিত্র গঠিত করিতে পারেন নাই। কেন পারেন নাই, সে প্রশ্নের উত্তর তিনিই দিতে পারেন, পতিবিদ্বেষ, কেন বিরাজের মন কলুষিতা নারীর চির-সুপ্রমার্গে প্রবাহিত করে নাই, রাজেন্দ্র কেন তাহার ক্ষণিক চিত্তবিকারের সাহায্যে তাহার অকলঙ্ক দেহ ও মন কলুষিত করিতে পারে নাই? নিত্য যাহা হয়, যাহা আমি জানি, বাঙ্গালী পাঠক মাত্রেই জানে, কবি শরৎচন্দ্র অধিক মাত্রায় জানেন, তাহা তিনি কেন করেন নাই? রূপসী বিরাজ স্বীয় মানসমোহিনী শক্তির বলে দুর্ব্বল চিত্ত ইন্দ্রিয়পরায়ণ রাজেন্দ্রকে বশীভূত করিয়া কিছুদিন স্বচ্ছন্দে রাজেন্দ্রের হৃদয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবী হইতে পারিত। বিরাজকে মৃত্যুকালে আর্য্যনারীর চিরবাঞ্ছিত পতিদেবতার চরণপ্রান্তে ফিরাইয়া আনিবার সময়ে কবি কি ভাল ও মন্দের বিচার করেন নাই?—না, তাঁহার মনে উচিত ও অনুচিতের প্রশ্ন উদিত হয় নাই?

শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের রচনাবলীর প্রতিছত্রে ঔচিত্য বিচার স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার সমস্ত গ্রন্থের আলোচনা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের পরিসরের মধ্যে সম্ভব নয়, তাঁহার গুণগ্রাহী—পাঠক যে সমস্ত রচনার প্রশংসা করিয়া থাকে, তাহার মধ্যে আর পাঁচ ছয়খানির উল্লেখ করিয়াই বর্ত্তমান—প্রবন্ধ শেষ করিতে হইবে। "শ্রীকান্তের" প্রথম পর্ব্বের অন্নদা দিদি এমন অপদার্থ স্বামীর অনুসরণ করিয়াছিল কেন? যে স্ত্রীর স্বামী এরূপ অপদার্থ ও দুশ্চরিত্র সে সাধারণতঃ দুশ্চরিত্রাই হইয়া থাকে, সে নারীর পাতিব্রত্য অভাব বিরল, এমন স্ত্রীকে অধঃপতনের পিচ্ছিল পথে নামাইয়া দেওয়াই সহজ কিন্তু কবি তাহা করিতে পারেন নাই কেন? তিনি বলিবেন যে, অন্নদা হাজার

স্ত্রীলোকের মধ্যে একটা, এরূপ অবস্থায় সহস্র নারীর মধ্যে এক নারী একচারিণী বৃত্তি অবলম্বন করে, অন্যথা সে সহস্রের মধ্যে এক। অন্যথা কিন্তু শ্রীকান্তের সহিত শেষ সাক্ষাতের পর যে পত্র লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছিল যে সে পতিব্রতা। এই অশ্লীল অবর্ণের যুগে এই কঠোর পাতিব্রত্যের চিত্রাঙ্কণের কি প্রয়োজন ছিল? তাহার কারণ বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতে গেলে তলে একটা সুদীর্ঘ ঔচিত্যবিচার আর দীর্ঘকালব্যাপী ভাল ও মন্দের প্রশ্নোত্তর মালার চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীকান্তের রাজলক্ষ্মীর প্রসঙ্গ এ ক্ষেত্রে উত্থাপিত হইবে না।

চরিত্রহীনে কিরণময়ীর চরিত্র অঙ্কন করিতে গিয়া কবি শরৎচন্দ্র ভাল ও মন্দের বিচার করিতে গিয়াছেন কি না তাহা দুই একটি কথা ধরিলেই স্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইবে। কিরণময়ী পাপীয়সী, যাঁহারা সাহিত্যের আত্মা রক্ষার জন্য অত্যন্ত ব্যস্ত তাঁহারাই বলেন কিরণময়ী পাপীয়সী, কিন্তু সূক্ষ্ম বিচার করিয়া দেখিলে তাহাকে পাপীয়সী বলা যায় না। হারাণের চিকিৎসার জন্য যে ডাক্তার আসিত কিরণময়ী তাহাকে প্রলুব্ধ করিয়াছিল কিন্তু তাহার স্পর্শে দেহ কলুষিত করিয়াছিল কি? কবি সুকৌশলে দেখাইয়াছেন যে, কিরণময়ী বিষধর সর্প লইয়া খেলা করিত কিন্তু তাহাকে দংশন করিতে দেয় নাই। ডাক্তার খদ্যোতের মত কিরণময়ীর চারিপাশে ঘুরিয়া বেড়াইয়া তাহার পক্ষ দগ্ধ করিয়াছিল, অগ্নির বিশুদ্ধি নষ্ট করিতে পারে নাই। এই ডাক্তাররূপী খেলনাটা পুরাতন হইয়া গেলে কিরণময়ী যখন উপেন্দ্রকে দাবী করিয়া বসিল তখন ডাক্তার জীর্ণবস্ত্রের মত দূরে পরিত্যক্ত হইল কিন্তু সে মলিন বস্ত্রের কালিমার রেখা কিরণময়ীর অঙ্গে লাগিল না। এইরূপ উপেন্দ্র এক ক্রীড়নক, সতীশ আর একজন ক্রীড়নক কিন্তু কিরণময়ীর রূপ তাহাদিগকে জড়াইয়া ধরিতে পারিল না; কিরণময়ী ডাক্তারকে চারে আনিয়া তাহাকে বঁড়শীতে গাঁথিয়া অনেকদিন ধরিয়া খেলাইয়া যেমন করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছিল, উপেন্দ্র বা সতীশকে লইয়া তাহা পারিল কি? তাহার পরে সে যখন তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিবাকরকে ধরিল তখন অনেকদিন খেলা না পাইয়া তাহার মন একটা নূতন ক্রীড়নকের জন্য তৃষিত হইয়াছিল। যখন সে দিবাকরকে পাইয়া বসিল তাহার দেহ যখন প্রেমে পরিণত হইল, তখন তাহার অতৃপ্ত বাসনা অদম্য লালসা আর বহ্নির মত রূপ দুর্ব্বলচিত্ত দিবাকরকে নাগপাশের মত বেষ্টন করিয়া ভস্ম করিল। ধীরে ধীরে কিরণময়ী দিবাকরকে গ্রাস করিয়া বসিল, শেষ রাত্রিতে "কিরণময়ী বিহ্বল দিবাকরের বুকের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া" তাহাকে সর্ব্বগ্রাস করিল। এ ক্ষেত্রে নরনারীর যাহা পরিণাম, তাহা দেখাইয়াও কবি কিরণময়ীর দেহটা পবিত্র রাখিয়াছেন কেন? কিরণময়ী বলিয়াছে, "কিন্তু এ জীবনে, পোড়া দেহটা কি আর ছাই কিছুই চাইলে না, চাইলে শুধু ভালবাসা।" ডাক্তার যে তাহাকে স্পর্শ করিয়া তাহার দেহ কলুষিত করিতে পারে নাই সে কথাও কবি তাহারই মুখ দিয়া বলাইয়াছেন। "এ কামাদবৃত্তি এর কি আমি কিছুতেই ঘুচোতে পারলুম না! আর পারবই বা কি কোরে? আমার 'আদিষ্ট' ত আমি অতিক্রম করতে পারিনে। নইলে, অনঙ্গ ডাক্তারকেও কিনা একদিন মজাতে চেয়েছিলুম!" দিবাকরের বুকের উপরে উপুড় হইয়া পড়িয়া, কর্ম্মার পথে সারাটা পথ তাহাকে নিবিড় আলিঙ্গনে বেষ্টন করিয়া রাখিলাও কিরণময়ী কিন্তু তাহার দেহ কলুষিত করে নাই। উত্তেজিত চিত্ত নরনারী কামজ আলিঙ্গনের নিবিড়তমের মধ্যে অপ্রযুক্ত থাকিতে পারে কিনা সে বিচার পরের কথা, কবি কিন্তু কিরণময়ীর মুখ দিয়াই বলাইয়াছেন, "যেদিন তোমার উপীনদা আমার হাতে তোমাকে প্রথম সঁপে দিয়ে যান, সেই দিন থেকেই তোমাকে ছোট ভাইটির মত নিজের ছেলের মত ভাল বেসেছিলুম। তাই ত এই দু'মাস ধরে এক ঘরে বাস করেও তোমাকে এই দেহটা নষ্ট করতে দিতে পারিনি; —তাই ত, তোমার চোখের সুধায়, তোমার মুখের শেষ নিবেদনে আমার সমস্ত দেহ, ঘৃণায় লজ্জায়, এমন কোরে শিউরে ওঠে!" প্রকৃত হিন্দুর নিকট কিরণময়ী পাপীয়সী, তাহাকেও তাহার সৃষ্টিকর্ত্তা শরৎচন্দ্র পবিত্র রাখিয়া গিয়াছেন কেন? ভাল ও মন্দের বিচার এখন যিনি করেন না, এখন উচিত ও অনুচিতের প্রশ্ন উত্থাপন করিলে যিনি ক্ষুব্ধ হন তিনি কিরণময়ী-চরিত্রাঙ্কণকালে ভাল ও

মন্দের বিচার করিয়াছিলেন কিনা তাহা বঙ্গীয় পাঠকই বিচার করিবেন।

"দেবদাসে"র পার্ব্বতী এবং "মন্তা"র বিজয়া একই ভাবের চিত্র। পার্ব্বতী অবস্থানুসারে ইচ্ছার বিরুদ্ধেও গত্যন্তর গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিল কিন্তু সে পতি কখনো প্রকৃত পতিত্ব লাভ করেন নাই। তাঁহার কাল রোগ ছিল কিনা কবি সে কথাটা স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দেন নাই মাত্র, অথচ পার্ব্বতী সতী, যেদিন সে বিবাহের পূর্ব্বে একা দেবদাসের ঘরে আসিয়া অকপটে তাহার নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছিল, শাস্ত্রানুসারে সেইদিন হইতেই সে দেবদাসের ধর্ম্মপত্নী, কুলাচার ও দেশাচার তাহাকে জোর করিয়া অপরের অঙ্কশায়িনী করিয়াছিল বটে কিন্তু তাহার মূঢ়চিত্তের সংযম দেখাইয়া কবি স্পষ্ট বুঝাইয়া দিয়াছিলেন যে, অপরকে বিবাহ করিয়াও পার্ব্বতী সতী ছিল। এই সতী চিত্র অঙ্কণের কি প্রয়োজন ছিল, পার্ব্বতী স্বচ্ছন্দে দেবদাসের কণ্ঠলগ্ন হইতে পারিত। অসহ্য যন্ত্রণার পরে তাহার চিত্তবিভ্রম স্বাভাবিকই হইত। হিন্দুর সমাজে যে এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল, কবি তাহা বলিতে পারিবেন না। কেবল বর্ত্তমান সমাজের ভাল ও মন্দের প্রশ্ন তাঁহাকে সমাজের মূঢ়বদ্ধ গণ্ডীর মধ্যে পার্ব্বতীকে আবদ্ধ রাখিতে বাধ্য করিয়াছে; উচিত ও অনুচিতের বিচার তাঁহাকে দেবদাসের মৃত্যুকালে তাহাকে পার্ব্বতীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে দেয় নাই। পার্ব্বতীর আকর্ষণে মরণাহত দেবদাস ব্যাধের শরবিদ্ধ পক্ষীর মত তাহার নীড়ের অদূরে আসিয়া প্রাণ পিঞ্জর মুক্ত হইতে দিয়াছে কিন্তু সামাজিক ভাল ও মন্দের বিচার কারক তাহার প্রকৃত নায়ককে নায়িকার পতিগৃহ পর্য্যন্ত স্পর্শ করিতে দেয় নাই। "মন্তা"র বিজয়া' পিতৃনির্দ্দিষ্ট পতিকে বরণ করিয়া আমাদের হিন্দু সমাজের মূঢ়বদ্ধ সংস্কার অনুসারে কাজ করাইয়া একটা কঠিন সমস্যা পূরণ করাইয়াছে মাত্র। শুনিতে পাওয়া যায় যে, সম্প্রদায়গত বিদ্বেষ কবিকে ব্রাহ্ম কন্যার বৈধবিবাহ হিন্দু মতে সম্পন্ন করাইতে বাধ্য করিয়াছে, কিন্তু সে জনশ্রুতির বিচার বিজয়াচরিত্রবিশ্লেষণে অনাবশ্যক, কারণ কুম্ভকার যেমন একই মৃত্ লইয়া ঘোরা কালীমূর্ত্তি এবং স্নিগ্ধ শান্ত সরস্বতী মূর্ত্তি গঠন করে, শরৎচন্দ্রও তেমনি একই ছাঁচে বিজয়া ও পার্ব্বতীকে ঢালিয়াছেন।

"গৃহদাহে"র অচলা মহিমের বাগ্‌দত্তা পত্নী, তাহাকে দীর্ঘকাল সুরেশের বিবাহবন্ধনবিরহিতা পত্নীরূপে রাখিয়াও কবি যেভাবে তাহার দেহের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছেন তাহা দেখিলেও স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে, কবির মনে ভাল ও মন্দের দ্বন্দ্ব অনেকদিন চলিয়াছিল, তিনি উচিত ও অনুচিতের বিচার না করিয়া এই সবলে উৎপাটিত সুরেশ অনাঘ্রাত রাখিতে পারেন নাই। সুরেশ মরিয়া নিজকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছিল, বঙ্কিমচন্দ্রের অপূর্ব্ব সৃষ্টি চন্দ্রশেখরের প্রতাপ যেমন করিয়া আত্মোৎসর্গ করিয়া বাহিতার দেহ-মন-প্রাণ কলুষের পথ চিররুদ্ধ করিয়াছিল, সুরেশও তেমন করিয়াই বাহিতার ভবিষ্যত জীবন নিষ্কণ্টক করিয়া দিয়াছিল। ভাল ও মন্দের প্রশ্ন নিত্য প্রতিপদে মানুষের মনে উত্থিত হয়, সে প্রশ্ন আমার মনে উঠে না বলিয়া যে প্রকাশ করে সে কেবল নিজের মনকে প্রতারিত করিবার চেষ্টা করে। উচিত ও অনুচিতের প্রশ্ন জন্মদিন হইতে মৃত্যুকাল পর্য্যন্তও নিত্য করিতে হয়, তাহা করি না বলিয়া ক্ষণকাল প্রতারিত জনসঙ্ঘের চিত্তাকর্ষণের চেষ্টা বৃথা।

গ্রন্থ-আলোচনা

'মণিকাঞ্চন' উপন্যাস। শ্রীযুক্ত কবীন্দ্রনাথ পাল প্রণীত। প্রকাশক—ভোলানাথ লাইব্রেরী ৩০, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ১৷৷০—বাংলা সাহিত্যে কবি-বাবু অনেকগুলি সুমধুর গল্প ও কয়েকখানি উপন্যাস দিয়াছেন, এবং তাহার ভক্ত পাঠকও আছে। সমাজে নারী ও পুরুষের অবাধ মেলা-মেশা ভাল কি মন্দ এবং ইহার সুফল ও কুফল লইয়া আলোচনাই এই উপন্যাস খানির ভিত্তি গড়িয়া উঠিয়াছে। গ্রন্থের বিষয় সরস সুতরাং ইহা পাঠক পাঠিকার চিত্ত বিনোদন করিবে সন্দেহ নাই। গ্রন্থের নারী ও পুরুষ চরিত্র গুলিও বেশ ফুটিয়াছে। গ্রন্থকার নারী ও পুরুষের অবাধ মেলা-মেশার বিরুদ্ধে বা স্বপক্ষে ওকালতী করেন নাই—ইহার মধ্যে যতটুকু ভাল এবং যতটুকু মন্দ আছে তাহাই নিঃসঙ্কোচে দেখাইবার প্রয়াস পাইয়াছেন। বইখানি সুন্দর কাগজে বেশ বড় করে ছাপা—বাঁধাই সুন্দর।

চটকপাখী

[শ্রীমনোরমচন্দ্র গুহ ঠাকুরতা]

শীকার থেকে ফিরছিলাম বন বিথীকার মাঝ দিয়ে যে চওড়া রাস্তাটা এঁকে বেঁকে গ্রামের দিকে চলে গিয়েছে—সেই রাস্তায়। আমার শীকারের সঙ্গী কুকুরটা সামনে সামনে দৌড়ে চলেছিল। হঠাৎ তার দৌড়ের গতি মন্থর হয়ে এলো, সে ধীর পদ বিক্ষেপে চলতে আরম্ভ করলো। যেন সে একটা শীকারের পেছন নিয়েছে।

আমি রাস্তাটার চার দিকে ভাল করে তাকিয়ে দেখলুম। দেখলুম একটা চটক-ছানা, ঝাড়াসের প্রবল আন্দোলনে নীড় থেকে মাটীতে পড়ে গিয়ে, তার ক্ষুদ্র পাখা দুটীকে উড়বার চেষ্টায় নাড়ছে। সবই ব্যর্থ-প্রয়াস, উড়বার মত শক্তি তখনো তার পাখা দুটিতে জন্মায়নি।

আমার কুকুরটা চটক শিশুটীর দিকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হচ্ছিল। এক টুকরা পাথর উপরের দিকে ছুঁড়ে মারলে যেমনি ভাবে তীরের বেগে মাটীতে এসে পড়ে, তেমনি ভাবে একটা বাড়ী চটকপাখী নিকটবর্ত্তী একটা বৃক্ষশাখা থেকে পড়লো এসে কুকুরটার ঠিক নাকের উপর। গাছ থেকে মাটীতে নেবেই চটক পাখীটা নিরাশা মেশানো করুণ সুরে কুকুরটাকে গঞ্জনা করতে আরম্ভ করলো।

শাবকটাকে শত্রুর মুখ থেকে রক্ষা করবার জন্যই পাখীটা গাছ থেকে নীচে এসেছিল। প্রাণ দিয়ে কুকুরের মুখ থেকে সে তার শাবককে রক্ষা করতে আরম্ভ করলো। কিন্তু তার ক্ষুদ্র দেহটী ভয়ে বাতাস-প্রপিড়ীত বেতসীলতার মতো কাঁপছিলো, তবু সে পেছু পা হলোনা। অদ্ভুত রকমের বিকট সুরে সে চীৎকার সুরু করলো। ভয়ে জ্ঞানহারা হয়ে ও সে তার শিশুটীকে কুকুরের মুখ থেকে রক্ষা করতে লাগলো।

ক্ষুদ্র এই পাখীটার পাশে কুকুরটা একটা প্রকাণ্ড ভীষণ দৈত্যের মতো। এত বড় একটা বিরাট জানোয়ারের সঙ্গে এঁটে ওঠা দায় হবে জেনেও ক্ষুদ্র পাখীটী নিশ্চিন্ত মনে নিজকে বৃক্ষশাখায় রাখতে পারেনি। ইচ্ছার চেয়ে ও অন্য রকমের একটা বড় শক্তি তাকে গাছ থেকে নীচে টেনে এনেছিলো।

কুকুরটা পাখীটার গঞ্জনা সহ্য করেও অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত দাঁড়িয়েছিলো, শেষে আস্তে আস্তে "রণে ভঙ্গ" দিল। কারণ কুকুরটাও পাখীটার এই "অতি শক্তি"র কারণ বিশেষ ভাবে উপলব্ধি করেছিলো।

আমি তাড়াতাড়ি আমার এই ব্যর্থমনোরথ কুকুরটাকে ডেকে পাখীটার প্রতি শ্রদ্ধা পূর্ণ হৃদয়ে গৃহে ফিরে চললুম।

এইরূপ নির্ভীক সন্তান বাৎসল্য দেখে আমার হৃদয়ের অলি গলি পর্য্যন্ত পাখীটার প্রতি শ্রদ্ধায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিলো।

প্রেম জিনিষটা বোধ হয় মৃত্যু কিম্বা মৃত্যুতে যে ভয় আছে তার চেয়ে ও দৃঢ়। আমার মনে হয় শুধু প্রেমই পরস্পরের জীবনকে মিলন সূত্রে আবদ্ধ করতে পারে—শুধু প্রেমই মানুষকে আলোকের পথে টেনে নিয়ে যেতে পারে।*

---

* ইংরাজিতে The Sparrow নামক কবিতা হইতে অনূদিত।

দেশ-বিদেশ

বাঙ্গলার শিশু মৃত্যু

বাঙ্গলাদেশে প্রতি বৎসর এক বৎসরের কম বয়স্ক হাজার শিশুর মধ্যে কত জনের মৃত্যু হইয়াছে' তিনে তাহার ভীষণ তালিকা প্রকাশ করিলাম—

বালক	বালিকা
২০৫'৩	১৮৪'৮
১৯০'৬	১৩৩'৪
২১৭'৪	২০১'২
২২৭'৩	২১৫'২
২২৪'৪	২১৩'১
২০৩'৫	১৮৩'৪
১৯২'৬	১৭১'০
২৩৪'৪	২৪০'২
২৩১'৩	২২৪'১
২৩২'১	২০৪'৮

বিগত দশ বৎসরে এক বৎসরের কম বয়স্ক ১৩৬৫৫১৯ বালক ও ১৪১৯৮২ বালিকার মৃত্যু হইয়াছে। সুতরাং গড়ে হাজারকরা২১৬'৬ বালক এবং ২০২বালিকার মৃত্যু হইয়াছে। জন্মের কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই অধিকাংশ শিশুর মৃত্যু হইয়া থাকে। ১৯০১ হইতে ১৯১১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত হাজারকরা গড়ে ২০৭'২ বালক ও ১৮৭'৯ বালিকার মৃত্যু হইয়াছিল। সুতরাং দেখা যাইতেছে গত দশ বৎসরে শিশু মৃত্যুর সংখ্যা বাড়িয়া গিয়াছে। ইংরেজী ১৮৭০ সাল হইতে ১৮৮০ সাল পর্য্যন্ত দশ বৎসরে গড়ে হাজারকরা ১৪২ জন শিশুর মৃত্যু হইয়াছিল। কিন্তু ১৯২০ সালে হাজারকরা কেবল মাত্র ৮০ জনের মৃত্যু হইয়াছে। মাতা ও সন্তানের প্রতি বিশেষ যত্নগ্রহণ হওয়াতেই ইংলণ্ডের শিশু মৃত্যুসংখ্যা হ্রাস পাইয়াছে।

—(সঞ্জীবনী)

ঝুলিয়া

[শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী]

১

রান্নাঘরের বারান্দায় মাদুর পেতে শুয়ে ঝুলিয়া গুন্ গুন্ ক'রে একটা তেলেগু গান গাইছিল, এমন সময় ঘুরে কাকে আস্‌তে দেখে চুপচাপ ঘুমের ভাণ কোরে প'ড়ে রইল ; কিন্তু তার চোখের কোনে দুষ্টুমীর হাসিটা তখনো উঁকিঝুঁকি মারছিল।

আস্তে আস্তে কাছে এসে দাঁড়াল মতি। খানিকক্ষণ চেয়ে দেখে সে ঝুলিয়ার গায়ে হাত দিয়ে ডাক্‌লে, "ঝুলিয়া —এই ঝুলিয়া। ঝুলিয়া জড়িয়ে জড়িয়ে বোল্লে, "উঃ— কটা রাত ?"

"রেটে। রাত ! এখনো অবেলায় ঘুমুচ্ছিস্ ?"

"হুঁ।"

"কতক্ষণ ?"

"অনেকক্ষণ।"

দাঁত দিয়ে ঠোঁটের চঞ্চল হাসিটুকুন্ চেপে রেখে মতি বোল্লে, "তবে যাই, নিজের কাজ করিগে।"

রান্নাঘরের দোরের পানে দু'পা যেতে না যেতে ঝুলিয়া চোখ চেয়ে বোল্লে "এই মতি। যাচ্ছিস্ যে বড় !"

মতি মুখ ফিরিয়ে হেসে বোল্লে, "আমি যেতেই তোর হ'ল বুঝি ? আমি রাত্তির, কেমন ?"

ঝুলিয়া হেসে বোল্লে, "দূর—তুই চাঁদ ; তারপর কি মনে ক'রে এসেছিস্ বল্‌তো ?

"এই তোকে দেখ্‌তে।"

"ইস্—এত ভাগ্যি !"

"বিশ্বেস হয় না ? তবে চায়ের দুধ নিতে।"

"ঠিক তাই।"

এমন সময় সাম্‌নের বাঙ্গলা থেকে একটা চড়া আওয়াজ ভেসে এলো, "মতিয়া।"

মতিয়া সন্ত্রস্ত হ'য়ে বোল্লে, "হুজুর !"

"চা-পানী লে আও।"

মতিয়া চেঁচিয়ে বোল্লে, "যো হুকুম সাব্।" তারপর ঝুলিয়ার দিকে চেয়ে আস্তে আস্তে বোল্লে, "তাহ'লে আসি ভাই ; অনেকক্ষণ ষ্টোভে চা চড়িয়ে এসেছি, খারাপ হ'লে সাহেব আস্ত রাখবেন না।"

তাড়াতাড়ি রান্নাঘরে ঢুকে দুধের বাটীটা নিয়ে বেরুতেই দোরে ঠোকা খেয়ে বাটীটা মতির হাত থেকে ঝন্ করে পড়ে গেল। ঝুলিয়া মুখ ফিরিয়ে বোল্লে, "ফিরে ! ফেলে দিলি সব !"

মতিয়া সভয়ে বোল্লে, "প'ড়ে গেল !—এখন উপায় ?"

"উপায় আর কি ! সাহেব যে এখনো শব্দ শুন্‌তে পায়নি এই তোর বাপের ভাগ্যি।"

ভয়ে ভয়ে কয়েকবার বাঙ্গলার দিকে চেয়ে মতিয়া বোল্লে "চা করি কোত্থেকে ?"

"দৌড়ে ওধাড়ী থেকে একটু দুধ নিয়ে আয়গে।"

"সাহেব যদি তাড়াতাড়ি করে ?"

"আমি ঠাণ্ডা কোর্‌বো'খন ; যা—দৌড়ে যা।"

মতিয়া যাবার একটুখানি পরেই বাঙ্গলা থেকে সাহেবের জোর হুকুম এলো, "এই—জল্‌দি লে আও।" ঝুলিয়া একবার মতির আস্তার গেটের পানে চেয়ে আস্তে আস্তে বাঙ্গলার দিকে চ'ল্লো।

ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব তখন Statesman প'ড়ছিলেন। একটা ট্রেতে ক'রে কয়েকটা টোষ্ট আর জিম টেবিলের ওপোর রেখে, চায়ের কাপটা রাখতে রাখতে ঝুলিয়া বোল্লে, "চাতে দুধ দেয়া হয়নি সাব্।"

নিশীথবাবু ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে বোল্লেন, "কেন ?"

একটু স'রে গিয়ে জান্‌লা দিয়ে বাইরে চাইতে চাইতে ঝুলিয়া বোল্লে, "মতিয়া দুধ আন্‌তে গেছে এই এলো বোলে।"

"দুধ ছিল যে ! খেয়ে ফেলেছিস্ শুয়ার ?"

"আজ্ঞে না, প'ড়ে গেছে হুজুর।"

সাহেবের চোখ মুখ লাল হ'য়ে উঠলো—টেবিল চাপড়ে তিনি বোল্লেন, "প'ড়ে গেছে ! কি ক'রে ফেল্লি ?"

"আজ্ঞে—আস্‌তে মোরে লেগে——"

"চোপ! রাস্কেল—ডেভিল, তবে কি তামাসা দেখতে 'র' চা এনেছিস? পাজি, উল্লুক——"

বাধা দিয়ে ছলিয়া বোল্লে,"আপনি শুধোশুধি গালাগাল দিচ্ছেন হুজুর।"

একটা সামান্য চাকরের এতখানি স্পর্দ্ধা নিশীথবাবুর মত হাকিম মোটেই সইতে পারেন না। সবেগে চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠে তিনি চেঁচিয়ে ব'লে উঠলেন, "তবেরে তয়ারকে বাচ্চা!" সঙ্গে সঙ্গে চায়ের কাপটা সজোরে ছলিয়ার দিকে ছুঁড়ে মার্‌লেন।

ছলিয়া একবার জলন্ত দৃষ্টিতে সাহেবের পানে চেয়ে দেখলে,—অজানতে তার মুঠোগুটো শক্ত হ'য়ে উঠলো। কিন্তু একটী কথাও না বোলে সে যখন আস্তে আস্তে বেরিয়ে এলো, তার কানের পাশ দিয়ে তখন ঘর্ ঘর্ ক'রে রক্ত পড়ছিল।

২

আর একজনকে মনে কোরে ছলিয়ার দু চোখ দিয়ে দুফোঁটা জল গড়িয়ে পড়লো,—সে এই নিশীথবাবুর স্ত্রী। ১২ বছর আগে বাপ, মা, ভাই, বোন, সবাইকে রোগের মুখে বিসর্জ্জন দিয়ে সে যখন একদিন পথের মাঝখানে এসে দাঁড়িয়েছিল, তখন তিনিই তাকে কুড়োনো ছেলের মত বুকে তুলে মানুষ ক'রেছিলেন। ছলিয়ার বয়স তখন ১১—নাম ছিল কিষণ। কিন্তু কৈশোরের সঙ্গে সঙ্গে সে যখন সমুদ্রের জলে মাছ ধ'রতে আর সাঁতরাতে তার জাতভাইদের মত ওস্তাদ হ'য়ে উঠলো, তখন তিনি আদর কোরে তার নাম রাখলেন 'ছলিয়া।' সে অনেক-দিনের কথা। নিশীথবাবু তখন এই পুরীতেই সাব-ডিপুটী; কিন্তু সেই সময় থেকেই তিনি কড়া সাহেবী মেজাজের লোক ছিলেন। তিনি কোনদিনই ছলিয়াকে ভাল চোখে দেখতে পারেননি; তার প্রধান কারণ বোধ হয় সে শীল্‌পির বাবুকে সাহেব বোল্‌তে দেখেনি বোলে। কিন্তু সাহেবের গালাগালি ও চাবুকে ছলিয়ার কিছুমাত্র আপত্তি ছিল না, যতদিন তার এই প্রভুপত্নী নূতন মা'টী জীবিত ছিলেন। সাহেবের কাছে বকুনি খেয়ে ছলিয়া সরাসর তার কাছে ছুটে গিয়ে ডাক্‌তো, "মা-জি!"

গৃহিণী চকিত হয়ে বোল্‌তেন, "কিয়ে!—সাহেব বকেছে বুঝি।"

ছলিয়া মাথা নীচু কোরে বোল্‌তো, "হাঁ মা-জি।"

"কেন? কেয়্ বাবু বোলেছিলি?"

"ভুলে গেছলাম।"

স্নেহ দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে চেয়ে, মাথায় হাত বুলুতে বুলুতে গৃহিণী বোল্‌তেন, "আরে বাছারে! কিন্তু তোরও তো অন্যায় ছলিয়া! এমন সুন্দর বাঙ্গালা কইতে শিখলি, শুধু সাহেব কথাটাই শিখলিনে বাবা?

কিন্তু জগতে ছলিয়ার সে সান্ত্বনাটুকুও ঈশ্বর হরণ কোরে নিলেন। দু মাসের খোকাবাবুকে রেখে সাধ্বী যখন অমরধামে চ'লে গেলেন, আর সেই সঙ্গে সঙ্গে সাহেবের অত্যাচার বেড়ে উঠলো, তখন ছলিয়ার মনটা একেবারে ক্ষেপে গেল, সে চাকরীর গণ্ডী থেকে আপনাকে মুক্ত কর্‌বার জন্য অধীর হ'য়ে উঠলো। তার-পর অনেক জায়গা ঘুরে ঘুরে নিশীথবাবু যখন ডিপুটী হ'য়ে পুরী ফিরে এলেন, তখন তার জন্মভূমি দেখে সে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো; কিন্তু ছাড়ি ছাড়ি কোরেও এই দীর্ঘ তিন বছরের ভেতর তার চাকরী আর ছাড়া হ'লো না। সবিস্ময়ে চেয়ে দেখলে, এক নূতন বন্ধন তাকে আবার জড়িয়ে ফেলেছে, সে তারই মত মাতৃ-পিতৃহীনা অভাগিনী মতিয়া!——খোকাবাবুর ঝি।

বাঙ্গালা থেকে বেরুতেই ছলিয়া দেখলে, একটু দূরে দুধের বাটী হাতে নিয়ে মতি হন্ হন্ কোরে ছুটে আস্‌ছে। কাছে আস্‌তেই সে বোল্লে, "ও ধড়ীতে দুধ পেলুম না ভাই, তাই আবার সেই বাজারে দৌড়তে হ'ল। সাহেব রাগ করেনি তো?"

ছলিয়া কথা কইলে না।

তার মুখের দিকে চেয়ে মতি বোল্লে, "কিয়ে! মুখ-খানা তার তার যে।" তারপর কাণের পাশটায় চোখ পড়তেই সে চম্‌কে উঠলো, "কি! ও-কি-ও! রক্ত!!"

একটু বিষাদের হাসি হেসে ছলিয়া বোল্লে, "হাঁ—সাহেব মেরেচে।"

মতিয়া খানিকক্ষণ স্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইল; তার বুকের ভেতর তখন যে যেন হাতুড়ীর ঘা দিচ্ছিল।

ঘুলিয়া হেসে বোল্লে, "চুপ কোরে রইলি যে? এতো নূতন নয় মতিয়া!"

মতিয়া সজল চোখে ঘুলিয়ার হাত ধ'রে বোল্লে, "উঃ! অনেকটা রক্ত গড়েছে যে! চল্, বেঁধে দিইগে।"

ঘুলিয়াকে নিজের ঘরে বসিয়ে রেখে মতিয়া দৌড়ে খানিকটা হলুদবাটা আর চুণ নিয়ে এলো; তারপর নিজের তোরঙ্গ থেকে খানিকটা সাদা ধপধপে ন্যাকড়া বার কোরে, একটী বঁটীতে কোরে মেটে কলসী থেকে জল গড়াতে গড়াতে বোল্লে, "কেন মেরেছে রে?"

ঘুলিয়া বোল্লে, "সাহেব রাগ কোর্‌ছিলো, তাই বিবি দুধের চা—ই নিয়ে গেছলুম।"

মতিয়া কথা কইলে না। তার মনটা তখন ভেতরে ভেতরে গুম্‌রে মর্‌ছিল। সে বেশ বুঝতে পার্‌ছিল যে তার ঘোষটা ঘুলিয়া ঘাড় পেতে নেওয়াতেই এই শাস্তিটা পেয়েছে। তার মনে পড়লো, আরো কতদিন ঘুলিয়া এম্‌নি কোরে তাকে বাঁচিয়েছে।

ঘা—টা জল দিয়ে ধুয়ে দিতে দিতে মতিয়া সজল চোখে বোল্লে, "উঃ! অনেকখানি কেটেছে তো! কি দিয়ে বাঁধ্‌লে?"

ঘুলিয়া বোল্লে, "চায়ের কাপ ভেঙ্গে।"

"গরম চা শুদ্ধু!—পুড়ে যায়নি তো কোথাও?"

"না। মুখটা একটু জ্বলছিলো, সেরে গেছে।"

বেশ কোরে ঘুইয়ে হলুদ চুণ দিয়ে মতিয়া নিপুণা নার্সের মত ব্যাণ্ডেজ ক'রে দিলে; তারপর দুটো ভালবাসা ভরা করুণ চোখ দিয়ে ঘুলিয়ার মুখের পানে চেয়ে বোল্লে, "তুই কেন আমার জন্য মর্‌তে যাস্ ঘুলিয়া?" তার বুকের ভেতর যে উৎসটা এতক্ষণ দুহু কোরছিল, সে আর কিছুতেই বাধা মান্‌লে না, চোখ ছাপিয়ে ছুটে বেরুলো।

ঘুলিয়া তাড়াতাড়ি তার হাত চেপে ধ'রে বোল্লে, "ওকি! তুই কাঁদ্‌ছিস্ যে! ছিঃ।"

মতিয়ার চোখের জল আরো হু-হু কোরে বেরুতে লাগ্‌লো। ঘুলিয়া বোল্লে, "ছিঃ! চুপ কর্ ভাই, কোর্‌বিনে?"

মতিয়া কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে বোল্লে, "তুই আমার একটা কথা রাখবি আগে বল্।"

"কি কথা?"

"আগে বল্ রাখবি।"

"আচ্ছা, রাখবো।"

"তুই চাকরী ছেড়ে দে।"

"দূর—তা কি হয়!"

মতিয়া ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে বোল্লে, "কেন হয়না শুনি?"

"খাব কি তাহ'লে?"

"কেন? জাত ব্যবসা কর্ না।"

ঘুলিয়া চুপ ক'রে রইলো। সে বেশ জান্‌তো খাবার ভাবনাটা কোন কারণই নয়। আসল কারণ হোচ্ছে মতিয়ার ভাবনা। তাকে এই দুর্দ্ধর্ষ ডিপুটী সাহেবের কবলে একলা ফেলে যেতে যে ঘুলিয়ার মন সর্‌ছিল না। সে অন্যমনস্ক ভাবে বোল্লে, "তা যেন কোর্‌লুম,—তবে কি জানিস্ মতি———"

মতিয়া কৌতূহলী দৃষ্টিতে ঘুলিয়ার পানে চাইল—

"কি খাম্‌লি যে?"

ঘুলিয়া মৃদু হেসে বোল্লে, "এই তোকে কি আর রোজ এম্‌নি কোরে দেখতে পাবো তাহ'লে?"

মতিয়া হেসে বোল্লে, "ওঃ—এই কথা! কেন, আমি রোজ বিকেলে খোকাবাবুকে নিয়ে সমুদ্রের ধারে বেড়াতে যাবো, তখন দুজনে দেখা হবে!"

"কিন্তু তোকে একা সাহেবের বকুনির মুখে ফেলে—"

মতিয়া বাধা দিয়ে বোল্লে, "না-না, সাহেব তো কোনদিন আমায় বেশী বকে না।"

ঘুলিয়া ভাবতে লাগলো। সত্যি নিশীথবাবু মতিকে বিশেষ কিছু বোল্‌তেন না, তার কারণ বোধ হয় খোকা তাকে খুব ভালবাস্‌তো ব'লে। গৃহিণীর মৃত্যুর পর মতিয়াই তার মায়ের স্থান অধিকার কোরেছিলো; নিশীথবাবুও একমাত্র পুত্রকে মতিয়ার হাতে ছেড়ে দিয়ে একরূপ নিশ্চিন্ত ছিলেন।

ঘুলিয়াকে ভাবতে দেখে মতি বোল্লে, "আবার ভাবছিস্ কি? লক্ষ্মীটী—কথা শোন্, চাকরী ছেড়ে দে।"

ছুলিয়া মতির মুখপানে চেয়ে বোলে, "আচ্ছা তাই হবে,—ছেড়েই দোবো।"

"তাহ'লে এই সামনের মাস থেকেই ———"

বাধা দিয়ে ছুলিয়া বোলে, "না, আজই!"

৩

পুরীতে জেলেদের বলে 'ছুলিয়া'। এরা মাদ্রাজের অনার্য্য অধিবাসীদের বংশধর, এবং সাধারণতঃ তারা ভালো ছেলেও। এরা দেখতে কালো বটে, কিন্তু প্রত্যেকে এক একটী লম্বা চওড়া জোয়ান, আর তাই ছেলেবেলা থেকেই সমুদ্রে সাঁতরাতে আর মাছ ধরতে সমান দক্ষ হ'য়ে ওঠে। সমুদ্র স্নানের জন্যে মিটোতে গিয়ে কেউ বিপদে পড়লে, এরা ছাড়া আর এমন কেউ নেই যে তাকে সেই পারাবারের করাল গ্রাস থেকে ফিরিয়ে আনে।

অল্প দিনের মধ্যেই ছুলিয়া তার জাতভাইয়ের ভেতর মাথা তুলে দাঁড়াল। সবাই তাকে চিন্‌তো তার বলিষ্ঠ চেহারায়, আর ভালবাস্‌তো সর্ব্বদা হাসি-খুসী ভাবে। সাঁতরাতে আর মাছ ধরতে তার মত আর কেউ ছিল না। তাই একদিন যখন সে ভয়ানক ঝড়ের ভেতর সমুদ্র থেকে মাছ ধরে নিয়ে এলো, তখন সবাই সসম্ভ্রমে তার নাম দিলে 'সর্দ্দার ভাই'। ছুলিয়াও সবাইকে ভাইয়ের মত দেখতো নিজের লাভের অংশ থেকে সে ভাইদের ছেলেমেয়ের খেল্‌না কিনে দিত। তাই ছেলে বুড়ো সবাই তাকে ভালবাসার সঙ্গে মানতোও যথেষ্ট।

সমুদ্রের ধারে জেলেদের ছোট ছোট পাতার ছাওয়া ঘর। এমনি একটী ঘরের পাশে ছুলিয়া বিকেল বেলা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সহরের পাকা রাস্তার পানে চেয়ে ছিল, এমন সময় ধীরে ধীরে খোকাবাবুর 'পেরেমবুলেটর' ঠেল্‌তে ঠেল্‌তে মতিয়া এসে কাছে দাঁড়ালো; তারপর একটুখানি হেসে বোলে, "ছুই অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছিস, না ছুলিয়া? আজ একটু দেরী হ'য়ে গেল ভাই,—সাহেব দেরীতে এলেন কিনা।"

ছুলিয়া হেসে বোলে, "সত্যি অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলুম ভাবলুম মতিটাদ বুঝি আজ আর আস্‌বেন না।"

মতিয়া হেসে বোলে, "নে—রে ঠাট্টা রাখ; ওদিকে বেড়িয়ে আসিগে। কেমন খোকাবাবু?"

খোকাবাবু ঘাড় নেড়ে বোলেন, "হু—চল ঝি-মা, আমি কিন্তু গাড়ীতে যাবো না, দৌড়ে যাবো।"

মতিয়া সভয়ে তাড়াতাড়ি বোলে, না-না, তাকি হয় খোকাবাবু? তুমি এই বালিতে দৌড়ুতে পার্ব্বে না, পড়ে যাবে যে!

খোকাবাবু ততক্ষণে তড়াক্ করে লাফ দিয়ে 'পেরেম-বুলেটর' থেকে নেমে বোল্লেন, "ইস্! পড়লেই হ'ল আর কি! তুমি দেখনা ঝি-মা, বেশীদূর যাবোনা তো! আমি দৌড়ে গিয়ে ঐ চিবিটার দাঁড়াই, তুমি গাড়ী নিয়ে পিছনে এসো।" এই কথা বোলেই খোকাবাবু ছুট দিলেন।

মতিয়া গাড়ী নিয়ে পেছনে আস্‌তে আস্‌তে বোলে, "এমনও দস্তি ছেলে! শেষে প'ড়ে ট'ড়ে না যায় ভাই।

ছুলিয়া বোলে, "না তুই দেখিস্, কক্‌খনো পড়বে না। ঐ দেখ, চিবিতে উঠে দাঁড়িয়েছে।"

দুজনে চিবির কাছে আস্‌তেই খোকাবাবু আবার গাড়ীতে উঠলেন। মতিয়া তার পা থেকে বালি ঝাড়তে ঝাড়তে বোলে, "এইযে। খোকাবাবু! জুতোর ভেতর বালি ঢুকেছে। দেখলে তোমার বাবা যে আমায় বক্‌বেন!"

খোকাবাবু গম্ভীর হ'য়ে বোল্লেন, "ইস্! তোমায় ব'কবে?—আমি দুম্ দুম্ ক'রে মার্‌বোনা তাহ'লে বাবাকে!"

মতিয়া ও ছুলিয়া দুজনেই হেসে উঠলো। হঠাৎ পেছনে চেয়ে মতিয়া বোলে, "ছুলিয়া। তুই খোকাকে নিয়ে আস্তে আস্তে এগো, আমি দৌড়ে তোর বাড়ী থেকে একটু জল খেয়ে আসি।"

ছুলিয়া এগিয়ে চ'লো। খানিকক্ষণ পরে মতিয়া হাঁফাতে হাঁফাতে এসে বোলে, "তুই অনেকটা এগিয়ে গেছিস্‌তো!"

ছুলিয়া কথা কইলে না, কি যেন ভাবছিল। মতিয়া তার মুখের দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চেয়ে বোলে, "কি ভাব্‌ছিস্ রে?"

আচ্ছা, তুই যে খোকাবাবুকে নিয়ে আমার কাছে আসিস্, সাহেব তা জানে?"

"না, বেড়াতে নিয়ে আসি তাই জানে শুধু।"

দুলিয়া কিছু না বোলে খোকাবাবুর দিকে চেয়ে র'ইল। মতিয়াও তার দৃষ্টি অনুসরণ কোরে খোকার দিকে চাইতেই চ'মকে উঠ্‌লো; সভয়ে বোল্লে, "খোকা-বাবুর গলায় হার কই? খোকাবাবু!"

খোকাবাবু নির্ব্বিকার চিত্তে বোল্লেন, "আমি জানিনে তো।"

মতিয়া কাঁদ কাঁদ হ'য়ে বোল্লে, "দুলিয়া! কি হবে—হারতো দেখ্‌ছিনে!"

দুলিয়া ধীরে ধীরে বোল্লে, "খোকাবাবুর গলায় হার ছিল? কই দেখিনিতো! বাড়ী রেখে আসিস্‌নি তো ভুলে?"

মতিয়া সভয়ে বোল্লে, "বাড়ীতে? কই—না! গলায়ই তো ছিল মনে হোচ্ছে।"

"তাহ'লে আর যাবে কোথায়? দৌড়্‌বার সময় প'ড়ে গেছে হয়ত; চল্, খুঁজে দেখি।"

খোকাবাবু যেটুকু দৌড়েছিলেন তার ভেতর দুজন তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজেও হারের চিহ্ন পাওয়া গেল না, শুধু বালি ঘাঁটাই সার হ'লো। মতিয়া মাথায় হাত দিয়ে ব'সে প'ড়লো। দুলিয়া সাহস দিয়ে বোল্লে, নিশ্চয় খোকা-বাবুকে আমা পরাবার সময় প'ড়ে গেছে। তুই পাজিস্ কেন মতি?—বাড়ীতেই আছে নিশ্চয়।"

মতিয়া কেঁদে বোল্লে, "যদি না পাই? তাহ'লে সাহেব কি আর অমনি ছাড়বে তাই? জেলে দেবে যে।"

দুলিয়া বোল্লে, "দূর্ পাগলি! বাড়ীতেই আছে, আমি বোল্‌ছি—দেখিস্।"

সেদিন আর বেড়ানো হ'লো না। মতিয়া খোকাকে নিয়ে বাড়ী ফিরলো। যাবার সময় দুলিয়া বোল্লে, "গেলে আমায় একটা খবর দিয়ে যাস্, বুঝ্‌লি?"

মতিয়া বোল্লে, "আচ্ছা।" কিন্তু তার প্রাণটা চ'মকে উঠলো; "হায়! হায়! যদি না পাই, তাহলে?" মনে মনে ঈশ্বরকে ডাকতে ডাকতে সে বাড়ী পৌঁছলো, "হে ঠাকুর! হে অনাথ দেব! দেখো, যেন মিছি-মিছি বিপদে না পড়ি।"

কিন্তু ঠাকুর তার কথায় কাণ দিলেন না; তন্ন তন্ন কোরে খুঁজেও হার-ছড়া পাওয়া গেল না; ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে মতিয়া কাঁদতে লাগ্‌লো।

সন্ধ্যেবেলা কথাটা যখন সাহেবের কাণে গেল তখন তিনি মতিয়াকেই চোর সাব্যস্ত ক'রে আগুন হ'য়ে উঠলেন। মতিয়ার জোর তলব প'ড়লো; ঠক্ ঠক্ কোরে কাঁপতে কাঁপতে গিয়ে সে সাম্‌নে দাঁড়িয়ে বোল্লে, "হুজুর!"

নিশীথবাবু চেঁচিয়ে বোল্লেন, "হার বেয়্ কর্ হারামজাদী।"

মতিয়া বোল্লে, "অনেক খুঁজেছিতো! পাচ্ছিনে কোনখানে!"

নিশীথবাবু তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চেয়ে বোল্লেন, "খোকা বেড়াতে গেছলি আজ খোকাকে নিয়ে?"

"আজ্ঞে—সমুদ্রের ধারে হুজুর। খোকাবাবু কিছুতেই ছাড়্‌লে না,—দৌড়্‌লে——"

খোকাবাবু বোলে উঠলেন, "হ্যাঁ বাবা, দৌড়্‌লুম; তারপর দেখ বাবা, আমার পায়ে——"

নিশীথবাবু ধমক্ দিয়ে বোল্লেন, "চুপ, পাজি ছেলে!"

খোকাবাবু মুখ তার কোলে ব'সে রইলেন; মতিয়ার দিকে চেয়ে নিশীথবাবু বোল্লেন, "হ্যাঁ—তারপর?"

"তারপর আমি আর দুলিয়া অনেকক্ষণ ধ'রে——"

নিশীথবাবু সাবিস্ময়ে বোল্লেন, "দুলিয়া!"

মতিয়া সভয়ে বোল্লে, "হ্যাঁ।"

খোকাবাবুর দুলিয়ার নামে আবার মুখ ফুটলো, বোল্লে, "দুলিয়া খুব জোরে গাড়ী টেন্‌তে পারে বাবা, কি-মা জল খেতে গেল কিনা, তাই——"

নিশীথবাবু চোখ ঘুরিয়ে বোল্লেন, "কেন্! তুই ছেলে!" তারপর মতিয়াকে বোল্লেন, "দুলিয়ার সাথে তোর দেখা হয়েছিল?"

মতিয়া ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বোল্লে, "আজ্ঞে—আজ্ঞে হুজুর।"

"তুই তার কাছে খোকাকে রেখে জল খেতে গেছলি?"

"হ্যাঁ হুজুর।"

চাকরী ছেড়ে যাওয়াতে নিশীথবাবু দুলিয়ার ওপর

বিলক্ষণ চটে গেছলেন, তাই রাগটা এবার দ্বিগুণ হয়ে জ্বলে উঠলো। চেঁচিয়ে বোল্লেন, "তবে ঠিক্ ঐ বেটারই কাজ; পাজি বেল্লিক, ওরার কোথাকার! এইবার কিছুদিন শ্রীঘর বাস কোর্‌লেই জব্দ হবেন; দাঁড়াও, দেখছি আমি। কিন্তু তোকেও আমি সহজে ছাড়ছিনে মতিয়া, যতক্ষণ না ঠিক্ কথা বলবি!"

মতিয়া কাঁপতে কাঁপতে বোসে পড়লো।

কিন্তু পরদিন মতিয়া আর দুলিয়াকে পুলিশে ধ'রে নিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে খোকাবাবু যখন কি-যা কি-যা ক'রে কাঁদ্‌তে লাগলো, তখন নিশীথবাবু একটু ব্যস্ত হ'য়ে পড়লেন। সেদিনই তিনি একজন নূতন ঝি নিয়ে এলেন, কিন্তু খোকা কিছুতেই খাবলো না; সারাদিন কেঁদে কেঁদে না খেয়ে ঘুমিয়ে পড়লো। নিশীথবাবু চিন্তিত হলেন। তাঁর স্ত্রীর একমাত্র চিহ্ন এই খোকাবাবুকে তিনি খুবই ভালবাসতেন। তার ভবিষ্যৎ লক্ষ্য করেই তিনি বয়স থাক্‌তেও বিয়ে করেননি; আর এই ডেপুটী-গিরি তাও ঐ খোকারই জন্য। তাই নিশীথবাবু পরদিন মতিয়াকে আমিনে খালাস দিয়ে নিয়ে এলেন, এবং তাকে কি করে একেবারে খালাস করা যায় তাও সেদিন মনে মনে ভাবতে হ'ল।

কিন্তু বিচারের সময় নিশীথবাবুকে বিশেষ কোন বেগ পেতে হলোনা, কারণ দুলিয়া নিজেই সমস্ত দোষ স্বীকার কোল্লে। কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে নির্ভয়ে বোল্লে, সে-ই মতি জল খেতে গেলে ঘর-দোর খুলে নিয়েছিল, কিন্তু কোথায় রেখেছে তা তার মনে নেই। হাকিম সাহেব রায় দিলেন, তিন মাস সশ্রম কারাদণ্ড।

দুলিয়াকে ঘেরাও করে প্রহরীরা যখন জেলের দিকে নিয়ে চল্লো, পথে তখন দাঁড়িয়েছিল মতিয়া। দুলিয়া চোর, এ কথাটা ভাবতেও তার বুকটা যেন ভেঙে যাচ্ছিল। ব্যথা ভরা চোখ দুটো দিয়ে দুলিয়ার পানে চেয়ে সে ডাকলো, "দুলিয়া!"

মুখ ফিরিয়ে চেয়ে দুলিয়া বোল্লে, "আমি চোর নয় মতি।"

"তবে তুই স্বীকার কোল্লি কেন?"

দুলিয়া মুখ নীচু করে বোল্লে "তানাহ'লে তোরও যে জেল হত মতি!"

মতিয়া কথা কইলে না, তার চোখ দিয়ে দর্‌দর্ ক'রে জল গড়িয়ে পড়লো।

৪

তারপর ছ-টা মাস দেখতে দেখতে কেটে গেছে। সেদিন রবিবার। সপ্তাহের ভেতর এই ছুটির দিনটা নিশীথ বাবু একটু ভাল ক'রে উপভোগ ক'রতেন। সেদিন সকালে সমুদ্রস্নান করা, আর সন্ধ্যায় বন্ধুবান্ধবদের চা পার্টি দেয়াটা তার অভ্যাসের মধ্যে দাঁড়িয়েছিল।

ভোরবেলা চা বিস্কুট খেতে খেতে নিশীথবাবু মৃদু-গম্ভীর স্বরে ডাকলেন, "মতিয়া!"

ধীরে ধীরে মতিয়া এসে বোল্লে, "হুজুর ডাক্‌ছেন?"

"হ্যাঁ—আজকে রোববার তাকি ভুলে গেছিস্? স্কুলে যেতে হবে না?"

"আমি এখুনি সব গুছিয়ে নিয়ে আস্‌ছি হুজুর! খোকাবাবুও যাবে তো?"

নিশীথবাবু স্মিতমুখে ক'রে বোল্লেন, "যাবে বৈকি, প্রতিবারই তো যেয়ে থাকে!"

তখন সবে সুর্য্যি উঠেছে। নূতন সুর্য্যির রাঙা আলো সমুদ্রের নীলজলে ঢেউ খেলে বেড়াচ্ছিল; আর সেই সোনা জলের অসীমতার মাঝখানে দুচারজন জেলে নৌকো নিয়ে মাছ ধ'রতে ধ'রতে মনের আনন্দে গান গাইছিল। এমন সময় মতিয়া, খোকা আর নিশীথবাবু সেই বালুর চড়ায় এসে দাঁড়ালেন। সমুদ্রের দিকে চেয়ে মতিয়া বোল্লে, "আজ ঢেউ বড় বেশী হোচ্ছে হুজুর! খোকাবাবুকে কি নামাবো?"

"থাক কাজ নেই, বাড়ীতে নাইবে'খন।"

কিন্তু খোকাবাবু বায়না ধ'রলেন, "না আমি বাড়ীতে নাইব না, আমি ঝি-মার সাথে নাইবো।"

মতিয়া বোল্লে, "আমিও তো বাড়ীতে নাইব খোকা-বাবু! লক্ষী ছেলে, দুষ্টুমী ক'রোনা; আমরা দুজন বাড়ীতেই নাইবো, কেমন?"

খোকাবাবু ঘাড় নেড়ে বোল্লেন, "না—না—এখানে—।"

মতিয়া বোল্লে, "দেখছ না, কত বড় ঢেউ। বাপ্‌রে!"

খোকাবাবু বোল্লেন, "তা হোকগে; আমি নাক মুখ বুজে তোমায় জড়িয়ে থাকবো ঝি-মা!"

নিশীথবাবু ধমকালেন, কিন্তু খোকাবাবুকে তিনি ডেপুটী হ'য়েও সাম্‌লিয়ে রাখতে পারলেন না; সে কেঁদে কেটে অস্থির ক'রে তুললে। শেষে তিনি বোল্লেন, "তবে নিয়ে আয় মতিয়া; কিন্তু দেখিস, বেশী ঢেউ খাওয়াসনি যেন।"

মতিয়া খোকার হাত ধ'রে ধীরে ধীরে নেমে নিশীথ বাবুর কাছ থেকে একটু দূরে স'রে দাঁড়াল; ঠিক সেই সময় একটা মস্ত ঢেউ মাথা তুলে ছুটে আসছিল, মতিয়া সেই দিকে চকিতে চেয়ে বোল্লে, "খোকাবাবু শীগ্‌গির! শীগ্‌গির কোলে এস—ঢেউ আসছে! শীগ্‌গির এস।"

খোকাবাবু বোল্লেন, "আমি বাবার কাছে ঢেউ খাবো ঝি-মা।"

মতিয়া তার হাত ধ'রে বল্লে, "এর পর বার খেয়ো, শীগ্‌গির এসো, ঢেউ এসে গেল যে!"

কিন্তু খোকা একটানে হাত ছাড়িয়ে বাবার দিকে ছুটলো; কিন্তু সে পৌঁছুবার আগেই ঢেউটা পাহাড়ের মতন হুড়মুড় কোরে ভেঙে পড়লো। ধাক্কাটা সাম্‌লে উঠে নিশীথবাবু ও মতিয়া সভয়ে চেয়ে দেখলেন, রাক্ষস ঢেউটা খোকাকে ফিরে দিয়ে যায়নি—অগাধ জলে টেনে নিয়ে গেছে। নিশীথবাবু চেঁচিয়ে উঠে পাগলের মত লাফিয়ে পড়লেন; কিন্তু আর একটু পরেই আর একটা প্রচণ্ড ঢেউ এসে তাকে বালির ওপর আছড়ে ফেলে দিয়ে গেল আর সঙ্গে সঙ্গে খোকাকে আরো দূরে টেনে নিলে।

খানিক দূরে জেলেরা মাছ ধ'র্‌ছিল; সমুদ্রের দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে নিশীথবাবু বোল্লেন, "এই—বাঁচাও, —বাঁচাও, এক'শ রূপিয়া বখ্‌শিস।" তক্ষুনি ৪।৫ জন জেলে জলে ঝাঁপিয়ে পড়লো। সেই মুহূর্ত্তেই কোথা থেকে ধূমকেতুর মত ছুটে এসে একজন জেলে হাত তুলে বোল্লে, "ছোড় দেও ভাই সব, পাক্‌ড়ো মৎ।"

নিশীথবাবু চেয়ে দেখলেন, ঝুলিয়া। মুখ ফিরিয়ে তিনি বোল্লেন—"পাক্‌ড়ো—হাজার রূপেয়া বক্‌সিস।" কিন্তু জেলেরা তখন মন্ত্রমুগ্ধের মত আবার তাদের নৌকোয় উঠে প'ড়েছে।

ঝুলিয়া মৃদু হেসে বোল্লে, "আমার হুকুম ছাড়া ওরা এক পা ও এগুবে না সাহেব।"

ঝুলিয়ার দিকে চেয়ে ডেপুটী সাহেব সরোষে চেঁচিয়ে বোল্লেন, "বেইমান! পাজি! হারামজাদা! জেলে দোবো —সব জেলে দেবো, আমি ম্যাজিষ্ট্রেট। এই—পুলিশ। পুলিশ।"

ঝুলিয়া হেসে বোল্লে, "জেলে দেবেন? তা দিতে পারেন হুজুর, কিন্তু খোকাকে এই সমুদ্রের মাঝে রেখে যেতে হবে।"

নিশীথবাবু জেলেদের পানে চেয়ে আবার বোল্লেন, "পাঁচ হাজার রূপেয়া। জল্‌দি—জল্‌দি!" কিন্তু সবাই পাথরের পুতুলের মত নিশ্চল হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইল।

খোকাকে তখন অনেক দূর টেনে নিয়ে গেছে। তার ক্ষুদ্র দেহটুকু তখন ঢেউয়ের সাথে উঠছিল প'ড়ছিল। ডেপুটী সাহেবের স্বর তখন নরম হ'য়ে এলো, চোখ ফেটে জল বেরুতে লাগলো। এক মুহূর্ত্ত তিনি চেয়ে দেখলেন, কেমন ক'রে তার সংসারের একমাত্র বন্ধন মরণের মুখে ভেসে যাচ্ছে; তারপর করুণনয়নে ঝুলিয়ার পানে চেয়ে বোল্লেন, "ঝুলিয়া! এনে দে—বাঁচা!"

আগুনঝরা চোখে তার দিকে চেয়ে ঝুলিয়া বোল্লে, কেন এনে দেবো হুজুর? তুমি আমার কি দিয়েছ সারা জীবনটা? ছেলেবেলা থেকে ব'কেছ, মেরেছ, চাবকে পিঠের ছাল তুলে দিয়েছ, আমি কোনকথা কইনি; তারপর তড়োতড়ি চোর অপ-নাম দিয়ে জেলে দিলে; চারদিন পরে খোকাবাবুর বিছানার নীচে হার পাওয়া গেল, কিন্তু তবু তুমি আমায় খালাস ক'রে আন্‌লে না। তারপর আবার———"

এমন সময় দূরে সমুদ্র থেকে বাতাসের ওপোর খোকার করুণ কান্না ভেসে এলো, "বাবা! ঝি-মা!"

মতিয়া এতক্ষণ হতভম্বের মত দাঁড়িয়েছিল এইবার খোকার মরণ-কান্না তার প্রাণে সাড়া দিয়ে সজাগ ক'রে তুল্‌লো। চকিতে সেই দিকে চেয়ে সজল চোখে মতিয়া ডাক্‌লে "ঝুলিয়া!"

ছুলিয়া চাইতেই মতিয়া বোল্লে, "খোকাবাবুকে এনে যে ছুলিয়া!"

ছুলিয়া চেয়ে দেখ্‌লে দুটী আগ্রহভরা, ব্যাকুল, সজল চোখ তার দিকে উৎগ্রীব হ'য়ে চেয়ে আছে। কত ভালবাসা, কত বিশ্বাস এই চোখ দুটীর ভেতর! ছুলিয়া চঞ্চল হ'য়ে উঠলো, নিমেষের তরে সে হুজুর সমুদ্র পানে চেয়ে দেখলে, তখনও খোকাবাবুকে বাঁচান বোধ হয় অসম্ভব নয়; তারপর আর সবাইকে ইসারায় এগুতে ব'লে সে সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়লো।

খোকাবাবুকে নিয়ে ছুলিয়া যখন তীরে এসে পৌছলো, তখন তার সবল হাতদুটো একেবারে অবশ হ'য়ে গেছে। খোকা অনেকটা নোনা জল খেয়েছিল, তাকে বাঁচাতে একটু বেগ পেতে হ'ল। ডাক্তারের সহায়তায় আর মতিয়া ও মেয়েদের শুশ্রূষায় খোকা যখন চোখ চেয়ে ডাকলো, "মা-মা! কি-মা!" নিশীথবাবুর চোখ দিয়ে তখন ঝর ঝর ক'রে আনন্দের জল গড়িয়ে পড়লো। ধরা গলায় তিনি ডাকলেন "ছুলিয়া!—ভাই!"

ছুলিয়া একপাশে চুপ ক'রে ব'সেছিল; তার বাঁ হাতটার জড়তা তখনো যায় নি। ধীরে ধীরে ছুলিয়া বোল্লে হুজুর!"

"তুই বাড়ী চল্ ছুলিয়া।"

"না হুজুর! আর চাকরী কোরবো না।"

"মাফ কর্ ছুলিয়া চল্"।

ছুলিয়া সেলাম ক'রে বোল্লে, "মাফ্ কিসের হুজুর? ছিঃ! ছিঃ! আপনি মুনিব, যখন দরকার হয় ডাক্‌বেন, যাবো; কিন্তু নোকরী কোরবো না।"

"তবে তুই কি চাস্ বল্ ছুলিয়া।"

"বক্‌সিস? আমি কিছু চাইনে সাহেব!

"না, তুই বল্ কি চাস্ তাই দোবো বল্।"

এক মিনিট চুপ ক'রে থেকে কি যেন ভেবে নিয়ে ছুলিয়া বোল্লে, "দেবে হুজুর?"

নিশীথবাবু বোল্লেন, "কি?"

"যা চাই দেবে?"

"হ্যাঁ, নিশ্চয় দোবো; বল্ ছুলিয়া কি চাস্ তুই!"

ছুলিয়া আস্তে আস্তে উঠে মতিয়ার হাতখানা ধ'রে সাহেবের সাম্‌নে এসে দাঁড়াল। নিশীথবাবু সবিস্ময়ে চেয়ে দেখ্‌লেন দুখানী কালো সরল মুখের ওপোর এক ঝলক চাঁদের জোছ্‌না ঝলমল ক'রে হেসে উঠছে!

দুঃখে সুখ

[শ্রীলীলা দেবী]

অবহেলায় আপন জনা
যতই আমায় ছাড়ে
ততই আমার তোমার দিকে
আরও যে টান বাড়ে।
আপনজনের গণ্ডী যেরা
ঘাত-ঘাঁচা ঘরের বেড়া
আসন্না হ'য়ে ততই আসে
ছুটার ঘরের বা'রে—
ঐ যেখানে ধানের হরিৎ
পদ্ম কোটা সবুজ সরিৎ
ঐ যেখানে আঙ্‌রাশি লাল
বিলায় মাঠের পারে
ঐ যে গো মোর প্রাণের সাড়া
ফুলঝরাণ শাখায় নাড়া
কাঁদলে যে দেয় সোহাগ ভাড়া
সুবাস ছোড়ো বায়
উড়িয়ে অলক ছুড়িয়ে এ বুক
ঝলক দিয়ে যায়।
অবহেলায় আপন জনে
যতই আমায় ছাড়ে
ততই তোমায় পাচ্ছি মনে
পাচ্ছি সবার ধারে
ঐ যে পথিক ঐ যে পাখী
ঐ যে সজল কমল আঁখি
ঐ অজানা তরুণ আনন
সঘনে গাছের ধারে
সবাই আমার আত্মীয় আজ
বাঁধা প্রাণের তারে।

ব্যতিক্রম

(উপন্যাস)

[শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্-এ]

একবিংশ পরিচ্ছেদ

বিনয়ের ভয়ানক গরম বোধ হইতেছিল, ইন্দুর স্বামীর আচরণ দেখিয়া সে স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিল। সে ছাদের উপরে গিয়া বসিল। তাহার মনে তখন নানা কথা উঠিতেছিল। নলিনাক্ষের মত গ্রামীর হাতে ইন্দুর কি পরিণাম হইবে, তাহার যৌবনের প্রারম্ভে অদৃষ্ট হস্ত লিখিত পতিপ্রেমের যে অংশটুকু সে পাইয়াছে, ভবিষ্যত জীবনে পরিণত বয়সে তাহা কি আকার ধারণ করিবে—এই কথা ভাবিতে ভাবিতে বিনয়ের হঠাৎ মনে হইল যে ইন্দু তাহার কে? ইন্দুর স্বামী সম্বন্ধে চিন্তা করিবার তাহার কি অধিকার আছে? সে হিন্দু, ইন্দু অপরের বিবাহিতা ধর্ম্মপত্নী, সে এখন নলিনাক্ষের সম্পত্তি। নির্ম্মল তাহার বন্ধু বটে, ইন্দু নির্ম্মলের ভগিনী, সে তাহার কেহ নহে।

ইন্দু তাহার কেহ নহে কথাটা মনে করিয়া বিনয়ের মনে বড়ই কষ্ট হইল কিন্তু সে মন শক্ত করিয়া সে বেদনাটা মুছিয়া ফেলিল। নানা চিন্তায় বিনয়ের মাথা গরম হইয়া উঠিল সে কোন মতেই ঘুমাইতে পারিল না।

ভোরের বেলায় যখন মহলা গাড়ীর শব্দে সহরের লোক জাগিয়া উঠিয়াছে তখন সে ছাদের উপর হাতে মাথা রাখিয়া ঘুমাইয়া পড়িল। সেদিন সে একটা স্বপ্ন দেখিল, সে স্বপ্নটা এত স্পষ্ট যে চিরদিন তাহা তাহার মনে ছিল। বিনয় দেখিল যে একটা বড় নদীতে দুইখানা ছোট নৌকা ভাসিয়া চলিয়াছে, তাহার একখানায় সে বসিয়া আছে আর একখানায় নির্ম্মলের ভগিনীপতি নলিনাক্ষ একটি স্ত্রীলোক লইয়া বসিয়া আছে। নলিনাক্ষ মাতাল হইয়া ভয়ানক চীৎকার করিতেছে আর হাসিতেছে। সে বলিতেছে, "মা গঙ্গা এঁটোপাত ফেলতে এসেছি।" বলিতে বলিতে নলিনাক্ষ স্ত্রীলোকটিকে জলে ফেলিয়া দিল, জলে পড়িবার সময় তাহার মুখের কাপড় খুলিয়া গেল, বিনয় দেখিল যে সে ইন্দু। সে তখন লাফাইয়া জলে পড়িল, পড়িতেই ইন্দু তাহাকে জড়াইয়া ধরিল, দুই জনেই তলাইয়া গেল। অনেক কষ্টে যখন সে ভাসিয়া উঠিল তখন নলিনাক্ষ বিনয়ের নৌকা ডুবাইয়া দিয়া হাসিতে হাসিতে আর একখানা নৌকায় চড়িয়া গেল। তখন বিনয়ের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল।

সে উঠিয়া দেখিল রৌদ্র উঠিয়াছে আর পরেশবাবু তাহার পাশে বসিয়া বাতাস করিতেছেন। বিনয় তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিল, তখন নীচের তলায় অনেক লোকের গলার আওয়াজ শুনিতে পাওয়া গেল, বিনয় জিজ্ঞাসা করিল,—"কি ব্যাপার পরেশবাবু?" পরেশবাবু বলিলেন "আজ্ঞে ওসব কিছুই না। গিন্নিমা যৎকিঞ্চিৎ জিনিষ আনতে বলেছিলেন—তাই মাছ তরকারিগুলো নতুন-বাজার থেকে কিনে আনলুম এখন রাধাবাজারে যাচ্ছি।"

বিনয় নীচে আসিয়া দেখিল নানান রকম তরকারি ও ফলে ঘরটি ভরিয়া গিয়াছে আর উঠানে দুইটা বড় মাছ পড়িয়া আছে। পরেশবাবুকে যত শীঘ্র সম্ভব বিদায় করিয়া বিনয় মাছ তরকারিগুলা বিলাইয়া দিল। বাসার লোক ভূরিভোজনের লোভ সম্বরণ করিতে পারিল না দেখিয়া বিনয় নিজে অন্যত্র নিমন্ত্রণ আছে বলিয়া চলিয়া গেল। সে যখন ফিরিয়া আসিল তখন বেলা ৩টা বাজিয়া গিয়াছে।

বিনয় বাসায় ফিরিয়া দেখিল, যে তাহার ঘরের দুয়ার জুড়িয়া ঘর্ম্মাক্ত কলেবর পরেশবাবু বসিয়া আছেন আর তাহার ঘরখানি আবার কিনিষপত্রে ভরিয়া গিয়াছে। চিঠির কাগজ হইতে আরম্ভ করিয়া সাবান গন্ধতৈল চিরুণী বুরুষ প্রভৃতি কোন দ্রব্যই পরেশবাবু কিনিতে বাকি রাখেন নাই। পূর্ব্ব দিনের অনুপাতে জলযোগের

ওরে পরেশবাবু জিনিষগুলা বিনয়কে দেখাইয়া দিয়াই বিদায় হইলেন। বিনয় কিন্তু তখন বিষম বিপদে পড়িল। খাদ্য দ্রব্যগুলা বিতরণ করা নিতান্ত সহজ কিন্তু অন্য জিনিষ সে কি করিয়া বিলাইবে ভাবিয়া পাইল না। এই সময়ে নির্ম্মল আসিয়া পড়ায় সে বিপদ উদ্ধারের পথ খুঁজিয়া পাইল। নির্ম্মল আসিয়াই জিজ্ঞাসা করিল, "কিরে মণিহারীর দোকান খুলে বসেছিস্ নাকি?" বিনয় তাহাকে বসাইয়া তাহার আকস্মিক বিপৎপাতের কথা জানাইল, তাহা শুনিয়া নির্ম্মল জিজ্ঞাসা করিল, "জিনিষ-গুলা তবে কি হবে?" বিনয় বলিল,—"কি কোরব ভেবে ঠিক কোরতে না পেরেই তোকে জিজ্ঞাসা কোর্‌ছি।" "জিনিষগুলো ব্যবহার কর্‌না কেন? বিনু তোর শাশুড়ীত লোক মন্দ নয়? বেশ তত্ত্ব-তাবাস করে, চার পাঁচশ টাকা খরচ করে ফেলেছে।" "তত্ত্বটা আমার বড়ই গরম ঠেক্‌ছে এত গরম যে ওসব জিনিষ গায়ে ঠেকলে ফোস্কা পড়্‌বে, তুই ভাই কোনও রকমে জিনিষ-গুলো বাড়ী থেকে বিদেয় কর। আমার যেন দমবন্ধ হয়ে আসছে।" "তোর তাদের উপর এত রাগ কেন বিনু, তাদের অপরাধ কি? বিয়ে করেছিস্ যখন তখন ত আর ফেরাবার উপায় নেই, পরে কি কোরবি?" "কি কোরব তাত ভেবে ঠিক কোরতে পারিনি। অপরাধ এখন মোটের উপর দেখছি আমারি। সে সব কথা হোচ্ছে, তুই আগে জিনিষগুলা বিদেয় কর।"

নির্ম্মল এক মণিহারীর দোকানে গিয়া তাহাকে ডাকিয়া আনিল এবং তাহার সহিত দর ঠিক করিয়া জিনিষগুলা আধাদামে বেচিয়া ফেলিল। ঘর পরিষ্কার হইয়া গেলে নির্ম্মল বিনয়ের বিছানার উপর বসিয়া একটা সিগারেট ধরাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তুই কি কোরবি বল্ দেখি বিনু?" বিনয় বলিল, "দেশ ছেড়ে পালান ছাড়া আরত উপায় দেখছি না। সম্মুখে পূজা আস্‌ছে সে সময় বাড়ী যেতেই হবে, আর বাড়ী গেলে হয়ত বাবার হুকুমে শ্বশুরবাড়ী যেতেই হবে, কিন্তু আমি সে বাড়ীর ত্রিসীমানায় পা দিতে চাই না, তাদের অন্ন মুখে তুলতে আমার ঘৃণা আসে, কেবল তোর পাল্লায় পড়ে কাশীতে ক'দিন তাদের বাড়ীতে থাক্‌তে হয়েছিল।" নির্ম্মল হাসিয়া বলিল,—"বিনু তুই একেবারে ক্ষেপে গেছিস্, চল বেড়িয়ে আসি।"

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

বেড়াইয়া আসিয়া বিনয় একখানা চিঠি পাইল, লেফাফার উপরে হাতের লেখা দেখিয়া সে শিহরিয়া উঠিল। পত্রখানায় লেখা ছিল :—

শ্রীশ্রী৺দুর্গা ২০শে ভাদ্র
সহায়— ১৩০৮

চিরজীবেষু—

অনেকদিন তোমার পত্র না পাইয়া বড়ই চিন্তিত আছি। তোমার মাতাও অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া পড়িয়া-ছেন। হরিহরপুর হইতে তোমার মেজপীসা শাশুড়ী-ঠাকুরাণী তোমাকে তথায় লইয়া যাইবার জন্য ক্রমাগত পত্র দিতেছেন ও লোক পাঠাইতেছেন। এরূপ অবস্থায় তুমি তথায় না গেলে আমার বিশেষ অপমানিত হইতে হয়। অতএব তুমি পত্র পাঠ বাড়ী চলিয়া আসিবা, কলেজ কামাই বা পড়ার ক্ষতি ইত্যাদি বাজনকা ওজর আপত্য করিবা না—অত্র পত্রে আশীর্ব্বাদ জানিবা। ইতি

আশীর্ব্বাদক—
শ্রীহরশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

পত্র পড়িয়া বিনয় একটু ভাবিল, তাহার পরে কাপড় পরিয়া বাসা ছাড়িয়া চলিয়া গেল। পথে যাইতে যাইতে তাহার সহিত পরেশবাবুর দেখা হইল, তিনি পথ আগলাইয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, "হুজুর একটা নিবেদন"—বিনয় একবার পাশ কাটাইবার চেষ্টা করিল কিন্তু পরেশবাবুর বিরাট বপু সমস্ত ফুটপাথটা ব্যাপিয়া থাকায় রাস্তায় কাদায় নামা ব্যতীত তাহার আর কোন উপায় রহিল না। সে তখন পলায়নের চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া হাসিমুখে জিজ্ঞাসা করিল, "কি পরেশবাবু যে?" মুখে হাসিটা আনিতে তাহার যে পরিমাণ কষ্ট হইল তাহা বুঝিতে বুদ্ধিমান পরেশচন্দ্রের বাকী রহিল না। তিনি হাতজোড় করিয়া কাঁদ কাঁদভাবে বলিলেন, "হুজুর বড়ই ব্যস্ত তা বুঝতে পাচ্ছি, অধীনের অপরাধ নেবেন না,—তবে—এজে গিন্নীমা বড়ই ব্যাধরায়"—বলিতে

বলিতে পরেশচন্দ্রের দুই গণ্ড দিয়া অশ্রুধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল, তাহা দেখিয়া বিনয়ও একটু বিচলিত হইল। পরেশচন্দ্র ওস্তাদ্ লোক তিনি বিনয়ের মনের ভাব বুঝিয়া পথের মাঝখানে তাহার পা দুই খানা চাপিয়া ধরিল। বিনয় বলিয়া উঠিল, "করেন কি, করেন কি?" পরেশচন্দ্র ছাড়িবার পাত্র নহে, সে বলিয়া উঠিল, "ছোট জামাইবাবু একটু দয়া করুন, একবার চলুন, ব্রাহ্মণকন্যা যে মারা যায়।" বলিতে বলিতে পরেশচন্দ্র কাঁদিয়া ফেলিল, কলিকাতার রাস্তা, দেখিতে দেখিতে লোক জমিয়া গেল, বিনয়ের এমন অবস্থা হইল যে সে কোনমতে পরেশচন্দ্রের হাত ছাড়াইয়া পলাইতে পারিলে বাঁচে। সে বাধ্য হইয়া বলিয়া বসিল যে, "যাব বইকি নিশ্চয়ই যাব।" তাহা শুনিয়া পরেশ পা না ছাড়িয়াই জিজ্ঞাসা করিল,—"তবে গাড়ী ডাকি?" বিনয় বলিল,—"এখনই যাব কি পরেশ—বাবু? বাবা চিঠি লিখেছেন আগে একবার বাড়ী যেতে হবে।" পরেশচন্দ্র তখনও পা ছাড়েন নাই তিনি সেই অবস্থায় পথের মাঝখানে বসিয়াই বলিলেন, "তবে বাড়ীই চলুন, গাড়ী ডাকি?" পথের লোক জিজ্ঞাসা করিল, "কি হয়েছে গা, ছেলেটি বুঝি পালিয়ে এসেছে?" আর একজন বলিল,—"আহা চাঁদপানা ছেলে গো, আজকালকার ছেলেগুলো কি যাদুরই হয়েছে?" বিনয় বলিল, "পরেশবাবু পা ছাড়ুন, আমি কাল সকালের গাড়ীতে বাড়ী যাব। আপনিও না হয় সঙ্গে চলুন সেখান থেকে যাবার কথামত হরিহরপুর যাওয়া যাবে।"

আশ্বাস পাইয়া পরেশচন্দ্র পা ছাড়িল বিনয় ছাড়া পাইয়া ছুটিয়া পলাইল। পরেশবাবু তখন সহৃদয় শ্রোতাদের কাছে গিন্নীমার দুঃখ ও বিনয়ের নিষ্ঠুরতার পরিচয় দিতেছিলেন। বিনয় যতদূর সম্ভব ছুটিয়া চলিল, চীৎপুর রোডের কাছে গিয়া তাহার গতিভঙ্গ হইয়া আসিল, হঠাৎ তাহার নলিনাক্ষকে মনে পড়িয়া গেল। নির্ম্মলদের বাড়ীর গলির মোড়ে সে দাঁড়াইল। বিনয় ভাবিল যেমন করিয়াই হউক তাহাকে তখনই নির্ম্মলের সহিত দেখা করিতে হইবে। কারণ সেইদিনই তাহাকে বাড়ী রওনা হইতে হইবে। নির্ম্মলের সহিত কলেজে দেখা হইবার সম্ভব আছে বটে কিন্তু তাহাতে একটা বিপদের আশঙ্কা আছে—নির্ম্মল কলেজে গেলেও সকল সময় ক্লাসে যায় না। সে কি করিবে ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিল না। এই সময় কলেজের বুড়া দরওয়ান বক্তিয়ার তাহার সম্মুখে সেলাম করিয়া দাঁড়াইল, বিনয় মনে করিল—বে সে পূজার বখ্‌শিসের তাগীদ করিতে আসিয়াছে। বক্তিয়ার কিন্তু কোন কথা না বলিয়া পকেট হইতে একখানা চিঠি বাহির করিল। বিনয় চিঠি পড়িয়া দেখিল, যে পত্রখানি কলেজের হেড্ ক্লার্কবাবু লিখিয়াছেন। সে তখন পত্রখানা পকেটে ফেলিয়া নির্ম্মলদের বাড়ী চলিয়া গেল।

নির্ম্মল তখন বারাণ্ডায় বেড়াইতেছিল, সে বিনয়কে দেখিয়াই বলিয়া উঠিল,—"কিরে আবার কি হল?" "শমন এসেছে।" বিনয় তাহার পিতার পত্রখানা নির্ম্মলের হাতে দিল, নির্ম্মল তাহা পড়িয়া দেখিয়া বলিল, "তক্ত পরেশচন্দ্রের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই তলব এসেছে যখন, তখন বোধ হচ্ছে কথাটা অনেকদূর গড়িয়েছে। এখন তুই কি কোর্‌বি?" "কোরব আর কি বাড়ী যাব, পথের মাঝখানে পরেশচন্দ্রের হাতে পড়িছিলুম, এমন করে পা আঁকড়ে ধরেছিল যে হরিহরপুরে যাব কবুল করে ছাড়ান পেয়েছি।" "তবেত বিরহের পরে মিলনের ব্যবস্থা সবই হয়ে গেছে ভাই। আমরা সকলে এইখান থেকেই আনন্দ কোরব। তুমি যাচ্ছ বটে কিন্তু ফিরে এসো, আমার মত শ্রীরাম সুধামের যেন যমুনাপুলিনে কেঁদে কেঁদে না বেড়াতে হয়।" বিনয় বিরক্ত হইয়া বলিল,—"কি অ্যাঠাম করিস্ তার ঠিক নেই। কলেজের কেরাণী বাবু সেই চাকরীটার সম্বন্ধে এই চিঠিখানা লিখেছেন, তুই দেখা করে টিউশনিটা ঠিক করে রাখিস্। ছুটির পর থেকে নিশ্চয়ই পড়াব, হয়ত ছুটির আগেও আসতে পারি। কাল সকালেই বাড়ী যাব।" বিনয় নির্ম্মলের কাছে বিদায় লইয়া চলিয়া গেল।

দড়ির ভোজবাজী

[শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ঘোষ]

পাশ্চাত্য জাতিটাই অত্যন্ত ব্যবসাদার এবং তাহারা ব্যবসা জিনিষটা খুব ভাল রকমই বুঝিয়া থাকে। ব্যবসার জোরেই আজ ইংরেজ জাতি সমগ্র পৃথিবীর উপর এমন আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে। তারা যে শুধু টাকাই চেনে তা নয়, প্রকৃত গুণের আদর করিতেও জানে এবং গুণীর পেছনে হাজার হাজার টাকা অম্লানবদনে ঢালিয়া দিতেও তারা দ্বিধা বোধ করে না।

আমাদের দেশে এমন কত কি অদ্ভুত জিনিষ রহিয়াছে যার আমরা খবরও রাখি না অথচ সেই জিনিষই যদি আজ পাশ্চাত্যজাতি আসিয়া টানিয়া বাহির করে তবে আমরা বুক ফুলাইয়া গলা কাটাইয়া গর্ব্বের দুন্দুভী নিনাদ করিতে কিছুমাত্র লজ্জিত হই না। আমরা নিজে কিছু করিব তেমন সাহস এবং উৎসাহ আমাদের নাই অথচ পাশ্চাত্য দেশ হইতে একটা সামান্য কিছুর আমদানী হইলে আমরা বিস্ময়ে বিহ্বল হইয়া যাই। ম্যাজিক্ জিনিষটা পশ্চিমের আমদানী। কোন বিদেশী ম্যাজিশিয়ান আমাদের দেশে আসিলে তাহার পেছনে আমরা উধাও হইয়া ছুটি—টীকিট ঘরের ভিড় ঠেলিতে প্রাণ কণ্ঠাগত করিয়া ফেলি। আমাদের দেশেও ভোজবাজী, ভেল্কী বাজী, ভূমরী খেলা প্রভৃতি কত অদ্ভুত খেলা রহিয়াছে কিন্তু দেশবাসীর উৎসাহের অভাব এবং রীতিমত শিক্ষাদানের ব্যবস্থা-হীনতা এই স্বদেশী ক্রীড়াশিল্পগুলিকে একেবারে লোপ করিয়া দিতে বসিয়াছে।

আজ যে খেলা সম্বন্ধে কিছু লিখিতে বসিয়াছি তাহা সামান্য দড়ির ভোজবাজী, অথচ এই খেলা ভারতবর্ষ ছাড়া পৃথিবীর আর কোথাও আজ পর্য্যন্ত কেহ দেখাইতে পারে নাই। সেই হেতু এই খেলাটা বিশ্ববিখ্যাত হইয়া পড়িয়াছে—সভ্য জগতের অনেক জাতিই এই দড়ির ভোজবাজী দেখিবার জন্য ইহার কলাকৌশল আবিষ্কার করিবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা এবং অর্থব্যয় পর্য্যন্ত করিতে প্রস্তুত হইয়াছে কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে আমরা ভারতবাসী হইয়াও এ সম্বন্ধে কোন সংবাদ রাখা কিম্বা তথ্য সংগ্রহ করার আগ্রহ আজ পর্য্যন্তও কেহ প্রকাশ করি নাই।

ভোজবাজীটা এই প্রকার—বাজীকর একটা লম্বা দড়ি লইয়া তাহার একটা দিক আকাশের দিকে ছুঁড়িয়া দেয়, দড়িটা বরাবর উপরের দিকে উঠিয়া সোজা হইয়া শক্তভাবে ঠিক দাঁড়াইয়া থাকে, তারপর একটী ছোট ছেলে সেই দড়ি বাহিয়া একবার উপরে ও একবার নীচে উঠানামা করে। এই খেলা! কিন্তু কিভাবে যে দড়িটা শূন্যে উঠিয়া লোহার মত কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়া থাকে তাহাই হইল প্রধান সমস্যা।

এই দড়ির খেলার কথা অনেকদিন যাবতই লোকে শুনিয়া আসিতেছে এবং অনেক পাশ্চাত্য যাদুকর ভারতবর্ষে আসিয়া এই খেলাটা দেখিবার জন্য অনেক চেষ্টাও করিয়াছে কিন্তু চাক্ষুষ প্রমাণ তাহারা কেহই পায় নাই। চার্লস্ বেট্টাস নামক জনৈক ম্যাজিশিয়ান বলিয়াছে—আমি ভারতবর্ষের অনেক জায়গায়ই ঘুরিয়াছি এবং রাজা মহারাজা অনেককেই আমি তামাসা দেখাইয়াছি। দেশী বাজীকর যাহাদের খেলা আমি ভারতে থাকিয়া দেখিয়াছি তাহাদের কেহই আমাকে দড়ির খেলা দেখাইতে পারে নাই। ওটা একটা গল্পমাত্র—সবাই বলে বটে অমুকের কাছে শুনিয়াছি কিন্তু নিজ চোখে ওই খেলা দেখিয়াছে এমন কথা কেহ বলিতে পারে নাই।

বিলাতের "ম্যাজিক সার্কুলার" পত্রের সম্পাদক মিঃ ক্লার্ক "ডেইলি মেল" কাগজে লিখিয়াছেন—প্রায় পাঁচশত বৎসর যাবৎ দড়ির খেলাটা একটা ভারতীয় উপকথার মত চলিয়া আসিতেছে। প্রাচ্যের যত যাদুকর ইউরোপে তামাসা দেখাইতে আসিয়াছে তাহাদের কেহই এই দড়ির খেলাটা দেখাইতে পারে নাই। সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ড যখন ১৯০১ খৃঃ অব্দে যুবরাজরূপে ভারতে গিয়াছিলেন তখন এই খেলাটা দেখাইতে পারে এমন একজন বাজীকর খুঁজিয়া পাওয়া যায় কিনা তাহার জন্য বিশেষ চেষ্টা করা হইয়াছিল। লর্ড লন্স্ ডেল্ এজন্য ১০,০০০ পাউণ্ড

পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছিলেন, মেসার্স মাস্কলীন এণ্ড ডেভাট কোম্পানী ঘোষণা করিয়াছিলেন যে কোন ব্যক্তি যদি লণ্ডনে আসিয়া এই খেলা দেখাইয়া যাইতে পারে তবে তাহাকে খুব মোটা রকমের পুরস্কার দেওয়া যাইবে। কিন্তু বছরের পর বছর চলিয়া গেল—কেহ আসিয়া এই খেলা দেখাইয়া পুরস্কার লইয়া যাইতে পারিল না।

একজন উচুদরের ডাক্তার লণ্ডনের ম্যাজিক সংঘের সভ্যগণের নিকট একদিন বক্তৃতা করিয়া বলিলেন যে ভারতবর্ষে তিনি অনেক বছর কাটাইয়া আসিয়াছেন কিন্তু কোন বাজীকরের নিকটই এই দড়ির খেলা তিনি দেখিতে পান নাই—সুতরাং তাঁহার মতে এটা একটা অলস্তব গাঁজাখুরী, আজগুবী গল্প ছাড়া আর কিছু নয়।

লেফ্‌টেন্যাণ্ট্ হোম্‌স্ (v. c., M. M.) মিঃ ক্লার্কের লেখা পড়িয়া সেই "ডেইলি মেলে"ই তার জবাব লিখিলেন —তিনি শুধু এই দড়ির খেলাটা যে চোখে দেখিয়াছেন তাহা নয়—পরন্তু উহার একবার ফটোও তুলিয়া রাখিয়াছেন। ষ্ট্র্যাণ্ড ম্যাগাজিনে এ সম্বন্ধে তাঁহার যে বিস্তৃত চিঠিখানা বাহির হইয়াছে তাহার অবিকল বাংলা এখানে দেওয়া গেল—আমি তখন পুণার নিকটে কিরকী নামক স্থানে অবস্থান করিতেছিলাম—সেটা ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দের মে মাস। আমি একদিন আমার বাংলোর বারান্দায় দাঁড়াইয়া আছি—আরো কয়েকজন কর্ম্মচারীও সেখানে দাঁড়াইয়াছিলেন, এমন সময় একটী বৃদ্ধ আমাদের সম্মুখে আসিয়া বলিল সে তামাসা দেখাইবে। তাহার সঙ্গে একটী মাত্র বালক ছিল। বাংলোর সম্মুখের খোলা মাঠে সে তামাসা দেখাইতে আরম্ভ করিল। তাহার সঙ্গে কোন লম্বা বাঁশ ছিল না—থাকিলেও সেটা এমন জিনিষ নয় যে কাপড়ের ভিতর তাহা লুকাইয়া রাখা যাইবে। সে তাহার কোমরে জড়ান একটা লম্বা দড়ি ধীরে ধীরে খুলিতে আরম্ভ করিল এবং একটা মাথা আকাশের দিকে ছুঁড়িয়া মারিল। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে দড়িটা শূন্যে উঠিয়া তাহার হাতের উপর সোজাভাবে দাঁড়াইয়া রহিল এবং সেই বালকটী দড়ি বাহিয়া একেবারে উহার মাথায় উঠিয়া চড়িয়া বসিল! ঐ সময়কার একখানা ফটো আমি তুলিয়া রাখিয়াছিলাম। বালকটী ধীরে ধীরে দড়ি বাহিয়া নীচে নামিয়া আসিলে বাজীকর দড়িটা আবার গুটাইয়া কোমরে জড়াইয়া রাখিল। আমি এখানে এই ভোজবাজীর কোন মীমাংসা করিব না—শুধু যাহা চোখের সম্মুখে ঘটিতে দেখিয়াছি তাহাই এখানে বিবৃত করিলাম।

"ডেইলি মেলে" হোম্‌স্ যাহা লিখিয়াছিলেন তাহা পড়িয়া এফ, জি, স্মিথ্ নামক অনেক ইংরেজ লিখিলেন—আপনি যাহা লিখিয়াছেন তাহার সত্যতা সম্বন্ধে আমিও সাক্ষ্য দিতে পারি। ১৮৯৬ খৃঃ অব্দে আমি যখন কাশী ছিলাম তখন একজন ভারতীয় বাজিকর আমাদের অনেকের সম্মুখে ঐ দড়ির খেলা দেখাইয়াছিল। তার পরের বছর দিল্লীতেও আমি ঐ খেলা নিজ চোখে দেখিয়াছি। দিল্লীতে আমার একজন বন্ধু ঐ খেলা দেখিয়া বলিয়াছিলেন যে এই ব্যক্তিই গত বৎসর কাশীতে আমাদিগকে এই খেলা দেখাইয়াছিল। আপনি ভারতবর্ষে ১৯১৭ খৃঃ অব্দে এই ভোজবাজী দেখিয়াছিলেন এবং আপনি জানিয়া নিশ্চয়ই সুখী হইবেন যে এই খেলাই আমি ১৮৯৬ খৃঃ অব্দে নিজচোখে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। আমি না এই খেলার ভিতরে কি রহস্য লুকায়িত রহিয়াছে কিন্তু একথা জোর করিয়াই বলিতে পারি যে নিজ চোখে যাহা ঘটিতে দেখিয়াছি তাহা চোখের ধাঁধা, ভেল্কীবাজী কিম্বা গাঁজাখুরী গল্প বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারি না।

ইণ্ডিয়ান সোপ কোম্পানীর
মেসিনে প্রস্তুত
চন্দন, রয়েলবকুল, মাল্ট ও ভেলভেট সাবান
ব্যবহার করুণ। টেলিফোন, ২৪৯০

মাসিক-সাহিত্য সমালোচনা

প্রবাসী, আশ্বিন, ১৩৩০। আশ্বিনের প্রবাসীর ৭২৯-৮৭২ পৃষ্ঠার মধ্যে প্রায় অর্দ্ধেকের কাছাকাছি 'বেতালের বৈঠক,' 'আলোচনা,' 'মহিলা মজলিশ', "দেশবিদেশের কথা, এবং "বিবিধ প্রসঙ্গে" পরিপূর্ণ। এর মধ্যে এক বিবিধ প্রসঙ্গই কুক্ষিগতা। প্রবাসী নামক মাসিকপত্রখানা ক্রমশঃ একখানা মাসিক সংবাদপত্রে পরিণত হচ্ছে। শুনতে পাওয়া যায় যে, একশ্রেণীর পাঠক এরকম লেখাই পছন্দ করেন কিন্তু তাঁরা মাসিকপত্রের অঙ্গে সংবাদগুলো না পড়ে দৈনিক বা সাপ্তাহিক কাগজে পড়লেই পারেন। রামানন্দ বাবু যতদিন বেঁচে আছেন ততদিন এই শ্রেণীর লেখাগুলির কদর থাকবে বটে কিন্তু তারপর কি হবে? রামানন্দ বাবুর লেখার সঙ্গে 'মডার্ণ রিভিউ'তে অন্য যাঁরা যাঁরা নোট লেখেন তাঁদের লেখা ওঁর লেখার সঙ্গে মোটেই খাপ খায় না। এই শ্রেণীর লেখার ভাগ প্রবাসীতে ক্রমশঃই বেড়ে যাচ্ছে, কিন্তু তার জন্য প্রবাসী মাসিক পত্রখানি বড় যে উপাদেয় হচ্ছে, তা নয়। আমরা সভয়ে 'প্রবাসী'সম্পাদককে অনুরোধ করি যে, তিনি যেন এই সংবাদপত্রের ভারযুক্ত অংশগুলো একটু কমিয়ে এনে গল্প প্রবন্ধ উপন্যাসের সংখ্যাটা একটু বাড়িয়ে তোলেন।

প্রবাসীর প্রথম প্রবন্ধ শ্রীহীন মহেশচন্দ্র ঘোষ লিখিত "গৌতমের তপস্যা"; মহেশবাবু দার্শনিক তত্ত্বের লেখায় বেশ নাম কিনেছেন কিন্তু এই শ্রেণীর লেখা তাঁর মত লোকের মাসিক পত্রে ছাপানো উচিত নয়। বোধ হয় তিনি এসম্বন্ধে একখানি বই লিখছেন এবং সম্পাদকের বা প্রবাসীর কর্তৃপক্ষের অনুরোধে তার এক একটা অংশ যন্ত্রের মত নিরীহ বাঙালী পাঠকের উপরে নিক্ষেপ ক'রছেন। প্রবন্ধটি কু-লিখিত, অসম্বদ্ধ এবং দুষ্পাচ্য—এবে যে কি কারণে প্রবাসীর প্রথম-প্রবন্ধ করে ছাপা হয়েছে তা মোটেই বুঝতে পারা গেল না। বৃদ্ধের কতকগুলি কথার তর্জ্জমা করে বাঙলা সাহিত্যের যে কি উপকার হবে তাও বুঝতে পারা যায় না।

প্রবাসীর প্রথম গল্প, শ্রীহেমেন্দ্রকুমার বসুর "যৌবন-মৃত্যু" গল্পটির লেখা মন্দ নয়। গল্পের নায়ক তাঁর বিধবা ভ্রাতৃজায়াকে পরে বড় হ'য়ে উঠে কুমারী কন্যা মনে করে বিবাহ করেছিলেন সুতরাং এখন তার গল্প লেখকদের মতে খুব সুখরোচক হওয়া উচিত। কিন্তু লেখকের সৎসাহস একেবারেই নেই—কারণ তিনি "সাহিত্যের স্বাস্থ্যরক্ষা"র খাতিরে এ বিধবা কুমারীটিকে গলা টিপে মেরে ফেলতে বাধ্য হয়েছেন, কুমারীর বৈধব্যের পরিচয় পেয়েও তাকে যদি দেবরের স্ত্রী ক'রে দিতে পারতেন তাহলেই বোধ হয় 'আর্টিষ্টিক' হত। রামানন্দ বাবু শুনতে পাওয়া যায় শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বা নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত প্রভৃতি sensualistic লেখকদের পক্ষপাতী নন কিন্তু তাঁর কার্য্যের পরিচালকেরা এখন বাঙলা সাহিত্যে যে sensualismএর ধারা চলেছে তার প্রবাহ থেকে নিষ্কৃতি পান নি। শ্রীরাধাচরণ চক্রবর্ত্তীর "নিস্তাহারা" কবিতাটী গদ্য-পুরণের জন্য ব্যবহার হয়েছে বটে কিন্তু লেখাটি নেহাৎ মন্দ নয়। শ্রীনরেন্দ্রনাথ রায়ের "বিনিময় ও টাকার বাজারে বিনিময়-হার" লেখাটি বড়ই কর্কশ, এর ভিতরে সার আছে বটে কিন্তু লেখক জিনিসটা ভাল ক'রে ফোটাতে পারেন নি এবং সাধারণ পাঠক এ জাতীয় লেখা একবার পড়ে বুঝতে পারবে না। "রাজপথ," শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের ক্রমশঃ প্রকাশ্য উপন্যাস। ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক শ্রী বিনয়কুমার সরকার "জার্ম্মেন সাহিত্যের নব্য ক্লাসিক" নাম দিয়ে যে পৌনে দু'কলম জায়গা দখল করেছেন তা একেবারে অখাদ্য। নূতন জর্ম্মেন সাহিত্য সম্বন্ধে আমাদের দেশের লোক এখনো এত পণ্ডিত হয়ে ওঠে নি যে, সরকার মহাশয়ের এককলমের খোঁচায় তা বুঝে নেবে। সরকার মহাশয় যদি এসম্বন্ধে বাঙালীকে কিছু বলতে চান তাহ'লে একটু ভেবে চিন্তে পরিষ্কার ক'রে লিখলেই ভাল হয়। কেবল তিনি লিখেছেন বলেই যে তা পড়তে হবে, এদিন বাঙলা সাহিত্যের গেছে। সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের "ফুলের ফসল" প্রায় শেষ হয়ে এল। কবির হাতের এই ঐতিহাসিক উপন্যাসখানি নাম-ধাম পরিবেশ—আর পারিপার্শ্বিক—অনুসরণ—সকল বিষয়েই

সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয়েছিল, সত্যেন্দ্রনাথ যদি জিনিসটি সম্পূর্ণ করে যেতে পারতেন তাহলে জিনিষটি বাঙ্গালা সাহিত্যের একটা নূতন সম্পদ হোত। শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের বৃদ্ধবয়সের ক্রমশঃ প্রকাশ্য রচনা "প্রবাসীর আত্মকথা" বড়ই ছোট, সম্পূর্ণ দু'পাতাও নয়, এতটুকু লেখা পড়ে কখনো তৃপ্তি হয় না। অনুবাদটী তবে বড়ই সুন্দর। সম্পাদক মহাশয় যদি "শ্রীবিহীন শিবরাম চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের বর্ষাগান নামক কাকের গান জাতীয় কবিতাটি পাদপূরণের জন্য না ছেপে এই ক্রমশঃ প্রকাশ্য অনুবাদটীর আরো একটু ছাপাতেন তাহলে প্রবাসীর অনেক পাঠকই তৃপ্ত হোত। শ্রীঅনাথবন্ধু সরকারের "রক্ষিত ফল ও অন্যান্য ব্যবসায়" নামক প্রবন্ধটি সারযুক্ত—মাসিক পত্রে এজাতীয় প্রবন্ধ যে কি ফল হয় তা বুঝতে পারা যায় না। আজকাল অনেক মাসিকপত্রেই এ রকম প্রবন্ধ দেখতে পাওয়া যায়। বিলাতী মাসিকপত্রে ছবি, ডায়গ্রাম নক্সা সমেত এই শ্রেণীর প্রবন্ধ ছাপা হয় বটে কিন্তু ছবির সাহায্যে সেগুলি কিছু বুঝতে পারা যায়। লেখকেরাও শ্রেণীবিভাগ করে বিষয়ের তারতম্য অনুসারে লেখেন কিন্তু অনাথবাবুর প্রবন্ধটি ছবির অভাবে এবং বিষয় নির্ব্বাচনের দোষে একেবারে অপাঠ্য হয়েছে। শ্রীসুনির্ম্মল বসুর "সন্ধ্যায়" কবিতাটি প্রবাসীর ৭৭৩ পৃষ্ঠার শেষাংশে পূরণ করবার জন্য ছাপা হয়েছে কিন্তু ঐ স্থানটা সাদা থাকলেই বোধ করি ভাল হ'ত। বাঙলা দেশের বড় বড় মাসিকপত্রগুলো এ বিষয়ে ইংরাজী বা ফরাসী মাসিকপত্রগুলির অনুকরণ করলে ভাল হয়।

শ্রীমনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের "বিদায় বরণ" গল্পটি একটি প্লটবিহীন বিশেষত্ববর্জ্জিত ছোট গল্প, গল্পের না আছে মাথা, না আছে মুণ্ডু। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সমাজের উপর লেকচার বর্ষণ করেছেন কিন্তু কি ব'লেছেন তা নিজেই বুঝেন নি। ভাষা রবীন্দ্রনাথের sixth-class অনুকরণ। বাঙ্গালা দেশের মাসিকপত্র এ জাতীয় আবর্জ্জনা থেকে কবে যে মুক্ত হবে? একটু নমুনা দেবার লোভ ছাড়তে পারলুম না। "হরসিন্ধুর - জলতরঙ্গের তালে তালে মিশে যাচ্ছে—মরণ সঙ্গীতের করুণ মূর্চ্ছনা। আর তারই সঙ্গে সঙ্গে হচ্ছে,—ও বুঝি—কোন্ দানবীয় বিসর্জ্জনের উলুধ্বনি। এস কাণ্ডারী! তোমার তরী নিয়ে,—আমার পার ক'রে দাও। ফেলো, স্বামী, এই জন্মঅভাগিনীর শূন্যশয্যার শিয়রে দাঁড়িয়ে, এই উপেক্ষিতার উদ্দেশে তোমার পাষাণ প্রাণের একবিন্দু অশ্রুজল।" ভাষা ও ভাব দুটোয় মিলে সাহিত্যের শরশয্যা সৃষ্টি ক'রেছে। "বেনো জল" ক্রমশঃ প্রকাশ্য উপন্যাস। শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায় একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক, তবে লেখাটা শেষ না হ'লে কোন কথাই বলা চলে না। শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচীর "নীলকণ্ঠ" চলনসই রচনা, এটা বাগচী কবির সাধের ভূরীভোজনের অজীর্ণ উদ্গারের মত নয়। অনেকদিন পরে অমিয়া চৌধুরীর "আশ্বাস" কবিতাটিতে পবিত্র অনুকরণহীন অমিত্রাক্ষর ছন্দের রচনা দেখা গেল। রচনাটি সুন্দর, এমন রচনা পাদপূরণের জন্য "বেতালের বৈঠকের" পদতলে পেষণ না করে ভাল জায়গায় ছাপা উচিত ছিল। কবি সম্ভবত মহিলা, কিন্তু শ্রীযুক্ত বা শ্রীমতী পাঠের অভাবে তাঁর পরিচয়টা নির্ণয় করা গেল না। "হারামণি" জিনিষটি আরম্ভ করে প্রবাসী বাঙ্গালা সাহিত্যের লুপ্তরত্ন উদ্ধারে মন দিয়েছেন। বাঙলার গ্রামে গ্রামে এখনো অনেক মণিরত্নের সন্ধান পাওয়া যায়, সেগুলো খুব দ্রুত লোপ পাচ্ছে। শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়ের "দরিদ্রের জাগরণ" নামক কবিতাটি, মন্দ নহে। শ্রীপ্রভাত সান্যালের "অজন্তার পথে" প্রবন্ধটি 'মডার্ণরিভিউ' পত্রের একটি প্রবন্ধের অনুবাদ। অনুবাদকের উদ্যম প্রশংসনীয় কিন্তু তিনি কখনো অজন্তার দিকে যান নি বলে জিনিসটি ভাল ক'রে ফোটাতে পারেন নি। প্রবাসীর মাননীয় সম্পাদক মহাশয় যে লোক অজন্তা দেখেছে তাঁকে দিয়ে এ প্রবন্ধটি লেখালে ভাল করতেন। অজন্তা কোথায়, সেখানে এখন কেমন ক'রে যেতে হয়, খানসেশে আর দাক্ষিণাত্যের উপত্যকায় কি প্রভেদ, কর্দ্দাপুরের গিরিসঙ্কটের ঐতিহাসিক বিবরণ—এসমস্ত সংগ্রহ ক'রে তবে অজন্তার কথা লেখা উচিত ছিল। ছবিগুলি বেশ ভাল, প্রবন্ধটি বেশ ভাল হয়ে জমলে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হত। "পিপুলের চাষ" আর একটি অখাদ্য রচনা, তার না আছে মাথা না আছে মুণ্ডু। "আলোচনা" বিভাগে যে দুটি কথা ছাপা

হয়েছে, সংক্ষিপ্তসার হওয়ায় তার একটিও ভাল করে কোটেনি। শ্রীগিরিজানাথ মুখোপাধ্যায়ের "ভিখারী" কবিতাটি ভাল, কিন্তু সেটিকে টিপে মারা হয়েছে। আম্বারীর মত আতোপটী এক ওজনে লেখা হয়নি, সুতরাং যতি ভঙ্গ হয়ে গেছে। "কষ্টিপাথর" বিভাগের জিনিসগুলি ভারি সুন্দর। বাছাই করা নিতান্ত সহজ কাজ নয়, এতে একটু নজরের দরকার আর সেই নজরটুকু আছে বলে প্রবাসী হাজার দোষ স্বত্বেও এখনো বাঙলাদেশের সমস্ত মাসিক পত্রের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। শ্রীবীরেশ্বর বাগচীর "রবারের কথা" সন্দর্ভটি মন্দ নয়। "প্রাচীন ভারতে অলঙ্কার", শ্রীরমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর ব্যর্থ রচনা, লেখক যা লিখতে গিয়েছিলেন, তার সম্বন্ধে তিনি কতটা জানেন তা বুঝতে পারা যায় না। যে জিনিসটা তিনি বোঝাতে চান সেটা ঠিক প্রবাসীর এক পাতায় শেষ করা যায় না। প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের ভিন্ন ভিন্ন যুগে ভিন্ন ভিন্ন রকমের অলঙ্কার ব্যবহার হত সুতরাং প্রাচীন ভারতের অলঙ্কারের শুধু বিভাগ না করে এ বিষয়ে কিছু লিখতে যাওয়া নিতান্ত ধৃষ্টতা। শ্রীনরেন্দ্র দেবের "মরণ কথা" কবিতাটি মন্দ নয়, তবে ছন্দের ঘোরে আলাপের তারটি ভাল করে বাঁধেনি। জায়গায় জায়গায় একটু কাণে বাঁধে :—

যেমন— "কি আশে আসি, পিয়াসী কি যে—
সে কথা আমি জানিনি নিজে ;
জানি গো শুধু তোমার দেখা নিয়ত আঁখি যাচে।"

শ্রীসুরেশচন্দ্র নন্দীর "আহরা" পদ্যের পাদপূরণের কবিতা, না ছেপে ছিঁড়ে ফেলা উচিত ছিল। শ্রীপুলিন-বিহারী দাসের "লাঠি খেলা ও অসি শিক্ষা" ক্রমশঃ প্রকাশ্য সচিত্র প্রবন্ধ।

প্রবাসীর প্রবন্ধগৌরব দিন দিন হীন হয়ে আসছে, কেন, সেটা বোঝা যাচ্ছে না। শ্রীব্রজাঙ্গন।

তপস্বী

[শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়]

একজন লোক ছিল। সে ছিল তপস্বী।

উঁচু পাহাড়ের এক গুহায় সে বাস করত। সবাই বলত জ্ঞানী ছিল সে খুব। পাহাড়ের গা বেয়ে অনেক লোক যাওয়া আসা করত তাঁকে দেখবার জন্য। তাঁর একটী কথা শুনবার জন্য। একদিন একটী স্ত্রীলোককে তাঁর গুহার কাছে দেখা গেল। জানিনা তাঁর কালো চোখেই যেনকার দৃষ্টি লুকানো ছিল, না চলার ভঙ্গিতেই উর্ব্বশীর নৃত্যের ছন্দ ছিল.....

সে ছিল যুবতী.....

একজন লোক ছিল। সে ছিল স্ত্রীলোক.....

গুহার ভিতর থেকে মাঝে মাঝে শিশুর কান্নার শব্দ ভেসে আসত.....

কিন্তু সেখানে তপস্বী আর কেউ ছিলনা।

শ্রেণী-বিভাগ—পুরুষের শ্রেণী-বিভাগ করতে হবে তাদের বুদ্ধি অনুযায়ী—স্ত্রীলোকের শ্রেণী-বিভাগ করতে হবে তাদের প্রেমের পাত্র অনুযায়ী।

সমস্যা—বিয়ে পুরুষ ও নারীকে এক করে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে কার অবস্থিতিটা ধরে নেওয়া হবে।

কল্পিত কথা—কোন ও ফরাসী কবি বলেছেন—যারা কখনও কোন বিদ্রোহের ষড়যন্ত্র করেনি—উত্তেজনার অনুভূতির জন্যে তাদের স্ত্রীলোকের মুখপানে তাকান উচিত।

ব্যবসায়ীর সাফল্য—স্ত্রীলোকের সাবধানে চুম্বন করা উচিত। তাঁর মনে রাখা উচিত ব্যবসার সাফল্য খরিদ্দারের ঘন ঘন আসার উপর নির্ভর করে।

সাধারণ ব্যাপার—এমন ব্যাপার প্রায়ই দেখা যায়না যে একজন লোক তার স্ত্রীর সঙ্গে কোন গুরুতর বিষয় নিয়ে দশ মিনিটের বেশী আলোচনা করে।

পার্থক্য—এটা দেখা গেছে পুরুষ ছোটকে সব চাইতে মধুর স্মৃতি বলে মনে রাখে প্রায় স্ত্রীলোকই অথবা কেউ কেউ অধিকাংশ সময়েই সেটাকে ভুলতে চেষ্টা করে।

আকর্ষণ শক্তি—যে স্ত্রীলোক সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে শিল্পই হোক্ কেরীতেই হোক্ সে সবার কর্ণ ও আকর্ষণ করবে।

Printed by Bijoy Krishna Dass at the Lakshmibilas Press,
14, Jagannath Dutta Lane, Calcutta.

কমলা

সচিত্র সাপ্তাহিক পত্রিকা

২য় বর্ষ] ১লা অগ্রহায়ণ শনিবার ১৩৩০, ইং ১৭ই নভেম্বর [১৮শ সংখ্যা

আলোচনা

দেখিতে দেখিতে একটির পর একটি করিয়া বিংশতিটি গান্ধী পুণ্যাহ এই দুর্ভাগ্য ভারতের উপর দিয়া চলিয়া গেল। আজ বিংশতি গান্ধী পুণ্যাহের স্মরণীয় দিবস। জাতি বর্ণ নির্ব্বিশেষে আজ প্রত্যেক ভারতীয় নর নারীকে স্মরণ করিতে হইবে যে ভারতের মুক্তিমন্ত্রের ঋষি ভারতীয়ের মুক্তির কথা গাহিতে গিয়াই দেশের কারাগারে আবদ্ধ হইয়া আছেন। ভারতীয়েরা মুক্তি যদি চাহিত—ব্যক্তিগত, সমাজগত, রাষ্ট্রগত মুক্তিই যদি তাহাদের কামনা হইত—জগতের সম্মুখে মানুষ বলিয়া পরিচিত হইবার ইচ্ছা যদি তাহাদের প্রাণে জাগিত তবে মহাত্মার মুক্তিমন্ত্র ভারতীয়দের নব-জীবন দিতে পারিত। ভারতীয়েরা বুঝি মুক্তির আহ্বানে ভীত হয়, সত্যের ডাকে শঙ্কিত হয়, সত্য মানুষকে দেখিয়া কম্পিত হইয়া ভয়ে চক্ষু মন আবরিয়া ফেলে, তাই এমন সত্যাগ্রহী যুগাবতার মহাপুরুষকে পাইয়াও তাহাকে চিনিতে পারিল না, তাঁহার সত্য মর্য্যাদা দিতে পারিল না—তাঁহার বাক্য ও কর্ম্ম মনে প্রাণে গ্রহণ করিয়া কর্ম্ম ক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে পারিল না। ভারতের নরনারী কি তাহাদের প্রাণশক্তি একেবারে হারাইয়া ফেলিয়াছে—তাহাদের ঘুম-ঘোর কি এখনও ভাঙ্গে নাই? একটা বিরাট দেশের কোটি কোটি নর নারীর কত যুগ সঞ্চিত দীর্ঘ নিঃশ্বাস আর প্রাণের হাহাকার বেদনায় যে এমন যুগাবতারের জন্ম হয়, তাহা কি দেশবাসী এখনও বুঝিতে পারিবে না? আজ যাঁহাকে আমরা পাইয়া হারাইতে বসিয়াছি তাঁহাকে কি আর পাওয়া যাইবে? আবার সমগ্র জাতির কত যুগ কত দীর্ঘ বরষ মাসের হাহাকারে ব্যথিত হইয়া ভগবানের আসন টলিয়া যদি এমন পুরুষোত্তমের জন্ম হয়। কিন্তু জাতি কি আবার সেই হাহাকারের জন্য প্রস্তুত হইবে?

* * * *

যে বিরাট পুরুষের মুক্তির আহ্বানে একদিন নিখিল ভারতের বিভিন্ন জাতি বর্ণ ও ধর্ম্মের নর নারী, উচ্চ নীচ ধনী নির্ধন সকলেই এক তার এক সুর এক লক্ষ্য

হইয়া সত্য লক্ষ্য পানে ছুটিয়া চলিয়াছিল আজ তাহাকে কারাগারে বন্ধ রাখিয়া দেশবাসী তাহাদের লক্ষ্য ভুলিয়া গিয়াছে—জাতি ছত্র ভঙ্গ লক্ষ্য-হারা হইয়া আবার আঁধারে ঘুরিয়া মরিতেছে। আশার আলো যেন নিভিয়া গিয়াছে। কোন পথ—কোন পথ—কে এই ভীষণ অন্ধকারে পথ দেখাইয়া লইয়া যাইবে—কে পথের সন্ধান বলিয়া দিবে—সমগ্র দেশের নরনারীর মনে এ কথা ক্ষণে ক্ষণে জাগিতেছে। কিন্তু লক্ষ্য-হারা পথ-হারা জাতি যে তাহার আশার আলোক নিজের আঁধার মনের কোণে ফেলিয়া রাখিয়াছে—পথের সন্ধান মিলিবে কোথা হইতে?

• • • •

দুর্ভাগ্য এই ভারতের—আর ভারতমাতার প্রাণহীন সন্তানদের। আজ ভারতমাতার এই উজ্জ্বল সন্তানটির কথা স্মরণ করিতেছেন দেশ বিদেশের মনীষীগণ—আর ভারত নিজে বোধ হয় তাঁহার কথা ক্রমেই বিস্মৃত হইতেছে। মুক্তির এত বড় একটা আন্দোলন—সত্যকে পাইবার এমন একটা বিরাট অভিযান, মনুষ্যত্বকে উদ্বোধিত করিবার এমন সঞ্জীবনী সুধা মহাত্মার মত কে আর জগতে এমন বিলাইয়াছেন? সত্যের মর্য্যাদা আবার সত্যভাবে প্রতিষ্ঠিত করাই ছিল মহাত্মা গান্ধীর জীবনের ব্রত। মানুষ আজ আপন মহত্ত্ব, মনুষ্যত্ব উচ্চভাব ভুলিয়া মিথ্যার জঞ্জালে ব্যভিচারে নিমজ্জিত হইয়া পড়িয়াছে। এই মিথ্যার মোহেই মানুষের ধ্বংশ আসিবে। মানুষের ধ্বংশের মুখ হইতে ফিরিয়া আসিবার এই যে মহা-প্রচেষ্টা মহাত্মা ইহার অতি অতি পরিষ্কার রূপ দিয়াছেন। যুক্ত পুরুষপ্রধান তিনি যুগে যুগে তিনি উজ্জ্বল রহিবেন। কিন্তু যাঁহাদের মুক্তির জন্য এই যুগাবতারের আত্মদান তাহাদের মুক্তি আর কবে হইবে কে জানে?

• • • • •

আজ জগতের সকল দেশের সকল জাতি ও মানবই মুক্তির জন্য চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। মানুষের অন্ন বস্ত্রের সমস্যা যতই তীব্র হইতেছে মুক্তি কামনাও ততই প্রবল হইতেছে। আজ রাজনীতি, ধর্মনীতি সকল নীতির উপর জাগিয়া উঠিয়াছে মানুষের অন্ন বস্ত্র পাইবার নীতি। জগতের দুঃখ দারিদ্র্য ক্রমেই বাড়িতেছে—মানুষের খাইবার পরিবার ভাবনা ক্রমেই বেশী হইতেছে। বিষাদ, ঘৃণা দাক্ষিণ্য প্রভৃতি গুণাবলী ক্রমেই মানুষের ভেতর হইতে লোপ পাইতেছে—তাহার স্থানে জাগিয়া উঠিতেছে হিংসা, দ্বেষ প্রভৃতি বৃত্তিগুলি! ইহার পরিণাম কি হইবে কোন পথে জগতের গতি যাইবে কেহ বলিতে পারে না। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দু'জগতেরই একই অবস্থা! অন্ন সমস্যা সর্ব্বত্রই প্রবল—দুই দেহই নহে। কিন্তু অন্যান্য দেশ শিল্পে বাণিজ্যে তবু যা'হোক করিয়া বাহিরের পয়সা কুড়াইয়া আনিতেছে কিন্তু ভারতের শিল্প বাণিজ্য সব প্রায় মৃত। ভারত বাহিরের দেশের শিল্প ও বাণিজ্যের প্রশ্রয় দেয়, অথচ নিজের দেশে তাহার কিছুই নাই। কৃষিজাত পণ্য যাহা দ্বারা ভারতের দু'পয়সা বাহির হইতে আসিতে পারে তাহারও লাভালাভ দর নির্দ্ধারণ প্রভৃতি নির্ভর করিতেছে বাহিরের ক্রেতার উপরেই। এ অবস্থায় ভারতের ভাগ্যে যে দারিদ্র্য ও হতাশা ক্রমেই বাড়িয়া যাইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি? ভারত বর্ত্তমানে এই অবস্থা হইতেই বাঁচিতে চাহিতেছে—কিন্তু দেশকে বাঁচাইতে পারে কে—উপায় কাহার হাতে?

• • • •

আমাদের ঘরে যাইবার নাই পরিবার কাপড় নাই যেন সব দিক্ দিয়া দুর্দ্দশাগ্রস্ত পশু কিন্তু ইহার মধ্যেও ব্যভিচার—দ্বেষ হিংসা-নিজেদের মধ্যে কাটা-কাটী মারা-মারির ত্রুটি নাই আমাদের। হিন্দু মুসলমানে রেষা-রেষি লাগিয়া আছে—হিন্দুতে হিন্দুতেও সদ্ভাব নাই। দেশীয়দের নিজেদের মধ্যেই এইরূপ ব্যাপারের সংবাদ প্রত্যহ শত শত পাওয়া যাইতেছে—মরিতে বসিয়াও আমাদের যদি এই আত্ম-কলহের প্রবৃত্তি না যায় তবে আর কি হইবে? কোন দেশের ধ্বংশের সময় বুঝি তাহাদের নিজেদের মধ্যে এমনি নীচ ভাব জাগিয়া উঠে।

• • • •

নারী নির্য্যাতনের সংবাদ দেশে নিত্য পাওয়া যাইতেছে। হীন জাতির আর কোন গুণ থাক আর

না থাক্ নিজেদেরই মা বোনদের নির্য্যাতিত করিবার লোক তাহাদের আছে যথেষ্ট। এই নারী নির্যাতন ব্যাপারে বোঝা যায় দেশের পুরুষ শক্তি আজ জাগ্রত নাই—নারীরাও তাহাদের শক্তি হারাইয়া ফেলিয়াছে। দুষ্টের শাসনের জন্য সমাজ কি কোন ব্যবস্থা করিতে পারে না? দেশের যুবকমণ্ডলীই বা নীরব কেন? অত্যাচারকারী হিন্দুই হোক আর মুসলমানই হোক কোন হিন্দু বা মুসলমানই তাহাদের সমর্থন করিতে পারে না। সমাজের কেহই যাহা ভাল চোখে দেখে না সমাজের বুকের উপর বাস করিয়াও তাহা কি ভাবে চলিতে পারে। দেশবাসী আজ পল্লীতে বাস করিতে ভয়ে ভীত শঙ্কিত হইতেছে কখন কাহার স্ত্রী, কন্যা, ভগিনীর উপর অত্যাচার হয়। নিজেরাই আমরা আমাদের ভগিনী, মায়ের উপর অত্যাচার করিতেছি। তাই প্রথমে আত্ম-শাসন করিয়া আমাদের মানুষ হইয়া সবল হস্তে ইহার প্রতিকারের জন্য দাঁড়াইতে হইবে—রাজশক্তিরও এ বিষয়ে অবহিত হওয়া কর্ত্তব্য। এমন শাস্তি এই সব পাষণ্ডদের দেওয়া উচিত যে ও পথে যাইতেও তাহাদের অন্তরাত্মা কাঁপিয়া উঠে।

• • • •

দেশ আজ অ-সহযোগ ভুলিয়াছে—স্বদেশী বস্ত্র খদ্দর বুনন ও প্রচারের উৎসাহ নাই। আত্ম-শক্তি জাগরণের সে সাধনা নাই। অমন যে বিরাট পুরুষ মহাত্মা গান্ধী যাঁহার ত্যাগ কর্ম্ম ও সাধনার দিব্য জ্যোতিতে সারা দেশ মাতিয়া উঠিয়াছিল তাহাকে পর্য্যন্ত লোকে ভুলিতেছে। দেশ নাকি একটা মস্ত বড় জিনিস কৌন্সিল প্রবেশ লইয়া মাতিয়াছে। এই ভোট সংগ্রহ ব্যাপারে জনমত জাগিবে সন্দেহ নাই—কিন্তু অসম্ভব কিছু ইহা দ্বারা হইবে না। ন্যাশনালিষ্ট পার্টির নেতা শ্রীযুক্ত সতীশরঞ্জন দাশ যাহা তাঁহার আবেদন পত্রে বলিয়াছেন তাহার বেশী অসম্ভব কিছু কৌন্সিলে পাইবার আশা নাই। কৌন্সিল ভাঙ্গিয়া ফেলিবার আশাও কাহারও সার্থক হইবে না। বৃটিশ রাজনীতির গঠন প্রণালীই তাহা নহে। যাহ আস্কাসন এখানে ব্যর্থ হইয়া যাইতে বাধ্য হইবে। এই আন্দোলন মিটিয়া যাইবার পর আবার দেশবাসী হইতো এক্বার ভাবিবে যে মহাত্মার অ-সহযোগই ভাল না এই সব ছাট-ছুট আন্দোলনে মত্ত হইয়া মূল কার্য্য ভুলিয়া যাওয়া ভাল!

• • • •

সম্প্রতি বিলাতে ইম্পিরিয়াল কন্‌ফারেন্সের অধিবেশন হইয়া গেল। আলোচ্য বিষয় ছিল বৃটিশ উপনিবেশ সমূহে ভারতবাসীর স্থান। বিগত ১৯২১ সনে ঔপনিবেশিক মন্ত্রীসভার অধিবেশনের পর হইতেই উপনিবেশ সমূহ স্ব স্ব অধিকারের মধ্যে জাতি বা ব্যক্তিবিশেষের অধিকার সঙ্কোচবিষয়ে পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করে। ফলে আফ্রিকা ভারতবাসীর অমর্য্যাদা করে। কেনিয়ায় ভারতবাসীর অপমানও সেই অধিকারেরই ফল।

• • • •

এবার ইম্পিরিয়াল কন্‌ফারেন্সের অধিবেশনে আলোয়ারপতি ও সার তেজবাহাদুর সাপ্রু লাঞ্ছিত ভারতের মর্ম্মব্যথার কাহিনী ইংরাজ জাতির গোচর করেন। অবশ্য ইহা যে ইংরাজ জাতির অজ্ঞাত ইহা হইতে কেহ যেন সে কথা মনে না করেন। প্রত্যেক ইংরাজ—অবশ্য যাঁহারা ভারতবর্ষ সম্বন্ধে বিন্দুমাত্রও চিন্তাশক্তির অনুশীলন করেন—এ কথা ভাল করিয়াই জানেন কিন্তু তথাপি প্রকাশ্য আলোচনায় এ প্রসঙ্গটা চাপিয়াই যাওয়া হয়। এবার ভারতসচিব লর্ড পীল মহোদয়ের সহায়তায় উক্ত ভারতবাসীদ্বয় এই কাহিনী ব্রিটিশ পার্লিয়ামেন্টের গোচর করিয়াছেন।

• • • •

যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন ইহাতে কি ফল লাভ হইয়াছে—তবে অবশ্যই বলিতে হয় যে কিছুই হয় নাই। কিন্তু তাহা হইলেও এটুকু স্বীকার করিতে হইবে যে এই ব্যাপার হইতে ভারতবাসী অনেক শিক্ষালাভ করিয়াছে। জেনারেল স্মাট্‌সের মত দম্ভ-গর্ব্বিত ব্যক্তির উক্তিতে ভারতবাসী মাত্রেরই যথেষ্ট শিক্ষা হওয়া উচিত—তিনি বলেন, যাহারা নিজের দেশে পূর্ণ অধিকার পায় না—তাহারা বিদেশে সে অধিকারের দাবী করে কোন সাহসে?

প্রাচীন পরকীয়াবাদ

[শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়]

যোপার্জিত বস্তু অপেক্ষা অপহৃত বস্তুর মূল্য মানবের নিকট চিরদিনই অধিক, কেন? তাহা বলিতে পারা যায় না। উত্তরাধিকারগত এই চৌর্য্যবৃত্তিপ্রিয়তা মানব-সমাজের সর্ব্বত্রই একরূপ। নারী যে প্রাগৈতিহাসিক যুগে নরের সম্পত্তিরূপে পরিগণিত হইয়াছিল সেই যুগ হইতেই নর অপরের সম্পত্তিভূতা নারীকে অপহরণ করিয়া অথবা তস্করের ন্যায় গোপনে উপভোগ করিয়া তৃপ্তি লাভ করে। আমাদের দেশে সমাজ-বন্ধনের পরে নারী ব্যক্তিবিশেষের সম্পত্তি ছিল না। প্রাচীন আর্য্য সমাজে বিবাহ বন্ধন ছিল না, ব্যভিচার সামাজিক দোষাবহ বলিয়া নিরাকরণীয় ছিল—সত্যকাম জাবাল গৌতম বংশীয় অটিনা ও প্রচেতাগণের পত্নীরূপাখ্যানে তাহার প্রকৃষ্ট নিদর্শন। মুনি শ্বেতকেতু তাঁহার পিতার সম্মুখে তাঁহার মাতাকে অপর পুরুষ ভোগার্থে আকর্ষণ করায় বিবাহ-বন্ধন প্রচলিত করিয়াছিলেন। সেই সময়ে আর্য্য-সমাজ বিবাহ-বন্ধনের আবশ্যকতা বুঝিয়াই শ্বেতকেতুর প্রস্তাব গ্রাহ্য করিয়াছিলেন। প্রতিবেশীর উদ্যানের ফলের ন্যায় প্রতিবেশীর স্ত্রী-উপভোগ যে মিষ্টতর তাহা আধুনিক হাবভাব বলিবার বহু পূর্ব্বেই পৃথিবীর সকল দেশেই বিজ্ঞাত ছিল। এই জন্যই প্রাচীন ইহুদী ধর্ম-শাস্ত্রকার ঈশ্বরের নামে বলিয়া গিয়াছেন "Covet not thy neighbours wife" দ্বিসহস্র বৎসর পূর্ব্বে কামশাস্ত্র রচয়িতা বাৎস্যায়ন বলিয়া গিয়াছেন, "বেত্তায় পুনর্ভূং চ ন শিষ্যো ন প্রতিষিদ্ধঃ, স্বধার্ম্মা।" অমরুশতকনায়ী কামসূত্রের টীকায় পুনর্ভূ শব্দের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন, "যা অক্ষতপূর্ব্বাঃ কক্ষতযোনয়োঃ বিধবা ইন্দ্রিয়দৌর্ব্বল্যাদিনাক্ষ পুনর্ভবতি; তাক্ষ বীক্ষতাক্ষ, বেত্তায় চ সামান্যস্ত্রীষু প্রভুত্বমানো ন শিষ্টঃ—ন বিহিতঃ, তত্র সবর্ণাপরিগ্রহে তৎপরিগ্রহস্য অনভিহিতত্বাৎ। পরিগৃহ্যাপি ন প্রতিষিদ্ধত্বাৎ পরিগৃহ্যাপ্রতিষিদ্ধঃ।" অর্থাৎ—

"অক্ষতপুরুষ যাহাকে ভার্য্যারূপে পূর্ব্বে গ্রহণ করিয়াছিল সে ক্ষতযোনি হইয়া (অক্ষুণ্ণতী হইয়া পরে) বিধবা হইলে যদি ইন্দ্রিয়দৌর্ব্বল্যবশতঃ আবার অক্ষতা হয়, তবে তাহাকে পুনর্ভূ বলা যায়। সে বীক্ষিত হইলে, তাহাতে যে প্রভুত্বমান সংযোগ, সে সংযোগ সম্বন্ধে কোন বিধিই দেখিতে পাওয়া যায় না। তবে তাহার মধ্যে বিশেষ এই আছে যে, সবর্ণা স্ত্রী পরিগ্রহ না করিয়া সেই বিধবার পরিগ্রহ কুত্রাপি কথিত হয় নাই। কিন্তু সবর্ণার পরিগ্রহ করিয়া পরে কাম লালসা পরিতৃপ্তির জন্য বিধবার পাণিগ্রহণ করিতে পারে, তাহা নিষিদ্ধ নহে। অগ্রেই বিধবার পরিগ্রহ করিলেও কুত্রাপি তাহার নিষেধ না থাকায় অগ্রে বিধবা বিবাহ পরিগৃহ্যাপ্রতিষিদ্ধ—অর্থাৎ, প্রাহ্য, নিষিদ্ধ নহে। পরিগৃহ্যাপতিষিদ্ধ, পরিগ্রহের যোগ্য, অথচ নিষেধের বিষয় নহে; সুতরাং সুখের জন্যই যাহারা ভ্রমণ করিয়া বেড়ায়, তাহারা অনায়াসে বিধবার পরিগ্রহ করিয়া কাম লালসার নিরাবধি পরিতৃপ্তি করিতে পারে।" (বাৎস্যায়ন বিরচিত কামসূত্র, মহেশচন্দ্র পাল কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত, কলিকাতা ১৩১০ সাল, পৃঃ ১৪৯-৫০।)

বিধবা যখন ইন্দ্রিয়দৌর্ব্বল্যবশতঃ কামার্ত্তা হইয়া পুরুষান্তরকে বরণ করে তখনই তাহার নাম পুনর্ভূ হয় কিন্তু বয়সের পরে সে আর পরকীয়া থাকে না। তখন সে ভার্য্যা হইয়া যায়। প্রাচীন কালে ভারতবর্ষের লোকে ১ কৃত পরকীয়া এবং দ্বিতীয় পুরুষ পরিগৃহীতা বিধবা, অর্থাৎ পুনর্ভূর প্রভেদ বুঝিত। এই জন্যই পরবর্ত্তী সূত্রে বাৎস্যায়ন বলিয়া গিয়াছেন যে, নায়িকা তিন প্রকারের,—কন্যা, পুনর্ভূ ও বেশ্যা; কিন্তু গোণিকাপুত্র বলিয়া গিয়াছেন, "পুত্রও দ্বয় এতদুভয়বিধ কারণ হইতে অন্যবিধ কারণবশতঃ পরপরিগৃহীতা স্ত্রীও পক্ষে প্রাপ্ত চতুর্থী নায়িকা। চারায়ণ অবর্ণনাভ, ঘোটক মুখ, গোনার্দ্দীয় প্রভৃতি অন্যান্য গ্রন্থকারেরা আট রকমের নায়িকা স্থির করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে কন্যা, পুনর্ভূ ও বেশ্যা ব্যতীত অন্যান্য পক-প্রকারের নায়িকা পরকীয়া। এই জন্য বাৎস্যায়ন কন্যা পুনর্ভূকে ভার্য্যার অধিকরণের মধ্যে বর্ণনা করিয়া পরকীয়ার জন্য স্বতন্ত্র অধিকরণ লিখিয়া গিয়াছেন। কন্যা ও নায়িকার মধ্যে প্রভেদ এই যে, কন্যার সহিত অভিযোগ নায়ক স্বয়ং করিতে পারেন কিন্তু

পর-স্ত্রী দূতীসাধ্য। পরকীয়া সম্বন্ধে ঐতিহাসিক তথ্য-ভেদে ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশিত হইয়াছে। তাহার ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশ নিম্নে নির্দ্দিষ্ট হইল।

বাৎস্যায়নের কামসূত্র রচিত হইবার পূর্ব্বে এবং পরে ভারতবর্ষে কামসূত্র বহুবার রচিত ও আলোচিত হইয়াছে। বাৎস্যায়ন স্বয়ং বলিয়া গিয়াছেন যে, এক সময়ে পাটলীপুত্র নগরীর বেশ্যাদের অনুরোধে দত্তক নামক ব্রাহ্মণপুত্র কামসূত্রের বৈশিক নামক অধিকরণ রচনা করিয়া ছিলেন। দেশের ও দেশবাসীর যখন এরূপ অবস্থা হয় যে, কাম প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য নিয়ম বিধিবদ্ধ করিতে হয় তখন অন্যদিকে দেশ-বাসীর দৃষ্টি থাকে না। মানব-হৃদয়ের উচ্চতর আকাঙ্ক্ষা ক্রমশ সঙ্কীর্ণ হইয়া লুপ্ত হয়, তখনই জাতির অধঃপতন হয়। বাৎস্যায়ন যদি চাণক্য হন তাহা হইলে তাঁহার আবির্ভাবের পূর্ব্বেই উত্তর-ভারতের এইরূপ দুর্দ্দশা হইয়াছিল। চন্দ্রগুপ্ত কর্ত্তৃক মৌর্য্য-সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বেই মগধ সাম্রাজ্যের অধঃপতন হইয়াছিল, সেই জন্যই ভারতবর্ষের তোরণ পুরু আদি প্রভৃতি ক্ষুদ্র রাজ্যের অধীশ্বরগণের অধিকারভুক্ত হইয়াছিল এবং সেই জন্য জগদ্বিজয়ী বীর আলেকজেণ্ডার পঞ্জাব-তীর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইতে ভরসা করিয়া ছিলেন। আলেকজেণ্ডারের আক্রমণের অনুমান পঞ্চবিংশ বর্ষ পরে দ্বিতীয় যবন-রাজ যখন দ্বিতীয়বার ভারতবর্ষ অধিকার করিতে আসিয়াছিলেন, তখন আর সে তোরণের পথ তত সুগম ছিল না। সেই জন্যই বিজয়ী, সেলিউকস্ (Selukos Nikator) কে কেশাহত কুক্কুরের মত প্রলায়ন করিতে হইয়াছিল। এই ঘটনার দ্বি-সহস্র বৎসর পরে একদিন পারস্য-রাজ নাদির শাহ ভারতবর্ষের অরক্ষিত তোরণ-পথে প্রবেশ করিয়া মুসলমান মোগলের দর্প চূর্ণ করিয়া ছিলেন। চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যকাল হইতে মহম্মদ শাহের রাজ্যকাল পর্য্যন্ত এইরূপ দুর্ঘটনা বহুবার প্রত্যক্ষ হইয়াছে।

গৌতম বুদ্ধের বিমল ধর্ম্ম একদিন মসীমলীন হইয়া উঠিয়াছিল, গৌতমের মত নিপুণ শিল্পী যে অপরূপ দেব-প্রতিমা গঠন করিয়াছিলেন, জনমেজয়ের নিরন্ধ দৃষ্টি বৌদ্ধ-তান্ত্রিক অদম্য পরকীয়া-লালসায় অভিভূত হইয়া তাহাকে বানর-মূর্ত্তিতে পরিণত করিয়াছিল। গৌতম জগতে দুঃখনিবৃত্তির কারণ অনুসন্ধান করিয়া পাইয়াছিলেন এবং সেই অনুসন্ধিৎসার ফল প্রাচীন প্রাচ্যে ও প্রতীচ্যে সুপরিচিত হইয়াছিল। যুদুর ইজরেলবাসী যীশু তাঁহার নবপ্রবর্ত্তিত ধর্ম্মে, জ্ঞানে বা অজ্ঞানে গৌতমের ধর্ম্মের অনুকরণ করিয়াছিলেন। লালসার লোলরসনা অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা ও অদম্য কামনা বৌদ্ধ সঙ্ঘের চিত্তবিকার ঘটাইয়া মুক্তির নিরোধকে ক্রমশঃ অবিচ্ছিন্ন দুঃখে পরিণত করিয়াছিল। যে ধর্ম্ম একদিন অর্দ্ধ-জগৎকে মোহিত করিয়াছিল তাহাই পরকীয়াকামনার জন্য ঘৃণ্য ও ঘৃণ্য হইয়া নিজ জন্মভূমি হইতে বিতাড়িত হইয়াছিল। এক দিন বৌদ্ধ শ্রমণের পরকীয়া লালসা মাতৃস্নেহসিক্ত বৈষ্ণব-ধর্ম্মকে অভিভূত করিয়া তাহাকেও ত্যাগের পবিত্র মার্গবিচ্যুত করিয়াছিল। বৈষ্ণব-ধর্ম্মের ইতিহাস এখনো লিখিত হয় নাই। প্রাচীন বৈষ্ণব রাধাকৃষ্ণের পূজা করিত না। সার্দ্ধ সহস্র বর্ষ পূর্ব্বে গুপ্ত-সম্রাটদিগের অধিকার কালে বিষ্ণুর পূজা হইত, কৃষ্ণের পূজা হইত কিন্তু রাধার পূজা হইত না। জয়দেব যখন গীতরচনায় নিযুক্ত তখন বৌদ্ধ-তান্ত্রিকের লোলুপহস্তাঘাত নূতন প্রেম-ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। পরকীয়া, শ্রেষ্ঠা নায়িকা বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছিল এবং সেই জন্যই গৌড়বঙ্গ স্বাধীনতা হারাইয়াছিল। দীর্ঘকাল যবনাধিকারে পরকীয়া ভাব প্রচ্ছন্ন ছিল। মানুষ যখন আত্মরক্ষায় ব্যস্ত থাকে তখন তাহার দৃষ্টি জননেন্দ্রিয় পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হয়; প্রাণভয় ও ক্ষুধার যন্ত্রণা যখন মানুষকে অভিভূত করে তখন তাহার পরকীয়া চিন্তার অবসর থাকে না, সেই জন্যই দ্বি শতবর্ষ পরে বাঙ্গালী হিন্দু আবার মস্তকোত্তলন করিয়াছিল, গণেশ ও দনুজমর্দ্দন স্বাধীন হিন্দু-রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। সেই হিন্দু-রাজ্য কেন স্থায়ী হয় নাই তাহার কারণ অন্যত্র অনুসন্ধান করিতে হইবে।

নিষ্ঠুর সমাজ-শাসন রাষ্ট্রীয় বিদ্রোহের ন্যায় ঘোর সমাজ-বিদ্রোহ আনিয়া উপস্থিত করে, শ্রীচৈতন্য এই সামাজিক বিদ্রোহের নেতা, ব্রাহ্মণের অত্যাচারপ্রপীড়িত

উত্তরজাতির উদ্ধারের জন্যই তাঁহার আবির্ভাব, প্রেমধর্ম্মের ছায়ায় সর্ব্বসঙ্ঘের একীকরণ তাঁহার ধর্ম্মের মূল উদ্দেশ্য। বৈষ্ণব-ধর্ম্মের গৌড়ীয় নববিধানের আবির্ভাবের এই কারণ অতি অল্পদিন পূর্ব্বে পরিস্ফুট হইয়াছে। কিন্তু চৈতন্যের ধর্ম্ম কি অবিকৃত ছিল? যাঁহারা চৈতন্যের সমসাময়িক তাঁহারা চেষ্টা করিয়া পরকীয়া ভাবযুক্ত নব বৈষ্ণব-ধর্ম্মকে যে উচ্চ পাদপীঠে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের রচনার প্রতিপত্রে এখনো তাহার আভাস পাওয়া যায়। শ্রীমদ্ভাগবত যে সময়েই রচিত হোক, শ্রীধর স্বামী ও সনাতন গোস্বামী তাহার প্রসিদ্ধ টীকাকার। শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধে কৃষ্ণ-চরিত্র বর্ণিত হইয়াছে এবং শ্রীমদ্ভাগবতের এই স্কন্ধ, চৈতন্য প্রতিষ্ঠিত নব-বৈষ্ণব ধর্ম্মের মূলাধার। কৃষ্ণ চরিত্রে পরকীয়া ভাবের আরম্ভ শ্রীমদ্ভাগবতের উনত্রিংশ অধ্যায়ে। পরাশরের পুত্র ব্যাস, শ্রীমদ্ভাগবতের প্রকৃত রচয়িতা কিনা তাহা বলা যায় না। যিনি সেই পুরাণ রচনা করিয়াছিলেন তিনি অতি সাবধানে পরকীয়া ভাব নিজ রচনায় আনয়ন করিয়াছিলেন। কৃষ্ণ বংশীবাদন করিতেছেন, তাহা শুনিয়া ব্রজ-স্ত্রী-গণের অনঙ্গবর্দ্ধন হইতেছে। শ্রীমদ্ভাগবতের অনুবাদক ৺রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন উনত্রিংশ অধ্যায়ের চতুর্থ শ্লোকের অনুবাদে বলিয়াছেন, "ব্রজাঙ্গনা দিগের চিত্ত একে শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক পরিগৃহীত হইয়াছিল তদুপরি আবার তাঁহারা অনঙ্গবর্দ্ধন তদীয় গীত শ্রবণ করিলেন অতএবসাপত্ন্য ভাব পরিহার পূর্ব্বক স্বজন্য বিহার বাসনায় পরস্পর কেহ কাহাকেও স্ব-স্ব উদ্যম জ্ঞাপন না করিয়া যে স্থানে সেই কান্ত অবস্থিতি করিতেছেন তথায় সত্বর আসিতে লাগিলেন, বেগে আগমন করাতে তাঁহাদের কর্ণকুণ্ডল সাতিশয়-চঞ্চল হইল।" শ্রীধর স্বামীর টীকা টীকাই নহে, এই শ্লোকের প্রকৃত অর্থ সনাতন গোস্বামী ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন; "অনঙ্গ শব্দ প্রয়োগশ্চ পূর্ব্বং যোজনামুরূপেনৈব স্থিতঃ সম্প্রতিত্বু পল্লবিত ইত্যর্থং বোধয়তি। এতেন তদানীন্তা মৃতসেকমপ্যুৎপ্রেক্ষ্যতে সম্ভ তথাভাবাৎ। ব্রজস্থ স্ত্রিয়ঃ তদ্বিশেষাঃ প্রকরণ বলাৎ অতএব কৃষ্ণেন পরমাকর্ষকেন পূর্ব্বমেব গৃহীতং আকৃষ্টং মানসং মনস্তদীয়ানেব যা যাসাং তাঃ বিশেষতস্তেনানীং গীতং শ্রুত্বা আবন্নুঃ।" ভাগবতকার উনত্রিংশ অধ্যায়ে দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, গোপীগণ কৃষ্ণগত চিত্ত হইলেও কৃষ্ণ স্বয়ং প্রথমে তাহাদিগকে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। সেইজন্য প্রথমে অভ্যর্থনা করিয়া তাহাদিগকে ব্রজে ফিরিয়া যাইতে বলিয়া ছিলেন। দশম স্কন্ধের উনত্রিংশ অধ্যায়ের আঠার হইতে বাইশ শ্লোক পর্য্যন্ত ভাগবতকার কৃষ্ণের মুখ দিয়া এই কথাই বলাইয়াছেন। অবশেষে যথাসম্ভব বাক্যে উপপতির নিন্দা করিয়াছেন। এই কয়টি শ্লোকের অনুবাদে প্রায়শঃ প্রকৃত অর্থ ফুটিয়া ওঠে না। সনাতন গোস্বামী 'বৈষ্ণব তোষিণী'র টীকায় ইহার স্পষ্টার্থ নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। তৃতীয় শ্লোকের টীকায় যে স্থানে ভাগবতকার বলিয়াছেন যে, পূর্ণচন্দ্রের কৌমুদী দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ বেণুবাদন করিতে আরম্ভ করিলেন সেই স্থানে সনাতন গোস্বামী স্পষ্ট কথায় কবির মনের ভাব ব্যক্ত করিয়া দিয়াছেন। "কেমন করিয়া অনঙ্গবর্দ্ধন হইল, বক্ষ্যতেচ অনঙ্গ বর্দ্ধনমিতি। স চ নূনং মধ্যমাদি নামা যত উক্ত মৌডীর রাগভেদে। মধ্যমাদির্গ্রহাস্তো মধ্যম গ্রাম রাগজঃ।" সপ্তম শ্লোকে ভাগবতকার লিখিয়া গিয়াছেন যে, ব্রজ-সুন্দরীগণ পতি, পিতা, ভ্রাতা ও বন্ধুগণ কর্ত্তৃক বারবার নিবারিতা হইয়াও গোবিন্দ কর্ত্তৃক মোহিত চিত্ত হইয়া কোন মতেই নিবৃত্ত হইলেন না, সেই স্থানে সনাতন গোস্বামী রমণীর চিত্তমোহনের প্রকৃত কারণ স্পষ্ট নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "অন্যং সত্যাদীনামপি শৈথিল্যাদে হেতুজ্ঞে র্ঃ।" এই শৈথিল্যের অর্থ কামসূত্রোদ্ধারে করিতে হইবে। শৈথিল্য অর্থে ব্রজগণ যে বর্ত্তমান যাদাণী-গোদাগার ন্যায় ব্রজবিদ্‌গিগের প্রতি মধ্যে মধ্যে লাঠ্যৌষধি প্রয়োগ করিত না, তাহা নহে। এ সম্বন্ধে অনুবাদ না করিয়া বাৎস্যায়নের দুইটি সূত্র উল্লেখ করিলাম :—

"সাত্ত্যাত্ত্বস্তাঃ পুরুষেণ কণ্ডূতিরপহৃতে। ১১।

টীকা :—সম্বাধকস্ত স্বভাবতঃ কৃমিদুষ্টস্থানস্ত নিদর্শনিকা কণ্ডূতিঃ। তথাচোক্তম্—'রক্তজাঃ কৃময়ঃ সূক্ষ্মা মৃদুমধ্যে প্রকোপনঃ। নখদন্তৈস্তু কণ্ডূতিং জনয়ন্তি ধ্রুবাবলম্।'

"সংযোগে যোষিতঃ পুংসো কণ্ঠশ্লিষ্টপয়োধরাঃ।
তত্তাতিমানসংস্পৃষ্টং সুখমিত্যাভিধীয়তে ॥ ১৫"

আটম শ্লোকের টীকায় সনাতন গোস্বামী ব্রহ্মসংহিতা, বৃহৎ গৌতমীয় পুরাণ, কৃষ্ণ পরিশিষ্ট, পদ্মপুরাণের উত্তর খণ্ড, প্রভৃতির শ্লোক প্রমাণস্বরূপ উল্লেখ করিয়া রাধার লক্ষ্মীত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন এবং সেই উপলক্ষ্যে জ্ঞাপন করিয়াছেন যে, বৈষ্ণব-তোষিনীর টীকা রচনাকালে তিনি প্রখ্যাত পরকীয়াবাদী ছিলেন না। ভাগবতকার দশম শ্লোকে বলিয়াছেন যে, উপপতি বোধ সত্ত্বেও শ্রীকৃষ্ণরূপ পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হইয়া গোপীগণ তখন দেহকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। সনাতন গোস্বামী উপপতি বোধ সত্ত্বেও গোপীগণের কৃষ্ণপ্রাপ্তি যে ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহা মূল ভাগবতের উক্তি অপেক্ষ প্রশংসনীয়। এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের পরিসরের মধ্যে সনাতন গোস্বামীর অপূর্ব্ব পাণ্ডিত্যের সম্পূর্ণ উল্লেখ অসম্ভব। স্থানে স্থানে তাঁহার নিজের উক্তি দুই একটি কথা বলিয়া এই প্রবন্ধ শেষ করিতে হইবে। "অত্র স্বামং দ্বিবিধং শ্রীগোপ্যাদীনামিব প্রেমময়ং সৈরিন্ধ্র্যাদীনামিব বিরূপসাময়ক —"

(চতুর্দ্দশ শ্লোকের টীকা)

"তাস্বাদিতি রত্যাখ্যঃ স্ত্রীভাব বিশেষো ন গৃহীতঃ বিশেষণাভাবাৎ অতএব মহৌদাত্তমাহ হি যতঃ সর্ব্বোপি প্রাণিনো ময়ি প্রীতিং কুর্ব্বন্তীতি মদ্ভক্তিস্নেহাদিতি সাক্ষাদুক্ত্যা তথাপি শিথিলয়তি অতএব গৌরবেন ভবত্যাইতি।"

২২শ শ্লোকের টীকা।

দশম স্কন্ধের ৩৩শ অধ্যায়ে ভাগবতকার যখন পরীক্ষিতকে প্রশ্ন করাইয়া শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা সম্বন্ধে নিজের মত ব্যক্ত করিয়াছেন, সে স্থানে সনাতন গোস্বামী টীকায় পরকীয়া সম্বন্ধে নিজের মত স্পষ্ট করিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। "আনন্দ চিন্ময় রস প্রতিভাবিতাভিস্তাভি-র্য্য নিজ রূপতয়া কলাভিঃ। গোলোক এব নিবসত্যখিলাত্ম ভূতো গোবিন্দমাদি পুরুষং তমহং ভজামীত্যত্র কলাশব্দেন নিজরূপত্ব প্রাপ্তোপি প্রকট লীলাগত পরকীয়ত্বে সন্দেহ নিরাসার্থং।"—দশম স্কন্ধ, ৩৩শ অধ্যায়, ৩য় শ্লোক।

অথচ চৈতন্য প্রবর্ত্তিত নব বৈষ্ণব ধর্ম্মে পরকীয়া ভাব সংস্থ পবিত্র ব্যাখ্যা সত্ত্বেও একদিন মহামারীর মহাবিষের ন্যায় প্রবেশ করিয়া তাঁহার পবিত্র ধর্ম্ম বিনষ্ট করিয়াছিল, তাহার ফলে পাটনা ও রাজমহলের যুদ্ধে বাঙ্গালার স্বাধীনতা চিরদিনের মত বিনষ্ট হইয়াছিল। ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায় যে, যে দেশে মানব কিছু দিন স্বাচ্ছন্দ্য ভোগের ফলে জীবনের প্রকৃত কর্ত্তব্য বিস্মৃত হইয়া কামসাধন পরতন্ত্র হয়, সে দেশ সে জাতি পৃথিবীর পৃষ্ঠ হইতে মুছিয়া যায়।

দুঃখের দিনে

[শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী]

চাইনে আমি সুখের সময় থাকতে তোমার কাছে,
সুখের সময় বন্ধু অনেক পাবে,
যারা সবাই ছায়ার মতন ঘুরবে তোমার কাছে,
তোমার চোখে চোখটী দিয়ে চাবে।
দুঃখ যখন আসবে তোমায় ছেয়ে,
সুখের সখা দেখবে নাকো চেয়ে,
একলা ফেলে জগৎ মাঝে তারাই যাবে চলে,
যখন তুমি একলা তোমায় দেখে—
উঠবে কেঁপে, হৃদয় তোমার ব্যথায় যাবে গলে
দুঃখের ছবিই বক্ষে রবে এঁকে।

ওগো, তখন থাকব আমি একলা তোমার পাশে,
মলিন মুখে ফুটিয়ে দিয়ে হাসি,
জানবে তুমি সত্য কে সেই দুঃখে ভালবাসে
এগিয়ে আসে নিতে দুঃখের বাঁশী।
বন্ধু, তুমি পাবে আমায় তবে,
তোমায় আমায় সেদিন মিলন হবে,
সুখের মাঝে মিলন—সেতো যোগ্য মিলন নয়
তোমায় আমি পাইনে আমার পাশে,
পরস্পরে পরস্পরকে করব মোরা জয়,
দুঃখের মাঝে শুধুই ভালবেসে।

রামময় আশ্রমে শ্রীশ্রী৺ জগদ্ধাত্রী পূজা ও মেলা

প্রতি বৎসরের ন্যায় এবারও বিখ্যাত বণিকবর বণিলাল কোরে ধর্মীয় ধর্মাধিকারী ও সাহিত্যিক রামময় বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতিষ্ঠিত দেওঘর স্থিত রোকাবে রামময় আশ্রমে ৺ জগদ্ধাত্রী মাতার পূজা ও মেলার বিশেষ অনুষ্ঠান হইয়াছে, বর্তমান ধর্মাধিকারী শ্রীযুক্ত হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় মায়ের পূজা উপলক্ষে কলিকাতা হইতে বহু সাহিত্যিক ও বন্ধু বান্ধবগণকে এই উৎসব আনন্দে যোগদান করিবার জন্য আহ্বান করিয়াছেন। এবার মন্দির রাম-নারায়ণের সেবার বিশেষ বন্দোবস্ত হইয়াছে, মেলায় নানাবিধ আমোদের আয়োজন হইয়াছে। ভক্তের বাঞ্ছিত এই মাতৃপূজার সাধু উদ্দেশ্য প্রণোদনীয়, এই সঙ্গে সাততাল পরগণার প্রকৃত স্বাস্থ্য ও শাক সব্জির এক প্রদর্শনী হইবে।

পৃথিবীর বুক হইতে রাজতন্ত্র কি খসিয়া পড়িবে! মহাযুদ্ধের পর অষ্ট্রিয়া জার্মেনী ইত্যাদি যেসব রাজতন্ত্রের অবসান ঘটিয়াছে—সুইডেনও তাহাই। সম্প্রতি গ্রীসেও রাজতন্ত্র বাধা ছাড়া বিদায়ছে—কি হয় বলা যায় না। তবে গতিক দেখিয়া মনে হয়—অন্ততঃ ইউরোপে শীঘ্রই রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইবে।

ইংলণ্ডের মন্ত্রীসভা ভাঙ্গিল। বোধ হয় এই তিনের নূতন মন্ত্রীসভা গঠিত হইবে। সে দেশে নির্বাচন লইয়া অথবা সময় নষ্ট হইবার যো নাই। প্রধান মন্ত্রী এই মর্মে বক্তৃতা করিয়াছেন।

জার্মেনীর ভূতপূর্ব যুবরাজ পুনরায় দেশে ফিরিয়াছেন। জর্মণীর ভগ্ন বর্তমান সামরিক শক্তি বর্ণনে বিস্ময়কর উঠিবে।

হিন্দু মুসলমান বন্ধ পঞ্জাব হইতে ক্রমে ছোটনাগপুরে আসিল। কিন্তু দেশের নেতাদের দেখিতে পাই—তাঁহারা এখন কাউন্সিল প্রবেশ লইয়া ব্যস্ত। জানিনা দেখায় কি মোহিনী শক্তি আছে—জানিনা কোন মায়ামন্ত্রে বেশ আছে মুহ্যমান! লক্ষ ঘুমিয়া—উপেক্ষ ঘুমিয়া দেশবাসী বৃথা মনে মনাদলি করিয়া সময় নষ্ট করিতেছে—আর আমলাতন্ত্র প্রভুত্বচিত্তে ঘুরে দাঁড়াইয়া তাহাই উপভোগ করিতেছে! কবে আমাদের জ্ঞান হইবে জানি না।

---

২৪ পরগণা বরয়াহাট থানার অন্তর্গত মুরাই পোঃ আফিসের অধীনে হাঁসখড়িয়া গ্রামে এক শ্মশান আছে—চতুষ্পার্শ্বে অনেকগুলি গ্রামের মৃতসৎকার তথায় সম্পন্ন হয়। কোন অতীত যুগে পুণ্যবাহিনী গঙ্গা গ্রামখানি বিধৌত করিয়া প্রবাহিত হইতেন, এখনে তাঁহার চিহ্নমাত্র অবশিষ্ট—৩।৪ কাঠার এক ক্ষুদ্র পুষ্করিণী মাত্র তাহার স্মৃতি রক্ষা করিতেছে। জনৈক শিক্ষিত হিন্দু সাধু অশিক্ষিত গ্রামবাসীকে শিক্ষাদান করিয়া—রোগসেবা, আর্তসেবা ইত্যাদি ব্রতে গ্রামবাসীদিগকে পারদর্শী করায় বহু রোগী তাঁহার আশ্রমে চিকিৎসার্থে আসে। অন্যে মধ্যে আশ্রমে মহোৎসব এবং তাপদৎ দান ইত্যাদি হওয়ায় তথায় প্রায়ই বহুজন সমাগম হয়। কিন্তু পুষ্করিণী অসংস্কৃত—তাহার পার্শ্বে সর্প ব্যাঘ্রাদি শ্বাপদ সঙ্কুল অরণ্য থাকায় বহুলোক তাহাদের কবলে প্রাণ হারাইতেছে। পুষ্করিণীর জল পঙ্কিল বলিয়া পান করায় অনেকে রোগগ্রস্ত হইতেছে। ২৪ পরগণা ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড এদিকে একটু লক্ষ্য করিবেন কি?

গ্রন্থ-আলোচনা

'ত্যাগের পূজা'—উপন্যাস। দশ জন খ্যাতনামা লেখক লেখিকার সমবায়ে এই সুবৃহৎ উপন্যাস রচিত। মূল্য দুই টাকা, প্রকাশক গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স। এই সুন্দর উপন্যাসখানি আট জন খ্যাতনামা লেখক ও আট জন খ্যাতনামা লেখিকার লেখায় পূর্ণ হইয়া 'যমুনা' পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। দশ জন লেখক লেখিকার বিচিত্র লেখায় যে উপন্যাস পূর্ণাঙ্গ হইয়াছে তাহা যে কেমন বিচিত্র সুন্দর হইবে তাহা পাঠকপাঠিকা পড়িলেই বুঝিতে পারিবেন। ত্যাগের পূজার ছাপা কাগজ সুন্দর।

'ভাষা ও ছন্দ' শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায় রচিত শিক্ষা-কাব্য। দাম এক টাকা। আশুবাবুর কবিতা অনেক কাগজে বাহির হয়। কবিতা যাঁহারা ভালবাসেন তাঁহারা এ বইখানির কতকগুলি কবিতা পাঠে তৃপ্তি পাইবেন।

'কবির স্বপ্ন' শ্রীরাধাচরণ দাস প্রণীত। মূল্য চারি আনা। লেখক ভূমিকায় লিখিয়াছেন 'এটি বিশ্ব-বিশ্রুত-কীর্তি অমর কবি শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা কাব্যের অক্ষম আলোচনা—'বামন হইয়া চাঁদে হাত'। লেখক ভূমিকায় যাহা লিখিয়াছেন তাহার উপর কোন কথা বলা অনাবশ্যক।

পথের লেখা—উপন্যাস, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র মোহন চট্টোপাধ্যায় প্রণীত—মূল্য ১৷৷০ উপন্যাস খানির ছাপা ও বাঁধাই ভাল।

পঞ্চশস্য—সংগ্রাহক শ্রীপাঁচকড়ি ঘোষ, মূল্য এক টাকা, এই পুস্তক খানিতে কয়েকজন খ্যাতনামা সাহিত্যিকের রচনা সংগৃহীত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে দু'একটি পুণ্য চরিত, প্রাচীন কবি পরিচয়, ভক্তি প্রবন্ধ, রঙ্গ সাহিত্য পরিচয় আছে।

কুলীর ভাগ্য

[শ্রীসুকুমার ভাদুড়ী বি, এস্-সি]

ক্রিং—ক্রিং—ক্রিং.....…

হ্যালো.....…

হাজিরা বাবু হ্যায় ?.....

হাঁ, হ্যায় !.....

আপ্‌কো সা'ব্ বোলাতাহ্ ; জল্‌দি সাব্‌কো ডেরাযে আপ্‌কো যানে হোগা।.....

আচ্ছা।.....…

আমি তখন চটকলের হাজিরাবাবু। আফিসে আসতে না আসতেই বড় সাহেবের তলব শুনেই মনে একটু ভয় হ'ল। সেদিন আবার ভাগ্যক্রমে বিলম্বও হ'য়েছিল কয়েক মিনিট। শুনলাম নাকি সাহেব আরও দু'তিনবার ইতিপূর্ব্বে আমায় খোঁজ ক'রেছেন। জাতিতে বাঙ্গালী ; তা'র উপর আবার ব্রাহ্মণ। অতএব সাহেবের তলব পেয়ে প্রাণটা যে কোনও মতেই স্থির ও নিশ্চিন্ত থাকতে পারে না, এটা আজ কালকার দিনে অত্যন্ত স্বাভাবিক।

সবে মাত্র কাজে ব'সেছি এমন সময় টেলিফোনে সাহেবের তলব শুনেই তাড়াতাড়ি হাতের কাজ ফেলে অত্যন্ত চিন্তান্বিত মন নিয়ে এবং মনে মনে 'হরির লুট' মানতে মানতে ত' কোনও রকমে শুষ্কমুখে সাহেবের বরজার সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। বেহারা আসতেই বেহারাকে দিয়ে সাহেবের কাছে খবর পাঠিয়ে মনে মনে দুর্গানাম জপ্‌ছি—আর প্রতি মুহূর্ত্তেই ক্রত স্পন্দন অনুভব ক'রছি।.....

মিনিট দুই পরেই বেহারা এসে আমায় সঙ্গে ক'রে সাহেবের কাছে নিয়ে গেল। ভিতরে যেতেই সাহেব আমার দিকে চেয়ে ব'ল্লেন,—"Well babu take your seat there."

আমি ত' একেবারে অবাক্ !...এবে একেবারে জামাই আদর ! বড় সাহেবের কাছে এরকম আদর আমার মত অবস্থার বাক্তি চটকলের সৃষ্টি হ'য়ে অবধি কখনও পেয়েছে কিনা সন্দেহ। আমি ত আস্তে আস্তে অত্যন্ত বিনয়ীর মত পার্শ্ববর্ত্তী একখানা চৌকিতে জড়সড় হ'য়ে ব'সে প'ড়লাম, আর মনে মনে ভাবতে লাগ্‌লাম—"ব্যাপারটা কি ? চাকরীটা তাহ'লে এ যাত্রা বেঁচেই গেল মা দুর্গা, তোমারই কৃপা !"...

মিনিট পাঁচেক মা বসুন্ধরার পানে অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে চেয়ে চিন্তার পর সাহেব হঠাৎ আমার পানে তাঁর রক্তচক্ষু ফিরিয়ে জিজ্ঞাসা ক'রেন,—"Well Babu, can you say why the two bloody coolis, Lachman and his wife, are absent from yester day ?"

চৈত্রের জলন্ত দ্বিপ্রহরে অত্যন্ত পরিশ্রান্ত ভারবাহীর মাথা থেকে একটা খুব বড় ভারি বোঝা নামিয়ে নিলে তা'র হৃদয়টা যেমন মুহূর্ত্তে একটা নির্ম্মল শান্তি ও আনন্দে ভ'রে ওঠে, বোধ করি তা'র চেয়েও অধিক শান্তি ও আনন্দে তখন আমার মন প্লাবিত, ব্যাকুলিত অন্তরটা একমুহূর্ত্তের মধ্যে পূর্ণ হ'য়ে উঠ্‌লো সাহেবের এই কথা-গুলো শুনে।.....

আনন্দের আধিক্যকে বক্ষে চেপে সহজ সরল ভাবেই সাহেবের কথার উত্তর দিলাম,—"তা সাহেব, How how how can I say that sir ;—I sir, know not sir."

সাহেব পুনরায় ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে এবং রক্তচক্ষু দুটিকে কিঞ্চিৎ ক্ষুদ্রতর ক'রে ফেলে একটু যেন আশ্চর্য্য হ'য়ে ব'ল্লেন,—"You know nothing of it ? But you should. Well, get information about this and send them to me atonce."

বাবা !...হাঁফ্ ছেড়ে বাঁচ্‌লাম।...আস্তে আস্তে

সাহেবকে ত' খুব একটা লম্বা সেলাম ঠুকে ঘর থেকে বেরিয়ে প'ড়লাম। আফিসে যখন ফিরে এলাম তখন আমার মুখে কান্নার ভাবের পরিবর্ত্তে হাসির ছটা দেখে সবাই অত্যন্ত আশ্চর্য্য হ'য়ে উঠ্‌লো। সকলেই অনুমান ক'রেছিল, সাহেব নিশ্চয় আমার একটা কিছু অত্যন্ত গুরুতর অপরাধ পেয়েছেন; তাই আমার এত ঘন ঘন তলব প'ড়ছিল, এবং আজ যে আমার চাকরীর এই পর্য্যন্তই শেষ তাও তা'রা সকলেই এক প্রকার স্থির ক'রে ফেলেছিল। কিন্তু ঠিক তা'র বিপরীত দেখে বিস্মিত হ'য়ে সবাই যেন একটু হতাশস্বরে একসঙ্গে বলে উঠলো, "কিহে, কি খবর?"

কিন্তু এই ব্যগ্র প্রশ্নের যখন আমি উত্তর দিলাম, তখন তা'দের সকলের মুখ থেকেই এককালীন একটা তাচ্ছিল্যের অস্ফুট শব্দ বেরিয়ে এল এবং পুনরায় মুখ নীচু ক'রে যে যা'র কাজে মনযোগ দিলে।

যাহ'ক্ সাহেবের আজ্ঞায় তখনই বুলিসর্দ্দারকে ডেকে লছ্‌মনের সন্ধানে পাঠিয়ে আমি আবার নিজের অসম্পূর্ণ কাজে মন দিলাম।.....

ঘণ্টাখানেক পরেই সর্দ্দার লছ্‌মনকে সশরীরে কলের আফিসে আমার সামনে এনে হাজির ক'র্লে। সাহেবের অনুকরণ ক'রে আমিও তার পানে চোখ রাঙিয়ে চাইতেই তা'র মুখখানা ভয়ে এমন শুখিয়ে উঠ্‌লো যে তখনই আমার রক্তচক্ষু আবার তা'র স্বাভাবিক শ্বেতবর্ণ ধারণ করে ফেল্লে; এবং মনের সে আজ্ঞাকারী শক্তিও যেন কোন্ অদৃশ্য মহাশক্তি হরণ ক'রে নিলে। লছ্‌মনকে কাছে ডেকে জিজ্ঞাসা ক'র্লাম, "কাল থেকে তোরা দু'জনে আসিস্‌নি কেনরে? সাহেব যে তোদের উপর ভারি চ'টেছে!"

লছ্‌মন তা'র মিনতিভরা ক্ষুদ্র চোখি দুটো ধীরে ধীরে আমার পানে তুলে যেন ভাঙা গলায় ব'ল্লে,—"হামারা লেড়কাকো কাল সবেরসে বিমার হুয়া বাবুজী;—রাত্‌মে হাম্ খোড়া ছাতু খায়া; লেকেন্ মণিয়া ত' রাত্‌ভর্ কুছ্' নেহি খায়া,—খোড়া পানিভি নেহি লিয়া বাবুজী।—হামারা লেড়কা আভি ঘর যায়েগা বাবুজী।" বলিতে বলিতে সেই নিরক্ষর অসভ্য হিন্দুস্থানী মিলের কুলীটার চক্ষুর পুত্রের শীড়ার বেদনায় অশ্রুতে সিক্ত হ'য়ে উঠলো। আধা বাংলা আধা হিন্দীতে তাকে ভরসা দিয়ে ব'ল্লাম,—"মুর্, মরেগা নেহি। ও বাঁচ যায়েগা। তা তুম্‌কো অন্ততঃ এক আধ্‌দি আইও।"

সহসা মনে হইল সাহেবকে না হয় একবার খবর দিয়ে আসি যে লছমন কুলী এসেছে এবং তা'র পুত্রের বেমার হওয়ায় তা'রা দুই স্বামী স্ত্রীতে কাল আস্‌তে পারে নাই।

সাহেবকে গিয়ে ব'ল্‌তেই সাহেব তাঁর রক্তচক্ষু আরও রক্তবর্ণ ক'রে রক্তের সহিত যা' ব'ল্‌লেন—তা'র অশ্রাব্য কথাগুলো বাদ দিয়ে শুদ্ধ শ্রাব্য কথা গুলি ধ'রলে অর্থটা দাঁড়ায় এই যে তা'র শিশুপুত্রের বেমার হ'য়েছে ব'লে চট্‌কলের কাজের ক্ষতিত' তিনি সহ্য ক'রতে পারেন না। কাল থেকে তা'রা যদি না আসে তবে তা'দের বিশুণ মাহিনা কাটা যাবে। সাহেবের সঙ্গে তর্ক করা বা তা'র কথার উপর কথা ব'ল্‌বার সাহস এবং শক্তি থাকা আজ পর্য্যন্ত আমার মত কলের একটা সামান্য কেরাণীর পক্ষে কখনই সম্ভব নহে;—অতএব সেই আজ্ঞা শিরোধার্য্য ক'রেই আফিসে ফিরলাম।

সাহেবের কক্ষ থেকে নিষ্ক্রান্ত হ'য়ে কয়েক পা এসেছি এমন সময় বেহারা ছুটতে ছুটতে এসে খবর দিলে,—'সাহেব আমায় আবার ডাক্‌ছেন।"

পুনরায় ফিরলাম। সাহেবের কাছে আবার লম্বা চওড়া এক সেলাম ঠুকে দাঁড়াতেই তিনি ব'ল্লেন যে যদি দুজনে না'ও আস্‌তে পারে তবে অন্ততঃ মণিয়া যেন নিশ্চয় আসে; এই তাঁর শেষ আদেশ।

আবার সেলাম ক'রে ঘর থেকে বেরিয়ে প'ড়লাম। লছমনকে এসে সাহেবের আদেশ জানাতেই সে কেঁদে ফেল্লে, ব'ল্লে,—"ক্যায়সে মণিয়া আওয়েগা বাবুজী! লেড়কাকো দিনভর্ উস্‌কো কোল্‌মে রহতাহ!"

কিন্তু বহু চিন্তা ও তর্ক বিতর্কের পর যখন কিছুতেই আর অন্য কোনও উপায় পাওয়া গেল না তখন সে সেই কথাতেই স্বীকার হ'য়ে অশ্রুসিক্ত নেত্রে শুষ্কমুখে বাসায় ফিরল!—কি ক'র্বে; বেচারার যে আর অন্য কোনও উপায়ই নাই। এই কলের মাহিনা পেলে তবে তা'দের আহার জুটবে, শিশুর চিকিৎসার অর্থ জুটবে, পথ্য জুটবে।

কেমন ক'রে তা'রা কল কামাই ক'র্ব্বে! হায়রে কুলির ভাগ্য! তোদের সন্তান মরুক্ আর বাঁচুক—কলের সাহেবের তা'র কি? সে চায় কাজ! এত' আর সাহেবের ছেলে নয় যে এর জীবনের কোনও একটা মস্ত মূল্য থাকতে পারে! এযে একটা অসভ্য হিন্দুস্থানী কুলীর শিশু! এযে এক হিন্দুস্থানী কুলী রমণীর হৃদয়ের ধন,—বুকের রক্তে গড়া স্নেহের পুতলী, এর জীবনের আবার মূল্য কি?

২

পরদিন মণিয়া ঠিক্ সময় কাজে এলো, কিন্তু কাজে তা'র হাত আর উঠতে চায় না; তা'র চক্ষু দুটি বুঁজে আস্‌ছে; কয়দিনের অবিশ্রান্ত রুগ্ন পুত্রের সেবা ও শুশ্রূষা এবং সারারাত্রির জাগরণে তা'র শরীর অত্যন্ত ক্লান্ত হ'য়ে যেন ভেঙ্গে প'ড়ছিল।

দুপুর বেলা টেলিফোনে খবর এল বড় সাহেব মণিয়াকে তলব ক'রেছেন। মণিয়া তা'র অর্দ্ধসমাপ্ত একখানা 'থলে' ফেলে ক্লান্ত দেহ ও চিন্তান্বিত হৃদয় নিয়ে বেড় সহস্র কুলীর গ্রাসাচ্ছাদনের মালিক প্রবল প্রতাপান্বিত পুরুষ সিংহ মিঃ হলের সঙ্গে দেখা ক'রতে গেল।

খানিকপরে ফিরে এসে মণিয়া সহসা অশ্রুপূর্ণ-লোচনে আমার পাদুখানা জড়িয়ে ধ'রে ভগ্নকণ্ঠে ব'ল্লে,—"বাবুজী! সাহেব হাম্‌লোক্‌কো সাঁওমেঁতি আনেকো বোলা হায়;—ক্যায়সে হাম্ আওরেগা বাবুজী।"

মণিয়ার মর্ম্মন্তুদ অবস্থা এবং অশ্রু বিসর্জ্জন দেখে অকস্মাৎ আমার চোখ দুটো যেন জ্বালা ক'রে উঠলো। কিন্তু মিলের কুলির দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা বর্ত্তমান ভাগ্যবিধাতা যিনি, তাঁর আদেশের উপর হস্তক্ষেপ ক'র্ব্বার উপযুক্ত ক্ষমতা ত' আমার নেই। অতএব তা'র সমস্ত অবস্থা সম্যক্ বুঝে উঠতে পার্লেও আমার বাধ্য হ'য়েই নীরব থাকতে হ'ল। শেষে মণিয়ার অজস্র অশ্রু বিসর্জ্জন দেখে আমারও প্রাণটা গুম্‌রে কেঁদে উঠল। একটা দীর্ঘশ্বাস টেনে ব'ল্‌লাম,—"হাম্ কেয়া করেগা? উ সাব্ লোক হায়; উস্‌কো হুকুমকা উপর আওর কুছ্ বাত নেহি হায়। আচ্ছা আভি তোম্ যাও,—ফিন্ সাঁঝমে আইও লেকেন কুছ সবেরে হাম্ তোম্‌কো ছোড় দেগা।"

মলিন হাতখানির পিঠে চোখের জল মুছতে মুছতে মণিয়া বাসার উদ্দেশে প্রস্থান ক'র্লে। খানিকক্ষণ আমি একদৃষ্টে সেইদিকে চেয়ে রইলাম,—ভাবলাম এদের কি দুর্ভাগ্য! ছেলের অসুখ বাড়ীতে, অথচ সেই রুগ্ন শিশুকে ফেলে ওকে কাজে আস্‌তে হ'চ্ছে;—কি দুর্ব্বিসহ বন্ধনে এদের জীবনটা জড়ীভূত হ'য়ে প'ড়েছে। কিন্তু এই বন্ধন থেকে কি এদের মুক্তি নেই...কলের ঘড়িতে ঢং ঢং ক'রে বারো বাজলো। সমস্ত কাজ ভুলে ফেলে আস্তে আস্তে বাসার দিকে প্রস্থান কর্লাম।.....

সন্ধ্যার সময় আফিসে ব'সে তাড়াতাড়ি কতকগুলো কাজ সারছি এমন সময় সাহেবের এক চাপরাসী ছুটতে ছুটতে এসে খবর দিলে,—"বাবু, শীগ্‌গির আসুন; সাহেব আপনাকে ডাক্‌ছেন।" তার ব্যগ্রতা ও কথার ভঙ্গী দেখে বুঝলাম, খুব জরুরি তলব। তখনই উঠে দ্রুত পদে সাহেবের কুঠির উদ্দেশে যাত্রা কর্লাম।

সাহেবের ঘরের দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই যেন কিসের একটা অস্ফুট আর্ত্তনাদ শুন্‌তে পেলাম। মুহূর্ত্ত অপেক্ষা ক'র্ত্তে না ক'র্ত্তেই হঠাৎ সাহেবের কক্ষের ভিতর থেকে সাহেবের মধুর বজ্রগম্ভীর কণ্ঠস্বর কাণের ভিতর দিয়ে এসে আমার মরমে পশল, "Come in"

ঘরে প্রবেশ ক'রেই যা' দেখলাম—তা'তে আমার পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত ভয়ে শিউরে উঠলো। একি! ঘরের এককোণে পালঙ্কের ধারে প'ড়ে মণিয়ার জ্ঞানহারা নিশ্চল দেহখানা; তার চোখের কোণ দিয়ে রক্ত প'ড়ছে। জীর্ণ মলিন বস্ত্রের যে অংশটুকু তা'র ধূলিমাখা মস্তকের আচ্ছাদনরূপে ব্যবহৃত হ'য়েছিল সেটুকু রক্তে লাল হ'য়ে উঠেছে। এ সমস্ত দেখে আমি হতবুদ্ধির মত সাহেবের সম্মুখে দাঁড়িয়ে রইলাম। সাহেব তখন টেবিলের উপর কনুয়ের ভর দিয়ে এবং হাতের তালুতে প্রকাণ্ড মাথাটা স্থাপিত ক'রে একটা ঘোরতর গভীর সমস্যাপূর্ণ চিন্তায় মগ্ন। খানিকক্ষণ সেইভাবে দাঁড়িয়ে থাকার পর ঘরের একধারে সুপ্তিত মণিয়ার নিশ্চল দেহটার প্রতি অঙ্গুলি সঙ্কেত ক'রে ব'ল্‌লে—উস্কো হাসপাতালমে লে যাও; লেকেন, উস্কো রাখ দে'কে ফিন্ হামারা পাস আইও!"

তৎক্ষণাৎ তিন চারজন চাকরের সাহায্যে মণিয়াকে

নিকটস্থ মিলের হাসপাতালে পাঠিয়ে পুনরায় সাহেবের কাছে ফিরলাম। সাহেবের সম্মুখে উপস্থিত হ'তেই সাহেব তাড়াতাড়ি পকেট থেকে দু'খানা ধবধবে সাদা কাগজ বা'র ক'রে আমার হাতে গুঁজে দিয়ে ব'ল্লেন, "Be very carefull. Don't disclose evena single word of this matter."

বাইরে এসে কাগজটা খুলে দেখি,—দুখানা দশ টাকার নোট। মুহূর্ত্তের মধ্যে সমস্ত ঘটনাটা তলিয়ে বুঝতে আর বিলম্ব হ'লনা। রাগে, দুঃখে, ক্ষোভে, সেই কুলিরমণীর অসীম লজ্জা ও দুর্দ্দশার কথা চিন্তা ক'রে আমার সমস্ত মনটা যেন একটা তীব্র ঘৃণা ও বিতৃষ্ণায় ভ'রে উঠলো। মনে মনে ভাবলাম "হায়রে কুলীরমণী! মিলের চাকরী ক'রে আজ তোমার দুর্দ্দশা চরম সীমায় পৌঁছুল। রমণী হ'য়ে তুমি এর চেয়ে আর কি অধিক দুর্ভাগ্য ও অপমানের প্রত্যাশা ক'র্ত্তে পার? ভগবান্, চক্ষের সাম্নে এত পাপ কি তুমি নির্ব্বিবাদে সইতে পার্ব্বে?

• • • •

সমস্ত দিনের শ্রান্তির পর রাত্রি প্রায় দুটার সময় বাসায় যখন আমি গভীর নিদ্রায় মগ্ন,এমন সময় বাইরে কার পুনঃ পুনঃ চীৎকারে সহসা ঘুম ভেঙ্গে গেল। আরও দু'এক-বার ডাকাডাকির পর বাইরে এসে দেখলাম,—লছমনিয়ার একজন প্রতিবেশী কুলী আমায় ডাকতে এসেছে। খবর দিলে—'লছমনিয়ার ছেলেটা মারা গেছে; লছমনিয়াকেও নাকি বমে ধ'রেছে—আর অধিকক্ষণ নয় এবং মণিয়া এখনও বাড়ী না ফেরায় লছমনিয়ার জন্ত বড় ব্যাকুল হ'য়ে উঠেছে।'

মনে মনে ভাবলাম, এর চেয়ে দুঃসময় আর মানুষের জীবনে ঘটে না। আর এই বিদেশে সেই অসভ্য কুলিটাকে দেখবার মত লোক এখানে আর কেউ আছে ব'লেও মনে হয় না, তাড়াতাড়ি শিরাণটা গায় দিয়ে চটি পায়েই সেই হিন্দুস্থানীটার সঙ্গে বেরিয়ে প'ড়লাম। লছমনের কাছে যখন পৌঁছলাম, তখন তার জীবন প্রায় শেষ হ'য়ে এসেছে। আমায় দেখে সে একবার শুধু তার দীপ্তিহীন চোখের উদাস দৃষ্টিটুকু আমার মুখের উপর নিবদ্ধ ক'রে ব'লে, "বাবু, মণিয়া।"

তাড়াতাড়ি একটা ঢোক গিলে নিয়ে বল্লাম, "আজ কাজ ক'র্ত্তে ক'র্ত্তে মণিয়া কেমন অসাবধানবশতঃ প'ড়ে যাওয়ায় তার বড় লেগেছে; সে হাসপাতালে।"

সমস্ত কথাগুলো সেই অসভ্য বর্ব্বরটা শুনে গেলে কিনা বুঝলাম না; তবে এটুকু বেশ স্পষ্টই বুঝতে পার্লাম যে সে তার মৃত পুত্রের পার্শ্বে শুয়ে সেই পুত্রেরই মায়া ত্যাগ ক'র্ত্তে না পেরে তারই পাশু পাশু কোন্ অনন্তের উদ্দেশে যাত্রা ক'র্লো। হায়রে দরিদ্র হতভাগ্য কুলী! মৃত পিতার বক্ষের পাশে মৃত পুত্রকে শায়িত দেখে আমার চোখ দিয়ে দু'ফোটা তপ্ত অশ্রু গড়িয়ে প'ড়ল। কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে পার্শ্বে দণ্ডায়মান কুলিটার পানে চেয়ে ব'ল্লাম, "কি আর হবে, এই নাও দশটা টাকা; যা ক'র্ত্তে হয় সব তুমিই ক'রে যাও।" ব'লে পকেট থেকে একখানা দশ টাকার নোট বার ক'রে হাতে দিলাম।

বাসায় ফিরে সমস্ত রাত্রি আর ঘুম হ'ল না। নানা দুর্ভাবনায় মনটা বড় অস্থির হ'য়ে উঠলো। ভোর হ'তে না হ'তেই মণিয়াকে দেখবার জন্ত হাস্পাতালের দিকে অগ্রসর হ'লাম। সেখানে গিয়ে দেখলাম, মণিয়ার জ্ঞান হ'য়েছে, এবং সে কিঞ্চিৎ সুস্থও অনুভব ক'র্চ্ছে।"

আমায় দেখবামাত্রই সে চীৎকার ক'রে উঠলো, "বাবুয়া! হামারা লেড়কা!" সঙ্গে সঙ্গে সে খাট থেকে তাড়াতাড়ি নীচে নেমে প'ড়ল এবং পরক্ষণেই দুর্ব্বল দেহে অধিক উত্তেজনার উদ্রেক বশতঃ আবার অজ্ঞান হ'য়ে ভূমিতলে লুটিয়ে প'ড়ল।

সেই মুহূর্ত্তেই একটা 'কম্পাউণ্ডার' ছুটে এসে চীৎকার ক'রে উঠল, "হাঁ-হাঁ, 'করেন কি মশায়, করেন কি?—যা', সব মাটি; অনেক কষ্টে কাল রক্ত থামিয়ে ছিলাম বা জ্ঞান ক'রাম তা আবার আপনি এই কাণ্ড ক'রে ব'স্লেন? একে ত' কপালটা কেটে গেছে, তার উপর আবার এই। ছিঃ ছিঃ, কে আপনাকে এখানে আস্তে ব'লেছে বলুন ত'। বেরিয়ে যান্ এখান থেকে।".....

কম্পাউণ্ডারের কটু তিরস্কারে এবং মণিয়ার মর্ম্মন্তুদ অবস্থা দেখে আমি যেন্ একেবারে হতভম্ব হ'য়ে প'ড়েছিলাম। খানিক পরে আস্তে আস্তে সেখান থেকে বেরিয়ে এলাম।

রাস্তায় আসতে আসতে মনে মনে ভাবলাম—"আচ্ছা, পৃথিবীতে এত লোক থাকতে আমিই বা কেন মিছে ওদের জন্ত ভেবে মরি? মরুকগে ছাই যা' হয় হ'কগে! ওদের ভাগ্যে যা' আছে হ'তে দাও। আমার তাতে কি? কে ওরা আমার!"

কিন্তু হাজার চেষ্টা ক'রেও সেদিন আমার মনকে বুঝাতে পারলাম না। সেই দিনই বাসায় ফিরে চাকরী ছাড়বার জন্ত একখানা Resignation letter লিখে ফেললাম। তারপর তার সঙ্গে গত রাত্রের সাহেবের দেওয়া পুরস্কারের (?) নোট দুখানা একত্রে গেঁথে একটা ঝুলির হাতে দিয়ে সাহেবের কাছে পাঠিয়ে দিলাম।

চাকরীতে জবাব দিয়ে সেই দিনই দেশে চ'লে এসেছি এই প্রতিজ্ঞা ক'রে যে অনাহারে মরি সেও ভাল তবু কলের চাকরী আর জীবনেও করছি না।

কয়েকদিন পরে আমাদের দেশীয় ঐ কলেরই এক কর্মচারীর কাছে সংবাদ পেলাম যে, মণিয়াকে নাকি আর সে কলঙ্কের ছাপ ললাটে নিয়ে বেশীদিন বিশ্বের দ্বারে মুখ দেখাতে হয় নি। বেচারা তিন দিন পরেই তার দুখী-জীবনের করুণ গাথা সাঙ্গ ক'রে স্বামী পুত্রের সঙ্গে মিলিত হবার জন্ত অমরের উদ্দেশে যাত্রা ক'রেছে। মৃত্যুর ঘনান্ধকার তার কলঙ্কের সমস্ত কালিমা ঢেকে দিয়েছে!... ...

তৃপ্ত

[শ্রীসরসীবালা বসু]

চোখের পরে এই যে ওগো আলো আঁধার খেলা—
চল্‌ছে সারা বেলা
ভুবন ভরা এই যে ওগো হাজার আয়োজন,
বর্ণ গন্ধ মেলা।
কত রকম মোহন সুরে কাণ যে যায় ভরে
উথ্‌লে ওঠে প্রাণ—
চোখ জুড়ানো, মন ভুলানো ধরার তামল লাগ
নিতুই অফুরাণ।
রাত পোহালে নয়ন মেলে আকাশ পানে চেয়ে
দেখে বিভোল হই—
রঙ বেরঙের ফুলের হাসি মন কেড়ে লয় নিতি
অবাক্ চেয়ে রই।
ঋতুর পরে নূতন ঋতু আসে নবীন বেশে
নিত্য নবীন সাজে—
সেই নূতনের ছোঁয়া লাগে এক নিমিষেই যেগো
আমার আঁখির মাঝে।
আমি জানি—সেই ভালো মোর—বিজ্ঞানে কাজ নাই
চাইনে তত্ত্ব-জ্ঞান,
চোখে দেখেই অমনি খুসী, দার্শনিকের জ্ঞানে
চাইনে সমাধান।
কোন্ যাদুকর আকাশে ঐ সাজিয়ে মেঘের ডালি,
বুলায় রঙের তুলি,
দেখব খালি অবাক হয়ে—মায়া—সবই মায়া—
শুনব না এই বুলি।
গাছ ভরে ঐ ফুল ফুটেছে—চোখ জুড়ালো মোর,
খুঁড়ে গোড়ার মাটি
দেখতে আমি চাইনে ওগো গোপন রসের ধারা
কোন্ সে যাদুকাঠী।

ইণ্ডিয়ান সোপ কোম্পানীর
মেসিনে প্রস্তুত
চন্দন, রয়েলবকুল, মাল্ক ও ভেলভেট সাবান
ব্যবহার করুণ। টেলিফোন, ২৪৯৬

স্বরাজের পথে

[শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার এম-এ]

ব্যক্তিগত ইচ্ছা দেশহিতবুদ্ধিতে পরিচালিত ও দেশাত্মবুদ্ধিতে প্রণোদিত হলে সাধারণী ইচ্ছার সঙ্গে মিলে যায়; তখন সেই সাধারণীকৃত ইচ্ছা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে সমাজ তথা ব্যক্তির জীবনে ব্যক্ত হয়ে স্বরাজে পরিণত হয়। এ ক্ষেত্রে সাধারণী ইচ্ছার কাজে ব্যক্ত হওয়ার বেগকে প্রতিহত করে তার উপর প্রভুত্ব পরিচালনাতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত নয়। সাধারণ কথায় স্বরাজ মানে ব্যক্তিগত স্বার্থবুদ্ধি ভুলে দেশহিত বুদ্ধিতে নিজেদের কাজে নিজেরা কর্তৃত্ব করার সুযোগ ও অধিকার ভোগ করা। দেশের জনসাধারণ নিজেদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মধ্যে স্বার্থবুদ্ধি মুক্ত ব্যক্তিগত ইচ্ছা কেন্দ্রীভূত করে' তাঁদের কাজের মধ্যে নিজেদের ইচ্ছাকে পরিণত করেন। বর্তমানে এইরূপে জনসাধারণ নিজেদের কর্তৃত্বাধিকার প্রতিনিধিদের মধ্যে দিয়ে চালিয়ে প্রতিনিধি মূলকগণতন্ত্র বা স্বরাজ প্রতিষ্ঠা করে। দেশের কর্তা বা প্রভু জনসাধারণের বাইরে কোন শক্তি, রাজা বা তৎস্থানীয় কোন ব্যক্তি হতে পারেন; তা তিনি নিজের দেশেরই হোন আর অন্য দেশেরই হোন, এ ক্ষেত্রে এ রাজশক্তিকে স্বরাজ বলা কোন মতেই চলে না; আমরা নিজেদের তৈয়ারী আইনের দ্বারা নিজেদের শাসনও পরিচালন করবার অধিকার ও সামর্থ্য রাখি যতক্ষণ না এইভাব প্রতিপদে ও কাজে মানুষ অনুভব করে ততক্ষণ তার সামাজিক মুক্তি বা রাজনৈতিক স্বরাজ কোথায়? রাজনৈতিক আত্মা যতক্ষণ না নিজের প্রভু নিজে হচ্ছেন অর্থাৎ সমাজজীবনে অবাধ হয়ে সমষ্টির মধ্যে ব্যষ্টির ভাবে মুক্ত হচ্ছেন ততক্ষণ সে বদ্ধ। সামাজিক প্রভুত্ব বা শাসনদণ্ড সঙ্ঘবদ্ধ নিজেদের সকলের উপর বা প্রতিনিধিদের উপর ন্যস্ত থাকতে পারে। এই দুই ক্ষেত্রেই স্বরাজ সম্ভব হতে পারে; প্রথমোক্ত রকমের স্বরাজ প্রাচীন গ্রীসে ও বর্তমানে সুইজারল্যাণ্ড দেশের কন্টী ক্যাণ্টন বা 'চাকলা'য় দেখা যায়। আর যেখানে অসংহত অসংযত ভাবে সকলেই প্রভু সেজে বসেন সেখানে স্বরাজ অরাজকতার নামান্তর মাত্র হয়। বর্তমান অবস্থায় প্রকৃত আত্মশাসন শক্তি লাভ করতে হলে প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠান স্থাপনের বিশেষ দরকার। সে প্রতিনিধি এমন হওয়া চাই যে তিনি দেশের ও দশের লোক হবেন, দেশের ব্যথা বুঝে দশের চাপরাশ পরে' নিজেকে সর্বসাধারণের ভৃত্যাধমি ভৃত্য জ্ঞান করে কাজে নামবেন—সম্মান লাভের আশায় নয়, প্রতিষ্ঠার জন্য নয় তৃণাদপি সুনীচ হয়ে সাধারণ দেবতার সিংহাসন তলে মাথা নীচু করে' সর্বসাধারণী ইচ্ছাকে কাজে পরিণত করবেন এবং দরকার হলে সগৌরবে ও সবিক্রমে সাধারণের কল্যাণ হিতবুদ্ধিতে লড়বেন। চাই আমাদের এখন এমন পুরুষপ্রধান যিনি তাঁর আচার-ব্যবহারে সাধারণের ভৃত্যাধমি ভৃত্য হলেও সময়োচিত আত্মিক তেজে কাঙাল নন। স্বরাজকামী প্রত্যেকেরই উচিত এ ঘোর সংশয়-আঁধার, প্রলোভন ও হিংসাদ্বেষের মাঝে বিমল কর্তব্যবুদ্ধির ভাস্বর জ্যোতিতে সত্যসেবী সময়ের মানুষ চিনে নেওয়া ও তাঁদের স্বরাজরথের সারথি পদে বরণ করা।

প্রতিনিধিমূলক গণতন্ত্র বা স্বরাজে দেশের সামান্য একজন চাষীরও মতামত হেয় নয়। আজকাল বিলাতের পার্লামেণ্ট মহাসভাও তাদের মত লোকের মতামতের অপেক্ষা কম করেন না; সেখানে কোন বিষয়ে আলোচনার মধ্যে সামান্য সাধারণ লোকের মতামত opinions of 'the man in the street' এর উপর প্রায়ই কিছু না কিছু জোর দেওয়া হয়। সুবৃহৎ অট্টালিকার নিম্নে ভিত্তি ইষ্টকের মত এই ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র ব্যক্তির মতামতের উপর সুবিশাল ব্রিটিশগণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত। সাধারণের বিষয়ে সামান্য চাষাভুষার মত সেখানে সর্বোচ্চ ধনিদারের মতের সঙ্গে তুল্যমূল্য; রাজনৈতিক অধিকার বিষয়ে ছোট, বড়, ধনী, নির্ধন

নাই অন্ততঃ থাকা উচিত নয়; ইতর ভদ্র নির্বিশেষে সকলের মতামতই প্রতিনিধি নির্ব্বাচনাদি সাধারণের ব্যাপারে সমানভাবে গ্রাহ্য। আমাদের এখানেও প্রজা জমিদার, ব্রাহ্মণ, ইতর, ভদ্র, শূদ্র সকলেরই নিজ নিজ স্বাধীন ও তুল্যমূল্য মতগুলি ভোটের আকারে যথাযথ ন্যস্ত ও সন্নিবিষ্ট হলে স্বরাজতন্ত্রের ইমারত পাকা হয়ে গড়ে উঠে। আর যদি এই মতামত প্রকাশ অবাধ হতে না পায় তাহলে ধ্বংসের বীজ অন্তরে ধারণ করাতে তা মুষড়ান হয়ে গড়ে' উঠা দূরে থাকুক ক্রমে শিথিল হয়ে বসে যায়। সুতরাং গোড়ায় যাতে গলদ রয়ে না যায় তা আমাদের দেখতে হবে অর্থাৎ আমাদের গণতন্ত্রের ভিত্তি—ভোট দেওয়ার ক্ষমতার ন্যায় কয়টী ব্যক্তিগত রাজনৈতিক অধিকার পরিচালনের ক্ষমতা অবাধ করতে হবে। স্বার্থান্বেষণ, হিংসান্বেষে স্বরাজ আসে না, আসে তা কেবল ত্যাগে, বিবেক বিচারে।

দেশের রাজনৈতিক শিক্ষার বর্ত্তমান অবস্থায় অনবরত সভাসমিতি করে' রাজনৈতিক অধিকার পরিচালনা বিষয়ে দেশের লোকের কর্ত্তব্যবুদ্ধি জাগিয়ে তুলতে হবে —তাদের এখন বুঝিয়ে দিতে হবে কেমন করে' অন্যান্য গণতন্ত্র দেশে প্রজারাই তাদের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধির সাহায্যে আইন সভাতে আইন তৈয়ারী করে' দেশ শাসনের অধিকার কতকটা পরিচালনা করে। নির্ব্বাচন-দ্বন্দ্বের সময় নির্ব্বাচনার্থীদের এ একটী প্রধান কর্ত্তব্য, যদিও নির্ব্বাচনের পরও ইংল্যাণ্ডের মত এখানেও প্রতিনিধিরা দেশের লোক বা নির্ব্বাচক মণ্ডলীর সঙ্গে দেশ সম্পর্কীয় নানা বিষয়ে সভাতে বসে আলোচনা করতে পারেন। এতেই গণতন্ত্রের উদ্দেশ্য কতকটা সফল হয়; কারণ প্রতিনিধি অনবরত জনমতের সম্পর্কে থাকায় গণতন্ত্রের আদর্শ কাজে ও কথায় ফুটে উঠবার সুবিধা পায়; জনশিক্ষাও সুলভ হয়। সত্যের কাঙাল সেই যুগপ্রেরিত পুরুষের সত্যবাণী অবহেলা করে টাকার জন্য ব্যক্তিগত স্বাধীনতা বেচতে রাজি এমন লোকেরও অভাব দেশে নাই। এ অবস্থায় জনসাধারণকে তাদের ভগবদ্দত্ত অধিকার সম্বন্ধে বেশ করে' বুঝিয়ে দেওয়ার দরকার, যাতে তারা বিবেক বুদ্ধি পরিচালিত হয়ে সে অধিকার যথাযথ পরিচালনা করে—যাতে তারা স্পষ্ট দেখতে পায় শুধু ভোট দেওয়ার পিছনেই কত কিছু প্রজার বা মানুষের রাজনৈতিক জীবন বিকাশে কত সাহায্য করে; দেশের এ দুর্দ্দিনে সকলকেই বেশ ধীরতা ও বিবেচনার সঙ্গে চলতে হবে। মননের দ্বারাই মানুষ বাঁচে, তাতেই তার জীবন ও মুক্তি আর এতেই সে উদ্ভিজ্জাদি ও অন্যান্য প্রাণী হতে বিভিন্ন। তাই যদি মানুষ যে পর্য্যন্ত না স্বাধীনভাবে চিন্তা করে' কাজ করতে শিখে, সে পর্য্যন্ত তার মুক্তি কোথায়, তার সমাজজীবনে ব্যক্ত হওয়ার আশাই বা কোথায়? দেশের লোক এখনও তেমন শিক্ষিত হয় নাই যে খবরের কাগজ পড়ে' রাজনৈতিক শিক্ষালাভ করবে। তা ছাড়া খবরের কাগজের চেয়ে জনসভার দ্বারা রাজনৈতিক শিক্ষা বেশী প্রচার লাভ করে, বিলাতের মত শিক্ষিত দেশেও এ কথার সত্যতা বেশ বুঝা যায়। তা ছাড়া ভোটারের সংখ্যা বেশী হলে সভাসমিতির প্রয়োজনীয়তা বিশেষ আছে। এদেশেও নূতন সংস্কার আইনে ভোটারের সংখ্যা নিতান্ত মন্দ হয় নাই, তবে জন সংখ্যা হিসাবে অবশ্য কম হয়েছে। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দের সংস্কার আইনের পর ইংল্যাণ্ডে ভোটারের সংখ্যা অত্যধিক বেড়ে যাওয়াতে নির্ব্বাচনার্থীরা নির্ব্বাচনের পূর্ব্বে ও পার্লামেণ্টের সভ্যেরা নির্ব্বাচনের পরেও প্রায় সারা বছরটাই যায়গায় যায়গায় সভা করে' দেশসংক্রান্ত অনেক বিষয়েই দেশের লোকের সঙ্গে মিলে আলোচনা করে থাকেন। এইরূপে নূতন আইন প্রণয়নে বা পুরাতন আইনের সংশোধনে বা পরিবর্ত্তনে জনমতকে সেখানে অবহেলা করা চলে না। তা করলে পরবর্ত্তী নির্ব্বাচনের সময় এ রকম সত্যকে আর লোকে গ্রহণ করে না। পার্লামেণ্টের বাহিরে ও ভিতরে তীব্র সমালোচনার ভয়ও জনপ্রতিনিধির কাজের ধারা অনেকটা নিয়ন্ত্রিত করে।

ইংল্যাণ্ডে জনমত দলবদ্ধভাবে অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে নিজেকে খাটায় ও স্বীয় প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে। এলোমেলো ভাবে কাজ না করায় তা এতটা ব্যক্ত ও প্রতিষ্ঠিত হয়। এক একটী মোটামুটি মত ঘিরে এক একটী দল গড়ে উঠে; নানা মুনির নানা মত হলেও

তাদের প্রত্যেকটীর ভিতরে কম বেশী সত্য নিহিত আছে। প্রবল ও মোটামুটি মতগুলিকে দল বাঁধবার স্বাধীনতা দিলে যে মতটী বেশী সত্যে প্রতিষ্ঠিত কার্য্যক্ষেত্রে স্বপক্ষ ও বিপক্ষ সমালোচনার মধ্যে দিয়ে তাকে দাঁড় করাবার সুবিধা হয় অর্থাৎ সকল মতাবলম্বী লোকের একত্র স্বাধীন আলোচনার দ্বারা সত্যে উপস্থিত হওয়া কতকটা সহজ হয়ে পড়ে ও সেই মত, আইন-প্রণয়নেরও সুবিধা হয়। এতে এক দেশদর্শিতা, সম্প্রদায় ও ব্যক্তি-গত স্বার্থ প্রকট ও প্রবল হতে পায় না। এই নিরপেক্ষতাই আইন প্রণয়নের আদর্শ। সকল সম্প্রদায়ের ও ব্যক্তির স্বার্থ এই নিরপেক্ষ নীতিতেই সমঞ্জসীভূত হয়ে বজায় থাকে। ব্যষ্টি-গত-সমষ্টিগত গণতন্ত্রে এই নিরপেক্ষ নীতির রক্ষার জন্য সব সময়েই সতর্ক থাকার দরকার, নইলে সম্প্রদায় বিশেষের স্বার্থ এসে তার সুমহান্ আদর্শকে খর্ব্ব ও কলুষিত করে তার পবিত্র স্বরাজের ভিত্তিতে আঘাত করতে পারে।

ব্যক্তিগত মতের মুক্তিতেই সমাজের পত্তন ও পরিণতি। ব্যক্তিগত মতগুলি বর্ত্তমান ক্ষেত্রে যথোপযুক্ত প্রতিনিধিমণ্ডলীর মধ্যে দিয়ে সংহতভাবে ব্যক্ত ও মুক্ত হলে জাতীয় মুক্তি বা স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত হয়; ব্যক্তিগত মুক্তি কতকগুলি সামাজিক প্রতিষ্ঠানের মাঝে ঠিক মত ধারায় প্রবাহিত হয়ে জমাট বাঁধতে না পারলে জাতিগত মুক্তি আসে না; প্রতিনিধিমূলক অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানের বাঁধে ব্যক্তির মুক্তিকে মূর্ত্তি দিতে না পারলে সামাজিক মানুষের মুক্তিপথ খোলে না, স্বরাজও আসে না। ব্যক্তিগত স্বরাজ বা মুক্তি দশের মনের মানুষের কাজে সাধারণী ইচ্ছার সঙ্গে অভেদ হয়; ব্যক্তির ইচ্ছা এইরূপে স্বার্থ বুদ্ধি বিমুক্ত হয়ে সাধারণের কল্যাণবুদ্ধিগত ইচ্ছার সঙ্গে এক হয়ে যায়; দশের মানুষের কাজই সেই সাধারণের বড় ইচ্ছাটার ব্যক্ত ও সত্য রূপ। এইরূপে ব্যক্তিই সমাজে পরিণতি ও পূর্ণতা লাভ করে সমাজ জীবনে সত্য হয়। আবার সাধারণ ইচ্ছা-সংহত-প্রতিষ্ঠান-গর্ভ রাষ্ট্রই ব্যক্তির সামাজিক মুক্তির সহায়তা করে। মোট কথা, ছোট ছোট স্বার্থ ভুলে ব্যক্তি দেশ ও দশহিত বুদ্ধিতে প্রণোদিত ও বিকশিত হলেই স্বরাজ আপনা হতেই আসে—আর স্বরাজ আসলেই তার গণতন্ত্র মন্ত্র আপনা হতেই ফুটে পড়ে গড়ে উঠে।

ভাই ফোঁটা

[শ্রীকটিকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়]

দিব্য প্রভাত, বাজারে শঙ্খ লইয়া রূপার বাটী
দুয়ারে দাঁড়াল ভগিনী লক্ষ্মী-সমা রূপে পরিপাটী।
ঘিয়ের প্রদীপ রাখিল জ্বালিয়া পাতিল আসন খানি
মৃদুল কণ্ঠে উচ্চারি ভ্রাতা প্রণাম মন্ত্র বাণী।
ক্ষুণ্ণ-বদনে দাঁড়াইল ভ্রাতা সহসা আসিয়া দ্বারে
তার যুগ আঁখি কমল আনত স্নেহ সুধারস ভারে।
সিত সুশীতল চন্দন ফোঁটা তারে যেন দিল রয়
বর মাগে দোঁহে দেহে মনে দেব র'বো মঙ্গলময়।

সহসা কহিল ভ্রাতা গাঢ় ভাবে—স্নেহময়ী বোন্ মোর
দুয়ারের পাশে র'য়েছে দাঁড়ায়ে আর এক ভাই তোর।
আমার হৃদয় হ'রে গেছে যাঁরা তাহার হৃদয় সাথে
কর্ম্মের পথে চলেছি আমরা মিলি আজি হাতে হাতে।
এক তারে বাঁধা দুটী হিয়া তার, কণ্ঠেতে একই গান
ভগিনী আমার নহে সে হিন্দু, ভাই সে মুসলমান।
তোর দেওয়া ফোঁটা ললাটে তাহার জয়টীকা সম রাজে
সে ফোঁটা লইতে আকুল বাসনা তাহারও হৃদয় মাঝে।

ভগিনী তখন রূপার পাত্র লইল তুলিয়া হাতে
শঙ্খধ্বনি করিয়া আসন দিল পাতি আঙ্গিনাতে।
নূতন ভাইটী করুণ নয়নে দাঁড়াইল সেথা আসি
ললাটে লইয়া তিলক তাহার অধরে বিজয় হাসি।
নত হ'য়ে তুলি নিল শিরোপরে ভগিনীর—পদধূলি
কহিল—এ স্নেহে হইয়া ধন্য যেন জনমজনম তুলি
করমের পথে চলি আগুসারি হিন্দু মুসলমান।
বিধাতা অমর মুক্তির বর দিবেন মোদের দান।

ব্যতিক্রম

(উপন্যাস)

[শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্-এ]

প্রথমোবিংশ পরিচ্ছেদ

বিনয় যখন বাড়ী পৌঁছিল তখন বেলা ৩টা বাজিয়া গিয়াছে। বাড়ীর সকলের তখন খাওয়া দাওয়া শেষ হয় নাই। বিনয় আসিয়া দেখিল যে ছইখন কুটুম্বার তখন খাইতে বসিয়াছে আর তাহার মাতা পূজার দালানের সম্মুখে বসিয়া তাহাদিগকে খাওয়াইতেছেন। মাকে প্রণাম করিয়া বিনয় তাহার বুকে মুখ লুকাইল, মাতা পুত্রকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিরে?" বিনয় আবেগরুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "কিছু না মা।" মাতা কিন্তু পুত্রের কণ্ঠস্বর শুনিয়াই বুঝিতে পারিলেন যে সে মনে বড়ই ব্যথা পাইয়াছে। তিনি আঁচল দিয়া বিনয়ের মুখ মুছাইয়া দিয়া বলিলেন, "চল ঘরে চল, বেলা একেবারে পড়ে এসেছে কখন নাইবি কখন খাবি তার ঠিক নেই।" মাতাপুত্র উঠিয়া ঠাকুরবাড়ী ছাড়িয়া অন্দর মহলে গেলেন। বিনয়ের মা তখন আর তাহাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিলেন না। সন্ধ্যার পূর্ব্বে আহার করিয়া বিনয় পাড়ায় বেড়াইতে বাহির হইয়া গেল, হরশঙ্কর-বাবু তাহার সন্ধান করিতে আসিয়া তাহাকে খুঁজিয়া পাইলেন না।

এক প্রহর রাত্রিতে সে যখন ফিরিয়া আসিল তখন বৈঠকখানায় পাশা খেলার ধুম পড়িয়া গিয়াছে, বিনয় আসিলেও হরশঙ্কর তাহাকে দেখিতে পাইলেন না। সে বৈঠকখানায় দু চার মিনিট দাঁড়াইয়া সটান অন্দর-মহলে মায়ের কাছে চলিয়া গেল। মা তখন ধূপ তৈয়ার করিতেছিলেন, তিনি হাতের কাজ ফেলিয়া বিনয়কে কোলের কাছে বসাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুই কোথায় গিয়েছিলি বাপু, উনি সন্ধ্যাবেলায় এসে তোকে খুঁজে পেলেন না।" বিনয় বলিল, "একটু কাজে ওপাড়ায় মোহিনীদের বাড়ী গিয়েছিলুম, মা। এখন দেখে এলুম বাবা পাশা খেলছেন।" "তবে তুই এইখানে বোস্, তিনি যখন ভিতরে আসবেন, তখন কথা কইবেন।" "সে ত দুপুর রাত্তিরে মা? আমার যে ঘুম পাচ্ছে!" "তোর সমস্তই দুষ্টুমি বাপু। ঘুম টুম তোর কিছুই পায় নি। তোর শ্বশুর বাড়ীর আমলা এসে সেদিন তোর কত সুখ্যাতি করে গেল, বলে গেল যে তুই নাকি সারারাত্রি জেগে পড়িস্।" "সে কি এখানেও এসেছিল মা?" "এসেছিল বৈকি, কাল এসেছিল আজ সকালেই চলে গিয়েছে। বেয়াণ ঠাকুরুণ নাকি ভারি তত্ত্ব করেছিলেন? সে লোকটা ওঁর কাছে বসে বসে গল্পটা ধরে তত্ত্বের ফর্দ্দ পড়ে শোনাচ্ছিল, তুইত জিনিষপত্র কিছু আনিস নি?" হঠাৎ বিনয়ের মুখের ভাবান্তর ঘটিয়া গেল, সে বলিয়া উঠিল, "আনিনি মা, আমি নিজে তা স্পর্শ পর্য্যন্ত করিনি। আমার মনে হল যারা অত সুন্দর, তাদের সব সুন্দর জিনিষপত্র আমাদের কাল মানুষের সইবে না; অত সুশ্রী জিনিষ আমাদের এ বিশ্রী সংসারে মানাবে না।" বিনয়কে উত্তেজিত হইতে দেখিয়া মা বলিলেন, "দেখ বিনু প্রথম থেকেই এ বিয়েতে আমি মত দিইনি, কেবল কর্ত্তার জেদে এ বিয়েটা হয়েছিল। তিনি তখন মনে করেন যে এখানে বিয়ে হলে বউ বিস্তরের অর্দ্ধেক অংশ নিয়ে এসে বসবে। এখন তোমাদের তিন জনের তিন রকম মত দাঁড়াচ্ছে, কি যে হবে মা দুর্গাই জানেন। বেয়ান লোক পাঠিয়েছিলেন তোকে নিয়ে যাবার জন্য, ওঁর ইচ্ছে যে পূজোর সময় তুই ওঁদের বাড়ীতেই থাকিস্। কর্ত্তার ইচ্ছে যে তুই বৌমাকে নিয়ে দু'চার দিন পরে হরিহর পুরেই চলে আসিস্। সেটা আমারও ইচ্ছে বাবা, তুমি আমার শিবরাত্রির সলতে, আমার বাড়ী পুরো, হাজার আনন্দ হলেও আমার আঁধার ঘরের মাণিক না এলে আনন্দের দিন আমার ঘর নিরানন্দ হয়ে থাকবে। বিয়ে হয়ে অবধি বউ ঘরে আসেনি, শুনছি বৌমা বেশ বড় সড়

হয়ে উঠেছেন, এখন আর বেশী দিন বাপের বাড়ী থাকা ভাল নয়। সেই জন্য আমাদের দুজনেরই ইচ্ছে যে তুই বৌমাকে এখানে নিয়ে আসিস্। তবু এখানে না পাঠিয়ে কোলকাতায় পাঠানতে কর্ত্তা একটু চটেছেন, উনি মনে কচ্ছেন যে বেয়ান ঠাকরুণ আলাদা উস্কে করে তোকে বশ করছেন।" বিনয় নিশ্বাস ছাড়িয়া বলিল, "তত্ত্বের কথা তুমি বাবাকে বুঝিয়ে বোলো মা। বশ যতটা হয়েছি তা তুমি বুঝতেই পাচ্চ। বাবা যদি বলেন আমি কালই সেখানে যাব, শুনেছি তাঁরা খুব বড়লোক, তাঁদের মেয়ে তাঁরা যদি ছাড়েন, তাহলে নিয়ে আসব আর যদি না ছাড়েন তাহলে নিজেই চলে আসব। আমি কোন মতেই তাঁদের বাড়ী পুজোর সময় থাকব না।" মাতা সস্নেহে বিনয়ের গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন, "তুই ত আমার সেই বিনু, আমি কি তোকে চিনিনা আমি ওঁকে বার বার করে বুঝিয়ে বোললুম কিন্তু উনি কিছুতেই বুঝতে চান না; রাগ হলে ওঁর ত কাণ্ডজ্ঞান থাকে না।"

নানা কথায় রাত্রি বাড়িয়া গেল, তখন বিনয়ের মাতা জিজ্ঞাসা করিলেন, "হাঁরে, তুই কিছু খাবি না? রাত্রি যে ক্রমশঃ দুপুর হয়ে উঠল।" বিনয় বলিল, "এইত সন্ধ্যা বেলায় খেয়েছি মা, এ বেলা আর খেতে পারব না।" মা বলিলেন, "তবে বৈঠকখানায় খবর দিয়ে পাঠাই, তা নৈলে পাশা খেলা ভাঙবে না দেখছি।" "আর বেশী দেরী হবে না। তোমার সঙ্গে আমার গোটাকতক কথা আছে মা। শ্বশুর বাড়ীর সম্বন্ধে না—হাঁ মা মোহিনীর কি বিয়ে হবে না?" "হবে না কেন, তবে ওর বাপের বরাত ভাঙা পণ, সমান ঘরের পাত্র না পেলে বিয়ে দেবে না। শুনের সমান ঘরের পাত্র আজি আমাদের দেশে পাওয়া যায় না।" "মোহিনীও বড়সড় হয়ে উঠেছে না?" "বড় হয়েছে বৈকি, ষোল সতের বৎসরের মেয়ে কি আমাদের ঘরে রাখা চলে? তবে ওদের ঘরে চলে, জিশবৎসর বয়সে মোহিনীর পিসির বিয়ে হয়েছিল।" বলিতে বলিতে হরসুন্দরের পায়ের শব্দ শোনা গেল, তিনি আসিলে বিনয় তাঁহাকে প্রণাম করিয়া দাঁড়াইল। হরসুন্দর বলিলেন, "বিনু তুমি কাল শ্বশুর বাড়ী যাও, বৌমাকে নিয়ে দুচার দিনের মধ্যেই ফিরে এস। তোমার শাশুড়ী ঠাকরুণকে বোলো যে আমার একটি মাত্র বউ, তাঁর মত আমারও সাধ আহ্লাদ আছে ত? সুতরাং এখন বউ পাঠাতেই হবে।" বিনয় পিতার মুখের দিকে চাহিয়াই জিজ্ঞাসা করিল, "আর তাঁরা যদি না পাঠান?" "তাহলে পত্র পাঠ তুমি চলে আসবে, যেন অন্যথা না হয়।" বিনয় বলিল, "নিশ্চয়ই আসব।" হরসুন্দর আশ্চর্য্য হইয়া পুত্রের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন, বিনয় আর কোন কথা না কহিয়া নিজের ঘরের দিকে চলিয়া গেল।

চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ

সকালবেলায় বিনয়ের শ্বশুরবাড়ী যাইবার সাজসজ্জা দেখিয়া বাড়ীর লোকে আশ্চর্য্য হইয়া গেল, একজন চাকরে তাহার মন উঠিল না, সে দুইজন সঙ্গে লইল। সে সাবেক কালের টিন ট্রাঙ্ক ফেলিয়া কলিকাতা হইতে আনীত দুইটা স্যাচেল ব্যাগ্ লইল, চটের বলিয়ার বিছানা না বাঁধিয়া নূতন চামড়ার ট্রাপ দিয়া বাঁধিয়া ব্যয় বাহুল্যে গ্রামবাসীকে বিস্মিত করিয়া তুলিল। কৃপণস্বভাব হরসুন্দর যখন তাহাকে তৃতীয় শ্রেণীর পরিবর্ত্তে মধ্যমশ্রেণীতে শ্বশুর বাড়ীতে যাইতে আদেশ করিলেন তখন সে দ্বিতীয় শ্রেণীতে যাইব বলিয়া বিস্ময়ের মাত্রা বাড়াইয়া দিল।

পরের দিন বিনয় শ্বশুর বাড়ীতে পৌঁছিল, সাদরে ও সম্ভ্রমে তাহার অভ্যর্থনার কোনও ত্রুটী হইল না কেবল দুই একটা বিষয়ে বিনয় নিজের মত প্রকাশ করিয়া শ্বশুরালয়ে বদনাম কিনিল। সে বলিল যে সে ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করে না—সেইজন্য সে সন্ধ্যা-বন্দনা করে না, আর সে জাতিভেদ মানে না বলিয়া উপবীতটা ফেলিয়া দিয়াছে। পরম হিন্দুর গৃহে নব-জামাতার এই অদ্ভুত আচরণে সকলে স্তম্ভিত হইয়া গেল, কিন্তু জামাতা নূতন বলিয়া কেহ কিছু বলিল না।

সন্ধ্যার সময় বিনয় বাহিরে বসিয়াছিল, একজন দাসী আসিয়া তাহাকে বলিল যে বড়দিদিমণি তাহাকে

তাকিতেছেন। বিনয় উঠিয়া অন্তরে গিয়া দেখিল যে সদ্যস্নাতা সারদাসুন্দরী তাহার জন্য একরাশি সাবান, দেয়ার লোশান ও এসেন্স্ লইয়া বসিয়া আছে। সারদা তাহাকে দেখিয়া বলিল, 'বিনয়, তুমিতো একটী আস্ত গাধা, এখন দেখ্‌ছি তোমার বন্ধুবান্ধবও সব গাধা। প্রথম শ্বশুর বাড়ীতে এসেছ, কি কর্ত্তে হয় তা' জাননা? বন্ধুবান্ধবও কি শিখিয়ে দেয় নি? বিনয় সন্তাষণে তুষ্ট হইয়া বলিল, "না, দিদি আমায় তো কেউ কিছু ব'লে দেয় নি।" "তবে আমিই ব'লে দিচ্ছি, তোমায় নিয়ে অনেক ঘুসতে হবে দেখ্‌ছি? এখন এই লোশান্‌টা নিয়ে গরম জলে ঢেলে দিয়ে সাবান মেখে স্নান ক'রে এস দেখি!" বিনয় অন্যত্র কোন দিন তিনবার কোন দিন দুইবার স্নান করিত কিন্তু সে বাঁকিয়া বসিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া শ্বশুরালয়ে আসিয়াছিল সুতরাং সে প্রথম সুযোগ পাইয়া বাঁকিয়া বসিল। সে বলিয়া বসিল, "দিদি, দিনে দু'বার স্নান আমার কোন কালেই সহ্য হয় না, এত রাত্রিতে স্নান ক'রলে আমার জ্বর হবে না হয় নিউমোনিয়া হবে।" সারদা মুখ বাঁকাইয়া বলিল, "এমন গাধা পিটে ঘোড়া কর্ত্তে হ'লে অনেক ওষুধ পত্র দরকার। গাধা মশাই, একবার এসে দেখ দেখি।" সারদা বিনয়ের হাত জড়াইয়া ধরিয়া তাহাকে নিকটের একটা ঘরের দুয়ারে লইয়া গেল। বিনয় যাহা দেখিল তাহাতে তাহার হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন সহসা স্তব্ধ হইয়া গেল, ধমনীতে উষ্ণশোণিত প্রবাহ নিমেষের জন্য থামিয়া গেল, সে দেখিল যে ঘরের মধ্যে মার্ব্বেল পাথরের মেজের উপরে বসিয়া তাহার বিবাহিতা পত্নী অন্নদা সুন্দরী একটী সুন্দর অপরিচিত যুবার সহিত তাস খেলিতেছে। অন্নদার অঙ্গে, অন্নদার পরণে একখানা বহুমূল্য রেশমের শাড়ী, তাহা নূতন বলিয়া বোধ হইতে খুলিয়া পড়িয়াছে, অন্নদার সেদিকে দৃষ্টি ছিল না, সে পরমোৎসাহে মনের আনন্দে অপরিচিত যুবার সহিত হাস্য পরিহাস করিতেছিল, তাহার বক্ষের বা পৃষ্ঠের আবরণ কোথায় সেদিকে দৃষ্টি দিবার অবসর তাহার তখন ছিল না। বিনয়ের ভাব দেখিয়া সারদা আবার তাহার হাত ধরিয়া তাহাকে সেখান হইতে সরাইয়া লইয়া গেল এবং দূরে গিয়া বলিল, "দেখলে তো, এখন একটু সাজ গোজো, তা' নইলে আমার বোনের মনে ধর্‌বে কেন? বিনয়ের মন অন্নদার হাবভাব দেখিয়াই বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছিল, সে বলিয়া উঠিল, "দিদি, আমার যে রং আছে, তা' সাতজন্ম সাবান মাখ্‌লেও তো' ফর্সা হবে না সুতরাং শুধু শুধু একদিন সাবান বা বাথ্ এসেনিয়াল্ ব্যবহার ক'রে মিছি কাজ এনে লাভ কি? যখন ভগিনীপতি গাধা অথবা বানরের গলায় অর্পণ করেছিলেন, তখন আমার পাকা রংএর কথাটা ভেবে দেখা উচিত ছিল।" সারদা কিছুমাত্র না হাসিয়া বলিয়া উঠিল, "গাধা, তোমার কথায় প্রমাণ হচ্ছে যে তুমি একটী আস্ত গাধা। বসন্তের কোকিল না ডাক্‌লে কি কোকিলা আসে? কাল শ্যামচাঁদের বাঁশী সমস্ত গোকুলের রূপসীদের পাগল ক'রে তুলেছিল। এখন আমার কথা শোন দেখি। আমি সাজিয়ে গুজিয়ে দি, দেখ তোমার উর্ব্বশীর মনে ধরে কি না।" বিনয় সারদার কথার উত্তর না দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "দিদি ও লোকটী কে?" সারদা প্রশ্ন শুনিয়া হাসিয়া গড়াইয়া পড়িল। অনেকক্ষণ পরে হাসির বেগ সামলাইয়া বলিল, "তাহ'লে অষুধ ধরেছে? পাঁচন অবধি দিতে হয় নি। গাধাবাবু ওটী তোমার মত গাধা পিটে ঘোড়া ক'রবার মুষ্টিযোগ। ও চেহারা সম্মুখে থাকতে কোন মেয়ে মানুষ কি তোমার মত কাল বাঁদরের দিকে চেয়ে দেখে?" বিনয় বলিল, "নিশ্চয় না, তবে দিদি আমি এমনি গাধা যে অষুধটা ধরে ও ধ'রল না। বাবা ব'লে দিয়েছেন, এখানে দু'চার দিন থেকেই বাড়ী ফিরে যেতে। আপনার মা কোথায়? সে কথাটা তাঁ'কে বলা হয় নি।" বিনয় উঠিয়া গেল, সারদা আশ্চর্য্য হইয়া বসিয়া রহিল।

পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ

ভবসুন্দরী রাধা বিনোদের মন্দিরের সম্মুখে বসিয়া মালা ফিরাইতে ছিলেন। মন্দিরের সম্মুখের নাট-মন্দিরে চাকরেরা আসর সাজাইতেছিল। এই সময়ে এক জন দাসী আসিয়া তাঁহাকে সংবাদ দিল যে তাঁহার

ছোট জামাই তখনই তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে চাহেন। দাসীকে মন্দিরের রোয়াকে একখানা আসন পাতিয়া দিতে বলিয়া ভব-সুন্দরী তাহাকে জামাইকে ডাকিয়া দিতে বলিলেন। অল্পক্ষণ পরে বিনয় আসিয়া শাশুড়ীকে প্রণাম করিয়া তাঁহার আদেশ মত আসনে বসিল। ভবসুন্দরী অন্য কথা খুঁজিয়া না পাইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ আর বেড়াতে যাওনি, বাবা?" বিনয় বলিল, "আজ শরীরটা তত ভাল না সেই জন্য বেড়াতে যাইনি।"

"না গিয়েছ ভালই ক'রেছ, সারদার 'বেড়ান' বাই আছে, সেই বলছিল বেড়াতে যাবে। আমি বারণ করি তা' শুনবে না, রোজ বৈকালে অন্নদাকে নিয়ে গাড়ী ক'রে বেরুবে। তোমার যে দিন ইচ্ছে হয় যেও। এ তোমার বাড়ী, তোমার ঘর, আমি আর ক'দিন বাছা, সারদাকেও ভগবান্ মিথ্যে ক'রে রেখেছেন। এর পর তোমাকেই এখানে বসবাস ক'রতে হ'বে।" কাশীতে ভবসুন্দরীকে দেখিয়া অবধি বিনয় তাঁহাকে ভক্তি করিত, সুতরাং শ্বশুরালয়ে বাসের কথাটা তাহার মনঃপুত না হইলেও সে উত্তর দিল না। বিনয় চুপ করিয়া রহিল দেখিয়া ভবসুন্দরী আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি গান শুনতে ভালবাস বাবা?" সঙ্গীতে যথেষ্ট আসক্তি সত্ত্বেও বিনয়ের তখন তাহা বিষবোধ হইতেছিল। সে উত্তর দিল 'সকল গান ভালবাসি না, বিশেষতঃ সেকেলে গান আমার মোটেই ভাল লাগে না।' ভবসুন্দরী বলিলেন "এ গান সেকেলে গান কিন্তু যে ছেলেটী গায় সে দেখ্‌তে যেমন সুন্দর তার গলাটীও তেমনি মিষ্টি। অন্নদা তা'কে বড়ই ভালবাসে দুটীতে যেন পিঠোপিঠি ভাই বোন্। কেবল পারি পোড়ামুখী ছেলেটীর উপর হাড়ে চটা। তুমি একটু বলো বাবা, সারদা আর অন্নদা এখুনি ছেলেটীকে নিয়ে আসবে।'

দেখিতে দেখিতে কীর্ত্তনীয়ার দল খোলকরতাল লইয়া নাটমন্দিরে আসিয়া বসিয়া গেল। তাহা দেখিয়া বিনয় বুঝিল যে সময় নিতান্ত সংক্ষেপ, সে তখন শাশুড়ীকে বলিল, "বাবা একটা কথা ব'লে দিয়েছেন সে কথাটা আপনাকে শুনিয়ে রাখ্‌তে চাই।" ভবসুন্দরী বলিলেন, "আমি তাঁর পত্রও পেয়েছি কিন্তু তুমি যে সাত রাজ্যের প্রাণ বাবা। জন্মের মধ্যে এই প্রথম বাড়ীতে জামাই এসেছে। সারির বিয়ে হবার পরেই কপাল পুড়েছে। আরির বিয়ের পরে এতদিন হ'য়ে গেল একদিনের তরেও তোমাকে পাইনি। এখন কি তোমাকে ছেড়ে দিতে পারি, বাবা? এ পুজোটা এখানে কাটিয়ে যেতেই হবে। পুজোর পরে তুমি না হয় আরিকে দু'চার দিনের জন্য হরিহরপুরে নিয়ে যেও।" বিনয় একটু হাসিয়া বলিল, "বাবা বড় বদরাগী মানুষ, আমি তাঁকে কোন কথা বলতে ভরসা পাই না। তিনি ব'লে দিয়েছেন যে এবার পুজোতে আমাদের হরিহর-পুরে থাকতেই হবে। সুতরাং এখন না পাঠালে তিনি বড়ই অসন্তুষ্ট হবেন।" "সে কথা তিনি পরেশের মুখেও ব'লে পাঠিয়েছেন, কিন্তু বাবা, আমার অবস্থাটা একবার বিবেচনা ক'রে দেখ। আমি পতি-পুত্র-হীনা। এ-সংসারে তিন পুরুষ ধ'রে পোষ্য পুত্রের উপরই চ'লছে। সেই জন্য এ বাড়ীতে মেয়ের আদর ছেলের সমান। আমি কেবল মেয়ে দু'টীর মুখ চেয়ে পোষ্য পুত্র নিইনি। বৎসরকার দিন সাধ আহ্লাদ মেটাতে ঐ একটী মেয়ে কারণ বড়টীকে ভগবান্ মিথ্যে ক'রে রেখেছেন। ছোটটীকে তোমার সঙ্গে ছেড়ে দিয়ে আমরা দু'টী বিধবাতে এই রাবণের পুরীর মধ্যে কি ক'রে বাস ক'রব বাবা?" বিনয় কথাটা শুনিয়া একটু গলিল। কিন্তু, তাহার পরই তাহার মনে পড়িয়া গেল যে এই গৃহে বাস করিয়া তা'র সদ্যোদ্ভিন্নযৌবনী ধর্ম্মপত্নী অনাবৃত দেহে নির্জ্জন কক্ষে পর-পুরুষের সহিত রঙ্গালাপ করিতে শিখিতেছে। তখন তাহার রক্ত আবার গরম হইয়া উঠিল। সে যথাসম্ভব তাহার বিনীত ভাব রক্ষা করিয়া বলিল, 'আপনি যা' ব'লছেন তা' ঠিক কিন্তু আমি ও আমার মায়ের একমাত্র সন্তান, আমার মা আমাকে ছেড়ে থাকতে পারেন না। আমি এখন কি ক'রব বলুন?" ভবসুন্দরী বুঝিলেন যে জামাই নরম হ'য়েছে, তিনি বলিয়া উঠিলেন, "তোমার মা তো বছর বছর তোমাকে কোলে বসিয়ে পুজো দেখেন কিন্তু আমি যে এই প্রথম পেয়েছি, বাপু। আমি যেমাই মশায়কে

যেমন ক'রে পারি ঠাণ্ডা ক'রব তুমি নিশ্চিন্ত হ'য়ে এখানে থেকে যাও।" বিনয় নিজের দুর্ব্বলতা অনুভব করিয়া বলিল "এখানে আসবার পূর্ব্বে বাবা আমাকে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছেন যে তাঁর অনুমতি ব্যতীত আমি দু'দিনের বেশী থাকব না।" ভবসুন্দরী একটু অসন্তুষ্ট হইলেন, কিন্তু জামাই নূতন বলিয়া মুখ ফুটিয়া কিছু বলিলেন না। তাঁহাকে নীরব দেখিয়া বিনয় আবার জিজ্ঞাসা করিল, "তবে কি আমি কর্ত্তাকে কিছু লিখ্‌ব?" ভবসুন্দরী বলিলেন; "না বাপু, তোমাকে কিছু লিখতে হবে না। আমি এখনই পরেশকে পাঠিয়ে দিচ্ছি।" কর্ত্রীর আদেশ মাত্র পরেশচন্দ্র আসিয়া দাঁড়াইল, ভবসুন্দরী তাহাকে তখনই হরিহরপুর যাত্রা করিতে আদেশ করিলেন।

এই সময় নাটমন্দিরের সমস্ত আলো জ্বলিয়া উঠিল, খোল বাজিয়া উঠিল, বিনয় দেখিতে পাইল যে অন্দর মহলের দুয়ার দিয়া ফুলের সাজে সাজিয়া অনেক সেই অপরিচিত যুবকের হাত ধরিয়া নাট মন্দিরের দিকে আসিতেছে। বিনয় যে সেখানে বসিয়া আছে অনেক তাহা জানিত না, সুতরাং সে অনাবৃত মস্তকে অর্দ্ধাবৃত দেহে হাসিতে হাসিতে নাচিতে নাচিতে আসিতেছিল। সে নিকটে আসিলে নাট মন্দিরের আলোকে বিনয়কে দেখিতে পাইল, তাহার উল্লাস উড়িয়া গেল, মাথার কাপড় টানিয়া দিতে তাহার ফুলের সাজ ছিঁড়িয়া গেল। সে রাগ করিয়া ছেঁড়া ফুলের মালাগুলা টানিয়া ফেলিয়া দিয়া মাথায় এক হাত ঘোমটা টানিয়া দিল। ভবসুন্দরী তাহাকে দেখিয়া বলিলেন "আরি, আমার কাছে বস্‌বি আয়।"

অপরিচিত যুবা অসন্তুষ্ট হইয়া নাট-মন্দিরের এক কোনে গিয়া বসিল, ভবসুন্দরী যখন তাহাকে গাহিতে বলিলেন তখন সে বলিয়া পাঠাইল যে তাহার মাথা ধরিয়াছে, সে গাহিতে পারিবে না।

(ক্রমশঃ)

ফুলের বাতাস

[শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী]

১

ফুলের বাতাস গায় লেগেছে তাই এসেছি তোর কাছে,
আজকে রাধে করিস্‌নে আর মান;
ব্রজের মাঝে প্রাণাধিকে তুই বিনে কে মোর আছে,
তুই বিনে কে ভুলিয়েছে মোর প্রাণ।

২

তবুও কেন কিসের লাজে রইলি চেয়ে ভূঁই পানে,
অবাক্ হ'য়ে আঙুল দিয়ে চিবুকে;
কইছি কত মানময়ী শুন্‌স্ নাকি তুই কাণে,
বল কত আর ব্যথা দিবি এ বুকে।

৩

চরণ যুগে নূপুর দুটী রুমঝুম্ রুন্ বাজে,
কঙ্কণী কাঁখে আসিস্ যখন ঘাটে;
তাই শুনে আজ এসেছিলো লুকিয়ে কদম-বন মাঝে,
বিকিয়ে যেতে তোর লো প্রেমের হাটে।

৪

যাইনি তো আর রাগ্‌বি ব'লে 'চন্দ্রাবলী'র কুঞ্জেতে,
চাইনি তো আর গোপবালার মুখ;
দেখ্‌না ভেবে,প্রকাশ পাবে তোর যা সে কোন গুণ এতে,
দুঃখ দিয়ে পাবি বা কোন্ সুখ?

৫

রেখে যে তোর অবাক্ হবার লজ্জা পাবার ভাণ করা,
বুঝেছি তোর এসব শুধুই ছল;
বুঝেছি তুই আজকে কেন শুধুই কেবল মান্ করা,
আমায় কি কাজ ক'র্ত্তে হবে বল্।

৬

আবার কিগো হাতটী আমার চিবুক পরি তোর দিয়ে,
গাইতে হবে মান ভাঙ্গাবার চং?
কইতে হবে পদ্ম-রাঙ্গা চরণ যুগ স্পর্শিয়ে,
'দেহি পদ-পল্লব মুদারম্'?

চরন

মহাত্মাজীর প্রভাব

ফাঁসীকাষ্ঠে মহাত্মার জয়ধ্বনি

'নবজীবন' পত্রে মৌলানা শৌকৎ আলী কর্তৃক বিবৃত তাঁহার জেলের অভিজ্ঞতার এক হৃদয়স্পর্শী গল্প বাহির হইয়াছে; তাহা এই :—মৌলানা সাহেব যখন রাজকোট জেলে ছিলেন তখন তাঁহার কারাকক্ষের পার্শ্ববর্তী একটী কক্ষে মহাবো নামক একটী ভাঙ্গীকে রাখা হয়। মদ খাইয়া তাহার পত্নীকে হত্যা করায় তাহার প্রাণদণ্ডাদেশ হইয়াছিল। সে মৌলানার নিকট তাহার অপরাধ স্বীকার করিয়া বলে যে, প্রাণদণ্ড তাহার উপযুক্তই হইয়াছে। সে আরও বলে যে, তাহার মৃত্যুর পূর্ব্বে যে কয়দিন আছে, সে কয়দিন সে ঈশ্বরের নাম করিয়া ভজন গাহিয়া কাটাইবে। একদিন রাত্রে মৌলানা সাহেব তাঁহার পার্শ্বের ঘরে নৃত্যের শব্দ ও তৎসঙ্গে গান শুনিতে পাইলেন। মহাবো তাহার সৃষ্টিকর্ত্তার নামগানে বিভোর হইয়া নৃত্য করিতেছিল। তারপরদিন সকাল বেলাতেই প্রাণদণ্ডের কথা। তাহার গান শুনিয়া মৌলানা সাহেবের চোখ দুটী অশ্রুজলে ভরিয়া উঠিল। পরদিন প্রাতে মহাবো যখন তাহার কক্ষ হইতে বাহির হইল, তখন তাহার চেহারা বদলিয়া গিয়াছে। তাহার মুখে দুঃখ অথবা ভয়ের চিহ্ন মাত্র নাই, তাহার পরিবর্ত্তে হাসি ফুটিয়া উঠিয়াছে। সে যেন নাচিতে নাচিতে তাহার ফাঁসীকাষ্ঠের দিকে অগ্রসর হইল। তারপর যখন তাহার মাথায় মস্তকাবরণ পরাইয়া দেওয়া হইল, তখন তাহার মুখ হইতে 'মহাত্মা গান্ধীর' জয়ধ্বনি ফুটিয়া উঠিল। আর সেই সঙ্গে জেলের সমস্ত বন্দীর কণ্ঠনিসৃত 'মহাত্মা গান্ধিজী কি জয়' ধ্বনিতে সেই বিশাল কারাগার মুখরিত হইয়া উঠিল। পরে মৌলানা সাহেব অন্যান্য বন্দীর নিকট মহাবোর মৃত্যুর কাহিনী শুনিয়াছিলেন। তাহারা একবাক্যে বলিয়াছিল যে গত পনর বৎসরের মধ্যে তাহারা এমন নির্ভীকচিত্তে কাহাকেও মৃত্যুর সম্মুখীন হইতে দেখে নাই। জেলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টও এই কথা সমর্থন করিয়া মৌলানাজীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আচ্ছা, এই ভাঙ্গীটার সঙ্গে মহাত্মার সম্বন্ধ কি? 'মৌলা ।। সাহেব বলিলেন, "এই পৃথিবীতে এমন লোক শুধু একটি আছেন (মহাত্মা গান্ধি) যিনি তাঁহার সৃষ্টিকর্ত্তার নিকট প্রার্থনা করিয়াছেন যে, যদি তাহার পুনর্জ্জন্ম হয় তবে যেন তিনি ভাঙ্গী অথবা ধোপাদ (অস্পৃশ্য জাতি বিশেষ) হইয়া জন্ম গ্রহণ করেন।"

'আনন্দবাজার'

জাপানী জনবাদ

[শ্রীহিরণ্ময় ঘোষাল]

পৃথিবীর সকল দেশের মতই জাপানেও জনবাদের দুর্ভিক্ষ নেই; এবং সেগুলি সকল দেশেরই মতন জ্ঞান-সাগর মন্থন করা জ্ঞানসুধার উপাদানে তৈরী ও প্রায় সমরূপ; যেমন জাপানী জনবাদে বলে—"লাভারের পড়ে একবার ওঠে"—"হাজার ক্রোশের রাস্তা একপা থেকেই সুরু।" আমাদের দেশের—"উলুবনে মুক্ত ছড়িয়ো না" স্থলে "বেরালকে স্বর্ণমুদ্রা দান ক'রো না," "বকধার্ম্মিক" স্থলে "পুরোহিতস্বজ্ঞারুত ব্যাঘ্র," জাপানের অন্যান্য বচন হ'চ্ছে—"নীচ ব্যক্তি আকাশ থেকে নলের ভেতর দিয়ে," "অন্ধকরণ তিন বছরেও যা' যায় বছরেও তাই," "নির্ব্বুদ্ধিতা আর প্রেমরোগের ঔষধ মেলে না।" জাপানে মুরগীর ডাকটা নাকি দুর্ভিক্ষের পূর্ব্বলক্ষণ, তাই জাপানে কথায় বলে—"মুরগী ডাকলে রক্ষা নেই।" একজন জাপানী যদি কাউকে ব'লতে চায় যে কোনও কাজ হ'চ্ছে নিতান্ত অসম্ভব, তিনি জনবাদের দোহাই দিয়ে ব'লবেন—"ভাঙার দাঁতার যাও," অথবা "এক গুলিতে সাগর তোলপাড় কর," 'অসম্ভব'-বস্তুর জো নেই; Asiatic Napolean দের মুখে impossible-কথাটা যে মোটেই মানায় না।

গতির পরিমাণ

[শ্রীবরেন্দ্রনারায়ণ বসু]

সর্ব্বাপেক্ষা মন্দগতি হইতেছে সামুকের। তাহা হইতে ৪৫০০ গুণ কম সময়ে বরফ নদীর স্রোত বহিতে থাকে। ঘণ্টায় ৭ মাইল সাধারণ নদীর স্রোত বহিয়া যায়, বাতাস যাহা আমরা সচরাচর উপভোগ করি তাহার গতি ঘণ্টায় ৮ মাইল। ঝড়ের গতি প্রতি ঘণ্টায় ৯০ মাইল পর্য্যন্ত হইয়া থাকে।

আধুনিক মোটর গাড়ী ভাল রাস্তা পাইলে ঘণ্টায় ২০০ মাইল পর্য্যন্ত যাইতে পারে উহা ভীষণ ঝড়ের দ্বিগুণ বেগে ও এরোপ্লেনের সঙ্গে সমান পাল্লা দিতে পারে। ফিটন্‌জান ৭ হইতে ১৫ মাইল ও ঘোড়ার গাড়ী ৭ মাইল পর্য্যন্ত এক ঘণ্টায় গিয়া থাকে।

রেলের সাধারণ যাত্রীগাড়ী ঘণ্টায় ১৫ হইতে ২৫ মাইলের উর্দ্ধবেগে যায় না। মেলট্রেণ এ দেশে সাধারণতঃ ৪০ হইতে ৫০ মাইল ও আমেরিকায় ঘণ্টায় ৭০ মাইল বেগে ধাবিত হইয়া থাকে। সমুদ্রপথে জাহাজ ঘণ্টায় ১৫ হইতে ৩০ মাইল বেগে চলিয়া থাকে।

ঘোড়দৌড়ের মাঠে রেলিংয়ের ধারে দাঁড়াইয়া থাকিলে দৌড়ের ঘোড়া সম্মুখ দিয়া বিদ্যুৎ বেগে চলিয়া যায় কিন্তু তাহাদের গতি বেগ ঘণ্টায় ৩০ হইতে ৩৮ মাইলের অধিক নহে।

উটপাখী ঘণ্টায় ৬০ মাইল বেগে দৌড়িতে পারে। পায়রা সমান ভাবে ক্লান্ত না হইয়া দীর্ঘ পথ উড়িয়া যাইতে পারে ৫০০ মাইল, ঘণ্টায় ৩৫ মাইল করিয়া সমানভাবে উড়িতে পারে।

বন্দুকের গুলি ২৬০০ ফিট প্রত্যেক সেকেণ্ডে অর্থাৎ ১৭৭০ মাইল প্রত্যেক ঘণ্টায় যায় কিন্তু বন্দুকের শব্দ ঘণ্টায় ৭১৮ মাইল গিয়া থাকে। যদি কোন লোককে গুলি মারা হয় তাহা হইলে বন্দুক ছোড়ার শব্দ তাহার কাণে পৌঁছিবার অনেক আগেই তাহার শরীর বিদীর্ণ হইয়া গুলি চলিয়া যাইবে।

শব্দের গতি সর্ব্বাপেক্ষা জলের মধ্যে অধিক হইয়া থাকে। বাতাস অপেক্ষা জলের ঠাস অধিক সেই জন্য জলের মধ্যে শব্দ করিলে তাহা ঘণ্টায় ৩২৮০০ বেগে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। আলো ও বিদ্যুতের গতি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, ইহাদের প্রত্যেক সেকেণ্ডের গতি হইতেছে ১৮৬০০০ মাইল। অর্থাৎ এক সেকেণ্ডের মধ্যে খানিকটা আলোক বা বিদ্যুৎ পৃথিবীটাকে আট বার প্রদক্ষিণ করিয়া আসিতে পারে।

আমরা যখন কোন কাজে যাইবার জন্য পথ চলি তখনকার চলার বেগ ঘণ্টায় প্রায় দুই মাইল আর তাহা না হইলে সাধারণতঃ ১ মাইল ১½ মাইল বেগে চলিয়া থাকি। তার পিওন চিঠি বিলি করিতে সময় সময় ঘণ্টায় ২½ মাইল বেগে চলিয়া থাকে অবশ্য তাহা কেবল কলিকাতায় দেখা গিয়াছে।

মাসিক-সাহিত্য সমালোচনা

বঙ্গবাণী, আশ্বিন, ১৩৩০। অনেক দিন পরে আশ্বিনের বঙ্গবাণীর প্রথম পাতে একটা কবিতার মত কবিতা পড়া গেল। বঙ্গবাণীর জোড়া "সম্পাদক" কবির নামটা ছাপেন নাই। সম্পাদকীয় গরুর গাড়ীখানা যদি উড়িষ্যার গাড়ীর মত একবগ্গে টানা হত, তাহলে নাম না দেওয়ার অভিপ্রায় ছিল না কিন্তু গাড়ীখানা যখন দুই জনের তখন নামটা উহ্য রেখে ফল কি। বঙ্গবাণীর প্রথম প্রবন্ধ তাহার অবনীন্দ্রনাথের "নিজ-পাত্রের জিজ্ঞাসন্ত"। প্রবন্ধটি অতি সুন্দর—লেখাটি যদিও অবনীন্দ্রনাথের নিজস্ব ভাষায় তবু প্রতিপাদ্য বস্তুটি এমন সুন্দর ভাবে বুঝানো হয়েছে যে, অবনীন্দ্রনাথের চিরপক্ষ প্রগতিবিদদের এর জবাব দিতে বেগ পেতে হবে। শিরপাত্র হাতের নিকার জন্য তৈরী, শিল্পী সুরসুন্দরী গড়তে বাধ্যসুন্দরী গড়ছে, না, সত্যসত্যই উর্ব্বশী মেনকা রম্ভা গড়ে তুলবে সেটা ওঁর মানসিক শক্তি বিকাশের উপর নির্ভর করে। শাস্ত্র ওঁকে সৌন্দর্য্য বিকাশের পথ দেখিয়ে দেয় মাত্র, তদীক্ষা যত্ন প্রথমে সাড়ে তিন ইঞ্চি পরে একেবারে চারইঞ্চি কি সাড়ে চার ইঞ্চি দিতে হবে, আর বন্ধরেখার কতটা কিভাবে ঘাবে তা শাস্ত্রকারে বলে দিতে পারে না। "নাগদন্তী" শ্রীকালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি বড় কবিতা। বাণী ও মানসীর কল্পকবি বিশ্ববিদ্যালয়ের বেড়ের পরিদর্শক হয়ে বোধ হয় ওঁর বৈজয়ন্তীর ভাষা ধোপাটী ফেলে দিয়েছেন। হুগলির কোম্পানীর দোকানের হালে কল্পনা-কবি যে কল্পনায়

গাইতেন তাঁর কথাটা বোধ হয় আমাদের ছাত্রদের জীবনের কঠোর ব্রহ্মচর্য্য দেখে একটু বদলে গেছে। শ্রীহৃষিকেশ সেনের "ভারতবর্ষে রাষ্ট্রীয় ওপোবৎপত্তি" লেখাটি ভাল, কিন্তু বোটের উপর প্রতিপাদ্য বস্তুটা মনকে জোরঠোক্কর দেয় না। আমরা বাঁধীর বেটা হয়ে রাজাধিরাজের হতে চাই, ঘোড়া রাজার চাবুক খেয়ে উঠি বসি আর মারি, আমাদের আবার রাষ্ট্র রাষ্ট্রীয় শক্তি আর রাষ্ট্রীয় মন। বেমালা কবিতা "কাছে আয়" বোধ হয় সম্পাদকীয় বিনোদন, পত্রের পরিপূরণের জন্য ব্যবহৃত, কীর্ত্তনের সুরে লেখা বটে, কিন্তু কীর্ত্তনীয়ার অভাব। শ্রীবেদ্যনাথ কাব্য-পুরাণতীর্থের "একটি ছোট গল্প" সত্য সত্যই ছোট, গল্পটি ভাল কিন্তু ছ'ইঞ্চি মিলিমিটারে মেড় ইঞ্চি ইশারতের মধ্যে পুরে টিপে মারা হয়েছে। শ্রীসতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্যের "দুঃখ-সন্তান" নামক কবিতাটি বোধ হয় জোড়া-সম্পাদক নিতান্ত খাতিরে পড়ে ছেপেছেন। ভট্টাচার্য্য-কবি কবিতালেখা ছেড়ে দিয়ে ঘাস কাটতে আরম্ভ করে দিলে বাঙলা সাহিত্যের বেশী উপকার হবে। বঙ্গবাণীর মত দ্বিতীয় মাসিক পত্রে এরকম মাসিক দেখলে দুঃখ হয়। "ফ্রান্সের দর্শন" জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রবন্ধ: প্রবন্ধ ভাল কিন্তু দর্শন হলেও দুর্নিখিত ও দুষ্পাঠ্য। শ্রীশরদিন্দুবোধন সেনগুপ্তের "বাসবদত্তা" কবিতাটি "Adonais" রচয়িতা ও লেখক কর্তৃক সম্পাদিত প্রকাশ "কেবাণী" পুস্তকের উপকরণ হলেও "প্রথম দেখা" কবিতা, অনেক সময় গদ্য কি পদ্য তা বুঝা যায় না।

"(আমি) রাজ্যহারিণী, তব
করি দান—করে গ্রহ,
জানবতী আমি বুদ্ধিমতী বিদুষী বলভাম প্রথম।
এখন বলবা মোরে
(রাখে) মেরে বল ঠুঁটো করে',
সুধি কিবি আমি সব হারাই, আমি বল-প্রাণ-অন্তরে।"

কবিতার আকারে সাজিয়ে না দিলে এক বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদগ্ধমণ্ডলী ছাড়া আর কেউ কবিতা বলে বুঝতে পারবে না। সেজন্য কবি বোধ হয় ইতিপূর্ব্বে ডাক্তারী করতেন কিম্বা যদি এমন কবিতা লেখা না ছাড়েন তা হলে হয় তো বাদুড়বেটাকে ধরিয়ে রোগে পারিয়ে চিকিৎসা করাতে হবে, কারণ কবিতার বাক্য মোটিওপ্যাথিক ওষুধে সারবে না। ডাক্তার আর কিমুরার "জাপানে সামাজিক প্রথা" অতি সুন্দর লেখা। জাপানী-যুবা ভারতে এসে দারিদ্র্যের কঠোর পেষণ সহ্য করে ইতিহাস, যৌতুসাহিত্য ও বাঙলা সাহিত্যে যে পরিমাণ কৃতিত্ব লাভ করেছেন তা আশ্চর্য্য। ডাক্তার কিমুরার বাঙলা লেখাটি অতি সুন্দর, ভাষাটিও তদ্রূপ, যদুকরে অনেক উচ্চশিক্ষিত বাঙালী-লেখক এর অনুকরণ করলে বাঙলা সাহিত্যের মঙ্গল হবে। শ্রীসুধাংশুরঞ্জন মল্লিকের "বাঙালীর চিন্তা" কবিতাটি মন্দ নয় কিন্তু শ্রীবিমলাপ্রসন্ন মজুমদারের "অষ্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসী" প্রবন্ধ-নয় প্রবন্ধ। "প্রবন্ধ"—শ্রীযুক্তা বিমলপ্রভা দেবীর প্রবন্ধ প্রকাশ উপন্যাস। শ্রীযুক্তা সুশীলাসুন্দরী দেবীর "জন্মাষ্টমী" সুন্দর কবিতা, হয় তো আধুনিক পাঠকের কাছে ভাবহীন কিন্তু স্ত্রী-কবি যে কথা বলেছেন তা হিন্দুর কাছে কখনো পুরাণো হয় না।

"এস আইবী-পূর্ণিমা।
যমুনা-কূল-কলঙ্কিনী ধনি।
হৃদয় মধুবনে উজলি
চরণ সব মতি ধরি'।"

শ্রীযুক্ত রায় লিখিত "বাংলার শিল্প সাধনা" এবং শ্রীযুক্ত নাথ দত্তের "বর্ত্তমান বাঙলার অর্থনৈতিক রাজনৈতিক ইতিহাসের এক অধ্যায়" সুলিখিত প্রবন্ধ। গানের স্বরলিপি লিখিয়া শ্রীমতী মোহিনী সেন গুপ্তা শ্রীযুক্ত কিরণচাঁদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি গানের স্বরলিপি লিখিয়াছেন। তা কেবল হয়েছে সঙ্গীতজ্ঞরা বলতে পারেন কিন্তু মাসিক পত্রে বোধ হয় স্বরলিপি ছাপবার কোনই প্রয়োজন নেই। "কাব্যে'ন্দ্র ব্রাহ্মণ"—শ্রীরাজেন্দ্র নাথ লাহিড়ীর সুলিখিত সন্দর্ভ, আকারে আর একটু দীর্ঘ হলে বঙ্গবাণীর সৌন্দর্য্য বৃদ্ধিই হত। শ্রীসতীন্দ্রনাথ সান্যালের "বন্দীজীবন" প্রবন্ধটির বিষয় বড়ই চিত্তাকর্ষক কিন্তু লেখকের অজস্র বোধে সাহিত্যের চিরন্তনী পদ লাভ করবে না। এই বিষয়টি যদি ভাল করে লেখা হত তাহলে বড়ই সুন্দর হত। ভুল বুঝেই হোক, আর ভাল বুঝেই হোক যাঁরা আমাদের দেশে জন্মে অমেয় স্বরাজীয় জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করেছিল, সাজন' জন্মের দুর্দ্দম বাসনের কথা যাঁরা সাময়িক উত্তেজনায় ভুলতে পেরেছিলেন তাদের অন্তরের কথা বাণীর মন্দিরের পাদপীঠে লেখা থাকা উচিত; কিন্তু সে লেখাটা লেখকের দোষে মলিন হয়ে উঠলে দেখলে বড়ই কষ্ট হয়। আমার কারণ—শ্রীযুক্ত নাথ সান্যালের লেখা হলে "বন্দীজীবনের" কোনই মূল্য নাই; যে মানুষ আমরা নিজে দেখি অন্ত চিনতে পারি না, সেই মানুষ আমাদেরই একজনের জ্ঞান চক্ষু হঠাৎ খুলে গিয়ে সে কেবল যারা দেখেছিল তাই জানতে আগ্রহ হয়। বলতে গিয়ে সে যদি হঠাৎ তোতলা হয়ে ওঠে তাহলে তার উপর রাগ হয় না কি? শ্রীহরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের "অধিকার সাম্রাজ্য ও জাপানী অভিযান" গল্পটি মন্দ নয়। শ্রীপঞ্চানন নিয়োগী লিখিত "শিক্ষিত বাঙালীর বেকার সমস্যা" সুলিখিত প্রবন্ধ, বাঙালী মাত্রেরই পড়া উচিত। ঘোড়ারোগ যা বিদেশীবণিক এ সমস্যার পূরণ করে দিবে না। এটা আমাদেরই সমস্যা, আমাদেরই দোষ, সুতরাং আমরাই এর প্রতিকার করতে পারি, আর কেউ পারবেনা। অন্যরা করি নিয়ে মহাশয় এ বিষয়ে আরো আলোচনা করবেন। শ্রীহেমেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের "ভাগ্যের বোঝা" গল্পটি সুন্দর, আজ-কালকার মাসিকপত্রে এরূপ সুন্দর গল্প খুব কমই দেখা যায়। শ্রীবিমলচন্দ্র পালের "বৈঠকী কথা" সম্প্রদায় বিশেষের ভাল লাগতে পারে কিন্তু বঙ্গবাণীর মত মাসিকে ছাপা না হওয়াই ভাল। বেমালেলা "ছোট কোটা'র কবিতা চারটি অতি সুন্দর।

দুই বছরে শিশু বঙ্গবাণী এর মধ্যেই সুন্দর হয়ে উঠেছে, আশা করি শিশু প্রাচীনা গৌড়বাণীর মুখ রাখবে। ভুলত্রুটি হবে এবং অন্যান্য মাসিক পত্রের সম্পাদকেরা তা সহ্য করতে পারবেন না সুতরাং আমি আর বিশেষ বলতে চাই না যে, বঙ্গবাণী এই ছোট বছরের মধ্যেই বাঙলার সাময়িক পত্রের সভায় উচ্চ আসন লাভ করেছেন।

শ্রীযোগানুশ

Printed by Bijoy Krishna Dass at the Lakshmibilas Press,
14, Jagannath Dutta Lane, Calcutta.

ভোট-রঙ্গের ভঙ্গিনী

আমরা নারী বিভঙ্গিনী
নহি শুধু পোড়া বাংলার ভোটের অধিকারিণী।
এবার হোরবো মহা আন্দোলন
ভোটার মোদের হতেই হবে—চাইব কৌন্সিলের নির্ব্বাচন।
দেখা যাবে ভোট-রঙ্গে নামলে পরে—
কে এমন ক্ষমতা ধরে—কে আমাদের হারাতে পারে—
আমরা নারী বিভঙ্গিনী হোরব কৌন্সিল জয়—
হব দেশের ভোট-রঙ্গের অধিকারিণী।

ভোট-রঙ্গীন্নার সাত দশা

নমস্কার—আপনার সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায় বিশেষ আহ্লাদিত হইলাম।

এবার আমি মালসী হয় সেজন্য আপনার কাছে এসেছি—

আপনার ভোট পাবার প্রত্যাশা করিতে পারি কি?

বন্ধু আমার—জননী আমার—ধাত্রী আমার—আমার দেশ—।

আজ সুজলা সুফলা বাংলা দেশের—কি অবস্থা!

ব্যাটা আমাকে ভোট দেবে না কি?

হিরে—না—এর শোধ নিতেই হবে।

হর-মালসী

সোনার-রঙ-খাঁচা

গড়িয়েছি সোনার খাঁচা পুষ্‌বো পাখী মনের মতন্।
সোনার শিকল গড়িয়ে দেব (পাখী) এড়িয়ে যেবে তার চলন।
ঐ যে বলে যাবে ছোলা, পুষ্‌বো পাখী হয়বোলা :
"অসহযোগ মন্ত্র তুলি আয়রে পাখী আয়রে চলি
ভু—ভু—ভু
স্বর্গ দেব মোক্ষ দেব, দেব তোরা চাস যে যেমন।"

ছোট-রঙ সৌ:

সরলতা

(নব চেতনের সৌজন্যে)

ماشاءالله

Digitized by Google

সচিত্র সাপ্তাহিক পত্রিকা

বাঘম্বত

২য় বর্ষ] ৮ই অগ্রহায়ণ শনিবার ১৩৩০, ইং ২৪শে নভেম্বর [১৯শ সংখ্যা

ভোট-রঙ্গে খাও খাও অষ্টডিম্ব খাও
কৌন্সিল-রঙ্গে গিয়ে যত ইচ্ছা লাফাও!

ভোট-রঙ্গের সৌজন্যে

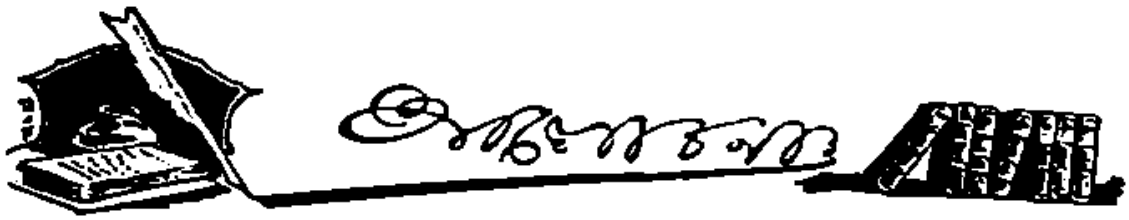

বাংলা সংবাদপত্রের খ্যাতনামা সেবক পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় আর ইহলোকে নাই। ক্ষমতাশালী লেখনীর সাহায্যে দেশবাসীকে নানা ভাবে ভাবাইয়া—তীব্র বিদ্রূপ বাণে তাহাদের রস বোধ শক্তি জাগাইবার সহায়তা করিয়া পাঁচকড়িবাবু আজ চির আনন্দের ধামে চলিয়া গিয়াছেন! যাহারা বাংলা ভাষার সঙ্গে সামান্য পরিচিত তাহারাই পাঁচকড়িবাবুর লেখার ঔজ্জ্বল্যের পরিচয় পাইয়াছেন। সংবাদপত্র সেবী রূপে কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া ইনি দেশের ও বিদেশের সকল সমস্যাই তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে দেখিতেন ও বুঝিতে পারিতেন—পরে বিচার করিয়া তাহা আপনার মত প্রভাবে উজ্জ্বল রূপে পাঠকের সম্মুখে ধরিতেন। লেখা তাঁহার সজীব ও সরল ছিল, দেশের বিশেষত্ব জাতির বিশেষত্ব তিনি সব সময় বজায় রাখিতে চেষ্টা করিতেন। ক্ষমতাশালী লেখক দেশ-ভাব ও দেশের সমাজতত্ত্ব ও জাতিতত্ত্বের সুবিজ্ঞ বিশ্লেষক রূপে পাঁচকড়িবাবুর নাম চির উজ্জ্বল রহিবে। লেখনী মুখে-রসধারা ঢালিয়া দিতে তাঁহার সমকক্ষ লেখক এযুগে বোধ হয় আর দ্বিতীয় নাই। ১৮৬৭ খৃঃ ডিসেম্বর মাসে পাঁচকড়িবাবুর জন্ম হয়, মৃত্যু হইয়াছে ১৯২৩ খৃঃ ১৫ই নভেম্বর সন্ধ্যা ৭ টার সময়। পাঁচকড়িবাবুর বয়স বেশী হইয়াছিল না—বিশেষত তাঁহার ৯০ বৎসরের বৃদ্ধ পিতামাতা এখনও জীবিত। যোগ্য, উপার্জনক্ষম, বয়স্থ পুত্র হারাইয়া আজ তাঁহারা শোকে অধীর—এ শোকের সান্ত্বনা কে দিবে! পুত্র গৌরবে গৌরবান্বিত পিতা মাতা—পরিবার পরিজন, দেশ আজ তাহাদের পাঁচকড়িবাবুর জন্য শোকে মুহ্যমান এই তোমাদের সান্ত্বনা!

• • • •

সংবাদ পত্র সেবা দ্বারা জীবিকা অর্জন, দেশসেবা ও লোক মত গঠন এই ভাব পাশ্চাত্য হইতেই প্রাচ্যে আসিয়াছে। অল্প দিন মধ্যেই আমাদের দেশীয় সংবাদ পত্রের প্রচার ও প্রভাব অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু এখনও দেশের এরূপ অবস্থা আসে নাই যাহাতে সংবাদপত্র সেবীগণ নিশ্চিন্ত মনে একমাত্র সংবাদপত্রের সেবা করিয়াই স্বচ্ছন্দে দিনাতিপাত করিবেন। দেশের বর্ত্তমান অবস্থা যাহা তাহাতে সেরূপ সময় কবে যে আসিবে তাহাও কিছু বলা যায় না। প্রথমতঃ দেশে শিক্ষিত লোকের সংখ্যা মুষ্টিমেয় —শিক্ষিত সকলেরও সংবাদপত্র পাঠে উৎসাহ নাই। তাহার উপর এদেশের ব্যবসায় বাণিজ্য সবই পরাধীন পরহস্তগত। দেশীয় ব্যবসায় বাণিজ্যের সাফল্যের উপর দেশীয় সংবাদপত্রের উন্নতি বিশেষরূপে নির্ভর করে। এ অবস্থায় আমাদের দেশীয় সংবাদপত্র ও সংবাদপত্র সেবীদের মধ্যে ও ভিন্ন ভিন্ন দেশীয় সংবাদপত্র ও সংবাদপত্র সেবীদের অবস্থার মধ্যে আকাশ পাতাল পার্থক্য রহিয়াছে। সংবাদপত্র সেবী হন এখনও এ দেশের লোকে অনেকটা সখের খাতিরেই। কিন্তু এই সখ পুরাইতে গিয়া অনেককেই আজীবন দুঃখ দারিদ্র্য বরণ করিয়া লইতে হয়। সংবাদপত্র সেবীর বিদ্যা বুদ্ধি মনীষা দেখিয়া দেশের লোকে সাময়িক বাহবা দেয় বটে—কিন্তু তাহাতে তাঁহাদের পেটের ক্ষুধা মেটে না। পাশ্চাত্য এক একটি সংবাদপত্রের প্রতিষ্ঠাতা, সম্পাদক বর্গ ও লেখকদের যাহা আয় ও তাঁহারা যে রকম সুখে স্বচ্ছন্দে থাকিয়া লেখনী পরিচালন করেন আমাদের দেশে তেমন হওয়ার আশা আকাশকুসুমের মত। পাঁচকড়িবাবুর মত শক্তিমান সংবাদপত্র সেবীকেও আজীবন দুঃখ দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রাম করিয়াই শেষ বয়সে অকালে জীর্ণ অবস্থায় প্রাণ দিতে হইয়াছে। এমন সঞ্চয় বোধ হয় তিনি কিছুই রাখিয়া যাইতে পারেন নাই যাহাতে তাঁহার পরিবারবর্গের দু'দিনও নিশ্চিন্তে চলিতে পারে! এ দেশে দেশসেবার পরিনাম এই।

আধুনিক পরকীয়াবাদ

[শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ]

ধীরে ধীরে সহজিয়া মত কেমন করিয়া মোগল-শাসনের প্রারম্ভে চৈতন্যের পবিত্র ধর্ম কলঙ্কিত করিয়া তাহাকে কেমন করিয়া আত্মসাৎ করিয়াছিল তাহার প্রমাণ এখনো বৈষ্ণবের ধর্মে সামাজিক আচার ব্যবহার এবং সকলের উপরে আধুনিক বৈষ্ণব সহজিয়াবাদী-সাহিত্যে স্পষ্ট বিদ্যমান রহিয়াছে। বৌদ্ধ সহজবাদী যেমন কায়সুখকামীকে নির্ব্বাণের পবিত্রমার্গে অবস্থিত বলিত সেইরূপ পবিত্র প্রেমমার্গবিচ্যুত বৈষ্ণব কখনো বা প্রকাশ্যে কায়সুখকে প্রেমের একমাত্র আধার বলিয়া কখনো বা পরকীয়া সাধনাকে অপ্রাকৃত নিকামধর্ম্মের আবরণ দিয়া মহাপ্রভু চৈতন্যদেব প্রবর্ত্তিত সর্ব্বজীবাধার প্রেমধর্মকে একেবারে বিস্মৃত হইয়াছিল। রাধামোহন ঠাকুর যেদিন পরকীয়াবাদী গোস্বামীদিগকে পরাজিত করিয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সমাজকে পরকীয়াবাদে দীক্ষিত করিয়াছিলেন, সেই দিন সহস্র বর্ষ পরে লুইপাদের অবধূত যথেচ্ছাচারের ধর্ম্ম আবার গৌড়ীয় জন-সমাজের একাংশ বিজয় করিয়াছিল। তখন গোস্বামীরা অথবা হিন্দু ভট্টাচার্য্যেরা বুঝিতে পারেন নাই যে, পরকীয়াবাদের আশ্রয়ে গৌড়ে আবার কি ফিরিয়া আসিল। লুইপাদ ও কাহ্নপাদ যখন মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রীকে আশ্রয় করিয়া "বৌদ্ধগান ও দোহা"র আবরণে জন্মভূমিতে ফিরিয়া আসিল তখনই গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সমাজে পরকীয়াবাদের প্রকৃত ইতিহাস জানিতে পারা গেল। কিন্তু সে ইতিহাস অতি তুচ্ছ, ভারতের ইতিহাসে হয় তো গৌড়ীয়-বৈষ্ণবের পরকীয়া প্রকৃতি উপাসনা উল্লেখ লাভ করিবে না। সামাজিক বিবর্ত্তনের জন্য যারা আবশ্যক, তারা মানুষই হউন আর দেবতাই হউন, সেই নবদ্বীপবাসী শচীনন্দন নিমাই তাহা করিয়া গিয়াছিলেন, সেই জন্য বুদ্ধ, মহম্মদ, ঈশা ও পার্শ্বনাথের ন্যায় সকল দেশের শিক্ষিত মানুষ তাঁহার নাম করিলেই মস্তক নত করিবে। মানুষে সমাজে মানুষের সৃষ্ট ব্যবধান যখন অসহ্য-ক্লেশকর হইয়া উঠে তখন যে অদৃশ্য শক্তিকে আমরা ঈশ্বর বলি তিনি নিমাই পণ্ডিতের মত একজন মানুষকে দিয়া মানবের ক্রমবিবর্ত্তনের পথটা সরল করিয়া তুলেন। আভিজাত্যাভিমানী ব্রাহ্মণ যখন গৌড়দেশে একাধিকার পাইয়া সমাজ-শাসনের অত্যাচারে সমাজের অন্যান্য বর্ণকে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিয়াছিল তখন নিমাই জীবমাত্রকেই প্রেমের আধার করিয়া গৌড়ীয় হিন্দু-সমাজে সমীকরণের একটা নূতন যুগ আনিয়াছিলেন, সেই বিপ্লবের যুগেও সমস্ত ভারতবর্ষ বিস্ময় স্তিমিতনেত্রে গৌড়ীয় ব্রাহ্মণের এই অপূর্ব্ব কীর্ত্তিকলাপ উদগ্রীব হইয়া দেখিতেছিল। সে প্রেম পশুর প্রেম হইতে ভিন্ন, কারণ তাহা বিবেক-বুদ্ধিবিশিষ্ট মানবের প্রেম। পশুর প্রেম ঋতুবিশেষে সহজাত হয় এবং কিছুদিন স্ত্রী-সহবাস করিলে তাহা লুপ্ত হয়, আবার যখন বসন্ত আসে তখন কোকিল আবার ডাকে, কুহুর কুহুরীর সন্ধানে ফিরে। ডাক্তার নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত তাঁহার "শান্তি" নামক নব প্রকাশিত উপন্যাসে "বোহেমিয়া ক্লাবে" মিসেস চ্যাটার্জির মুখ দিয়া যে প্রেমের ব্যাখ্যা নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহা পশুর প্রেম। মিসেস্ তথা গ্রন্থকার ডাক্তার সেনগুপ্তের মতে "প্রেম সে জিনিসই নয় যাকে নিয়ে তুমি রোজকার ঘর-সংসার করবে!...লোকে ভালবাসাটা বিবাহের দ্বারা বেঁধে সংসারে লাগাতে যায়, তাই থেকেই ত ভালবাসার মত tragedy সৃষ্টি হয়।" মানুষের এই যে পশুভাব সকল দেশে সকল সমাজেই ছিল এবং আছে। মানুষ বিবাহ-বন্ধন আরম্ভ হইবার পরে ক্রমে এক-নারীতে অভিযুক্ত হইয়া গিয়াছে, নারীও বহু-পতিত্ব পরিত্যাগ করিয়া একচারিণী হইয়াছে। এই এক-নারীতে অভিযুক্ত এক-পুরুষে শান্ত ভাবে সমস্ত জীবন অতিবাহিত করিতে পারে না, সময়ে সময়ে তাহাদের প্রশান্ত জীবন-সাগরে একটা ঝড় ওঠে, সেটা মানুষের পাশব-বৃত্তির পরিচয়। মানুষের বিবেক-বুদ্ধি যখন এই পাশব-বৃত্তিকে

জয় করিতে পারে তখনই সে দম্পতীর জীবন স্বচ্ছন্দে কাটিয়া যায় কিন্তু এই যুগলের মধ্যে যদি একজন পাশব-বৃত্তির বশীভূত হয় তাহা হইলে তাহাদিগের উভয়ের ভবিষ্যতের পথ সহসা কণ্টকাকীর্ণ ও বন্ধুর হইয়া উঠে। খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে উচ্ছৃঙ্খল ফরাসী-সমাজে মানব-জীবনে এই পশু-ভাবের প্রাবল্য পবিত্র প্রেমের উৎকর্ষরূপে কীর্তিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। বৈষ্ণব-কবির প্রেমের আদর্শ কখনো পাশ্চাত্য কবির মনে উদয় হয় নাই সুতরাং সে প্রেম ইউরোপের পাশববৃত্তি চরিতার্থতামূলক প্রেম-অপেক্ষা অবশ্য বা শ্রেষ্ঠ, পাশ্চাত্য কবিবৃন্দ তাহা তুলনা করিবার অবসর পান নাই। অদৃষ্টের দোষে মাত্র পাশ্চাত্য-শিক্ষিত গৌড়ীয় সমাজে এই অবশ্য পাশ্চাত্য-প্রেম কথা-সাহিত্য অবলম্বন করিয়া আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। যুগলন্ধ নর-নারীর চিত্রের ন্যায় এই জাতীয় সাহিত্যের একটা আকর্ষণী শক্তি আছে; সেইজন্য ইহা যুবক যুবতীকে অতি সহজে অভিভূত করে। যে বয়সে সকল দেশে সকল সমাজে মানুষ অধিক চিন্তা করিয়া কাজ করে না, সেই বয়সের যুবক-যুবতীর নিকট এই জাতীয় সাহিত্য আমাদের দেশে অত্যধিক আদরণীয় হইয়া উঠিয়াছে। ইহা কেবল বয়সের ধর্ম বা দোষ, কথা-সাহিত্যের সমস্ত গুণ বা দোষ ইহাতে বিদ্যমান আছে।

কবে কি ভাবে পাশ্চাত্য প্রেমের এই অপরূপ আদর্শ আমাদের সাহিত্যে প্রবেশ করিয়াছে তাহা ইতিপূর্বেই শ্রীযুক্ত গৌরহরি সেন মহাশয় নির্দেশ করিয়া দিয়াছেন। আমাদের দেশে পূর্বে নারী পাশবচাঞ্চল্যে অভিভূত হইলে স্বামী-গৃহে বসবাস করিয়া পরকীয়াবৃত্তি অবলম্বন করিত না, করিলেও অধিক দিন বাস করিতে পারিত না। ডাক্তার নলেচন্দ্রের মত-গৃহিণীর মত পতিগৃহে বাস করিয়া স্বচ্ছন্দে উপপতি লাভ, সে পতি-বেচারার জীবন-কালে, আমাদের দেশে ও সমাজে অত্যন্ত দুর্লভ ছিল। দুই একটা দৃষ্টান্ত যাহা ছিল তাহাও নিন্দনীয় ছিল, তাহা প্রচার করিয়া কবিকুল শ্লাঘা অনুভব করিত না। বঙ্কিমচন্দ্রের রচনায় এই জাতীয় প্রেমের দৃষ্টান্ত অতি বিরল। শ্রীযুক্ত গৌরহরি সেন মহাশয় বলিয়াছেন, "কৃষ্ণকান্তের উইলের" রোহিণী, "বিষবৃক্ষের" হীরা এই সব আঁকিতে গিয়া বঙ্কিম বাবু ঘোমটার পিছনে খেমটা নাচান নাই। প্রভাত বাবু কখনও ধরি মাছ না ছুঁই পানি গোছের সতী আঁকিয়া পাঠক পাঠিকাকে হতভম্ব করেন নাই।" বঙ্কিমচন্দ্র যে লেখনীর দ্বারা "আনন্দমঠ" লিখিয়াছিলেন সে লেখনী কলঙ্কিত হইবার ভয়েই বোধ হয় কিরণময়ী, অচলা, গোপা বা শুভার মত নারী-চরিত্রাঙ্কণে প্রবৃত্ত হন নাই। এ বিষয়ে শ্রীযুক্ত গৌরহরি সেন মহাশয়ের সঙ্গে এক মত হইতে পারিলাম না। কারণ আমি ইতিহাসের ছাত্র, আমার নিকট ইহা যুগ ধর্মের প্রভাব বলিয়াই বোধ হয়। যে যুগে মানব উদার থাকে, যখন তাহার চিত্তবৃত্তি দেশ ধর্ম ও মানব-সমাজের উপরে নিবিষ্ট থাকে, তখন কেবল পাশববৃত্তি চরিতার্থ করিবার লালসা তাহাকে অভিভূত করিতে পারে না। এক রবীন্দ্রনাথেই এই যুগের চিহ্ন আছে, যে-লেখনী "ক্ষুধিত পাষাণ" রচনা করিয়াছিল তাহাই অল্পদিনের ব্যবধানে বাঙ্গলা-সাহিত্যকে "নষ্টনীড়" ও "ঘরে বাইরে" উপহার দিয়াছে।

বর্তমান যুগে একমাত্র রবীন্দ্রনাথই সাহিত্যের আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিতেছেন, যে পরকীয়া ভাবের আবর্তে বাঙ্গালা দেশের সাহিত্য ডুবিতে বসিয়াছে তাহারও প্রবর্তক রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত গৌর-হরি সেন মহাশয় বলিয়াছেন, "স্বামীর আশ্রয়ে ও কি প্রকারের পরিপাটিরূপে আত্মবঞ্চনা করিতে হয় ও পরের চোখে ধূলা দিতে হয়, সেই বিদ্যায় অ্যাষ্ট্রি-কিউলেট—রবিবাবুর "নষ্টনীড়ের চারুলতা; এ্যাজুরেট শরৎবাবুর "গৃহদাহের" অচলা; এবং রামচাঁদ প্রেমচাঁদ স্কলার—রাববাবুর "ঘরে বাইরের" বিমলা। শেষোক্ত এই অপূর্ব উপন্যাসের প্রতি পৃষ্ঠা তাহার ঝঙ্কারে, অলঙ্কারের প্রাচুর্যে ও শিল্পীর চাতুর্যে মনকে অভিভূত করে, কিন্তু বরাবর একটা অশুচি ভাব থাকিয়া যায়।" রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত গৌরহরি সেন মহাশয়ের সহিত একমত হইতে পারিলাম না। রবীন্দ্রনাথের ভিতরে একটা সংযম আছে, সেটা সকল সময়ে বাস্তব অসংযম-কেও শোভন করিয়া রাখে, তাহাকে জনসমাজে অথবা

সাহিত্যে পরিস্ফুট হইতে দেয় না। সেই জন্যই "নষ্ট-নীড়ের" চারুলতা অথবা "চোখের বালির" বিনোদিনী জন-সমাজের নিকট বিলুপ্ত হয় নাই। কিন্তু পরকীয়া ভাবগ্রস্ত অন্য লেখকগণ সে সংযম সমানভাবে অভ্যাস করিতে পারেন নাই। কামজভাবের উদ্দীপনা কতদূর সঙ্গত এবং কোন্ স্থানে গিয়া তাহা অসঙ্গত হইয়া উঠে তাহার পরিচয় শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ডাক্তার নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত প্রমুখ আধুনিক লেখকগণের রচনায় দেখিতে পাওয়া যায় না। সংযম মানব-সমাজের ভিত্তি, এই সংযমের উপরে নির্ভর করিয়া আদিম মানব একদিন সমাজবন্ধন করিয়াছিল, যে আত্মত্যাগ ও স্বার্থত্যাগের বলে মানব-সমাজের বর্ব্বর জাতিগুলি একদিন সুসভ্য বলিয়া পরিচিত হইয়াছে তাহা এই সংযমেরই অধীভূত। পরকীয়া-লালসা সকল দেশে যুবক ও যুবতীকে অভিভূত করে কিন্তু চোখকে স্পর্শ করে না, তাহার কারণ অত্যন্ত সংযম। যুবক যৌবন লাভ করিয়াই সংযমী হয় না, তাহাকে প্রতিপদে আঘাত পাইয়া প্রতিঘাতের ভয়ে সংযম শিক্ষা করিতে হয় তাহা না করিলে তাহাকে সংযত মানব-সমাজের বাহিরে গিয়া বাস করিতে হয়। মানুষ তাহা পারে না, কারণ দীর্ঘকাল সমাজবন্ধনের পরে পশুবৃত্তি বা একাকী বনবাস তাহার পক্ষে অসম্ভব, রবীন্দ্রনাথের সংযম "ঘরে বাইরে" উপন্যাসখানিকে যেরূপ উপাদেয় করিয়া তুলিয়াছে সেই সংযমের অভাব শরৎচন্দ্রের "চরিত্রহীন"কে শ্রীযুক্ত গৌরহরি সেনের নিকট মহিমান্বিত করিয়া তুলিতে পারে নাই, সেইজন্যই তিনি বলিয়াছেন যে, 'শরৎ বাবু গণিকার সাধিজীকরণের চেষ্টা করিয়াছেন।'

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে আধুনিক সাহিত্যে স্বদেশীয় বা বিদেশীয় ভাবমাত্রেরই প্রতিষ্ঠাতা রবীন্দ্রনাথ। "নষ্টনীড়", "চোখের বালি", "নৌকাডুবি", এবং "ঘরে বাইরে" আমাদের বাঙ্গালা সাহিত্যে যে পরকীয়া ভাবের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল তাহা অসংযত লেখকের লেখনী হইতে উদ্দাম ভাব প্রাপ্ত হইয়াছে, যে সংযমবিহীন লালসা বঙ্গসাহিত্যে বন্যার স্রোতের মত আসিয়া পড়িয়াছে তাহার মুখে সাহিত্যের অন্যান্য রত্ন অতল জলে মগ্ন হইয়াছে, কোন দিন তাহাদের উদ্ধার হইবে কিনা সন্দেহ। এই আধুনিক পরকীয়া ভাবের স্বরূপ উদ্ঘাটন করিয়াছেন পরমশ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। আধুনিক পরকীয়া কি, তাহা বিশ্লেষণ না করিলে বুঝিতে পারা যাইবে না, তবে তাহা অনন্তরাগ রঞ্জিত বেণুধ্বনিতে সম্মোহিত ব্রজগোপাঙ্গনা নহে, তাহা 'রক্তমাংসকণ্ডূতি'র অপনোদনের অভাবে ব্যথিত চরিত্রা রোহিণী বা হীরাও নহে, ইহা আধুনিক পাশ্চাত্য সাহিত্যানুকরণে অঙ্কিত তৃপ্তিলালসার অসীম আকাঙ্ক্ষাময়ী নারী-মূর্ত্তি, সে নারী মাতৃভাব বিবর্জ্জিতা, তাহাতে ভক্তি প্রায়ণ অনুসন্ধান করিলেও মিলে না, তাহাতে আছে কেবল অপরিসীম লালসা, তাহা তৃপ্ত হইলেও তাহার আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হয় না। আধুনিক কবিকুল এই লালসাময়ী মূর্ত্তিকেই চিত্রিত করিয়া থাকেন, কবির নৈপুণ্যের তারতম্যানুসারে এই জাতীয় পরকীয়া নায়িকা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে। প্রথম শ্রেণীর নায়িকা শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সৃষ্টি, তাহার লালসা তৃপ্ত হয় না, কবি তাহাকে বারম্বার তাহার নায়কের সংস্পর্শে আনিয়া সুকৌশলে নানা ছন্দে পাঠকপাঠিকার কামভাবের উদ্দীপনা করাইয়া যথাসময়ে তাহাকে দূরে সরাইয়া লইয়া যান। দ্বিতীয় শ্রেণীর নায়িকা ডাক্তার নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত প্রমুখ দ্বিতীয় শ্রেণীর কবিকুলের সৃষ্টি, তাহাদের লালসা অসীম, তাহা নায়ক বা উপনায়ক সম্ভোগেও তৃপ্ত হয় না। এই শ্রেণীর কবিকুল শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের অনুকরণে নায়িকাকে নায়ক বা উপনায়কের সংস্পর্শে বহুবার আনিয়া পাঠক বা পাঠিকাগণের মনে বিরংসার উত্তেজনা করিয়া থাকেন। বিরংসার উত্তেজন আর স্পষ্ট করিয়া লেখা চলে না। মানুষ যেমন বাহু বর্শিতে গাঁথিয়া তাহাকে অনেকক্ষণ ধরিয়া খেলাইয়া দুর্ব্বল করিয়া অবশেষে তীরে তুলে, শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-প্রমুখ লেখকগণ সেইরূপ পাঠকপাঠিকার বিরংসা অনেকক্ষণ ধরিয়া উত্তেজিত করিয়া অবশেষে নায়িকাকে নিবৃত্তিমার্গ অবলম্বন করান।

শ্রীযুক্ত গৌরহরি সেন লিখিয়াছেন যে, "শরৎবাবু

গণিকার সাবিত্রীকরণের চেষ্টা করিয়াছেন", কথাটা সর্ব্বৈব ভ্রমাত্মক; সাবিত্রী হয় তো বেশ্যা হইতে পারে কিন্তু গণিকা নহে। বেশ্যা ও গণিকায় যে কি প্রভেদ তাহা গৌরহরি বাবুকে বুঝাইবার কোনই প্রয়োজন নাই কিন্তু বর্ত্তমান বাঙ্গালা সাহিত্যে এই দুইটি একই অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, সেই জন্যই বোধ হয় গৌরহরি বাবু গণিকা শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। বস্তুতঃ শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের রচনায় বেশ্যা-চরিত্র দেখিতে পাওয়া যায় না। মেসের ঝি সাবিত্রী বেশ্যা-বাড়ীতে বাস করে বলিয়া সে বেশ্যা নহে, এমন কি "শ্রীকান্তের" দ্বিতীয় পর্ব্বের রাজলক্ষ্মী বেশ্যা ব্যবসায়িনী হইলেও শরৎচন্দ্র তাহাকে বেশ্যা করিয়া আঁকিতে পারেন নাই। চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের ভক্তের দল হয় তো বলিবেন যে, ইহাই শরৎচন্দ্রের বৈশিষ্ট্য, তিনি যে বেশ্যার চিত্র আঁকিয়াছেন তাহা সহস্রের মধ্যে একটি কিন্তু প্রকৃত তাহা নহে, রাজলক্ষ্মী একচারিণী। লক্ষ্ণৌ প্রদেশে কলাবন্তীন্ সমাজে এইরূপ বহু নারী আছে, তাহারা নৃত্যগীতের ব্যবসায় করে বটে কিন্তু জীবনে তাহারা একচারিণী, কখনো বেশ্যাবৃত্তি করে না। "শ্রীকান্তের" দ্বিতীয় পর্ব্বে পিয়ারী বাইজী অথবা ব্যভিচারিত চরিত্রা বা "ঘুঘুরী" রাজলক্ষ্মী বেশ্যা নহে। বৈশিক জীবনের অভিজ্ঞতা শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কতদূর আছে তাহা জানিবার সুযোগ আমার হয় নাই। কথায় বলে, কবির অভিব্যক্তি কাব্যে, শরৎ চন্দ্রের কাব্যে বেশ্যা-চরিত্রের অভিব্যক্তি দেখিতে পাওয়া যায় না। তাঁর "শ্রীকান্তের"র দ্বিতীয় পর্ব্বে নন্দমিশ্রির উপন্যাস, "চরিত্রহীনে" আরাকানের বাড়ীউলি কামিনী বোষ্টমীর সহিত "ঘেনা-পাওনার" অলকা ও "চরিত্র-হীনের" সাবিত্রীর বিশেষ প্রভেদ নাই, এই চারি জনের কেহই বেশ্যা নহে, শরৎচন্দ্র ইহাদের পরিচয় নিজেই দিয়াছেন, "অনতিকাল পরেই দিবাকরের পিছনে বাড়ীউলি আসিয়া হাজির হইল। তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত-মাত্রই কিরণময়ী টের পাইল এ ভদ্র ঘরের স্ত্রীলোকে নহে, যাহারা কলিকাতায় দাসীবৃত্তি করিয়া খেকায় তাহাদেরই একজন—চরিত্রহীন, পৃঃ ৪০৮—৯। শরৎচন্দ্রের অঙ্কিত এই চারিটি চরিত্রের মধ্যে বারবনিতা-কলাকুশল কোন ব্যক্তি যদি বেশ্যা, বারবনিতা বা গণিকাচরিত্রের আভাস পাইয়া থাকেন তাহা হইলে তিনি যেন অনুগ্রহ করিয়া লেখককে জানান।

সাবিত্রী যদি বেশ্যা নহে তবে সে কি? "চরিত্র-হীনের" দ্বিতীয় অধ্যায়ে দেখিতে পাওয়া যায় যে, সে "বামার ঝি এবং গৃহিণী।" কলিকাতার মেসে শরৎ বাবু তাঁহার জীবনের কতটা অংশ অতিবাহিত করিয়াছেন তাহা বলিতে পারা যায় না, তবে মেসের ঝি চুরী না করিলেও কখনো গৃহিণী হয় না। "সাবিত্রী কল। কাপড় পরিত এবং ঠোঁট দুটি পান ও দোক্তার রসে দিবারাত্র রাঙা করিয়া রাখিত। সে হাসিয়া কথা কহিতে যেমন জানিত সে হাসির দামটিও ঠিক তেমনি বুঝিত।" এই সাবিত্রী "সারাদিন সমস্ত কাজ-কর্ম্মের মধ্যে……তাহার একটি চোখ এবং একটি কান এই উন্নত বলিষ্ঠ চারু দর্শন যুবকটির উদ্দেশে নিযুক্ত রাখিত। বামার সকলেই ইহা জানিত এবং কেহ কেহ সকৌতুক ইঙ্গিত করিতেও ছাড়িত না। সাবিত্রী জবাব দিত না, মুখ টিপিয়া হাসিয়া কাজে চলিয়া যাইত।" কবি বলিয়াছেন "বামার মধ্যে শুধু সতীশই তাহার নাম ধরিয়া ডাকিত। যা-তা পরিহাস করিত এবং যখন তখন বক্সিস দিত। সতীশের উপর তাহার স্নেহটা কিছু অতিরিক্ত ছিল।" এই জাতীয় প্রেমকে স্নেহ বলিয়া শব্দ-শক্তিকে পদাঘাত করা কবির উচিত নহে। সাবিত্রীর মত ঝি, যে মেসের বাবুকে বলে, "ইস্কুলে যেতে হবে না আপনাকে, ঘরা করে দুটি খেয়ে নিয়ে আমাদের মাথা কিনুন"—একালে বিরল ছিল না, এখনও হয় তো নাই। সাবিত্রীর মর্ম্মিতে সতীশচন্দ্রকে গাঁথিয়া কবি শরৎচন্দ্র "চরিত্রহীনের" দ্বিতীয় তৃতীয় অধ্যায়ে তাহাকে খেলাইয়াছেন, তাহার পর পাঁচ অধ্যায়ে সতীশ-সাবিত্রী সংবাদ নাই, অষ্টম অধ্যায়ে সতীশচন্দ্রের নেশা ছুটিলে সে সাবিত্রী সম্বন্ধে তাহার কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিতে বসিল, পথ ভুলিয়া সে সাবিত্রীর বাড়ীতে যাইয়া উপস্থিত হইল, সে যখন তাহাদের পুরাতন দাসী মোক্ষদার কাছে সাবিত্রীর পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়া তাহার সহিত একজন ভুবনচন্দ্র

মুখোপাধ্যায়ের অনির্দ্দিষ্ট সম্পর্ক বলিতেছিল তখন হঠাৎ সাবিত্রী আসিয়া পড়িয়া কথাটা চাপা দিয়া ফেলিল। সাবিত্রী থাকে বেশ্যা-বাড়ীতে, অথচ সে তাহার মনিবকে বাড়ীতে পাইয়া নিজের আলনার কাচা কাপড় পরিয়া সন্ধ্যা আহ্নিক করিতে অনুরোধ করিতে কিছুমাত্র দ্বিধা বোধ করিল না অথচ সতীশ বলিয়া বসিল "আমি কোনও মতেই এখানে কিছুই খাব না।" সাবিত্রী যে ভাবে অভ্যাগত সতীশের সেবা করিল তাহা বিদ্যার সুন্দর-সেবা, হীরা মালিনীর নহে। কলিকাতার কোনও Practising বেশ্যা এমন করিয়া পুরাতন নাগরকে অভ্যর্থনা করে নাই, অথবা করিতে পারিবে না। বেশ্যা-বাড়ী অনেকেই বাস করিয়াছে, অথবা করিতেছে, বেশ্যার অন্ন অনেকেই গ্রহণ করিয়াছে এবং করিবে কিন্তু পুরাতন দাসী মোক্ষদার আহ্বানে পত্র পড়িতে আসিয়া সতীশ যে ভাবে সাবিত্রীর পবিত্র শুভ্র-সুকোমল শয্যায় অঙ্গ ঢালিয়া দিল সে ভাবটা হয় তো এখন প্রবল হইয়াছে কিন্তু আমাদের প্রথম যৌবনের কালে ছিল না। "আহারান্তে সতীশ আর একবার শয্যায় আসিয়া বসিল। সাবিত্রী ডিপা ভরিয়া পান আনিয়া দিল, এবং বাঁধা হুকায় তামাক সাজিয়া আনিয়া সতীশের হাতে দিয়া পায়ের নীচে মাটিতে বসিয়া পড়িয়া একটুখানি হাসিয়াই নিঃশব্দে মুখ নীচু করিল।" কালিদাস হইলে ইহার পরে ঘরের দীপ নির্ব্বাপিত করাইতেন কারণ সাবিত্রী দাসীর বাড়ী তো মণির প্রদীপ জ্বলে না যে, যক্ষ কন্যার ভূমিকায় বেশধৃতী সাবিত্রী তাহার উপর চূর্ণ নিক্ষেপ করিবে। আধুনিক পরকীয়াবাদী কবি শরৎচন্দ্র কালিদাসের মত gross নহেন, তাহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবামাত্র তিনি গাঁথা-মাছ, সতীশকে, আবার গভীর জলে লইয়া গেলেন কারণ আধুনিক যুবক-যুবতীর বিরংসা উদ্দীপ্ত হইয়াছে। সতীশ বলিল, "শিকারী বঁড়শিতে মাছ গেঁথে খেলিয়ে যেমন করে আমোদ করে, এতদিন আমাকে নিয়ে বোধ করি তুমি সেই তামাসাই করছিলে। না?" তাহার উত্তরে সাবিত্রী বলিল, "বঁড়শিতে গেঁথে তোমাকে টেনেই তোলা যায়—খেলিয়ে তোলবার মত বড় মাছ তুমি নও।" এমন জমাট বিদ্যা-সুন্দরের পালা কালিদাসের মত মূর্খ কবির হাতে পড়িলে এই খানেই তাহার যবনিকা পতন হইত কিন্তু আধুনিক পরকীয়াবাদী অধ্যাপকদের বিরংসা উত্তোজনের সঙ্কল্প করিয়া আছেন সুতরাং সাবিত্রীর সত্যবান প্রস্থানের উদ্যম করিল এবং ফিরিয়া আসিয়া মূর্চ্ছিতা সাবিত্রীকে দেখিয়াও তাহার নষ্টরাগ ফিরিয়া আসিল না। নবম অধ্যায়ে সতীশ বাসা ছাড়িয়া চলিয়া গেল, দিনকতক পরে সতীশ তাহার ভৃত্য বেহারীকে সাবিত্রীর সন্ধানে পাঠাইল। বেহারী গিয়া দেখিল, "একটা কপাট বন্ধ ছিল। তাহার আড়ালে সাবিত্রী মাটীর উপর চুপ করিয়া বসিয়া আছে। এবং অদূরে তক্তপোষের উপর বিছানায় বিপিন মদ খাইয়া মাতাল হইয়া পড়িয়া আছে।" বেহারী সে চিত্র দেখিয়া রাখিয়া চলিয়া গেল, কবি কি অবস্থায় বিপিনকে সাবিত্রীর ঘরে আনিয়াছেন তাহার সন্ধান পর্য্যন্ত করিতে দিলেন না। পশ্চিম যাত্রার মুখে যখন সতীশের জ্বর হইল তখন প্রাণের আকুলতা তাহাকে সাবিত্রীর সন্ধান করিতে বাধ্য করিল, তখন বিহারী জানাইল যে, সাবিত্রী তাহার বাসা ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে, যেদের বাসাতেও নাই, কেহ তাহার সন্ধানও জানে না। তখন সতীশ কলিকাতা ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

মাস-খানেক পরে উপেন্দ্রের সঙ্গে সতীশ যখন কলিকাতায় ফিরিয়া আসিল, তখন সতীশের দ্বিতীয়া নায়িকা সরোজিনী দেখা দিল। পঞ্চদশ অধ্যায়ে সতীশ বিহারীর সঙ্গে তাহার পুরাতন বাসায় যাইয়া উপস্থিত হইল, বাড়ীটা তখনও খালি পড়িয়াছিল। বাসা ঠিক করিয়া সতীশ সাবিত্রীর সন্ধানে গেল। বিংশ অধ্যায়ে সাবিত্রী হঠাৎ সে বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইল, তাহার স্পর্শে সে অসজ্জিত অথচ সেবিত গৃহ সহসা সুন্দর হইয়া উঠিল। বেহারী "পুরাতন ভৃত্যের" মত সাবিত্রীর সেবা করিল। স্বভাবকবির সিদ্ধ-লেখনীপ্রসূত সাবিত্রীর প্রত্যাবর্ত্তনের চিত্র এবং তাহার প্রিয় সম্মিলন অতি সুন্দর। সাবিত্রী পান সাজিতেছে, নারীর রোগক্লিষ্ট শীর্ণ পাণ্ডুর মুখের যে নিজস্ব গোপন মাধুর্য্য আছে, তাহাই এই কৃপাণীর মত ঘাত মুখের উপর বিরাজ করিতেছিল। "সতীশ দীর্ঘ

বিরহের পরে তাহাকে পত্নী ভাবেই দেখিল, সাবিত্রীও তাহাকে দেখিয়া "সেই মুহূর্ত্তের অসতর্ক অবসরে যৌবনমদীর জয়-চন্দ্রাঙ্কিত সংস্কারে লজ্জায় একেবারে অভিভূত হইয়া পড়িল! এই মিলন মুহূর্ত্তের নায়কের পরকীয়া-লাভের সম্ভাবনা দেখাইয়াও দূর করিয়া দিবার জন্য কবি উপেন্দ্র ও সুরবালাকে সেই বাসায় আনিয়া উপস্থিত করিলেন। সুরবালা সূর্য্যমুখীর মত দেবীমূর্ত্তি, কবির বিবেক তাহাকে দেবী ও উপদেবীর সংস্পর্শ অসম্ভব বলিয়া দিল। সেই আঘাতে যে প্রীতিরস ভঙ্গ হইল সতীশের তপ্ত হৃদয়ের আকুল ব্যথিত আহ্বান সে রস ফিরাইয়া আনিতে পারিল না। গৃহত্যাগের পথে সাবিত্রী আবার মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িল তখন কবি সতীশকে ফিরাইয়া আনিয়াও নষ্টরাগ প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারিলেন না অথবা ইচ্ছা করিয়াই করিলেন না। কেন যে তিনি সরোজিনীর অবতারণা করিয়াছিলেন তাহা বুঝিতে পারা যায় না, প্রেমের প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রদর্শনই যদি তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য, তাহা হইলে তাঁহাকে সাবিত্রীর দীর্ঘ তপস্যার পরে সতীশের সহিত বিবাহ, অদৃষ্টের প্রতি তাঁহার স্বরচিত সাবিত্রী-চরিত্রের প্রতি, এবং রসাত্মক কাব্যের প্রতি এক ক্রূর কঠোর পরিহাস দাঁড়াইয়া গিয়াছে, উপেন্দ্রের দেবত্ব, কিরণময়ীর অসম্ভব পরিণাম এবং সাবিত্রীর অপূর্ব্ব আত্মত্যাগ সে পরিশিষ্টকে মধুর করিয়া তুলিতে পারে নাই।

সাবিত্রী চলিয়া গেল। একবিংশ অধ্যায়ের পরে সে একটা সুদীর্ঘ বনবাসে গেল, সঙ্গে সতীশ প্রকৃত বনবাসে গিয়া সরোজিনীর নিকট সংস্পর্শে আসিল, তাহার পর কবি রিরংসা উদ্দীপনের জন্য কিরণময়ীর কলুষিত চিত্র আনিয়া ফেলিলেন, কারণ তখন আর সাবিত্রী তরুণ-তরুণীর লালসা উদ্দীপন করিতে পারিবে না। সতীশের সহিত সরোজিনীর যে প্রেম তাহাকে পরকীয়া ভাব নাই, শশাঙ্কমোহন এই নাটকের villain, সতীশ Hero এবং সরোজিনী Heroine. শশাঙ্কমোহনের মুখে সতীশের সাবিত্রী-সংস্পর্শের কথাটা ফুটাইয়া শরৎচন্দ্র তাঁহার villain-এর চিত্রটা সম্পূর্ণ করিয়াছেন। সাবিত্রী আবার যখন আসিল তখন সে পুনর্ব্বার। সংযম ও আত্ম-ত্যাগ তাহার নারীত্ব লোপ করিয়া দেবীত্ব প্রদান করিয়াছে। বেহারী গিয়া যখন সাবিত্রীকে লইয়া আসিল তখন সাবিত্রী যে মূর্ত্তি ধরিয়াছে সে মূর্ত্তি পতি-ব্রতা সতীর মূর্ত্তি, কবি উচিত বিচার করিয়া সাবিত্রীর সতীত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন, সাবিত্রীকে পিতৃ-গৃহ বা পতি-গৃহ পরিত্যাগ করাইয়াও তাহার দেহ কলুষিত করেন নাই। সে যে "ক্ষতযোনি বিধবা"ও নহে তাহাও তিনি একচত্বারিংশ অধ্যায়ে যোক্ষদার মুখে ব্যক্ত করাইয়াছেন। সেই সাবিত্রীকে তাহার প্রকৃত পতিগৃহে আনিয়া তাহাকে বিমুখ করিয়াছেন কেন তাহার উত্তর তিনিই দিতে পারেন। সরোজিনীর সহিত সতীশের বিবাহ দিয়া তিনি নিজেকে নৈতিক কাপুরুষ প্রমাণ করিয়াছেন। যুগযুগান্তের সংস্কার ভারতবর্ষের ব্রাহ্মণের মনে আধুনিক সংকীর্ণতা, সতীশের সঙ্গে সাবিত্রীর মিলনে বাধা দিয়া শরৎচন্দ্রের কাব্যে রসভঙ্গ করিয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক পরকীয়ার রিরংসা উদ্দীপনের স্বভাব, কবিকে ভুলাইয়া দিয়া তাঁহার নিজের উদ্দেশ্য ব্যর্থ করিয়া দিয়াছে।

সাবিত্রী ও কিরণময়ী আধুনিক পরকীয়া নায়িকার প্রথম শ্রেণীভুক্তা। সুধা ও গোপা দ্বিতীয় শ্রেণীর, তাহারা শরৎচন্দ্রের স্বীয় আদর্শে পৌঁছিতে পারে নাই।

সাহিত্যে প্রগতি

[ডাক্তার শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত এম-এ, ডি-এল]

জীবহত্যায় পাপ থাকা সম্ভব, কিন্তু তারও একটা সীমা আছে। ছারপোকা যে নির্ব্বিরোধে আমার কষ্টের রক্ত টানিয়া খাইবে আর আমি তাহাকে সবংশে নিধন করিব না, ইহা কোনও শাস্ত্রে বলে না।

নরহত্যা সম্বন্ধেও নিষেধের তেমনি একটা সীমা আছে। দুষ্টলনকে হত্যা করা সে সীমার বাহিরে। সে সম্বন্ধে আমার বিবেকে এক কোঁটাও দ্বিধা নাই—কেবল ঠিক করিয়া উঠিতে পারি নাই যে ঠিক কোন প্রক্রিয়ায় সেই কাজটা সৌষ্ঠবের সহিত করা যায়।

ব্যাপারটা বুঝাইয়া বলি।

আমি সাহিত্যিক। ছেলে বেলায় কবিতা লিখিয়া বাপের কাছে ঠেঙা খাইয়াছিলাম, রচনার মাষ্টার মহাশয়ের কাছে গোল্লা পাইয়াছিলাম। কিন্তু হাতের অভ্যাসটা বরাবর বজায় রাখিয়াছিলাম।

যখন আমার বয়স বছর ষোল তখন—যা বাঙ্গালীর ছেলের অদৃষ্টে চিরদিন হইয়া থাকে—তাই আমার হইয়াছিল—ওর নাম কি উদ্বাহ!—উদ্বহনের সঙ্গে এবধার ব্যাকরণগত কি বৈষম্য আছে তাহা জানি না। কিন্তু প্রকৃতিগত কোনও প্রভেদ আছে বলিয়া আমি বিশ্বাস করি না।

এ বিশ্বাস আমার অনেক পরে হইয়াছিল—গোড়ায় ছিল না। প্রথম প্রথম এই উদ্বাহ ক্রিয়ার ফলে আমার লেখার অভ্যাসটা বেশ জোরের সহিত বহাল রহিল। কবিতার পদ মিলাইতে আগে যে কষ্ট হইত তাহা ক্রমে কাটিয়া গেল—'গাল'এর সঙ্গে 'চিল' মিলাইতে দিয়া দূর হইল। আর গদ্য—সে নিত্য আট পৃষ্ঠাব্যাপী চিঠি লেখায় ঐত ফরলাও হইয়া প্রকাশিত হইতে লাগিল যে আমার নিজেরই আশ্চর্য্য বোধ হইতে লাগিল। অনেক দিন চিঠি লিখিয়া ইচ্ছা হইয়াছে যে নবীন পণ্ডিত মশায়কে দেখাইয়া আসি। রচনার না আমাকে শূন্য দিয়াছিলেন? হাঁ!

রচনা এই পত্রে নিবদ্ধ থাকিতে থাকিতেই মা ষষ্ঠীর দয়া অজস্র ধারে বর্ষিত হইতে লাগিল। চিঠির বহর কমিল, রসের ও প্রকৃতি ক্রমশঃ বদলাইতে লাগিল। 'অশ্রুচিকা চমৎকারা' একটা কথার কথা হইতে নিতান্তই মাথা ব্যথার পরিণত হইতে লাগিল। শ্রীরূপিণী লক্ষ্মী এবং চিঠির অধীশ্বরী সরস্বতী আমাকে যতই কৃপা করুন, বিশ্ববিদ্যালয়ের সরস্বতী মুখ ফিরাইয়া রহিলেন; তাঁর সাধনা ছাড়িয়া অখণ্ড মণ্ডলাকারা রৌপ্যময়ী লক্ষ্মীর সন্ধানেও খুব বেশী সুবিধা করিতে পারিলাম না।

ক্রমে আসিয়া ঠেকিলাম ঠিক সেইখানে যেখানে বাঙ্গালীর ছেলে স্বভাবতঃ আসিয়া ঠেকে—কেরাণী হইলাম।

সরস্বতীর সঙ্গে লড়াই ঝগড়া করিয়া বি-এ, পর্য্যন্ত পড়িয়াছিলাম। পঁচিশ টাকা মাইনার কেরাণীগিরীতে মন উঠিল না, তার ভিতর মাসে তিন টাকা জরিমানা দিয়া ওকালতি পড়িতে—ওর নাম কি লেকচারে present লিখাইতে আরম্ভ করিলাম। স্ত্রী পুত্র বস্তা দেশের যৎকিঞ্চিৎ সম্পত্তির ঘাড়ে চাপাইয়া দিয়া নিশ্চিন্ত মনে আইনের সাধনা ও কেরাণীগিরী করিতে লাগিলাম।

দীর্ঘ সাধনার অবশেষে আইনের সরস্বতী মুখ তুলিয়া চাহিলেন। যখন পাশ করিলাম তখন গোঁপে কিঞ্চিৎ পাক ধরিয়াছে। অবিলম্বে গোঁপ কামাইয়া চাপকান ও গাউন কিনিয়া আলিপুরে ঘোরাফেরা করিতে লাগিলাম। সঙ্গে সঙ্গে গৃহলক্ষ্মী কাঁকি দিলেন। জমা খরচ অন্তে তিনটি অপোগণ্ড শিশু ঘাড়ে চাপাইয়া তিনি যে দেশে গেলেন সেখান হইতে কেহ কাহাকেও এ পর্য্যন্ত ধরিয়া আনিতে পারে নাই। কেহ ধরিয়া আনিয়াছে জানিলে আমি প্রাণপণ চেষ্টা করিতাম—সর্ব্বস্ব পণ করিয়া ছুটিতাম; কেন না যে বোঝা ঘাড়ে চাপিল মারাত্মক। ছেলে-পিলে মানুষ করা এত হাঙ্গামা তাহা আগে জানিতাম না। গৃহিণী সে সব করিতেন, আমার কাজ ছিল কেবল তাঁর ঘোর ত্রুটি দেখিয়া তিরস্কার করা। আজ নাকি সে কাজটা আসিয়া পড়িল আমার ঘাড়ে!

আমার শ্বশুর পশ্চিমে চাকরী করিতেন, এমন কিছু নয়, সামান্য চাকরী! বছর দুই বাদে তিনি একবার আসিলেন। কিসে তাঁহার এ সুমতি হইল জানি না, তিনি প্রস্তাব করিলেন যে আমার ছেলে-পিলেদের লইয়া যাইবেন। সর্ব্বান্তঃকরণে সম্মত হইয়া ঘাড় নাড়িলাম।

কেবল স্ত্রী ও পুত্রকন্যাই যদি ঘাড় হইতে নামিত তবে বোধ হয় একটু আরামই পাইতাম। কিন্তু কয়েক-দিন পর আমার শতচ্ছিন্ন গাউনখানাও ঘাড় হইতে আপন খুসিতে ঝরিয়া পড়িল। ওকালতীর সরস্বতী যদিবা বহু সাধনায় মুখ তুলিয়া চাহিলেন, সেই মোকামের লক্ষ্মী ঠাকুরাণীর দেখাও পাইলাম না। পাঁচ সাত বৎসর টেঁক হইতে ট্রামের পয়সা চালাইয়া শেষে যেদিন জীর্ণ-গাউনটি খসিয়া পড়িল সেই দিন তাহার হতাবশিষ্ট ভাগ নর্দ্দমায় ছুঁড়িয়া ফেলিয়া বাড়ীতে বসিলাম, আলিপুর যুথো হইবার আর ইচ্ছা রহিল না।

আর একটা জিনিষ ঝরিয়া পড়িল—সে আমার দেশের বিষয় সম্পত্তি। তার ঘাড়ে পরিবার চাপাইয়া নিশ্চিন্ত ছিলাম, কিন্তু তার স্কন্ধটা বিশেষ চওড়া ছিল না বলিয়া সে কিছু বোঝা চাপাইয়াছিল ঋণের উপর। এখন ঋণ বাড়িয়া এত ভারী হইয়া উঠিল যে সে সম্পত্তিটুকু লইয়া খপাস করিয়া পড়িল।

আবার কলম আশ্রয় করিলাম, কিন্তু কেরাণী-খানায় নয়। সেখানে হাঁটা হাঁটি করিয়া ছিলাম ফাঁক পাইলাম না। কাজেই কলম লইয়া আপন খুসীতে লিখিতে লাগিলাম।

সাহিত্যিক হইলাম। দেখিলাম কলমের আমার স্বচ্ছন্দ গতি। কাগজের সঙ্গে একবার মুখোমুখী করিয়া দিতে পারিলেই তাহাতে কাব্য উপন্যাস, প্রত্নতত্ত্ব, রসতত্ত্ব, সমালোচনা সবই এমন তীব্র গতিতে বাহির হয় যে বলিবার নয়।

যতীনের সঙ্গে এই মহাসন্ধিস্থলের কাছাকাছি আমার দেখা হয়। সে মানসীতে লিখিত। লিখিত কি তা' ঠিক বলিতে পারি না তবে সেসে বসিয়া রাশি রাশি প্রুফ দেখিত। আমি একদিন তার কাছে আমার একটা লেখা দিয়া বলিলাম, "এটা ছাপাতে পার?" সেটা একটা কবিতা! পড়িয়া যতীন লাফাইয়া উঠিল —বোধ হয় আনন্দে না হয় চেয়ারের ছারপোকার কামড়ে।

সে লেখা ছাপা হইল—তারপর আরও লেখা ছাপা হইল। ক্রমে আমি গল্প লিখিতে লাগিলাম—কাব্য সমালোচনা আরম্ভ করিলাম—সূত্রপাত করিলাম খুব বড় একজন কবিকে গাল দিয়া। "মানসী" আফিসে আমার নাম ডাক পড়িয়া গেল। তারপর আমি প্রত্নতত্ত্ব লিখিলাম। 'শকক্ষত্রপ চষ্টনের' রাজধানী যে বাঙ্গালা দেশে ছিল তাহা নিঃসন্দেহে প্রমাণ করিয়া দিলাম। আর্টের সমালোচনা করিতে গিয়া দেশী চিত্রকলার নির্ব্বংশ করিয়া দিলাম। সব তাতেই দেখিলাম মানসী সম্পাদক খুসী। শুধু খুসী নন তিনি যৎকিঞ্চিৎ টাকাও ছাড়িতে লাগিলেন।

আমার কাব্য সমালোচনা পড়িয়া তার সমালোচনা করিলেন একটি নারী—শ্রীমতী অনামা দেবী। সে সমালোচনায় যেন মধু ঢালিয়া দিলেন। তিনি বলিলেন আহা যদি, এমন নহিলে সমালোচনা এ অপূর্ব্ব জিনিষটা এতদিন ছিল কোথায়? ইত্যাদি

অনামা দেবীর লেখাটা আমি উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিতে লাগিলাম। মানসীর যে সংখ্যায় তাহা বাহির হইয়াছিল তাহার পঁচিশ কপি কিনিয়া বিলাইলাম। আর স্বপ্নে অনামা দেবীর ধ্যান করিতে লাগিলাম। স্বপ্নে তাকে এতবার দেখিলাম যে তার চেহারা সম্বন্ধে আমার এক কৌটাও সন্দেহ রহিল না। গৌরবর্ণ অপূর্ব্ব সুন্দরী তন্বঙ্গী হাস্যময়ী—ইত্যাদি সে নারী, তার চলনের ভঙ্গী দেখিলে তাকে এক মাইল দূর হইতে বাহিয়া লইতে পারিব সে বিষয়ে সন্দেহ রহিল না।

তার পর অনামা দেবী আরও লিখিলেন, আমারই কথা আমারই প্রশংসা। ছাতি আমার ফুলিয়া উঠিল। তারপর আবার! অস্থির হইয়া উঠিলাম। ধন্যবাদ দিয়া একখানা সংক্ষিপ্ত চিঠি লিখিয়া যতীনকে দিলাম অনামা দেবীকে পাঠাইয়া দিতে। যতীন আনন্দের সহিত এ দৌত্যে সম্মত হইল।

যতীন আসিয়া আমাকে অনামার চিঠি দিল। তাহাতে উচ্ছ্বসিত ভক্ত হৃদয়ের পুষ্পাঞ্জলী। একটু

নিরিবিলি গিয়া আমি সে চিঠিখানা বুকে ধরিলাম—আর সত্য বলিব—চুম্বন করিলাম।

শেষে একদিন যতীন বলিল সে আমাকে তাহার সঙ্গে পরিচয় করিয়া দিবে। আমি তাহাকে তাড়াতাড়ি ঘর হইতে বাহির করিয়া দিয়া কামাইতে বসিলাম। পাকা পাকা গোঁফ ও দাড়ীর সামান্য অংশগুলি কামাইয়া কামাইয়া কিছুতেই যেন দূর হইতে চায় না মনে হইল। তারপর সাজসজ্জা করিয়া যতীনের সঙ্গে বাহির হইলাম।

দুর্ভাগ্যক্রমে অনামা দেবীর বাড়ী গিয়া কেবল তাঁর আঁচলের দেখা পাইলাম। জানিলাম শ্রীমতী এই মাত্র মোটরে চড়িয়া হাওয়া খাইতে গেলেন। তার পর সেই আঁচলই কেবল চ'খে দেখিতে লাগিলাম।

অনামার পরিচয় যতীনের কাছে পাইয়াছিলাম। হিন্দুর ঘরের মেয়ে, কিন্তু শিক্ষিতা ও বয়স্থা—হাল কি তিন পোয়া পরধানশিন। "মালভী"তে রীতিমত লেখেন। ভারী লাজুক। বয়স বছর বুড়িক হইবে। বাপের একমাত্র সন্তান—দেখিতে ঠিক আমি যেমন বলিলাম তেমনি—যতীন আশ্চর্য্য হইয়া গেল যে যাহাকে চোখে দেখি নাই তাহাকে এমন নিখুঁত ভাবে স্বপ্নে দেখিলাম কেমন করিয়া!

পরদিন চিঠি পাইলাম। অনামা বড় দুঃখ করিয়া লিখিয়াছেন যে আমি যাইয়া তাঁর দেখা পাই নাই। দয়া করিয়া যেন আজ অবশ্যই যাইয়া দেখা করি। সঙ্গে সঙ্গে ছিল বহু উচ্ছ্বাস!

আমি পরের দিন ছুটিলাম। দুয়ারে দাঁড়াইলাম; যতীন ভিতরে গিয়া খোঁজ করিল। দেখিলাম একটি অপরূপ সুন্দরী উপরের জানালা হইতে একবার আমার দিকে চাহিয়া লজ্জিত মুখ নত করিয়া চলিয়া গেলেন। মুখ খানা মনের ভিতর ছাপ মারিয়া গেল।

যতীন ফিরিয়া আসিল—মুখটা ভারী অপ্রসন্ন। বলিল, "কিছু বুঝতে পারছি না। বেয়ারা বল্লে তিনি বাড়ী নেই। কিন্তু আছেন নিশ্চয়। বেয়ারা খবর দিতে কিছুতেই—রাজী হইল না!"

আমি ধপ্ করিয়া বসিয়া পড়িলাম! হঠাৎ স্বর্গ হইতে সুধার মত উপরের বারান্দা হইতে আমার সামনে আসিয়া পড়িল একখানা কাগজ আমি তাড়াতাড়ি খুলিয়া পড়িলাম।

অনামা "প্রিয়ত—"লিখিয়া কাটিয়া লিখিয়াছেন, "প্রিয় —বাবু! আপনাকে এত কষ্ট দিলাম ভাবিতে আমার বুক কাটিতেছে। কিন্তু বাবা কিছুতেই আমাকে আপনার সঙ্গে দেখা করিতে দিবেন না। তিনি নাকি আমার কোথায় বিবাহের সম্বন্ধ করিতেছেন, পাছে একথা প্রকাশ হইয়া বিবাহ ভাঙ্গিয়া যায় সেই ভয়ে তিনি আমাকে আপনার সামনে যাইতে দিবেন না। বিবাহ আমি কিছুতেই করিব না। বাবাকে তাহা বলিয়াছি। কিন্তু আপনার সঙ্গে দেখা করিতে পারিলাম না এ দুঃখ রাখিবার আমার ঠাঁই নাই। দয়া করিয়া অপরাধিনীকে ক্ষমা করিবেন।—ইতি—

আপনার—
অনামা।

সে দিন সমস্ত রাত্রি ছট্-ফট্ করিয়া বেড়াইলাম। তারপর আরও চিঠি চলিল—ক্রমেই তাও বাড়িতে লাগিল শেষে একদিন যতীন ছুটিল অনামার বাপের কাছে বিবাহের প্রস্তাব লইয়া। মেয়ে দেখার কথা উঠিল। আমি তো সে দিন সে সুন্দর লজ্জাবনত মুখ দেখিয়াছি! বিবাহের পূর্ব্বে দেখিতে অস্বীকার করিলাম।

বিবাহের দিন আমার গাড়ী যেখানে আসিয়া থামিল সেটা অনামার বাড়ী নয়। কিন্তু অনামার পিতা আসিয়া আমাকে নামাইয়া লইয়া গেলেন।

শুভ-দৃষ্টির সময় আমি আঁৎকিয়া উঠিলাম!

কি মুখ! কি স্ত্রী!

মোটা কালো বেঁটে সকল প্রয়োজনের অতিরিক্ত কুশ্রী একটা মেয়ে ছোট ছোট নিষ্প্রভ চক্ষু মেলিয়া প্যাট প্যাট করিয়া আমার দিকে চাহিল।

আমি বলিলাম, "এ কি রকম?"

আমার শ্বশুর বলিলেন 'কি রকম?' আমিও বুঝিলাম যে বিশেষ কিছু বলিবার আমার নাই। শ্বশুর মশায় মেয়ে দেখাইতে চাহিয়াছিলেন, আমিই তো দেখি নাই।

যা'ক বেশী গোলোযোগ করিলাম না। চেহারা যাই হ'ক অনামার ? বিদ্যা, তার ভালোবাসা তো আছে !

বিবাহের রাত্রেই আমি অনামাকে প্রণয় সম্ভাষণ করিলাম। অনেক কথা হইল—মাথা ঘুরিয়া গেল।

আমার স্ত্রীর অনামা নামেই বিবাহ হইয়াছে, কাজেই সে অনামাই (বিনামা হইলেই বোধ হয় ঠিক হইত)—কিন্তু এ নামকরণটা সম্প্রতি হইয়াছে। এত দিন সে নির্ব্বিরোধে বুঁচি নামে পূর্ব্ববঙ্গের এক নিভৃত পল্লীতে বাড়িয়া উঠিয়াছে। পঁচিশ বৎসর বয়সেও বিবাহের কোনও উপায় করিতে না পারিয়া যতীন এই চক্রান্ত করিয়াছে। অনামা যতীনের মায়ের পেটের বোন ! মাসতুতো সম্পাদক তার পিসতুত ভাই। মাসতুতো হওয়াই উচিত ছিল !

চিঠিপত্র ইত্যাদি অনামার নয়, যতীনের নিজের লেখা। যে বাড়ীতে অনামার সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিলাম সেটা সম্পাদকের এক বন্ধুর।

এত দিনে স্মরণ হইল যে আমার সাহিত্যিক খ্যাতি প্রতিপত্তি যাহা কিছু সবই কেবল "মালতী" পত্রে আবদ্ধ ছিল। অন্য কাগজে আমার লেখাও ছাপে না, "মালতী"তে আমার লেখারও সমালোচনা করে না। বড়-ঘরটা জলের মত পরিষ্কার হইয়া গেল।

শেষ রাত্রে বিছানা ছাড়িয়া যতীনের সন্ধানে ছুটিলাম। যেসে গিয়া শুনিলাম সে রাত্রের ট্রেণে লাহোর চলিয়া গিয়াছে। সেখানে এক খানা খবরের কাগজের চাকরী সে আগেই জোগাড় করিয়াছিল।

লাহোর যাইয়া তার রক্ত দর্শন করিবার উৎসাহ হইল না। কিন্তু তাহার সঙ্গে ভবিষ্যৎ সাক্ষাতের শুভ দিনের প্রতীক্ষায় রিজলভারের লাইসেন্সের দরখাস্ত করিয়াছি।

স্বপন-পসারী

(বর্ষা)

হর-পরী কোন্ মোর স্বপনের পাশে
নিত্য নিভৃতে আসে।
এমন করে হাসে,
আর, এতই ভালো বাসে—
ঠিক্ যেন সে কাটিয়েছে ঘুম, বুকের হতাশাসে
শুধু, আমায় পাবার আশে।
আমি ভাবি, তোমার ও নীল চোখের চাওয়া
কতকালের হারিয়ে-পাওয়া
আমারই কোন্ মানস-প্রিয়ার ছবি,
জাগিয়ে দিল সবই।

লুপ্ত-চেতন রক্তে আমার মায়াবিনীর বাঁশীর ও-সুর পশি
হে মোর উর্ব্বশী !
আহুতি তোর বাথার ধূপে
সে কোন্ দানব জাগে,
মেঘ মহিষ ও ছাগে
যায় না তাহার প্রলয়-তৃষা,
রক্ত তৃষা, রক্ত শুধুই মাগে।
তাই ভালো মোর প্রিয়া।
তোমার সাথে গোপন-মিলন স্মৃতি
জাগুক্ বুকে নিতি,
বেদন্-আঘাত দিয়া।

চয়ন

মহাত্মার জীবন-যাত্রা প্রণালী

আরবেদা জেলের অভ্যন্তরের কথা

শ্রীযুক্ত মজর আলী গুরুথা ২ বৎসর কারাদণ্ড ভোগের পর গত ১লা নবেম্বর মুক্তিলাভ করিয়াছেন। তিনি প্রায় ৬ মাসকাল আরবেদা জেলে মহাত্মার সঙ্গে এক-সঙ্গে বাস করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন। মহাত্মা কি ভাবে আজকাল দিন যাপন করেন তৎসম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন—মহাত্মা ভোর ৪টার সময় শয্যাত্যাগ করিয়া মুখ হাত ধুইয়া "প্রাপ্ত স্বরাধিষ্ঠিদি" শীর্ষক যে শ্লোকটী সবরমতী সত্যাগ্রহাশ্রমে নিত্য ভোর বেলা আবৃত্তি করান হয়, তাহা পাঠ করেন। এই সময়ে তিনি কতক্ষণ পর্য্যন্ত "স্থিতপ্রজ্ঞা" সম্বন্ধে গীতাতে যে সমস্ত শ্লোক আছে ঐগুলি নিত্য আবৃত্তি করেন এবং কোন কোন সাধু পুরুষের ভজন গান করেন। মীরাবাইয়ের "মেরে তো গিরিধর গোপাল দুসরা ন কোই" এবং "মেরে রামজি মে গোবিন্দ গুণগান" এই দুইটী ভজন মহাত্মার খুব প্রিয়। "বৈষ্ণব জনতো তে নে কহিয়ে" "আবনী ঠিক হামারি, লাজ রাখেন গিরিধারী" ইত্যাদি ভজন গুলিও মহাত্মার খুব প্রিয়; তবে ঐগুলি তিনি সন্ধ্যার সময় গান করেন। প্রাতঃকালে ভজন গাহিবার পর মহাত্মাজি উপনিষদ, বাইবেল, কোরাণ প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থ পাঠ করেন। বেলা ৯টার সময়ে মহাত্মাজি ভোজন করেন। আজকাল তিনি অন্নগ্রহণ ছাড়িয়া দিয়াছেন। মাত্র ছাগ-দুগ্ধ ও ফলফলারি খাইয়া তিনি জীবনধারণ করেন। অন্ন ছাড়িবার কারণ এই যে মহাত্মাজির হজম শক্তি এত কমিয়া গিয়াছে যে, তাঁহার অন্ন সহ্যই হয় না। ৯টা হইতে ১১টা পর্য্যন্ত মহাত্মাজি চরকা কাটেন এবং সূতা পিঁজেন। ১১টা হইতে ১২টা পর্য্যন্ত তিনি একটা শ্রমসাধ্য কাজ করেন এবং তৎপর কতক্ষণ বিশ্রামগ্রহণ করিয়া পুনরায় পুস্তকাদি পাঠ করেন। অপরাহ্ণ ৩টা হইতে ৪টা পর্য্যন্ত তিনি উর্দ্দু ভাষা পাঠ করেন এবং ৪টা বাজিলেই তিনি বৈকালের আহার শেষ করেন তৎপর ৬টা পর্য্যন্ত তিনি একটু বেড়ান এবং পরে রাত্রি ৯টা পর্য্যন্ত পুনরায় অধ্যয়ন করেন। রাত্রি ৯টা হইতে ২টা পর্য্যন্ত তিনি প্রার্থনা এবং ভজন গান করেন এবং ঐ সময়ে তিনি নিদ্রা যান। প্রার্থনার পর মহাত্মাজি কৃষ্ণ এবং রাম নাম স্মরণ করেন। একথা বলাই আবশ্যক যে উপরোক্ত প্রণালীর কোন দিনই একটু ব্যতিক্রম হয় না। মহাত্মাজি ঠিক ঠিক সময়ে প্রত্যহ এই ভাবে কাজ করিয়া যান। খাদ্য সম্বন্ধেও কখনও কোন প্রকার ব্যতিক্রম হয় না। শ্রীযুক্ত মজর আলী লিখিয়াছেন—আমি বড় উদ্দাম প্রকৃতি ও উগ্রস্বভাবের ছিলাম কিন্তু মহাত্মার সম্পর্কে আসিয়া নম্র হইয়া গিয়াছি, ধর্ম্ম ভাবও হৃদয়ে প্রকাশ হইয়াছে। আজ অসহযোগ এবং গঠনমূলক কার্য্যের ভিতরই যে দেশের মুক্তি তাহা আমি মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিয়াছি।

আনন্দবাজার

মহাত্মার প্রকৃত শিষ্য

বুঁচিয়া "জাগরণ" পত্রে জনৈক পত্রপ্রেরক লিখিতেছেন :—আমি কংগ্রেসের কাজ উপলক্ষে মেহের-পুর মহকুমার তেহট্ট থানায় গিয়া আমার একজন জেলবন্ধুর নিকটে শুনিলাম, সেখানে একজন বালক, নাম ফকির, জাতিতে মালো, প্রায় ১৫ দিন হইল অমরধামে গিয়াছে। শুনিলাম, যে দিন হইতে মহাত্মা পাঁচ পয়সার আহার করিতেন, তারপর হইতে বালকও পাঁচ পয়সার আহার করিত ও একখানি মাত্র ধুতি পরিধান করিত ও প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল যতদিন মহাত্মা কারাবাস হইতে মুক্ত না হইবেন, ততদিন সে এই

ভাবেই কাটাইবে। একজন দোকানদারের নিকট শুনিলাম, সে একদিন আসিয়া তাঁহাকে বলে আমার যখন জেল হইবে, তখন আপনি আমাকে একখানি কাপড় দিবেন। দোকানদারও তাহাতে সম্মত হন ও একজোড়া কাপড় কিনিয়া রাখেন, কিন্তু তার আর জেল হইল না। দোকানদার তাহাকে একদিন বলিলেন, তোমার কাপড় লইয়া যাও। সে উত্তরে বলিয়াছিল জেল না হইলে আপনার নিকট হইতে কাপড় লইব না। যদি কখনও কেহ তাহার সম্মুখে মহাত্মার নিন্দাবাদ করিত, বালক কোন উত্তর না দিয়া সেস্থান হইতে অন্যত্র চলিয়া যাইত। দুই বৎসর ধরিয়া এরূপ কঠোর ব্রত পালন করাতে স্বাস্থ্যভঙ্গ হওয়ায় বালক চিরদিনের জন্য বিশ্রাম লাভ করিয়াছে। মরিবার সময় তাহার মুখে কোনও কথা শুনা যায় নাই, কেবল "মহাত্মা মহাত্মা" শব্দ উচ্চারিত হইয়াছিল। তাহার পবিত্র আত্মা আজ ভারতের বাতাসে মিশিয়া নির্জ্জীব হিন্দু মুসলমানের হৃদয়ের অন্তস্তলে স্বাধীনতার মন্ত্র প্রচার করিয়া বেড়াইতেছে।

ভূতের জাহাজ

(শ্রীবরেন্দ্রনারায়ণ বসু)

অনেকদিন আগেকার কথা. আমেরিকান জাহাজ "চার্লস হাসকেল" ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে নিউফাউণ্ডল্যাণ্ডের নিকট অপর একখানি পালের জাহাজকে ধাক্কা দিয়া ডুবাইয়া দেয়। এত শীঘ্র সেই জাহাজ ডুবিয়াছিল ও সেই সময় সমুদ্রে ঝড় তুফানও এত অধিক ছিল যে তাহার একটী লোকও রক্ষা পায় নাই। তার পর হইতে "চার্লস হাসকেলের' নাবিকরা দেখিতে পাইত ঐ ডুবো জাহাজ সমুদ্রগর্ভ হইতে উঠিয়া তাহাদের জাহাজে ধাক্কা দিবার জন্য বেগে ছুটিয়া আসিতেছে। হয়তো ঐ নাবিকদের সামনে জাহাজখানা ডুবিয়াছিল বলিয়া তাদের মনে ঐ রকম মিথ্যা ভয় আসিয়া থাকে বলিয়া পুরাতন নাবিকদের স্থানে নূতন নাবিক নিযুক্ত করা হইয়াছিল, কিন্তু তারাও ঐ ডুবো জাহাজকে তাড়া করিয়া আসিতে দেখিতে পায়। বার বার নাবিক বদলান হইয়াছিল, কিন্তু প্রত্যেক বারই তাহারা ভূতের জাহাজ দেখিতে পাইত। শেষে আর কেহই "চার্লস হাসকেল" জাহাজে কাজ লইত না। অনেক চেষ্টা করিয়াও ঐ জাহাজের জন্য নাবিক সংগ্রহ করা যায় নাই।

আর একটী ভূতের জাহাজের কথা শুনিতে পাওয়া যায় তার নাম ছিল "ফ্লাইং ডচম্যান"। যাকে কখনও প্রশান্ত মহাসাগরের উপর বা কখনও দক্ষিণ আটলান্টিক সাগরের উপর ভাসিয়া বেড়াইতে দেখা যাইত। অপর যে জাহাজ হইতে তাহাকে দেখিতে পাওয়া যাইত সে জাহাজের আর রক্ষা ছিল না নিশ্চয়ই ডুবিয়া যাইত। কি করিয়া যে সেই 'ফ্লাইং ডচম্যান" ভূত হইয়াছিল তার এই রকম বিবরণ শুনিতে পাওয়া যায়—ষোড়শ খৃষ্টাব্দে কেপহর্ণের নিকট একখানি ওলন্দাজ জাহাজ জল ঝড় তুফানে বানচাল হইয়া যাইবার জোগাড় হইয়াছিল তার কাপ্তেন ছিল নাস্তিক ঈশ্বরের উপর ভক্তিহীন বদমেজাজী রাগী লোক, সে জল ঝড়ের সঙ্গে সমান তাল বজায় রাখিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিল যে এই তুফানের মধ্যে নিশ্চয়ই কেপহর্ণ ঘুরাইয়া তাহার জাহাজ লইয়া যাইবেই যাইবে। ইহাতে যদি তাদের মৃত্যুও হয় তাও স্বীকার। খালাসীরা সকলেই এই অসম্ভব কার্য্য হইতে নিরস্ত হইবার জন্য অনুরোধ করিল, কাপ্তেনের সহকারী এই কাজে সাহায্য করিতে অস্বীকার করায় কাপ্তেন তাহাকে হত্যা করিয়া জাহাজ হইতে জলে ফেলিয়া দিল। কাহারও কথা শোনা হইল না জাহাজ সেই ভীষণ জল ঝড়ে কেপহর্ণের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। ক্রমেই ঝড়ের সঙ্গে বৃষ্টির বেগ বাড়িয়া উঠিতে লাগিল, জাহাজ আর রক্ষা করা যায় না, হঠাৎ সেই সময় সমস্ত আকাশ কাঁপাইয়া ভীষণ রবে জাহাজের উপর বজ্রপাত হইল। পর মুহূর্ত্তে সমস্ত নাবিক সমেত

"ফ্লাইং ডচম্যান" অতল জলে তলাইয়া গেল। তার পর হইতে "ফ্লাইং ডচম্যান" জাহাজকে যাহারা দেখিয়াছিল তাহারা বলে "বেশ পরিষ্কার আকাশ সমুদ্রও স্থির খুব সকালে বা সন্ধ্যায় ঐ জাহাজকে দেখা গেল, সে যেন আমাদের দিকেই আসিতেছে, ক্রমে নিকটে আসিল তাহাতে তাহার নাবিকরা অত্যন্ত ব্যস্ত ভাবে ছুটাছুটী করিতেছে কাপ্তেন বিরক্তমুখে হাল ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে ইহা সব স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যাইত; এবং ক্রমে অস্পষ্ট হইয়া মিলাইয়া যাইত। সমুদ্র স্থির থাকিলেও ঐ জাহাজ যেন ভীষণ ঝড়ের মুখে ছুটিতেছে আর তাহার মাস্তলে একটী উজ্জ্বল আলো ঝকঝক করিতেছে এইরূপ বোধ হইত। এই জাহাজ দেখিবার চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে আমাদের জাহাজ হয় ঝড়ে না হয় পাহাড়ে ধাক্কা খাইয়া যে রকমেই হউক ডুবিয়া যাইত। এ পর্য্যন্ত যে জাহাজের নাবিকরা ঐ ভূতের জাহাজ দেখিয়াছে তাহাদের কাহারও জাহাজ রক্ষা পায় নাই। ইংলণ্ডের পূর্ব্ব উপকূলে একখানি আধুনিক নির্ম্মিত বড় পালের জাহাজ ভূত হইয়া ঘুরিতে অনেকে দেখিয়াছে। তার পালের উপর মাস্তলের গায়ে ডেকের উপর বরফ জমিয়া থাকে ও আস্তে আস্তে বরফ সমুদ্রের উপর ভাসিয়া বেড়ায়। (Pearsons Weekly হইতে)

পছন্দ না হইলে মূল্য ফেরৎ।

অপছন্দ হইলে মূল্য ফেরৎ দিব বিজ্ঞাপনে পড়িয়া শশীবাবু একটাকায় একটী হাতঘড়ি ভিঃপিতে আনাইয়া দেখেন যে উহা দুই আনা দামের ছেলেদের খেলিবার ঘড়ি। উহা ফেরৎ পাঠাইয়া মূল্যের টাকা চাহিয়া সেখান পাঠাইলে, হইতে এই প্রকার উত্তর আসিয়াছিল "বড়ই দুঃখিত হইলাম আপনি ঘড়ি ফেরৎ পাঠাইয়া টাকা চাহিয়া পাঠাইয়াছেন কিন্তু পাঠ করিয়া আশা করি সুখী হইবেন যে আপনার টাকা আমাদের যথেষ্ট পছন্দ হইয়াছে, অতএব ফেরৎ পাঠাইবার কোন কারণ দেখিতেছি না।"

নবান্ন

[শ্রীকটিকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়]

পল্লী কুটীরে কুটীরেতে শুভ
শঙ্খ উঠিল বাজি।
নূতন ধানের গন্ধ ছুটেছে
হবে নবান্ন আজি।
হইবে পায়স, হবে পিঠাপুলি—
পল্লীর হিয়া উঠিছে উথলি,
দ্বারে দ্বারে নব মঞ্জরী হার—
ঘরে ধান ভরা সাজি।
মন্দ পবনে গন্ধ ছুটেছে,
হবে নবান্ন আজি।

নূতন আসন পাতি গৃহীজন—
লক্ষ্মী বরণ করি—
ভক্তি শিশির ঢেলে দিবে পায়
হৃদয় কমল ভরি।
যাচিবে—হে দেবী বরষে বরষে—
হয় উৎসব যেন গো হরষে—
তব অক্ষয় কণক পরশে—
গেহে নব রূপ ধরি।
ভুলি অবসাদ, ঈর্ষা, বিষাদ—
অলসতা বিস্মরি।
দেবীর পরশে নূতন অন্ন—
হইবে অমৃত প্রায়
প্রসাদ পাইয়া কৃষক কুমার—
পাবে নব বল গায়।
উঠিবে আসিয়া কলু জোলা তাঁতী,
গাহিবে আমরা নহি হীন জাতি—
নিজ সামর্থ্যে রাখিবে জীবনে—
বিসর্জিয়া স্বরমায়—
পরের অধীন নাহি রবে আর—
দাঁড়াবে নিজের পায়।

হোথা তরুতলে ভিখারী একটী—
আনি ক্ষুদ্র দুই মুঠা
বসেছে বাঁধিতে নূতন অন্ন—
জ্বালি পাতা খড় কুটা।
হেরিল সহসা মুখে দিতে গিয়ে—
ভিখারী দুই আছে দাঁড়াইয়ে—
বিরস বদনে, পাষাণিক—চাল—
তারা আজ দুই মুঠা।
ভিনজনে সেই নূতন অন্ন—
নিল ভবে ভাগ ভাগ।

'কাল-ফাগুনী' *

[শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার]

ফাগুনে হাওয়া তো বয়েছে, তবে কেন এ প্রকৃতির ধূলা মলিন বেশ, মুখে কেন তার ফাগের হাসির বদলে কালের করাল মলিন ছায়া? কেমন এ ফাগুয়া? রাহু-রূপে ধূমল ছায়া বিশ্বদেবের ললাট-শশী যে ঢেকে ফেলল, গ্রাস করল—প্রলয় সাঁঝ আজ ঘনিয়ে এল! বসন্তের হাওয়া তো আর সুখবার্ত্তা বয়ে আনল না—আনল কোন এক কাল বৈশাখীর বুক ফাটানো রুদ্র দারুণ সংবাদ; সন্ধ্যা তার কাল রাগ মেখে কি এক আঁধার রাতের অপেক্ষা করছে—শ্মশান যার অন্ধকারে মহাকালী ছিন্নমস্তা উঠবেন ফুটে, আর শতধারে গেরুয়া গঙ্গার ঝিনকি দিয়ে করাল কাল বদনে তাঁর জগৎ তৃষ্ণা দূর করবেন। কাল-বৈশাখীর ঘন ঘটাময় তামস রাত্রি ক্রমেই যেন গাঢ় হতে গাঢ়তর হয়ে আসতে লাগল—মহাকাল-তাণ্ডবে বিশ্বদেহ মুহুর্মুহু থর্-থর্ কম্পিত হতে লাগল—রাত্রি যত অধিক হয় কম্প বেগ ততই বাড়ে—সে ঘোর অমানিশা, সে ঘোর আঁধার রাত কাটে, না আর কাটে না; 'ত্রাহি ত্রাহি' আর্ত্তরোল উঠে আকাশ ভরে জগৎ জুড়ে।

গ্রীষ্ম গেল, বর্ষা গেল; এ মহাকাল বৈশাখীর অবসান আর হয় না; বিশ্বের আকাশে তখনও ঘোরাল, ফর্সা তো আর হয় না—জীবলোকের ভরসা আশা সব বুঝি ফুরিয়ে গেল—আকাশ কখনও ঘোরালো, কখনও কালো কখনও লাল কখনও ধূমল, আর সেই মত মাঠে রঙ সারা ধরাতল; আকাশ ফেটে বজ্রপাত, ঝঞ্ঝাবাত, রক্তবৃষ্টি, আগুন বৃষ্টি; ভিন্ন ছিন্ন, বিপর্য্যস্ত, লড়তে লড়তে অবসন্ন মানুষ গুলির প্রাণে দারুণ কঠিন প্রলয় রুদ্র কত না ত্রাস কত না ভয় হানে। সে ঘোর দুর্দ্দিনে আঁধার আকারে বিশ্বের যিনি বন্ধু তাঁর আশ্বাসবাণী মনে পড়ে গেল—কম্প-ঝঞ্ঝার পরেই ও সব শান্ত, সুখ নিরমল।

'প্রলয় তরঙ্গ-রঙ্গ সাঙ্গ-মঙ্গল।'

শরাগমে গাঢ়নীলাকাশে অমল ধবল চাঁদের শান্ত কিরণে আবার তাঁর শুভবার্ত্তা জগৎ মাঝে ছড়িয়ে পড়ল, তাঁর শুভাশীষ মাথায় করে' মড়া প্রকৃতি আবার বেঁচে উঠল্। মঙ্গল আরতি করতে তাঁর জলে স্থলে লাল নীল কত না রঙের পদ্মকুল ফুটে উঠল, প্রভাত সমীরণ তার আঁমোদে চারিদিকে ছুটাছুটি লাগিয়ে দিল, মঙ্গল শঙ্খ ঘণ্টায় সারা বিশ্বজোড়া তাঁর গানের রোলে আকাশ পরিপূরিত হয়ে গেল, হেমন্তের নীহার স্নিগ্ধ তাঁর 'আসা'র পথ যেন মুকুতার মালা ছাওয়া, সেগুলি তাঁর চরণ চুমিতে যেন কত দিন যামিনী ধরে পথের ধূলায় শুয়ে আছে। লীলারসময় এ শুভ মুহূর্ত্তের অপেক্ষায় যা হয় নাই কভু হবে না কখন এমন মধুর মোহন তাঁর লীলায় উন্মোষনে এ ধামেই লোক চক্ষুর অন্তরালে কত কঠিন কাজের রঙ্গে মেতে রয়েছেন, প্রলয় রাত্রিতে ঘুমন্ত জগৎকে জাগাতে তিনি আজ কত না সজাগ থেকে বিশ্বচিন্তার ভার মাথায় করে জগন্ময় ছুটাছুটি করছেন—জগৎ জাগাতে নিজ জন সনে আবার অভিনব রস-মাধুরী লীলায় অবতীর্ণ ও প্রকট হবেন বলে। আহা, লোকত্রাণের জন্য তাঁর কত না রূপদশা ভেদাভেদ, কত না ক্লেশ বরণ; এবে ধৈতরণী তাঁর ধর্ম্মধারণ ও ধর্ম্মসংস্থাপন নাম সত্য হোক।

* কৃষ্ণনগর কুসুম সরোবরের শ্রীযুৎ শচীন্দ্রনাথ বাগচীর বাগান বর্ণনা অনুভূতির উপর প্রতিষ্ঠিত।

ভাই ফোঁটায়*

[শেখ মোহাম্মদ ইদ্‌রিস আলী]

প্রীতি-পুষ্পের সুরভি আঘ্রাণে ভরিয়া উঠেছে প্রাণ;
ভগিনী তোমার ফোঁটার সম্মান রাখিবে মুসলমান।
দাদার বিপদ গণিব আপন ম'নতা' আনন্দে ব'য়ে;
সুখেতে তাঁহার সুখ হবে ধরিব শিরের 'পরে।
অতীত যুগের যতেক দ্বন্দ্ব সকল যাইব ভুলি';
তা'দের পার্শ্বে দাঁড়াব হর্ষে ন্যায়ের নিশান তুলি'।
দেশ মাতৃকার সাধিব কল্যাণ হ'য়ে মোরে এক প্রাণ;
কর্ম্মের পথে উল্লাসে গাইব গাহিয়া মিলন গান।
আজি গো তোমার মঙ্গল হস্তের পবিত্র পরশ পে'য়ে।
ফুটিল নূতন বাসনা কুসুম হৃদয় কানন ছে'য়ে।
শঙ্খ ধ্বনিয়া কর আশীর্ব্বাদ মঙ্গ উচ্চারি' মুখে;
যুগল ভ্রাতার এ শুভ মিলন থাকে যেন সুখে সুখে।

* গায়কীর ভাই ফোঁটা দেখিয়া লিখিত।

ব্যতিক্রম

(উপন্যাস)

[শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্-এ]

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ

রাত্রি দশটার পরে গানের মজলিস ভাঙ্গিলে ভবসুন্দরী বিনয়কে লইয়া উঠিয়া গেলেন, তখন অন্নদা ইচ্ছা করিয়াই পিছনে রহিয়া গেল। তাহার মাতা ও স্বামী অন্দর মহলে চলিয়া গেলে সে তাহার সঙ্গীকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "পূর্ণদা' তুই গাইলি না কেন?" পূর্ণ মুখ বাঁকাইয়া বলিল, "আমার ইচ্ছা হ'লো না।" "আমি চ'লে গেলুম ব'লে রাগ ক'রেছিস্ বুঝি?" "রাগ ক'রব কেন?"—"কেন"—আমি বুঝি বুঝ্‌তে পারিনি? আমাকে যে মা ডাকলে, তাই? আর ঐ যে আপদ এসে জুটেছে, এখন অবাধা হ'লে মা রাগ করে। কাল মাকে বলে দেব ওটাকে যেন বাট মন্জিয়ে না আনে। ও গুনেছি দিন রাত বই পড়ে, কাল দিদির সঙ্গে পরামর্শ ক'রে ওকে বা'র বাড়ীতে বইএর ঘরে পাঠিয়ে দেব। তারপর তুই যা' ব'লবি তাই ক'রব।" এতক্ষণে পূর্ণের অভিমান শান্ত হইল, সে আবার পূর্ব্বের মত আদর করিয়া অন্নদার হাত ধরিয়া অন্দর মহল ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

বিনয়কে আহার করাইয়া ভবসুন্দরী তাহাকে নানা-রকম বৈষয়িক কথা শুনাইতে ছিলেন, তাহা বিনয়ের এক কাণ দিয়া প্রবেশ করিয়া অপর কাণ দিয়া নির্গত হইতেছিল। ভবসুন্দরী বলিতে ছিলেন, "এই লাটের মুখ, এখন একজন পুরুষের এখানে থাকা নিতান্ত প্রয়োজন। আমরা তিনটী মেয়ে মানুষ, তাদের খরচ পত্র বেশী কিছু হবার কথা না, কিন্তু মেয়ে মানুষ কখনই হিসাব ক'রে খরচ ক'রতে পারে না। যে পরিমাণ টাকা আদায় হয় তা'তে খরচ পত্র ক'রেও অনেক টাকা বাঁচা উচিত। কিন্তু এত টেনে টুনে চ'লেও এক একটা সময় এমন অজ্ঞার খরচ ক'রে বসি যে পরে সুলিয়ে উঠ্‌তে পারিনে। এই মনে কর, এ বৎসর তীর্থে গিয়ে যে পরিমাণ টাকা খরচ ক'রে ফেলেছি, এখন হিসেব দেখে মনে হ'চ্ছে যে তা'র অর্দ্ধেক টাকাতেই তীর্থের খরচ নির্ব্বাহ হওয়া উচিত ছিল। সংসারে কেউ নেই, আমলারা যা' ইচ্ছে তা'ই করে।" বিনয়ের হঠাৎ কাশী'র কথা মনে পড়িয়া গেল, তাহার অজ্ঞাতে পরেশ চন্দ্রের নোট বুক্ এবং অপূর্ণ হিসাবের কথা মনে করিয়া তাহার মুখের কোণে ঈষৎ হাসি ফুটিয়া উঠিল। তাহা বুদ্ধিমতী ভবসুন্দরীর দৃষ্টি এড়াইল না। তিনি ভাবিলেন যে নবজামাতা চা'রে আসিয়া এই বার টোপ্ গিলিয়াছে। তিনি বলিয়া উঠিলেন, "দেখ বাপু তোমাকে যখন পেয়েছি তখন আর ছাড়্‌তে ইচ্ছে ক'রেছ না। তোমার বিষয় তুমি দেখ শোন, টাকা নিয়ে যা' ই'চ্ছে হয় কর, আমি যে ক'দিন আছি রাধা বিনোদের প্রসাদ পেয়ে কাটিয়ে দেব। লাটের কিস্তির টাকা রেখে তুমি ইচ্ছে মত খরচ পত্র কর, কেবল আমার স্বামীর ভিটের একটা প্রদীপ জ্বালিয়ে রেখো। পড়া-শুনো তো অনেক ক'রেছ বাপু। আর পড়াশুনো ক'রে কি হবে? যদি নেহাৎ পড়াশুনো ছাড়তে না চাও, তোমার জন্য এই খানেই একটা কলেজ বসিয়ে দিচ্ছি, দশটা মাষ্টার রাখ, পড়াশুনা যা ক'রতে হয় এই খান্ থেকেই কর। বিষয় আশয় তুমি না দেখ্‌লে আর চলে না। এই দেখ, আশ্বিন কিস্তিতে হরিপুর আর শিবপুরে লাটের টাকা এখনও যোগাড় কর্‌তে পারিনি। হয়ত গহনা বন্ধক দিয়ে টাকা দিতে হবে, অথচ এই ভাদ্র মাসে একা পরেশের হাতে গহনা বাবদ চোপড়ে বোধ হয় বিশ হাজার টাকা খরচ ক'রেছি। আমি বলি যে এই লাটের কিস্তিটা কি ক'রে যেওয়া হয় কোন মহল থেকে কি আসে তা তুমি নিজে দেখে নাও।" ভবসুন্দরীর কথার প্রথম ভাগটা বিনয় মন দিয়াই শুনিতে ছিল, কিন্তু শেষের দিকটা সে অন্যমনস্ক হইয়া গেল কারণ

তখন পাশের ঘরে সারদা অন্নদাকে বলিতেছিল, "কিছুতেই শুনলে না, সাবান লোসান গরম জল সমস্ত ঠিক করে রেখেছিলাম, কিন্তু বিনয় বলে গেল যে রাত্রে নাইলে তার সর্দ্দি হয়। উত্তরে অন্নদা বলিল, "ঐ জামের মত কাল, ওর গায়ে না জানি কি ভীষণ দুর্গন্ধ। দিদি, আমি ত ওর সঙ্গে এক খাটে শুতে পারব না।" সারদা বলিল, "এসেন্স দিয়ে ঘরটা ভাসিয়ে দিয়ে এসেছি, বিছানার চাদর আর বালিশের ওয়ার গোলাপ জলে কাচিয়ে রেখেছি, তুই একখানা রেশমী রুমালে আতর মাখিয়ে নিয়ে যাস্।" অন্নদা আবার বলিল, "আমার এখন থেকে গা ঘুলুচ্ছে।" "কি ক'রবি ভাই, হাজার হলেও স্বামী। স্বামীকে অশ্রদ্ধা করতে নেই।" "অমন স্বামীকে দরকার নেই দিদি, অনিলা দিদির মত সধবা হ'য়েও বিধবা সেজে থাকব।" বিনয় অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া কাণ ফিরাইয়া লইল। ভবসুন্দরী তখনও বলিতেছিলেন, "এই নিকেশের কাজটা আমি কোন দিনই বুঝি না। তুমি যদি একবার সেওয়ানজীর সঙ্গে বস, তা'হলেও আমি কতকটা ভরসা পাই। এই দশ বৎসর হ'ল কর্ত্তা স্বর্গে গিয়েছেন এর মধ্যে একবারও ভাল করে নিকেশ নেওয়া হয়নি।" বিনয় হাসিয়া বলিল, "যদি থাকি তা' হ'লে ব'সব বই কি, আমার শরীরটা আজ ভাল বোধ হ'চ্ছেনা।" "তবে তুমি শোও গে।" ভবসুন্দরী ভাবিলেন, যে কন্যার রূপে মুগ্ধ হইয়া জামাতা মিলনাকাঙ্খায় অধীর হইয়া পড়িয়াছে। বিনয় শয়ন কক্ষে গিয়া দেখিল, যে বড় একখানা খাটে চারি দিকে বড় পাশ বালিশে দুর্গ সাজাইয়া তাহার ধর্ম্মপত্নী পাশ ফিরিয়া আতর মাখা একখানা রঙীন রুমাল মুখে চাপা দিয়া পড়িয়া আছে। বিনয় খাটের দিকেও গেল না, সে ঘরের কোণ হইতে একখানা মাদুর টানিয়া লইয়া তাহার উপর শুইয়া পড়িল।

সপ্তত্রিংশ পরিচ্ছেদ

অন্নদা সকালে উঠিয়া মুখখানা ভার ভার করিয়া রহিল, তাহা দেখিয়া সারদা মনে মনে খুব হাসিল কিন্তু প্রকাশ্যে কিছু বলিল না। বিনয় একদণ্ড রাত্রি থাকিতে উঠিয়া গিয়াছিল, সুতরাং অন্নদা উঠিয়া দেখতে পায় নাই। সারদা যখন কাপড় কাচিতে গেল তখন সে দূরে পুষ্করিণী তীরে উদ্যানের মধ্যে বিনয়কে দেখিতে পাইল। কাপড় কাচিয়া সারদা নিত্য মাতার পূজার আয়োজন করিতে মন্দিরে যাইত কিন্তু আজ আর সে দিকে গেল না। সে পুষ্করিণী হইতে উঠিয়া সিক্তবস্ত্রে মাথার জল মুছিতে মুছিতে বিনয়ের দিকে চলিল, আর তাহাকে আসিতে দেখিয়া বিনয় শিহরিয়া উঠিল।

পুষ্করিণীর তীরে সারি সারি ছোট-ছোট গাছে অসংখ্য শেফালিকা ফুটিয়া ছিল, রাত্রির বাসী ফুল ঝরিয়া গাছের চারিদিকে শিশির সিক্ত শুভ্র শয্যায় ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। বিনয় স্নান করিয়া তাহার অসংবদ্ধ দীর্ঘ কেশগুলা শুকাইবার জন্য রৌদ্রে বসিয়াছিল। সারদা আসিয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া গামছা দিয়া তাহার সিক্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ মুছিতে আরম্ভ করিল, বিনয় বিরক্ত হইয়া মুখ ফিরাইয়া লইল। সারদা তাহা দেখিয়াও মনে মনে হাসিল। সে কিন্তু সহজে ছাড়িবার পাত্রী নহে। সে জিজ্ঞাসা করিল, "রাত্রি জেগে ব'সে গেছ বুঝি?" বিনয় রাগিয়া তাহার দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিল, "রাত্রি মোটেই জাগিনি, বরঞ্চ এত ঘুম এসেছিল যে রাত্রিটা কোথা দিয়ে কেটে গেল জানতে পারিনি।" সারদা কিছুমাত্র অপ্রতিভ না হইয়া আবার জিজ্ঞাসা করিল, "এই ভোরের ঠাণ্ডায় পুকুরের জলে স্নান ক'রে দিব্যি জিজে বিড়ালটীর মত বসে আছ দেখছি? চুল দিয়ে যে টপ্ টপ্ ক'রে জল গড়িয়ে পড়ছে?" এই বলিয়া সে বিনয়ের অনুমতির অপেক্ষা না করিয়াই তাহার নিজের গামছা দিয়া বিনয়ের মাথার চুল মুছিতে আরম্ভ করিয়া দিল। বিনয় অত্যন্ত চটিয়াও প্রকাশ্যে কিছু বলিতে পারিল না। সারদা আদর করিয়া কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া তাহার চুল শুকাইয়া দিল, মুখ মুছাইয়া দিল, তাহার পরে তাহার চিবুক ধরিয়া আদর করিয়া বলিল, "আমি দিদি, আমার কথা শুনতে হয়। লেখাপড়া শিখে যত দিগ্‌গজ হ'লে কি হয়, ছেলেমানুষের বাহ-রাখো তো যায় নি। এখন উঠে এস তো দেখি। রোদ্দুর উঠেছে, এখনি মাথা ধ'রবে।" বিনয়ের হাত

ধরিয়া তাহাকে লইয়া সারদা মন্দিরের উঠানে ঢুকিল। সেখানে তখন অন্নদা আর তার পূর্ব্বের দিনের অপরিচিত যুবকটী ছুটা-ছুটি করিতেছিল। অন্নদা মাথার কাপড় কোমরে জড়াইয়া একটা পিঞ্জরমুক্ত শুক পাখীর পিছনে পিছনে ছুটিতেছিল। পাখীটী তখনও ভাল করিয়া উড়িতে শেখে নাই সুতরাং প্রাণভয়ে এদিক ওদিক ছুটিয়া বেড়াইতেছিল। সারদার সহিত বিনয় তখন পূজা বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল অন্নদা বা তাহার সঙ্গী তাহা দেখিতে পাইল না। পাখীটী উড়িয়া গিয়া রাধা বিনোদের মন্দিরের মধ্যে আশ্রয় লইল, অন্নদা তাহার পিছন পিছন ছুটিতে গিয়া মন্দিরের রোয়াকে পূজার সাজ বাধিয়া পড়িয়া গেল, তখন তাহার সঙ্গী তাহাকে ধরিয়া তুলিল। এই দৃশ্যটী দেখাইবার জন্য সারদা ততক্ষণ পর্য্যন্ত কথা না কহিয়া মন্দিরের উঠানের এক কোণে বিনয়ের হাত ধরিয়া দাঁড়াইয়াছিল। তাহা দেখিয়া সারদা যে ফল আশা করিয়াছিল প্রকৃত ফল বিপরীত হইয়া দাঁড়াইল। বিনয় এতক্ষণ মন্ত্রমুগ্ধের মত দাঁড়াইয়াছিল, সারদা তাহার হাত ধরিয়া যে পথে লইয়া যাইতেছিল, সে সেই পথেই চলিতেছিল। কিন্তু তাহার বিবাহিতা ধর্ম্ম-পত্নীর আচরণ দেখিয়া তাহার সে মন্ত্রের মোহ কাটিয়া গেল। বিনয় সারদার হাত ছাড়াইয়া মন্দিরের উঠানের বাহিরে চলিয়া গেল। সারদা কিন্তু তখনও বুঝিতে পারে নাই যে বিনয়ের মোহ কাটিয়া গিয়াছে, সে তাহার পিছনে পিছনে মন্দির বাড়ীর দরজার বাহিরে আসিয়া বিনয়কে জিজ্ঞাসা করিল, "চ'ট্‌লে চ'লবে কেন? বাঁশী না বাজ্‌লে ভাষের রূপে কি রাধার মন টলে?" বিনয় কপালের ঘেম বিন্দু মুছিয়া বলিল, "রাগ্‌ব কেন? এ দেশের দেখ্‌ছি এই রীতি।" সারদা হাসিয়া বলিল, "ছেলে মানুষ না হ'লে এমন কথা বলে, ও রীতি সব দেশেই সমান।" বিনয় রাগিয়া বলিল, "আমাদের দেশে কিন্তু এ রীতি দেখিনি!" "কতদিন ত্রিলোয় এসেছ গা, ত্রিলোয় কতখানি দেখ্‌লে? সব দেশে সব জায়গায় প্রেমের এই ভাষা, বুঝলে হনুমানজী; যে এই ভাষার কথা কইতে শেখে সে জগৎ মাথায় বেঁধে দিগ্‌বিজয় ক'রে আসে।" বিনয় এই হেঁয়ালীর ভাষা বুঝিল না, কারণ সে কোন দিন প্রেমের ভাষা বুঝিতে চেষ্টা করে নাই। তখন তাহার মনে পড়িতেছিল যে ইন্দুর কাতর মুখে সে কোনও দিন এই উদ্দাম উন্মাদের ভাব দেখিতে পায় নাই, তাহার সেই প্রথম দিনের কথা স্মরণ হইতেছিল, ইন্দুর মুখে আর এই রূপযুক্ত ধনযুক্ত কন্যাযুগলের মুখে অনেকটা প্রভেদ। সারদা তাহার চিন্তায় বাধা দিয়া বলিল, "আমার সঙ্গে আমার ঘরে এস দেখি, ফুলের সাজে সাজিয়ে দি, দেখ রাধার মন টলে কিনা? তোমার মুখখানি বেশ, কাল ব'লে দুঃখ ক'রোনা। নীলমণি কি জলে না, হীরার বাঁধনে নীলমণি যত জলে চুনীপান্না তার দশ ভাগের এক ভাগও জলে না।" বিনয় অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠিল, সে বলিল, "দিদি আমার এখনও উপাসনা করা হয়নি।" সারদা হাসিয়া বলিল, "সাধ ক'রে বলি, তুমি গাধা, তুমি অর্দ্ধেক গাধা অর্দ্ধেক বাঁদর। আমার কাছে শিখ্‌বে এস, এ বয়সে যা'রা চক্ষু বুজে হাঁটু গেড়ে উপাসনা করে তা'রা বাঁদরের দল। এ বয়সের উপাসনার পদ্ধতি অন্য রকম, মন্ত্র অন্যরকম, ভাষা অন্য রকম।"

সহসা বিনয়ের মনে আতঙ্কের সঞ্চার হইল, সে সারদার হাত ছাড়াইয়া বলিল, "দিদি, আমি তবে কাপড়টা ছেড়ে আসি! সুতোর কাপড় প'রে উপাসনা ক'রতে নেই।" বিনয় একরকম ছুটিয়াই পলাইল। তাহা দেখিয়া সারদা কিছু মাত্র ব্যস্ত না হইয়া মন্দিরে গিয়া মায়ের পূজার সাজ করিতে বসিল, ভবসুন্দরী আসিয়া দেখিলেন যে অন্নদা শাড়ীর পাড় ছিঁড়িয়া তাহার সঙ্গীর হাতে 'পটী' বাঁধিয়া দিতেছে।

অষ্টাত্রিংশ পরিচ্ছেদ

বাধ্য হইয়া বিনয় যখন আবার অন্দরে ফিরিল, তখন বেলা হইয়া গিয়াছে। আগের দিনের কথা ভুলিয়া গিয়া সে তখন স্নান করিবার উদ্যোগ করিতেছিল। প্রথম হইতেই সে নিজের কাপড়চোপর বাহিরে রাখিবার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু তাহার কথা কেহই শুনে নাই। অগত্যা কাপড় ছাড়িবার জন্য তাহাকে দিনে দুইতিন বার বাড়ীর ভিতরে আসিতে হইত। বিনয় যখন কাপড়

ছাড়িয়া স্নানের ঘরে গেল, তখন সারদা কোথা হইতে আসিয়া তাহার চোখ টিপিয়া ধরিল। বিনয় তখন পূর্ব্বের আতঙ্কের কথা ভুলিয়া গিয়াছিল, সে হাসিয়া বলিয়া উঠিল, "দিদি!" সারদা হাত ছাড়িয়া দিয়া হাসিতে হাসিতে ঘুরে একখানা জল চৌকির উপরে বসিয়া পড়িল। বিনয় জিজ্ঞাসা করিল, "দিদি, আপনি এখন এখানে কেন এলেন?" উত্তরে সারদা বলিল, "সকাল থেকে ওৎ পেতে আছি, কেন ধরা প'ড়বে না? অগ্নির কি হ'য়েছে জান? তা'র টিয়া পাখী উড়ে গিয়েছিল, পূর্ণ তা'কে খ'র্জে গিয়েছিল, ধরবার সময় পাখীটা পূর্ণের হাতের আঙুলগুলা এমন করে কা'মড়ে দিয়েছে, যে তা'র জ্বর এসেছে। অগ্নি এখন পূর্ণকে নিয়ে প'ড়েছে।" বিনয় তাহার কথা শুনিয়া কিছুমাত্র দুঃখিত না হইয়া বলিল, "বেশ তো, তা'র সেবা করাই তো উচিত।" সারদা উঠিয়া স্নানের ঘরের দুইটা দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া বলিল, কি দিয়ে লেখাপড়া শিখেছিলে—ধান দিয়ে? অত বড় সোমত্ত বউ ঐ অত বড় মস্ত মিন্‌সের সঙ্গে দিন রাত্তির ঘুরে বেড়াচ্ছে, চোখ ফুটবে কবে?" "কানার চোখ কি ফোটে?"

সারদা তখন জল চৌকীখানা বিনয়ের চৌকীর কাছে আনিয়া বলিল, "দেখ, এখনও আমার কথা শোন। কাল রাত্তিরে সর্দ্দি লাগা সম্বন্ধে তুমি যা' ব'লছিলে, সে সমস্তই মিথ্যে কথা। এই সকাল বেলায় পুকুরে নেমে একঘণ্টা ধ'রে স্নান ক'রেছ, আর বারটা বাজ্‌তে না বাজ্‌তে আবার স্নান ক'র্‌তে এসেছ, তোমার নাকি সন্ধ্যে বেলায় বাইলে সর্দ্দি হয়? দেখ, আমার কোন অপরাধ নেই ভাই। আমি মা'কে অনেক বুঝিয়ে ব'লবার চেষ্টা ক'রেছি। কিন্তু মা'র চোখ কিছুতেই ফুটছে না। এই পূর্ণটা এসে অবধি অগ্নির নজরে প'ড়েছে, আর সে যতদিন এ বাড়ী থেকে না যেতে ততদিন অগ্নির মঙ্গল নেই।" বিনয় হঠাৎ বলিয়া বলিল, "তাই যদি মনে করেন তা'হলে আপনার বোন্‌কে হরিহরপুরে পাঠিয়ে দিলেই পারেন।" সারদা তাহার কথা শুনিয়া হাসিয়া লুটাইয়া পড়িল, অনেকক্ষণ পরে হাসির বেগ থামিলে সে বলিল, "একেই বলে ছেলে মানুষ, মা কি একদণ্ড অগ্নিকে চোখের আড়াল ক'র্‌তে পারেন?" "তবে পূর্ণের সঙ্গেই আপনার বোনের বিবাহ দেওয়া উচিত ছিল।" "হনুমানজী, তখন তো তোমার পরামর্শ পাওয়া যায়নি, পেলে কি হ'ত বলা যায় না। পূর্ণটা কে জান? আমাদের ওপাড়ার এক সোনার বেণের বামুন ছিল, সে ছেলেবেলা গিয়ে ওকে পথ থেকে কুড়িয়ে এনেছিল।" "তা'তে কি আসে যায়?" তাতে কতটা আসে যায়, তা' আর কিছুদিন বাদে বুঝতে পারবে? দেখ, অগ্নি ছেলে মানুষ, তুমি বিদ্বান, তা'র সমস্ত অপরাধ তোমাকেই মাপ করতে হবে। আমার বয়স হ'য়েছে, আমি সব বুঝ্‌তে পা'রছি তুমি এখন আমার কথা শোন দেখি।" "দেখুন দিদি, আপনি সম্পর্কে আমার বড় হ'লেও আমি বয়সে আপনার বড়। কথাটা তলিয়ে দুদিন বুঝে দেখি তার পর আপনাকে ব'লব।" সারদা তত সহজে হটিবার পাত্রী নহে, সে বলিল "দেখ, পুরুষে এ সকল কথা কিছু বুঝ্‌তে পারে না, আমরা কিন্তু মুখের ভাব দেখ্‌লেই বুঝ্‌তে পারি যে কি হচ্ছে। তুমি এখনও আমার কথা শোন। আমি একবার চেষ্টা ক'রে দেখি, তারপর যা' ক'রতে হয় কোরো। যতদিন পূর্ণচন্দ্রের এ বাড়ীতে শুভাগমন হ'য়েছে ততদিন থেকে আমি তোমাকে পাবার জন্য ব্যস্ত হ'য়েছি। তোমার সম্পত্তি চোখের সম্মুখে বেদখল হ'য়ে যাচ্ছে, এটা আমার কিছুতেই সহ্য হ'চ্ছেনা। এতদিন পরে তুমি যখন এসেছ তখন একটা ব্যবস্থা না ক'রে যেতে পারবে না।" সারদার কথা শুনিয়া রাগে ও ঘৃণায় বিনয়ের সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া উঠিল, সে বলিল, "দেখুন দিদি সকল সম্পত্তির মূল্য সকলের চোখে সমান নয়। আমি আর বেশী কিছু ব'ল্‌তে চাইনে, দেখে শুনে আমার বোধ হ'চ্ছে যে এ সম্পত্তিটা ছেড়ে দিলেও আমার কোন দিন কিছুর অভাব হবে না। আপনি যা' ক'রেছেন তা' অবশ্য মঙ্গলের জন্যই ক'রেছেন, কিন্তু বোধ হয় ফলটা আপনার আশার মত হবে না।" সারদা বিস্মিতা হইয়া বিনয়ের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, অনেকক্ষণ পরে সে বলিল, "কি রকম লেখা-

পড়া যে শিখেছ, তাতো ভাই বুঝতে পারলুম না। শুনেছি, তুমি তিন চারটে পাশ ক'রেছ, পাশের চাইতে ঢের বেশী বিদ্যে নাকি তোমার, কিন্তু কথায় তো তা'র পরিচয় পাচ্ছিনে।" বিনয় চৌকী ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "দিদি, বেলা বেড়ে গেল, আপনি একটু বাইরে যান, আমি স্নান ক'রে নি। ইংরেজী বিদ্যাটা অনেক রকম, সেটা কেবল গোনাগন্থি পাশের উপর নির্ভর করে না।" সারদা মুখখান ভার করিয়া উঠিয়া চলিয়া গেল।

বিনয় যখন স্নান শেষ করিয়া ঘরের বাহিরে আসিল তখন সে দেখিল যে ভবসুন্দরী তাহার ঘরের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছেন। বিনয় তাহার শাশুড়ীকে সে সময় সেখানে দাঁড়াইতে দেখিয়া একটু আশ্চর্য্য হইয়া গেল, কারণ সাধারণতঃ তিন প্রহর বেলা পর্য্যন্ত তিনি রাধাবিনোদের মন্দিরের সম্মুখে বসিয়া বিষয় কর্ম্ম দেখিতেন। স্নানের ঘরটা দালানের এক কোণে, আর ভবসুন্দরী দাঁড়াইয়া ছিলেন আর এক কোণে। তিনি বিনয়কে দেখিয়া আগাইয়া আসিয়া বলিলেন, "তোমার একখানা 'তার' এসেছে, বাবা।" বিনয় 'তার' খানা লইয়া খুলিয়া পড়িল, হরসুন্দর তাহাকে তৎক্ষণাৎ হরিহরপুরে ফিরিয়া যাইতে আদেশ করিয়াছেন। সে 'তারের' মর্ম্ম ভবসুন্দরীকে পড়িয়া শুনাইল। কিন্তু ভবসুন্দরীর মুখ দেখিয়া বোধ হইল যে সংবাদটা শুনিয়া তিনি কিছুমাত্র বিস্মিতা হন নাই। বরঞ্চ তিনি বলিলেন, "এখন বেলা বেড়ে উঠেছে, তুমি খাবে এস, বিকেল বেলায় ও কথা হবে।" বিনয় পলাইবার একটা সুযোগ খুঁজিতেছিল, টেলীগ্রাম আসায় সে সুযোগটা আপনা হইতে উপস্থিত হইল। কথায় কথা বাড়িবে মনে করিয়া সে আহার করিতে গেল।

(ক্রমশঃ)

মায়ার খেলা

[শ্রীসতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়]

আজ থেকে তো মানব না আর বিধি
আজ থেকে তো লইব না ও নাম,—
আমায় যখন কাঙ্গলে হৃদয়-নিধি,
তখন কেন ভাঙব অবিরাম ?
অন্ধ-নয়ন ছিনিয়ে আমায় নিতে
নাই বা যদি বুঝলে গোপন ব্যথা,
কোন মুখে আর রুদ্ধ নীরব চিতে
ভাব্‌ব আমি অত্যাচারীর কথা ?
শাস্তি দেবা নয়কো ক্ষমার ক্রোড়ে
কেমন করে সেই সে বিচার মানি,
আজ থেকে আর যাইব না ওই দোরে
কাঙ্গাল হ'য়ে ধরতে পা'দুখানি।
মায়ার খেলা নাইবা র'ল যদি
তোমায় কেন করব আমি ভয় ?
জীবন যদি লুটেও নিরবধি
লুটবে ; কিন্তু তোমার পায়ে নয়।
যতই বোঝা দাওনা মাথার 'পরে
আজ থেকে তো লইব না ও নাম;—
আমায় যখন কাঙ্গাল করে
তখন কেন ভাঙব অবিরাম ?

ইণ্ডিয়ান সোপ কোম্পানীর
যেসিনে প্রস্তুত
চন্দন, রয়েলবকুল, মাল্ক ও ভেলভেট সাবান
ব্যবহার করুন। টেলিফোন, ২৪৯৬

সঙ্গীতাচার্য্য কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়

[পূর্ব্বানুবৃত্তি]

[শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষাল এম্, এ, বি, এল্, সরস্বতী]

প্রথম বর্ষ, ২য় খণ্ড 'বাসন্তী'র ১৫১ পৃষ্ঠায় এই প্রবন্ধে লিখিয়াছিলাম, "বঙ্গৈকতান" গ্রন্থ আমরা সংগ্রহ করিতে পারি নাই।" ইহা লেখার পর স্বর্গীয় কৃষ্ণধন বাবুর পুত্র শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় একখানি 'সঙ্গীত শিক্ষা' নামক গ্রন্থ আমাকে দেখিতে দিয়াছেন। ইহা কৃষ্ণধন বাবুর রচিত ও প্রথম সংস্করণের গ্রন্থ। ইহার বিজ্ঞাপনে স্থান ও কাল এইরূপে প্রদত্ত হইয়াছে। কলিকাতা হোগলকুড়িয়া। ১৪ই বৈশাখ ১৭৯০ শকাব্দাঃ।' টাইটেল পেজে ১২৭৫ ছাপা আছে। এই গ্রন্থখানির শেষভাগে "বঙ্গৈকতান" শীর্ষক ছয়টি পৃষ্ঠা আছে। ইহা হইতে অনুমান হয় যে কৃষ্ণধন বাবু প্রথমে "বঙ্গৈকতান" নামক যে পৃথক্ গ্রন্থ ছাপাইয়াছিলেন, তাহাই পরে "সঙ্গীত শিক্ষা"র সহিত পুনর্মুদ্রিত করিয়া দিয়াছিলেন। এই অনুমানের হেতু এই যে কৃষ্ণধন বাবু স্বয়ং গীতসূত্র-সারের ১ম সংস্করণের ভূমিকায় লিখিয়াছেন "আমি প্রথমে ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে 'বঙ্গৈকতান' নামক পুস্তক প্রকাশ করি; তাহাতে কেবল ঐক্যতান বাদ্যের গত্ লিপিবদ্ধ হইয়া প্রকাশিত হইয়াছিল। সেইখানি হিন্দু-সঙ্গীতের প্রথম স্বরলিপি গ্রন্থ। তাহার পর বৎসর Hindustani Airs Arranged for the Pianoforte ও 'সঙ্গীত-শিক্ষা' নামক পুস্তকদ্বয় প্রকাশ করি। তৎপরে খৃঃ ১৮৭৩ সনে 'সেতার শিক্ষা' প্রকাশ করি।"

ইহা হইতে জানা যায় যে 'সঙ্গীতশিক্ষা' ছাপা হইবার পূর্ব্ববৎসরে বঙ্গৈকতান মুদ্রিত হয়। কিন্তু 'সঙ্গীতশিক্ষা'র শেষের দিকে আবার ঐ 'বঙ্গৈকতান' মুদ্রিত দেখা যায়। 'সঙ্গীতশিক্ষা'র বিজ্ঞাপনে আছে "বঙ্গৈকতানের গত্ সকলে যে ঐক্যধ্বনির সঙ্গীত সুতন্ত্র সুতন্ত্রা ঝঙ্কারেরা দেওয়া হইয়াছে, তাহা হিন্দু সঙ্গীতে একটি অভিনব ব্যাপার। তদ্বারা ঐক্যধ্বনির (Harmong) বিষয় কিঞ্চিৎ জানা যাইতে পারিবে। ঐ সকল গত্ পিয়ানোফোর্ট, হার্ম্মোনিয়ম্ বেহালা, এস্রাজ, বাঁশী প্রভৃতি যন্ত্রে বাজাইতে পারা যাইবে।" ইহা হইতে অনুমান করি যে পূর্ব্ব প্রকাশিত গত্ সমূহে নূতন করিয়া Hormong যোগ করিয়া আবার, সঙ্গীতশিক্ষা'য় মুক্ত হইয়াছিল।

বঙ্গৈকতানে খাম্বাজ, বেহাগ, আড়ানা, সারঙ্গ, কৃপালী, ঝিঁঝিট, বাহার, শঙ্করা ও লক্ষ্ণৌ ঠুংরীর ৯ খানি গত্ প্রদত্ত হইয়াছে।

সঙ্গীতশিক্ষা প্রকাশের উদ্দেশ্য এই গ্রন্থের বিজ্ঞাপনে কৃষ্ণধন বাবু এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন "অস্মদ্দেশে সঙ্গীত-শিক্ষার যে প্রণালী প্রচলিত, তদ্বারা সঙ্গীতশিক্ষায় প্রবৃত্ত হইলে, লিখাপড়া প্রভৃতি সকল কর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া সর্ব্বদা ওস্তাদ লইয়া সঙ্গীতচর্চ্চা না করিলে, কখনই উহাতে যথেষ্ট পারদর্শী হইতে পারা যায় না। এই হেতু অস্মদ্দেশীয় বিদ্বান্ লোকেরা স্বহস্তে সঙ্গীত চর্চ্চা করায় ঘৃণা প্রকাশ করেন। আর বিশেষ যাবজ্জীবন ওস্তাদের উপর নির্ভর না করিলে সঙ্গীতে ব্যুৎপত্তি বৃদ্ধি হইবার উপায়ান্তর নাই বলিয়া :আমাদের সুশিক্ষিত সভ্যমণ্ডলীর মধ্যে সঙ্গীতচর্চ্চা বিস্তীর্ণ হইতে পারে নাই। অতএব ঐ অসুবিধা দূরীকরণ মানসে আমি এই গ্রন্থ প্রকাশে যত্নবান্ হই।...সঙ্গীতশিক্ষা সহজ করাই এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য। আমাদের দেশে ওস্তাদ্ মহাশয়দের খোসামোদ করিয়া গ্রন্থাভাবে সঙ্গীত শিক্ষা করা যে কতদূর ক্লেশকর, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। একে সঙ্গীতের কোন গ্রন্থাদি নাই, তাহাতে আবার ওস্তাদ মহাশয়েরা সরল মনে শিক্ষা দেন না। সুতরাং হিন্দু-সঙ্গীত শিক্ষা করা অন্যান্য কঠিনতর শাস্ত্র শিক্ষা করা অপেক্ষাও দুরূহতর হইয়াছে। এই হেতু যাঁহাদের লিখাপড়ার প্রতি মনোযোগ আছে, তাঁহারা ঐ সকল দেখিয়া শুনিয়া সঙ্গীতশিক্ষার দিক দিয়া যান না। কিন্তু সঙ্গীত যে একটি চিত্তোদ্রেককর পরম মোহিনী বিদ্যা, তাহা অস্মদ্দেশের সকলেই স্বীকার করেন। অতএব এরূপ বিদ্যা যাহাতে

সহজে উপার্জ্জন হয়, তাহার সদুপায় উদ্ভাবনে যত্নবান হওয়া যে ব্যর্থশ্রম নহে তাহা বোধ হয় সকলেই স্বীকার করিবেন। ইউরোপে এমন বিদ্যালয় নাই, যে স্থলে ছাত্রেরা বিশেষ সঙ্গীতশিক্ষা না পায়। এবং ইউরোপীয় বিশ্ববিদ্যালয়াদিতে সঙ্গীতের ছাত্রবৃত্তি ও উপাধি প্রদানের নিয়ম পর্য্যন্তও আছে। ইহাতে ইউরোপে সঙ্গীতচর্চ্চার যে কতদূর উৎসাহ, তাহা অনায়াসেই বোধগম্য হইতে পারে। বঙ্গদেশেও ঐরূপ বিদ্যালয়াদিতে সঙ্গীত-শিক্ষার নিয়ম না করিলে এতদ্দেশে রীতিমত সঙ্গীতচর্চ্চা বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা নাই। আমাদের দেশের প্রায় সকলেই সঙ্গীতকে অতি খল বিদ্যা বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। ইহার কারণ এই, যে, উহা প্রায় অবিদ্বান ও নিরক্ষরদিগের আলোচনীয় ও উপজীবিকা হওয়াতে, কেহ কাহাকেও সঙ্গীতের গূঢ় ব্যাপার সকল শিখাইতে চাহেন না। সুতরাং আমাদের দেশে সঙ্গীতজ্ঞদের মধ্যে পরস্পর বিদ্বেষ ভাব অতি প্রবল। অতএব সঙ্গীতের এরূপ অপ্রসিদ্ধি প্রকাশ করা, এতদ্দেশীয় আধুনিক ওস্তাদদিগের অভিপ্রেত নহে। কিন্তু সঙ্গীত সম্বন্ধে স্বদেশের কিঞ্চিৎ উপকার সাধনের আশায়, আমি কিছুতেই এ বিষয়ে নিরুৎসাহ হই নাই।"

১২৭৩ সালে কৃষ্ণধন বাবু যে কথা লিখিয়া গিয়াছেন, আজিকার দিনেও তাহা প্রযুক্ত হইতে পারে। এখনও ঐরূপ ওস্তাদদিগেরই প্রাধান্য বেশী। এই শ্রেণীর ওস্তাদদিগের নিকট কতদূর সাহায্য পাওয়া যায় তাহা নিম্নোদ্ধৃত পংক্তিগুলি হইতে বুঝিতে পারা যাইবে "তখন আমার পাঠ্যাবস্থা। কি জানি কেন বেহালা শিখিবার জন্য সেই সময় আমার বড় ইচ্ছা ও আগ্রহ হয়। তবে তখন যে দুই চারিজন গুরু-স্থানীয় খ্যাতনামা বেহালাবাদক জীবিত ছিলেন, তাঁহাদের কাছে শিক্ষালাভ করা আমার মত নিঃস্ব শিক্ষার্থীর পক্ষে একান্ত দুর্লভ ও অসম্ভব ছিল...বহু আয়াসে খানকতক সাধারণ গৎ সংগ্রহ করিয়া বাজাইতে লাগিলাম।...তখন যাঁহারই কাছে শিখিতে গিয়াছি, অধিকাংশ স্থলে একখানি গতের অর্দ্ধাংশ প্রাপ্ত হইলাম, পরিমার্জ্জনের অভিলাষে এক সপ্তাহ কাটিল এবং পূর্ণাবয়ব প্রাপ্তি, ভাগ্যে লাভ হইতে একমাস লাগিল।" (তুলসীদাস চট্টোপাধ্যায় সরল স্বরলিপি শিক্ষা, প্রথম ভাগ, ভূমিকা) এই শ্রেণীর ওস্তাদগণ যে সঙ্গীতশিক্ষা সহজ করিবার প্রণালীর বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন হইবেন তাহা বিচিত্র নহে। কৃষ্ণধন বাবুর আজীবন সাধনা ছিল এই শ্রেণীর ওস্তাদগণের নিকট না গিয়া যাহাতে গ্রন্থ সাহায্যে সঙ্গীত শিখিতে পারা যায়, তাহার উপায় নির্দ্ধারণ করা। যে প্রণালী অবলম্বনে কৃষ্ণধন বাবু এই উদ্দেশ্য সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাহা সর্ব্বাপেক্ষা সহজসাধ্য। বর্ত্তমান প্রবন্ধ-লেখক স্বয়ং এই প্রণালী অবলম্বনে সেতারশিক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছে, সুতরাং ইহা অনুমানের কথা বা প্রশংসার অত্যুক্তিবাদ নহে।

'সঙ্গীতশিক্ষা' গ্রন্থ খানি পুনর্মুদ্রিত হওয়ার আর কোন সম্ভাবনা নাই। ইহার প্রধান প্রধান বিষয়গুলি কৃষ্ণধন বাবুর পরবর্ত্তী গ্রন্থ 'সেতার শিক্ষা ও গীতসূত্রসারে' আলোচিত হইয়াছে। ঐ দুই গ্রন্থ এখনও কিনিতে পাওয়া যায়। এই শেষোক্ত গ্রন্থদ্বয় হইতেই যে কোনও শিক্ষার্থী সঙ্গীতের মোটামুটি জ্ঞানলাভ করিতে পারিবেন ও Staff Notation এর সহিত পরিচিত হইতে পারিবেন। সঙ্গীতশিক্ষার প্রথম তিন অধ্যায়ে Staff Notation এর সঙ্কেতাবলী ব্যাখ্যাত হইয়াছে, ৪র্থ অধ্যায়ে তাল, লয় ছন্দ ইত্যাদির বিবরণ, ৫ম অধ্যায়ে সঙ্গীতিক অন্তর, স্বরগ্রাম, বিকৃত সুর ইত্যাদি, ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে ভিন্ন ভিন্ন স্বরগ্রাম ও তাহা প্রস্তুতের রীতি, ৭ম অধ্যায়ে মূর্চ্ছনা, সমক, গিটকিরি ইত্যাদি, ৮ম অধ্যায়ে স্বরগ্রামের উৎপত্তি অর্থাৎ শব্দবিজ্ঞান প্রমাণ সাঙ্গীতিক সুরের উৎপত্তি ও তাহাদের পরস্পর সম্বন্ধ নিরূপণ ও ৯ম অধ্যায়ে কণ্ঠে ও যন্ত্রে স্বরসাধনের নিয়ম বর্ণিত হইয়াছে। এই শেষোক্ত অধ্যায়ে সেতার এস্রাজ, বেহালা, হার্ম্মোনিয়ম ও বংশী বাজাইবার প্রণালীও বর্ণিত হইয়াছে। এই অধ্যায় গুলির শেষে সাধন-প্রণালী, কতিপয় গৎ ও স্বরলিপি সহ গীত প্রদত্ত হইয়াছে। সঙ্গীত-শিক্ষার মোটামুটি পরিচয় এইরূপে প্রদত্ত হইল।

ভালবাসা

[শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী]

১

ভালবাসা—নিজে বিধি গ'ড়লো বুঝি ভালবেসে,
পাঠিয়ে দিল ভূবে সে কোন্ স্বপন পুরী স্বরগ দেশে ;
রূপের রাণী অপ্সরীদের নৃত্য গীতের মধুধারে,
হৃদয়-সত্তার কোমলতায় লভিয়ে দিল আপনারে ;
ভাষা, উষা, সরস্বতী, লক্ষ্মী মায়ের বুকের মাঝে—
আদর পেয়ে গ'লে গ'লে হ'ইলো গিয়ে নূতন সাজে।
মানবেরে ম'র্‌তে দেখে দুঃখে-শোকে, মৃত্যু-জরায়,
ভালবাসা—চোখে দুটী তার ভ'রে গেল অশ্রু ধারায়।
নেমে এসে নরনারীর বুকের মাঝে বাঁধ্‌লো বাসা ;
দয়া, মায়া, প্রণয়, প্রীতি, স্নেহের নামে ভালবাসা।

২

ভালবাসা মায়ার পাহাড়, দয়ার সাগর দাতার প্রাণে,
নিজুই সেথায় অধীরতায় পরের ব্যথায় ব্যথা আনে।
পরের দুখে পরের বুকে অনুভূতির তুফান তোলে,
নয়ন দিয়ে অশ্রুজলের পবিত্রতায় পড়ে গ'লে ;
দানের নামে ভালবাসা গরীব দুখীর প্রতি প্রাণে—
সঞ্জীবনী সুধার ধারা শিরায় শিরায় বইয়ে আনে ;
চোখের কোণে কৃতজ্ঞতায় মুক্তাফুলে ফুটে উঠে,
অস্থি সেরা বুকের নীচে আশীর্ব্বাদের কণ্ঠ ছোটে ;
মরণ-নদীর কূলে তাদের ইহকালের সকল আশা,
অক্ষয়তী, পুণ্যবতী, মূর্ত্তিমতী ভালবাসা।

৩

ভালবাসা স্নেহের রূপে উথ্‌লে উঠে মায়ের কোলে,
চোখের মণি সন্তানেরে বাহুর মাঝে ব'য়ে ব'লে ;
কুসুম-কোমল ঠোঁটের ফাঁকে শিশুর রুচি মুখটী ভ'রে,
মায়ের মধু বক্ষ সুধায় ভালবাসা প'ড়লো ঝ'রে ;
শিশুর আধ আধ বোলে, ছেলের মধু মা মা ডাকে,
ভালবাসা সঙ্গোপনে কতখানি লুকিয়ে থাকে !
হাসে যখন মায়ের কোলে সোনার কমল খোকামুখী,
ভালবাসা তাহার আড়ে নীরবে দেয় উঁকি ঝুঁকি ;
তাদের চির রক্ষা কবচ, বিপদ আপদ সর্ব্বনাশা,
মায়ের বুকে আপন-ভোলা, সকল-ভোলা ভালবাসা।

৪

ভালবাসা ভাইয়ে বোনে পরস্পরে পরম প্রীতি,
দুঃখে ভরা সংসারেতে সুখের ধারা আন্‌ছে নিতি ;
সুখের সুখী দুখের দুখী দুটী ফুলে একটী বোঁটায়,
ভালবাসা-মলয়-বায়ে একই মধুর গন্ধ ছোটায় ;
একই রূপে লাবণ্যেতে উজল করে দুটী মুখে,
একই দেহের রক্তকণায় ছড়িয়ে পড়ে দুটী বুকে ;
মুছিয়ে দিয়ে পরাণ হ'তে সকল মলা আবিলতায়,
মিশিয়ে থাকে অদর্শনের তীব্র-মৃদু ব্যাকুলতায় ;
শোকের মাঝে সান্ত্বনাতে কাঁদার মাঝে আন্‌ল হাসা,
বোনের প্রাণে প্রীতির নিঝর, সুখের সাগর ভালবাসা।

৫

ভালবাসা যৌবনেতে হৃদয় তলে, অধর সুধায়,
প্রণয় রূপে মিটিয়ে দিল উন্মাদনার সকল ক্ষুধায় ;
এনে দিল শান্তিবারি পরস্পরের অবকাশে,
প্রিয়তমা প্রিয়তমের পিপাসিত বাহুর পাশে ;
ঠিক্‌রে পড়ে ভালবাসা মৃদুল মধু হাসির সনে,
লুকিয়ে থাকে কৃত্রিমতায় অভিমানের আবরণে ;
মিলনেতে ভাসিয়ে নে যায়, বিরহেতে পাগল করে,
আদর-সোহাগ-ফোয়ারাতে উথ্‌লে উঠে,উছ্‌লে পড়ে ;
চোখের কোণে ফুটিয়ে দেয় নূতন ছবি, নূতন ভাষা,
রূপের খনি, মোহের রাণী, উন্মাদিনী ভালবাসা।

৬

ভালবাসা ! ভালবাসা ! সবাই তারে ভালবাসে,
তারে বিনা সংসারেতে ব'ইত মানব কিসের আশে ?
জীবন হ'ত মরুর মত, বৃথাই হ'ত সৃষ্টিরাশি,
হায়রে ! যদি ব'ইত নাকো এমন ভালবাসা-বাসি !
ভালবাসা কিসের টানে বনের পশু আন্‌ল ধ'রে !
ভুলিয়ে দিল শোণিত-তৃষা রক্তলোলুপ শার্দ্দূলেরে !
গ'ড়লো যে গো সোনার শিকল অগ্নীশের পায়ের সাথে !
রাখলো বেঁধে দেবতারে ভক্ত জনের আঙীনাতে !
ঘুচিয়ে দিল বৈতরিণীর ওপারেতে যাওয়া আসা—
ইহকালের পরকালের চিরকালের ভালবাসা ॥

কাহিনী

[শ্রীসুধাংশুকুমার চক্রবর্ত্তী]

সে দিন পূর্ণিমা।

ভুবনেশ্বর ষ্টেশনে বসে আছি। ট্রেনের প্রতীক্ষায়। চাঁদের আলোয় যতদূর দৃষ্টি চলে বেশ পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। টিকিট ঘরের ভেতর একটা আলো মিট্‌মিট্ করে জ্বলছে আর প্ল্যাটফর্মের এক প্রান্তে একটা কুলী ঝিমুচ্ছে। এ ছাড়া কোথাও জনমানবের চিহ্ন নেই। ওয়েটিং রুমে বসে আমি একলা।

নৈশপ্রকৃতির এমন বিরাট গাম্ভীর্য্য মোটেই ভাল লাগছিল না। কি করি কিছুই স্থির করতে না পেরে মনে মনে বড়ই অস্থির হয়ে পড়লুম। একবার ভাবলুম যাই ষ্টেশন মাষ্টারের সঙ্গে বসে কথাবার্ত্তায় বাকী সময়টুকু কাটিয়ে দেই পরক্ষণেই মনে হল ষ্টেশন-মাষ্টার মাত্রাজী তার সঙ্গে কথা বলে সুখ হবে না, সুতরাং ক্ষান্ত হলুম। কিন্তু বেশীক্ষণ চুপকরে থাকতে পারলুম না, ধীরে ধীরে উঠ্‌লুম। ষ্টেশনের বাইরে এসে দেখি, দোকান ক'খানা বন্ধ। জ্যোৎস্নায় কিন্‌কি ফুটছে। যত দূর নজর চলে দেখলুম কোথাও লোক জন নেই।

বিরক্ত হয়ে ষ্টেশনের বাইরে যে বেঞ্চখানা পড়েছিল তাইতে বসে পড়লুম। নব্ধ-ভূমিকার গাছগুলোর পাশ দিয়ে আঁকাবাঁকা পথগুলি চলে গিয়েছে। সামনে মুক্ত মাঠ; দূরে রামেশ্বরের মন্দিরের চূড়োটা দেখা যাচ্ছে। চাঁদের আলো আকাশ ছাপিয়ে পৃথিবীতে এসে লুটিয়ে পড়েছে। নাগকেশর ফুলের মিঠে গন্ধ, আর পূর্ণিমার চাঁদ, আমার মনে একটা কল্প-কল্পনার রঙিন ছবি আঁকবার সহায়তা করছিল। চোখ বুজে আমি যেন তার ভেতর ডুবে যাচ্ছিলুম···।

হঠাৎ কার পদশব্দে আমার চোখের তন্দ্রা ছুটে গেল। চেয়ে দেখি একটী বাঙালী যুবক সিঁড়িতে পা ঘষে জুতোর কাদা ঝেড়ে ফেলছে। বড্ড আনন্দ হল; চাষ চুপ করে বসে থেকে প্রাণ যেন হাঁপিয়ে উঠেছিল। লোকটী সামনে এসে বল্লে "গাড়ীর কত দেরী মশাই?"

"এখনও ঘণ্টা দেড়েক।" হতাশ হয়ে যুবক বলে উঠ্‌ল "ওঃ তাহলে অনেকক্ষণ সময় বসে থাকতে হবে দেখছি।"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, কি আর করা যায়।"

"তাই ত তাড়াতাড়ি এলুম গাড়ীর এখনও ঢের দেরী যে" বলে যুবক আমার পাশে বসে পড়্‌ল। আমি বললুম "আমি আপনার একঘণ্টা আগে এসে চুপ্‌চাপ্ বসে আছি।"

"বলেন কি? এখন কি করে সময় কাটান যায়?"

হেসে বললুম "এই ভাবে বসে বসে।" যুবক হেসে উঠ্‌ল। আমি বললুম—

"চলুন ওয়েটিংরুমে গিয়ে গল্প করা যাক্।" "চলুন" বলে সে উঠ্‌ল।

ধীরে ধীরে ওয়েটিংরুমে গিয়ে দুজনে বসলুম। প্রথমেই আমি জিজ্ঞাসা করলুম "আপনার বাড়ী?"

"গোবরডাঙ্গায়।"

মনে মনে ভাবলুম কোথায় গোবরডাঙ্গা আর কোথায় এই ভুবনেশ্বর! বললুম "কোথায় ছিলেন এখানে?"

"ক্যানিটোরিয়মে।"

"ও, তা বেশ।"

আমার মুখের দিকে স্থিরনেত্রে চেয়ে যুবক বল্লে "দেখুন আজ এই বিদেশে বিশেষতঃ এই নির্জ্জন ষ্টেশনে একজন স্বদেশবাসীর দেখা পেয়ে বেশ আহ্লাদ হচ্ছে।"

আমি বল্লুম "সেটা মিছে নয়।"

"আপনি এখানে বোধ করি বেড়াতে এসেছিলেন।"

"আজ্ঞে হ্যাঁ আপনি?"

"আমি এই শরীরটার জন্যে—"

তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করলুম "আপনার কি অসুখ হয়েছিল?"

"কি অসুখ সেটা আজও কিন্তু ঠিক করতে পারিনি কারণ আমার অসুখটা শারীরিক কি মানসিক তা বোঝা গেল না" বলে যুবক উদাস নয়নে আকাশের তারকিয়ে দিকে রইল।

মুখ টিপে একটু হাসলুম। বুঝলুম উনপঞ্চাশ বাতিকের এক বাতিক লোকটার মনে পুরোপুরী বর্ত্তমান। প্রকাশ্যে বললুম "আধ্যাত্মিক নাকি?"

"মাপ করবেন, আমাকে বোধ হয় উৎকট ভাবুক মনে করছেন, কিন্তু মোটেই আমি তা নই। আমার রোগের কারণ কি তা যদি শোনেন তা হলে আমার স্থির বিশ্বাস যে আপনিও আমার মত মহাসঙ্কায় পড়বেন।"

মনে বিষম কৌতূহল হল। লোকটার রোগের ইতিহাস কি সত্যই কোন রহস্যে ভরা, না ওর মাথায় কিছু গোল আছে।

আগ্রহান্বিত হয়ে বললুম "যদি বলেন ত শুনি।"

"আচ্ছা বলব কিন্তু এখানে নয়। বাইরে এমন হাওয়া দিচ্ছে আর আমরা যে এই একটী মাত্র জানলার ওপর ভরসা করে গল্পমে কষ্ট পাব তা হচ্ছে না।"

আমি বল্লুম "তবে চেয়ার দুখানা ব্যাল্‌কনিতে নিয়ে যাই চলুন। সেখানে বসে আরম্ভ করবেন।"

"হ্যাঁ চলুন" বলে যুবক উঠে পড়ল।

২

মেঘমুক্ত নির্ম্মল আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ হাসছে। চেয়ার দুখানা এনে বসবামাত্রই মুক্ত হাওয়ার পরশে দেহ যেন সজীব হয়ে উঠল।

দূরের গাছপালা গুলো অস্পষ্ট ভাবে দেখা যাচ্ছে। রেলের লাইন্ দুটী উঁচু নীচু মাটীর ঢিপি কেটে চলে গিয়েছে। বিশ্বপ্রকৃতি নীরব নিস্পন্দ; চেয়ে দেখি যুবক বসে আছে তন্ময় হয়ে। নীরবতা ভেঙে বল্লুম "কই আরম্ভ করুন।"

"হ্যাঁ শুনুন" বলে যুবক ধীরে ধীরে সুরু করে।

"কলকাতায় সিটি-কলেজে আমি পড়তুম বি-এ ক্লাসে আমার নাম শ্রীসত্যাশ্রয় বসু। পটলডাঙার একটা মেসে থাকতুম আর দুনি-ছাটা হলে খেয়ে নেতুম। আগেই বলেছি আমার বেশ মোবরুব্বী ভাব। ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করবার পরেই আমার বিয়ে হয়। বাড়ীতে আছেন আমার মা, স্ত্রী ও দূরসম্পর্কের এক খুড়ো। এই খুড়ো-মশাই হচ্ছেন আমাদের অভিভাবক। চিরকালই আমি একটু একরোখা ও গোঁয়ার বলে প্রসিদ্ধ ছিলুম। সেবার পূজোর ছুটীতে কলেজ বন্ধ হল। জিনিষ পত্র গুছিয়ে বাড়ীর দিকে রওনা হলুম। যে দিন আমি গিয়ে বাড়ী পৌঁছলুম সেই দিন রাত্তির থেকেই বেলায় বৃষ্টি আরম্ভ হল এমন বৃষ্টি যে মনে হল এবার একটা বন্যা না হয়ে যায় না। সে রাত কাটল। পরের দিন ও সমান ভাবে জল চল্‌ল।

বিকেল বেলায় মাকে বিচুড়ী রাঁধবার উপদেশ দিয়ে দাওয়ায় বসে চা খাচ্চি কাকা কি একটা কাজে পাড়ায় বেরিয়েছেন, এমন সময় ছাতা মাথায় দিয়ে হাঁটুর ওপর কাপড় গুটিয়ে, কাদা ভাঙতে ভাঙতে বাল্যবন্ধু দীনেশ এসে হাজির।

অবাক হয়ে তাকে বসতে বলে জিজ্ঞাসা করলুম "কি খবর হে—এই জল কাদায় এতটা পথ ভেঙে এলে যে।"

"এই তোমার সঙ্গে দেখা করতে। কবে এলে?" বলে ছাতাটী মুড়ে আমার পাশে বসে পড়ল।

আমি বল্লুম "কাল বিকেলে এসেছি—একেবারে বৃষ্টি মাথায় করে—নইলে সকালে তোমার সঙ্গে দেখা করতে যেতুম।"

"কেমন আছ?"

"ভালই আছি। চা খাবে?"

"পেলে মন্দ হয় না এই জল-বাদলায়—"

উঠে বাড়ীর ভেতর গিয়ে স্ত্রীকে বল্লুম "ওগো দীনেশ এসেছে। চা করে বিন্দীবিকে দিয়ে বাইরে পাঠিয়ে দিও। দু'বাটী কোরো। আমিও আর একবাটী খাব।"

"যে আজ্ঞে" বলে মুচ্‌কে হেসে তিনি চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে রান্না ঘরে চলে গেলেন। আমিও বাইরে দাওয়ায় এসে বসলুম।

পা মুছতে মুছতে দীনেশ বলে হ্যাঁ হে সত্য, তুমি এসেছ ভালই হয়েছে। ও পাড়ার দিঘিটা জলে ভরে গিয়েছে। অনেক মাছ নাকি উঠেছে, হেথো শশী চাক এরা সব কুড়িয়ে নিয়ে গেল। আমি ভাবছিলুম কি যে আমিও সন্ধ্যের সময় যাব। তা তুমি রয়েছ চলনা আমার সঙ্গে, দুজনে কিছু মাছ কুড়িয়ে আনা যাক্। বাদলার রাতে ভোফা খাওয়া যাবে।

মাছের নাম শুনেই মনটা বেশ লুব্ধ হয়ে উঠল। ছেলেবেলায় সঙ্গীদের সাথে খেজুর রস খেতে, আম কুড়োতে, মাছ ধরতে প্রায়ই দল বেঁধে যেতুম। আমি ছিলুম এসব কাজের নায়ক, আর দীনেশ উপদেষ্টা। অনেক দিন পরে সেই রকম একটা ছেলেমানুষীর সুযোগ পেয়ে ছাড়তে ইচ্ছে হল না।

বল্লুম "বেশ ত যাব'খন।"

দীনেশ বল্লে "তবে তৈরী হয়ে থেকো। বেশীক্ষণ যেন বসে থাকতে না হয়।"

আমি বল্লুম "আচ্ছা।"

বৃন্দা ওদের বিস্বাদ দু'বাটি চা দিয়ে গেল। দুজনে পরমানন্দে খেতে সুরু করলুম। নানা কথাবার্ত্তার পর খাওয়া যখন শেষ হল তখন দীনেশ উঠে পড়ল। আমি জিজ্ঞাসা করলুম "কি হে চল্লে না কি?"

"হ্যাঁ, মিছিমিছি আর দেরী করে লাভ কি? আবার সন্ধ্যেবেলায় ভাবতে আসতে হবে ত।"

"আচ্ছা এস" বলে তাকে বিদায় দিলুম। ধীরে ধীরে ছাতা মাথায় দিয়ে সে চলে গেল। আমিও মাকে এই খবর জানাতে বাড়ীর ভেতর গেলুম।

৩

মা তখন আমার স্ত্রীকে 'একটা ভাল তরকারী না হলে যে বিচুড়ী ভাল লাগে না' রন্ধনকারিনীর পক্ষে এই অবশ্য জ্ঞাতব্য তথ্যটি ভাল করে বোঝাচ্ছিলেন।

আমি গিয়ে তাঁর কাছে বসলুম। অগত্যা পুত্রবধূকে সম্বোধন করে তিনি বল্লেন "বৌমা, যাও আলু কপি আর পেঁয়াজ দিয়ে একটা চচ্চড়ি করগে।"

যার উদ্দেশ্যে একথা বলা হল তিনি তার পূর্ব্বেই এক হাত ঘোমটা টেনে পলায়ন করেছিলেন। আমি বললুম "মা।"

"কেন রে?

দীনেশ মাছ কুড়োতে যেতে বলে গেল।

সবিস্ময়ে মা বল্লেন "কোথায় রে?"

"ও পাড়ার দিঘিতে নাকি অনেক মাছ উঠেছে, সেখানে।"

"তাই কি হয় এই জলঝাপসায় কোথায় যাবি?"

"আমি একা যাবনা সেও সঙ্গে যাবে।"

মা বল্লেন "তা থাকগে, তুই বাবা যাসনে। ও দিঘিটায় আজকাল বড় ভয় হয়েছে। সন্ধ্যের পর ওখানে কেউ যায় না।"

বড় হাসি পেল। বল্লুম "মা কি যে বল তার ঠিক নেই। আমি ওসব ভূত টুত মানি না।"

"তা মানিস্ আর না মানিস্ তুই যেতে পাবি না।"

অনেকক্ষণ ধরে তর্ক করলুম কিন্তু কিছুতেই বোঝাতে পারলুম না যে ভূত বলে কোন জিনিষ নেই। অবশেষে যখন বল্লুম যে দীনেশকে কথা দিয়ে ফেলেছি তা খেলাপ করা ভদ্রজনোচিত নয় তখন এই সর্ত্তে রাজী হলেন যে আমাকে রাত নটার মধ্যে বাড়ী ফিরতে হবে। অগত্যা তাইতে স্বীকার করতে হল।

৪

আমাবস্যার রাত। সমস্ত বিশ্ব যেন একটা কালো-রঙের আবরণে ঢাকা। গাছপালা-গুলো সেই অন্ধকারের ভেতর আত্মগোপন করে আঁধারের মাত্রা যেন আরও বাড়িয়ে তুলেছে। বৃষ্টির গতি কমে যাওয়াতে শীতটা বেশ অনুভব করছিলুম—এক একটা দমকা হাওয়ায় হাড়ের ভেতর পর্য্যন্ত কন্‌কন্ করে উঠ্‌ছিল। নির্জ্জন পুকুর পাড়ে দাঁড়িয়েছিলুম আমি আর দীনেশ। হাতে আমাদের এক একটা টুকনি।

দীনেশ বল্লে "ওহে কত মাছ ধরলে?"

"টুকনিটার আদ্ধেক ভরেছে।"

"তবে চল যাওয়া যাক্। কেউ কোথাও নেই, ভাল বোধ হচ্ছে না।"

সত্য কথা বলতে কি! আমার অমন সাহসী প্রাণ-টায়ও কি এক অজ্ঞাত ভয়ের ছায়া পড়েছিল কিন্তু ভয়ের চেয়ে চুপোপুঁটী মাছগুলো ধরতে ধরতে আমার লোভ ঢের বেশী বেড়ে গিয়েছিল আর দীনেশের কাছে আমার পল্লীবিখ্যাত গোঁয়ার পদবীটীর মর্য্যাদা নষ্ট করে অন্তরের ভয়টুকু প্রকাশ করতে বিষম আপত্তিও ছিল। কাজেই শুক্‌নো হাসি হেসে বল্লুম "ভয় পেলে নাকি হে?"

"তুমি যাই বল ভায়া, আমি চল্লুম ঢের ধরা হয়েছে।"

"এরি মধ্যে"

"হ্যাঁ"

"তবে যাও, আমি কিন্তু যখন এসেছি, তখন টুকনিটা পুরোপুরি না ভরে যাচ্ছি না।"

"তবে থাক" বলে রাগ করে সে হন্‌হন্ করে চলে গেল।

এতক্ষণ যাও-বা মনে সাহস ছিল; দীনেশ চলে যাওয়াতে সেটুকু আর রইল না। যে ভয়টাকে মনের মধ্যে এতক্ষণ আমল দিচ্ছিলুম না সেটা যেন পুরোপুরি আমায় দখল করে বসল। মুখ তুলে চেয়ে দেখি নিবিড় অন্ধকার চারিদিক আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। দিঘির কালো জল সেই অন্ধকারের স্পর্শে যেন জমাট বেঁধে গিয়েছে। আকাশে দুটো একটা তারা কোন রকমে মেঘের আবরণ থেকে মুক্ত হয়ে মিটমিট করে প্রদীপের মত জ্বলছে। আমি মাছ খুঁজতে মনোনিবেশ করলুম। কি দুর্ভাগ্য! মাছ ও যে আর মেলে না। দিঘিটা বার দুই তিন ঘুরেও একটা মাছ পেলুম না। স্থির করলুম বাড়ী যাই, মার অনুরোধ মনে পড়ল নটার মধ্যে বাড়ী ফিরতে হবে। আন্দাজে বোধ হল দশটা বেজে গিয়েছে; আর দেরী করলে কি ঘটবে বলা যায় না। বাড়ী ফিরি এই সঙ্কল্প করে সবে পা বাড়িয়েছি এমন সময় আমার বুকটা তোলপাড় করে একটা শব্দ উঠল—মড়-মড়...মড়-মড়। সমস্ত দেহ যেন অবশ হয়ে গেল। চৈতন্য যেন লুপ্ত হতে লাগল। মোহাবিষ্টের মত খানিক-ক্ষণ সেখানে দাঁড়িয়ে রইলুম। প্রায় আধঘণ্টার পর যেন একটু সুস্থতা লাভ করলুম। অতিকষ্টে পিছন ফিরে দেখলুম ওপারের বাঁশঝাড়টা নড়ছে। যা থাকে কপালে ভাই হবে স্থির করে বাড়ীর পথ ধরলুম। অনেকটা পথ পার হয়েছি আর খানিকটা গেলেই বাড়ী পৌঁছব এমন সময় মনে হল যেন কে আমার পিছু পিছু আসছে। পিছন ফিরে তাকালুম কই কেউ ত নেই। শব্দ আসে কোত্থেকে। মনকে প্রবোধ দিলুম ও আমার মানসিক বিকার আকস্মিক ভয়ের দরুণ ঘটেছে।"

৩

কিছুক্ষণ নীরব থেকে যুবক আবার আরম্ভ করলে "বাড়ী পৌঁছে মাকে ডাকতেই তিনি বেরিয়ে এসে বল্লেন "এত রাত করে হয়, তোর কি প্রাণে ভয় ডর নেই?"

অপরাধীর মত ভগ্নকণ্ঠে বল্লুম "এই কুড়োতে কুড়োতে দেরী হয়ে গেল। কত রাত, তা ঠাওর করতে পারিনি।"

"যা, হাত মুখ ধুয়ে খেতে বসগে" বলে মা আঁচাবটির সন্ধানে গেলেন।

টুকনিটা উঠোনে নামিয়ে রেখে আমিও হাত-পা ধুতে গেলুম।

হাত পা ধুয়ে, দালানে মাদুর পেতে বসে বিশ্রাম করছি, আর বাঁশঝাড় নড়া, পেছনে পেছনে কার আসা ইত্যাদি ভাবছি এমন সময়ে উঠোন থেকে মা বল্লেন "সত্য।"

চম্‌কে উঠে বল্লুম "কেন? মা।"

"মাছ কোথায়?"

"কেন? উঠোনে"

"উঠোনে কোথায়?"

"টুকনির ভেতরে।"

টুকনির ভেতর ত নেই।"

"সে কি মা!" বলতে বলতে এক লাফে উঠোনে নেমে গিয়ে যা দেখলুম তাতে আমার চক্ষুস্থির হয়ে এল—দেখলুম টুকনি খালি, একটীও মাছ নেই।

সেই মুহূর্ত্তে যদি আকাশটা ভেঙে পড়তো, কিম্বা গ্রামের প্রান্তস্থিত কীর্ণাঙ্গী যমুনা নদী যদি সহসা বিশাল মূর্ত্তি ধারণ করে সব ভাসিয়ে দিত তা হলেও অত বিস্মিত হতুম না। এ যে ধারণাতীত। এই মাত্র মাছে ভরা টুকনিটী রেখে এলুম, এর মধ্যে এই একেবারে খালি। এ কি স্বপ্ন দেখছি!

মা বল্লেন "কিরে কথা কচ্ছিস্ না যে?"

জড়িত কণ্ঠে বল্লুম "কি জানি বলতে পাচ্ছি না মা। বোধ হয় পথে পড়ে গিয়েছে।"

"হাঁ মা খেয়ে শুগে যা।"

আতঙ্কে, বিস্ময়ে মন অভিভূত হয়ে গিয়েছিল। ধীরে ধীরে গিয়ে আসনে বসলুম আমার স্ত্রী বিচুরীর থালা এনে দিলেন। গলা দিয়ে যেন আর কিছু নামে না। সমস্ত সুধা যেন এক ঐন্দ্রজালিক স্পর্শে মিটে গিয়েছিল।

নাম মাত্র খেয়ে শুয়ে পড়লুম। বিছানায় শুয়ে ভাবছিলুম ভাই-ত এ ব্যাপার কি! জলে ভিজে অতক্ষণ ধরে যে মাছগুলো ধরলুম সেগুলো গেল কোথায়? বাঁশঝাড়টা নষ্টেছিল বটে, আমার পিছন পিছন কেউ এসেছিল বটে...ঐ তবে কি তারই কাজ? সত্যই কি ভূত বলে কোন প্রাণী আছে? আমার শিক্ষিত মন অস্বীকার করে উঠল কিন্তু মাছগুলো গেল কোথায়? নিজ হাতে তুলেচি বাড়ী পর্য্যন্ত বয়ে এনেছি। এত কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না।

হঠাৎ দরজার কড়া নড়ে উঠল। ভীতস্বরে বল্লুম "কে?"

"ওগো দোরটা খোল।" আমার স্ত্রীর কণ্ঠস্বর বলে বোধ হল।

শরীর ও মনের এমি অবস্থা যে উঠে দোরটা খুলে দেবার সে শক্তি ছিল না। ধীরে ধীরে বল্লুম "আজ আর কাছে শোওনে আমার শরীরটা ভাল নয়।"

"কি যে বল তার ঠিক নেই।" বলে তিনি আবার দরজায় আঘাত করলেন।

"সত্যি বলছি। যাও।"

"না না সে, কি হয়। এ রাতে আবার কোথায় যাব।"

মনটা তিক্ততায় ভরে গিছল। রাগ করে বলে ফেল্লুম "দেখ যদি বেশী বাড়াবাড়ি কর তা হলে মাকে ডাকব। আমি দোর খুলব না।"

"খুলবে না?"

"কিছুতেই না।"

দুম্—একটা বাইশমণ ভারী পাথর যেন দরজায় পড়ল। পরক্ষণেই কে অতিগম্ভীর স্বরে বল্লে "যাঃ—বড্ড বেঁচে গেলি।"

শরীরের মধ্যে যেন একটা বৈদ্যুতিক প্রবাহ বয়ে গেল। আমি বিছানায় মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লুম।

সকাল হয়ে গিয়েছে। শিউ হাওয়া লেগে যখন আমার চেতনা সঞ্চার হল তখন চেয়ে দেখি আলো দিয়ে দোকুর এসে বিছানায় পড়েছে। বাইরে থেকে মা ডাকছেন "ওরে সত্য আজ আর উঠ্‌বিনি নাকি?" রাত্রের কথা মনে পড়ল সে যেন একটা দুঃস্বপ্ন। ধীরে ধীরে দোর খুলে বাইরে এলুম।

অবাক্ হয়ে মা বল্লেন "হ্যাঁরে তোর মুখ চোখ অমন হয়ে গেছে কেন?"

কাল সন্ধ্যা থেকে গোপনতার বেষ্টনীর মধ্যে নিজেকে জোর করে চেপে রেখেছিলুম। এখন মার এই একটী স্নেহসূচক প্রশ্নে সেগুলো সব ছিন্ন হয়ে গেল। আদ্যোপান্ত সব তাঁকে খুলে বল্লুম। শুনে প্রথমটা তিনি চুপ করে রইলেন; তারপর ধীরে ধীরে বল্লেন "কাল মাছ না পাওয়াতেই অনেকটা বুঝেছিলুম তবে এতটা আন্দাজ করতে পারিনি। যাক্ তোর কাকা আসুক, তাঁকে দিয়ে বেহুলা ঘেলেকে ডাকিয়ে আনি, ঝাড়াতে হবে।"

কাকা এলেন, সব শুনে বেহুলাকে ডেকে আন্‌লেন। সে এসে বিস্তর দুর্ব্বোধ্য মন্ত্র আওড়াল কিন্তু সবই বৃথা। সে দিন হতে আমার শরীরের অবনতি আরম্ভ হল।

সকলেই বল্লে এর কারণ ভূতে পাওয়া; একমাত্র বীরেশ বলে না। সে বলে ভূতে আমাকে অনুসরণ করেছিল, ভয় দেখিয়েছিল সত্য কিন্তু এখন পর্য্যন্ত সেটা আমার রক্ত শোষণ করছে না। আমি একটা ভুল বিশ্বাস মনে মনে পোষণ করছি নাকি এবং সেই জন্যেই আমার শরীর দিন দিন শুকিয়ে যাচ্ছে। অর্থাৎ তার মতে আমি কেবল সেই রাত্রেরই কথা ভাবি এবং সর্ব্বদা আতঙ্কে কাল যাপন করি; এই ভয়ে ভয়ে নিরানন্দ ভাবে দিন কাটানই আমার রোগের মূল।

যাই হোক্, ক্রমে আমি অস্থিচর্ম্মসার হলুম। কলেজ ছেড়ে গিয়ে অনেক চিকিৎসা করালুম কিন্তু টাকা খরচই সার হল, উপকার তিলমাত্রও পেলুম না। এই ভুবনেশ্বরে শেষে হাওয়া খেতে এলুম। প্রথম প্রথম মন্দ ছিলুম না কিন্তু কিছুদিন পরে যে কে সেই। অবশেষে একদিন আমা———" বলে যুবক থেমে গেল।

কাহিনীটি শুনতে শুনতে যেন তন্ময় হয়ে গিছলুম। হঠাৎ থেমে যাওয়াতে বল্লুম "তারপর।" কোন সাড়াশব্দ নেই। মুখ ফিরিয়ে দেখি চেয়ার খালি—যুবক নেই। আমার সমস্ত মোহ যেন ছুটে গেল।

কোথায় গেল সে? চেয়ার ছেড়ে উঠে বন্ধুর "কোথায় গেলেন?"

কথাটার প্রতিধ্বনি ফিরে এল। নীরব নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম।

হঠাৎ দূর- বহুদূর থেকে যুবকের কণ্ঠস্বর যেন শুনতে পেলুম।

"মশাই এখানে আমার মৃত্যু হয়। নমস্কার—বিদায়।"

চোখের সাম্‌নে যেন পৃথিবীটা ঘুরছে বলে বোধ হল। চোখের পাতা আপনা আপনি মুদে এল। মূর্চ্ছিত হয়ে র‍্যাগ্‌টুকরুমে পড়ে গেলুম।

যখন জ্ঞান হল তখন চেয়ে দেখি ডেন্‌টন্ মাষ্টার মহাশয় আমার মুখে জলের ঝাপটা দিচ্ছেন; আর কুলী পাখায় হাওয়া করছে।

মাসিক-সাহিত্য সমালোচনা

ভারতবর্ষ, কার্ত্তিক, ১৩৩০—ভারতবর্ষের কার্ত্তিক সংখ্যাই এবৎসরের পূজার সংখ্যা হওয়ায় সম্পাদক এই সংখ্যাটিকে খুব ভাল করবার চেষ্টা করেছেন। মলাটের রবি বর্ম্মার আঁকা কিন্তু মূর্ত্তিটি যে কি, চিত্রকর তা ভাল করে কোটাতে পারেন নি। এটি কি সাবেক ভারতের কুমারী কন্যাদের মূর্ত্তি গান্ধারী, না, বর্ত্তমান ভারতের পাশ্চাত্য শিক্ষা লব্ধ মাতৃমূর্ত্তি? মুখ পত্রে একখানি চিত্রের জন্য ধন্যবাদ দিয়ে শ্রীযুক্ত প্রবোধকুমার চট্টোপাধ্যায়ের আঁকা, তার বিষয় সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক চৈতন্যদেবের গায়কন্যাস। ছবিখানি বোধ হয় কোন প্রাচীন চিত্রকরের আঁকা মৌঘল যুগের চিত্রের অনুকরণ, কারণ এরকম চৈতন্যদেব কবিতে বা সাহিত্যে পাওয়া যায় না। প্রথমেই এক বেনামী লেখকের মেয়েলোক ভরসা করি সহকারী বাদ্য সম্পাদক কবিতাটি লেখেন নি। কাব্যহিসাবে রাবীন্দ্রিক কাব্য নয়—"কাব্যার্থ ও সাহিত্যবর্ণনে" বিশ্বানুসারে এ কবিতাটি ভাল নয়। বহুলা মাসিক পত্রে যখন যাচ্ছে, কেবল ভারতবর্ষে নয়, অন্য ও মাসিক পত্রেও সাধারণ বাঙ্গালীপাঠককে বিভ্রান্ত করবার জন্য এরূপ ভাবহীন সংস্কৃত কবিতা ছাপা হয়ে থাকে। বোধ হয় একটা Mass Meeting করে protest না করলে ভালো মাসিক পত্রের সম্পাদকেরা এ জিনিষটা বন্ধ করবেন না। আজিনবরাবর কাব্যের লেখা যেমন বন্ধ হয়ে গেছে, সংস্কৃত ভাষার নূতন কবিতা লেখা সেই রকম বন্ধ হওয়া উচিত। সংস্কৃত সাহিত্যের আলোচনা প্রয়োজন কিন্তু টুলোপণ্ডিতদের মুখের চুলকানি কমাবার জন্য এই জাতীয় কবিতা ভারতবর্ষের মত উঁচুদরের মাসিকপত্রে প্রশ্রয় করা উচিত নয়। ভারতবর্ষের এই সংখ্যার তিনটি গল্প কাহিনী আছে, একটি শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম-এ লিখিত "ঔরঙ্গজেবের মোগীবাঈ" লেখক লেখেন ভাল, বিষয়টিও ভাল কিন্তু জিনিষটিকে টেনে বাড়ান হয়েছে এবং দু'এক খানি ছবি না থাকায় ভালরকম সাজে নি। প্রবন্ধটির ছোট আকার এবং ছবির অভাব সম্পাদক ইচ্ছা করলেই পূরণ করতে পারতেন। ভ্রমণের দ্বিতীয় প্রবন্ধ ডক্টর যাদুর রমণীমোহন ঘোষের "বাঙ্গালোর", লেখাটি ভাল নয়, লেখক ধনিও পাকা কিন্তু তিনি অন্যান্যদের মধ্যে অনেক জিনিষ ঢোকাবার চেষ্টা করে জিনিষটিকে ঘাটি করে তুলেছেন। ভ্রমণের তৃতীয় প্রবন্ধ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যারত্নের "কাশীর বৈশিষ্ট"। প্রবন্ধের গোড়াতেই এই প্রাচীন অধ্যাপক মহাশয় যে, আত্মপরিচয় দেওয়ার ভঙ্গি থেকেই বোঝা যায় যে, তাঁর অন্ন বিস্তর বিকৃতি ঘটেছে, তবে সে বিকৃতিটা মস্তিষ্কের কি লেখনীর তা এক চিত্তিতে বোঝা গেল না। প্রবন্ধটি তেমন ভাল নয়। অধ্যাপক মহাশয় পাকা লেখক হওয়ায় পাকা লেখার আকর্ষণ তাঁর ছত্রের মধ্যে থাকবেই কিন্তু সত্য সত্যই এ প্রবন্ধে অধ্যাপক ললিত কুমারের সাবেক ভাষার দেখা যায় না। ভারতবর্ষের সম্পাদক মহাশয় এক সংখ্যায়ই তিনটি অমণ বৃত্তান্ত কেন ছাপালেন তা বুঝতে পারা গেল না। এই সংখ্যায় শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের "অতুল গুপ্ত" শেষ হয়ে গেল, দ্বিজেন্দ্রলালের "বিরিঞ্চি-বিরিঞ্চা", ডাক্তার মহেন্দ্রলালের "বিদূষক" এবং শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রকুমার রায়ের "বারের মহাদেব" চলেছে। শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহার "মানবের জন্ম" শ্রীমতীন্দ্রদেবের "পরাজয়ে", শ্রীমতীন্দ্রদেবের "কৃষ্ণের বচন" শ্রীযতীন্দ্র নাথ রায়ের "উদাস করে যা" পদ্যের পাদপূরণের কবিতা। কবিতা ইন্দিরা দেবীর "অভাগিনী" এই জাতীয় কবিতা হলেও সুন্দর, কারণ তাঁর ভাষা রসাত্মক, কেবল শব্দের ঝঙ্কার নয়। শ্রীযুক্তবন্দ্য বন্দ্যোপাধ্যায়ের "বিরহিণী," যাদুনাথের ঘটনোপযোগী অনুকরণ। শ্রীযুক্ত যোগিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়ের "মতি চক্রবর্ত্তী" গল্পটি ভাল, ভাষাও ভাল কিন্তু লেখক গল্পের মধ্যে মৌলিকতাটা একটু বেশী করে ফেলে রসভঙ্গ করেছেন। শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের "সংস্কার" গল্পটি অতি সুন্দর, এমন গল্প ভারতবর্ষে কিছুদিন দেখা যায় নি। শ্রীযুক্ত কুমুদরঞ্জন মল্লিকের "পোষাকী সম্বাদ" চলনসই রচনা। "কৌতুকরঙ্গ" বিলাতী মাসিকপত্র থেকে চয়ন, এতে সম্পাদক বা লেখকের কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায় না। ব্রহ্মার নূতন সৃষ্টি শ্রীযতীন্দ্রনাথ বসুমল্লিকের ব্যঙ্গচিত্র। ভারতবর্ষের অনুষ্ঠান মেয়ে-ব্যাপারটা ভালরকম ফুটে ওঠে নি। শ্রীমানিক ভট্টাচার্য্যের "মুক্তির দুঃখ" একটা বিশৃঙ্খলাকার গল্প। রাজদ্রোহ অপরাধে তিনভাই একসঙ্গে বন্দী হয়েছিলেন, জেলে দু'ভাই মরে গেল বছর খানেক পরে একটি ভাই যখন মুক্তি পেলে তখন তার সেল ছেড়ে আসতে-ই ইচ্ছে হয়েছিল।" এই হচ্ছে গল্পের মোটকথা, গল্পটিতে আছে এবং

খোড়া না থাকায় এবং লেখকের লিখতে বসে বিশেষ বহু না বেড়ায় কাজটায় মোটেই ফোটে নি। শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ বসুর "বেশ" কবিতাটির আরম্ভ ভাল কিন্তু মাঝখানে মহাবিষাদ। যেমন —

"তমসার তামিস্রিতে বিতরে কি তপন কিরণ ?"

কবির মনে কি ভাব আছে তা জানিনে কিন্তু বাংলা ভাষায় তা ভাল ফুটে উঠে নি। নাটকিয়া আয়ত্তী শ্রীবিমলানলিন বন্দ্যোপাধ্যায় ঋষিবন্ধুদের "চন্দ্রহাস" গল্পটি কোন বিলাতী গল্পের অনুকরণ কিন্তু লেখকের দোষে বস্তুটি খাপ খায় নি। আমাদের সমাজে এরূপ ঘটনা একান্তই অসম্ভব এবং কোন রকমে চোখ কান বুজে সেটাকে সম্ভব করে তুলতে পারলেও হিন্দুর ঘরের মেয়ের ঐরকম লম্বা বক্তৃতা বাক্সে একরূপ অসম্ভব। শ্রীযুক্তা প্রসন্নময়ী দেবীর "খাতা" মন্দ নয়। শ্রীযুক্ত শৈলজা মুখোপাধ্যায়ের "রাঙা শাড়ী চলনই ছলনা। শৈলজা বাবুর এই গল্পগুলা ক্রমশঃ এক ঘেয়ে হয়ে যাচ্ছে। ওঁর যদি আর নূতন মাল মজুত না থাকে তাহলে কিছুদিন লেখা বন্ধ করলে ভাল হয়। শ্রীযুক্তা বিজয়া দেবীর "স্মরণে" কবিতাটি ভাবে ও ভাষায় সেকেলে এই একটিমাত্র 'সেকাল' যখন রবি বাবু উর্বশীর প্রতি লিখতেন, এখনকার দিনের ছোকরা পাঠকদের ভাল লাগবে কিনা বলতে পারি না। কবিতাটির পর দুপাতা বাদ দিলে তা না হলেও ভাল হয়। কার্তিকের ভারতবর্ষে শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ বসুর "স্বপ্ন" গল্পটি বিশেষ রূপে উল্লেখ যোগ্য। এই পত্রিকা-খানায় যুগে একেলে যা লেখেন—কোন দলই এরকম ভাষা ব্যবহার করতে পারেন না। শ্রীযুক্তা যমুনা বসুর "আহতা" গল্পটি ভাল হয় নি, গল্পটিতে একটি সুন্দর ঘটনা আছে কিন্তু লেখিকা তা ভাল করে ফোটাতে পারেন নি। শ্রীযুক্তা প্রমথনাথ ভট্টাচার্য্যের "হিন্দুস্থান" কবিতাটি পত্রের পাণ্ডুলিপির কবিতা, ভাবে ও ভাষায় অতি জঘন্য। কবির মতে: —

যাহি কিছুনাম, আছে ব্যক্তিগত জাতিগত বিভিন্নতা হেয় ;
যাহি গল্পগলি, বড় বলাবলি, আলোচনা শুধু পরস্পরীয়।

কবি এমন আশ্চর্য্য রস ভাব ও ভাষা কোথায় পেলেন ? যেখানে পেয়েছেন তাঁর সেখানেই বুড়ি কলসী সংগ্রহ করে রেখে দেওয়া উচিত। শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদারের "পরের পাপে" গল্পটি মন্দ নয়, লেখার অবোলা ভাবটি এতে বেশ আছে—বিজয়রত্ন বাবুর লিখবার ক্ষমতা আছে কিন্তু গল্পটি কিছুই হয় নি, সেটা কেবল বলবার দোষে। শ্রীশচীন্দ্র মোহন সরকারের "পল্লীচিত্র" কবিতাটি মন্দ নয়, চারটি কাঁচা হাতের হলেও এতে কবির শক্তির পাওয়া যায়। "টাইফোনেডটি" গল্পটি উপভোগ্য, পাকা হাতের লেখা "পরশুরাম রচিত গায়ক বিচিত্রিত" এই শ্রেণীর ব্যঙ্গচিত্র ভালো সাহিত্যে উচ্চ স্থান অধিকার করবে। শ্রীনরেন্দ্রদেবের "ভাঙা ও গড়া জগৎ" প্রবন্ধটি বড়ই ছোট। নরেন্দ্র বাবুর লেখার ওঁর রচনার চাইতে কবির ভাবটা বেশী হয়ে পড়ছে। শ্রীযোগেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর "বাঘের পূজা" গল্পটি ঐতিহাসিক গল্প হবার প্রমে এমনো মোসলা আছে তাদের খুবই ভাল লাগবে। শ্রীযুক্ত কোকিলনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের "ঘরোয়া কথা" সোজাসুজি রচনা, এতে লেখা বেশ ফুটে উঠেছে কিন্তু অধ্যাপক প্রিয় গোবিন্দ বসুর "ভারত ভ্রমণটি ছোটোদের কি গার্হস্থ্যের ঠিক বোঝা গেল না, গল্পরূপে যে একটা কাঠামো প্রয়োজন অধ্যাপক মশাই বোধ করি তা এখনো বোঝেন নি। মোটের উপরে কার্ত্তিকের ভারতবর্ষ ভালই হয়েছে, অনেকগুলি ভাল ভাল গল্প আছে এবং দুএকটি কবিতাও মন্দ নয়।

শ্রীঅনুরূপ

গ্রন্থ-আলোচনা

'নদের পাগল' নাটক। শ্রীবঙ্কিম চন্দ্র পাল গুপ্ত প্রণীত, মূল্য আট আনা। প্রকাশক যোগেন্দ্র পাবলিশিং হাউস্ ১১৮নং গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোড, সালিখা, হাওড়া, প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য। এই ছোট নাটখানিতে প্রেম ধর্ম্মের প্রচারক সেই বিরাট সুন্দর পুরুষের পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। নাটখানি পাঠ করিলে মনে আনন্দ হয়, একটা অপূর্ব্ব রসে প্রাণ ভরিয়া যায়। বালকেরা এই নাটখানি অভিনয় করিয়া আনন্দ ও শিক্ষা লাভ করিতে পারিবে। নাটখানির ভাষা সুন্দর উচ্ছ্বাসময়—কিন্তু স্থানে স্থানে আরও একটু সোজা করিলে ছেলেদের পক্ষে আরও সুবিধা হইত। আমাদের জাতীয় জীবনের গৌরবময় চরিত্র গুলি এই ভাবে ফুটাইয়া তুলিলে দেশের উপকারই হইবে। গ্রন্থের ছাপা, কাগজ সুন্দর—।

'চিতোর গৌরব' নাটক। শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র পাল গুপ্ত প্রণীত মূল্য আট আনা। প্রকাশক যোগেন্দ্র পাবলিশিং হাউস্। ১১৮নং গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড, সালিখা, হাওড়া। প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য। নাটকার ভূমিকায় লিখিয়াছেন—এই ঘুণ সন্ধ্যায়—যাঁহাদের উপর দেশের সকল ভবিষ্যৎ কল্যাণ নির্ভর করে, তাঁহাদেরই কর-কমলে এই ক্ষুদ্র চেষ্টা অর্পিত হইল। রাণা অমরসিংহ ও বাদশাহ জাহাঙ্গীরের আমলের যুদ্ধ বিগ্রহ ও দেশ-প্রাণতার কথা লইয়া এই ক্ষুদ্র নাটখানি রচিত। অল্প দিনের মধ্যেই এই ক্ষুদ্র নাটখানির দু'টি সংস্করণ হইয়াছে—সুখের বিষয়। ছেলেরা এই নাটখানি অভিনয় করিয়া আনন্দ ও শিক্ষা লাভ করিবে।

'হেথা সেথা' ভ্রমণ কাহিনী। শ্রীপাঁচকড়ি ঘোষ প্রণীত, ১৭২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত। মূল্য এক টাকা। লেখক সুন্দর ভাষায় তাঁহার ভ্রমণ কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন। চিত্র সংযোগে বই খানির মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে। এই ভ্রমণ কাহিনীতে ভারতের নানা দেশের পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে তথাকার লোক জনের পরিচয় ও দিবার চেষ্টা হইয়াছে এবং তাহা সরস হৃদয়গ্রাহীই হইয়াছে।

Printed by Bijoy Krishna Dass at the Lakshmibilas Press,
14, Jagannath Dutta Lane, Calcutta.

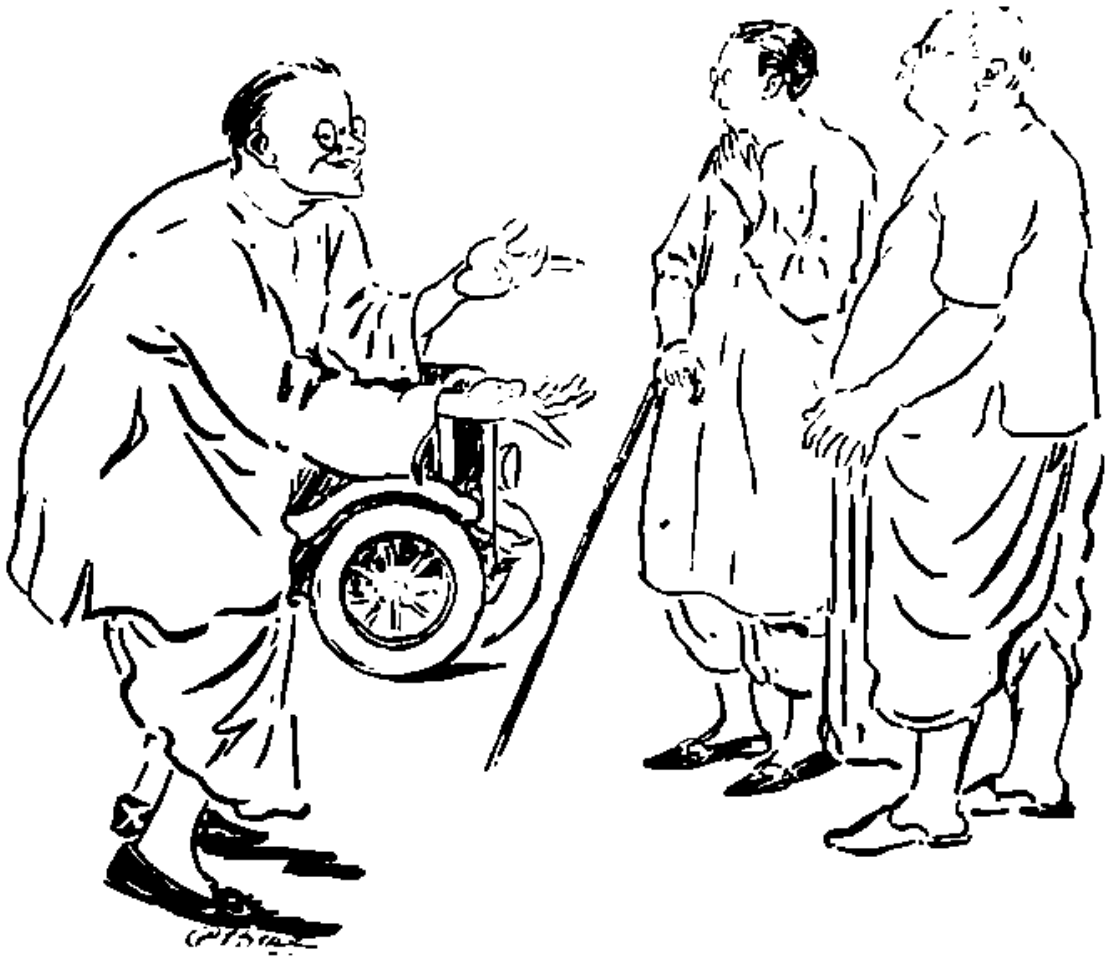

সহরের ভোট-ভিক্ষ

সচিত্র সাপ্তাহিক পত্রিকা।

বাসন্তী

২য় বর্ষ] ১৫ই অগ্রহায়ণ শনিবার ১৩৩০, ইং ১লা ডিসেম্বর [২০শ সংখ্যা।

নিবেদন

বাসন্তীর

২৩ এর সংখ্যা একটি

বিশিষ্ট সংখ্যা

(Special Issue)

হইবে।

নগদ মূল্য ।/০ পাঁচ আনা।

আগামী মাঘ মাস হইতে

বসন্তীর

প্রতি মাসের শেষে একটি করিয়া বিশিষ্ট সংখ্যা হইবে।

তাহার মূল্য হইবে নগদ ।/০

কিন্তু

বাৎসরিক ও ষাণ্মাসিক গ্রাহকগণের মূল্য

অধিক হইবে না।

বহ্নিমুখা পতঙ্গ

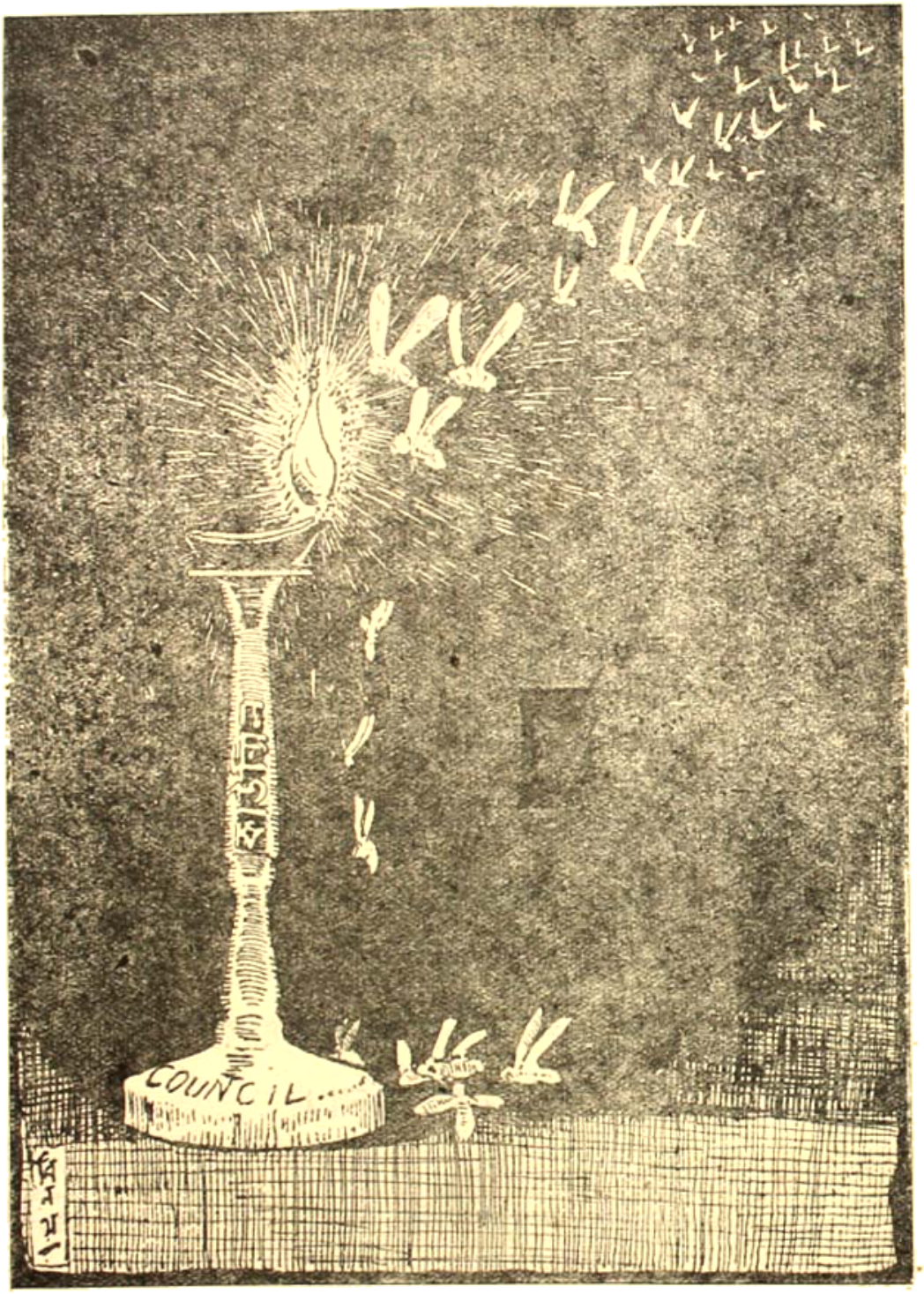

বহ্নিমুখী পতঙ্গকুল বহ্নিপানে ধায়,
মরণ জেনেও তারা ফেরেনাক' হায়!!

দেহ দিয়ে—রক্ত দিয়ে ক্ষেতে কমল বোনা,
নয়তো কাঁকি—ও যে মোদের পরিশ্রমের সোনা !
তবু আমার পেটের ক্ষুধা ক্ষিপ্ত হয়েই আছে,
অনাহারে মরছে ছেলে—মরছে কোলের কাছে,
মা মরেছে—মরছে মেয়ে—মিলিয়ে গেছে প্রিয়া,
বসে আছি আমি তাদের শ্মশান আগুলিয়া।
আমার সোনা—তারপরে মোর নেইকো অধিকার—
সাগর পারের রেলু জাহাজে সমস্ত সাবাড় !

বাস্তহারা নারীর প্রতি।

জনসেবকের সৌজন্যে

বাসন্তী—

শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ মজুমদারের সৌজন্যে

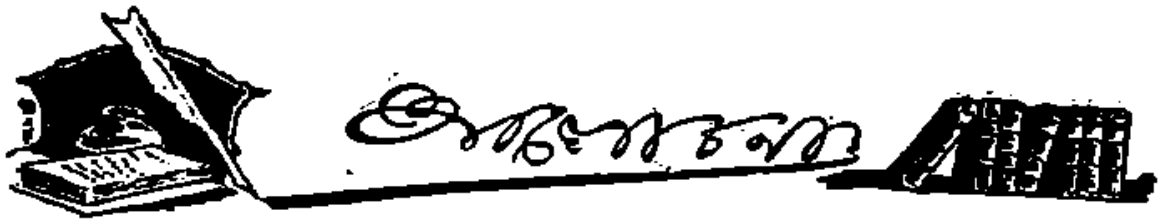

দেশে উৎসাহ অবসাদ, উত্তেজনা ঘুমন্তভাব অনবরত আসিতেছে যাইতেছে। উৎসাহের সময় দেশবাসী এক ভাবে প্রমত্ত হইয়া ছুটিতেছে আবার অবসাদের সময় নিরাশ চিত্তে বসিয়া আকাশ পাতাল ভাবিতেছে আর ঝিমাইতেছে। ভাবের মুখে, উৎসাহের স্রোতে দেশবাসীর কাছে আজ যাহা বড় ভাল বলিয়া মনে হইল উৎসাহের অবসানে আবার তাহাই অতি অপ্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচিত হইতেছে। এই ভাব ও অভাবের মধ্য দিয়া দেশবাসী ক্রমে জীবন পথে অগ্রসর হইয়া যাইতেছে। দেশবাসী যে ভাবে চলিতেছে এই ভাবে আরও কিছু-কাল চলিলে তাহাদের আর চলিবার সামর্থ্য মোটেই থাকিবে কিনা তাহাও সন্দেহের বিষয়। মানুষের এবং অন্যান্য সকল প্রাণীরই জীবনে অগ্রসর হইয়া যাওয়াই নাকি অপরিহার্য্য নীতি। এই নীতি বশেই সকলে ছুটিয়া চলিয়াছে। কিন্তু জগতের জন সমাজের অবস্থা বিচারে দেখা যায় জীবন পথে চলার মধ্যেই কেহ উন্নতির স্তরে ক্রমশঃ উঠিতেছে কেহ বা ধ্বংসের মধ্যে বিলয় হইয়া যাইতেছে। আমাদের এই দেশবাসী যে ভাবে জীবন পথে চলিতেছে তাহাতে এ ভাবে চলিলে তাহার উন্নতির আশা দুরাশা—চলার মধ্যপথেই অচল হইয়া ধ্বংসের মধ্যে ডুবিয়া যাইতে হইবে। জাতিকে, দেশকে এই ধ্বংস হইতে বাঁচাইবার জন্যই আজ দেশে বার বার উৎসাহ—আশা ভঙ্গে অবসাদ আসিতেছে। কিন্তু এই উৎসাহ ও অবসাদের ধাক্কা সহিবার মত জীবনী শক্তি আর দেশবাসীর কতদিন থাকিবে তাহাও দেখিতে হইবে।

• • • •

দেশে উৎসাহ উত্তেজনা অবশ্যই চাই। অবসাদ, ঘুমন্ত ভাব, মৃতের মত সব সহিয়া পড়িয়া থাকিয়া জীবন অন্ত করিয়া দেওয়া কোন মানুষেরই কাম্য হইতে পারে না। কিন্তু উৎসাহ উত্তেজনা মানুষের জীবনে আনিবার যে প্রধান রস, যে রস উৎস হইতে জীবনে সঞ্জীবনী প্রবাহ আসে তাহারই একান্ত অভাব যদি কোন দেশে হয় তবে সাময়িক বাহ্য উত্তেজনা উৎসাহ কতদিন মানুষের জীবনকে মাতাইয়া রাখিতে পারে? দেশবাসীর খাইবার সংস্থান, পরিবার সংস্থান প্রথমে না করিতে পারিলে, আপনার অভাব আপনি পূরণের ব্যবস্থা না করিতে পারিলে দেশের উপর অপমানাহত ক্ষুব্ধ মনুষ্যত্বের মত তেজ বেগই প্রবাহিত হইয়া যাক্ না কেন অভাবের তাড়নায় তাহা অতি শীঘ্রই আবার প্রশমিত হইয়া যায়। এই দেশে ইহা আমরা নানা ভাবে বার বারই প্রত্যক্ষ করিতেছি।

• • • •

উৎসাহের তীব্র মাদকতা দেশে আনিবারও যেমন প্রয়োজন আছে আবার সেই উৎসাহ জাতীয় জীবনে চিরস্থির কার্য্যকরী করিয়া রাখিবার জন্য দেশ-বাসীর বাঁচিবার উপায় গঠন-মূলক কার্য্যকে অব্যাহত রাখিবারও তেমনি প্রয়োজন আছে আপনাদের বাঁচিবার ব্যবস্থা আগে না করিয়া শুধু উৎসাহের মুখে ইন্ধন যোগাইলে সেই উৎসাহই পরে অবসাদে পরিণত হয়।

• • •

কি উপায়ে দেশে খাইবার ও পরিবার সংস্থান হইতে পারে কি ভাবে দেশ এই দুঃসময়ে আত্মরক্ষার চেষ্টা করিতে পারে তাহার বিধান দেশবাসী পাইয়াছিল। কিন্তু গঠন কার্য্যে যে শ্রম, ধীরতা ও কষ্ট সহিষ্ণুতার প্রয়োজন তাহা দেশবাসী করিতে বসিয়াও দেখাইতে পারিতেছে না। আজ দেশে আবার বিদেশী পণ্য বর্জ্জনের

প্রস্তাব আসিয়াছে—এ প্রস্তাব পূর্ব্বেও আসিয়াছিল। কিন্তু সব বঞ্চিত হইয়া দেশবাসী সন্ন্যাসী থাকিয়া পারিবে না। তাই অন্ততঃ মোটা ভাত, মোটা কাপড় পাইবার পন্থা যাহাতে তাহাদের বজায় থাকে সে ব্যবস্থা আজ তাহাদেরই করিতে হইবে। এই ব্যবস্থায় খুব উৎসাহী হইয়া এই কার্য্য সাধন করিতে না পারিলে ঘরে ও বাহিরে কোথাও দেশবাসীর শান্তি ও সম্মান মিলিবে না। বাহ্য উৎসাহ ক্রমেই নিবিয়া যাইবে। উৎসাহের মূল যাহা তাহাই আগে বজায় রাখিবার আয়োজন দেশবাসীকে করিতে হইবে। মোটা ভাত মোটা কাপড় দিয়া দেশের অগণিত জনসঙ্ঘকে বাঁচাইয়া রাখিতে হইবে।

• • • •

সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মেঘনাদ সাহা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ ইস্তাফা দিয়াছেন। তিনি কৃতি অধ্যাপক। সুতরাং তাঁহার পদত্যাগে বিশ্ববিদ্যালয়ের যে বিশেষ ক্ষতি হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। তাঁহার পদত্যাগের সঠিক কারণ কি তাহা আমরা জানি না। তবে সাধারণতঃ দুইটি কারণেই অধ্যাপকেরা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করিয়া থাকেন। একটী কারণ—অন্যত্র অধিক অর্থোপার্জ্জনের সম্ভাবনা; দ্বিতীয়টি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতরকার গলদ। এই দুইএর কোনো কারণই যে বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে গৌরবের কথা নহে তাহা বলাই বাহুল্য।

• • • •

আগে অর্থের কথাই ধরা যাক। ভাল লোককে ভাল মাহিনাই দিতে হয়। মোটা মাহিনার উপর তাঁহাদের সত্যকার দাবীও আছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হয় তো বলিবেন, তাঁহার অবস্থা প্রায় 'দাল বাতি' জ্বালাইবার অবস্থায় আসিয়া হাজির হইয়াছে। সুতরাং কাহাকেও মোটা মাহিনা দেওয়া এখন আর তাহার পক্ষে সম্ভবপর নহে। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের এই যে মেউলিয়া-দেষা অবস্থা এ অবস্থার জন্য দায়ী কে? বিশ্ববিদ্যালয় যেরূপ খোলাম কুচির মত অর্থ ব্যয় করেন তাহাতে তাহার এ অবস্থা কিছু মাত্র অস্বাভাবিক নহে। নিজের পেয়ারের লোকদিগকে ভরণ পোষণ করিবার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তারা যোগ্য অযোগ্যের কোনরূপ বাছ বিচার না করিয়াই অধ্যাপকদের আসনে বসাইয়াছেন—ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংখ্যা এবং অধ্যাপকের সংখ্যা প্রায় সমান হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এইরূপে বিশ্ববিদ্যালয় প্রয়োজনাধিক অর্থ ব্যয় করাতেই তাহার অবস্থা আজ এরূপ শোচনীয়। সুতরাং অর্থাভাবের দোহাই দেখাইয়া যদি উপযুক্ত অধ্যাপকের মাহিনা তাঁহারা যোগাইতে না পারেন তবে তাহা বিশ্ববিদ্যালয়ের অযোগ্যতারই চরম নিদর্শন হইয়া দাঁড়ায়।

• • • •

বেশী অধ্যাপক থাকিলেই বিশ্ববিদ্যালয় ভাল হয় না। বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রেষ্ঠত্ব নির্ভর করে অনেকটা পরিমাণে অধ্যাপকদের যোগ্যতার উপরে। যোগ্যতা যাহাদের আছে খোশামুদী বা তৈলের সহিত সম্ভাব রাখিবার প্রয়োজন তাহাদের হয় না। কারণ তাঁহারা জানেন তাঁহাদের রুটী এখানে না হোক অন্য স্থানে মিলিবেই। কিন্তু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় অযোগ্য লোকদের দ্বারা পরিপূর্ণ হওয়ায় আত্মনির্ভরতা, তেজস্বিতা, ব্যক্তিগত স্বাধীনতার ভাব বিশ্ববিদ্যালয় হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয়না। অধিকাংশ অধ্যাপকই এখানে স্তাবকের আসন গ্রহণ করিয়া বসিয়া আছেন এই অবাস্থ্যকর আবহাওয়ার ভিতরে যাঁহারা সত্যকার মানুষ, যাঁহারা স্বাধীনচেতা তাঁহাদের পক্ষে টিকিয়া থাকা একরূপ অসম্ভব। সুতরাং এ কারণেও অনেকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত সম্পর্ক ছেদন করিতেছেন। বস্তুতঃ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এই কারণে অতি অল্পদিনের ভিতরেই অনেক গুলি যোগ্য অধ্যাপকের সাহায্য হইতে বঞ্চিতও হইয়াছেন। বিশ্ববিদ্যালয় কোনো ব্যক্তিবিশেষের সম্পত্তি নহে—তাহা সাধারণের প্রতিষ্ঠান। সুতরাং যাহারা গণের অধিকারের জন্য আজ অসহিষ্ণু হইয়া উঠিয়াছেন তাঁহাদের পক্ষে গণের এই প্রতিষ্ঠানটিকে উপেক্ষা করা যে সঙ্গত নহে বলাই বাহুল্য।

শৈবলিনী ও গোপা

[শ্রীরাখালদাস .ব্যোপাধ্যায় এম-এ,]

শৈবলিনী প্রফুল্ল পরকীয়া, অর্থাৎ—স্বামীর জীবদ্দশায় তিনি কতকগুলি কারণের জন্য উপপতি কামনা করিয়াছিলেন, উপপতিলাভের যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু কৃতকার্য্য হন নাই। শৈবলিনীকে আধুনিক পরকীয়া বলিতে পারা যায় না। যদিও তিনি গত শতাব্দীর মধ্যেই সৃষ্ট হইয়াছিলেন তথাপি যে কবি তাঁহাকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তিনি তাঁহাকে প্রাচীন পরকীয়ার আদর্শেই সৃষ্টি করিয়াছিলেন ; কারণ :-(ক) চন্দ্রশেখরের সহিত বিবাহের পূর্ব্বে প্রতাপের সহিত শৈবলিনীর প্রেম জন্মিয়াছিল। যদিও শরচ্চন্দ্র প্রমুখ লেখকগণ এখন বলেন যে, যেরূপ অবস্থায় প্রতাপের সহিত শৈবলিনীর প্রেম জন্মিয়াছিল সেরূপ অবস্থায় নরনারীর প্রেম জন্মে কিনা সে বিষয়ে আধুনিক পাঠকের সন্দেহ আছে, তথাপি কবি যখন বলিয়াছেন যে, "এইরূপে ভালবাসা জন্মিল।" তখন তর্কের খাতিরে স্বীকার করিয়া লওয়া উচিত যে, শৈবলিনীর সহিত প্রতাপের বাল্যে প্রেম জন্মিয়াছিল। সেটা Calf love, কি Heifer love, তাহার বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া যদি প্রতাপ-শৈবলিনীর বাল্যপ্রেমটা মানিয়া লওয়া যায় তাহা হইলে শৈবলিনী চরিত্র বুঝিবার অনেকটা সুবিধা হয়। বাৎস্যায়ন বলিয়াছেন :—

ইচ্ছা স্বভাবতো জাতা স্ত্রিয়ো পরিবৃংহিতা।
বুদ্ধ্যা সংশোধিতোদেগা স্থিরা সাধনশালিনী।
সিদ্ধতামাত্মনো জ্ঞাত্বা লিঙ্গাদ্যস্যাং বিবোধিতম্।
ব্যাবৃত্তিকারণোজ্জেদী নরো যোষিদেষু সিধ্যতি। ১১

অর্থাৎ—"স্বভাবতঃ যে কোন উজ্জ্বল পুরুষকে দেখিলেই স্ত্রীর ইচ্ছা আপনা হইতেই জন্মিয়া থাকে। সেই ইচ্ছাকে জিয়ার দ্বারা পরিবর্দ্ধিত করিতে হইবে। সেই বর্দ্ধিত ইচ্ছাকে আবার প্রজ্ঞা দ্বারা সংশোধিত করিয়া সম্ভোগের উপায়গুলির আদর্শে উদ্বেগের সহিত (সাঙ্কেতিক বুদ্ধি) মিলাইয়া দিতে হইবে। তাহা হইলে, সে ইচ্ছার পুরণার্থে উপায় দেখাইয়া দিলে, তখন স্থিরভাবে প্রাপ্ত সে ইচ্ছা কিছুতেই বিনাশমুখে ধাবিত হইবে না। তারপর, নিজের সিদ্ধতা। (আমি ইহার পক্ষে সিদ্ধ কিনা) এবং কামিনীর ইচ্ছাসূচক ইঙ্গিতাকার চিহ্ন সকল জানিয়া ও উহার বা অনুমান করিয়া যে রাগবর্দ্ধনাদি দ্বারা ব্যাবৃত্তিকারণের, অর্থাৎ—বাধাবিঘ্নের উচ্ছেদসাধন করিতে পারে ; সে ব্যক্তি যোষিনীগণের নিকট সিদ্ধ আখ্যায় আখ্যাত ও পরিগৃহীত হয়।"

অন্যস্থানে গোণিকাপুত্র বলিয়াছেন :—"যং কঞ্চিদুজ্জ্বলং পুরুষং দৃষ্ট্বা স্ত্রী কাময়তে। তথা পুরুষোঽপি যোষিতাম্। অপেক্ষা তু ন প্রবর্ত্তত ইতি গোণিকাপুত্রঃ।" অর্থাৎ—গোণিকাপুত্র বলেন, বর্ণ ও বেশ দ্বারা উজ্জ্বল যে কোন স্বকীয় বা পরকীয় পুরুষ দেখিয়া স্ত্রী কামনা করে। সেইরূপ আবার স্ত্রীকে দেখিয়া পুরুষও কামনা করে ; কিন্তু কোন কার্য্যের অপেক্ষায় প্রবর্ত্তিত হয় না।" তাহার পর বাৎস্যায়ন নিজেই বলিয়াছেন, "তত্র স্ত্রিয়ং প্রতিবিশেষঃ। ন স্ত্রী ধর্ম্মমধর্ম্মং চাপেক্ষতে কাময়ত এব।" অর্থাৎ—"তাহার মধ্যে স্ত্রীর কিছু বিশেষত্ব আছে। স্ত্রী ধর্ম্ম বা অধর্ম্মের অপেক্ষা রাখে না, কেবল প্রবর্ত্তিতই হয়।" এগুলি সাধারণ স্ত্রী-লক্ষণ, ইহার সত্যাসত্য সম্বন্ধে যদি কাহারো কোনরূপ সন্দেহ থাকে তিনি অনুগ্রহ করিয়া লেখকের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন।

বাল্যে প্রতাপের সহিত প্রেমাভিনয়ের পরে যখন শৈবলিনীর সহিত চন্দ্রশেখরের বিবাহ হইল তখন শৈবলিনী অতৃপ্ত বাসনার বশবর্ত্তী হইয়া নরেন্দ্র কটৈর উপলক্ষে স্বামীগৃহ ত্যাগ করিল। শৈবলিনীর অধঃপতনের কারণ :—(ক) প্রতাপের সহিত বাল্যপ্রেম, (খ) চন্দ্রশেখরের সহিত তাহার বয়সের ব্যবধান এবং (গ) প্রৌঢ় চন্দ্রশেখরের প্রাপ্তযৌবনা পত্নীর অতৃপ্ত বাসনার প্রতি ঔদাস্য। এই স্থান হইতে অপেক্ষাকৃত প্রাচীনা পরকীয়া শৈবলিনী এবং অধুনা লব্ধপ্রতিষ্ঠ ঔপন্যাসিক ডাক্তার শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের "শান্তি" নামক গ্রন্থের আধুনিক পরকীয়া "গোপার" তুলনা চলিতে পারে উভয় নায়িকার অধঃপতনের কারণগুলি মিলাইয়া দেখিলে

বুঝিতে পারা যাইবে যে, শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত প্রমুখ লেখকগণের রচনার পরশ্বলিতা পরকীয়া নায়িকার আদর্শের কতটা অবনতি হইয়াছে। শৈবলিনী ও গোপা উভয়েরই পরস্খলন হইয়াছিল, উভয়েই পতিবর্ত্তমানে স্বেচ্ছায় উপপতি গ্রহণ করিয়াছিল, উভয়েরই পরিণাম একরূপ, কেবল আদর্শের ভেদে কিঞ্চিৎ পার্থক্য ঘটিয়াছে। শৈবলিনীর অধঃপতনের কারণ পূর্ব্বেই বলিয়াছি। নরেশচন্দ্রের "শান্তি" উপন্যাসখানি বর্ত্তমান বর্ষের শ্রাবণ মাসে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে লেখকের জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে "গোপা" চরিত্রে "শৈবলিনী" চরিত্রের একটা ছায়া আসিয়া পড়িয়াছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। গোপা "হাইকোর্টের তরুণ উকীল" শুভেন্দুকুমুদ রায়ের পত্নী। তাহার উপপতি কমল প্রতিবেশী যুবা। বিবাহিত জীবনে কমল-গোপার সাক্ষাৎ হইয়াছিল, ইহার পূর্ব্বে কোন অছিলায় তাহাদিগের সাক্ষাৎ পর্য্যন্ত হয় নাই সুতরাং বঙ্কিমী আদর্শের ভালবাসা জন্মাইতে পারে নাই। কমল-গোপার প্রেমের প্রথম লক্ষণ তাহাদিগের অনুকূতি সুখ।

"গোপা তাহাকে হাত ধরিয়া উঠাইল। একটু জোর করিয়াই তাহাকে উঠাইতে হইল। সে ইহাতে বেশ একটু আনন্দ অনুভব করিল। আর যাহাকে সে টানিয়া উঠাইল, সেও এ স্পর্শ বেশ আনন্দের সঙ্গেই অনুভব করিল। এবারও দুইজনে নীরব হইয়া কেবল পরস্পরের সান্নিধ্য অনুভব করিল। তারপর ঈষৎ লজ্জিত হইয়া কমল মাটির দিকে চক্ষু নামাইল আর তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিল।" নারী lumenant না হইলে মাত্র পরপুরুষের স্পর্শে এরূপ হয় না, বিশেষতঃ আমাদের দেশের নারী, যাহারা কেবল মাতৃত্বযৌবনে বিরুদ্ধ সম্পর্ক জ্ঞান করেন তাহারা যে পুরুষ তাহাদিগকে মাতৃসম্বোধন করিতেছে তাহাদিগের স্পর্শে কামজলালসায় আত্মহারা হইয়া পড়ে না। ডাক্তার নরেশচন্দ্রের এই উক্তি হইতে বুঝিতে হইবে যে, পুত্তির বিপুল প্রেমসত্ত্বেও কোন অশ্লীল কারণে শুভেন্দু গোপার বিরাগভাজন হইয়াছিল।

জেলে গিয়া শুভেন্দুর অর্থসাহায্যে কমল গোপার সহিত পত্র বিনিময় আরম্ভ করিল। এই সকল পত্রে ক্রমশঃ রাগ বৃদ্ধ হইতে লাগিল। "কমল কখন যেন নিজের অজ্ঞাতসারে মা ডাকটা চিঠি হইতে ছাটিয়া ফেলিয়াছিল। গোপা এ পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়াছিল। ইহাতে তাহার প্রাণটা একটু কাঁপিয়া উঠিল, চিঠিটা পড়িতে হাত কাঁপিতে লাগিল, কিন্তু তার নিভৃত অন্তরে যে পুলকের কম্পন লাগিয়া গেল, সেটা সে কিছুতেই লুকাইতে পারিল না।" এই "পুলকের কম্পনটাই অনুরাগের প্রথম লক্ষণ। ক্রমে "অনেক সময় চিঠি লিখিতে বসিয়া তার বুক ঠেলিয়া এমন সব কথা হাতের ডগায় আসিত, যাহা কলম চাপিয়া গোপন করিতে হইত।" পূর্ব্ব প্রবন্ধে বলিয়াছি বারম্বার বিরংসার উত্তেজনা এই শ্রেণীর উপন্যাসের একমাত্র উপজীব্য, ডাক্তার হইলেও নরেশচন্দ্র এই বিদ্যায় শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের তুলনায় অত্যন্ত হীন। গোপার আদর্শে তাঁহার এবং তদনুপাতে পাঠকপাঠিকার বিরংসার উদ্রোতন করিতে গিয়া এই চরিত্রের সৃষ্টিকর্ত্তাকে যে সকল উপায় অবলম্বন করিতে হইয়াছে, শরৎচন্দ্রের রচনায় তাহা সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না। প্রধানস্বরূপ ভূতপূর্ব্ব উকিল, ডাক্তার নরেশচন্দ্রের "সাফাই" উল্লেখযোগ্য। "তাহারা যে সব কথাবার্ত্তা কহিত, যে সব কৌতুক করিয়া দিন রাত হাসিত, সে সব নিতান্তই অশ্লীল। নিতান্তই নীতিবিরোধী। গোপার তাহা প্রথমে খটকা অসহ্য হইয়াছিল, ছয়মাস অনবরত শুনিতে শুনিতে তাহার অলক্ষ্যে তাহা তার কাছে ঠিক সেই পরিমাণে অপরিহার্য্য হইয়া উঠিয়াছিল।" "কিন্তু স্বামীর সঙ্গে তাহার দেখা-সাক্ষাৎ হইত সপ্তাহে একবার অল্প কিছুক্ষণের জন্য, আর কমল তার কাছে নিত্যই সত্য হইয়া দেখা দিত, চিঠির ভিতর দিয়া। কাজেই তাহার অন্তরাত্মার অসাবধানতার অবসরে আবার নিত্যই তাহার চিত্ত কমলকে লইয়া অভিসার করিত।" ক্রমে ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত হইল, যেদিন কমল তাহার ও গোপার জেল হইতে পলায়নের উদ্যোগ শেষ করিয়া জেলে গোপার কক্ষে গেল তখন "স্বপ্নের ঘোরে গোপা তার হাত বাড়াইয়া কমলের কণ্ঠ জড়াইয়া ধরিল। কমল ব্যস্ত এবং কতকটা রূঢ়ভাবেই তাহাকে সেই হাত ধরিয়া জোর করিয়া টানিয়া খাড়া করাইল।"

তাহার পরে গোপা যখন স্বামী গৃহে না ফিরিয়া পশুপতি সুখভোগের আশায় কলিকাতা ত্যাগ করিল তখন তাহার স্বেচ্ছাত্যাগের সহিত শৈবলিনীর বেগ্রাম ত্যাগের অনেকটা সাদৃশ্য আছে। ঘুরঘীতে গিয়া গোপা ও কমল স্বামী-স্ত্রীর মত বাস করিতে লাগিল. "গোপাকে পত্নীরূপে সে কল্পনা করিল, তাহাতে তার রক্তের ভিতর একটা উদ্দাম নৃত্য লাগিয়া গেল।" ইহার পরে ডাক্তার নরেশচন্দ্র-অঙ্কিত কমল গোপার চিত্রে, প্রতাপ-শৈবলিনীর চরিত্রের এক সুপরিস্ফুট ছায়া আসিয়া পড়িয়াছে। "চন্দ্র-শেখরের" দ্বিতীয় খণ্ডের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে প্রতাপের অনিচ্ছায় তাহার ভৃত্য রামচরণ শৈবলিনীকে জগৎ-শেঠের গৃহে লইয়া না গিয়া যখন তাহাকে প্রতাপের মুঙ্গেরের বাসায় লইয়া আসিল তখন শৈবলিনী নিদ্রার ভাণ করিয়া শুইয়া রহিল। বাঙ্গালা সাহিত্যের অতীত যুগের সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র এই স্থানে লিখিয়াছেন।

"রামচরণ বিশ্রাম করিতে গেল। তখনও কিছু রাত্রি আছে। গৃহে—গৃহের বাহিরে নগরী—সর্ব্বত্র শব্দহীন, অন্ধকার। প্রতাপ একাকী নিঃশব্দে উপরে উঠিলেন। আপন শয়ন কক্ষাভিমুখে চলিলেন। তথায় উপনীত হইয়া দ্বার মুক্ত করিলেন—দেখিলেন, পালঙ্কে শয়ানা শৈবলিনী। রামচরণ বলিতে ভুলিয়া গিয়াছিল যে, প্রতাপের শয্যাগৃহেই সে শৈবলিনীকে রাখিয়া আসিয়াছে।

"প্রতাপ জ্বালিত প্রদীপালোকে দেখিলেন যে,শ্বেতশয্যার উপর কে নির্ম্মল প্রস্ফুটিত কুসুমরাশি ঢালিয়া রাখিয়াছে। যেন বর্ষাকালে গঙ্গার স্থির শ্বেত-বারি-বিস্তারের উপর কে প্রফুল্ল-শ্বেত-পদ্ম-রাশি, ভাসাইয়া দিয়াছে। মনোমোহিনী স্থির শোভা] দেখিয়া, প্রতাপ সহসা চক্ষু ফিরাইতে পারিলেন না। সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া, বা ইন্দ্রিয়-বশতা প্রযুক্ত যে, তাঁহার চক্ষু ফিরিল না এমন নহে—কেবল অন্যমন বশতঃ তিনি বিমুগ্ধের ন্যায় চাহিয়া রহিলেন। অনেক দিনের কথা তাঁহার মনে পড়িল—অকস্মাৎ স্মৃতিসাগর মথিত করিয়া তরঙ্গের উপর তরঙ্গ প্রহত হইতে লাগিল।

"শৈবলিনী নিদ্রা যায় নাই—চক্ষু মুদিয়া আপনার অবস্থা চিন্তা করিতে ছিলেন।"

শৈবলিনীকে দেখিয়া প্রতাপ যখন অন্যমনা হইয়া পড়িলেন তখন তাহার হাতের বন্দুকটি সাবধানে রাখা হয় নাই বলিয়া পড়িয়া গেল। সেই শব্দে শৈবলিনী চক্ষু চাহিল এবং প্রতাপকে দেখিয়া মূর্চ্ছিতা হইল। আধুনিক পরকীয়া গোপা এ অবস্থায় কি করিল?

"একবার কমল মাচানের দিকে চাহিল। ঘুমের ঘোরে গোপা তখন পাশ ফিরিয়া শুইয়াছে। তার সুসংযম বসন অনেকটা এলোমেলো হইয়া গিয়াছে,অনাবৃত হস্তপদ স্বর্ণলতার মত বিছানার উপর এলাইয়া পড়িয়াছে, স্বল্পালোকে উদ্ভাসিত মুখের উপর প্রেমের ছবি ফুটিয়া উঠিয়াছে সুগঠিত অধরোষ্ঠ ঈষৎ কম্পিত হইতেছে।

"কমল লাফাইয়া উঠিল। সুপ্ত সুন্দরীর এই অযত্ন বিস্তস্ত রূপরাশি তাহার সকল সংযমের চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া তাহাকে প্রলুব্ধ করিল। সে মাচানের পাশে গিয়া দাঁড়াইল, তার বুকের ভিতর চিপ্ চিপ্ করিয়া উঠিল।

"অনেকক্ষণ চাহিয়া চাহিয়া কমলের মাথা একদম ঘুরিয়া গেল। গোপা এখন গভীর নিদ্রায় অভিভূত। এই সুযোগে যদি সে একটি বার তাহার অপরূপ দেহ খানি মৃদু আলিঙ্গনে বাঁধিয়া ওই লোভনীয় ওষ্ঠাধরে শুধু একটি চুম্বন দেয়, তবে কি-ই বা ক্ষতি?" ● ● ●

"উজ্জ্বল আলোকে গোপার সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সুপরিস্ফুট হইয়া উঠিল। তাহার রূপের মহিমা ফুটিয়া উঠিল, তাহার অর্দ্ধাবৃত দেহের রূপ কমলকে আরও ক্ষেপাইয়া তুলিল।

"গোপার শরীরের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া সে অতৃপ্ত পিপাসায় অত্যন্ত ধীরে চোরের মত গোপার ওষ্ঠাধরে একটি চুম্বন দিয়া আবার উঠিয়া বসিল, ● ● ●"

এই তো গেল কমলের কথা, গোপার কথাও তদনুরূপ —সে মূর্চ্ছিতা হইল না বা শৈবলিনীর মত কমলকে Cross Examination করিতে আরম্ভ করিল না।

"কমল লণ্ঠনের আলো কমায় নাই। তার তীব্র আলোক কমলের সুন্দর উদার হাস্যবিমণ্ডিত মুখের উপর পড়িয়াছিল। গোপা একাগ্রচিত্তে সেই মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। চাহিয়া চাহিয়া তার মনটা

কেপিয়া উঠিল। চন্দ্রমুখীর মুখে শোনা অনেক কুৎসিত কাহিনী তাহার মনে হইল। চন্দ্রমুখীর অপূর্ব্ব নীতি শিক্ষাই তার মনে একমাত্র সত্য বলিয়া প্রতিভাত হইতে লাগিল। গভীর রাত্রির নিস্তব্ধতা ও জনশূন্যতা তাহাকে প্রলুব্ধ করিল। সেই নালীর ভিতরকার এক রাত্রীর কথা স্মরণ হইয়া তাহার বুকের ভিতর ক্ষুধের নৃত্য লাগিয়া গেল।

"অনেকক্ষণ পড়িয়া থাকিয়া সে উঠিল। প্রথমে সে একটা বালিশ লইয়া যত্নের সহিত তাহা কমলের মাথার তলায় চালাইয়া দিল, তার পর তাহার পাশে বসিয়া তাহার বুকের উপর হাত দিয়া আবিষ্টভাবে কমলের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তার মনে একটা মস্ত আকাঙ্ক্ষা হইল, ওই ওষ্ঠাধর ওই গণ্ড, ওই কোমল পদ্মরাজি চুম্বনে ভাসাইয়া দিতে, কিন্তু একটা অজ্ঞাত আশঙ্কায় সে পারিল না। তারপর কমলের বুকের ভিতর আলগোছে মাথা রাখিয়া সে কেবল নিবিড় স্পর্শসুখ অনুভব করিতে লাগিল।

"ঘুমের ঘোরে কমল গোপার মাথাটা সরাইয়া দিয়া পাশ ফিরিয়া শুইল। অপমানে, লজ্জায়, ঘৃণায় গোপার মাথার ভিতর আগুন জ্বলিয়া উঠিল। কমলের ঘুমটাকে গোপা ভাণ বলিয়া মনে করিল।"

"শান্তির কবি, পথপ্রদর্শক শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় অনুকরণে এই স্থানে পাঠক পাঠিকার মনে রিরংসার উদ্রোতন করিয়া গোপাকে সরাইয়া লইয়া গিয়াছেন। "ইহার পর যে কমলের কাছে মুখ দেখান একেবারেই অসম্ভব।" কমলও নিশ্চয় তার মত পাপিষ্ঠাকে বিনা বিচারে পরিত্যাগ করিবে। এখন উপায়?

"তাড়াতাড়ি সে বিছানা হইতে উঠিয়া দাঁড়াইল। তার চারিদিক শূন্য বোধ হইল, মাথা বোঁ-বোঁ করিয়া ঘুরিতে লাগিল। অবশেষে সে ধপ করিয়া মাটিতে বসিয়া পড়িল।" রিরংসার উদ্রোতন আধুনিক সাহিত্যের ধর্ম, সুতরাং ডাক্তার নরেশচন্দ্র গোপাকে কণ্ঠতীর বশীভূতা করিয়া যথাসময়ে উত্তেজিত করিয়া তাহাকে তাহার উপপতির নিকটে লইয়া গিয়াছেন।

"অনেকক্ষণ সে বিছানার উপর বসিয়া রহিল। তারপর তার মনে হইল যে, শিলমুরটা তো যথাস্থানে রাখা হয় নাই। এই অজুহাত পাইয়া যেন সে ভয়ানক তৃপ্তি বোধ করিল! দুয়ার আবার খুলিয়া সে আস্তার কমলের শয্যা পার্শ্বে গেল। এবার সে দেখিতে পাইল যে, একরাশ লম্বা লম্বা চুল আসিয়া কমলের মুখ ঢাকিয়া পড়িয়াছে। সে যত্নের সহিত চুল গুলি মুখ হইতে সরাইয়া পাট করিয়া দিতে লাগিল। কমলের নারীর মত কোমল অঙ্গহীন গণ্ডে হাত পড়িতেই গোপার শরীরের ভিতর একটা বিদ্যুৎ-প্রবাহ খেলিয়া গেল। সে একটু ধীরে আঙুলটা গালের উপর চাপিয়া দেখিল—কি নরম। আর একটু স্পর্শ করিল। একবার তার অধরোষ্ঠ ছুঁইয়া দেখিল—কি কোমল।

তার স্কন্ধের উপর মৃদুভাবে অঙ্গুলী চালাইয়া গেল। তার বুকের ভিতর দুরু দুরু করিতে লাগিল—তার বাহ্য জ্ঞান লোপ পাইল। সে আস্তে আস্তে সেই তক্তপোষের উপর বসিয়া পড়িল। বসিয়া সে কমলের চুলের ভিতর কপালের উপর মুখ রাখিয়া, আস্তে আস্তে হাত বুলাইতে লাগিল।

"একবার ভাবিল যদি কমল জাগিয়া ওঠে! কিন্তু সে মরিয়া হইয়া উঠিয়াছে, সে ভাবিল, ওঠে উঠুক, যা হয় হউক বিশ্ব রসাতলে যাউক। তার তখন মনে হইল না যে, এই মুহূর্ত্ত ছাড়া জগতে কিছু আছে। তার মনে হইল না যে, ইহার ভিতর কিছু ভয়ের কারণ বা লজ্জার কারণ আছে। চন্দ্রমুখীর বলা শত শত নজীর তার মনে আসিয়া গেল, যাহাতে কুলবতী স্বামী সোহাগিনী কত নারী কত গোপন প্রেম করিয়া সমাজে সতী বলিয়া কাটিয়া যাইতেছে। সত্য সত্যই যে জগতে কেহই নাই তাহা সে চন্দ্রমুখীর কাছে শুনিয়াছিল সত্য সত্যই সতীত্ব একটা বোকামী বলিয়া চন্দ্রমুখী পরিহাস করিত। এই সব এখন বেদ-বাক্যের মত সত্য বলিয়া তার মনে হইল। 'সে আত্ম-সংবরণের কোনও চেষ্টা করিল না। বরং ক্রমে সে কম্পিত হস্তে কমলকে আস্তে একটু ধাক্কা দিয়া মৃদুস্বরে ডাকিল, "কমল!

"কমল তাহাতে উঠিল না।

"গোপা তখন তাহার গায়ের উপর ঠেস দিয়া আর

একবার ধাক্কা দিয়া ডাকিল; আরও একবার ডাকিল। তার বুকের ভিতর ঢিপ ঢিপ করিতে লাগিল, কানের ভিতর ভোঁ ভোঁ শব্দ হইতে লাগিল, সে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া আবার ডাকিল, "ওগো!"

"কমল একবার চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া আবার চক্ষু মুদিল।

"কমল চক্ষু মেলিতেই গোপা একটু চকিত হইয়া উঠিয়া বসিল। তারপর সে আবার কমলের বুকের উপর পড়িয়া ডাকিল, "ওগো! কমল!"

ইহার পরে নায়ক-নায়িকা আর একবার যথারীতি বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল এবং সময় বুঝিয়া আবার একত্র হইল। এইবার গোপার কাম চরম সীমায় উপনীত হইয়াছিল।

"গোপা ঘরে আসিয়া গোপা নিজের প্রকোষ্ঠে নিজের বিছানায় যায় নাই—সে যত্ন করিয়া কমলের বিছানাটা পাট করিয়া সেই খানে পাশ বালিস জড়াইয়া শুইয়া পড়িয়াছিল। সে ঘুমাইবে বলিয়া শোয় নাই, কেবল কমলের বিছানায় একবার গড়াইবার ইচ্ছায় সে শুইয়াছিল—আর হঠাৎ ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। কমল দেখিল তাহার কাপড়-চোপড় এলোমেলো, কেশ-পাশ এলাইয়া—তার সে স্বপ্নরূপ বড় মনোহর! কমল প্রলুব্ধ হইল। আর যখন সে মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করিয়া গোপাকে ধর্মপত্নী করাই স্থির করিয়াছে, তখন সে তার লোভ সংবরণ করিবার কোনও চেষ্টা করিল না।

"গোপার তখন ঘুম ভাঙিয়াছে। ঘুম ভাঙিয়া সে অনুভব করিল কমল আসিয়াছে—সে নিশ্চয় জানিল যে কমল তাহারই দিকে চাহিয়া আছে। সে অনুভব করিল যে তার অঙ্গ অত্যধিক পরিমাণে অনাবৃত—কিন্তু সে গা ঢাকিবার কোনও চেষ্টা করিল না, ঘুমের ভাণ করিয়া পড়িয়া রহিল। তার কেমন একটা সুপ্ত আকাঙ্ক্ষা হইল যে, কমল তার অঙ্গশোভা দেখুক, তাই সে নিজেকে উত্তম রূপে আবৃত না করিয়া ঘুমের ভাণ করিয়া পড়িয়া রহিল—বুকের ভিতর ধড়াস ধড়াস করিতে লাগিল।

"কমল আসিয়া গোপার পাশে বসিল, কিছুক্ষণ পর সে গোপার দেহে হস্তার্পণ করিল, দুজনের হৃদয়েই বিদ্যুৎ প্রবাহিত হইল।

"গোপা কমলের দিকে পিছন ফিরিয়াছিল। সে দাঁত দিয়া অধর টিপিয়া পড়িয়া রহিল। তার মনে হইল কি স্পর্দ্ধা। কিন্তু সে স্পর্দ্ধার প্রতিকার করিতে ইচ্ছা হইল না। কমল ক্রমে গোপার সমস্ত অঙ্গে হাত বুলাইতে লাগিল, গোপা অধর আরও চাপিয়া ধরিল। লজ্জায় সুখে ক্রোধে তার চিত্ত টলমল করিতে লাগিল।

কমল তারপর গোপার শরীরের উপর দিয়া ঝুঁকিয়া পড়িয়া গোপার গালের উপর চুম্বন করিল—গোপার সমস্ত শরীর পুলকে আতঙ্কে কণ্টকিত হইয়া উঠিল। ০ ০ ০

"এক মুহূর্তে তার অতীত, ভবিষ্যৎ মুছিয়া গেল; কাণ্ড-জ্ঞান লোপ পাইল, তার সমস্ত অঙ্গ কাঁপিতে লাগিল। তার শুধু মনে হইল, ওই গোপা, ওই রূপের ডালি, ওকে আমার চাই—চাই—চাই। সে ক্ষিপ্তের মত গোপার উপর ঝুঁকিয়া পড়িল, গোপার দেহখানি নিবিড় আলিঙ্গনে বেষ্টন করিয়া সে তাহার পিঠের কাছে শুইয়া পড়িল।"

ইহার পরে গোপা এবং শৈবলিনী দুইজনেই পতি-গৃহেই ফিরিয়া আসিল, শৈবলিনীর প্রত্যাবর্তন যেমন স্বাভাবিক, গোপার প্রত্যাবর্তন তেমনি অস্বাভাবিক।

"শেষরাত্রে, ছিপ পশ্চাদ্ধাবিত ইংরেজদিগের অনুচর-দিগকে দূরে রাখিয়া, তীরে লাগিয়াছিল—বড় বড় নদীর তীরে নিভৃত স্থানের অভাব নাই—সেইরূপ একটি নিভৃত স্থানে ছিপ লাগাইয়াছিল। সেই সময়ে, শৈবলিনী, অলক্ষ্যে ছিপ হইতে পলাইয়াছিল। এবার শৈবলিনী অসদভিপ্রায়ে পলায়ন করে নাই। যে ভয়ে বহুমান অরণ্য হইতে অরণ্যচর জীব পলায়ন করে, শৈবলিনী সেই ভয়ে প্রতাপের সংসর্গ হইতে পলায়ন করিয়াছিল।" আর গোপা গিয়াছিল সংবাদপত্রে তাহার স্বামীর এক বিজ্ঞাপন দেখিয়া।

ইহার পরে উভয় কবি নিজ নিজ নায়িকার উপপতি গ্রহণের প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ করিয়াছেন। চন্দ্রশেখরের অনুকরণে শান্তির গুভেন্দুও এক স্বামীজির শরণাপন্ন হইয়াছে। রামানন্দ স্বামীর এই under study'টির নাম সত্যস্বরূপ। শৈবলিনী যেমন প্রাচীন পরকীয়া, রামানন্দও তেমনি প্রাচীন স্বামীজি, আধুনিক স্বামীজির

আশ্রমে "গেরুয়া কাপড় ও গেরুয়া-পরা ছোকরা চেলা ছাড়া সন্ন্যাসের আর কোনও নিদর্শন বর্ত্তমান ছিল না। বাড়ীটি প্রকাণ্ড—ইলেক্‌ট্রিক লাইট ও পাখা এবং সুন্দর আধুনিক বাগানে সজ্জিত।" এই আধুনিক স্বামীজির প্রায়শ্চিত্ত-বিধিও আধুনিক, তাহার সহিত সেকেলে রামানন্দ স্বামীজির প্রায়শ্চিত্তবিধি একেবারে মিলিবে না। আধুনিক পরকীয়া গোপা প্রাচীনা পরকীয়া শৈবলিনীর মত পাগলও হয় নাই। শুভেন্দু যেচারা গোপা ফিরিয়া আসিলে তাহাকে গৃহে স্থান দিয়াছিল বটে কিন্তু কমলের আলিঙ্গনভঙ্গপ্রবণ গোপাকে সে প্রথমেই বুকে তুলিয়া লইতে পারে নাই, ইহা যে তাহার অক্ষমনীয় অপরাধ এ কথা আধুনিক কবি নানা ছন্দে বহুবার গাহিয়াছেন কিন্তু তথাপি শুভেন্দুকে দিয়া সত্যের খাতিরে তাঁহার নিজের প্রতি এত বড় অবিচারটা করাইতে পারেন নাই। আধুনিক ব্রহ্মচর্য্য এবং প্রায়শ্চিত্ত অন্তে গোপা "যতই দিন যাইতে লাগিল, ততই সে তার চিত্ত স্বামীর নিকট হইতে সরাইয়া ভগবানে সমর্পণ করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল।" সুতরাং শুভেন্দু যখন এই স্বেচ্ছাচারিণী স্ত্রীটিকে আবার নিবিড়ভাবে আলিঙ্গন করিয়া চুম্বন করিল তখন "কলেইবলের অপবিত্র আলিঙ্গনে বদ্ধ হইয়া তাহার চুম্বনে তার সমস্ত অন্তর যেমন ঘৃণায় শিহরিয়া উঠিয়াছিল, তেমন একটা শিহরণ তাহার অজ্ঞাতসারে তার সমস্ত শরীরের ভিতর বহিয়া গেল। সে আড়ষ্টভাবে কিছুক্ষণ স্বামীর দিকে চাহিয়া রহিল। স্বামীর প্রতি যে সে অভিমান করিবে, এতটুকু প্রেমও তার অন্তরে অবশিষ্ট ছিল না।" গোপা-চরিত্রে কবি যে সংযমের অভাব দেখাইয়াছেন তাহা অস্বাভাবিক। তাঁহার যদি বেশ্যা চরিত্রের অভিজ্ঞতা থাকিত তাহা হইলে হয় তো তিনি বুঝিতে পারিতেন যে, এই জাতীয় অসংযম বারবণিতা সুলভ কিন্তু সযত্নলালিত কুলস্ত্রীতে অসম্ভব। অসংযমের পরে দুঃসংযমের "চন্দ্রশেখর" সাহিত্যে অমরত্ব লাভ করিয়াছে। "দেবদাসের" পার্ব্বতী চিরসংযমের জন্য দেবদুর্লভ চিত্রে পরিণত হইয়াছে এবং সেই সংযমের অভাবে "শান্তির" গোপা অসম্ভব রাক্ষসী-চিত্ররূপে প্রতিভাত হইতেছে। তবে গ্রন্থখানি সম্পূর্ণরূপে সমযোপযোগী, ইহা পাঠ করিলে তরুণ-তরুণীর বিবাহের উদ্যোক্তন হইয়া থাকে, সে হিসাবে ইহা গোপনে প্রচারিত "হরিদাসের গুপ্তকথা" প্রমুখ আখ্যায়িকা সমূহের অগ্রণী। কাব্যের নাম দিয়া কবি কেমন করিয়া পরিণত বয়সে আত্মবোধ হারাইতে পারেন, নরেশচন্দ্রের "শান্তি"ই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। সহস্র বর্ষ পূর্ব্বে গৌড়ীয় ভাস্কর আদর্শ সুন্দর দেবপ্রতিমা গঠনে অকৃতকার্য্য হইলে বলিত, "দেবতা গড়িতে বানর গড়িয়াছি;" আধুনিক বঙ্গীয় সাহিত্যে লোকে স্বীকার না করিলেও এই জাতীয় দৃষ্টান্ত নিতান্ত বিরল নহে।

রসিক ও জ্ঞানী

[শ্রীসরসীবালা বসু]

মিছরীর খণ্ড শিশু যায় মনোসুখে
সুধারসে তৃপ্ত তার মন,
জ্ঞানী বুঝাইছে তায়—কেমনে প্রস্তুত,
জ্ঞান কিছু উৎপত্তি কারণ?
অবোধ বালক শুধু ক্যাল্-ক্যাল্ চায়,
না জেনেও রস বোধ বাধা নাহি পায়।

শেষ পথ

[শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী]

১

দত্ত গৃহিণীর বাড়ীতে তাসের আড্ডাটা সেদিন বেশ জমিয়া উঠিয়াছিল। রবিবার ভিন্ন অন্যান্য দিনে পাশাপাশি বাড়ীগুলির কর্ত্তারা যখন আফিসে কলম পিষিতে যাইতেন, তখন পাড়ার অবসর প্রাপ্ত স্ত্রীমহলের মনোভাব আদান প্রদানের ও সময় কাটাইবার একমাত্র স্থান ছিল এই তাসের আড্ডাটী। ক্ষুদ্র সহরে অথবা পল্লীগ্রামে এরূপ স্বাধীনতা প্রাপ্ত ছোটখাট স্ত্রীসভাগুলিতে সাধারণতঃ পরচর্চ্চা, পরকুৎসা প্রভৃতি যে সমস্ত গুরুতর বিষয় আলোচিত হইয়া থাকে, এক্ষেত্রেও অবশ্য তাহার কোন ব্যতিক্রম হইত না।

তাস খেলিতে বসিয়াছিলেন চারিজন। কিন্তু তাহাদিগকে সময়োপযোগী উপদেশ দিতে এবং কোনও গভীর গবেষণাপূর্ণ মন্তব্য উপস্থাপিত হইলে তাহার পরিশোধন করিতে যে আরও অনেকে উপস্থিত ছিলেন, তাহা বলাই বাহুল্য। পাড়ায় ক'টী বিবাহযোগ্যা কন্যা আছে, ক'জন অরক্ষণীয়া, কাহার কিরূপ সৌন্দর্য্য, কাহাদের বিবাহ আসন্ন এবং সম্প্রতি তাহাদের মধ্যে কাহার কিরূপ অলঙ্কার নির্ম্মিত হইয়াছে প্রভৃতি বিষয়ে গুরুতর সমালোচনা পূর্ণ স্বাধীন মত ব্যক্ত করিতে করিতে মিত্র গৃহিণী হঠাৎ প্রশ্ন করিলেন, "হ্যাঁ, দিদি। তোমাদের সুষমার বে'র কি হ'চ্ছে গা?"

দত্তগৃহিণী একখানা চিড়িতনের ১০এর উপর হরতনের টেক্কা তুরুপ করিয়া 'পঞ্চাশ কাবার' দিতে যাইতেছিলেন, তাহার হাতের তাস হাতেই রহিয়া গেল, প্রশ্নকারিণীর দিকে সবিস্ময়ে চাহিয়া তিনি বলিলেন "ওমা! সেকি গো! আমাদের কি রকম?

ঘোষপত্নী বিজ্ঞতার হাসি হাসিয়া সম্বোধন করিলেন "তুমি হালালে দেখছি মিত্তির বৌ! ওরা যে জেন্ন।"

মিত্রগৃহিণী অপ্রস্তুত হইয়া বলিলেন—ওঃ। তা বটে—তাবটে! আমারই ভুল—তা' বে'র কি কচ্ছে জানো?"

পঞ্চাশ কাবার দিয়া দত্তগৃহিণী তাচ্ছিল্যের সহিত বলিলেন "আমি কি ক'রে জান্‌বো ভাই। যা করে করুক্ গে। কাজ কি ওসবের ভেতর থেকে?"

বাঁড়ুয্যে বৌ একটু সরিয়া আসিয়া বলিলেন—"সেকি গা। মেয়ের বে' দেবে না নাকি?"

মিত্রগৃহিণী বলিলেন, "বয়সও তো কম হয় নি, দিদি তালগাছ হ'য়ে উঠেছে যে! ১৮য় কাঁচে নয় নিশ্চয়ই; কি বল দিদি?"

দত্তগৃহিণী সবিস্ময়ে চক্ষু দুইটী কপালে তুলিয়া কহিলেন ১৮! পুরোপুরি বল বরং! সেইতো বেবার ৬ বছরের মেয়েটাকে নিয়ে বড়বৌ বাপের বাড়ী থেকে এল, আমার ভুষুম তখন পেটে; ভুষুম এই অঘ্রাণে চোদ্দয় পা দিয়েছে তো! তাহ'লে ১৪ আর ৬এ এককুড়ি হ'ল কিনা ঠিক?"

বাঁড়ুয্যে বউ একটু মুরুব্বি চালে বলিলেন "কিন্তু রাগই কর আর যাই কর দিদি, আমি স্পষ্ট কথা ব'লবো ভাই। তোমারও একটু খোঁজ টোঁজ ক'রে দেখা উচিত ভাই, সত্ত হ'লেও আপনা জন্‌তো বটেই! কি বল বৌ?"

মিত্রগৃহিণী মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "হাঁ—তাতো নেহ্য কথা, নৈলে পাড়ার লোকেও নিন্দে ক'রবে যে!"

দত্ত গৃহিণী বলিলেন "তা' আর তোমরা—কি ব'লবে ভাই, অদিষ্টের দোষ। ক'রে ক'র্ম্মেও নাম নেই! চেষ্টার কি আর কোন কসুর ক'রেচি। এইতো সেদিন ৬ বিমি ঘটকীকে ৫৲ টাকা দিলুম, কিন্তু দিলে হবে কি? মেয়েটা কি মানুষ? সম্বন্ধ আসে আর ফিরে যায়।"

রজুমদার বধূ অন্য একটা মধুর আলোচনায় ব্যাপৃতা

ছিলেন, কথাটা কাণে যাইতেই তিনি অর্দ্ধ সমাপ্ত প্রসঙ্গটা চাপা দিয়া অধৈর্য্য কৌতূহলে নিকটে আসিয়া বলিলেন, "কি রকম! কি রকম! কথাটা কি দিদি?" তাহার সঙ্গে সঙ্গে আরও দুই চারিজন আসিয়া আসর জমকাইয়া বসিলেন; সকলের সপ্রশ্ন দৃষ্টির পানে চাহিয়া মজুমদার গৃহিণী বলিলেন, "কাউকে না বলিস্ তো বলি, দরকার কি ভাই আমাদের পরের কথায় থেকে?"

মজুমদার গৃহিণী বলিলেন, "তা আর বোল্‌তে! সেকি আর বল্‌বার কথা?" ঘোষপত্নী বলিলেন, "কাকে আবার বোল্‌তে যাব? ছিঃ!"

বসুজায়া বলিলেন, "ঈশ্বর যেন অমন মন না দেন ভাই, পরের নিন্দে! রামঃ।"

মজুমদার গৃহিণী বলিলেন, "কথাটা কি জানিস্? এই যে মেয়েটা দিদি হ'য়ে উঠেছে, যে দিচ্ছে না; কিন্তু কথাতো আর চাপা থাকে না ছাই উড়ে আগুন বেরুবেই।"

মিত্রজায়া বলিলেন, "ব্যাপারটা কি দিদি?"

মজুমদার গৃহিণী বলিতে লাগিলেন, "এই দেখ্‌না কেন, আমিতো আর পর ভাবিনে; ভাবলুম, আপনা লোক, দেখি—যদি কিছু কোত্তে পারি; অনেক ভেবে আমার মামাতো ভাইপোর সাথে যে ঠিক কোল্লুম, বড়বৌ রাজি হোলোনা। বেশতো পছন্দ না হয়, না-ই হ'লি; কিন্তু তারপর আরো কত সম্বন্ধ এলো গেল তো? কোনটাতেই মন উঠলো না। মানে, মতলবখানা যে না দেয়া।"

একটু থামিয়া বলিলেন, "কথাটা কি জানিস্? ঐ যে কোলকাতা থেকে একটা সুন্দর ছোঁড়া—কবী না-কি নাম—হামেসাই আস্‌ছে, ছোঁড়াটার স্বভাব চ'ত্তির নাকি ভাল নয় শুনেছি; তারি সঙ্গে সুষমার আর কি! এত দিন চল্‌ছে কি ক'রে? সেই ছোঁড়ার পয়সাতেই তো। সেকি আর অমনি অমনি দিচ্ছে?"

কিছুক্ষণ নীরবতার পর মিত্রগৃহিণী বলিলেন, "ক'দিন আগে ছোঁড়াটা কি ও বাড়ী এসেছিল দিদি?"

মজুমদার গৃহিণী বলিলেন, "সেদিন রাত্তিরে এসেছিল বটে,—কীনা বল্‌তো?"

"ছঃ—তুমি আপনা লোক, কি ভাববে,—তাই বলিনি দিদি। আমিও একদিন দেখেছি।"

মজুমদার গৃহিণী ব্যস্ত হইয়া বলিলেন "কি? কি দেখেছিস্ লো?"

"আমি সেদিন ছাতে উঠেছিলুম; আমাদের ছাত থেকে ওদের ছাত দেখা যায় কিনা, দেখলুম, ছুঁড়িটা সেই ছোঁড়ার হাত ধ'রে ছাতে বেড়াচ্ছে। আমি তত্তটা লক্ষ্য কোল্লুম না, ভাবলুম আর কিছু না।"

ঘোষজায়া বলিলেন, "আমিও কিছু কিছু শুনেছিলুম; কিন্তু ব্যাপারটা যে এতদূর গড়িয়েছে——

হঠাৎ ঝার ঠেলিয়া ঘরের মধ্যে আসিল পাংশুমুখী সুষমা। মুহূর্ত্তে কক্ষটা স্তব্ধ হইয়া গেল; সকলের কৌতূহলদৃষ্টি সেই পঞ্চদশ বর্ষীয়া বালিকার উপর পতিত হইল।

সুষমা ধীরে ধীরে নিকটে আসিয়া নতমুখে বলিল, "কাকীমা! মার বড্ড অসুখ।"

মজুমদার গৃহিণী বিস্ফারিত স্বরে বলিলেন, "তা আমাকে কি কোর্‌তে হবে?"

মজুমদার বধূ মৃদু মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "কেন সে ছোঁড়াটা আসে নি?"

ক্রোধে লজ্জায় সুষমার মুখখানা রাঙ্গা হইয়া উঠিল। মজুমদার বধূর দিকে নিমেষমাত্র চাহিয়া পুনরায় আপ্লুত চক্ষে সে বলিল, "আমি কি কোর্‌বো কিছুই বুঝতে পাচ্ছিনে মে কাকী মা! তুমি যদি কাকাকে একবার—"

বাধা দিয়া মজুমদার গৃহিণী বলিলেন, "তাতো বটেই লো! অসময়ে কাকাকে চাই; আর সময়কালে কাকা একটা মনিষ্যিই নয়, তার কথা কথাই নয়, সব সেই ছোঁড়া। কেন তোর সেই ডাক্তারবাবুকে ডাকগে যা না?"

সুষমা একমুহূর্ত্ত দাঁড়াইয়া রহিল। দুঃখে, ক্রোধে, অপমানে তাহার দুই চক্ষু ফাটিয়া জল বাহির হইবার উপক্রম হইল; কিন্তু সে দৃঢ়চিত্তে আপনাকে সংযত করিয়া লইয়া ধীরপাদবিক্ষেপে যে পথে আসিয়াছিল সেই পথেই চলিয়া গেল।

২

যাহার প্রসঙ্গ আজিকার দুইজনার প্রধান আলোচ্য বিষয়ে পরিণত হইয়াছিল, সেই সুষমা মজুমদার গৃহিণীরই ভাতৃ-কন্যা। রমেশবাবু ও পরেশবাবু দুই ভ্রাতা মাতাপিতাকে সুখী করিবার জন্য বাল্যকালেই বিবাহ করিয়াছিলেন।

সেই মাতাপিতা যখন সাধ্যমত হইতে বিশেষ কোন সুযোগ না দিয়া কয়েকদিন অগ্রপশ্চাতে উভয়েই পরলোক গমন করিলেন, তখন শোকসন্তপ্তচিত্ত দুই অকৃতী ভ্রাতা হতাশ হইয়া দেখিলেন, পিতার পরিত্যক্ত সম্পত্তির মধ্যে অবশিষ্ট আছে শুধু বসতবাটীখানি, আর নিজেদের অস্থাবর সম্পত্তি দুইটী যুবতী ভার্য্যা। বধূদের পিত্রালয়ে পাঠাইয়া দুই ভ্রাতা আসবাবপত্রসমেত বাটীটি বিক্রয় করিয়া ফেলিলেন; এবং নগদ যাহা কিছু পাইলেন, লইয়া কলিকাতায় চলিয়া আসিলেন। তাহাদের অক্লান্ত চেষ্টায় কিছুদিনের মধ্যেই কাজ জুটিয়া গেল। পরেশবাবু কলিকাতার নিকটে খালিতে একটা চাকুরী পাইয়া রহিয়া গেলেন, এবং রমেশবাবু একটা অল্প বেতনের মাষ্টারি লইয়া এলাহাবাদ চলিয়া গেলেন।

কয়েক বৎসরের মধ্যেই উভয় ভ্রাতা কিঞ্চিৎ আর্থিক উন্নতি করিয়া পত্নীদিগকে লইয়া স্ব স্ব কর্ম্মস্থলে ফিরিয়া আসিলেন; সে প্রায় ১৬ বৎসর পূর্ব্বের কথা। ভাগ্য ক্রমে সুপ্রসন্ন হইল। রমেশবাবু একটা কারবারে প্রচুর অর্থলাভ করিতে লাগিলেন; পরেশবাবুও ক্রমোন্নতি করিয়া 'ফিসারিয়েটের' বড়বাবু হইলেন। দুই ভ্রাতার মধ্যে সদ্ভাবের কোন অভাব ছিল না। কারবারের ভার ম্যানেজারের হাতে দিয়া রমেশবাবু মাঝে মাঝে সস্ত্রীক ভ্রাতার বাসায় আসিয়া থাকিতেন; পরেশবাবুও মধ্যে মধ্যে অবকাশগ্রহণ করিয়া পত্নীসহ এলাহাবাদে জ্যেষ্ঠের বাসায় বেড়াইতে যাইতেন।

সুষমার বয়স তখন ১১ বৎসর। গৃহিণী মধ্যে মধ্যে তাহার বিবাহের জন্য তাড়া দিলে রমেশবাবু হাসিয়া বলিতেন, "তুমিতো ব'লেই খালাস; কিন্তু এই বিদেশে বিভোয়ে পাত্তর পাচ্ছি কোথা বলতো? আর মেয়েটাই বা কি এমন বড় হয়েছে!" এই সময় হঠাৎ একদিন অতিরিক্ত পরিশ্রম হেতু' রমেশবাবুর হৃদ্‌রোগ দেখা দিল; অনেক চিকিৎসা সত্ত্বেও বিশেষ কোন উপশম হইল না। কাজেই রমেশবাবু একদিন স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া প্রস্তাব করিলেন, "এখানেতে কিছুই হোচ্ছে না, তার চেয়ে চল পরেশের কাছে যাওয়া যাক্। কোলকাতা কাছে, চিকিচ্ছেটাও ভাল হবে, আর তারপর ঈশ্বরের ইচ্ছের তাল হ'লে একেবারে দু-বার বে-টাও দিয়ে আসবো।"

কিন্তু বাঙ্গালীর সংসারে সাধারণতঃ যাহা দেখা যায়, এ ক্ষেত্রেও তাহাই হইল। উভয় ভ্রাতা স্বাধীনভাবে বিদেশে থাকিবার সময় বধূদ্বয়ের যথেষ্ট সদ্ভাব থাকিলেও প্রায় বৎসরখানেক একত্রবাসের ফলে সে সদ্ভাব ক্রমশঃ তরতর অসদ্ভাব ও দেখাদেখিতে পরিণত হইল; কাজেই বাধ্য হইয়া রমেশচন্দ্র পৃথক বাসা ভাড়া করিলেন। কিন্তু ভাই বলিয়া পরেশচন্দ্র জ্যেষ্ঠকে এই বিপদের সময় একেবারে ত্যাগ করিতে পারেন নাই। চিকিৎসক ও ঔষধপত্র প্রভৃতির কর্ত্তৃত্বভার পত্নীর পরামর্শে তিনি স্বইচ্ছায়ই গ্রহণ করিয়াছিলেন। ফলে, জ্যেষ্ঠের আয়ুর সঙ্গে সঙ্গে সিন্দুকটীও ক্রমশঃ শূন্য হইতে লাগিল। তবে পরেশবাবু একেবারে মনুষ্যত্ববর্জ্জিত হইয়া নিমকহারামী করেন নাই। তিনি কলিকাতা হইতে কয়েকজন বিজ্ঞ চিকিৎসক আনিয়া জ্যেষ্ঠকে দেখাইলেন, কিন্তু কোনই ফল হইল না। ঠিক এই সময়ে সংবাদ আসিল ম্যানেজারের 'আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু' এই গভীর জ্ঞানের ফলে কারবারটী ফেল হইয়া গিয়াছে। অর্থশোক ও দুশ্চিকিৎস্য রোগে জর্জ্জরিত হইয়া রমেশবাবু যখন শেষ নিশ্বাস ফেলিলেন, তখন তাহার পত্নীর দেহে একখানিও অলঙ্কার ছিল না।

স্বামীর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে দেবরও যখন সুবোধ ছেলেটীর মত আস্তে আস্তে সরিয়া দাঁড়াইলেন, তখন সদ্যবিধবা সুষমার মাতা চক্ষে অন্ধকার দেখিলেন, তাহার পিতৃকুলে এমন কেহই ছিল না, যে তাহাকে এই বিপদে এতটুকু আশ্রয় দান করিবে। কিন্তু তিনি তবুও আত্মাভিমান ক্ষুণ্ণ করিয়া দেবরের নিকট অযাচিতভাবে ভিক্ষাপ্রার্থিনী হইলেন না। সুষমার কয়েকখানি অলঙ্কার ছিল, তাহাই বিক্রয় করিয়া কোনরকমে চলিতে লাগিল। কিন্তু তাহা নিঃশেষ হইতেও অধিক দিন বিলম্ব হইল না; একবৎসর পরেই সুষমার মাতা দেখিলেন কন্যার অলঙ্কারগুলিও নিঃশেষ হইয়াছে। তিনি ভবিষ্যৎ ভাবিয়া আকুল হইলেন; শেষে বুঝি দেবরপত্নীর গৃহেই দাসীবৃত্তি করিতে হয়।

এই সময়ে হঠাৎ একদিন বিধাতার আশীর্ব্বাদের মত

একজন আসিয়া তাহাদের মাঝখানে উপস্থিত হইল, সে ফণীভূষণ তাহার বাড়ী কলিকাতা। এলাহাবাদে তাহার পিতা পাটের ব্যবসায় করিতেন। রমেশবাবু এলাহাবাদ গিয়া প্রথম প্রথম কয়েকমাস এই যুবকটীর 'প্রাইভেট টিউটর' ছিলেন; কিন্তু ফণীভূষণের স্বভাব চরিত্রে বাধ্য হইয়া তাহাকে সে চাকুরী ত্যাগ করিতে হয়। রমেশবাবু ও তাহার কারবারের পরিণাম ফণীভূষণ অনেক পূর্ব্বেই জানিতে পারিয়াছিল; তাই বহুদিন পরে কলিকাতায় আসিয়া কি জানি হঠাৎ তাহার মাষ্টার মহাশয়কে এবং তাহার পরিবারবর্গকে মনে পড়িয়া গেল।

চতুর ফণীভূষণ মুহূর্ত্তে সমস্ত বর্ত্তমানটাকে বেশ করিয়া বুঝিয়া লইয়াছিল। তাই সুষমার মাতার প্রশ্নের উত্তরে সে চটপট জবাব দিল, "মাষ্টার মশাই নেই! সেকি আর কম দুঃখের কথা কাকীমা? তুমি জাননা, আমি তার কাছে প'ড়েছি যে। তার কাছেই এসেছিলুম; তা তিনি যখন নেই, তোমাকেই ব'লতে হয়। কথাটা কি জানো কাকীমা? মাষ্টারি করবার সময় তিনি আমার কাছে অনেকগুলো টাকা রেখেছিলেন; অনেকবার তাকে ফিরিয়ে দিতে চেয়েছি, আজ নেবো কাল নেবো ক'রে জানিনি। শেষে আমিও খরচ ক'রে ফেলুম। সেই টাকাটাই দিতে এসেছিলুম কাকীমা! একবারে তো দিতে পারবোনা, তবে মাঝে মাঝে কিছু কিছু দোবো।"

মাতাপুত্রী স্বর্গ হাতে পাইলেন। এই উদার সরল যুবকটীর পানে চাহিয়া উভয়ের চক্ষে জল আসিল। ফণীভূষণ প্রথমতঃ মাঝে মাঝে এবং শেষে প্রায়ই সাক্ষাৎ করিতে অথবা ঋণ পরিশোধ করিতে আসিতে লাগিল; সুষমার মাতা তাহাকে পুত্রের ন্যায় যথেষ্ট ভালবাসিলেন, সুষমা দেবতার ন্যায় পূজা করিতে লাগিল। কাজেই কিছুদিনের মধ্যেই ফণীভূষণের এই ঋণপরিশোধের অনুহাতে সাহায্য করিবার কথা অবসন্ন হইয়াও তাহারা নীরব রহিলেন।

কিন্তু নিঃস্বার্থ পরোপকারী মানবের সংখ্যা জগতে খুবই কম। ফণীভূষণও বিনা স্বার্থে এতখানি অর্থের মায়া পরিত্যাগ করে নাই। তাহার সেই আশাপোষিত স্বার্থটা যখন সুষমার নিকট একটা কদর্য্য প্রস্তাবের মধ্য দিয়া ব্যক্ত হইয়া পড়িল, তখন সুষমার হৃদয়ের অন্তস্থলটা লজ্জায়, ঘৃণায়, ত্রাসে চম্‌কিয়া উঠিল। ধীরকণ্ঠে সে বলিল, "তোমায় আমি ভাল ব'লে জান্‌তুম ফণী দা।" ফণীভূষণ তৎক্ষণাৎ ক্ষমাপ্রার্থনা করিল, এবং তাহার শিক্ষিত বচনচাতুরীতে শীঘ্রই আপনাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিয়া লইল; কিন্তু মনের গোপন অভিসন্ধিটা পরিত্যাগ করিল না। কিন্তু এই সময় পাড়ায় হঠাৎ একটা নিন্দাবাদ উত্থিত হওয়াতে সুষমা একদিন ফণীভূষণকে সমস্ত খুলিয়া বলিল; এবং পুনরায় আসিতে নিষেধ করিয়া দিল। তাহার পর ফণীভূষণ প্রায় মাসখানেক আসে নাই বটে, সেদিন হঠাৎ আবার আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল।

৩

স্বামীর নিকট কোন গুরুতর বিষয়ের অবতারণা করিতে হইলে বাঙ্গালার কেরাণী সংসারের গৃহিণীগণ সাধারণতঃ রাত্রে করিয়া থাকেন। কারণ সন্ধ্যায় কর্ম্মক্লান্ত আফিস-ফেরৎ বাবুদের মেজাজটা যে পরিমাণে রুক্ষ থাকে এটা তাহাদের অজ্ঞাত বিষয় নহে, এবং সেই রুক্ষ মেজাজ যে আবার নৈশভোজনান্তে তাম্রকূট সেবনের সময় সম্পূর্ণ শান্ত ও সংযত ভাব ধারণ করে, তাহাও তাহাদের বিদিত বিষয়ের মধ্যে।

কাজেই ঠিক এমনি সন্ধিক্ষণে পান চিবাইতে চিবাইতে দত্তগৃহিণী শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলেন। দুই চারিটী প্রীতিমধুর সম্ভাষণ ও রসালাপের পর দত্তগৃহিণী বলিলেন, "ওগো—শুনছো? তোমাদের সেই সোহাগী আজ সোহাগ কাঁড়তে এসেছিলেন।"

একমুখ ধূম্র উদ্গীরণ করিয়া পরেশবাবু বলিলেন, "সোহাগীটা কে?"

"সেই যে গো বড়লোকের ঝি—রাজরক্তে।"

গড়্‌গড়ায় একটা টান দিয়া পরেশবাবু বলিলেন, "তার মানে?"

গৃহিণীর ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিল; ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া গলাটা মধ্যম রকম চড়াইয়া বলিলেন, "বুদ্ধিটা কি আকিলে রেখে এসেছ? না—পুড়িয়ে খেয়েছ? তোমাদের সেই সুষমারাণী গো—সুষমারাণী।"

এতক্ষণে পরেশবাবুর বোধগম্য হইল, অস্থির নিশ্বাস ফেলিয়া তিনি বলিলেন, "হুঁ—তা কি হ'য়েছে ?

নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া গৃহিণী বলিলেন, "তিনি আজ দুপুরে তোমার বাড়ীতে পায়ের ধূলা দিয়ে গেছেন।"

"বটে ! কি মনে ক'রে ?"

"বল্লেন মা-র বড্ড অসুখ, কাকা এসে পাঠিয়ে দিয়ে।"

পরেশবাবু একেবারে হৃদয়হীন লোক ছিলেন না, তাহার গড়গড়ার নলটা মুহূর্ত্তে স্তব্ধ হইয়া গেল ; মুখ তুলিয়া বলিলেন, "এঁ্যা ! অসুখ ! তাহ'লে এক্ষুনি যেতে হয় একবার !"

গৃহিণী সবিস্ময়ে বলিলেন, "যেতে হয় ! চ'লে নাকি সত্যি ?"

"তা বৈ কি।"

গৃহিণী মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "হায়রে কপাল ! এইতো বুদ্ধি। এই নিয়ে আফিসে বড়বাবুগিরি কর ?"

পরেশবাবু অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন, "কেন ?"

"এসব বুজরুকি—চালাকি। এটাও বুঝ্ছো না ? পয়সা আদায়ের ফন্দী গো—পয়সা আদায়ের ফন্দী। সেদিন সেই ছোঁড়াটা এসেছিল, রাগারাগি ক'রে চ'লে গেছে বুঝি, আর এদিকে, খরচ পত্তরও টানাটানি, কাজেই বেশ একটা ফিকির বের করা হ'য়েছে ; মা-র অসুখ, কাকাবাবু এসে দেখে যাও, অর্থাৎ কিনা টাকা যাও। তা নৈলে বুঝ্ছ না ? হঠাৎ এতখানি ভালবাসা উথ্‌লে উঠলো ?"

স্ত্রীর কাছে বারম্বার বোকা ব'নিতে পরেশবাবু মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না। মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "হুঁ—সে আমি অনেকক্ষণ বুঝেছি।"

"বুঝেছ তো ছুটে যাচ্ছিলে যে বড় ?"

পরেশবাবু তাচ্ছিল্যের হাসি হাসিয়া বলিলেন, "যাচ্ছিলুম। পাগল আর কি। তুমিও যেমন।"

কিয়ৎক্ষণ নীরবতার পর গৃহিণী চিন্তিতভাবে বলিলেন, "আর ব্যাখো গা। তুমিতো আমার কথা হেসেই উড়িয়ে দাও ; আজকে মিত্তির বৌ কি ব'লে জানো ?"

"কি ব'লে ?"

"সেদিন সে ছাতে ওদের দুজনকে বেড়াতে দেখেছে।"

"বেড়াতে !"

"হ্যাঁ—গো—হ্যাঁ ! শুধু কি তাই ? দুজন একেবারে গলাগলি চলাগলি।

পরেশবাবু বিজ্ঞতার হাসি হাসিয়া বলিলেন, সে আমি অনেক দিন থেকেই জানি।"

পরের কন্যা ভ্রাতৃজায়ার উপর কোনরূপ আন্তরিক আকর্ষণ না থাকিলেও, পরেশবাবু সুষমার সহিত রক্তের সম্বন্ধটা একেবারে নির্ম্মমভাবে বিস্মৃত হইতে পারেন নাই। সেই সরল সুন্দর মুখখানি মনে করিয়া তাহার পত্নীগত প্রাণে মাঝে মাঝে একটা স্নেহের স্পর্শ জাগিয়া উঠিত ; কিন্তু এই হাস্য ও তৎসনাকর দৌর্ব্বল্যটা পত্নীর নিকট কোনও রূপে ব্যক্ত হইতে দিতে তাহার যথেষ্ট আপত্তি ছিল। কিন্তু কয়েকদিনের মধ্যেই যখন তিনি শুনিতে পাইলেন, যে সুষমার মাতা যথার্থই ভয়ঙ্কর পীড়িতা, তখন তিনি হৃদয়কবাট আর কোনও রূপে রুদ্ধ করিয়া রাখিতে পারিলেন না ; গৃহিণীকে ডাকিয়া বলিলেন, "হ্যাগা ব্যাখ, বৌদির অসুখটা নাকি শুন্‌ছি খুবই বেশীরকম ! একবার গিয়ে দেখে এলে হ'ত না ? যাহোক্ আপনা জনতো বটে ?"

গৃহিণী তর্জ্জন করিয়া বলিলেন, "ক্যাটা মারি অমন আপনা জনের মুখে, আপনাতো কত। ঘরদের আর খই পাচ্ছে না !"

পরেশবাবু অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন, "তা—তা জানি কিন্তু তবু—তবু——"

বাধা দিয়া মুখ বাঁকাইয়া গৃহিণী বলিলেন, "বেশত ! দরদ হ'য়ে থাকে যাওনা আপনা জনের কাছে ; কে বারণ কোচ্ছে ? কিন্তু আমি বাপু আপমান হ'তে যেতে পারবো না, তা স্পষ্ট ব'লে দিচ্ছি।"

সবিস্ময়ে পরেশবাবু বলিলেন, "অপমান !"

"অপমান নয়তো কি ? সেই ক'নে ছোঁড়াটা এসে ক'ত্তিত্তি কোরছে তো ? চোখের ওপোর সে সব ছিনালি দেখতে পারবে ? আর ছোঁড়াটা যদি হঠাৎ ব'লে বসে 'বেরোও এ বাড়ী থেকে' তাহ'লে কি কোরবে শুনি ?"

সেটা এসেছে নাকি আবার ?"

গৃহিণী ঘৃণার হাসি হাসিয়া বলিলেন, "আসেনি ? তবে

রোজ মোটর ক'রে এত বড় বড় ডাক্তার আসছে কোত্থেকে? এত পয়সা পাচ্ছে কোন্ চুলোয়? সারাদিন আপিসে থাক, খবরতো রাখনা কিছু। তুমি ভাব বুঝি তারা তোমারই হা পিত্তেশ ক'রে ব'সে আছে!"

পরেশবাবু আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন, "বটে! বড় বড় ডাক্তার আস্‌ছে! কই তাতো জানতুম না! ছোঁড়াটা কবে এলো?"

গৃহিণী স্বরটা কয়েক পরদা নামাইয়া বলিলেন, কবে এলো তার আমি কি জানি? আমার কাছে খবর দিয়ে তো আসে নি; তা যার কাছে দিয়েছে সেই জানে। তবে—হ্যাঁ, পরশুদিন চোখে প'ড়লো, দেখলুম, এই পর্য্যন্ত।"

"বটে। কি ক'রে দেখলে?"

"ঐ যে গো ওই তোমাদের কি বাঁড়ুজ্জে? যোগেশ্বর না—কি ভাল নামটা? তার বৌ সেদিন দুপুরে তাস খেলার নেমন্তন্ন ক'রেছিলো কিনা, তাই গেছলুম। আস্‌বার সময় ভাবলুম বড়বৌর বাড়ী কি হ'চ্ছে না হ'চ্ছে একবার লুকিয়ে দেখে যাই; তাদের বড়ঘরের জানলাটা খোলাই ছিল, আস্তে আস্তে উঁকি মারতেই দেখলুম,——ছ্যা—ছ্যা। ঘেন্না। ঘেন্না!"

"কি—কি দেখলে গা?"

"দেখলুম ছোঁড়াছুড়ি দুটো ব'সে ফুস্‌ফাস্ ক'রে কি সব গল্প গুজব কোরছে, আর হেসে হেসে ঢ'লে প'ড়ছে। সামনে মা ব্যাটরামে শুয়ে সে জ্ঞানও নেই। রামঃ! রামঃ!"

পরেশবাবু ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া গম্ভীরভাবে বলিলেন, "হুঁ—মা-টাও বোধ হয় ঐ দলেরই।"

গৃহিণী বিজ্ঞতার হাসি হাসিয়া বলিলেন, "তা-কি আর বোঝা যাচ্ছে না? নৈলে মেয়ে কি তখন মার সাম্‌নে অমন কোত্তে সাহস পায়?"

পত্নীর এই অতিরঞ্জিত, অর্দ্ধমিথ্যা নৈশ আলোচনার ফলে, পরেশবাবুর মনে যে সামরিক বাৎসল্যটুকু জাগিয়া উঠিয়াছিল, তাহা তাচ্ছিল্যের ভাব যুগপৎ একত্র উদিত হইয়া তাহার বিবাক্ত মনটীকে আরও বিবাক্ত করিয়া দিল।

৪

জ্বরের আতিশয্যে উত্থানশক্তি রহিতা সুষমার মাতা শয্যায় পড়িয়া আকাশ পাতাল কত কি ভাবিতেছিলেন, এমন সময়ে ধীরে ধীরে মলিনমুখী সুষমা আসিয়া ডাকিল, "মা!"

আগ্রহভরা ক্ষীণস্বরে মাতা বলিলেন, "কিরে! খু-মা এয়েছিস? কই? ছোট বৌ এলো?"

ম্লানমুখে সুষমা বলিল, "না মা এলেন না।"

"এলনা! কি ব'লে? আসবেনা? হ্যাঁ মা আসবেনা ব'লে?"

সুষমার নিষ্প্রভ আঁখিযুগল জলে ভরিয়া আসিল, অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "আমায় অপমান ক'রে তাড়িয়ে দিলেন; তুমি শুধোশুধি আমায়——" সুষমা আর বলিতে পারিল না, কথাগুলি তাহার কণ্ঠে আটকাইয়া গেল।

কন্যার অপমানাহত, ক্ষুব্ধ, বিষাদমলিন মুখখানির দিকে চাহিয়া মাতা একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "তুই কি বুঝবি মা কি দুঃখে তোকে পাঠিয়েছিলুম! আমি গেলে তোর কি দশা হবে তাই ভেবে আমি নিশ্চিন্ত হ'য়ে মরতেও পারছিনে যে।"

মাতার পায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে সজল চোখে সুষমা বলিল, "অমন ক'রে অকল্যাণ ডেকে এনো না মা। ঈশ্বর রক্ষা কোরবেন; দেখো, তুমি আবার ভাল হ'য়ে উঠবে।"

মাতার শুষ্ক অধরে, একটু মৃদুহাসি খেলিয়া গেল; বলিলেন, "পাগলি! ঈশ্বর আর কি র'ক্ষে ক'রবেন রে! আমার দিন যে ফুরিয়ে এসেছে মা। আমি বেশ বুঝতে পাচ্ছি, কর্ত্তা আমায় স্বর্গ থেকে ডাকছেন। যাবার আগে তোকে যদি কারো হাতে সঁপে দিয়ে যেতে পাত্তুম!"

ব্যথিত মর্ম্মাহত স্বরে সুষমা বলিয়া উঠিল, "মা!"

"বুঝি মা তোর কষ্ট হয় খুব, আমি ছাড়া তোর ত্রিসংসারে কেউ নেই যে। যদি আমার বাপের বাড়ীও কেউ আপনাজন থাকতো। এত পাপ ক'রেও পৃথিবীতে এসেছিলুম! হা ভগবান!"

মাতার দুই চক্ষু দিয়া ঝরঝরধারে অশ্রু গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। আর সুষমা? সুষমা মাতার চরণ দুটী বক্ষে

জড়াইয়া ধরিয়া ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

কিয়ৎক্ষণ নীরবতার পর মাতাকে চিন্তান্বিত দেখিয়া সুষমা বলিল, "কি ভাবছ মা?"

"ভাবছি, ফণী যদি বামুন না হ'য়ে আমাদের স্বজাতি হ'ত।—হ্যাঁ মা সে আর আসে না কেন ব'লতে পারিস্? তাকে বড্ড দেখতে ইচ্ছে করে যে।"

ফণীভূষণের যৌবনসুলভ ক্ষণিক চাঞ্চল্য পাড়ার অধর্ম নিন্দাবাদের মৃদুগুঞ্জন, এবং তাহার পুনরাগমনে সুষমার নিষেধ প্রভৃতি ঘটনা সুষমা জননীর নিকট যথাসম্ভব গোপনে রাখিয়াছিল; কারণ সে জানিত, এগুলি শুধু তাহার মানসিক কষ্টের কারণ হইবে মাত্র।

সুষমা নতমুখে একটু ভাবিয়া বলিল, "ফণীদা আর আসবে না মা।"

"আসবে না?——তা আসবে কেন, পরের ছেলে ত? তা-ও সে যা ক'রেছে, পেটের ছেলেও অনেক সময় তা করে না মা। এর চেয়ে বেশী আর কি ক'রবে বল্। ——মা!"

"কি মা।"

"তুই তাকে একখানা চিঠি লিখে দে বরং।"

সুষমা চমকিয়া উঠিল; বস্তুতঃ সম্পূর্ণ শান্ত সংযতভাবে থাকিলেও সে সেই একদিনের কথা কিছুতেই ভুলিতে পারে নাই। সবিস্ময়ে সে বলিল, "চিঠি! কাকে? ফণীদাকে?"

"হ্যাঁ মা, যাবার আগে একবার দেখবো।"

"সে আর আসবে না মা।"

সরল বিশ্বাসভরে মাতা বলিলেন, "আসবে, নিশ্চয়ই আসবে। তুই দেখিস না, আমার অসুখ শুনলে ছুটে আসবে সে। ফণী যে আমায় মা ব'লে ডাকে মা।"

জননীর আন্তরিক অভিলাষ অবগত হইয়া সুষমা কিংকর্তব্যবিমূঢ়া হইয়া পড়িল। সে জানিত, তাহার পত্র পাইলে ফণীভূষণ আসিবেই; এবং সে আসিলে মাতার সুচিকিৎসাও নিশ্চয়ই হইবে; হয়ত তাহার স্নেহময়ী জননী এযাত্রা রক্ষা পাইলেও পাইতে পারেন। কিন্তু সেই এক অতর্কিত মুহূর্তের ক্ষুব্ধ স্মৃতিটুকু মাতার সঙ্কটাপন্ন জীবনের সন্ধিস্থলেও সুষমা বিস্মৃত হইতে পারে নাই। সেই দিনই সে জানিতে পারিয়াছিল, ফণীভূষণের চরিত্রবল কতটুকু; সেইদিনই সে জানিতে পারিয়াছিল, কোথায় তাহার স্বার্থটা লুকাইয়া থাকিয়া চক্ষুর অন্তরাল হইতে হলাহল উদ্গীরণ করিতেছে। অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া সুষমা ফণীভূষণকে সংবাদ দেওয়াই স্থির করিল; কিন্তু তৎক্ষণাৎ তাহার হৃদয়ের অন্তঃস্থল হইতে কে যেন একটা প্রবল বাধার তুফান তুলিয়া দিয়া বলিয়া উঠিল 'না—না—না।' সুষমা ভাবিল, 'থাক কাজ নেই সেই অমঙ্গলকে ডেকে এনে। মা আমার এমনি ভাল হ'য়ে উঠবে। তিনি তো সবাইকেই নিয়েছেন, আমার সংসারের একমাত্র সম্বল স্নেহময়ী মা-কেও কি তিনি টেনে নেবেন? না—না, তিনি এতদূর নিষ্ঠুর নন। আমি জ্ঞানতঃ কোন পাপই তো ক'রিনি তাঁর কাছে। তবে কেন আমায় শুধোশুধি কষ্ট দেবেন তিনি? মা আমার এমনি ভাল হ'য়ে উঠবে।' অপেক্ষাকৃত শান্ত সংযত হৃদয়ে সুষমা পুনরায় মাতার শুশ্রূষায় মনোনিবেশ করিল।

কিন্তু জননীর পীড়া যখন কিঞ্চিন্মাত্রও উপশমিত না হইয়া উত্তরোত্তর বাড়িয়াই চলিল তখন সুষমা আর স্থির থাকিতে পারিল না; আপনার ক্ষুদ্র অনিষ্টাশঙ্কায় সে চক্ষের উপর মাতার মৃত্যুর পথ উন্মুক্ত হইতে দিবে? আর মৃত্যু যদি অবশ্যম্ভাবীই হয়, তাহার অন্তিম ইচ্ছা পূর্ণ না করিয়া, একমাত্র সন্তান হইয়া সে ব্যাঘাত উৎপাদন করিবে? তাহা সে কিছুতেই পারিবে না। ঈশ্বরের উপর সুষমার অটুট বিশ্বাস টুটিয়া গেল, সে ফণীভূষণকে আসিতে লিখিল।

রান্নাঘরের বারান্দায় বসিয়া সুষমা তখন রোগিণীর জন্য সাবু তৈয়ারী করিতেছিল, এবং মনে মনে ভাবিতেছিল বোধ হয় ফণীভূষণেরই সম্ভাবিত আগমনের কথা। এমন সময়ে ধীরে ধীরে বাটীর ভিতর প্রবেশ করিয়া ফণীভূষণ ডাকিল, "সুষমা!"

সুষমা অন্যমনস্ক ছিল; ফণীভূষণের কণ্ঠস্বর কর্ণে প্রবেশ করা মাত্র সে চমকিয়া উঠিল। ত্রস্তে অসংবদ্ধ বসন সংবৃত করিয়া লইয়া, ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইল।

"আমায় ডেকেছ সুষমা?"

"হ্যাঁ ফণীদা।"

"কেন? হঠাৎ কি মনে ক'রে?"

সুষমা এক মুহূর্ত্ত ইতস্ততঃ করিল। তারপর ফণীভূষণের পা দুটী দুই বাহু দিয়া জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিয়া বলিল, "মা ম'রতে ব'সেছে, তাকে বাঁচাও ফণীদা।" দুই বিন্দু তপ্ত অশ্রু ফণীভূষণের পায়ে গড়াইয়া পড়িল। ফণীভূষণ ব্যস্ততার সহিত তাহাকে হাত ধরিয়া উঠাইয়া বলিল, "ওকি! কাঁদছ কেন? ছিঃ। কি হ'য়েছে মা-র?"

অশ্রুপূর্ণ নেত্রে সুষমা বলিল, "আজ ৭ দিন জ্বর' সকাল থেকে বিকারে দাঁড়িয়েছে।"

চিন্তাপূর্ণ ফণীভূষণ বলিল, "এসো, দেখে আসিগে মা-কে।"

৫

কিন্তু সুষমা ফণীভূষণের সকল প্রয়াস, সকল যত্ন বিফল করিয়া দিয়া সুষমার মাতা যখন একদিন অপরাহ্নে অমরধামে চলিয়া গেলেন, তখন চারিজন বিজ্ঞ, বহুদর্শী চিকিৎসকের তেজস্কর অব্যর্থ মহৌষধিগুলিও তাহাকে ধরিয়া রাখিতে পারিল না। চিত্রার্পিতের ন্যায় স্থির নিশ্চল দৃষ্টিতে সুষমা চাহিয়া দেখিল, কেমন করিয়া এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে তাহাকে সম্পূর্ণ একাকিনী অবস্থায় পরিত্যাগ করিয়া, তাহার দুঃখিনী জননীর জীবন বিহঙ্গমটী দেহপিঞ্জর শূন্য করিয়া কোন্ সুদূর গোপনরাজ্যে উড়িয়া গেল। তাহার শুষ্ক অধরপুট হইতে শোকের একটা ক্ষুদ্র বাণীও স্ফুরিত হইল না; শুধু তাহার মর্ম্মের মর্ম্মস্থল হইতে একটা প্রবল দীর্ঘ-নিশ্বাস একটা তীব্র বেদনার বার্ত্তা বহিয়া লইয়া বায়ুর সাগরে মিশিয়া গেল।

বন্ধু পরিবারের বহু বন্ধুর শেষকার্য্য অগ্নিসংস্কার করিতে লোকের অভাব হইল না; এইটুকুই পল্লীর বিশেষত্ব। পরেশবাবুই অযাচিত ভাবে আসিয়া তাহার কর্ত্তৃত্বভার গ্রহণ করিলেন। আপাদমস্তক বসনাবৃতা সুষমার মাতার মৃতদেহ লইয়া সকলে যখন শ্মশান অভিমুখে যাত্রা করিলেন, তখন সুষমাও যেন কোন এক অদৃশ্য অভিনব যন্ত্রে চালিতা হইয়া ধীরে ধীরে তাহার অনুগমন করিল। রাত্রির ঘন অন্ধকার প্রযুক্ত কেহই তাহাকে লক্ষ্য করিবার সুযোগ বা অবসর পায় নাই; শুধু লক্ষ্য করিয়াছিল একজন, সে ফণীভূষণ। ফণীভূষণের লালসাপূর্ণ তেজদৃষ্টি নিমিষের জন্যও সুষমাকে ত্যাগ করিয়া অন্য দিকে ধাবিত হয় নাই। সুষমার মাতার প্রাণরক্ষার্থে ফণীভূষণ যথেষ্ট অর্থব্যয় করিয়াছিল সে ইচ্ছা করিলে তাহার মৃত্যুর দিনটা আরও অগ্রগামী করিয়া দিতে পারিত, এবং সুষমার অনিচ্ছাসত্ত্বেও আপনার দুরভিসন্ধি চরিতার্থ করিতে পারিত, কিন্তু সে তাহা করে নাই। কারণ দুরদৃষ্টটাকে সে তখনও অতখানি পাপ করিবার মত নির্দ্দয় পাষাণ করিয়া গড়িতে পারে নাই; এবং তাহা ভিন্ন সে সুষমার মাকে যথেষ্ট ভক্তিও করিত বটে।

ধীরে ধীরে সুষমার সম্মুখে আসিয়া পথরোধ করিয়া দাঁড়াইয়া ফণীভূষণ বলিল, "একি! তুমি কোথায় যাচ্ছ সুষমা?"

এক মুহূর্ত্ত স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া সুষমা বলিল, ছেড়ে দাও ফণীদা—দেখে আসি; মা—মা-কে আমার শেষ দেখা দেখে আসি!"

"কিন্তু তোমায় এই আঁধারে একা যেতে দেবো না "তো! চল, আমিও যাচ্ছি।"

"না-না, তুমি না; আমি একাই যাবো। তুমি মা—মার সাথে এগিয়ে যাও বরং।"

তাহার সেই দৃঢ়তা ব্যঞ্জক স্বর শুনিয়া ফণীভূষণ আর একটীও বাক্যব্যয় করিতে সাহসী হইল না, দ্রুত পাদ-বিক্ষেপে সম্মুখে অগ্রসর হইয়া গেল।

সর্ব্বভুক্ অগ্নির লেলিহান জিহ্বা গুলি সুষমার মাতার মৃত দেহটাকে গ্রাস করিবার অল্প মুহূর্ত্তের মধ্যে যখন চিতার চারিদিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল, তখন একটা ক্ষুদ্র শুল্কের অন্তরাল স্থিতা সুষমার মনে হইল তাহার হৃদয়ের অন্তস্থলেও কে যেন রাবণের অবিনশ্বর চিতা জ্বালাইয়া দিয়াছে। দুই হাতে বুকটাকে চাপিয়া ধরিয়া সুষমা কাঁপিতে কাঁপিতে বসিয়া পড়িল; তাহার অধর যুগলের মধ্য হেতু ভেদ করিয়া একটী অস্ফুট কথা ফুটিয়া বাহির হইল "মা!" পরক্ষণেই আপনাকে পুনরায় সংযত করিয়া লইয়া সুষমা উঠিয়া দাঁড়াইল; কিন্তু চিতার সেই ভীষণ মূর্ত্তি তাহার দৃষ্টি আর সহ্য করিতে পারিল না। চক্ষিতে

মুখ ফিরাইয়া লইয়া নিজের সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে সে চলিতে আরম্ভ করিল।

কিন্তু কোথায় যাইবে সে? এ জগতে কি তাহার স্থান আছে? সংসারে থাকিবার মধ্যে এক বিদেষত্ব-বিহীন, পত্নীগতপ্রাণ, পত্নীর ইচ্ছায় চালিত খুল্লতাত। সেখানে তো তাহার স্থান নাই! তাঁহার জননীর সেই সঙ্কটাপন্ন অবস্থাও তো পাষাণময়ী খুল্ল-তাত-পত্নীকে টলাইতে পারে নাই! অনুগ্রহ ভিক্ষা করিতে গিয়া সে পাইয়াছে শুধু অবহেলা, বিদ্রূপ, অপমান।

সুষমার আজ সৌম্য মূর্ত্তি স্নেহময় পিতাকে মনে পড়িল; কত ভালই না বাসিতেন তিনি! সে মাতা-পিতার একমাত্র সন্তান, পিতা তাহাকে সুশিক্ষিতা করিয়াছিলেন; কিন্তু আজন্ম তাহাদের স্নেহ ভালবাসায়, সুখ-স্বচ্ছন্দে লালিতা পালিতা হইয়া সে কখনও এমন শোচনীয় পরিণামের কথা ভাবিবার অবসর পায় নাই। পূর্ব্ব জন্মে কত পাপই না জানি করিয়াছি সে। তাই পিতার মৃত্যু হইল; মাতাও তাহাকে অকূল সাগরে ভাসাইয়া অনুগমন করিলেন। হায়! পিতা যদি তাহাকে কোনরূপে পরিণীতা করিয়াও যাইতে পারিতেন! তাহা হইলে—তাহা হইলে আজ বোধ হয় তাহাকে এতটুকু আশ্রয়ের অভাবে পথে আসিয়া দাঁড়াইতে হইত না!

এইরূপ নানা বিষয়িনী চিন্তার মধ্যে নিজের অজ্ঞাত-সারে কেমন করিয়া যে সে তাহার খুল্ল-তাতের গৃহ-সমীপে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা সুষমা কোন ক্রমেই উপলব্ধি করিতে পারে নাই। দ্বারের নিকট আসিয়া তাহার চমক্ ভাঙ্গিল। সহসা সম্মুখে সর্প দেখিলে লোকে যেমন চমকিত হয়, ঠিক্ তেমনি চম্‌কিয়া সুষমা দুই পা পিছাইয়া গেল। এ কোথায় আসিয়া পড়িয়াছে সে! ফিরিবে কি? না ফিরিবে না। কাকীমার পায়ে ধরিয়া সে এই শেষবার অনুগ্রহ ভিক্ষা করিবে; তারপর যদি না দেন, তাহা হইলে? তাহা হইলে কি কি হইবে সুষমা ভাবিয়া পাইল না, ধীর অচঞ্চল পদে সে গৃহে প্রবেশ করিল।

দত্ত-গৃহিনী তখন কিঞ্চিৎ জলযোগ করিতেছিলেন। ধীরে ধীরে সুষমা আসিয়া ডাকিল, "কাকীমা!"

মুখ তুলিয়া দত্ত গৃহিনী বলিলেন, "অ-মর্—পোড়া-মুখী! কেন্ এয়েছিস্!"

"কোথায় যাবো আর?"

"চুলোয় যা-গে; বেরো অলক্ষুণে, খাবার সময় মুখ দিস্‌নে ব'লছি।"

"আমি তোমার দাসী হ'য়ে থাকবো কাকী-মা!"

"কেন? সে ছোঁড়াটা আর রাখ্‌লে না তোকে? এখানে জায়গা হবে না বাপু। ভালয় ভালয় বেরিয়ে যাও।

সুষমা কিয়ৎক্ষণ স্তম্ভিতা হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল; এই তাহার কাকী-মা! একি মানুষ না পাষাণ? ইহার নিকট কি অপরাধ করিয়াছে সে? জ্ঞাতসারে কোন অপরাধই তো করে নাই। ধীরে ধীরে সুষমা যখন আবার বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল, তখন সে প্রায় চৈতন্যহীনা; তাহার শরীরটা তখন থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতেছিল। ঠিক্ সেই সময় দ্রুতপদে কর্ণীভূষণ আসিয়া তাহার হাত খানা ধরিয়া না ফেলিলে সে বোধ হয় পড়িয়া যাইত।

সুষমার বাহু আকর্ষণ করিয়া কর্ণীভূষণ তাহাকে ধীরে ধীরে গৃহে লইয়া গেল; তারপর একটা কাঁচের গ্লাসে খানিকটা রক্তবর্ণ তরল পদার্থ ঢালিয়া আনিয়া বলিল, "এটুকু খেয়ে ফেল সুষমা!"

অর্দ্ধমুক্ত দৃষ্টিতে কর্ণী-ভূষণের মুখের পানে চাহিয়া সুষমা বলিল, "কি—ও?"

"একটা ওষুধ; খেয়ে ফেল লক্ষীটী, একটু সুস্থ বোধ কোর্‌বে'খন।" সুষমা নিরাপত্তিতে সেটুকু গলাধঃকরণ করিয়া ফেলিল।

কিয়ৎক্ষণ বিশ্রামের পর সে বিলক্ষণ সুস্থবোধ করিতে লাগিল; এই শত দুঃখ কষ্টের মধ্যে থাকিয়াও ঔষধির অমিত প্রভাবে তাহার মুখখানা যেন একটু প্রফুল্ল হইয়া উঠিল; তারপর ধীরে ধীরে সে নিদ্রার কোমল ক্রোড়ে ঢলিয়া পড়িল।

পরদিন প্রত্যুষে শয্যাত্যাগ করিয়া আসিয়া কর্ণীভূষণ ডাকিল "সুষি!"

সুষমা তখনও শয়ন করিয়া ছিল ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিয়া বলিল "কি?"

"চল তোমায় নিয়ে যাই। যাবে আমার সাথে?"

"কোথায়?"

"আমার ক্যাম্পে—আমার বাড়ী?"

সুষমা এক মুহূর্ত্ত নীরবে চিন্তা করিল, তারপর মৃদু স্বরে বলিল, "চল।"

পাঁচমিশেলী

[শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য।]

টুকরো।—মানুষের নীরোগ হৃৎপিণ্ড প্রতিদিনে ১২১৬০ বার স্পন্দিত হয়।

হিসেবে প্রকাশ বিলাতে গড়পড়তায় প্রতিবৎসরে ত্রিশজন করিয়া লোক ট্রেণের ভিতর হইতে বাহিরে পড়িয়া যায়।

রাস্তায় চুম্বনের ছড়াছড়ি সব চেয়ে বেশী প্যারিসহরে। কিন্তু সেখানকার নীতিবাগীশেরা এ প্রথায় ঘোরতর আপত্তি তুলিয়াছেন। তাঁহারা আইন করিয়া রাস্তায় প্রকাশ্য চুম্বন করার প্রথা বন্ধ করিবার চেষ্টা করিতেছেন।

হেনরি ফোর্ডের নাম আপনারা নিশ্চয়ই শুনিয়াছেন। তাঁহার কারখানায় প্রস্তুত 'ফোর্ড'কার আজকাল সকলের চেয়ে সস্তা। বর্ত্তমান কালের সব চেয়ে বড় ধনকুবেরের নাম করিতে হইলে তাঁহার নামই করিতে হয়। তাঁর প্রতি মিনিটের আয় ৬৭৫ টাকা। ব্যাপারটা হৃদয়ঙ্গম করিতে অব্যবসায়ী বাঙ্গালীর বিলক্ষণ বেগ পাইতে হইবে সন্দেহ নাই।

বেলজিয়ামের একটী স্ত্রীলোক নিজের শরীরের ভার বহিতে পড়িয়াছিল। কাজের জন্য তাঁহাকে প্রায়ই রেলগাড়ীতে যাতায়াত করিতে হয়। কিন্তু গাড়ীর বরদা তাহার শরীরের বেড়ের মাপের তুলনায় নিতান্ত ক্ষুদ্র হওয়াতে তাঁহাকে বাধ্য হইয়া মালগাড়ীতে যাইবার জন্য রেল কোম্পানির নিকট আবেদন করিতে হয়। রেল সরকার উত্তর দিয়াছেন—এরূপভাবে গাড়ীতে চলা-ফেরা করাতে যদি তাহার কোন ক্ষতি হয় সেজন্য তাঁরা দায়ী নন।

স্বচ্ছশিক্ষা।—যে মানুষ প্রাণ খুলিয়া হাসিতে পারে দুঃখকষ্টে সে শীঘ্রই কাঁদিয়া ফেলে।

দুর্দিনের আশায় বসে থাকাও যা, মেঘে মেঘে স্বপ্ন দেখাও তাই। যে সজাগ কর্ম্মী সেই দুর্দিনকে উৎসাহের সহিত এগিয়ে নিয়ে আসে।

স্ত্রীর নিকট সন্দেহ ও বিরাগভাজন হতে না চাও ত তার সামনে অন্য কোন রমণীর রূপের প্রশংসা করিও না।

ভবিষ্যৎকে জানা একটী মহৎ বিদ্যা সন্দেহ নাই। কিন্তু এটাও সত্য যে তাহাকে জানিতে চেষ্টা করা আর দুঃখ ও মনোকষ্টকে বরণ করিয়া ডাকিয়া আনা একই কথা।

"বিয়ের আগে, তুমি আর কোন রমণীকে ভালবাসতে কিনা?" এরূপ প্রশ্ন স্বামীকে করে কোন বুদ্ধিমতী মেয়েই নিজের সন্তাপের কারণ হবে না।

দুঃখীচরণ

[শ্রীকালিদাস রায় কবিশেখর]

দুঃখীচরণ চক্রবর্ত্তী
রাখেন যা কারে তক্কা?
রাজা উজীর মারেন কথার
চলেন লাহোর মক্কা।
যে খাঁটে তার কল্লা নিতে
লক্কাগিরির টেক্কা দিতে,
লক্ষ লোকের সাজ্যে সদাই—
বাজান আপন চক্কা।

ছাতা কাঁধিল, গাত্তা করে'
মুলুক জেনেন বাক্য জোরে,
বুঝ্‌তে বাকী নেইক বেবাক্
ফাঁকী এবং ফক্কা।
গাত্তা খেলে শিক্কা হবে
আক্কেলও তার জাগ্‌বে তবে
টন্‌কো লোকের টঙ্গরে চাঁদ
পাবেন কবে অক্কা।

ব্যতিক্রম

(উপন্যাস)

[শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ]

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ

সাত আটদিন বিনয়ের কোন পত্র না পাইয়া নির্ম্মলেন্দু চিন্তিত হইয়া পড়িল। বিনয়ের এবং সে যে কাজের ভার বিনয়ের উপরে সমর্পণ করিয়াছিল তাহার দুশ্চিন্তা ক্রমশঃ নির্ম্মলকে এত অভিভূত করিয়া ফেলিতেছিল যে সে ক্রমশঃ পাগলের মত হইয়া উঠিল। চিত্রবিদ্যা, গীতবাদ্য এমন কি কলেজ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া সে ক্রমশঃ বাড়ীর চারিদিকে ঘুরিতে আরম্ভ করিল। তাহার অবস্থা দেখিয়া ভীত হইয়া গৌরমোহন বাবু তাহার চিকিৎসার ব্যবস্থা করিলেন কিন্তু চিকিৎসক আসিয়া নির্ম্মলের সঙ্গে কথা কহিয়া 'রোগ কিছু নয়' বলিয়া চলিয়া গেলেন। নির্ম্মল ক্রমশঃ বাড়ী ছাড়িয়া রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিতে আরম্ভ করিল। অপর লোকের অভাবে নির্ম্মলের মাতা একদিন নলিনাক্ষকে তাহার উপর নজর রাখিতে অনুরোধ করিলেন; ফল এমন বিপরীত হইয়া দাঁড়াইল যে নির্ম্মল নিত্য সকালে উঠিয়া পালাইত এবং দ্বিপ্রহরের পূর্ব্বে ফিরিয়া আসিত না, কারণ 'রাস রসামৃত' সেবন করায় শ্রীমান্ নলিনাক্ষ কোনদিনই বেলা ৮ টার পূর্ব্বে শয্যা পরিত্যাগ করিতে পারিত না। গৌরমোহন বাবু ভীত হইয়া নির্ম্মলের নিকট লোক পাঠাইলেন, তখনও কলেজ বন্ধ হয় নাই, সুতরাং মেস্ বন্ধ হয় নাই, কিন্তু বিনয়ের মাসীর কেহ তাহার সংবাদ বলিতে পারিল না। তখন বাধ্য হইয়া নির্ম্মলের মাতা আর একদিন নলিনাক্ষকে বলিলেন, বাবা, দিন-কের দিন নিরু যেন আরও কেমনতর হ'য়ে যাচ্ছে, তুমি ত নজরে নজরে রাখ-বটে কিন্তু আমার ক্রমশঃ আরও ভয় হ'চ্ছে। কোন্ সকালে উঠে বাড়ী থেকে বেরিয়ে যায়, আর দুপুর বেলায় আসে, একটা উপায় ঠিক করতো বাছা। নলিনাক্ষ আশু অর্থাগমের উপায় দেখিয়া বলিল, "উনি তো গান বাজনা ভাল বাসেন, নাচ গানে যদি কোন রকমে ভুলিয়ে রাখতে পারা যায়—কিন্তু তা'তে কিছু খরচ পড়বে।" "কত খরচ পড়বে" "তা'কি ঠিক বলা যায় মা, কোন দিন বেশী কোন দিন কম, সেটা বড় বাবুর মেজাজের উপর নির্ভর করে। একেবারে উনপঞ্চাশ বায়ু আক্রমণ ক'রছে কিনা, রোগটা নিতান্ত শক্ত। প্রথম হরেক রকম লোক দেখিয়ে নিতে হবে, তারপর যদি সেখানে স্থায়ী ক'রতে পারি তা'হলে খরচ বেড়েই যাবে। এমন ওষুধ আমার হাতে আছে যে অমন দশটা—বড়বাবু আমি সেখানে লাট্টুর মত ঘুরিয়ে দিতে পারি। কিন্তু মা একটা কথা বলে রাখি, একথা যেন আর কেউ না শোনে, দৈব ওষুধ কিনা দু'কাণ হলেই মাহাত্ম্য কেটে যাবে।" "এখন উপস্থিত কত টাকা চাই? বাছার রোগের জন্য তুমি যত টাকা চাইবে, আমি দেব। আর বাবা, তুমি-তো আমার কাছে নির্ম্মলের চাইতে কম নও, আমি দিব্যি ক'রে ব'লছি, একথা কাউকে—কি কাউকে—বল্‌বে না।" "উপস্থিত শ'দেড়েক টাকা হ'লেই চল্‌বে।" নির্ম্মলের মাতা টাকা আনিতে চলিয়া গেলেন আর নলিনাক্ষ তাহার বিবাহিতা ধর্ম্ম পত্নীর নিকটে গিয়া সহসা উচ্ছ্বসিত প্রেমোল্লাসে ইন্দুকে কৃতজ্ঞতায় অভিভূত করিয়া দিল। সেদিন মদ্যপান না করিয়া শান্ত শিষ্ট বালকের ন্যায় নলিনাক্ষ দ্বিপ্রহরের পূর্ব্বে আহার করিয়া বাহির হইয়া গেল। অপ্রহৃষ্টা ইন্দু তুলসীমঞ্চের কাছে প্রণামের সহিত প্রচুর পরিমাণে অশ্রুনিক্ষেপ করিয়া অদৃষ্ট দেবতার কাছে তাহার ক্লিষ্ট হৃদয়ের অস্ফুট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিয়া আসিল।

সন্ধ্যার পূর্ব্বে, নলিনাক্ষ যখন ফিরিয়া আসিল, তখন গৌরমোহন তাহাকে সোজা চলিতে দেখিয়া

আশ্চর্য্য হইয়া গেল। নলিনাক্ষ ঘরে গিয়া বেশ পরিবর্ত্তন করিল, এবং সকলকে নিত্যনৈমিত্তিক অশ্রাব্য কটূক্তির পরিবর্ত্তে মিষ্ট কথা বলিয়া তুষ্ট করিল। সান্ত্বিয়া গুছিয়া নলিনাক্ষ যখন নির্ম্মলেন্দুর বসিবার ঘরে গিয়া উপস্থিত হইল, তখন তাহার শ্বেতচক্ষু, ঘৃতপাদবিক্ষেপ এবং মিষ্ট সম্ভাষণে নির্ম্মল আশ্চর্য্য হইয়া গেল। নলিনাক্ষ ঘরে ঢুকিয়াই জিজ্ঞাসা করিল "বড়দা' আজ কোথাও বেরুচ্ছ না কি?" নির্ম্মল বলিল "কোথায় আর যাবো ভাই? কিছু নেই, একটা কথা কইবার লোক পর্য্যন্ত জোটে নাই" "বড়দা, একজন গাইয়ে এসেছে, যেমন গলা তেমনি কেরামতি, চলনা শুনে আসি?" "কোথায় কন্সার্ট হচ্ছে?" "ঐ ইংরিজী ভাবগুলো মন থেকে মুছে ফেল' দেখি? যাবে ওস্তাদের কলাবতী শুনতে, কেন বীবা, কন্সার্ট নইলে কি ওস্তাদ গাইতে পারে না। আমি যার কথা বলছি সেখানে হার্ম্মোনিয়মটি পর্য্যন্ত পাবে না। সেকেলে চাল, দাদখানির মত, সারেঙ্গী আছে, এস্রাজ আছে, বীণ আছে। আমি হলফ্ করে' বলতে পারি, বড়দা; এমন মিঠে আওয়াজ তুমি কখখনো শোনো নি।" "তবে চল না, মাকে আর ইন্দুকে নিয়ে যাই?" "ইংরেজী লেখাপড়া শিখে তোমার মাথা একদম খারাপ হয়ে গিয়েছে। একি তোমাদের মিউজিকাল্ ড্রিল্‌ক্লাস, বাবা? কলাবতের মজ্‌লিস্, সেখানে দু'রকম তামাকই চলছে। সেখানে কি ভদ্রলোকের মেয়ে ছেলে নিয়ে যাওয়া চলে? বড়দা', সেখানে অন্ত মেয়ে মানুষই সাম্‌লে ছাড়িতে হয়।" "নলু, আজ ও বিদ্যি ঠাওা হবে কথা কইচ। অতদিন তোমায় দানো পায় কেন?" "অভ্যেসের দোষ, বড়দা'। পুরোনো জুতোর মত সাবেক পিরীত কি সহজে ছাড়া যায়? এখন যাবে ত উঠে পড়।" কাজের অভাব অনুভব করিয়া নির্ম্মল নলিনাক্ষের সহিত গান শুনিতে যাইতে প্রস্তুত হইল। নলিনাক্ষ তখন তাহাকে সাজাইয়া গুজাইয়া একখানা ভাড়াটিয়া গাড়ী করিয়া যাত্রা করিল। বাড়ীর লোকের হাজার অনুরোধ সত্ত্বেও ঘরের গাড়ীতে উঠিল না।

রামবাগানের মোড়ে একখানি ছোট্ট সুন্দর তিনতলা বাড়ীর সম্মুখে গাড়ীখানা যখন দাঁড়াইল, তখন বীণে সৌরীর আলাপের আওয়াজ ক্ষুব্ধ গলিটা মাতাইয়া তুলিয়াছিল, তাহা নির্ম্মলের কাণে গিয়া তাহাকে পাগল করিয়া তুলিল। সে, বাড়ীর ভিতরের অন্ধকার গলি, উঠানের আবর্জ্জনা ও দুর্গন্ধ, কিছু লক্ষ্য না করিয়া একেবারে উপরে গিয়া উপস্থিত হইল। একটী কক্ষে অনেক স্ত্রী-পুরুষ বসিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে একটী স্ত্রীলোক বীণ বাজাইতেছিল, নির্ম্মল তাহার পাশেই বসিয়া পড়িল।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

বীণের বাজনা থামিয়া গেলে নির্ম্মলের চৈতন্য হইল, কারণ এতক্ষণ সে অচেতনের মতই বসিয়া ছিল। তখন সে ঘরের চারিদিকে চাহিয়া দেখিল যে, সে যে দলে আসিয়া পড়িয়াছে সে দলে জীবনে সে কখনো মিশে নাই। তখনো সন্ধ্যা নাই, অথচ সকলের মুখেই মদের গন্ধ। ঘরের কোণে একজন একটা বড় পাথরের খলিকায় গাঁজা সাজিতেছিল, অনেকেই সিগারেট টানিতেছিল আর একজন হুঁকার নল দেওয়া একটা গড়গড়ায় তামাক খাইতেছিল। তাহার ভক্ত শিষ্য পরেশচন্দ্রের অনুকম্পায় গল্পিকার গন্ধটা তার সহিয়া গিয়াছিল কিন্তু মদের গন্ধ সে কখনো সহিতে পারিত না। ইন্দুর উপরে নলিনাক্ষের অমানুষিক অত্যাচারের সহিত মদের গন্ধটা এমন দৃঢ়ভাবে খর্জ্জুরাশ্বথের মত জড়াইয়া গিয়াছিল যে, মদের গন্ধ তাহার নাসিকায় প্রবেশ করিলেই ইন্দুর পতিপ্রেমক্লিষ্ট মুখখানি তাহার চোখের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিত। ক্রমে মদের গন্ধে সে উত্তেজিত হইয়া উঠিল তখন আর একজন দীর্ঘকায় দীর্ঘকেশ গল্পিকারজনেত্র কলাবৎ একটা তানপুরা লইয়া গান ধরিয়াছিলেন। নলিনাক্ষ ঘরের আর একটা কোণে মদের সঙ্গে সোডা মিশাইতেছিল, সে তখন সে সমাজে তরলাসবের সহিত জলীয়ের ন্যায় মিশিয়া গিয়াছিল, নির্ম্মল যে তাহাতে তৈলবিন্দুর মত ভাসিয়া বেড়াইতেছিল সে কথা বুঝিবার শক্তি তখন তাহার ছিল না। অল্পক্ষণ পরে নির্ম্মল বলিয়া উঠিল, "নলু, ঘরটা কি রকম গরম বোধ হচ্ছে!" নলিনাক্ষ জড়িতকণ্ঠে উত্তর দিল, "বড়বাবু, ওকণী এবার পূরবী ধরবেন, ওঁর গলার আওয়াজ শুনলে তুমি যদি উঠতে

পার তখন স্বচ্ছন্দে উঠে যেয়ো। তখন দেখবে যে, এই ঘর বরফের মত ঠাণ্ডা হয়ে গেছে।" নির্মল অগত্যা বসিয়া রহিল।

গায়ক গান ধরিল, তাঁহার গলার আওয়াজ সত্য সত্যই মিঠা। একটা দুইটার পরে তাঁহার গলার আওয়াজ সত্যসত্যই নির্মলকে মদের গন্ধ ভুলাইয়া দিল, যখন তাঁহার গান থামিল তখন ঘরের ভিতরে গোলমাল আরম্ভ হইয়া গিয়াছে, অনেকেই কথা কহিতেছে কিন্তু তাহার কথা কেহ শুনিতেছে কিনা তাহা কেহই দেখিতেছে না। যে কোণে গায়িকা চলিতেছিল কেবল সেই কোণে দুই-চারি জন লোক চুপ করিয়া বসিয়া ছিল। নির্মল দেখিতে পাইল নলিনাক্ষের ইঙ্গিতে একটি সুন্দরী যুবতী উঠিয়া তাহার কাছে আসিল। যুবতী সুন্দরী, কিন্তু তাহার সৌন্দর্য্যে কোমলতার অভাব ছিল, মুখের কোণে একটা অবজ্ঞার ভাব যেন তাহার চেষ্টা সত্ত্বেও ফুটিয়া উঠিতেছিল। সে যখন নির্মলের কাছে আসিয়া বসিল তখন তীব্র মদের গ তাহার মুখ হইতে বাহির হইয়া নির্মলের সঙ্গীতপ্রেম সহসা উড়াইয়া দিল। সুন্দরী নির্মলের হাত ধরিয়া বলিল, "যেখুন, নলুবাবুর মুখে শুনেছি, আপনি সুন্দর গাইতে পারেন; একটা গাইতেই হবে।" নির্মল বিরক্ত হইয়া বলিয়া উঠিল, "নলু মদের মুখে যা ইচ্ছে তাই বলে। এত ওস্তাদের মাঝখানে কি আমি গাইতে পারি?" আমি না বুঝি তাল না বুঝি সুর।" সুন্দরী ছাড়িবার পাত্রী নহে, সে নির্মলের দুই হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "তা বল্লে আমি শুনছি না, আপনি গানের সঙ্গে পায়ে তাল দিচ্ছিলেন, তা বুঝি আমি দেখিনি? গাইতেই হবে। আমি কিছুতেই শুনব না, আমার মাথার দিব্যি রইল, বুঝলেন, আমার মাথার দিব্যি।" ঘরের আর এক কোণ হইতে একজন বলিয়া উঠিল, "সোনা বাপধন, কাঁচাপাকা অনেক মাথা খেয়েছো, তোমার মত বুড়ো শালিকের মাথা কি ঐ কচি ছেলের হজম হবে?" যুবতী বক্তার দিকে কটমট করিয়া চাহিয়া রহিল, তাহার পরে মৃদু সোহাগের অভিনয় করিয়া নির্মলের কাঁধে হাত দিয়া বলিল, "ওদের কথা শুনবেন না, ওরা ভারী দুষ্টু। আমার অনুরোধ পায়ে ঠেলবেন না।" তাহার স্পর্শে নির্মল শিহরিয়া উঠিল, কিন্তু সে দেখিল অনুরোধ করিবার সময়ে তাহার মুখের কর্কশতা যেন লঘু হইয়া আসিতেছে। নির্মল নম্র হইয়া বলিল, "আচ্ছা গাইছি।"

সে তখন তানপুরা প্রত্যাখ্যান করিয়া একটা ছোট হারমনিয়াম লইয়া গাইতে বসিল, উপস্থিত কলাবৎদের মত সঙ্গীতশাস্ত্রে তাহার পাণ্ডিত্য ছিল না বটে কিন্তু সে তাহার কণ্ঠের মাধুর্য্যে নিমেষের মধ্যে সেই মদ্যপ সমাজের উচ্ছৃঙ্খলতা দূর করিয়া দিল। সেখানে যাহারা বসিয়া ছিল তাহারা সকলেই গুণী, নূতন গায়কের কণ্ঠামৃতের আস্বাদ পাইয়া তাহারা নিবিষ্ট চিত্তে গান করিতে বসিয়া গেল।

প্রথম গান শেষ হইলে সুন্দরী আবার ধরিয়া বসিল, নির্মল আবার গাহিতে বাধ্য হইল, চারি পাঁচ খানা গানের পর নির্মল ঘড়ি খুলিয়া দেখিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িল। সে বলিল, "নলু, দশটা বাজে, মা ভাববেন, অনেক হয়েছে।" নলিনাক্ষ সুরাবিজড়িত কণ্ঠে কহিল, "চল যা।"

সুন্দরী তাহার কাছে উঠিয়া গিয়া কি বলিল, নলিনাক্ষ চক্ষুর ইঙ্গিতে তাহাকে বাহিরে যাইতে বলিল। নির্মল ঘরের বাহির হইবামাত্র সুন্দরী তাহার হাত ধরিয়া বলিয়া উঠিল, "আবার কবে আসবেন? বলুন আসবেন। দিব্যি করে বলুন। দিব্যি না করলে ছেড়ে দিব না কিন্তু।" নির্মল আশ্চর্য্য হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল যে, তাহার চোখে মদের দীপ্তি নিভিয়া গিয়াছে, মুখের কোণে আন্তরিক কাতরতা কর্কশতার স্থান অধিকার করিয়াছে, নির্মল স্তব্ধ হইয়া তাহার সুন্দর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তখন মনোসুমার মাথার কাপড় খুলিয়া গিয়াছে, অঙ্গের বসন স্রস্ত হইয়া আসিয়াছে, নির্মল চেষ্টা করিয়া তাহার সুগঠিত দেহের দিক হইতে চক্ষু ফিরাইয়া লইয়া বলিল, "আমি এখন কলেজের ছাত্র, সুতরাং সকল দিন সময় পাই না, যদি সময় পাই তাহলে আর একদিন আসব।" তখন নির্মলের কাণে গেল, ঘরের ভিতর কে বলিতেছে, সোনাটি কলেজের ছেলের মাথাটি খাওয়ার মত।" সহসা নির্মলের চিত্ত স্থির হইয়া

গেল, সে চোখ ফিরাইয়া লইয়া সুন্দরী মনোরমার হাত ছাড়াইয়া নীচে চলিয়া গেল। সে বাড়ীটার নীচে একটা বড় পানের দোকান ছিল, নির্ম্মল তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিল। অল্পক্ষণ পরে পিছন হইতে কে তাহার চোখ চাপিয়া ধরিল, নির্ম্মল তাহার স্পর্শে শিহরিয়া উঠিল। সে অঙ্গুলী স্পর্শ করিয়া বুঝিতে পারে, সে হস্ত নলিনাক্ষের নহে; তখন সে মিনতি করিয়া কহিল, "অনুগ্রহ করে আমায় ছেড়ে দিন, পথের মাঝখানে আমায় এ অবস্থায় যদি কেউ দেখে যায় তাহলে আমরি বাড়ীতে মুখ দেখাবার উপায় থাকবে না।" নূপুর কঙ্কণ সিঞ্জিতবৎ মৃদু মধুর হাসিয়া মনোরমা নির্ম্মলের চোখ ছাড়িয়া দিয়া বলিল "তবে বলো আসবে? মাইরি বলছি, যদি না আস তাহলে তোমার বাড়ী গিয়ে উঠব।" ভয়ে বিস্ময়ে নির্ম্মল কাঁপিয়া উঠিল। মনোরমা তখন এক হাত দিয়া নির্ম্মলের কটি বেষ্টন করিয়া বলিল, "বল আসবে? নিশ্চয় আসবে?" নির্ম্মল কম্পিত কণ্ঠে বলে উঠল, "আসব।"

এই সময়ে নলিনাক্ষ আসিয়া পড়ায় নির্ম্মল পরিত্রাণ পাইল। সে বাড়ী আসিয়া সমস্ত কাপড় চোপড় ফেলিয়া দিয়া স্নান করিল এবং পিতামাতার পদধূলী লইয়া নিজের পাঠাগারের দ্বার বন্ধ করিয়া দিল। সেই ঘরের কোণে সুদূর পল্লীর সন্ধ্যাসমাজ্ঞনা ছায়ায় তরুণী মোহিনীর চিত্র সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত ছিল, নির্ম্মল তাহা জড়াইয়া ধরিয়া বলিয়া উঠিল, "আমি যাব না, কখনো যাবো না।" তাহার পরে অশ্রুর রুদ্ধ উচ্ছ্বাস উথলিয়া উঠিয়া তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ করিয়া দিল। উষাগমের পূর্ব্বে আবার স্নান করিয়া নির্ম্মল গৃহদেবতার পূজায় বসিয়া গেল, নাস্তিকের পৌত্তলিকতা দেখিয়া পরিবারের সমস্ত লোক আশ্চর্য্য হইয়া রহিল।

লজ্জাবতী লতা

[শ্রী প্রভাবতী দেবী সরস্বতী]

একটু বাতাস লাগলে গায়
অমনি সে যে মুয়ে যায়
নেয়ে পড়ে বড় সরম ভরে,
বাতাস ও কি তেমনি তারে
বারে বারে আসিয়ে যারে
চুপি চুপি কেবল পরশ করে।
আপন মনে একটী ধারে
বীনার মতই আছে পড়ে
কারুর দিকে চায় না তুলে আঁখি,
আপন-মনে-সারা বেলা
আপন মনে করছে খেলা,
মুগ্ধা সে যে নিজের ছবিই দেখি।

ঝিনকি আলো আসে নেমে
কপোল খানি তাহার চুমে
রাঙ্গা করে বড় আদর ভরে,
চায় সে তুলে আলোর পানে
আপন কথা রয় না মনে,
আগে যখন বাতাস এসে পড়ে।
আবার কখন মানব করে
স্পর্শিত সে আদর ভরে
সরমেতে মুদে চোখের পাতা,
হেলে পড়ে মাটীর পানে
কি আগে যে তাহার প্রাণে,
বুঝতে নারি গোপন হৃদের ব্যথা।

ইণ্ডিয়ান সোপ কোম্পানীর
মেসিনে প্রস্তুত
চন্দন, রয়েলবকুল, গ্লীস্ব ও ডেলডেট সাবান
ব্যবহার করিবেন। টেলিফোন, ২৪৯৬

মাসিক-সাহিত্য সমালোচনা

প্রবাসী—কার্ত্তিক, ১৩৩০ সংখ্যা প্রবাসীর প্রথম ছবি, "লেখা" চিত্রকর শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসুর লেখার ধাঁচা। বিলাতি কাগজের ইলিয়াস্ রাউনের বাসরঘরের অনেক গুলি একটি একটি নূতন বিলাতি। সর্ব্বপ্রথম হাতের মুদ্রিয়া এত তফাৎ যে, তাতে বোধ হয় না যে কোন কালে সে দুটো একত্র হয়ে থেকেছিল এবং বাকের ও পায়ের আঙুলের অবস্থা দেখলে বোধ হয় যে, সর্ব্বপ্রথম কলেরা রোগে Cramp ধরেছে। দ্বিতীয় ছবি শ্রীযুক্ত নাথ চক্রবর্ত্তীর "সোনাপাখী" ও এই জাতীয় ছবি, তবে অতটা অস্বাভাবিক নয়। তৃতীয় ছবি শ্রীনারায়ণচন্দ্র উকিলের "কাশীরের পণ্ডিতানী" ও চতুর্থ ছবি শ্রীসুরেন্দ্র সিংহের "বেলা অবসান হল" মোটের উপর ভাল। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রসিংহের ছবিখানি ইলিয়াস্ আর্ট-স্কুলভুক্ত হলেও ছবির মত ছবি। "প্রবাসীর" অন্যান্য ছবিগুলি ভালই ছাপা হয়, "ভারতবর্ষের" মত ছাপার ঘোরে ত্রিমহলের বুক চিরে দিয়ে ছড়িয়ে পড়ে না।

"প্রবাসীর" প্রথম প্রবন্ধ প্রবাসীর মত প্রথম শ্রেণীর মাসিক পত্রের যোগ্যই হয়েছে। বিদ্যালঙ্কার অধ্যাপক শ্রীযুক্ত কিতীমোহন সেন "দাদুর সেবাযোগ" সম্বন্ধে যা লিখেছেন তা অতি উপাদেয়। আশা করি কিতীমোহন বাবু এই জাতীয় প্রবন্ধগুলি একত্র করে ছাপিয়ে ফেলবেন। "রাজপথ" শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র নাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের ক্রমশঃ প্রকাশ্য উপন্যাস। অনেক দিন পরে শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুর মহাশয় একটি সুন্দর গল্প অনুবাদ করেছেন। অনুবাদটিও গল্পের মত সুন্দর, তবে গল্পের নায়িকা যখন উপপতি লাভ করেন নি তখন এক শ্রেণীর লেখক বোধ হয় বাক্য নিঃসৃতে বলবেন যে গল্পটায় আর্ট নেই। এমন সুন্দর গল্প, উপভোগ করবার ক্ষমতাও আমাদের চলে যাচ্ছে। "প্রবাসীর আত্মকথা" আমেকার মত মোহিতগ্যাধী ছেলেই যোগাচ্ছে, প্রবাসীর সম্পাদক হয় একটু বেশী করে ছাপুন, না একেবারে বন্ধ করে দিন। "প্রতীক্ষা" শ্রীরাধাচরণ চক্রবর্ত্তীর বৈশিষ্ট্যবিহীন একটি ছোট কবিতা। এই জাতীয় ছোট কবিতা কচুরী পানার মত বাংলা সাহিত্যকে একেবারে আচ্ছন্ন করে ফেলছে, অথচ যা ছাপলে কাগজের পাতপূরণ হয় না। "যোগাযোগ" শ্রীযোগেন্দ্র কুমার রায়ের ক্রমশ প্রকাশ্য উপন্যাস। শ্রীমন্দিরিল বসুর "কবি" আর একটি ছোট কবিতা, এটি, রবীন্দ্রনাথের অনুকরণ হলেও মোহাৎ মন্দ নয়। "মধ্যযুগ কবি-চর্চা" একটি মোটা প্রবন্ধ, মন্দ নয়, "ভারতবর্ষে" এই জাতীয় যে সমস্ত অপাঠ্য প্রবন্ধ বার হয় তার তুলনায় এটি ভালই। স্বর্গীয় কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের "ফরাসিনাদ" নামক ঐতিহাসিক উপন্যাস খানি এই সংখ্যায় শেষ হয়ে গেল। এই উপন্যাস খানি ঐতিহাসিক উপন্যাস হিসেবে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর।

শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের "স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের কয়েকটি মূলসূত্র" বাঙ্গালীর ভাষা সাহিত্য ও বাঙ্গলা পাঠকের প্রতি একটা ভয়ঙ্কর বিদ্রূপ, লেখক যে কথাটা বলতে চেয়েছেন সেটা তিনি একবারও বলতে পেরেছেন বি। কয়েক কাগজ পেরে যখন বাঙ্গালী পাঠকের প্রতি কতোগুলি নির্দ্দেশ করেছেন তখন আশা করি যে, দুই বাঙ্গালী পাঠক একখানি এরাম ইঞ্চি প্রকোপ করে প্রতিখান দেবে। লেখকটির বাংলা ফিউচিসি-প্যাসীটির ফলাফাড়ায় বিচুরী :—তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, একই পরিমাণ জোগের মাথায় পরিমাণ স্বাস্থ্যসাধন করার ক্ষমতা আছে এবং কি পরিমাণ স্বাস্থ্য তা হতে পাওয়া যাবে, তা তার কতটা প্রণালীর উপর নির্ভর করবে।.....বিলাসমনে প্রয়োজনীয়তা একটা সাধারণ নিয়ম।" "বাসন্তী" ছাপাখানার হিরিমিরি হতে পারে এই ভয়ে লেখকের টেম্পলার কেলকুলেশনের মনুষ্যত্বটি বিলুপ্ত না। এই লেখকটিকে শীঘ্রই শৃঙ্খলা-বদ্ধ না করলেবঙ্গ তো তাকে বহরমপুর পাঠাতে হবে। অমরেন্দ্রলাল রায়ের "বিদ্রোহী" গল্পটি ভাল এবং বিদেশীয় সাহিত্যের অনুকরণে লিখিত হলেও উপভোগ্য। লেখকের বাংলা কিন্তু কাঁচা, এখনকার মাসিক সাহিত্যে এই রকম কাঁচা বাংলা নিতান্ত বিরল না হলেও লেখক বাবুর মত শক্তিশালী লেখকের কলমায় এরকম ভোর লেখা দেখতে দুঃখ হয়। গোটাকতক বানান না দিয়ে পারলুম না। "কিন্তু একটু পরেই আপনাকে সম্বরণ করে নিয়ে সে বললে,—না না, এ হতুম নয় নয়—না আমার মিনতি, আমার প্রার্থনা—আমার ভিক্ষা।.....সে দিন একটা type তার পায়ের গোড়ালি থেকে চুলের ডগাটি পর্য্যন্ত দেখে বৈশিষ্ট্যে ভরা।.....হঠাৎ দীপা স্তব্ধ হয়ে গেল। তার মুখের দিকে চেয়ে মেয়েমুখ দীপা তো নয়—অবিকল শ্বেত-পাথরের মৌন-ই করা লোকের একটি করুণ মূর্ত্তি।.....দীপা,—ঘরের মানুষকে তুমি পথের উপর এনে দাঁড় করিয়েছ—পথ—যার শেষ নেই—সীমা নেই—যে সবের ইচ্ছার সঙ্গেই অনুগত।.....কি সম্পদ ছিল তোমার ঐ মেহটার উপরেই? যার গর্ব্বে ধরাটাকে সরার মত পায়ে মাড়িয়ে চলেছিলে;.....".....এই অংশ গুলো বাংলা অক্ষরে লেখা হলেও ভাষা ইংরেজী এবং লেখক গল্পটি adapt করেছেন বটে কিন্তু তাকে adapt করতে পারেন নি।

শ্রীজলধরলাল বসুর "আলোক" গল্পটি লেখার দোষে করুণ হয় নি, তবুও পাওয়া গেল যে, এই গল্পটি মাকি এবছরে প্রবাসীর প্রথম পুরস্কার পেয়েছে। একথা যদি সত্য হয় তাহলে "প্রবাসীর" কর্ত্তৃপক্ষের চোখ ভাল করে পরীক্ষা করিয়ে নূতন চশমা কিনে নেওয়া উচিত। গল্পটির প্রতিপাদ্য বিষয় ভাল কিন্তু গল্পটি মোটেই জমে নি। এ গল্পটিকে বাড়িয়ে এক খানা ছোট উপন্যাস লিখলে ভাল হত। শ্রীযুক্ত প্রভাত সান্যালের "দক্ষিণ আমেরিকার বন্যা" প্রবন্ধটি লেখকের ভৌগলিক জ্ঞানের অভাবে একবারে মাটি হয়ে গেছে। প্রভাত বাবু নূতন লেখক, তাঁর তথ্যগুলি লেখবার চেষ্টা আছে কিন্তু যে সকল জায়গা তিনি দেখেন নি সে সকল জায়গা সম্বন্ধে লিখতে যাবার পূর্ব্বে বিশেষজ্ঞকে জিজ্ঞেস করে নেওয়া উচিত।

আমাদের দেশে কি আছে না আছে তা দেখবার পূর্ব্বেই যারা বিলেতে গিয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করেন এবং সেই অভিজ্ঞতার ফলটা বিলেত থেকেই ফাঁকতে আরম্ভ করেন শ্রীবিমলকুমার সরকার তাঁদের অন্যতম। বিলেত যাবার আগে পরের ঘরটার অবস্থা দেখবার সময় কি সরকার ভারতবর্ষের যারো আশা আমরাই রেখে যাই নি। অথচ বিলেতে গিয়ে যে রকম বোল ফুটতে সুরু করেছেন তাতে বোধ হয় যে, তিনি হিমালয় থেকে কুমারিকা পর্য্যন্ত বারম্বার গিয়ে বিলেত যাত্রা করেছিলেন। তিনি বলেন, "এমন কি বুদ্ধগয়ের ভারতের মন্দির ও তীর্থক্ষেত্রের আগুতায় ঘুরিয়ে কোন স্থানও তাঁহার শিল্পকলার মোহাইয়াছিলেন কিনা সন্দেহ। বোম্বাই শহরের মালবার নামক স্থানে মহাবীর শিবাজীর এক প্রস্তর মূর্ত্তি সাবেক কাল হইতেই দাঁড়াইয়া আছে শুনিয়াছি। কিন্তু এই ধরণের কাজে

বোধ হয় এইটাই একমেবাদ্বিতীয়ম্।" সহকার মহাশয় কি আদু পাহাড়ে গিয়েছিলেন, না বিরাট পর্ব্বতে গিয়েছিলেন? তিনি কখনো অবয়বশূন্যের বণিকদের মূর্ত্তি দেখেছেন, না শুভ্রঘাটের প্রাচীন রাজধানী পাটনে গিয়াছিলেন? ভারতবর্ষের বিন্দুমাত্র না জেনে শুনে একথা লিখতে গিয়েই এরূপ হাস্যোদ্দীপক ভুল করা অত্যন্ত অন্যায়, অধ্যাপক বিনয় কুমার সরকারের প্রবন্ধটির নাম "রাধার ক্রমবিকাশ।" প্রবন্ধটি অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত এবং অসম্পূর্ণ। "পরকীয়া" ও "হেলেনের পাতিব্রত্য" প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনা চলে না। বিক্রমশিলা বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা নামক প্রবন্ধটি শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ বড় লিখিত। লেখাটি এক পাতারও কম। বিষয়ের সমস্ত প্রয়োজনের আভাস মাত্র এতে নেই। লেখক যা কিছু এতে লিখেছেন তা আমরা তাঁর দাদার তিব্বতীয় ভাষায় লেখা বৌদ্ধ ধর্ম্মের ইতিহাসের ফরাসি অনুবাদ থেকে সংগ্রহ করেছেন। ইনি এক জায়গায় লিখেছেন, "মন্দির ঠিক মাঝখানে একটি প্রকাণ্ড মূর্ত্তি ছিল, তাতে মহাবোধি মূর্ত্তি ছিল। বোধ হয়ই মহাবোধি মূর্ত্তিটা কি লেখক তা জানেন না, সেই জন্যই সোজাসিধে লিখেছেন। বহু মহাশয় তথাপি বিশ্ব-ভারতীর একজন শিক্ষক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশ পঁচিশজনের চেয়ে বেতন। সেজন্যই সোজাসিধে লিখে আমরা না করে কিছু লেখা পড়া শিখে বুদ্ধি করা উচিত ছিল। শ্রী হরীকেশ চৌধুরীর "বাদল বিদায়" প্রবন্ধ হয়েরও শেষের পদের মতই "বাজে"। মৈত্রেয়ীর ভুল—সব প্রতিষ্ঠা কবি শ্রীসুধীর-রঞ্জন মল্লিকের একটি কবিতা, তাতে কবির মনের মিষ্টিত্বটুকু জেগেই পড়বে। "বেতসবনের বৈঠক" বাংলা সাহিত্যের একটি চিড়িয়া খানা। এই চিড়িয়া খানায় অনেক রকম চিড়িয়ার আনাগোনা পাওয়া যায়। তাদের মধ্যে এক জনের নাম শ্রী হরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী। এই সংখ্যার প্রবাসীতে এই চক্রবর্ত্তী চিড়িয়াটি লিখেছেন, "তিব্বতীয় পরাণ গ্রন্থে সমাট অশোক সম্বন্ধে অনেক বিবরণ লিপিত আছে। অশোক ২০০ খৃ পূর্ব্বাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন।" প্রথম কথা, অশোক ৩৩৮ খৃষ্টাব্দের পরে রাজত্ব করেন এবং "তিব্বতীয়" (আসল কথা তিব্বতী) পরাণ গ্রন্থে অশোক সম্বন্ধে কোন কথাই নেই। এই চক্রবর্ত্তী চিড়িয়াটিকে এই সমস্ত কথা কেন লিখতে দেওয়া হয় তা বুঝতে পারা গেল না। প্রবাসীর "বেতসবনের বৈঠক" কি রূপটায় পক্ষির আড্ডা? শ্রীপরিমল কুমার ঘোষের "মানসী"কে লুকিয়ে রাখা উচিত ছিল। গোলাম মুস্তফার "পল্লী-মা" বাঁচা হাতের লেখা, লেখক আরো কিছু দিন মক্স করে তারপর মাসিক পত্রে লেখা দিলে ভাল করতেন। "শিশুমেলে নূতন আবিষ্কার" সরলিত। শ্রীপুলিনবিহারী দাসের পরিশ্রম ও অনি শিক্ষা" সকলই প্রকাণ্ড প্রবন্ধ। অধ্যাপক শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় "বিষ্ণুর দশ অবতার" নামক প্রবন্ধটি সুন্দর হয়েছে, এরূপ সুখপাঠ্য প্রবন্ধই মাসিক পত্রে ছাপা উচিত। ছবিগুলিও সুন্দর। শ্রী প্রিয়নাথ বসুর "পরগাছা" গল্পটি বাস্তবজীবনে অসম্ভব, লেখকের মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছে বলেই বোধ হয়। কার্ত্তিক মাসের প্রবাসী লেখা নির্ব্বাচনের দোষে ভাল হয় নি।

শ্রীবীরেন্দ্রকুমার

যৌবনে

[শ্রীচণ্ডীচরণ মিত্র]

এল কোথেকে আজ হঠাৎ
এত মৌ মনে?
বুঝি প্রাণের কুঁড়ি ফুটল
নব-যৌবনে।
মরি সহসা কি জাদুর ঊষর,
করে বর্ষে মাসে-সুরু-সুরস!
যেন আলোর পোকাগুলো সব
খুসীর যৌবনে।

ঘির- নাচীতে আজ এল একি
ঘোর-ঘোরার?
আগে তরুণ দেহের ভিতরে যে
মন গোঁয়ার!
তা'র ঝিকে ঝিকে বিলুচে সাড়া,
ওগো বৈভবী গান পরাণ-কাড়া!—
জানি, বিশ্বপিতার চরণ
উপঢৌকন এ!

Printed by Bijoy Krishna Dass at the Lakshmibilas Press,
14, Jagannath Dutta Lane, Calcutta.

বাসন্তী—

প্রেম-লীলা

কমলিনী-সাহিত্য-মন্দিরের সৌজন্যে

শিল্পী—শ্রীভবানীচরণ সাহা

সচিত্র সাপ্তাহিক পত্রিকা।

বাসন্তী

২য় বর্ষ] ২২শে অগ্রহায়ণ শনিবার ১৩৩০, ইং ৮ই ডিসেম্বর [২১শ সংখ্যা।

চিত্রশী-সরস্বতী

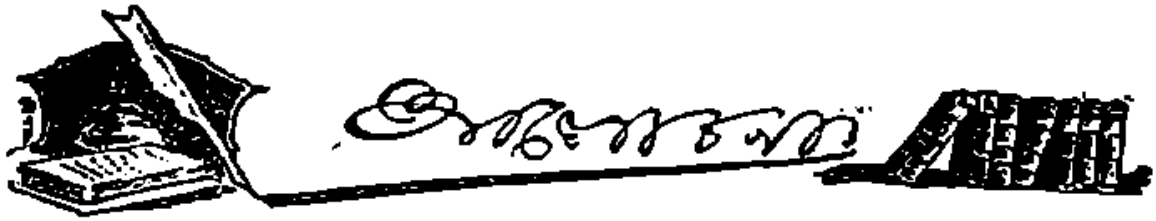

দেশের একদিকে দারুণ অন্নাভাব, বস্ত্রাভাব, আর এক দিকে নানা ব্যাধি পীড়া। খাইবার পরিবার অভাবে দেশের অগণিত জনসঙ্ঘ যতই হাহাকার করিয়া মরিতেছে নানা ব্যাধি পীড়াও সময় সুযোগ বুঝিয়া তাহাদের ততই পাইয়া বসিতেছে। দেশের লোকেরা কি করিয়া দিন চলিবে সেই ভাবনাই অহর্নিশ তাহার উপর ব্যাধি পীড়ায় তাহাদের কর্মশক্তি, উৎসাহ, জীবনের উপর অনুরাগ একেবারে লোপ করিয়া দিতেছে। জীবনে আনন্দের আস্বাদ যে এতটুকু পায় না জীবন তাহার পক্ষে ক্রমেই দুর্বহ হইয়া দাঁড়ায়। এই দুর্বহ জীবনের ভার লইয়া দেশবাসী অপ্রার্থিত প্রাণ-হীনের মত লক্ষ্যহীন হইয়া অহ-অহ ভাবে যেন মরণের প্রতীক্ষায়ই গুমরিয়া মরিতেছে।

• • • •

উচ্চ উচ্চ দার্শনিক তত্ত্ব কথা, রাজনৈতিক অধিকার অনধিকারের কথা—নানা শিক্ষা-দীক্ষা জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা দেশের শতকরা নিরানব্বই জন অধিবাসীর প্রাণেই প্রবেশ করিতে পারে না। নিজের পেটের ভাবনায় যাহারা সতত অস্থির বিব্রত, চোখের উপর যে নিত্য পরিবার পরিজনের অন্নাভাবে শীর্ণ তনু দেখিতেছে, ক্ষুধার জ্বালা সহিতে না পারিয়া প্রাণ সম পুত্রকন্যাগণ যাহাদের চক্ষুর সম্মুখে ব্যাধি-পীড়ার অসহনীয় জ্বালায় ঘুরিয়া ঘুরিয়া প্রাণ দিতেছে তত্ত্ব কথায় কাণ বা প্রাণ দিবার সামর্থ্য তাহাদের আসিবে কোথা হইতে?

• • • •

সুজলা, সুফলা, শস্য-শ্যামলা এই দেশের আজ প্রধান প্রাণস্পন্দের অভাব—অন্নাভাব। পেটের ভাত পরিধানের বস্ত্র ইহা যাহার আছে সে ইহার মূল্য বুঝিতে পারে না, কিন্তু যে হতভাগ্য এই অতি সামান্য জিনিষ হইতেও ভাগ্য গুণে বঞ্চিত সেই জানে যে ইহার মূল্য কত খানি। ইহার অভাবে জীবন কেমন তিক্ত বিষাক্ত হইয়া উঠে। পেটে অন্ন না থাকিলে মানুষের মনুষ্যত্ব একটা তীব্র উপহাসের মত মনে হয়।

• • • •

অন্নপূর্ণার ভাণ্ডার যেথায় মুক্ত, প্রকৃতি যেথায় হাসিয়া হাসিয়া সোনার মত শস্য রাশি ঢালিয়া দিতেছেন, সে দেশের সন্তানেরা আজ অন্নাভাবে মরণ দশাগ্রস্ত কেন? সে দেশে এই হাহাকার কেন? মূলে অন্নাভাব জনিত এই প্রাণঘাতী ব্যাধি পীড়া কেন?

• • • •

এই অবস্থায়ও—দেশের এই মরণ দশা চোখের উপর দেখিয়াও কোন কোন দেশশাসক স্বচ্ছন্দ চিত্তে বলিয়া থাকেন এ দেশ নাকি ক্রমেই ধনশালী হইতেছে। যিনি এ কথা বলেন দেশের জনসাধারণের অবস্থা সম্বন্ধে তাঁহার জ্ঞান যে অপরিসীম তাহাতে আর সন্দেহ করিবার কি আছে। তবে দেশের শিল্প বাণিজ্য যাঁহাদের হাতে আছে সেই জনকতক লোক ও দেশের মোটা টাকা মাসে মাসে গুণিয়া লইয়া যাহারা দেশের শাসন ব্যাপারে উচ্চপদস্থ হইয়া আছেন তাঁহারা অসম্ভব অর্থ পাইতেছেন বটে। দেশের জনসঙ্ঘ মরিয়া ইহাদের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বিধান করিতেছে বটে—কিন্তু যে জনসঙ্ঘ শেষণে এই অর্থের আগম তাহারা মরিয়া গেলে আর এ সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য আসিবে কোথা হইতে!

• • • •

গতবার দেশের মন্ত্রীদের সিংহাসনাধিরোহণের সময় তাঁহারা অনেকেই প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন যে তাঁহারা মাস মাহিয়ানা বাবদ দেশের ভাণ্ডার হইতে যে অর্থ গ্রহণ করিবেন তাহার কতকাংশ তাঁহারা দেশের জনহিত কর কার্যে ব্যয় করিবেন। গতবারে সেরূপ কোন প্রমাণ দেশবাসী পায় নাই। এবার আবার ভাগ্যগুণে যাঁহারা

মন্ত্রীত্ব লাভ করিবেন তাঁহারা কি ঐরূপ প্রতিশ্রুতিই দেশবাসীকে দিয়া এইরূপেই পালন করিবেন? তবে ইহাদের কেহ কেহ বলিতে পারেন বটে কোট-সংগ্রহ ব্যাপারেই তো তাহাদের প্রাপ্ত অর্থের যথেষ্ট ব্যয় হইয়া গিয়াছে।

• • • •

নির্ব্বাচন লইয়া যে আন্দোলন সুরু হইয়াছিল তাহা শেষ হইয়া গেল। বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফ হইতে শ্রীযুক্ত বিজয় কৃষ্ণ বসু কাউন্সিলের সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন। বলা বাহুল্য স্বরাজ্য-দলের পৃষ্ঠ-পোষকতাই বিজয় বাবুর সাফল্যের কারণ। নতুবা বিজয় বাবুর এমন কোনো যোগ্যতার পরিচয় এ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই যে জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে তিনি সদস্য নির্ব্বাচিত হইতে পারেন। এ সম্বন্ধে স্বরাজ্য দল তাঁহাদের দায়িত্ব এবং বিচার শক্তির পরিচয় কত খানি প্রদান করিয়াছেন আজ তাহার রায় দেওয়া যায় না। তাহার রায় সম্পূর্ণ ভাবেই নির্ভর করিতেছে কাউন্সিলে বিজয় বাবু যেরূপ যোগ্যতার পরিচয় প্রদান করেন তাহারই উপরে। পূর্ব্বে যাহার কোনো যোগ্যতার পরিচয় পাওয়া যায় নাই সেই যে অযোগ্য হইবে তাহার অবশ্য কোনো নিশ্চয়তা নাই। কারণ যোগ্যতা দেখাইবার সুযোগের অভাবেও অনেকে তাহাদের শক্তির পরিচয় দিবার অবকাশ পায় না।

• • • •

বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পর্কে খুব জটিল সমস্যা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। নানা দিক দিয়া তাহার ভিতর পরিবর্ত্তনের আবশ্যক। তাহার আইন গুলি এমন করা দরকার যে কোনো ব্যক্তি বিশেষের প্রভুত্ব তাহার গণতান্ত্রিক আবহাওয়াকে নষ্ট করিয়া দিতে না পারে। একদিকে গবর্ণমেণ্ট তাহার স্বাধীনতাকে খর্ব্ব করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন, অন্যদিকে স্যার আশুতোষ সিণ্ডিকেট সিনেট প্রভৃতি নিজের দলের লোক এবং আত্মীয়-স্বজনের দ্বারা ভর্ত্তি করিয়া এই প্রতিষ্ঠানটিকে নিজস্ব সম্পত্তিতে পরিণত করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছেন। এই ঘূর্ণাবর্ত্তের ভিতর পড়িয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের তরণী খানি বান চাল হইবার উপক্রম হইয়া পড়িয়াছে।

• • • •

বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফ হইতে যিনি সদস্য নিযুক্ত হইলেন তাঁহার পথ যে সহজ সরল নহে তাহা বলাই বাহুল্য। বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে প্রত্যেক ছোট বড় ঘটনার হিসাব নিকাশ তাঁহাকে রাখিতে হইবে, স্যার আশুতোষ বিশ্ববিদ্যালয়ের চারিপাশে যে দুর্ভেদ্য জাল-রচনা করিয়াছেন তাহা ভেদ করিয়া ভিতরের রহস্যের সন্ধান তাঁহাকে লইতে হইবে। সুতরাং একদিকে তাঁহার দৃষ্টি এবং বুদ্ধি যেমন তীক্ষ্ণ হওয়া দরকার অন্যদিকে তাঁহার সাহস, কর্ম্ম শক্তি, দৃঢ়তা, তেজস্বিতা প্রভৃতিও অসাধারণ হওয়া আবশ্যক। স্যার আশুতোষের ব্যক্তিত্ব এবং গবর্ণমেণ্টের প্রলোভন এই উভয়কেই যিনি জয় করিতে পারিবেন বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য হইবার অধিকার কেবল মাত্র তাঁহারই আছে।

পারস্য-প্রসূণ

আবুল ফরহ মোহম্মদ আব্দুল হক।

অনুবাদ

(ওমর খৈয়াম হইতে)

কতনা রূপসী কামিনী জনে
বাসিয়াছি ভাল দিয়ে মন প্রাণ,
সুষমার সুধা ভরিয়া সেরাজা
নিয়তি যাহারে করেছিল দান,
দুদিনের তরে হাসিয়া খেলিয়া
জীবনের সুধা করিয়া পান,
লুকায়েছে আজ কবরের মাঝ
কাঁদিয়া কাঁদায়ে গাহিয়া গান।

বেশ্যা ও পরকীয়া

[শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ]

বাৎস্যায়ন স্বীকার করিয়া গিয়াছেন যে, বেশ্যা একজন প্রধানা নায়িকা, সুতরাং সুনীতি সঙ্গত প্রেমের বিশ্লেষণ করিতে হইলে বেশ্যাকে আলোচনার বহির্ভূত করা চলে না। জগতে কবে কোন্ সময়ে বেশ্যার উৎপত্তি হইয়াছিল ইতিহাস তাহার তারিখ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখে নাই। বেশ্যা নামান্তরে সামান্যা গণিকা, অর্থের জন্য আত্ম-বিক্রয় করিয়া থাকে। পরকীয়া নায়িকা, অর্থাৎ স্ত্রী ধর্ম্মানুরোধে বা প্রেমানুরোধে নায়কস্পর্শী পতির অধিগত হয়, পুনর্ভূ বা পরকীয়া কেবল রজঃগত কণ্ডূতীর অপলোদনের জন্যই নায়কান্তর গ্রহণ করিয়া থাকে কিন্তু বেশ্যা রিরংসার সহিত নায়কের নিকটে ধনসম্পত্তি প্রার্থনা করে। অসভ্য বনবাসী বা যাযাবর মানব-সমাজে বেশ্যার অস্তিত্ব নাই, কেবল সভ্য সমাজ-বদ্ধ মানবের বৃহদুপনিবেশে, অর্থাৎ—নগরেই বেশ্যার অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায়।

আধুনিক কালে বেশ্যার নাম করিলে অনেকে শিহরিয়া ওঠেন, সম্প্রদায় বিশেষের মতে সভ্য-মানবের সমাজে বেশ্যার আবশ্যকতা নাই কিন্তু বর্ত্তমান কালে সভ্যতাভিমানী প্রত্যেক প্রদেশে বেশ্যার অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাচীন কালেও আমাদের সমাজে বেশ্যার অস্তিত্ব ছিল, বাৎস্যায়ন রচিত কামসূত্রে, ভাসের চারুদত্ত নাটকে তাহার স্পষ্ট প্রমাণ আছে। প্রাচীন প্রতিচ্যে সর্ব্বত্র বেশ্যার অস্তিত্ব ছিল। কেবল তাৎকালীন বর্ব্বর সমাজে অর্থাৎ—ইংলণ্ড জার্ম্মেনী প্রভৃতি দেশে অবাধ যৌন সম্মিলনের জন্য বারবণিতা বা বেশ্যার আবশ্যকতা উপলব্ধ হয় নাই। বেশ্যার প্রয়োজন হয় কেন? বিবাহের স্থায়ীত্ব জন্যই বেশ্যার প্রয়োজন। যখন মানব-সমাজে নর-নারীর মিলনে বৈধ বা অবৈধ ভাব ছিল না, নর-নারী যখন ইচ্ছানুসারে যৌন সম্মিলনে রিরংসার পরিতৃপ্তি করিতে পারিত তখন বেশ্যার আবশ্যকতা ছিল না। ভারতবিজেতা আর্য্যগণ ঋক্-বেদ রচনা কালে নিতান্ত অসভ্য ছিল, মাত্র তাহাদিগের বহু বলে ধ্যাবিদনের প্রাচীন সেমিটিক সভ্যতা বিনষ্ট হইয়াছিল। তখন যৌন-সম্মিলনের বিশেষ বিধিবদ্ধ নিয়মাবলী ছিল না, থাকিলেও তাহা বর্ত্তমান যুগের ন্যায় কঠোর ভাবে নর-নারীর প্রতি প্রযুক্ত হইত না। সেই জন্যই ঋক্-বেদে বা ঋক্-বেদের যুগে গণিকার অস্তিত্ব সুস্পষ্ট নহে। উর্ব্বর ভারতবর্ষ জয় করিয়া বর্ব্বর আর্য্য জাতি যখন সভ্যতর হইয়া উঠিল তখনই ক্রমশঃ প্রাচীন ব্যাবিলনের ন্যায় ভারতের আর্য্য-সমাজে গণিকার প্রয়োজন হইল।

রিরংসা পতি-পত্নীর সমান নহে। অসমান রিরংসার সামঞ্জস্য সকল দম্পতীতে সম্ভব ছিল না, পত্নীরা সকল সময়ে চতুঃষষ্টি কলার অধিকারিণী হইতে পারিতেন না। সেই জন্যই রিরংসা তৃপ্তি ও বিলাসের পরিতৃপ্তির জন্য পুরুষ স্বকীয় ব্যতীত অপরা নায়িকার সন্ধানে যাইত। অবশ্য পুরুষ প্রথমে পরকীয়ার সন্ধানে যাইত কিন্তু পরকীয়া সর্ব্বত্র সুলভ নহে। পরকীয়ার কামনা অর্থের জন্য যে নারী প্রথমে ভুষ্ট করিতে প্রবৃত্তি হইয়াছিল সেই প্রথম বেশ্যা। কালে বেশ্যার সমাজ মানব-সমাজের প্রয়োজন অনুসারে পুষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। বেশ্যা সমাজের দোষকালনের পয়ঃ-প্রণালী। পরকীয়া-কামী নরের অনন্ত পিপাসা পরিতৃপ্ত করিয়া বারবণিতা সভ্য-মানবের সমাজবন্ধন সুদৃঢ়তর করিয়া রাখে সেই জন্য বেশ্যা প্রাচীন আর্য্য-সমাজে আদরণীয়া ছিল।

এখন পাশ্চাত্য বর্ব্ব যাজকের চক্ষুতে আমরা আধুনিক বার-বণিতাকে দেখিয়া তাহাকে যে অপার্থিব ঘৃণার পদার্থে পরিণত করিয়াছি, বেশ্যা কখনও ভারতে ততদূর ঘৃণ্য ছিল না। কিন্তু আমরা যখন ইশার প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের আধুনিক যাজকগণের অনুকরণে বার-বনিতাকে ঘৃণা করি, তখন আমরা ভাবিয়া দেখিনা যে, ক্রীশ্চান বেশ্যা বিবাহ করিলেই স্বকীয়ায় পরিণত হয়, মুসলমানী যাহারা দীর্ঘ যৌবনে আত্মবঞ্চনা করিয়া প্রৌঢ়ে নেকাহ করিতে পারে কিন্তু হিন্দুর সমাজে বেশ্যা বারবণিতা অবস্থায় হেয়

নহে এবং সে বিবাহ করিয়া পরে অকীর্ত্তা হইতে পারে না।

সকল দেশে সকল সভ্য-সমাজে বেশ্যা ছিল এবং আছে, জগতে যে বেশ্যার প্রয়োজন আছে সর্ব্বত্র বারবণিতা সমাজের অস্তিত্বই তাহার প্রমাণ। সম্প্রদায় বিশেষের নিষ্ঠা বা ঘৃণায় মানব-সমাজের অত্যাবশ্যক অঙ্গ লুপ্ত হইতে পারে না। আমি গৃহে বসিয়া দম্ভ ভরে বলিতেছি, আমি যে, বিবাহিতা পতিপত্নী কেন পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত হইবে না, বসে বসিয়া বিধি দিতে পারি যে, নারী রজস্বলা হইলে তবে পতি তাহাকে স্পর্শ করিবে এবং "পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা পুত্রঃ পিণ্ডঃ প্রয়োজনম্" বিধি লিখিবার সময় সুন্দর শুনায় কিন্তু কেহ কখনও তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে পারিয়াছিল কি? আমাদের দেশে যাঁহারা আর্য্যামির দর্প করিয়া থাকেন তাঁহাদের কেহই কোনদিন প্রমাণ করিতে পারিবেন না যে, প্রাচীন আর্য্যগণ পত্নী ঋতুস্নাতা না হইলে তাহাতে অধিগত হইতেন না। বানরের হিংসার ন্যায় নরের হিংসা মজ্জাগত. ইহা বিধিনিষেধের গণ্ডীভুক্ত করিবার জন্য বিবাহের সৃষ্টি এবং বিবাহিত নর-নারীর কদাচিৎ অসাবধানে পুরুষ বা নারী পরকীয়া বা উপপতি কামনা করিয়া থাকে, তদভাবে বেশ্যার সৃষ্টি। বেশ্যা মানব সমাজের নিত্য-প্রয়োজনীয় বস্তু, বেশ্যার অভাবে বিবাহ-বন্ধনের পবিত্রতা রক্ষা মানব-সমাজে অসম্ভব। একথা যিনি অস্বীকার করেন তিনি অসত্য-বাদী। সহস্র সহস্র বর্ষ পূর্ব্বে ভারতবাসী প্রাচীন আর্য্য-জাতি মানব-সমাজে বেশ্যার আবশ্যকতা বুঝিতে পারিয়াছিল এবং তদবধি গণিকা প্রথা আর্য্য সমাজে আদরনীয়।

গণিকা সমাজের পরিবর্ত্তন হয় নাই। বাৎস্যায়ন তাঁহার গ্রন্থের "বৈশিকাধিকরণ" নামক প্রকরণের তৃতীয় অধ্যায়ে উপযুক্ত অর্থ-প্রদানে অসমর্থ ব্যক্তিকে বাড়াইবার যে সমস্ত উপায় লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন বর্ত্তমান কালের কলিকাতার গণিকাগণ সেই সকল উপায়ই অবলম্বন করিয়া থাকে।

"সকৃৎ তু পূর্ব্বোপকারিণমপ্যন্য কৃতং ব্যলিকেনানুস্মরেৎ।
অপরাং তু নিষ্প্রতিপত্তিকমুপায়তোঽপবাহয়েৎ।

অসমবয়স্কা।

কামসূত্রের টীকায় যশোধর বলিয়া গিয়াছেন যে অর্থ প্রদানে অসমর্থ নায়ক বিতাড়নের উপায় দুই প্রকার, প্রকাশ্য ও গোপন—

"তে চ নিষ্কাষ-নো-পায়া প্রকাশে রহসি বা স্থিতস্য।
তত্র পূর্ব্বমধি কৃত্যাহঃ—"

"নিষ্কাষনের উপায় প্রকাশ্য ভাবে ও গুপ্তভাবে অবলম্বন করিবে তন্মধ্যে প্রকাশ্য-ভাবের উপায় বলা যাইতেছে।"

রতের জন্য সরকতামূলাদি উপচার প্রদান করিতে যাইলে উদ্বেগ প্রকাশ করিবে। চুম্বন করিতে উদ্যত হইলে মুখদান করিবে না। অঙ্গ রক্ষার চেষ্টা করিবে। নখদশনক্ষতের সহন করিবে না। আলিঙ্গন করিতে উদ্যত হইলে, ভুজমধ্যে সূচী দ্বারা ব্যবধান করিবে। গাত্রের সুস্থতা করিবে, যাহাতে আকর্ষণ করিতে না পারে। বস্ত্রযোগ নিবারণার্থ উভয় দৃঢ়রূপে ব্যত্যস্ত করিবে।

বেশ্যা দুই প্রকার, বেশ্যা ও গণিকা।

"আভিরূপ্যান্বিতা বেশ্যা শীলরূপগুণান্বিতা।
সভাসু গণিকাশব্দং স্বানেক জন সংশ্রয়ঃ॥"

"বেশ্যা এই সকল কলার ব্যবহারে উচ্চসম্মান প্রাপ্ত হইয়া সুন্দর স্বভাব, সুন্দররূপ ও গুণ-যুক্ত হইলে গণিকা নাম এবং গুণগ্রাহি-জনগণের সভায় স্থান লাভ করিতে সমর্থ হয়। রাজা তাহার পূজা করেন।

কলা দ্বারা অভ্যাজিহ্মতা—আভোৎকর্ষ হইলে—গুণের আভিমুখ্য বা প্রধানতা জন্মিলে। বেশ্যা-শব্দটী প্রাদিক বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। ইহা—দেখাইবার জন্য বলা হইয়াছে। শীল, সু-স্বভাব। রূপ,—ভাল গঠন ভাল বর্ণও। গুণ সকল,—বৈশেষিক অধ্যায়ে বক্ষ্যমান নায়িকার গুণ। গণিকানাম্নি—সামস্ত্য বেশ্যা সম্ব বাচ্য হইলেও বিশিষ্ট গণিকানাম লাভ করে। যেহেতু গণিকা হইতে হইলেই এই সকল গুণ থাকা একান্ত আবশ্যক। স্থান, জন-সভায় আসন ভূমি—অর্থাৎ বেশ্যা বলিয়া ঘৃণা করে না। রাজা পূজা করেন,—ছত্র ও মুদ্রারাক্ষসাদি দিয়া। ব্যাখ্যা করেন,—ইহার কলা কৌশল অতীব বিস্ময়ক, অসাধারণ,—এইরূপে। প্রার্থনীয়া,

—কলার উপদেশে—প্রার্থীগণের অভিগমন-যোগ্যা। বিরক্ত সুরত-প্রার্থীগণের লভ্য ভূতা। দৃষ্টান্ত-স্বরূপা দেব-দত্তাদির ন্যায়।"

বেশ্যার উৎপত্তিও দুই প্রকার:—(১) স্বকৃত-ভঙ্গ অর্থাৎ যে নারী রিরংসার বশবর্ত্তিনী হইয়া পিতৃ বা পতি-গৃহ পরিত্যাগ করে এবং কিছুদিন পরে প্রথম উপপতি কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা হইয়া অন্যাভাবে বেশ্যা-বৃত্তি অবলম্বন করে। এই জাতীয় বেশ্যা সাধারণতঃ অত্যন্ত কামুকা হয় এবং প্রায়শঃ নৃত্যগীত শিক্ষা করিয়া গণিকা পদ লাভ করিতে পারে না। (২) উত্তরাধিকার সূত্রে বেশ্যা, বেশ্যার কন্যা বা দৌহিত্রী মাতা বা মাতামহীর নিকট শিক্ষালাভ করিয়া যৌবনারম্ভেই বেশ্যা বৃত্তি আরম্ভ করে। ক্রমে প্রথম দুই চারিজন নাগরের অর্থে নৃত্যগীত শিক্ষা করিয়া ইহারা ক্রমশঃ গণিকাপদ লাভ করে। বিংশতি বর্ষ পূর্ব্বে কলিকাতায় বেশ্যা সমাজে এই জাতীয় বেশ্যার নাম ছিল "খানদানী"। সাধারণতঃ বেশ্যা কন্যা যৌবনারম্ভের পূর্ব্বেই অর্থোপার্জ্জন আরম্ভ করে। ধনী যুবা সুন্দরী কিশোরী বেশ্যা কন্যা দেখিতে তাহার উপনায়ক পদ-প্রার্থী হইয়া তাহাকে মাসিক বৃত্তি দিয়া থাকে। বিদ্যা-বিদ্যালয়ের বৃত্তির ন্যায় এই বৃত্তির নামও জলপানি। বেশ্যা কন্যা যৌবন প্রাপ্তা হইলে নায়ক পদলোভী যুবা দীর্ঘকাল জলপানি দিয়াও নায়িকালাভের পূর্ব্বে একটা সেলামী দিতে বাধ্য হয়।

এই জাতীয়া বেশ্যাদের মধ্যে বিবাহ-প্রথা প্রচলিত ছিল। এখনও কোন কোন বেশ্যা অশ্বত্থ বৃক্ষের সহিত কন্যার বিবাহ দিয়া থাকে এবং স্থান-বিশেষে বেশ্যা-পুত্র বেশ্যা-কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া থাকে কিন্তু সে স্বামীর স্বামীত্ব-সত্ত্বে দীর্ঘকাল উপভোগ করিতে হয় না। ইহাই আধুনিক ও প্রাচীন বেশ্যা সমাজের উৎপত্তির ইতিহাস।

বেশ্যা প্রকৃতপক্ষে সমাজের হিতকারিণী কারণ কামার্ত্ত ধনী যুবক সম্প্রদায়ের রিরংসা তৃপ্ত করিয়া সে মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র গৃহস্থের দাম্পত্য সম্বন্ধ অক্ষুণ্ণ রাখে। সে এই বৃত্তি অবলম্বন করিয়া কিঞ্চিৎ অর্থ সঞ্চয় করে বটে কিন্তু তাহাকে ইহার জন্য যে পরিমাণ শারীরিক ও মানসিক ক্লেশ সহ্য করিতে হয় তাহা বর্ণনা করা দুঃসাধ্য। অবাধ অপ্রতিহত যৌন-সম্মিলনের ফলে বেশ্যা যে সমস্ত দুরারোগ্য রোগে জীর্ণ হইয়া পড়ে তদ্ব্যতীত তাহাকে অন্য বহুবিধ ক্লেশ সহ্য করিতে হয় তাহা জন-সমাজে সুপরিচিত নহে।

সাধারণতঃ ধনী-যুবা কাম-প্রবৃত্তি তৃপ্ত করিবার জন্য বেশ্যার উপরত হইয়া থাকে। সে কখনও বেশ্যার চিত্ত-বৃত্তির প্রতি লক্ষ্য রাখে না। রতি চক্রে প্রবৃত্ত হইলে সাধারণতঃ স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ের সমভাবে উত্তেজনা তৃপ্ত না হইলে কায়িক ও মানসিক ক্লেশ উভয়কেই ভোগ করিতে হয়।

কামসূত্র-কার বলিয়াছেন;

"সুরতান্তে সুখং পুং-সাং স্ত্রীণাং তু সততং সুখম্।
ধাতু ক্ষয় নিমিত্তা চ বিরামেচ্ছোপ জায়তে॥
তস্মাৎ পুরুষবদেব যোষিতোঽপি রতব্যক্তি দ্রষ্টব্য।
কথং হি সমানায়ামেবা কৃতাবেকার্থ মুক্তি প্রপন্নয়োঃ কার্য্য বৈলক্ষণ্য? তাদৃগায়-বৈলক্ষণ্যাদভিমান বৈলক্ষণ্য-চ।"

"প্রথমরতে চণ্ডবেগতা শীঘ্র কালতা চ পুরুষস্য তদ্বি-পরীত মুত্তরেষু। যোষিত পুন-রেতদেব বিপরীতম। আ ধাতুক্ষয়াৎ প্রাক চ

স্ত্রী-ধাতুক্ষয়াৎ পুরুষ ধাতুক্ষয় ইতি প্রায়োবাদঃ।"

দ্বিতীয় বারে এই সামঞ্জস্য কেবল স্বকীয়া ও পুনর্ভূতে সম্ভব। বেশ্যা সাধারণতঃ ভাবের বশীভূতা হইয়াও অতৃপ্তা থাকে। আধুনিক কামশাস্ত্র সম্বন্ধীয় লেখকগণ একথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।

When the two have met and united, the usual resnlt is that, after a longer or shorter interval,the man's mental and physical stimulation reaches a climax in sensory intoxication and in the ejaculation of semen. Where the two are perfectly adjusted, the woman simultaneously reaches the crisis of nervous and muscular reactions very similar to his. This mutual orgasm is extremely inportant.....

It is perhaps hardly an exaggeration to say that 70 or 80 percent of our married woman

(in the middle classes) are deprived of the full orgasm—(Marie Stopes—Married Love 7th Ed pp 92-93)

স্বকীয়া বা পরকীয়া যে রসে প্রথমতঃ বঞ্চিতা সে বঞ্চনার বিষময় ফল যে বেশ্যা সমাজে অতি ভীষণ সে কথা অবশ্য স্বীকার্য্য। পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণ orgasm এর অভাব বহু স্ত্রী-রোগের একমাত্র কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন :—

"Many married women have told me that after they have relations with their husbands they are restless, either for some hours or for the whole night : and I feel sure that the prevalent failure on the part of many men to effect orgasms for their wives at each Congress must be a very common source of the sleep lessnesses and nervous diseases of so many married women (Ibid, pp 100 101)

সম্বাধে শয়নে অসংবৃত গতি বেশ্যা দেহকে ক্রমে স্পঞ্জন বিহীন পাষাণে পরিণত করে, তাহার স্ত্রী সুলভ আকাঙ্খা সুদীর্ঘ অপরিতৃপ্তির জন্য রাক্ষসী ক্ষুধার আকার ধারণ করে। অথচ অর্থোপার্জ্জনের জন্য বেশ্যা যখন তাহার কাম-কামনার প্রতি অমনোযোগী পুরুষকে গ্রহণ করে তখন তাহাকে স্বাভাবিক চিত্তবৃত্তি দমন করিয়া অনির্ব্বচনীয় সুখের অভিনয় করিতে হয়। তাহার অতৃপ্ত কামক্ষুধা তৃপ্ত না হইয়া তাহাকে সময়ে সময়ে উন্মত্ত করিয়া তুলে তখন সে স্বাভাবিক বা অস্বাভাবিক যে কোন উপায়ে তৃপ্তির প্রতিকার করিতে চেষ্টা করে। যে জাতীয় পুরুষ তৃপ্তির প্রতিকারে সমর্থ হইয়া বেশ্যার চিত্ত-বিনোদন করিতে পারে উজ্জ্বল নীলমণি অনুসারে তাহাদিগের উপাধি বিট্ ও প্রিয় নর্ম্ম সখ—

"বেশোপচারকুশলো ধূর্ত্তো গ্রাম্য বিদগ্ধয়োঃ।
কামতন্ত্র কলাভিজ্ঞো বিট ইত্যভিধীয়তে।"*

অর্থাৎ—"যে ব্যক্তি বেশভূষা ও শুশ্রূষা করণে পটু এবং ধূর্ত্ত আর পরিহাসবর্গ যাহার আজ্ঞা লঙ্ঘন করে না এবং যিনি স্ত্রী-বশীকরণার্থ মন্ত্রৌষধি প্রয়োগ করেন, রসজ্ঞেরা তাহাকেই বিট বলিয়া কীর্ত্তন করেন।"

"আত্যন্তিকরহস্যজ্ঞ সখীভাব সমাশ্রিতঃ
সর্ব্বেষ্যা প্রণয়িভ্যোঽসৌ প্রিয়-নর্ম্ম সখো মতঃ।"

অর্থাৎ—"যে ব্যক্তি অত্যন্তর রসজ্ঞ ও সখী-ভাবাশ্রিতা এবং প্রণয়িগণ-মধ্যে অতিশয় প্রিয়, তাহাকে প্রিয়-নর্ম্মসখ কহে।

কামুকের বিরংসা পীড়িত বারাঙ্গনা বিট ও প্রিয়নর্ম্মসখ ব্যতীত পুরুষ মাত্রেরই বিদ্বেষিণী হইয়া থাকে। তাহাদিগের মনের কোমল প্রবৃত্তি গুলি ক্রমশঃ লুপ্ত হইয়া স্নেহ ও মমতা কেবল নিজ-সমাজের উপরে নিবিষ্ট হয়। বিংশতি-বর্ষ পূর্ব্বে মৃতদাহ কার্য্যে কলিকাতার বেশ্যারা বৈষ্ণবদিগকে নিযুক্ত করিত কিন্তু বৈষ্ণবগণের অত্যাচারে বাধ্য হইয়া তাহারা এখন বেশ্যার শব স্বয়ং শ্মশানে লইয়া যায়, পুরুষান্তরের সাহায্যের প্রতীক্ষা করে না, ইহাই বারাঙ্গনা প্রকৃতির প্রকৃত পরিচয়। সর্ব্বত্র সকল সমাজেই প্রকৃতির বৈষম্য আছে, দুই একটি বেশ্যার চরিত্র অনুশীলন করিয়া তাহাদিগের সমষ্টিগত বৈশিষ্ট্য বিচার বা বিশ্লেষণ করা চলে না। সমাজের অন্যান্য স্তরের ন্যায় বারবণিতা-গণের মধ্যেও মহানুভবতা সর্ব্বত্রই দয়া, স্নেহ, মমতা, স্বজাতিপ্রিয়তা প্রভৃতি মহৎগুণ দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু সাধারণ পুরুষ বিদ্বেষ বারাঙ্গনা-সমাজের সমষ্টিগত বৈশিষ্ট্য এবং নারী-দেহের প্রতি পুরুষের অমানুষিক অত্যাচার তাহার মূল কারণ।

কলিকাতার বারাঙ্গনা সমাজের সহিত ব্যবসার উপলক্ষে ঘনিষ্ট-সম্বন্ধ-যুক্ত আমার এক পূজনীয় বন্ধু আমাকে তাঁহার দীর্ঘ-জীবনের অভিজ্ঞতার ফল জানাইয়া এই প্রবন্ধ রচনার প্রতিপদে সাহায্য করিয়াছেন। আমার নিজের জীবনে এবং আমার এক স্বর্গগত বন্ধুর মুখে শুনিয়া জানিয়াছি যে, বেশ্যা সমাজে স্ব-কৃত-ভ্রূণের গৃহ-ত্যাগের মূল কারণ বিরংসা—অন্যাভাব বা অত্যাচার নহে। ভ্রূণটার প্রথম প্রিয়নর্ম্মসখ যখন তাহাকে কলিকাতায় আনিয়া কিছুদিন পরে তাহার যথা-সর্ব্বস্ব হরণ করিয়া অদৃশ্য হয় তখনই অসংপতিতা নারী অঙ্গের অভাবে বাদশ নায়কের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া বারবণিতা-সমাজভুক্ত হয়।

মাসিক-সাহিত্য সমালোচনা

মাসিক বসুমতী। কার্ত্তিক ১৩৩০। বসুমতীর কলাবেদি দেখলে বেশ, বস্তুমূর্ত্তিটি দেখলে বিশেষ কিছু বলা যায় না। আর্ট্টিষ্টের মনোমত যদিও পূর্ণযৌবনা সুষমাময়ী শ্রী ভবুও অনেক ক্ষেত্রে এ বিষয়ের যে Suggestive ভাবটা বাঙ্গালাদেশের একশ্রেণীর মাসিকপত্রের দৌলতে একটা অপরিহার্য্য বিশেষণ হয়ে দাঁড়িয়েছে, সে বিশেষত্ব, অর্থাৎ—অর্দ্ধ ভাবটা বসুমতীর কপালে নেই। প্রথম ছবিখানি "গান" কোন এক অজানা চিত্রকরের। ছবিখানা দেখে মনে হয় যে মুঘল ইয়োরোপের সকল রকমে অনুকরণটার আতিশয্য নষ্ট করতে আসছে, তাতে ছবিখানি সেই যুগের আঁকা। সেখানে যার ছবিখানি দেখানে ইটালীয়ান পার্গোলা (Pergola) ছিল না এবং অর্দ্ধবৃত্তের উপরে ফুলের টব বসানো হত না; আমাদের দেশের ঝোলক আর Roman fountain এ আকাশ পাতাল তফাৎ ছিল। এসকল কথা ইংরেজ অধিকারের প্রথম যুগের চিত্রশিল্পীরা বুঝতেন না। ঐতিহাসিকের কলম থেকে ২৮৩৩ অব্দির ছাদের বিবরণ আছে কিন্তু আমাদের দেখে এমন কোন ছাদওয়ালা দেখে নি যে মেয়েরা সেতার, সুরবাহার, মন্দিরা, সারঙ্গী আর চামর নিয়ে রাসলীলা করতে দাঁড়িয়েছেন। চিত্রকর কিন্তু তা জানতেন না, বোধ হয় অনেকগুলো গল্প যেরকম করে বৈঠকখানা বাজারে রাস-লীলা করে ছবিতে সেই রকম ই তিনি শুনেছিলেন।

কার্ত্তিকের মাসিক বসুমতীর প্রথম প্রবন্ধ আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের "বাঙ্গালার পতন-কারণ"। অনাবশ্যক এটি একটি প্রবন্ধ প্রকাশ। আচার্য্য রায় অনেক গবেষণা করা কথা আলোচনা করেছেন কিন্তু শেষ করেন নি বলে এখনো কোন কথা বলা উচিত নয়। শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ ঘোষের "মেঘদূতিকা" কবিতাটি পদ্যের আকারে লেখা গদ্য। এ জাতীয় কবিতার যে আরো বানুষে ছাপাতে সাহস করে এইটেই আশ্চর্য্য! "রাম বাড়ীর বউ" বিষয়ে প্রবন্ধ, বোধ হয় সম্পাদকীয় প্রবন্ধ, কারুর মাথা-মুণ্ড নেই। আশা করি শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ এটি লেখেন নি। শ্রীযুক্ত জগচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তীর "আবাহনে" ছবিখানি ভয়োগ্রাফে কিন্তু যন্ত্রটি এমনি Self-conscious যে তার আবাহনের পরিচয় ছবিতে কিছুই নেই। আবাহনের লেখে অন্তর্দ্ধানটা অনেকটা উপাদানৈতিক হয়ে পড়েছেন কারণ এখন আর আর্ট্টিষ্টের মডেল হতে আপত্তি করেন না। শ্রীযুক্তা সরলাবালা বসুর "প্রেম" গল্পটির কাঠামো ভাল কিন্তু লেখিকার দোষে সমাপ্ত সুন্দর হতে পারে নি। মুসলমান আমলের নাম ধাম কারো কানুন লেখিকা বড় বেশী জানেন না, তার উপর পরিচ্ছদে বোধ হয় তাড়াতাড়ি করেছেন, এই মুসলমান একাধিনীর একাধীকতা অস্বাভাবিক মর্ম্মস্পর্শী হওয়া উচিত ছিল। লেখিকা দু'এক জায়গায় ইংরেজী ভাব বাংলায় অনিয়ে দিয়েছেন। এসকলের লেখক-বাবুরা এ জিনিসটা প্রতিপদে করে থাকেন কারণ তাদের দেখার তাই এখন পর্যন্তকথা বিশুদ্ধ বাংলায় কথা বলতে পারেন না। কিন্তু মা-ঠাকুরুণরাও যদি তাই করেন তো অর্দ্ধশিক্ষিত বাঙ্গালী পাঠক কোথায় যাবে? একটু সবুর না দিয়ে থাকতে পারলুম না, "আমার প্রথমাস্পদ কবিতের সম্পাদে ভিন্ন হলেও উপরের সম্পাদে অনুকরণীয়।" শ্রীযুক্তা সরলাবালা আর লেখেন একটু গবেষণা হলেই এসব সাধারণ লেখাগুলি লেখার থাকে না। উইলসনের পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন "সাধনদর্শন" যা লিখেছেন তা বোধ হয় কারো মনঃপুত হবে না তবুও এখনো আমরা ১৭৯৬খৃঃ অব্দীয়ের Equality ছাড়া মানুষের সমাজে যে সকলে সমান হতে পারে না এ কথাটা বলতে-ছিলুম এখন বুঝতে পারছেন, "সীতার বনবাসের" আমার লেখা প্রবন্ধটি সারবান। তর্করত্ন মহাশয় বিষয়টি খুলে লিখলে ভাল হত। "ভোজ-তত্ত্ব" "ভোজনের" কথা ও বাঙ্গচিত্র। "গ্রাম" নামক সচিত্র প্রবন্ধটি "কলম" আমা করি এটি উপন্যাসলীর, সম্পাদকীয় নয়। মহা-মহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণের "ঈশ্বরের হস্ত" নামক প্রবন্ধের প্রবন্ধটি সুন্দর, পাঠ করলে অনেক নূতন তথ্য, অনেক অনেক কৃতিত্ব পদার্থের কথা আছে। শ্রীযুক্ত আশুতোষ রায়ের "বজরা" কবিতাটি একরকম। "বজরায়" শ্রীযুক্ত মণিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের "শ্রীশিক্ষায়তন" প্রবন্ধটি সুন্দরী লেখকের শক্তির অপব্যয়ের প্রকৃষ্ট নিদর্শন অর্থাৎ prostitution of powers বিষয়ে শ্রীযুক্ত ঘোষ হয় প্রবন্ধে বিষয়ের ঘোর চড়াতে পারেন নি। বসুর নামে একটি নামের Index করে দিলে ভাল হত। শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের "কোজাগরী" পূর্ণিমার কবিতাটি ঈষৎ-খু অক্ষরের অনেকটা ঘোষ—অবশ্যটি ঠিক "রাইয় চরিতের নিয়ে" "রূপের ব্যবহারিক সত্তা" নামক সচিত্র বিবাহ প্রবন্ধে সম্পাদক সুরেন্দ্রনাথ, প্রভৃতি অনেক অতীত রাজনীর সত্তা সংযোজন করেছেন। শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ গুপ্তের "বাঙ্গালার শ্রীহট্ট বা বৈকুণ্ঠপুর" চরিত্র চর্চ্চণ এবং অনেক নূতন তথ্য আছে। সাহিত্যে কি দেখে করে দিতে হয় সে বিষয়টিকে গুপ্ত মহাশয় নূতন পরিচ্ছদে পরিচ্ছদ করেছেন। চণ্ডীদাসের কাব্যের যে পটের সঙ্গে কথা, যথা—কৃষ্ণকীর্ত্তনের ভাষা এবং চণ্ডীদাসের যাদের অধিক দেখা তা দুটির ঐক্য যাদের ভাষা, সে ভাষাটা গুপ্ত মহাশয় এক ভিন্নতা হতে দেখে দিয়েছেন। এ বিষয়ে তিনি মাসিক বসুমতীর ছবির অনেক আলোচনা করেন নি। শ্রীযুক্তীন্দ্রনাথ ঘোষের "শান্তি কণিকা" ছবির আড়ম্বরে, তার ভাব ও ভাষার অনুভূতি। এই ভাতীয় কবিত্বের নিদর্শন না হলে বাঙ্গলার সাহিত্য ক্ষেত্রে শীঘ্রই সর্ব্বের ভাব হবে। শ্রীযুক্তা সরলা দেবীর "বিজয়-বরণ" পড়া হাতের লেখা, কিন্তু ভাঁরা কি বলা, এই বহুদর্শিনী সম্পাদকা উপরোধে পড়ে এড়াতে না পেরে কি লিখতে হয় তাই বসুমা দিয়েছেন। কারণ তাঁর কলমে উনার মাতৃ দেবতার জন্য ভাবের উদ্রেক হয় না এই কথাটাই লেখিকা সংক্ষেপে বলতেন কিন্তু সেটা এত সংক্ষেপে দেখেছেন যে, সাধারণ লোকে তা বুঝতে পারবে না। কারণ বিজয়ার মর্ম্ম আর বুঝানো এখন এই কঠিন যে, সাধারণ লোকের পক্ষে তার আচরণ একেবারেই অসম্ভব। শ্রীযুক্তীন্দ্রনাথ বসুর "নারীর সমস্যা" কবিতাটি পাঠক পাঠিকার "চিত্ত দর্পণে" ভাবের বিকৃতিকার উদ্রেক করবে। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র সেনের "বেদে বর্ণিত আর্য্য নারীর অবস্থা ও গার্হস্থ্য ধর্ম্ম" এই লেখকটির chronology বা সাহিত্যের স্তর বিভাগের কোনই বালাই নেই। তাঁর Rigvedic India নামক গ্রন্থে এই লেখকটি যে অসাধারণ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছেন প্রবন্ধের তার প্রচুর প্রমাণ পাওয়া যায়, অথচ কাজের বাহাদুরী তখনই আমরা এতটা অভিভূত হয়ে পড়ি যে প্রবন্ধটি যখ বাঙ্গালী কি বাঙ্গলার বাঙ্গালী তা বিচার করবার সময় থাকে না। শ্রী যুক্ত

গুরুর মল্লিকের 'দুষ্কিয়ের বন্ধু' কবিতাটি পাদপূরণের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। এই জাতীয় কবিতা গুলি ফুলমার্কে বন্ধ করা উচিত। 'রবীন্দ্রের মেয়ে' একটি ক্রমশঃ প্রকাশ্য উপন্যাস। 'আশাপথিক' এককালি ভাল নিবন্ধ। কবি শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র ঘোষের 'একান্ত কামনা' কবিতাটি ফুলদেবতার বর্ণনা, পড়িয়া বিস্তার বাহবা করে পড়ে গেল, যার একটি লাইনে আমরা খুঁজিয়া পেলি তখনে। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র মোহন সিংহের 'আর্ট ও অশ্লীলতা' নামক প্রবন্ধটি আরম্ভ করা হয়েছিল ভালে কিন্তু শেষ হয় নি, কারণ যিনি অশ্লীলটি দেখেছেন যান তাঁর বিশ্লেষণ জিনিস গুলো ভাল রকম জানা উচিত। শ্রীমতী নির্মলাবালা পালের 'আশাপথী মনের' কবিতাটি ভাবে ও ভাষায় বিদেশী কেবল অক্ষর গুলি বাংলা। বাংলা দেশে কবে কোন হতভাগা সম্পাদক পত্রের পাদপূরণের জন্য এই জাতীয় কবিতা সাহিত্যে চালাতে আরম্ভ করেছিল তার বিচার করে সম্পাদক পুরুষকে মূলে দেওয়া উচিত। শ্রীযুক্ত সত্যচরণ শাস্ত্রীর 'কৈলাস যাত্রা' বন্ধ কেলাস হচ্ছে, আর কেবলে ছিঁড়ে যাবে। শ্রীমতী প্রীতি দেবীর নিত্তর আবাহনে নিত্তর লেখা। অবতীর্ণ বাড়ী ছাপে বোধ হয় একটি প্রবাহের নিত্তর আবির্ভাব হয়েছে তাই পাপ তার প্রতিটি ছত্রমাত্রিকে এই কবিতার তারটি দিয়ে তার বোল করা পূর্ণ করেছেন। শ্রীযুক্ত সরোজনাথ ঘোষের 'প্রাপাণী দর্শকী' নামক প্রবন্ধটি ভারতবর্ষের শ্রীসংঘের মেয়ের সকলেরই মত অশান্ত। এই জাতীয় অপাঠ্য প্রবন্ধগুলি না ছাপালে মাসিকপত্র চলে না। যাদের মাইনে দিয়ে তারী, যতটুকু লেখা থাকে তার ফলগুণ পরিমাণ জায়গা ছবি দিতে হয়। অথচ এই শ্রেণীর লেখকেরা যা লেখেন তা অনেক সময় নিজেই বোঝেন না বা জানেন না কেবল সম্পাদকীয় অনুরোধ আবাঢ়ে এক পাতা ইংরেজী ছবিওয়ালা কাগজ থেকে বাংলা করকটা লিখে এনে হাজির করেন। এ রকম ছবি না ছাপলে মাসিক পত্রগুলোর মনে করেন যে কাগজ উঠে যাবে। যদি আপাতী দর্শকীর বিষয় লিখতে হয় তা হলে বঙ্গবাণীর লেখক আর কিমুরার মত লেখককে দিয়ে লেখান উচিত। শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রচন্দ্র দাস গুপ্তের 'বাঙ্গলার জলতত্ত্ব' সার শূন্য দেখলাম। মল্লিক কবির 'আশা-ছলন' মাসিক বসুমতীর কার্তিকের সংখ্যাটাকে বিভাত আশাহীন করে ফেলেছে, শ্রীযুক্ত সুধীর গুপ্ত তার পরিচয় প্রথম ছত্রেই দিয়েছেন 'আমা কপাল ভাঙ্গলে আর জুড়বে কত বোকা,' ইহার পর লিখতে হয় 'কবির কথা বাড়লো কত তার লাইক লেখা জোখা' যাদবলাল দিয়ের কাহিনী এবং আমার ডায়েরী' ক্রমশঃ প্রকাশ্য। ভট্টাচার্য্য শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসুর 'হিন্দুর মন মানবকল' লেখকের আদেকার লেখার মত হলে আমরা বর্ত। আমরন, তারপর ও চরণ এই তিন মনের আনন্দ একত্র ভাল হয় না। সাহিত্যিক উপন্যাসটি শরৎচন্দ্রের 'বামুনের' নামক ক্রমশঃ প্রকাশ্য উপন্যাসে একটি মূলন তথ্য পাওয়া গেল সেটি কবির নিজ ভাব। এখনকার বাঙ্গলা সাহিত্যে যে নিয়মানুশাসন চলে চলা হবে না একথা রবিঠাকুর পর্যন্ত জোর করে বলতে পারেন নি। শরৎ বাবুর নায়িকার নামে আপত্তি। এইবার থেকে চিত্রপট, তারাবট, এমন কি তার পরের পর্যন্ত নায়িকাদের নাম পাওয়া যাবে। শ্রীযুক্ত নীলা চৌধুরীর 'মুকে:চুম্বী' কবিতাটি একটি হেঁয়ালী, কবিদীর কাছে সবিনয়ে প্রার্থনা যে, অতঃপর তিনি যেন শান্তর ভাষা লিখে তার পর কবিতা লেখেন। তা নইলে আমাদের মত হতভাগা পুরুষের সজা পেতে হয়। মাসিক বসুমতীর বাকিটা খবরের কাগজ। 'ভারত' সম্পাদকীয় 'বাদপাত্রী' মাসিক পত্রে কেন' এগুলি প্রবাসীর অনুকরণ।

ভারতবর্ষের মত সম্পাদকের নির্বাচনের জোরে ভাল মাসিকপত্রের কপাল কেমন করে পাথর চাপা পড়তে পারে কার্তিকের মাসিক বসুমতী তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

শ্রীযদুনাথ

দেশ-বিদেশ

গত ১লা অগ্রহায়ণ শনিবার কুল্লা রাঘবের আশ্রমে শ্রীশ্রী৺জগদ্ধাত্রী মাতার পূজা, উৎসব মহা সমারোহে সুচারু রূপে সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। এ বৎসর জগদ্ধাত্রী পূজা উপলক্ষে দাদাবাদ হইতে বহু সাধু-সজ্জনী আশ্রমে সমবেত হইয়াছিলেন। কলিকাতা হইতে বহু সাহিত্যিক গুণিবৃন্দ ও ভক্ত মহোদয়গণ আশ্রমের উৎসবে যোগদান করিয়া উৎসবটিকে সর্বাঙ্গ সুন্দর করিয়া তুলিয়াছিলেন। সমাগত হইতে পুরু-মহিলাগণ আশ্রমস্থ পাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি দিতে পাঁচ পুত্র ও আরতির সময় পরিত্যাগ করিতে সমবেত হইয়াছিলেন। রাত্রির নারায়ণ ভিক্ষের সেবা এক অপূর্ব বৃহৎ হইয়াছিল। অগ্রহের সেবাকার্যে শ্রীযুক্ত হরিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের আশ্রমের সভ্যগণ অত্যাগত জন নারায়ণের যথাবিহিত সম্মান ও আদর আপ্যায়নে সকল কেই বিমোহিত করিয়াছিলেন। এই উৎসব উপলক্ষে হরিপদ বাবু অনেক অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন ও তাঁহার ত্যাগ ও সার্থক হইয়াছে।

মায়ার বাঁধন

[শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী সরস্বতী]

১

মনের আনন্দে সে গাড়ী হাঁকাত।

প্রতিদিনই দেখা যেত, ভোর বেলাই সে তার গাড়ী খানি নিয়ে ষ্টেশনে এসে হাজির। বেলা দশটার ডাউন ট্রেণখানা ছেড়ে গেলে সে তার নিজের আয়গায় ফিরে যেত। পাঁচু সকলের কাছেই পরিচিত হয়ে গেছল। ষ্টেশনে কেউ প্যাসেঞ্জার নামলেই আগে তাকে পড়ত পাঁচুর; অন্য কোচম্যানরা চুপচাপ থাকত কারণ পাঁচুর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবার ইচ্ছা কারও ছিল না, অথবা থাকলেও তা ঘটত না। পাঁচুর এতে একচেটিয়া অধিকার ছিল, তার কারণও ছিল।

লোকটী ছিল একেবারে খোলা ধরণের, অত্যন্ত সাদা সিদে। দুনিয়ার কুটীলতা বুঝি তার হৃদয় স্পর্শ করতে পারেনি। আরোহীরা তাকে বিশ্বাস করত কারণ সে যথার্থই বিশ্বাসী ছিল।

আরও একটী তার চরিত্রের বিশেষত্ব ছিল, সে ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের বড্ড ভালবাসত। খালি গাড়ী তার কখনও দেখা যায় নি, ভাড়া আনতে ষ্টেশনে চলেছে, পথের ছেলেপুলে তার গাড়ীতে আছেই। ছেলেপুলেরা তাকে পাঁচুদা বলে ডাকত, আর সে মিশতও তাদের সঙ্গে তেমনি।

ভাড়া নিয়ে কখনও সে কোন ভাড়াটীয়ার সঙ্গে গোলমাল করত না। দেখা গেছে, যার ভাড়া দেবার ক্ষমতা নেই এমন অবস্থার লোককেও সে গাড়ীতে উঠিয়ে তার গন্তব্য স্থানে পৌঁছে দিচ্ছে।

সংসারে তার আর কে ছিল জিজ্ঞাসা করতে তার সদাপ্রফুল্ল মুখখানা একেবারে মলিন হয়ে উঠত, সে আর একটাও উত্তর দিতে পারত না। তার বাড়ী কোথায় তারও সে উত্তর দিত না। তার সম্বন্ধে তাকে কোনও কথা জিজ্ঞাসা করবামাত্র তার মুখখানায় এমন একটা বিষাদ করুণ ভাব ফুটে উঠত, যাতে কেউ আর সে প্রসঙ্গটা তুলত না।

সে দিনটা তার এমনি বিষাদপূর্ণই কেটে যেত, কিছুতেই সে আর তার প্রাণে প্রফুল্লতা আনতে পারত না। মনের মধ্যে অনেক কষ্টে সে যে আগুনটাকে চাপা দিয়ে রাখত, তার সম্বন্ধে কোনও প্রশ্ন শুনবামাত্র সেই আগুনটা আবার জ্বলে উঠত।

যাই করে হোক, দিনগুলো তার কাটত মন্দ নয়। সে দিন সকাল বেলা,—সে তার নিয়মিতরূপ ষ্টেশনে গিয়েছিল। সকালের যে ট্রেণখানা আসে, সেই ট্রেণ হতে একটী ভদ্রলোক তাঁর স্ত্রী, ছেলে মেয়ে নিয়ে নামলেন।

সম্ভব তাঁর গাড়ী আসার কথা ছিল। গাড়ী আসে নি দেখে ব্যস্তভাবে খানিকটা এদিক ওদিক ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছিলেন, তাঁর স্ত্রী হতাশভাবে বসে পড়েছিলেন। তাঁরই একটী ছেলে—তার বয়েস বোধ হয় বছর পাঁচ ছয় হবে, এই ছেলেটীকে দেখবামাত্র পাঁচুর চোখ দুইটী আনন্দে দীপ্ত হয়ে উঠল।

অপলক দৃষ্টিতে সে এই ছেলেটীর পানে তাকিয়ে রইল, তার মনের মধ্যে চির গোপনতার আড়ালে ঠিক এই ছেলেটীর মতই একখানি ছবি সযত্নে রক্ষিত ছিল, সেই ছবিখানা সে ধীরে ধীরে মনের উপর ফুটিয়ে তুলে এই শিশুটীর সঙ্গে মিলিয়ে দেখলে—এ একই।

"খোদা—"

পাঁচুর চোখ দিয়ে ঝর্‌ঝর্ করে জল ঝরে পড়ল, "আজ আবার তারই সেই মূর্ত্তিটা মেহেরবানী করে আমায় দেখানোর কি দরকার ছিল? আমি তো দেখতে চাই নি মেহেরবান! কুড়ি বছর আগে যা গেছে, আজ

ঠিক তারই মত আর একটীকে কেন আমার সামনে নিয়ে এলে প্রভু ?

চকিতে সে চোখের জল সামলে নিলে, ছিঃ, সে করছে কি ? অন্য কেউ যদি দেখতে পায় তবে সে ভাববে কি ? না, হৃদয়ের এ দুর্ব্বলতা সে কিছুতেই প্রকাশ করবে না—মনের আড়ালে সে কথা লুকানোই থাক।

চশমাধারী ভদ্রলোকটী ছুটোছুটি করছিলেন আর মাঝে মাঝে ছেলেটীকে মায়ের কাছ ত্যাগ না করবার আদেশ দিচ্ছিলেন। ছেলেটী তার মায়ের কাছেই চুপ করে দাঁড়িয়েছিল, এ জন্যে তার বাপের এত উৎকণ্ঠিত হবার কোনও কারণ ছিল না।

ভদ্রলোক যখন নিজের বাড়ীর লোকদের উপর বৃথা তর্জ্জন গর্জ্জন করছিলেন, তখন পাঁচু তাঁর সামনে গিয়ে বিনীত কণ্ঠে বললে, "আমার গাড়ীতে আসুন না হুজুর, আপনার বাড়ীতে ঠিক পৌঁছে দেব'খন।"

অন্যমনস্কের দৃষ্টিতে তার পানে চেয়ে বাবু বললেন, "তোমার গাড়ী ? কোথায় তা ?"

পাঁচু অঙ্গুলী সঙ্কেতে নিজের জীর্ণ গাড়ীখানা দেখিয়ে দিয়ে বললে, "আজ্ঞে, ওই যে আমার গাড়ী।"

সেই জীর্ণ গাড়ীখানার পানে চেয়ে বাবুর মুখখানা অন্ধকার হয়ে গেল, দারুণ বিরক্তিতে তাঁর ভ্রূ দুটি কুঞ্চিত হয়ে উঠল। তিনি স্ত্রীর পানে তাকিয়ে বললেন, "রাণি, এই গাড়ীতে যেতে হবে ?"

স্ত্রী বললেন, "তা বেশ, ওতেই চল। বাড়ীর গাড়ী যখন আসেনি তখন এখানে তার প্রতীক্ষায় হাঁ করে বসে থাকতে গেলে তো চলবে না। যেমন করেই হোক বাড়ীতে পৌঁছতে হবে।"

বাবু চোখ ফিরিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "নয়াবাজার চেনো ?"

পাঁচু উত্তর দিল, "আজ্ঞে হুজুর, খুব চিনি।"

বাবু আর দ্বিরুক্তি না করে স্ত্রীকে নিয়ে গাড়ীতে উঠলেন। ছেলেটী ভারী গোল বাধালে, সে কিছুতেই গাড়ীর ভেতর যাবে না, সে বাইরে বসে যাবে।

বাবু রেগে উঠলেন, ছেলেটীকে অনেক গালাগালি দিয়ে তার হাত ধরে টেনে নিতে গেলেন, পাঁচু শান্তস্বরে বললে, "তা হোক না বাবু, দিন খোকাবাবুকে আমার কাছে, আমার পাশে বসে উনি বেশ যেতে পারবেন।"

একে বাবুর মেজাজ বিলক্ষণ উগ্র হয়ে ছিল, তাঁর ছেলে কিনা কোচবাক্সে, কোচম্যানের পাশে বসে যাবে, শুনবামাত্র তিনি আরও বেশী রকম উগ্র হয়ে উঠলেন। কিন্তু তাঁর স্ত্রী আর গোলমাল করতে রাজি ছিলেন না, তিনি বললেন যাক না কেন কোচবাক্সে বসে, তাতে এমন কিছু মান যাবে না। ছেলেপুলে অমন গিয়ে থাকে, তাতে সব সময় খিটিমিটি করতে গেলে চলে না।"

বাবু চুপ করিয়া গেলেন।

ছেলেটীকে সযত্নে পার্শ্বে বসিয়ে পাঁচু সগর্ব্বে গাড়ী হাঁকাল। দু'দণ্ডের মধ্যেই ছেলেটীর সঙ্গে তার সৌহার্দ্দ্য স্থাপিত হয়ে গেল। সে জানলে তার এই নতুন বন্ধুটীর নাম শিবনাথ। সে কখনও এ দেশে আসে নাই। এই ক্ষণকালের আলাপেই শিশু পাঁচুর একটী অকৃত্রিম বন্ধু হয়ে উঠল। কথাটা আর কিছু নয়, শুধু মুখের মিষ্ট আলাপ। একে স্বভাবতঃই পাঁচু মিষ্টভাষী তার উপর এই ছেলেটী, এযে তার অন্তরতমের নিদর্শন। পাঁচুর হৃদয়ের অভ্যন্তরে স্থিত সাধনার প্রিয়তম আজ অন্তর ভেদে বাহিরে প্রকাশ হয়ে পড়েছে যে, পাঁচু আর কি থাকতে পারে ? তার দীর্ঘ বিশ বৎসরের পুঞ্জিভূত স্নেহ আজ প্রকাশ হয়ে পড়ে শতবাহু প্রসারিত করে শিশুকে বক্ষে নেবার জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠল।

শিশুর সঙ্গে তার আলাপ নিবিড়তর হয়ে উঠল, বন্ধুত্বের খাতিরে শিশু তার এই প্রৌঢ় বয়স্ক বন্ধুর নিকট প্রতিশ্রুত হল সে প্রত্যহই একবার করে তার বন্ধুর সহিত দেখা করবেই। সামান্য কোচম্যানের সঙ্গে তার এ বন্ধুত্ব প্রকাশ পেলে পিতা আর আস্ত রাখবেন না, তাই সে জানালে গোপনে বন্ধুর আসা চাই।

বাবুর নির্দ্দেশ মত বড় প্রাসাদসম অট্টালিকাটীর সামনে গাড়ী দাঁড় করাবার আদেশ পাঁচু পেলে। বাড়ীটির দিকে তাকিয়েই হঠাৎ সে একেবারে আড়ষ্ট হয়ে উঠল, তার মুখখানা শবের মতই মলিন হয়ে গেল, আর একটা কথাও সে বলতে পারলে না।

সে প্রতিজ্ঞা করেছিল এ বাড়ীর সোয়ারী কখনও তার গাড়ীতে নেবে না, এই দীর্ঘ বিশ বৎসর সে তার সেই প্রতিজ্ঞা অটুট রেখেছিল আজ হঠাৎ সে প্রতিজ্ঞা হারিয়ে ফেললে কেমন করে? নয়াবাজারের সোয়ারী হলেই সে যে আগে জিজ্ঞাসা করত, "কোন্ বাড়ী যাবেন?" বিশ বছরের এই ধ্রুব কথাটা সে আজ ক্ষুব্ধ শিশুকে দেখে কোথায় হারিয়ে ফেলেছিল, তার মোটে মনেই হয় নি নয়াবাজারে বাড়ীটার নাম জিজ্ঞাসা করতে হবে।

এতদূর আক্রোশ এই বাড়ীটার 'পরে তার ছিল, সে এ পথ দিয়ে গাড়ী হাঁকিয়ে গেলেও কখনো এ বাড়ীর দিকে ফিরেও চায়নি। আজ তাকে নিয়তিচক্রে এই বাড়ীরই লোকদের বয়ে নিয়ে আসতে হল।

পাঁচুর সোয়ারী নেমে পড়ল। ভাড়া নিতে পাঁচুর হাত কাঁপছিল, তবুও সে ভাড়া নিয়ে গাড়ী ফিরালে।

পথে আসতে একটা বুড়ীকে দেখে সে ভাড়ার পয়সা গুলো তাকে দিয়ে দিলে। সে যে আজ এই বাড়ীর ভাড়া নিয়ে গেছল সেই কথা ভুলে যাবার জন্যে চেষ্টা করছিল, নিশ্চয়ই ভুলতে পারত যদি না শিশুর মধ্যে জড়িত থাকত।

২

সে দিন পাঁচু আর ভাড়ায় গেল না, সমস্ত দিনটা চুপ করে নিজের ঘরটীতে বসে রইল। আজ থেকে থেকে তার মনে বিশ বছর আগেকার দিনগুলোর কথা মনে পড়ছিল। আঃ, কি সে দিনগুলোই না কেটে গ্যাছে। সে দিনের কথা মনে করতে পাঁচুর চোখে জল ধরে না যে। বিশ বছর আগে পাঁচু কি এই পাঁচু ছিল, এমনি জীর্ণ শীর্ণ চেহারা, এমনি নিঃসঙ্গ সম্পূর্ণ একাকী? পাঁচুর এই ঘরখানি পূর্ণ হয়েছিল, তার গৃহলক্ষ্মী ছিল, তার আদরের ছেলে আলি—তারা আজ সব কোথায়?

কি সুখেই না দিন কাটত তখন, যদিও তখন গাড়ী তার ছিল না, তবু দিন খেটে সে যা উপার্জন করত, তাতে তার দিন খুব সুখেই কেটে যেত। সকাল বেলা তাড়াতাড়ি করে পান্তাভাত খেয়ে সে বাড়ী থেকে বেরিয়ে যেত, সন্ধ্যার একটু আগে যখন বাড়ীতে ফিরত—তখন তার মনটা কি আনন্দেই ভরে থাকত। তার মনে হত, বাড়ীতে ফিরবার পথেই সে তার আলিকে দেখতে পাবে, সে পথে দাঁড়িয়ে থাকত তার বাপের প্রত্যাশায়। তারপর বাড়ীতে তার স্ত্রী ফতিমা।

কে জানে কি কৌক চাপলে তার ছেলের মাথায়, সে গাড়ীতে উঠবে। পাঁচু কয়দিন তাকে গাড়ীতে চড়ালে কিন্তু আর কত পারবে সে, সেও তো গরীব, দিন খেটে খায়!

নয়াবাজারের এই বাবুদের বাড়ীর গাড়ী খানা কবে যে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল কে জানে, সেই গাড়ীতে উঠবার জন্যে সে কি কান্নাই না ধরেছিল। ফতিমার একান্ত অনুরোধে নিজের মান খুইয়েও পাঁচু বাবুর বাড়ীর কোচম্যানকে কত খোসামোদ করলে একটী বার তাকে গাড়ীতে উঠাবার জন্যে, কিন্তু কোচম্যান কিছুতেই রাজি হল না। জমিদার বাবু যে গাড়ীতে উঠে বেড়ান, সেই গাড়ীতে উঠবে কিনা সামান্য শ্রমজীবির ছেলে?

পাঁচুর একান্ত অনুনয় বিনয়ে সে অবশেষে বললে "যদি বাবুর হুকুম নিতে পার তবে উঠাতে পারি।"

বাবুর হুকুম—কথাটা শুনে পাঁচু একেবারে বসে পড়ল, নিতান্ত হতাশ হয়েই সে ফিরে গেল।

কিন্তু আলির আবদার গেল না, কেঁদে কেঁদে তার শেষে জ্বর হয়ে পড়ল।

অসহায় ভাবে পাঁচু অবশেষটায় জমিদার বাবুর কাছেই গিয়ে পড়ল, তাঁর পা দুটো জড়িয়ে ধরে চোখের জলে ভিজিয়ে দিয়ে সে তার প্রার্থনা জানালে।

কাঙালের ঘোড়া রোগ—কথাটার এই খানে ঠিক ফলে যেতে দেখে জমীদার বাবু, তাঁর কর্মচারী প্রভৃতি সব হেসে উঠলেন; সে হাসিতে পাঁচুর মুখ কালো হয়ে উঠল, তবু সে দাঁড়িয়ে রইল।

জমিদার বাবু বেশ করে বুঝিয়ে দিলেন কাঙালের ছেলে যে, তার এ আবদার একেবারেই অসঙ্গত, তিনি এ আবদারের প্রশ্রয় কখনও দিতে পারবেন না। অতএব পাঁচু ফিরে যাও এবং ছেলেকে যেমন করেই পার শান্ত কর।

পাঁচু ফিরে এল। এর পর এক দিন সে কাজে

গিয়ে মোটে টিকতে পারল না, কি জানি তার প্রাণটা অত ছটফট করতে লাগল কেন তা সে মোটে বুঝতে পারলে না। নিতান্ত অসময়েই সে তার ক্ষুদ্র কুটীরের দিকে ফিরল।

পথের পরে জনতার তার পথ বন্ধ করলে। আর্ত্তনাদ শুনে সে ভিড় ঠেলে দেখলে তারই স্ত্রী রক্তাক্ত বিকলাঙ্গ মৃতপুত্রকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে হাহাকার করছে।

সব কথা শুনে সে একেবারে স্তব্ধ হয়ে গেল। কে তার কানে তুলে দিলে এই খানে জমীদার বাবুর গাড়ী খানা দাঁড়িয়েছিল, জমীদার বাবু নেমে কোথায় গেছলেন। আলি সেই সময় বাজার হতে ফিরে যেতে গাড়ীতে উঠবার এই সুযোগটা ত্যাগ করতে পারে নি, আস্তে আস্তে কখন সে গাড়ীতে উঠে তার খড়খড়ি, কাঁচ ইত্যাদি নাড়াচাড়া করে দেখছিল। সেই সময় জমিদার বাবু ফিরে এসে তাকে কান ধরে গোটাকত চড় মেরে গাড়ী থেকে ফেলে দেন। সে কাঁদতে কাঁদতে চলে আসছিল কোচম্যান গাড়ী হাঁকিয়ে দেয়। সেই উন্মত্ত বড় বড় ঘোড়া দুটি তার কচি কোমল দেহটাকে পদদলিত করে তার বুকের উপর ভারী চাকার দাগ এঁকে দিয়ে চলে গেছে।

এই বিচার—ইয়া আল্লা, তোমার মমতার রাজ্যে ধনী ও দরিদ্রে এত পার্থক্য? দুনিয়া খোঁজে কেবল পয়সা—দরিদ্রকে সে চেয়েও দেখে না? ইয়া মেহেরবান খোদা, এই তোমার মেহেরবাণী?

সুখের ঘর তার ভেঙ্গে গেল কতিমা ও দুদিন পরে কবরের মধ্যে শেষ শয্যা বিছালে। রইল কেবল পাচু, একা—হৃদয়ে দুঃসহ যাতনা ভোগ করতে।

নিজের জীবনে সে একেবারে বীতস্পৃহ হয়েছিল, কিন্তু শমন তাকে স্পর্শ করলে না, দুনিয়ার বাইরের মানুষ হয়ে সে এই দুনিয়াতেই বাস করতে লাগল।

সব ঘুচিয়ে সে করলে এই ঘোড়ার গাড়ী খানা। তার বড় ইচ্ছা ছিল যত গরীবের ছেলে মেয়ে সবাইকে সে তার গাড়ীতে উঠাবে। তার আলি যে গাড়ীতে চড়তে পায়নি, অবশেষে এই গাড়ীর চাকার তলেই প্রাণ গেছে, এই ব্যথাটা অহোরহ তার বুকে শেলের মতই বিঁধছিল, তাই সে যত ছেলে মেয়ে সবারই বন্ধু হয়ে গেল, সবারই পাচু-দা সে। একটী আলির বদলে সে দেশ সুদ্ধ আলি পেয়েছে, তবু সে ভুলতে পারে নি বাবুদের ওই বড় ফিটন গাড়ীই তার সর্ব্বনাশ করেছে। সেই গাড়ী খানা যখন তার পাশ দিয়ে ভারী একটা শব্দ তুলে চলে যেত, তার মনে হত সেই রবার চাকা চাকার গুম-গুমানি শব্দের মধ্যে তার আলির বুকভাঙ্গা কান্নাটা আজও বেজে উঠছে, সে সভয়ে তাড়াতাড়ি কানে আঙ্গুল দিত। বাবুদের বাড়ীর কাউকে সামনে দেখতে পেলেই তার মনে প্রবল জীঘাংসা জেগে উঠত, সে তাড়াতাড়ি আল্লাকে স্মরণ করে সরে যেত।

পাচু ভেবে ছিল আর সে সে পথে যাবে না, সে ছেলেটীর সঙ্গে আর কিছুতেই দেখা করা হবে না। কিন্তু মন তার ক্রমেই বড় বেদনাক্রান্ত হয়ে উঠছিল, তার মনে হতে লাগল তার আলি শিশুরূপে শুধু ওই গাড়ী খানাতে উঠতে পারবে বলেই ওদের ঘরে জন্মেছে। নিশ্চয়ই এ সেই আলি। ঠিক সেই বয়েস, সেই বেহায়া সেই মুখখানা, আর কথাও তার তেমনি।

এ আলি, নিশ্চয়ই আলি, আলিই এসেছে দুটি বছর পরে। অননুভূত আবেগে পিতৃ হৃদয় ভরে উঠল ওরে, তুই-ই এসেছিস আবার এতকাল পরে, আলি—আলি, আমার আলি যে আমার কাছে আবার কি তুই আসবি বাপ?

কল্পনা চোখে সে দেখতে লাগল শিশু তার আলি হয়ে আবার তার ঘরে এসেছে, তার জীর্ণ ঘর খানা দেখে কত দুঃখ করছে।

তখনই সে চমকে উঠল—ইয়া আল্লা, সে কি পাগল হয়ে যাবে এর কথা ভাবতে ভাবতে? শিশুকে সে নিজের ঘরে পাবে এমনই কি সৌভাগ্য তার? যা সে পাবে না তার জন্যে কেন তার এ আকাঙ্ক্ষা?

মন তাকে টানতে লাগল, সে আর থাকতে পারলে না। তার আলি বিশ বছর পরে যার দ্বারা হত হয়েছে তারই ঘরে জন্মেছে, সে তবে দূরে থাকে কেন? আলি যখন শত্রুর কোলে গিয়ে তারই শত্রুকে ঠাকুর-দা বলে ডাকছে, তারই শত্রুর ছেলেকে বাবা বলে ডাকছে, সে কেন আর সে অতীত শত্রুতা মনে জাগিয়ে রাখে?

হঠাৎ করে তার মনে আগুন জ্বলে উঠল,—আমি তাকে বাপ বলে আর ডাকতে পারলে না, সে ডাকলে গিয়ে মা-কে? সে যে এখন ও বেঁচে আছে, সে তো মরে নি। না, সেও মরেছে, আলির সঙ্গে সঙ্গে সেও মরে গ্যাছে। সে তো সে পাঁচু নয়, সে পাঁচু গ্যাছে, সেও নতুন হয়ে এ জগতে বাস করছে। পাঁচুকে আবার ছুটতে হল। সব ব্যথা ভুলে গিয়ে অতীত ঘটনা অতীতেই ফেলে রেখে ভবিষ্যতের পানে দৃষ্টি রেখে আত্মভোলা পাঁচু শিশুর সন্ধানে ছুটল।

নূতন বন্ধুটী দিব্য আদরের সঙ্গেই তাকে গ্রহণ করলে, কিন্তু বড় গোপনে—পাছে তার ডেপুটী বাপ কিম্বা জমিদার ঠাকুর-দা জানতে পারে।

এমনি গোপনে উভয়ের বন্ধুত্ব দিন দিন গভীর হয়ে উঠতে লাগল। তাদের মাঝখানে তখন বাধা দিতে কেউ ছিল না। শিশুর গর্ব্বাভিমানী ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট বাপ কি ধনাভিমানী জমীদার ঠাকুর-দা জান্‌তে ও পারেন নি তাঁদেরই বংশধর একটা সামান্য কোচম্যানের সঙ্গে এত আলাপ করছে।

পাঁচু এই ছেলেটীকে প্রায়ই তার গাড়ীতে উঠিয়ে খানিকদূর পর্য্যন্ত ঘুরিয়ে এনে মনে গভীর তৃপ্তি অনুভব করত, তার গাড়ীখানা করার সার্থকতা লাভ করত। বেশী দূর নিয়ে যেতে পারত না পাছে শিশুর পিতা বা পিতামহ জান্‌তে পেরে শিশুকে একেবারেই তার কাছে আসতে না দেন।

কিন্তু এক দিন সে ধরা পড়ে গেল।

পাঁচুর সঙ্গে শিশুর সৌহার্দ্যের কথা কিছুদিন আগে হতেই জমীদার মহাশয়ের কর্ণগোচর হয়েছিল, হাতে হাতে ধরতে পারেন নি বলে তিনি চুপ করে ছিলেন। এক দিন তাঁর চোখে পাঁচুর গাড়ীতে শিশু ধরা পড়ল। এই লোকটাকে তিনি যত ভয় করতেন তত আর কাউকেই করতেন না। তিনি এই সামান্য লোকটাকে অবহেলা করে উড়াতে চাইলেও পারতেন না। পথে এর সঙ্গে দেখা হয়ে গেলে তিনি তাড়াতাড়ি মুখ ফিরাতেন, বিশ-বছর আগেকার এক দিনের ঘটনা যে আজও তাঁর মনে জেগে আছে, তাঁর মুখখানাই তা প্রমাণ করে দিত। সে দিন পাঁচুর গাড়ীতে তাকে দেখে তিনি তখন কিছুই বলতে পারেন নি, রুদ্ধ রোষে গর্জ্জাতে গর্জ্জাতে বাড়ী ফিরে এলেন। শিশুকে এর জন্যে লাঞ্ছনা সহ্য করতে হল বড় কম নয়। বৈকালে পাঁচু যখন গুটিকত লিচু নিয়ে তাদের দেখা করার সঙ্কেত স্থানে গিয়ে দাঁড়াল, তখন শিশু এল না। উৎকণ্ঠায় সারা বৈকালটী সেখানে কাটিয়ে সন্ধ্যার পরে পাঁচু বাসার দিকে ফিরল। নিরাশায় তার হৃদয় তখন একেবারে ভেঙ্গে পড়ছে, পা দু-খানা টলছে; তবু সে মনকে এই বলে প্রবোধ দিলে হয় তো আজ আসতে পারে নি, কাল নিশ্চয়ই আসবে। পরদিন আবার সে গিয়ে আশায় আশায় সেখানে দাঁড়াল, কই, শিশু তো এল না। দু-তিন দিন গেল, শিশুর দেখা পাওয়া গেল না। সে দিনও বৈকালে সে শিশুর বড় প্রিয় লটকন ফল কতকগুলো নিয়ে সেখানে গিয়ে দাঁড়াল, আজ তার মন বলছিল নিশ্চয়ই সে শিশুর দেখা পাবে, আজ কখনও শিশু লুকিয়ে থাকতে পারবে না।

এ কি—ও বাড়ীতে কারা কাঁদে? এ কি আকুল আর্ত্তনাদ, পুত্রহারা জননীর চিৎকার। ধাঁ করে পাঁচুর মনে বিশ বছর আগের কথা জেগে উঠল, এ কণ্ঠ সন্তান-হারা মায়েরই বটে। ওই কে—বাবা আমার—শিশু শিশুনাথ একবার চা বাবা আর একবার মা বলে ডাক রে।

আহা-হা, অভাগিনী কাকে ডাকছিস? তার হাত হতে থরথর কেঁপে ফল গুলো পায়ের তলায় পড়ে গেল। সে বসে পড়ল। তার কানে তখন মায়ের আর্ত্তনাদ ভেসে আসছিল, সে সংজ্ঞা হারিয়ে ফেল্‌লে।

জ্ঞান হল তখন—যখন সন্ধ্যার মৃদু আঁধার ধরণীর বুকে ঘনিয়ে এসেছে তার সামনে পথ দিয়ে শিশুর শব নিয়ে কারা যাচ্ছে। শিশুর বাপ তাদের পেছনে—দুই চোখ বেয়ে তাঁর ঝরঝর ধারে অশ্রুধারা ঝরছে।

ইয়া আল্লা—পাঁচুর ইচ্ছা হল—সে একবার আর্ত্তস্বরে চেঁচিয়ে ডাক ছেড়ে বলে ওঠে—মেহেরবান খোদা, এই তোমার মেহের বাণী?

থর থর করে কাঁপতে কাঁপতে সে চলল।

আর আমার জগতে সে একাকী, আজ আমার তার কেউ নেই। কাল হতে আমায় তাকে গাড়ী নিয়ে ষ্টেশনে যেতে হবে, যে ছেলে-মেয়েদের সে ভুলে গেছল আমায় তাদের গাড়ীতে উঠতে হবে।

"আল্লা" মুক্ত কণ্ঠে পাচু কাঁদতে লাগল—হীন দুনিয়ার মালিক আর কেন? সকল বাঁধন কেটে ফেলে আবার কেন বাঁধনে জড়াও? আমার গাড়ীর সাধ মিটেছে প্রভু, আর আমার গাড়ীর কি দরকার? তোমার আদেশে আলি এসেছিল নিজ ঘরে আমায় গাড়ীতে সে বসতে পেরেছে এই আমার যথেষ্ট পাওয়ার আর আমি পেতে চাই নে।"

একবার শেষ সে তার ঘোড়া দুটিকে দেখবার জন্যে আস্তাবলে প্রবেশ করলে। একটা তখন ঘুমাচ্ছিল, আর একটা জেগেই ছিল। মনিবকে দেখবামাত্র আনন্দে তারা পা ঠুকে একটা অস্পষ্ট রব করে তার হাত খানা চাটতে লাগল সে এক একটী ঘোড়ার গলা জড়িয়ে ধরছিল, আর তার চোখ দিয়ে হু হু করে জল ছুটছিল, তার সব ব্যথা আজ মূর্ত্ত হয়ে উঠেছিল, সে আর কিছুতেই তাদের চাপা দিয়ে রাখতে পারছিল না। "থাক বাচ্চা খানা খা। কাল হতে আর আমায় দেখতে পাবি নে তাই দেখা দিতে এলুম বুঝেছিস? কাল তোদের অন্য মনিব হবে, তার কথা শুনিস?"

তাদের ভাষা তারা প্রকাশ করছিল শুধু পা ঠুকে আর তার গা চেটে দিয়ে। সেখান হতে ফিরে পাচু লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল। পরদিন সকাল হতে আর তাকে দেখতে পাওয়া যায় নি। তার ঘোড়া গাড়ী সরকারে জমা হল।

রমণী

[শ্রীকালিদাস ঘোষাল।]

তরুণের উৎসুক নয়ন চায় কি—তরুণীর হরিণ চোখ এইটেই ঠিক উত্তর হল কিনা জানিনা, তবে আমি নিজেকে এখনও তরুণ ব'লে ভাবি; এবং সেইজন্যই এইকথা ব'লতে সাহস ক'রলাম।

সুন্দর, কুৎসিৎ; মূর্খ, বিদ্বান; কবি, অকবি; জিতেন্দ্রিয়, অসংযমী; সকলেরই ঐ বয়সে মনটা একটু কি জানি কিসের হাওয়ায় চঞ্চল হয়ে উঠে। হবেই এটা স্বাভাবিক নিয়ম। যে বলে "আমার হয়না" হয় সে মিথ্যাকথা বলে, না হয় সে অন্য কোন জিনিসের চাপে মনের যাত্রা জেমে দিয়েছে। প্রাণশক্তি ঠিক সতেজ ও সরলভাবে তাতে নাই বুঝতে হবে।

এখন কথা হচ্ছে—কেন এমন হয়? পাশ্চাত্য-বিজ্ঞানবিদগণ বলবেন, "Sex Attraction" আর এদেশের Puritan class এর অনেকেই বলবেন এটা পাশব প্রবৃত্তি, দমন করাই শ্রেয়ঃ। কিন্তু তাঁরাই যে এটাকে সম্যকভাবে দমন করতে সমর্থ হয়েছেন তা তাঁরা মাটী ছুঁয়ে বলেন, মাটী থেকে দশ হাত উঁচু হয়ে ব'লেও আমরা বিশ্বাস করিনা। যে কথা হইতেছিল, এই কথাটীর একটী সুন্দর মীমাংসা সুবিখ্যাত ঔপন্যাসিক শরৎবাবু তাঁহার "চরিত্রহীনে" কিরণময়ীর দ্বারায় প্রকাশ করিয়াছেন। কথা গুলি বোধ হয় এই যে সৃষ্টিশক্তি (creative tendency) প্রত্যেক প্রাণীর ভিতর আছে। এখন মানুষের যখন যৌবন আসে, তখন তাহার ভিতরকার ঐ সৃষ্টিশক্তি অন্যদেহ সংযোগে অধিকতর সার্থক হবার জন্য শিরায় শিরায়, ধমনীতে ধমনীতে যে তাণ্ডবনৃত্য সুরু করিয়া দেয় তাকেই পণ্ডিতদের নীতিশাস্ত্রে পাশব প্রবৃত্তি বলিয়া ঘৃণা করা হয়।

এইব্যাখ্যাটী সকলের মনে ধরিবে কিনা জানিনা তবে এইটেই সত্যি বলিয়া মনে হয়।

এখন ঠিক হল ঐসময় একরূপ মনচাঞ্চল্য হয় ও কেন হয়। এখন ঠিক ক'রতে হবে মন যাহা বলে তাহা করা উচিত কিনা। আমাদের মতে নয়। কারণ মনের আবেগ সাময়িক, উহা নদীতে উত্থিত ঢেউয়ের মত স্বাভাবিক নিয়মে কমিয়া যাইবে।

অভিনেত্রী।

[শ্রীগিরিজাকুমার বসু।]

হীন প্রাণ নারীকুল গ্লানি! আমি জানি,
স্পর্দ্ধা তব দলিতে চরণে, জানি মনে
প্রেম তব শুধু অভিনয়; ইচ্ছা হয়,
কোটিবার তোমায় ধিক্কারি, মিথ্যাচারী,
ওই জিহ্বা টানিয়া ছিঁড়িয়া,—নিপীড়িয়া,
দিই-করি কুকুর শিয়ার—বুভুক্ষার,
তৃপ্তি ভরে; মনে লাগে খিঁচ—এত নীচ
তুমি, তারো যোগ্য অহরহ—নহ, নহ।
লঘুমতি দুর্ব্বল রমণী! ভাগ্য গণি
মনে নাই কোনদিন মন—দরশন,
দিনান্তেও শুধু একবার—এ আবার?
বল'নাই আপনার মুখে—ভাসি সুখে
"গর্ব্বে মোর ভরিছে হৃদয়—মিথ্যা নয়,
আপনি, যে ভালবেসেছেন—এসেছেন?"
বল'নাই "নাহি কিছু আর—বলিবার?"
বল'নাই "নহ, নহে কথা—কৃতজ্ঞতা।
স্পর্দ্ধা রাখ' ভালবাসিবার, অস্বীকার
বার বার সভার মাঝারে—কর তারে,
ভালবাসা নহে অপরাধ, নাহি খাদ
শুদ্ধ শুভ্র অনুরাগে কভু; তারে তবু,
মুক্ত কণ্ঠে করিতে প্রচার—ভয় যার,
শুদ্ধভাবে সখ্যের ধরায়—যেই চায়,
রাখিবারে, অন্তরের প্রেম—বহে ক্ষেম,
ভোলে যেই হতভাগী নারী—ধিক্ তারি!
কে তোমারে চিনাল জগতে? ঘাটে পথে
আজিকে যে দেখি ভক্তদল—সদা কোলাহল
করে সদা, তব অনুরাগী—সুখ-ভাগী,
কোথা ছিলে তুমি' কোথা তারা? আজ যারা
ওই প্রাণ নিয়ে করে খেলা, বন্ধু-মেলা,
উঠে জমি যাহাদের তরে—হর্ষভরে,
কে তাদের পরিচয় দিল—চিনাইল,
কে তোমারে দিল খুলি কারা—আলোধারা?
আজ তুমি ভাব বসি মনে—মনে মনে,
সেবা করি নিতে তোমার—উপকার,
করিছে যে এত, করমাস্—বারোমাস,
খাটিছে আদরে, পদতলে—কুতূহলে,
হাসিয়া যে দেয় দিন দিন' আঁখি কীণ,
চেয়ে চেয়ে ওই মুখ পানে, মনে প্রাণে,
তারা বুঝি প্রণয়-পাথারে—একেবারে,
গেছে ডুবি; সেবকের প্রাণ—আন্‌চান্।
মূর্খ-নারী! বুঝাইবে কেবা—পদ-সেবা,
প্রেম নহে; ভৃত্যের ভকতি—উর্দ্ধ গতি,
যদি করে লাভ, নহে তবু—সেই কভু
প্রেমিকের অন্তরের মাঝে—গর্ব্বে রাজে,
যে নিবিড় প্রীতি অনুপম—তার সম,
সখ্য পারে যাহা রূপ নিতে—ধরণীতে,
ভৃত্য নাহি হয় কোন দিন—প্রাণে লীন,
সুখে দুঃখে সখার মতন—সুক্ষণ।
একদিন তাহাদেরো হবে—বুঝে লবে,
ওই তব হাসি মাখা মুখ—ভরা বুক,
ওই তব রাঙ্গা-ছেঁচা বাণী—পদ্ম-পাণি,
সব সরে যাবে; কটু বলি—দিবে বলি,
উহাদের সকল সোহাগ, অনুরাগ,
বৈরাগে দাঁড়াবে; মর্ম্মে মর্ম্মে—প্রতি কর্ম্মে,
দহি দহি করিবে চীৎকার—প্রেম তার,
কোথা? অভিনেত্রী, কুহকিনী—কলঙ্কিনী।

সময়ের আহ্বান।

[অধ্যাপক শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার এম-এ]

বেলা বেশী নাই, সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল। মানুষকে সে দুখনিশায় সজাগ থাকতে বিশের যিনি বন্ধু তিনি আজ কত না প্রকারে বারে বারে বলছেন। সে ঘনঘটাময়ী আসন্ন তামসরাত্রির কথা মনে করতেও আতঙ্ক হয়। সে কল্প বন্যা এসে পড়ার আগেই আমাদের সময় থাকতে সাবধান হতে হবে; সকলকে সজাগ রাখার ব্যবস্থা এখন হতেই করতে হবে। সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় বিষয়ে এবং বাহিঃপ্রকৃতিতে ব্যাপকভাবে আসন্ন প্রলয়ের বাণ ডাকছে; মহাপুরুষেরা তাই আগে হতেই শুনতে পেয়ে যুগধর্মবরার ইঙ্গিতে এখন আমাদের চলতে বলছেন, তাঁর ইঙ্গা অনুসরণ করে আমরা এ বিপৎ-সাগর তরতে পারব এই ভরসায়। আমাদের কাজ ও চিন্তা এখন প্রেম, মিলন ও সেবামন্ত্রে পূত হওয়া চাই। এই মন্ত্রই একমাত্র সার জেনে, অন্তরে ধ্যান করে ও কাজে প্রতিফলিত করে আমরা এই দুস্তর সাগর উত্তীর্ণ হতে পারব; 'নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়'। তাই চাই আমাদের এখন থেকে এমন সব সেবাসঙ্ঘ গঠন করা যা যুগমন্ত্রে অনুপ্রাণিত হয়ে সমাজকে সে ঘোর দুর্দিনে বাঁচিয়ে রাখতে পারবে; অত্যাচার অনাচার ও অন্তর্বিপ্লবে ক্ষতবিক্ষত ও পঙ্গু সমাজদেহ তখন একমাত্র সেবামন্ত্রেই সঞ্জীবিত হবে। তাই চাই এখন থেকে যায়গায় যায়গায় তেমন সব সেবাপ্রাণ যুবক যারা তাঁর কাজে প্রাণ মন বিলিয়ে দিয়েছে। প্রলয়ঙ্করে যখন জীবলোক হাবুডুবু খাচ্ছে, 'ত্রাহি ত্রাহি' ডাক ছাড়ছে, তখন সেবকরূপেই দেবতা এসে মানুষের হাত ধরে তুলবেন; তাই তাঁর সে লোকত্রাণের কাজে সাহায্য করতে হলে এখন থেকেই মানবতার সেবায় আত্মনিবেদন করতে হবে। সেবায় হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান নাই—সেখা আছে ভ্রাতৃত্ব, প্রেম ও মিলন। সেবা-সঙ্ঘ এমনই ব্যাপক হওয়া চাই যেন কোন গ্রাম, কোন নগর ফাঁক না পড়ে, আত্মরক্ষা ও আর্তত্রাণে এগুলির প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে সকলেরই নির্ভয়ে একাজে নেমে পড়া উচিত। সামনে কত কল্প কত বন্যা; নিজেদের গৃহস্থালী ও স্ত্রী, পুত্র, কন্যার রক্ষার ভাবনা এখন হতেই ভাবার দরকার। সেবাসঙ্ঘের পাশাপাশি সর্ব্বত্র গৌর ও জানপদসেনা (Civic and territorial volunteers) গড়িয়ে তোলার দরকার। সরকারের জানপদসেনার (territorial force) দিকে আরও ঝোঁক দেওয়া উচিত। সময়ের ডাক সাজাগোজারও অপেক্ষা করে না। সকল যায়গাতেই সময়ের মানুষ কম বেশী এসে গিয়েছেন, তাঁদের কেউ কেউ কাজ আরম্ভ করে দিয়েছেন, কেউ বা ঘুমিয়ে পড়েছেন; তাঁরা তাঁর বাঁশীর রবে চেতন হবেন। এঁদের সংগ্রহের জন্য ও প্রলয়ঙ্করঘাতিঘাত সইতে আত্মিক বল লাভের জন্য সেবা-সেনা সঙ্ঘের সঙ্গে সঙ্গে সৎসঙ্গ কেন্দ্রসব স্থাপন করার দরকার, যার কাজ হবে এখন নগরে, গ্রামে, পথে, ঘাটে নামকীর্ত্তনে তাঁর যুগমঙ্গল গান, জগৎকল্যাণ কামনা এবং সেবা ও ব্রহ্মচর্য্যমহিমা প্রচারণ।

ইণ্ডিয়ান সোপ কোম্পানীর

মেসিনে প্রস্তুত

চন্দন, রয়েলবকুল, মাল্ট ও ভেলভেট সাবান

ব্যবহার করুণ। টেলিফোন, ২৪৯৬

ব্যতিক্রম

(উপন্যাস)

[শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্-এ]

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

বিনয়ের শ্বশুরবাড়ী রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে চারি ক্রোশ দূরে অবস্থিত। যাইবার আসিবার জন্য ভবসুন্দরীর সংসারে দুই তিন খানি ঘোড়ার গাড়ী ছিল। আহারান্তে বিনয় সদর-বাড়ীতে গিয়া পরেশবাবুকে একখানা গাড়ী ঠিক করিয়া রাখিতে বলিল কিন্তু পরেশচন্দ্র তাহাকে বলিলেন, "হুজুর, কোচম্যানের বাড়ীতে ভূতের উপদ্রব হওয়ায় সে ভিন্‌গাঁয়ে রোজা ডাকতে গিয়েছে। আজ তেমন সওয়ারীর হুকুম ছিল না সেই জন্য গিন্নী-মাকে জিজ্ঞেস করে আমি তাকে ছুটী দিয়েছি।" বিনয় একটু চিন্তিত হইল। বৈকাল বেলা সে অন্দরে গিয়া ভবসুন্দরীকে বলিল, "দেখুন, বাবা যখন তার করেছেন তখন আমাকে আজই যেতে হবে। আপনি একখানা গাড়ীর বন্দোবস্ত করে দিন, আমি চলে যাই।" ভবসুন্দরী কথাটা শুনিয়া প্রথমে রাগিলেন কিন্তু মনের ভাব গোপন করিয়া বলিলেন, "বাবা, তার আসবে তা তো জান্‌তুম না, আজকে সকালে কোচোয়ানকে ছুটী দিয়ে ফেলেছি।" বিনয় বলিল, আমি সচ্ছন্দে চার পাঁচ ক্রোশ হেঁটে যেতে পারি কিন্তু আপনার মেয়ে তো আর তা পারবেন না। আপনি একখানা গরুর গাড়ীর বন্দোবস্ত করে দিন, আমরা আজই চলে যাই। বাবা যখন বলেছেন তখন আজ যেতেই হবে।" "তা কি হয় বাবা! এত গাড়ী ঘোড়া থাকতে জমিদার বাড়ীর মেয়ে গ্রামের ভিতর দিয়ে গরুর গাড়ীতে গেলে লোকে কি বলবে। পরেশ যে পরেশ, সেও ঘোড়ার গাড়ী ভিন্ন চলে না।"

বিনয় বিষম বিপদে পড়িল, সে তাহার পিতার স্বভাব জানিত, সে বুঝিল যে আজই হরিহরপুর যাত্রা না করিলে তাহার আর রক্ষা থাকিবে না সুতরাং সে আবার বলিল, "দেখুন, যেমন করেই হোক, আজ যেতেই হবে।" ভবসুন্দরী তখন মুখ বাঁকাইয়া বলিলেন, "মেয়েকে কি বাপু এমন করে পাঠাতে পারি? লোকে কি বলবে! তোমার বাপের হুকুম যদি এতই জরুরী তাহলে তুমি না হয় কালই যাও, পরে এসে অন্নদাকে নিয়ে যেয়ো।" বিনয় বলিল, "দেখুন, এখন যদি আপনার মেয়েকে না পাঠান তাহলে বাবা অত্যন্ত রাগ করবেন। আমাকে পাঠান দূরে থাক, অপর লোকও পাঠাবেন কিনা সন্দেহ! কথাটা আপনি একবার বুঝে দেখুন, বাবা অত্যন্ত বদরাগী এখন না পাঠালে বিষম গোল হবে।" ভবসুন্দরী অপ্রসন্ন মুখে বলিলেন, "অবুঝের মত কথা কেন বলছ বাপু? এ বাড়ীর একটা মান সম্ভ্রম আছে তো! মেয়ে প্রথম শ্বশুর ঘর করতে যাবে, ঘর-বসতের জিনিষপত্র পাঠাতে হবে, পূজার তত্ত্বটাও করতে হবে। তোমাকে তো বলেছিই বাবা, সম্মুখে লাটবন্দী, তার টাকাই এখনো জোগাড় হয় নি। টাকা কড়ি না এলে কি করে মেয়ে পাঠাই বল!" "তবে আমায় অনুমতি করুন, আমি আজই চলে যাই।" ভবসুন্দরী সেই ভাবেই বলিলেন, "নেহাৎ যদি যাও তাহলে কাল সকালেই এসো।"

বিনয় হাসিয়া বলিল, "আপনি আমার অপরাধ নেবেন না, আমাকে এখনি যেতে হবে।" এই বলিয়া সে শাশুড়ীর উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া চলিয়া আসিল। সদর ও অন্দরের মাঝখানে একটা বড় দালানে সারদাসুন্দরী তাহাকে ধরিয়া ফেলিল এবং তাহার হাত ধরিয়া তাহাকে তাহার নিজের ঘরে লইয়া গেল। ঘরের ভিতর গিয়া দুয়ার ভেজাইয়া দিয়া সারদা বলিল, "বিনু অনর্থক রাগারাগি করছ কেন?" ভবসুন্দরী অন্নদাকে পাঠাইতে অসম্মত হওয়ায় বিনয়ের মনের গোল দূর হইয়া গিয়াছিল সুতরাং সে হাসি মুখে বলিয়া উঠিল, "আমি তো মোটেই রাগি নি দিদি। বাবা তার করেছেন সুতরাং আমাকে

আজকে যেতেই হবে। না গেলে হরিহরপুরের বাড়ীতে আমাকে আর ঢুকতে হবে না। রাগ তিনিই করেছেন, আমি কেন রাগতে যাব!" সারদা তাহার জাগর চক্ষু দুটি বিনয়ের চক্ষুর সহিত মিলাইয়া তাহার হাত দুখানি ধরিয়া কাতর স্বরে বলিল, "দেখ বিনু, আমি এখনো বড় ছেলে মানুষ, সে এখনো ভালমন্দ বুঝতে শেখে নি। তুমি তার উপর অনর্থক রাগ করো না। তোমার এখন এখানে কিছু দিন থাকা দরকার। কতটা দরকার তা তুমি বুঝতে পারছ না। বোধ হয় তোমার বাপ মাও পারছেন না। আমি মা'র আদুরে মেয়ে, মা আদর দিয়ে তার মাথাটি একেবারে খাচ্ছেন। কি রকম ভাবে যে কি হচ্ছে তা যদি তোমার বাপ মা বুঝতে পারতেন তাহলে তাঁরা তোমাকে কখনো হরিপুরে যেতে বলতেন না। দেখ কালো হলেই কুরূপ হয় না, তোমার মুখখানি এমন সুন্দর যে, তোমার কালো রং তাতেই মানিয়ে যায়। তুমি আমার কথা রাখ, এখন যেয়ো না। দুদিন এখানে থেকে আমার কথা শুনে চলো। দেখ আমরা বড় দুঃখিনী, সংসারে আমাদের আপনার বলতে কেউ নেই।" সারদাসুন্দরী সুন্দরী, তাহার রূপ তীব্র, কোমল নয়। কিন্তু সে এমন ভাবে কথা গুলি বলিল এবং কথার শেষে দুই বিন্দু অশ্রু-বিসর্জ্জন করিল যে, বিনয়ের মন গলিয়া গেল। সে বলিল, "দিদি, আপনি কাঁদবেন না, ভগবান কাকে যে কি ভাবে চালান তা তো বুঝতে পারা যায় না। দেখুন, আমি বাপমার একমাত্র সন্তান, তাঁদের মনে ব্যথা দিলে আমার মঙ্গল হবে না। উপস্থিত বাবা বড়ই রেগেছেন, আমি দুদিনের মধ্যে না ফেরাতে রাগটা বড়ই বেড়ে উঠেছে। আজ আমি না গেলে সে রাগটা পড়বে না। তার উপর আপনার মা যখন আপনার বোনকে পাঠালেন না তখন আমার বিলম্ব করা, উচিত নয়। আমি গেলে দুদিন যাবে যাবার রাগ নিশ্চয় পড়ে যাবে তখন তাঁর অনুমতি নিয়ে আবার আসব।" সারদা তখন বিনয়ের হাত ধরিয়া বলিল, "দেখ বিনু, আন্নিকে না পাঠানো অন্যায় হয়েছে। কিন্তু মা আন্নিকে কোন মতেই পাঠাতে পারবেন না। আমার জন্মের বার-তের বৎসর পরে আন্নি হয়েছে, মা তাকে একদণ্ড চোখের আড়াল করতে পারেন না। আমি একবার চেষ্টা করে দেখি, কোচম্যান গাঁয়েই লুকিয়ে আছে, সে কোথাও যায় নি। তার পেয়ে পাছে তুমি চলে যাও সেই ভয়ে মা তাকে সরিয়ে দিয়েছেন। আন্নি যদি তোমার সঙ্গে যেতে চায় তাহলে তুমি তাকে নিয়ে যাও, মাকে জিজ্ঞাসাও করো না।" বিনয় বলিল, "চেষ্টা করে কেন বৃথা সময় নষ্ট করবেন দিদি, তাঁর মতামত তো আমার অজ্ঞাত নয়। বিলম্বে কাজ নেই আমি চলে যাই।" সারদা তখন আবার বিনয়ের হাত ধরিয়া বলিল, "ছিঃ ছিঃ বিনু, তুমি রাগ করলে।" বলিতে বলিতে সারদা কাঁদিয়া ফেলিল। তাহার কুঙ্কুম-কুঙ্কুমের মত মুখখানা লাল হইয়া উঠিল আর বিনয় লজ্জায় মরিয়া গেল।

বিনয় বলিল, দিদি "আজ হরিহরপুরে না যাওয়া ছাড়া আপনি যা বলবেন তাই শুনব।" সারদা তখন তাড়াতাড়ি চোখ মুছিয়া বলিয়া উঠিল, "তবে তুমি দালানে দাঁড়াও, আমি আন্নিকে জিজ্ঞেস করে আসি।" বিনয় বাহিরের দালানে দাঁড়াইল, সারদা যে ঘরে অন্নদা বসিয়া ছিল সেই ঘরে গেল। অন্নদার কাছে তখন কেহ ছিল না, সে এক মনে পুঁথির মালা গাঁথিতেছিল। সারদা তাহাকে বলিল, "আন্নি, মা তোকে না পাঠানোতে তোর শ্বশুর বড় রাগ করেছেন। বিনু এখনি চলে যাচ্ছে, আমি বলি, তুই মাকে লুকিয়ে বিনুর সঙ্গে চলে যা।" অন্নদা মুখ না তুলিয়াই বলিল "যাৎ"। সারদা আবার বলিল, "দেখ আন্নি, তুই বুঝতে পারছিস নে, বিনু যদি চটে যায় তাহলে তোর কপালে একেবারে আগুন লাগবে।" অন্নদা জবাব দিল, "লাগুক গে। মা বলেছে আমায় পাঠাবে না, আর ওর গায়ে যে গন্ধ, ওদের বাড়ী যে মরলা সেখানে কে যাবে! আমাদের বাড়ীর মেয়ের শ্বশুর ঘর করতে নেই।" বিনয় দালানে দাঁড়াইয়া সমস্তই শুনিল সুতরাং সে সারদার অপেক্ষা না করিয়া বাহিরে চলিয়া গেল। উপরের একটা ঘরের জানলা হইতে সারদা দেখিল যে, বিনয় সমস্ত জিনিষপত্র ফেলিয়া বাড়ীর বাহির হইয়া গেল, তখন সে অকারণ হাসিতে আরম্ভ করিল এবং হাসিতে হাসিতে ঘরের মেঝেয় লুটাইয়া পড়িল।

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ

শরতের দীর্ঘ রাত্রির শেষে বিনয় যখন হরিহরপুরে পৌঁছিল তখনো চারিদিক অন্ধকার। সে একাই আসিয়াছিল এবং ষ্টেশনে গাড়ী না পাইয়া হাটিয়াই চলিয়া আসিয়াছিল। বাড়ীর দুয়ারে আসিয়া দেখিল যে দরজা তখনো বন্ধ। একজন লোক দরজার সম্মুখে একখানা কাঠের উপর বসিয়া সিগারেট টানিতেছে। অন্ধকারে বিনয় তাহাকে চিনিতে পারিল না। সে দূর হইতে জিজ্ঞাসা করিল "কে?" লোকটি বলিল, "চিনতে পারবে না, আমি নূতন লোক।" তাহার গলার আওয়াজ শুনিয়া বিনয় চমকিয়া গেল এবং জিজ্ঞাসা করিল, "কে-রে নিরু?" আগন্তুক বলিল, "তুই কে-রে, বিনু? এত রাত্তিরে বাহিরে কেন?"

বিনয় নির্ম্মলের কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তুই কখন এলি? আর এসেছিস যদি তাহলে বাইরে বসে আছিস কেন?" নির্ম্মল বলিল, "রাত্তির তিনটার সময় এসে পৌঁছেছি, দুই একবার ডাকাডাকি করে কারুর সাড়া পেলুম না, তাই বসে আছি; আমি মনে করছি যে, তুই বাড়ীর ভিতরে আছিস, তুই কোথা থেকে এলি?" বিনয় বলিল, "শ্বশুর বাড়ী গিয়েছিলুম ভাই, বাবার টেলীগ্রাম পেয়ে চলে এসেছি।" নির্ম্মল জিজ্ঞাসা করিল "বৌ নিয়ে এলি নে?" বিনয় নির্ম্মলের পাশে কাঠের উপর বসিয়া বলিল, "সে অনেক কথা। তুই হঠাৎ হরিহরপুরে এসে উপস্থিত হলি কেন রে?" "সেও অনেক কথা।"

"বাড়ীর লোক কি ভাববে?"

"আর কত টুকুই বা রাত্তির আছে, এখন বাড়ীর ভিতর গেলে ঘুম হবে না। তার চাইতে বাইরে বসে থাকি সকাল হলে বাড়ীর লোক যখন উঠবে তখন ভিতরে যাব।"

শরতের রাত্রি ধীরে ধীরে শেষ হইতে লাগিল, বিনয় বলিল, "এখানে এসে এমন অবস্থায় পড়ে গেলুম ভাই যে, তোকে কোন খবরই দিতে পারলুম না। মোহিনীর বিয়ে, অঘ্রাণ মাসে, পাত্র রেলে চাকরি করে তার আগে দু-একটি বিয়ে করেছে। এটি বোধার উপর শাকের আঁটি?" নির্ম্মল উত্তর দিল না। তখন বিনয় আবার বলিল, "আমি চেষ্টা করে কিছু করতে পারব বলে বোধ হয় না নিরু। এখানে যে রকম অবস্থা তাতে চেষ্টা না করাই বোধ হয় ভাল। তবে তোর বাবাকে বলে এসেছি একবার অন্য লোক মারফতে বলিয়ে দেখব। কিন্তু ফল আগে থাকতেই জানা আছে।" নির্ম্মল বলিল, "হুঁ"। বিনয় তখন আবার জিজ্ঞাসা করিল, "তুই কি জন্যে এলি?" নির্ম্মল বলিল, "নলু কলকেতায় ডিক্টোতে দিলে না বলে।" "এবার বাড়ীতে বলে এসেছিস তো?" "ইন্দিকে বলে এসেছি, আর কাউকে বলবার সময় পাই নি।" "তোর বাবা যদি ব্যস্ত হয়ে পড়েন?" "ইন্দি মাকে বলেছে, আর আমি কাল সকালে একখানা তার করে দেব। দেখ বিনু, সেই চাকরিটে পাকাপাকি হয়ে গেছে, কলেজের হেডক্লার্ক বলে রেখেছেন যে তুই যেদিন কলকাতায় ফিরবি সেই দিন থেকেই পড়াতে যাবি। একটি ছেলেকে পড়াতে হবে, সে কেবল এইবার এণ্ট্রান্স পাশ করেছে, তারা আপার-সার্কুলার রোডে থাকে, তোর মেস থেকে বেশী দূর নয়।" "নলু এমন কি করলে ভাই যে তোকে বাড়ী ছেড়ে চলে আসতে হল?" সে এমন উপদ্রব আরম্ভ করে দিলে যে, বাড়ীতে মুখ দেখানো ভার হয়ে উঠল। এক দিন গান শোনবার অছিলা করে আমাকে রামবাগানে এক বেশ্যার বাড়ীতে নিয়ে গেল। তারপর সেই বাড়ীর একজন বেশ্যাকে এমন করে আমার পিছনে লাগালে যে সে আমি না গেলে গাড়ী করে আমাদের বাড়ীর দুয়ারে এসে বসে থাকত। দু-দিন এই রকম দেখে ইন্দিকে সমস্ত কথা বলে চলে এসেছি। কোথায় যাব স্থির করতে না পেরে এই খানেই এলুম। আমার মেসো মশাই কাশীতে আছেন কিন্তু তাঁরা বড্ড বেশী বড় রকমের বড় লোক সুতরাং সেখানে যেতে ইচ্ছে হল না।" "তা এসেছিস বেশ করেছিস। আমরা দু ভাই এক সঙ্গে থাকলে অনেকটা বল পাব।"

ধীরে ধীরে শরতের নাতিদীর্ঘ রাত্রি ফুরাইয়া গেল, চারিদিকে পাখী ডাকিয়া উঠিল, একজন রাখাল দুয়ার খুলিয়া দিয়া গরুগুলি বাহিরে আনিয়া বাঁধিল। দুই বন্ধু বাহির বাড়ীতে ঢুকিয়া দেখিল যে বিনয়ের মাতা পূজার

দালানের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। মা তাহাকে দেখিয়া বলিলেন, "তোরা কখন এলি রে?" দুই জন এক সঙ্গেই উত্তর দিল, "ভোর রাত্তিরের গাড়ীতে।" মাতা তখন বিনয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৌমা আসে নি?" বিনয় বলিল, "না।" দেবী পক্ষে বধূ আনিতে গিয়া পুত্র একা ফিরিয়া আসিয়াছে শুনিয়া বিনয়ের মাতার মুখ শুখাইয়া গেল, বিনয় তাহা লক্ষ্য করিয়া নির্ম্মলের কানে কানে একটা শক্ত কথা বলিয়া ফেলিল।

পুত্রের মনের ভাব মাতার বুঝিতে বাকী রহিল না। তিনি বলিয়া উঠিলেন, "তোরা বাড়ীর ভিতর যা, আমি আসছি।" বিনয় বাড়ীর ভিতর গিয়া নির্ম্মলকে বসাইয়া চায়ের বাসন ও চা খুঁজিতে ব্যস্ত হইয়া পড়িল। সে বাড়ীতে কেহ চা খাইত না সুতরাং বিনয় না আসিলে চায়ের বাসনের দরকার হইত না। বিনয় অনেক সন্ধান করিয়া পুরোনো তেঁতুলের কলসীর মুখে চায়ের টিনটা খুঁজিয়া পাইল, পরে পরে একটা পেয়ালায় পুরাতন ঘৃত ও আর একটায় গঁদের আঠা দেখিয়া হতাশ হইয়া উপরে উঠিয়া আসিল। সে দিন বিলক্ষণ গরম। নির্ম্মল জামা খুলিয়া পাখার বাতাস খাইতেছিল। এই সময় বিনয় একটা পিতলের ঘটী ও দুইটা কাঁসার গ্লাস ও চায়ের টিন লইয়া সেখানে উপস্থিত হইল। পিতলের ঘটী ও কাঁসার গ্লাস দেখিয়া নির্ম্মল বলিয়া উঠিল, "কিরে, এত বাসন কি হবে?" বিনয় হাসিয়া বলিল, "চায়ের পেয়ালায় পিসিমা পুরোনো ঘি মাখায় তাতে এমন দুর্গন্ধ হয়েছে যে, আজ আর তাতে চা খেতে ভরসা হচ্ছে না, আর একটা পেয়ালায় গঁদের আঠা এমন শক্ত আলিঙ্গন করে ধরেছে যে, তার ছাড়াতে অন্তত দু-ঘণ্টা লাগবে। টি-পটটা আর রেকাবী গুলো দেখতেই পেলুম না।" "ঘটীটা কি পায়খানার ঘটী ভাই?" বিনয় নির্ম্মলের গণ্ডদেশে এক চপেটাঘাত করিয়া বলিল, তুই একেবারে কলকাতার বাঙ্গাল, পল্লী-গ্রামে ব্রাহ্মণের বাড়ীতে পায়খানার ঘটী কখনো শোবার ঘরে ঢোকে?" নির্ম্মল নির্ব্বিবাদে চড়টা হজম করিয়া বলিল, "চেহারা দেখে ঠাকুর ঘরের ঘটী বলেও তো বোধ হয় না।"

এই সময় রুদ্র মূর্ত্তিতে হরশঙ্কর আসিয়া পড়ায় দুই বন্ধু ঘটী গেলাস ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। হরশঙ্কর জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৌমা আসেন নি?" বিনয় শান্ত শিষ্ট নিরীহ বালকের মত বলিল, "আজ্ঞে না।" হরশঙ্করের ক্রোধ তখন পুত্রের উপরে পড়িল, তিনি বলিলেন, "তুই তাহলে বৌমাকে এখানে আনবার কথা তাদের একেবারেই বলিস নি?" "আজ্ঞে নিশ্চয়ই বলেছিলুম, আপনার টেলীগ্রাম পেয়ে সে বাড়ী ছেড়ে আসবার এক মিনিট আগে অবধি বলেছিলুম।" "তারা কি বললেন?" "তাঁরা বললেন, যে, পুজোর সময় মেয়ে পাঠানো অসম্ভব, আর মেয়ে পাঠানো তাঁদের বংশের রীতি নয়।" হরশঙ্কর অল্পক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া বলিলেন "বেশ।" তাহার পর অত্যন্ত রাগিয়া দ্রুত পদে নীচে নামিয়া গেলেন। নির্ম্মল বিস্মিত হইয়া দেখিল যে, বিনয় নীরবে হাসিতে আরম্ভ করিয়াছে।

পিতলের ঘটিতে চা তৈয়ারী করিয়া তাহা কাঁসের গ্লাস হইতে বিনয় যখন অমৃত ধারার মত পান করিতে আরম্ভ করিল তখন নির্ম্মল নির্ব্বিবাদে আর একটা গ্লাস উঠাইয়া লইল।

ত্রয়োত্রিংশ পরিচ্ছেদ

ষষ্ঠিরদিন সন্ধ্যাকালে এক অষ্টপক্ক বৃদ্ধ ছাতি মাথায় দিয়া হাতে লাঠি ধরিয়া বিনয়ের বাড়ীর পূজার দালানের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, নির্ম্মল তখন বাতাসী লেবু শুনিতেছিল আর বিনয় নারিকেলের সন্দেশ ওজন করাইয়া তাঁড়ারে উঠাইতেছিল। নির্ম্মল কলিকাতার অভ্যাস মত তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "কাকে খুঁজছেন মশাই?" বিনয় তাহাকে বাধা দিয়া বলিল, "দূর বাঁদর, একি কলকাতা। যোধনের মুখে ব্রাহ্মণ বাড়ীতে এসেছেন, অকথা কি বলতে আছে। আসুন আসুন বসতে আজ্ঞা হয়।" বৃদ্ধ পূজার দালানের উপরে উঠিয়া দাঁড়াইল, বিনয় এক ঘটী জল গড়াইয়া দিল, বৃদ্ধা পা ধুইয়া দালানের দর-দালানে একখানা কুশাসনের উপর বসিল। তখন বিনয় জিজ্ঞাসা করিল, "তামাক খাবেন কি?" বৃদ্ধ একটু হাসিয়া বলিল' "এবাড়ীতে এখনও একটু ভদ্রতা আছে দেখছি। তামাক আন তবে

তোমাদের এখানে আজ থাকা হবে না, কারণ চক্রবর্ত্তী-দের বাড়ীতে একটা কুটুম্বিতার কথা আছে। আজ সেইখানেই রাত্রিবাস। বিনয় তামাক সাজিতে বসিল কিন্তু নির্ম্মল হাতের কাজ ভুলিয়া গেল, কারণ চক্রবর্ত্তী দের বাড়ীর কুটুম্বিতার কথা শুনিয়া তাহার বুদ্ধি লোপ হইয়াছিল। বৃদ্ধা তামাক টানিতে টানিতে জিজ্ঞাসা করিল, চক্রবর্ত্তীদের বাড়ী কোন্‌দিকে বাপু? আমাকে একটু পথ দেখিয়ে দিতে পার?" বিনয় বলিল, "চলুন আমিই নিয়ে যাচ্ছি।" অর্দ্ধদণ্ড ধরিয়া তামাক টানিয়া বৃদ্ধা যখন উঠিল তখন সূর্য্যাস্ত হইলেও অন্ধকার হয় নাই। বিনয় বৃদ্ধের সহিত বাড়ীর বাহির হইল, অর্দ্ধ-পথে গিয়া সে পিছন ফিরিয়া দেখিল যে নির্ম্মল তাহার সঙ্গে সঙ্গে আসিতেছে। বিনয় তখন একবার দাঁড়াইয়া গিয়া নির্ম্মলকে ফিরাইবার চেষ্টা করিল কিন্তু নির্ম্মল কিছুতেই বুঝিল না। তিনজনে যখন চক্রবর্ত্তী গৃহে উপস্থিত হইল তখন অন্ধকার ঘন হইয়া আসিয়াছে, বৃদ্ধ সদানন্দ চক্রবর্ত্তী চণ্ডীমণ্ডপের সম্মুখে মোড়া পাতিয়া বসিয়া কলিকায় ফুঁ দিতেছিল। চণ্ডীমণ্ডপের ভিতরে এককোণে একটা জীর্ণ কাচের লণ্ঠনের মধ্যে পিতলের গ্লাসে নারিকেল তেলের বাতী জ্বলিতেছিল, সদানন্দ তাহার ক্ষীণালোকে নবাগত বৃদ্ধকে চিনিতে পারিলেন না। প্রথম বৃদ্ধ তাহা বুঝিতে পারিয়া বলিল, "আমি কাশীপুরের জানকিরাম চট্টোর পুত্র গৌসাইদাস। তুমি তো সদানন্দ চক্রবর্ত্তী? তোমার নাকি কন্যা আছে? মূল করবে?" প্রশ্ন শুনিয়া নির্ম্মলের মাথা ঘুরিয়া গেল, সে চণ্ডীমণ্ডপের এক কোণের একটা বাঁশের খুঁটি ধরিয়া বসিয়া পড়িল

তাহার অবস্থা দেখিয়া বিনয় তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া তুলিয়া তাহাকে অনেক কষ্টে চক্রবর্ত্তীদের বাড়ীর বাহিরে লইয়া গেল। বাড়ীতে ফিরিয়াও নির্ম্মল অনেকক্ষণ কথা কহিল না। অনেকক্ষণ পরে সে হঠাৎ বলিয়া উঠিল, "বিনু, যেমন করে হোক এ বিয়েটা বন্ধ করতে হবে।" কথা শুনিয়া বিনয় খিল্ খিল করিয়া হাসিয়া গড়াইয়া পড়িল, অনেকক্ষণ পরে সে হাসির বেগ থামাইয়া বলিল, "দেখ, এটা ১৯০১ সাল, আর বাঙ্গলাদেশ, ইংরেজের রাজ্য। ভদ্র ব্রাহ্মণের ঘরের কুমারী তোর রূপে মুগ্ধ হয়ে গ্রেট্‌নাগ্রীন এও যাবে না, তার সঙ্গে সিভিল ম্যারেজও হবে না। তাকাতীও করতে পারবি নে, কক্সিপ্ট-হরণও হবে না। পাগলামী করিস নে, মাথা ঠাণ্ডা কর্। দেখ ভাই, চক্রবর্ত্তী জ্যেঠার যে রকম মত তাতে তিনি বোধ হয় এই বুড়োর কথাতেই নেচে উঠবেন। আশ্বিন কার্ত্তিক দুটো মাস বিয়ে হবে না, সুতরাং সময় আছে। আমি অনেকদিন ধরে একটা মতলব এঁটে রেখেছি সেটা তোকে এখনো বলা হয় নি। আমাদের গ্রামে এক জেনারেল বড়-দি' আছেন, তিনি বাবারও ঠাকুর মা আমার ও ঠাকুর-মা, পুরুষেরা তাঁকে ঠান দি বলে আর মেয়েরা বইঠাকরুণ বলে ডাকে। চল তোকে সেখানে নিয়ে যাই।"

নির্ম্মল কোন কথা না কহিয়া উঠিল, পূজার ভাণ্ডারের ভার একজন আমলার উপর দিয়া বিনয় নির্ম্মলের সহিত বড়-দি'র বাড়ী চলিয়া গেল। বড়-দি তখন উঠানে তুলসী মঞ্চের কাছে বসিয়া মালা জপ করিতেছিলেন। বিনয় দুয়ারে দাঁড়াইয়া হাঁকিল, "বড় ঠান্ দি বাড়ী আছ?"

ঠান্-দিদি উত্তর না দিয়া তামাক পোড়ার ছেপ ফেলিয়া জানাইলেন যে তিনি বাড়ীতেই আছেন। দুয়ারের বাহিরে জুতা খুলিয়া রাখিয়া বিনয় নির্ম্মলের সহিত প্রবেশ করিল। ঠানদিদি একদণ্ড কথা কহিলেন না, তাহার পরে মালা রাখিয়া প্রণাম করিয়া এক নিশ্বাসে তাহাকে তাহার শ্বশুর বাড়ীর সমস্ত সংবাদ দিয়া তাহার শ্বাস রুদ্ধ করিয়া ফেলিলেন।

"হাঁরে, তোর নাকি বৌ মনে ধরে নি? তোর শাশুড়ী বৌ পাঠায় নি কেন? তারা নাকি সোন্দর বলে বড় গুমর করে? একটা জাতীর ছেলে নাকি কেত্তন গাইতে পারে বলে গিন্নীকে একেবারে পেয়ে বসেছে? তোর বড় শালীর স্বভাব ভাল নয়, না? আমাদের মুখোজ্যে বাড়ীর সেজো বোয়ের বোন-পো ঐ বাড়ীতে বিয়ে করেছিল, সে বৌও একদিনের তরে শ্বশুর-ঘর করে নি। তোর শাশুড়ী অনেক দিন আগে তীরপুনীতে গঙ্গা নাইতে এসেছিল, তখন তোর বড় শালীর সবে বিয়ে হয়েছে।

সোম্বর বলে তখনই ছুঁড়ীর ঠেকার দেখে কে? তোর বাপকে অনেক বলেছিলুম ভাই, কিন্তু হরু তো পয়সার লোভ সামলাতে পারলে না। তুই আর একটা বে-থা কর্, আমি একটু বড়-ঘর দেখে একটি কনে' খুঁজে দিই।" ঠান্-দিদির কথা শুনিয়া বিনয় কাঁপিয়া উঠিল, কারণ তিনি মুখে যাহা বলিতেন, কাজেও প্রায় তাহাই করিতেন। সে হাত জোড় করিয়া বলিয়া উঠিল, "দোহাই বড় দি, তোমার পায়ে পড়ি, এক বিয়ের চোটেই অস্থির আবার গলায় দড়ি দিয়ো না।" "বিনু, তুই বুঝি কলকাতার সে ছুড়ীকে এখনো ভুলতে পারিস নি? সঙ্গে উটী কে, সেই শিরিলি-বাবুদের ছেলে বুঝি? ও ভাই, তোমরা তো শুনেছি ছেলে কিনে নিয়ে যাও, বিনুটাকেও কিন্‌লে না কেন? হরু প্রথম প্রথম চটত বটে, কিন্তু টাকা পেলেই জল হয়ে যেত।" নির্ম্মল মস্তক অবনত করিয়া কহিল, "তাবিতব্য ঠান্‌দি।" ঠান্-দিদি বলিলেন, "তুমি তো সিগারেট খাও, খাও না আমার তো তাতার নেই ভাই যে, তামাক দিগারেট খাবে। তামাক পোড়ার হোক্কা আছে, বল খাও তো এনে দিই।" নির্ম্মল বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আমি সিগারেট খাই, আপনি কি করে জানলেন ঠান্-দি?" "অনেক কথা জানি ভাই। চক্কত্তি বাড়ী বুড়ো ঘাটের মরা পোঁসাইদাস এসেছে তাও জানি আর এই এক প্রহর রাত্তিরে বিনু তোমায় আমার বাড়ীতে কেন এনেছে তাও জানি। ঠাণ্ডা হয়ে বসে সিগারেট খাও। মোহিনীর মত রূপসীর বাসর শ্মশান ঘাটে হবে না; যদি হয় তাহলে জেনো নেত্য বামনী কায়েতের মেয়ে।"

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

সকাল বেলায় উঠিয়া হরশঙ্কর পূজার দালানের সম্মুখে নির্ম্মল ও বিনয়কে দেখিতে পাইয়া তাহাদিগের সঙ্গে গল্প করিতে বসিয়া গেলেন, তাহা দেখিয়া বিনয় বড়ই আশ্চর্য্য হইয়া গেল। হরশঙ্কর সাধারণতঃ বড় বেশী কথা কহিতেন না, তিনি বিষয় কর্ম্ম ও পাশা খেলা লইয়া অত্যন্ত ব্যস্ত ভাবে সমস্তটা দিন কাটাইয়া দিতেন। বিনয় যদিও তাঁহার একমাত্র পুত্র তথাপি তাহাকে কোন কথা বলিতে হইলে বা কোন আদেশ করিতে হইলে তিনি তাহার মাতাকে দিয়া তাহা শুনাইতেন। এইরূপ জীবন যাত্রায় বিনয় অত্যন্ত হইয়া গিয়াছিল, সুতরাং হঠাৎ পিতাকে কাছে আসিয়া বসিতে দেখিয়া সে অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইয়া গেল।

হরশঙ্কর বসিয়াই প্রথমতঃ নির্ম্মলকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবাজী, দ্বিতীয় বিবাহ সম্বন্ধে তোমার মত কি?" নির্ম্মল অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া বলিল, "মত আর কি। তবে এক স্ত্রী মারা গেলে অনেক সময় পুরুষের আর এক বার বিবাহ করা উচিত। বাল-বিধবাও—" হরশঙ্কর তাহার কথায় বাধা দিয়া বলিলেন, "বিধবা বিবাহ এখন পাড়াগাঁয়ে অসম্ভব। আমি পুরুষের দ্বিতীয় বিবাহের কথাই বলছি। স্ত্রী মারা গেলে তো বিবাহ করাই উচিত কিন্তু স্ত্রী থাকতে বিবাহ করা উচিত কি না?" নির্ম্মল ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিল, "এক স্ত্রী বর্ত্তমানে আবার কেমন করে বিবাহ হতে পারে?" "কেন হতে পারে না? বিষ্ণুর তো ভাইফোঁটা দরকার নাই, আমার ঠাকুর এক সঙ্গে সাতটি বিবাহ করেছিলেন।" "সে সব দিন তো চলে গেছে, এখন আর লোকে এক সঙ্গে সাতটি বিবাহ দিতেও চায় না আর জেনে শুনে কেউ "জামাই-বারিকের" বগলা-সুন্দরীর স্বামীর মত দেহটাকে পার্টিসন করতে চায় না।" হরশঙ্কর শেষের কথাটা শুনিয়া একটু হাসিয়া ফেলিলেন, তাহার পরে বলিলেন, দেখ, আমাদের সমাজ থেকে সে সব দিন এখনো একেবারে যায় নি। বিনয় আমার একমাত্র সন্তান, আমি তাকে পোষ্যপুত্রও দিতে পারি না, ঘর-জামাই হবার জন্যেও ছেড়ে দিতে পারি না, অথচ তার শ্বশুরী এখন বলে পাঠিয়েছেন যে তাঁদের বংশের মেয়ে শ্বশুর ঘর করতে যায় না, সুতরাং বিনয়কে তাঁর বাড়ীতে গিয়ে বাস করতে হবে। বিনয় যদি পয়সার লোভে অথবা রূপের মোহে ঘর-জামাই হতে না চায় তাহলে তার দ্বিতীয় বার বিবাহ করা উচিত কি না?" সহসা উত্তেজিত হইয়া নির্ম্মল বলিয়া উঠিল, "নিশ্চয় উচিত, একশ'বার উচিত। আমাদের বাড়ীর আমাদের সমাজের ঘর-জামাই গুলো ক্রমে মানুষ থেকে পশু হয়ে যায়, কেন হয়ে যায় তা আমি বুঝতে পারি না——" কথাটা বলিয়াই নির্ম্মল অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল, তাহার মনে পড়িয়া

গেল যে তাহার পিতা তাহার একমাত্র ভগ্নিকে ইচ্ছা করিয়া যে পাত্রে সমর্পণ করিয়াছেন সে পাত্রটি শ্বশুর গৃহে পদার্পণ করিবার অনেক পূর্ব্বেই অকুলোর পূত্র হইয়া গিয়াছিল। তাহাকে নীরব দেখিয়া হরশঙ্কর বলিলেন, "কি হে, থামলে কেন? তোমার কথাই ঠিক, বুঝলে? শ্বশুর বাড়ি গিয়ে ঘর-জামাই হলে বিদু হয় তো গাড়ী জুড়ী চড়ে বেড়াতে পারে কিন্তু এখানে মোটা ভাত মোটা কাপড় পরেও সে বাপের পরিচয় দিতে পারবে, শ্বশুরের পরিচয় দিয়ে সমাজে পরিচিত হতে হবে না।" বলিয়াই হরশঙ্কর হাসিয়া উঠিলেন, কিন্তু তাঁহার হাসি দেখিয়া বিনয় শিহরিয়া উঠিল।

অল্পক্ষণ পরেই নির্ম্মল আস্তে আস্তে বলিল, "একটা স্ত্রী-লোককে জন্মের মত স্বামী স্বত্বেও বিধবা করবার পূর্ব্বে তাকে একবার শোধরাবার সময় দিলে হত না?" হরশঙ্কর উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, "দেখ বাপু, আমাদের সমাজে বাপ-মা মেয়েকে যে ভাবে গড়ে তোলেন, মেয়ে বড় হয়ে সেই ভাবই পায় সেই জন্ত আমাদের দেশে অতি অল্প বয়সে মেয়ের বিবাহ দেবার প্রথা আছে, কারণ তাহলে শ্বশুর ঘরে তার মতিগতি পরিবর্ত্তনের আশা থাকে। এক্ষেত্রে বিনয়ের শ্বাশুড়ী তাঁর মেয়েকে যে ভাবে গড়ে তুলছেন তাতে তাঁর মেয়ের মতিগতি পরিবর্ত্তনের কোন আশাই নাই, আমাদের বাড়ীতে আসতে দিলে তার মতিগতি হয় তো বদলে যেত কিন্তু এখন আর তার কোন আশাই রইল না।" "এক্ষেত্রে কিন্তু প্রকৃত অপরাধী বিনয়ের শ্বাশুড়ী এবং তাঁর অপরাধের জন্ত তাঁর মেয়েকে বোধ হয় খুব কঠিন দণ্ড দেওয়া হচ্ছে।" "কতকটা তা হচ্ছে বই কি, বাপমায়ের অপরাধের জন্ত সন্তানকে অনেক সময়েই শাস্তি ভোগ করতে হয় কিন্তু তার কোন উপায় নেই।"

হরশঙ্কর এই বলিয়া চলিয়া গেলেন, নির্ম্মল ও বিনয় স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া রহিল। বেলা বাড়িয়া উঠিল, পুরোহিত আসিয়া পূজোর দালানে বসিলেন, বিনয় স্নান করিতে গেল, নির্ম্মল তখনও বসিয়া রহিল। তাহার মনে ভীষণ যন্ত্রনা আরম্ভ হইয়াছিল, কারণ সে ভাবিতেছিল যে, হঠাৎ বেকুবের মত একটা কথা বলিয়া ফেলিয়া বিনয়কে অকারণ বিপদগ্রস্ত করিয়াছে। আশ্বিনের প্রখর রৌদ্রে বসিয়া ভাবিতে ভাবিতে হঠাৎ তাহার মনে হইল যে, নৃত্য ঠানদি হয় তো এই রোগেরও প্রতিকার করিতে পারিবেন। নির্ম্মল সর্ব্বদাই আকস্মিক উত্তেজনার বশবর্ত্তী ছিল, ঠান্-দিদির কথা মনে হইবামাত্র সে উঠিল এবং স্নান করিবার ছলে বাড়ীর ভিতর হইতে গামছা খানা লইয়া নদীর পরিবর্ত্তে সে নৃত্য ঠাকুরাণীর বাড়ীর দিকে চলিল।

সে গিয়া দেখিল যে, ঠান্‌দিদি স্নান করিয়া আসিয়া জপে বসিয়াছেন আর তাহারই মত বিনয় তাহার সম্মুখে বসিয়া আছে। বিনয়কে দূর হইতে দেখিয়া নির্ম্মল হাসিয়া উঠিল, সে শব্দ শুনিয়া বিনয়ের মুখখানা আরও কাল হইয়া গেল। নৃত্য ঠাকুরাণী তখন জপের মালাটা রাখিয়া বলিলেন, "এসো ভাই এসো। আমিও ভাবছিলুম যে তুমিও আসবে। সকাল বেলা ঘাটে গিয়ে বিদুর বিয়ের কথা শুনে এলুম তা হক তো অন্যায় কথা কিছু বলে নি, সে ঘরের মেয়ে কখনো শ্বশুর ঘর করে না আর বিদুর-মাও বিদুকে ছেড়ে একদণ্ডও বাঁচবে না সুতরাং আজই হোক আর দু'দিন পরেই হোক বিদুকে আবার বিয়ে করতেই হবে।" নির্ম্মল খপ করিয়া বসিয়া পড়িয়া বলিল, "ঠান্-দি, কর্ত্তার যখন আর এক বার ছেলের বিবাহ দেবার ইচ্ছা হয়েছে তখন হয় তো অঘ্রাণ মাসেই বিদুর আবার বিয়ে হবে। বিদু তো আমার মত নয় যে পালিয়ে বাঁচবে। তুমি কোন রকম করে উপস্থিত বিয়েটা বন্ধ রাখতে পার?" ঠান্ দিদি বলিলেন, "পারি, তোরা এখন নাইতে যা, বেলা হলে পুজোর বিলম্ব হয়ে যাবে এখনই পাড়ার পাড়ায় তোদের খুঁজতে লোক বেরুবে।" নির্ম্মল আর কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া বিনয়ের হাত ধরিয়া উঠিয়া পড়িল। (ক্রমশঃ)

অস্তিত্ব।

[শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী।]

তুমি আছ, তুমি আছ মালার মত জড়িয়ে,
সারা জীবন ভরিয়ে।
আমার গানে, আমার প্রাণে,
আমার বলে, আমার মানে,
আমার শোকে, আমার তাপে,
আমার পুণ্য, আমার পাপে
ছড়িয়ে।
আমার করমে, আমার ধরমে,
আমার হরষে, আমার মরমে,
আমার আশাকে, আমার বাসাকে,
আমার ভাবনা, আমার ভাষাকে
ঘেরিয়ে।
আমার সুখে, আমার দুখে,
আমার পাশে, আমার বুকে,
আমার হায়! এ মোহের ভাঙে,
আমার ভাঙা জীবন নাঝে
হারিয়ে।
আমার বেণুতে, আমার তন্তুতে
আমার হৃদের প্রতিটী অণুতে,
আমার প্রণামে, আমার নিশাসে,
আমার কামনা, আমার বিশ্বাসে
বেড়িয়ে।
তুমি আছ, তুমি আছ মালার মত জড়িয়ে,
সারা জীবন ভরিয়ে।

নিবেদন

বাসন্তীতে বন্ধুবর যে অনুযোগ উত্থাপন করিয়াছেন তাহার ভয়ে সাহিত্যের কমলবনচারী করীবৃন্দ কতদূর ত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছেন—বাঙ্গলা দেশের বাহিরে সুদূর পর্ব্বত বেষ্টনীর মধ্যে বসিয়া তাহা অনুভব করিতে পারি না, তবে সত্য কথা বলিতে কি—কলম ধরিবার সময় মনটা হাৎ করিয়া উঠে—যাহা হউক বাঙ্গলার সাহিত্যের আসরে অনেক কাল ভাল সাহিত্য সমালোচনা পড়ি নাই সুতরাং সমালোচকের অনুযোগ বেশ লাগিতেছে—দুঃখের বিষয় বন্ধুবর মানসী ও বঙ্গবাণীকে কেন পংক্তিতে আনেন নাই বুঝিলাম না, অন্ততঃ প্রবাসী ভারতবর্ষ, বঙ্গবাণীর সহিত এই দুইটি পত্রিকারও স্থান হওয়া উচিত—আশা করি সাহিত্য রস-গ্রাহী সমালোচক এ দিকে অবহিত চিত্ত হইবেন। বাঙ্গলা সাহিত্যের দুর্ভাগ্য যে সমালোচনায় হয় মিষ্ট নয় ঝাল খুব বেশীই থাকিবে, বন্ধুবর মহাশয় ঝালটা একটু কম পরিবেশন করিলেই ভাল—তাঁহার ন্যায় কঠোর বিচারকের কাছেও এটুকু আশা করিতে পশ্চাৎপদ নই।

শ্রীসরসীবালা বসু

বাসন্তীতে 'মাসিক সাহিত্য সমালোচনা' পড়ে বড় খুসী হয়েছি। বাণী-পীঠে মত্ত মাতঙ্গের যে রুদ্র-মাতন সুরু হয়েছে তার উপর বন্ধুবরের খোঁচা নিষ্ঠুর হলেও সত্য-সুন্দর! এ খোঁচা হয়ত আমার উপরেও কোন দিন এসে পড়বে, তা হলেও মাহুত মহাশয়কে আমার পিঠ-চাপড়ানি জানাবেন। 'জনৈক লেখক'।

Printed by Bijoy Krishna Dass at the Lakshmibilas Press,
14, Jagannath Dutta Lane, Calcutta.

বাসন্তী—

সচিত্র সাপ্তাহিক পত্রিকা

বাসন্তী

২য় বর্ষ] ২৯শে অগ্রহায়ণ শনিবার ১৩৩০, ইং ১৫ই ডিসেম্বর [২২শ সংখ্যা

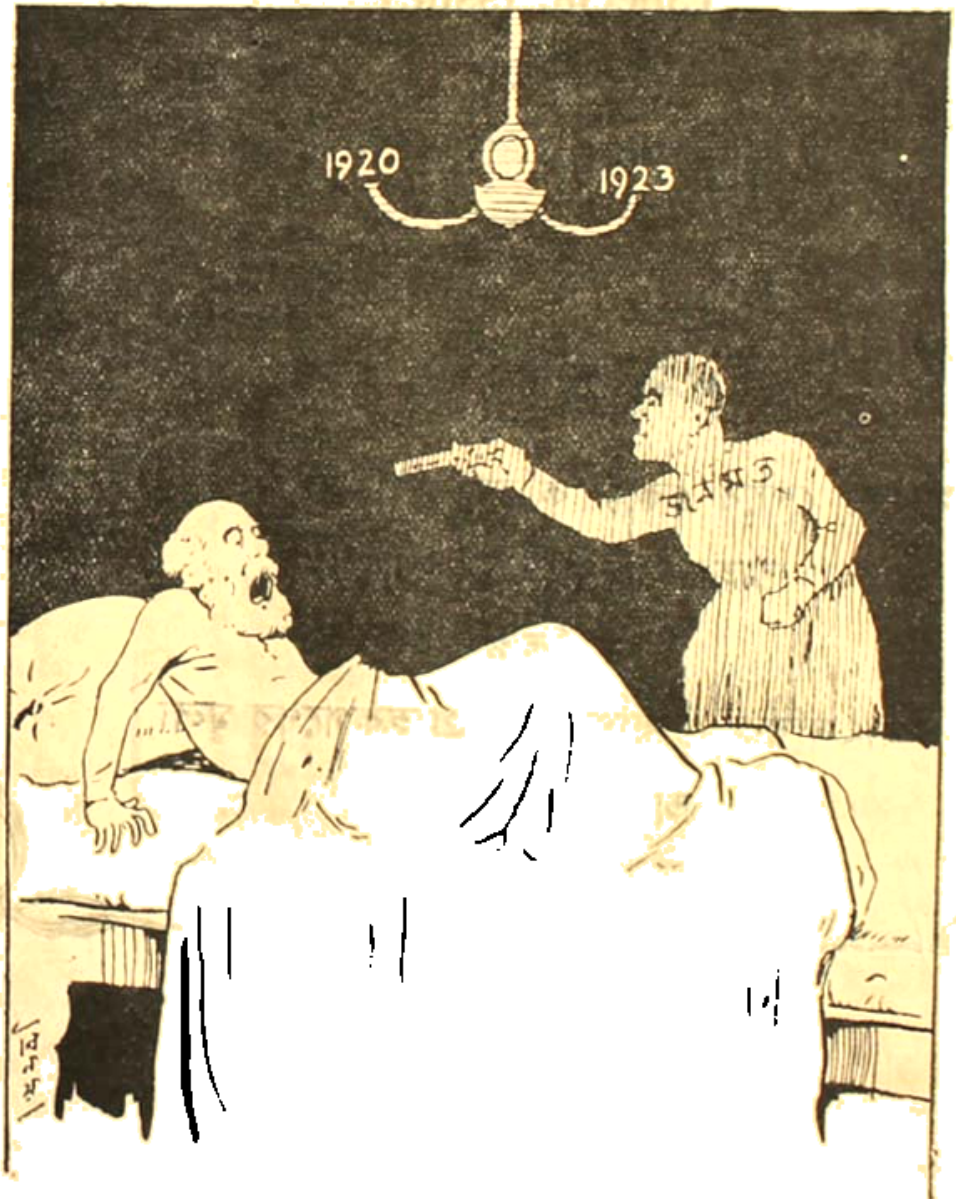

জনমত—তিন বৎসর আমি পদদলিত হইয়াছি, আজ প্রতিশোধ লইলাম।

বাসন্তীর

২৩ এর সংখ্যা একটি

বিশিষ্ট সংখ্যা

(Special Issue)

হইবে।

নগদ মূল্য ।/০ পাঁচ আনা।

আগামী মাঘ মাস হইতে

বাসন্তীর

প্রতি মাসের শেষে একটি করিয়া বিশিষ্ট সংখ্যা হইবে।

তাহার মূল্য হইবে নগদ ।/০

কিন্তু

বাৎসরিক ও যাণ্মাসিক গ্রাহকগণের মূল্য

অধিক হইবে না।

কৈফিয়ৎ

[ডাক্তার শ্রীনরেশচন্দ্র সেন গুপ্ত এম-এ ডি-এল]

কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া বন্ধুবর শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় আমাকে বধ করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন।

রাখাল বাবু সুপণ্ডিত। ইতিহাসে তাঁহার প্রতিষ্ঠা আমাদের দেশবাসী ঐতিহাসিকদের শীর্ষস্থানে। উপন্যাসে Maspero প্রদর্শিত পন্থা অনুসরণ করিয়া তিনি যে সব অতীত যুগের চিত্র বাঙ্গালী পাঠকের সম্মুখে মনোরম ভাবে উপস্থিত করিয়াছেন তাহাতে শিক্ষিত পাঠক সমাজ পরম পরিতৃপ্তি লাভ করিয়াছেন। এক কথায় বাঙ্গলা সাহিত্যের নানা প্রস্থানে তিনি গৌরীশঙ্কর না হউন অন্ততঃ ধবলাগিরি সদৃশ। তাঁর মত লোক আমার লেখার সমালোচনায় এতটা শ্রম স্বীকার করিতেছেন এবং সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরিয়া সেই সমালোচনা চালাইতেছেন ইহাতে আমি একটু গর্ব্ব অনুভব না করিয়া পারিতেছি না। রাখাল বাবু আমার বাল্য সুহৃদ, তিনি আমার কাজ একটু বড় করিয়া দেখা বিচিত্র নহে। কিন্তু তিনি আমাকে এই সমালোচনার দ্বারা এতটা সম্মানিত করিয়াছেন যে আমি এ গৌরব কেবল তাঁর বন্ধুপ্রীতির ঘাড়ে চাপাইতে পারি না।

তিনি কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া বাসন্তী পত্রিকায় আমার বইয়ের যে ভাবে সমালোচনা করিতেছেন তাহাতে আমার গর্ব্ব বোধ করিবার অনেকগুলি হেতু আছে। তিনি যদি কেবল আমার বই সমালোচনা করিতেন তবে হয়তো এতটা গর্ব্বিত হইতাম না। কিন্তু তিনি আলোচনা করিতেছেন আধুনিক কথা সাহিত্যের রসতত্ত্ব। সেই আলোচনায় তিনি বিভিন্ন ধারার নিদর্শন স্বরূপ ধরিয়া লইয়াছেন বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র ও আমাকে। যাহাদের পদধূলির যোগ্য হইলে আপনাকে ধন্য মনে করি তাঁহাদের সঙ্গে তুলনায় সমালোচনায় যদি অবশ্য প্রতিপন্ন হই তাহাতে ক্ষোভের বিষয় কিছু নাই, কিন্তু বাঙ্গলার এই হাজার হাজার ঔপন্যাসিকের মধ্যে যে আমাকেই তিনি এই সব মহারথীদের সঙ্গে এক পর্য্যায়ে স্থান দেওয়ার সম্ভাবনা কল্পনা করিয়াছেন ইহাই তো আমার পক্ষে পরম গৌরবের কথা।

আমার বই উপন্যাস হিসাবে ভাল কি মন্দ সে বিচার এ পর্য্যন্ত তাঁর লেখায় পাই নাই। আমি যতদূর বুঝিয়াছি—তাঁর অনেক কথাই বুঝি নাই একথা মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিতেছি;—তাহাতে তিনি আমার একটি বিশিষ্ট মতের প্রতিবাদ করিতেই আসরে নামিয়াছেন। এই মত খণ্ডনের জন্য তিনি বাৎস্যায়ন হইতে আরম্ভ করিয়া সহজিয়া সাহিত্য ও বৈষ্ণব সাহিত্য ও ইতিহাস সাহিত্যদর্পণাদি নানা অলঙ্কার গ্রন্থ হইতে আয়ুধ সংগ্রহ করিয়াছেন। তাঁহার সমালোচনা সম্ভবতঃ সম্পূর্ণ হয় নাই, সুতরাং তাঁর মতামতের আলোচনা করিবার সময় হয়তো আসে নাই। সে আলোচনা করিবার শক্তিও আমার নাই। কারণ তাঁর বেশীরভাগ কথা আমার বিদ্যালাঠ্যের বাহিরে। তাঁর মত সর্ব্বশাস্ত্রবিদ্ হইবার স্পর্দ্ধা আমার নাই।

কিন্তু একথা অনুভব না করিয়া পারিতেছি না যে যাহাকে বধ করিবার জন্য এতগুলি ভারী ভারী কামান পাতা হইয়াছে সে নিতান্ত মশা মাছি হয় তো নয়। তা'ছাড়া আর একটা কথা। সাদা কথার প্রতিবাদে যেখানে বড় বড় শাস্ত্রের আমদানী করিতে হয় সেখানে প্রতিবাদের মধ্যে একটু গলদ আছে একথা সহজেই মনে হয়। সাদাকে সাদা বলিয়া প্রমাণ করিতে শাস্ত্র যুক্তির প্রয়োজন হয় না। যাহাকে সাদা বলিয়া মনে হয় সেটা সাদা নয় একথা প্রায়ই শাস্ত্র ছাড়া লোকে মানিতে চায় না।

আবার স্বীকার করিতেছি যে বন্ধুবরের অনেক কথাই আমি বুঝিতে পারি নাই। বুঝিতে যে পারি নাই সেটা খুব সম্ভবতঃ আমার বিদ্যা বুদ্ধির দোষ। তিনি যে সব প্রমাণ গ্রন্থের ভূয়োভূয় উল্লেখ করিয়াছেন তাঁহার অর্দ্ধেকও যদি আমার পড়া থাকিত তবে হয় তো কথাগুলি সব

বুঝিতাম। তাহাই বোধ হয় বুঝিতে পারিতেছি না যে উহা প্রবন্ধগুলির প্রতিপাদ্য কি?

আমার পাঠকমাত্রেই সমালোচনা করিবার অধিকারী। তাঁহের ভাল বলা বা মন্দ বলার প্রতিবাদ বা সমর্থন করা লেখকধর্ম্ম বিরুদ্ধ। করিতে গেলে নিজের বইয়ের নিজে সমালোচনা করিতে হয়। সে উদ্দেশ্য লইয়া লিখিতে বসি নাই। সে রকম কোনও উদ্দেশ্য থাকিলে বর্ত্তমান স্থলে কিছু সুবিধা করিতে পারিতাম কি না তাহাও বলিতে পারি না' কেন-না রাখালবাবুর কথা আমি বিশেষ কিছুই বুঝি নাই; যা বুঝি নাই তার জবাব দেওয়া চলে না। কিন্তু একটা কথা বুঝিয়াছি, সেটা আমার বইয়ের ভাল মন্দর কথা তাহা নয় বরঞ্চ আমার সমাজতত্ত্ব ঘটিত মতামতের কথা। এবিষয়ে আলোচনা বোধ হয় লেখকধর্ম্মের বিরোধী নয়।

রাখালবাবু গত ৮ই অগ্রহায়ণের "বাসন্তীতে" লিখিয়াছেন "ডাক্তার নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত তাঁহার শান্তি নামক নব প্রকাশিত উপন্যাসে বোহেমিয়া ক্লাবে মিসেস চ্যাটার্জ্জীর মুখ দিয়া যে প্রেমের ব্যাখ্যা (?) নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহা পশুর প্রেম। মিসেস, তথা গ্রন্থকার ডাক্তার সেনগুপ্তের মতে 'প্রেম সে জিনিষই নয় যাকে নিয়ে তুমি রোজকার ঘর সংসার ক'রবে • • • লোকে ভালবাসাটাই বিবাহের দ্বারা বেঁধে সংসারে লাগাতে চায়, তাই থেকেই তো ভালবাসার যত tragedy সৃষ্টি হয়।"

রাখালবাবু বাৎস্যায়ন, হইতে রাধামোহন গোস্বামী পর্য্যন্ত নানা প্রমাণ উদ্ঘাটন করিয়া পাণ্ডিত্যের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন। কিন্তু সামান্য একটা ভুল করিয়াছেন। কোনও বই সমালোচনা করিবার পূর্ব্বে সেটা ভাল করিয়া পড়া দরকার এবং তাহা বোঝা দরকার এই সহজ সূত্রটা হয় তো তিনি ভুলিয়া গিয়াছিলেন। ভুলিলাম মহিলয়ঃ।

মিসেস চ্যাটার্জ্জীর ও কথা যে আমার মত এ অদ্ভুত কারণ যে বইখানা আদ্যো পান্ত মনোযোগের সহিত পড়িয়া কোনও শিক্ষিত লোকের হইতে পারে এ বিশ্বাস আমার ছিল না। যেখানে যে স্থানে এই কথা আছে ঠিক তার পরেই প্রথমে বীরেন গাঙ্গুলী, এবং পরে নায়ক শুভেন্দু এই মতের তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন। শুভেন্দু বলিয়াছে যে প্রেম যে কি জিনিষ তাহা যদি মিসেস চ্যাটার্জ্জী জানিতেন তবে এমন কথা বলিতেন না। প্রেম আত্মার আত্মার যোগ অনন্ত কালের জন্য এ সংযোগ। মিসেস চ্যাটার্জ্জীর দল তখন একথা হাসিয়া উড়াইয়াছিলেন। কিন্তু এমন এক দিন আসিল যখন মিসেস চ্যাটার্জ্জী সত্য সত্য ভালবাসিলেন। তখন তিনি শুভেন্দুকে বলিলেন, "আমি যা বলেছিলাম সব ভুলে যান সে সব ভুল। • • আপনি ঠিক ব'লেছিলেন আমি সত্য সত্য কোনও দিনই ভাল বাসিনি।"

মিসেস চ্যাটার্জ্জীর এই সত্য ভালবাসা যখন আসিল তখন তাহা তাঁর দেহে ফুটিয়া বাহির হয় নাই, ইহা প্রশান্ত আত্মার প্রেম ইহার ভিতর দেহের জন্য দেহের তৃষ্ণার এত পরিপূর্ণ অভাব ছিল যে মিসেস চ্যাটার্জ্জী তাঁর প্রেমাস্পদকে কোনও রকম সকাম স্পর্শ পর্য্যন্ত করিবার চেষ্টা করেন নাই। এই প্রশান্ত গভীর নিঃস্বার্থ আত্মার প্রেম অনুভব করিয়া মিসেস চ্যাটার্জ্জী সকল বিলাসে বিরাগী হইলেন। তাঁর একমাত্র আবেগের লক্ষণ তখনই প্রকাশ হইল যখন তিনি মনে ভাবিলেন যে তাঁর প্রেমাস্পদ তাঁর ভালবাসার যোগ্য নয়। তখনও তিনি লিখিলেন যে তিনি অন্তরে ঠিক সেই ভালবাসা অনুভব করিতেছেন যাহার বলে সাবিত্রী যা বেহুলা মৃত স্বামীকে বাঁচাইয়াছিল, যাহার জন্য হিন্দুনারী হাসিতে হাসিতে স্বামীর চিতায় প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছে।

আমার মনে বিশ্বাস ছিল যে শিক্ষিত ব্যক্তিকে এই ইতিহাসের পর আর চীৎকার করিয়া বলিতে হইবে না যে ভালবাসা সম্বন্ধে আমার মতামত কি? আমার বিশ্বাস ছিল যে উপন্যাস পড়িয়া আমার মতামত জানিবার সম্পূর্ণ অনাবশ্যক চেষ্টা যদি কেহ করেন তবে তিনি সমগ্র বইখানা হইতেই তাহা পাইবেন। কিন্তু যেকালে রাখালবাবুর মত প্রজ্ঞানিধি সমালোচক ও একথা বুঝিতে পারেন নাই তখন বড় গলা করিয়া বলিতে হইতেছে যে মিসেস চ্যাটার্জ্জী প্যারিসের বাস হইতে যে মতামত আহরণ করিয়া বোহেমিয়ার চালাইয়াছিলেন

তাহা আমার মত নয়। সত্য সত্য ভালবাসিয়া ঠেকিয়া শিখিয়া তিনি যে কথা আজও করিয়াছিলেন আমার মত তারই কাছা কাছি।

শুনিতে পাই রাখালবাবু কেবল আমার "শুভা" ও "শান্তিই" পড়েন নাই, সব বইগুলিই পড়িয়াছেন। তাহা হইলে তিনি আমার মতামত "দ্বিতীয় পক্ষের" নায়কের মুখে খুব স্পষ্ট করিয়াই পাইয়াছেন। মিসেস চাটার্জীর কথিত প্রেম যে পশুর প্রেম মানুষের প্রেমের বহুমুখীনতা যে তার পশু পূর্ব্বপুরুষদের কাছে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া এবং এবিষয়ে ইতিহাসের শিক্ষা যে "নিবৃত্তিস্ত মহাফলা।" একথা আমিই বলিয়াছি। সুতরাং মিসেস চ্যাটার্জীর মতামত আমার ঘাড়ে চাপাইবার তাঁর কোনও ওজুহাতই ছিল না।

উপন্যাসের রসভঙ্গ না করিয়া পাত্র পাত্রীর মুখে যে সম্পূর্ণরূপে নিজের মতামত ব্যক্তির করা প্রায় অসম্ভব একথা বাস্তবিক বা সাহিত্যদর্পণে না থাকিলেও রাখালবাবুর জানা থাকা সম্ভব। পাত্র পাত্রীরা একটা বিশিষ্ট চরিত্র লইয়া বিশিষ্ট আবেষ্টনের মধ্যে সৃষ্ট হয়, তার মধ্যে কেহই যে ঠিক ষোল আনা আমার মতামত প্রকাশ করিবে এমন করিয়া তাদের গড়া যায় না। যার যে চরিত্র, যেমন আবেষ্টন ও যে অবস্থা তার দ্বারা তার কথার প্রকৃতি নির্দ্ধারিত হয়, তাই নেহাৎ জোর না করিলে নিজের ষোল আনা মত পাত্র পাত্রীর মুখে দেওয়া যায় না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ "শান্তিরই" উল্লেখ করিতে পারি। স্বামী সত্য স্বরূপ শেষে বলিলেন যে গোপা নিষ্পাপ। আমি সেখানে ফুটনোট করিয়া একথা বলিয়া যেই নাই যে ইহা আমার মত নয়। কিন্তু সত্য-স্বরূপ কমলের কাছে যে কথা শুনিয়াছিলেন এবং বিশ্বাস করিয়াছিলেন তাহাতে তাঁর পক্ষে ঠিক এই রকম ভাবাই যে স্বাভাবিক এ বিষয়ে বোধহয় কাহারও সন্দেহ থাকিবে না। ইহিউক্ত পাঠক এ উক্তিতে আমার মতের যে অসম্পূর্ণতা আছে তাহা সংশোধন করিয়া লইতে পারিবেন কেন না তাঁহারা দেখিবেন যে কমল-বা সত্যস্বরূপ কখনও সম্পূর্ণ সত্যটা জানিতে পারেন নাই। পক্ষান্তরে গোপা বলিয়াছে "আমার পাপ যে বড় ভয়ানক" আর তাই ভাবিয়াই সে প্রায়শ্চিত্তকে বরণ করিয়া লইয়াছে কেবল দুঃখ করিয়াছে অন্যের জন্য। আরো মতটা জানিবার যদি প্রয়োজনই হয় তবে এই সব খণ্ড সত্য একত্র করিয়া দেখিলেই তাহা জানিতে পারা যাইবে।

রাখালবাবু এত বড় দুষ্কর চেষ্টা করেন নাই। তিনি বুঝিয়াছেন যে আমার বইখানা ভাল করিয়া বুঝিবার চেষ্টা করিবার চেয়ে বাংলাদেশ ও সাহিত্যদর্পণ ঘাঁটিলে আমার মতামতের ঢের বেশী বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যাইবে। সাধে কি বন্ধু বলিয়াছিল "গল্প হো ভট্টাচার্য্য মশায়ের টোলে পড়েনি?" বেশী বই পড়ার বড় জ্বালা!

না যাকার সুপ্রসিদ্ধ যোদ্ধার মত রাখালবাবু যে কত রকম কাল্পনিক শত্রুকে ধূলাশায়ী করিতেছেন তাহা দেখিলে দুঃখও হয় হাসিও পায়। তাঁর হাতের এক জনকে তিনি দুই হাত তুলিয়া হায় হায় করিয়া উঠিয়াছেন—কি না, আমি মা ডাকের অপমান করিয়াছি! কমল গোপাকে "মা" বলিয়াছিল। এ "মা" ডাক যে তার অন্তরের ডাক নয়, কেবল মেকী কেবল অবিদ্যের ভিতর জাগরিত শুদ্ধ বাসনার reactionএ অবিদ্যের দমন চেষ্টার ফল, তাহা, আমার মনে হয়, যেন সুস্পষ্ট-ভাবেই প্রকাশ করিয়াছি। তারপর তারা ঘটনা পরম্পরায় এমন একটা অবস্থায় আসিয়া পড়িল, এমন আবেষ্টনের ভিতর দিয়া চলিয়া গেল যে তাহারা তাহাদের বিবেক বুদ্ধির সম্পূর্ণ বিরুদ্ধভাবে পরস্পরের প্রতি কেবল-মাত্র কামজ মোহে আকৃষ্ট হইতে লাগিল, Unconcious এর মোহ ক্রমশঃ concious mindএ আসিতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে বিবেক দুর্ব্বল হইয়া পড়িল, শেষে কমল স্থির করিল গোপাকে সে বিবাহ করিবে, গোপা আপনার সঙ্কোচের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া ক্লান্ত হইয়া প্রায় পরাভূত হইল।

বলা বাহুল্য এই সমস্ত ইতিহাসের ভিতর কোথাও এমন ইঙ্গিত করা হয় নাই যে কমল বা গোপা ভাল কিছু করিতেছে। তারা যে পাপের পিচ্ছিল পথে চলিতেছে তার পরিচয় এই যে তাদের কাজ তাদের নিজেদের কাছেই হেয় বলিয়া মনে হইয়াছে। ইহা কেবল নিছক একটা দৈহিক আকর্ষণ বলিয়া বলা হইয়াছে। এমনি করিয়া এমন একটা অবস্থায় তাহারা আসিয়া পড়িল যখন তাদের

পাপের গভীরতম পঙ্কে পতিত হইবার পক্ষে কোনও বাহ্যিক বাধাই অবশিষ্ট রহিল না।

সেই সময়, সেই শেষ ভীষণ পরিণতি হইতে তাহারা রক্ষা পাইল দুই কারণে—প্রথম গোপার সমস্ত নায়ন্ধিক উত্তেজনা ও সকল কামজ মোহের অন্তরালে তার স্বামীর প্রতি একটা প্রকাণ্ড সমুদ্রের মত অতল পবিত্র প্রেম ছিল বলিয়া। কমল বিবাহের কথা বলিতেই সেই প্রেম গোপার হৃদয়ে আপনাকে হঠাৎ পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিয়া চিত্ত বিকারে পূর্ণ করিয়া দিল, সে আপনাকে কমলের পাপ আলিঙ্গন হইতে মুক্ত করিয়া পলায়ন করিল।

আর তাহাদিগকে রক্ষা করিল এই "মা" ডাক। যখন কমল মত্ত হইয়া গোপার হাত ধরিয়া বলিল "আজ আমি তোমায় ছাড়বো না।" তখন গোপা বলিল "কমল তুমি না একদিন আমায় 'মা' বলেছিলে।" তখনি কমল হাত ছাড়িয়া আহত হৃদয়ে গভীর অনুশোচনায় ডুবিয়া গেল। নিতান্ত সেকী 'মা' ডাকটার দরকার ছিল ওই মহামুহূর্তে এমনিভাবে গোপাকে রক্ষা করিবার জন্য।

অতি বড় বিপদে যখন তাহারা পড়িয়াছিল, ভীষণ ঘটনাচক্রে পড়িয়া যখন তাহারা পাপে ডুবিতে বসিয়াছিল তখন এই সামান্য 'মা' ডাক তাহাদিগকে রক্ষা করিল। ইহাতে "মা" ডাকের গৌরব বৃদ্ধি হইয়াছে না কমিয়াছে? রাখালবাবু বোধহয় লিখিবার সময় বইখানা শেষ পর্য্যন্ত পড়িবার সুবিধা পান নাই। নচেৎ 'মা' ডাকের অপমান হইয়াছে না ভাবিয়া এই পবিত্র ডাকের হাজার অপমানের মধ্যে ইহার চরম শক্তি ও গৌরব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে মনে করিতেন।

বইয়ের বিভিন্ন অংশের ভিতর সামঞ্জস্য করিয়া গ্রন্থকারের মতামত বুঝিবার চেষ্টা সমালোচকের কাজ হইতে পারে, গ্রন্থকারের নহে। আমিও এ পর্য্যন্ত এমন কোনও চেষ্টা করি নাই। কিন্তু রাখালবাবুর মত প্রাজ্ঞ লোকের প্রকৃষ্ট অজ্ঞতা দেখিয়া আমার পাঠক সাধারণের বোধশক্তি বিষয়ে এমন একটা আশঙ্কা জন্মিয়া গিয়াছে যে শান্তি বইখানার ভিতর আমার কোন কোন মতামতের একটু ইঙ্গিত পাওয়া যাইতে পারে তাহার একটা তালিকা দেওয়া আবশ্যক মনে করিতেছি। যদি প্রকাশকেরা এ বিষয়ে কোনও আপত্তি না করেন তবে ভবিষ্যতে বই লিখিবার সময় যখন যেখানে যে কোনও বিষয়ে কোনও পাত্রপাত্রী কোনও কথা বলেন, সেখানে ফুটনোট বসাইয়া দিবার চেষ্টা করিব যে তাহার কতখানি আমার মতে ঠিক এবং কতটুকু ভুল এবং কি কারণে সেই ভুলটুকু হইয়াছে। আশা করি তাহা হইলেও বঙ্গীয় পাঠকবৃন্দ আমার বইগুলি পরীক্ষার পাঠ্য না হইলেও সহিষ্ণুতার সহিত পড়িবেন।

যাহা হউক "শান্তিতে" আমার যে সব মতামতের ইঙ্গিত আছে তাহার একটা ফিরিস্তি দিতে ইচ্ছা করি। আশা করি রাখালবাবু তাঁর ভবিষ্য প্রবন্ধগুলি লিখিবার সময় এই ফিরিস্তি সম্মুখে রাখিয়া লিখিবেন এবং সন্দেহ-স্থলে বইখানা আবার পড়িয়া যাচাই করিয়া লইবেন।

(২) পুণ্যের সংসারে পাপ যে কখন আসিয়া কোন সাজ্ঞাবে দেখা দেয় বলা কঠিন। গোপার হৃদয়ে পাপের সিংহদ্বার গড়া হইয়া গেল পবিত্র দেশপ্রীতি দিয়া। তাহার ছায়ার তলে কমলের প্রতি কামজ মোহ গোপন হৃদয়তলে পড়িতে লাগিল।

সংসারে জনমতের আবেষ্টন হইতে দূরে চলিয়া গেলে ধর্ম্মের একটা প্রকাণ্ড আশ্রয় ভাঙ্গিয়া যায়। জেলে কয়েদীদের নৈতিক চরিত্রের অবনতির সহায়তা হয়। সমাজের চার চক্ষুর অন্তরালে চন্দ্রমুখীর পাপ সংসর্গ ও অপবিত্র শিকায় গোপার চরিত্র বল এতটা ক্ষীণ হইয়াছিল যে কমলকে কামনা করিতে তার অন্তরের বাধা ধীরে ধীরে দূর হইয়া গেল। তারপর লোকালয়ের অন্তরালে আসাযের জঙ্গলে তার ধর্ম্ম আত্মরক্ষায় ক্রমেই অধিক অশক্ত হইয়া উঠিল—কমলেরও বিবেক তেমনি দুর্ব্বল হইয়া পড়িল।

(৩) প্রকৃত সতীত্ব তাহাকেই বলে যাহার প্রতিষ্ঠা প্রেমে। গোপা অবস্থাচক্রে যেখানেই আসিয়া পড়ুক তার ভিতর এই প্রকৃত প্রেম ও জীবন্ত সতীত্ব ছিল। যখন তার সকল আশ্রয় নিখিল হইয়া গেল তখন স্বামীর প্রতি এই প্রেমই তাহাকে শেষ পতন হইতে নিবৃত্ত করিয়া উদ্ধার করিল।

(৪) ফরাসী সাহিত্যের বিশেষ অংশে প্রেমের যে আকৃতি প্রকাশ হইয়াছে তাহা প্রকৃত প্রেম নয়। প্রকৃত প্রেম আত্মার আত্মার চিরসংযোগ—ইহা উদ্দাম নহে, ইহা প্রশান্ত ও গভীর। ইহা ধর্ম্মের আশ্রয়, অধর্ম্মের উত্তেজক নহে। মিসেস চ্যাটার্জ্জীর জীবনের শিক্ষা ইহার প্রমাণ।

(৫) ব্যভিচারিণী পত্নীর প্রতি কর্ত্তব্য বিষয়ে হিন্দু-শাস্ত্রে নির্দ্দেশ এই যে ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা তাহার চিত্তশুদ্ধি করাইতে হইবে। কেবল কলঙ্ক ঢাকিবার জন্য তাহাকে কাশী পাঠান বা শাস্তির জন্য তাহাকে তাড়াইয়া দেওয়া শাস্ত্র ও যুক্তি বিগর্হিত। প্রায়শ্চিত্ত অন্তরের শুদ্ধির জন্য প্রয়োজন। যেখানে অন্তর প্রেমে ও পাপ বোধে সম্পূর্ণ পরিশুদ্ধ হইয়াছে সেখানে প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজন নাই।

(৬) যে মুহূর্ত্তের পথভ্রষ্টা নারী স্বামীর প্রতি প্রেমে পরিশুদ্ধ হইয়া অনুতপ্ত হৃদয়ে ফিরিয়াছে অন্যের তাহার প্রকৃত শাস্তি নহে। স্নেহের অভাবে তার হৃদয়ে এমন বৈরাগ্য আসিতে পারে যাহাতে তাহার চিত্ত শুদ্ধ হইলেও প্রেম শুকাইয়া গিয়া সে সংসারের সম্পূর্ণ অযোগ্য হইয়া পড়িতে পারে।

(৭) শাস্তি ও প্রায়শ্চিত্তে মাত্রা রক্ষা একান্ত প্রয়োজন। মাত্রাধিক্যে বিরুদ্ধ ফল হইতে পারে। শাস্তি ও প্রায়শ্চিত্ত প্রয়োগের পূর্ব্বে শাস্তিতের চিত্তের অবস্থা ও সমগ্র আবেষ্টনের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক।

আর একটা কথা না বলিয়া পারিতেছি না। রাখাল-বাবু তাঁর এক উচ্ছ্বাসে বৈথলিনী সম্বন্ধে প্রতাপের সংযমের সঙ্গে কমল ও গোপার পাপ প্রেমের তুলনা করিয়া বলিয়াছেন যে বঙ্কিমচন্দ্রের আর্ট শ্রেষ্ঠ। বঙ্কিম-চন্দ্রের আর্ট আমার আর্টের চেয়ে শ্রেষ্ঠ এই অবিসম্বাদী সত্য প্রতিষ্ঠাই যদি এ প্রসঙ্গের প্রয়োজন হয়, তবে তিনি এজন্য কষ্ট স্বীকার না করিলেই পারিতেন। কিন্তু তুলনা করিতে গেলে উপমা ও উপমেয়ের মধ্যে একটু সামঞ্জস্য থাকা দরকার বর্ত্তমান ক্ষেত্রে সেই জিনিষটা খুঁজিয়া পাইলাম না। প্রতাপ বঙ্কিমচন্দ্রের অঙ্কিত আদর্শ ত্যাগী পুরুষ আর কমলকে আমি আঁকিয়াছি একটি ভাবপ্রবণ অস্থিরমতি যুবকরূপে। গোপার সঙ্গে বৈথলিনীর তুলনা করিলে সেটা বরঞ্চ মানাইত। বৈথলিনী পরপুরুষকে ভালবাসিয়া শেষে বিশুদ্ধ হইয়াছিল; গোপাও হইয়াছিল। কিন্তু বৈথলিনী রক্ষা পাইয়াছিল প্রতাপের সংযমের ফলে, রামানন্দ স্বামীর কৌশলে ও যোগবলে। গোপা রক্ষা পাইয়াছিল আপনার চরিত্রবলে, সহস্র প্রলোভনে পড়িয়া পড়ি পড়ি করিয়াও এই চরিত্রবল ও অপার স্বামী-প্রেম তাহাকে রক্ষা করিয়াছিল। এই দুইটি চরিত্র তুলনা করিলে যদি কেহ বলেন যে বঙ্কিমচন্দ্রের বৈথলিনী আর্ট হিসাবে গোপার অনেক উপরে, সে সিদ্ধান্ত আমি নত মস্তকে গ্রহণ করিব। কিন্তু যদি কেহ বলেন যে স্বয়ং শুদ্ধা গোপার চেয়ে দৈব পরিশোধিতা বৈথলিনী চরিত্রগৌরবে গরীয়সী তবে আমি সে সিদ্ধান্ত মানিয়া লইতে পারিব না; অভিমানের জন্য নহে—তাহা আমার ধর্ম্মজ্ঞান বিরুদ্ধ বলিয়া।

ইণ্ডিয়ান সোপ কোম্পানীর
মেসিনে প্রস্তুত
চন্দন, রয়েলবকুল, মাল্ট ও ভেলভেট সাবান
ব্যবহার করুন। টেলিফোন, ২৪৯৬

আধুনিক সাহিত্যের বেশ্যা

[শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়.এম-এ]

পরকীয়ার ন্যায় আধুনিক কথা-সাহিত্যে যাঁহারা বেশ্যাচরিত্র বা চিত্রাঙ্কনে ব্রতী হইয়াছেন, শ্রীযুক্ত শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও ডাক্তার নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত তাঁহাদের অগ্রণী। কিন্তু এই লেখকদ্বয়ের বাস্তবজীবনের অভিজ্ঞতার অভাবে বেশ্যাচরিত্র তাঁহাদিগের রচনায় স্পষ্ট ফুটিয়া ওঠে নাই। শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় পরকীয়া আলেখ্যের উদ্ঘাটনায় সিদ্ধহস্ত কিন্তু তাঁহার গ্রন্থাবলীর মধ্যে বেশ্যাচরিত্র দুর্লভ। রতিশাস্ত্রে পারদর্শী চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এতদ্ব্যতীত স্ত্রিবিধ নায়ীর মধ্যে পরকীয়ার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন। "দেবদাসে" চরিত্রহিসাবে পার্ব্বতীর সমান্তরালে চন্দ্রমুখীর চিত্রটি বড় সুন্দর ফুটিয়াছে। ছবির হিসাবে চন্দ্রমুখী বেশ কিন্তু সে বেশ্যা নহে। শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় হয় তো বলিবেন যে, চন্দ্রমুখী সাধ্বে বেশ্যার মধ্যে এক নূতন ধারা অবলম্বন করিয়াছে কিন্তু সে কথা বলিবার অধিকারও তাঁহার নাই কারণ চন্দ্রমুখীর চরিত্র প্রাচীন ও আধুনিক বেশ্যার রীতিবিরুদ্ধ।

বেশ্যা কে? যে নারী অর্থলোভের জন্য বেশভূষা করিয়া বহুপুরুষের সন্তোষার্থ আত্মদেহ নিয়োগ করে সে-ই বেশ্যা। এক নারী অর্থের জন্য একপুরুষে নিযুক্ত থাকে সে বেশ্যা নহে। প্রাচীনকালে অনেক রকম বেশ্যা দেখা যাইত, যথা—

"কুম্ভদাসী পরিচারিকা কুলটা বৈরিণী নটী শিল্পকারিকা প্রকাশবিনষ্টা রূপজীবা গণিকা চেতি বেশ্যা বিশেষাঃ।" অর্থাৎ—"কুম্ভদাসী, পরিচারিকা, কুলটা, বৈরিণী, নটী, শিল্পকারিকা, প্রকাশবিনষ্টা, রূপজীবা এবং গণিকা;—এই কয়টি বেশ্যাবিশেষ। কুম্ভদাসী,—পাষাণ কর্ণধারীর পরিচারিকা, প্রভুর পরিচর্য্যাকারিণী। কুলটা—পতিগৃহে গৃহান্তরে যাইয়া যে প্রচ্ছন্নভাবে অন্যের সহিত সম্প্রযুক্ত হয়। বৈরিণী,—যে পতিকে তিরস্কার করিয়া স্বগৃহে বা অন্য গৃহে যাইয়া অন্য ব্যক্তির অভিগম করে। নটী,—রঙ্গযোষিৎ। শিল্পকারিকা,—রঞ্জক, তন্তুবায় ভার্য্যা ইত্যাদি। প্রকাশবিনষ্টা,—পতি মৃত বা জীবিত থাকিতেই সংগ্রহণ ধর্ম্মে গৃহীত হইয়া কামচার প্রবৃত্তিতে চলিয়া থাকে। এই ছয়টি রূপাজীবার মধ্যেই অন্তর্ভূক্ত। তদ্ভিন্ন কুম্ভদাসী ও গণিকা, এই তিনপ্রকারই বেশ্যা জানিবে।"

যে নারী বেশ্যাচার অবলম্বন করিয়াও এক পুরুষের অনুরক্ত থাকে সে প্রকৃত বেশ্যা নহে, কারণ কামসূত্রকার স্পষ্ট নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন যে, বেশ্যাতে আসক্ত নায়কের চক্ষে ধূলি দিয়া দ্বিতীয় নায়কে উপগত হইয়া অর্থ উপার্জ্জন করাই বেশ্যার প্রকৃত ধর্ম্ম।

"সক্তং তু বশিনং নারী সম্ভাষ্যাপ্যন্যতো ব্রজেৎ।
ততশ্চার্থ মুপাদায় সক্তমেবাভিরঞ্জয়েৎ।"

অর্থাৎ—"গণিকা বশবর্ত্তী সক্তকে ছলে ভুলাইয়া অন্যস্থানে যাইবে ও সেখান হইতে অর্থগ্রহণ করিয়া আসিয়া আবার সক্তের অনুরাগ বর্দ্ধন করিবে।"

শরৎচন্দ্রের সৃষ্ট বেশ্যা চন্দ্রমুখী কলাবিদ্যা কুশলা। তাহার প্রথমে প্রেম পরে একচারিণীব্রত বা ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন, বেশ্যাচরিত্রে অভিজ্ঞ ব্যক্তির নিকট একেবারে অসম্ভব। কাহিনীহিসাবে হয় তো চন্দ্রমুখী-চরিত্র সুখরোচক কিন্তু বাস্তব জীবনে চন্দ্রমুখী অসম্ভব নারী-চরিত্র এবং বেশ্যা-চরিত্রের তুলনায় তাহার চিত্র একেবারে কাল্পনিক। কেন?—তাহা বুঝাইয়া বলা আবশ্যক। চন্দ্রমুখী বেশ্যা, সে বেহারার বন্ধু চুণীলালের আশ্রিতা রক্ষিতা কিনা তাহা গ্রন্থকার খুলিয়া বলেন নাই। চুণীলালের আর্থিক অবস্থার যে পরিচয় গ্রন্থকার দিয়াছেন তাহাতে চুণীলালের পক্ষে পুরা বাঁধা বেশ্যা রাখা অসম্ভব। চন্দ্রমুখী "নিত্য ঘটা হিসাবে," "সপ্তাহে দুইদিন," অথবা "সপ্তাহে একদিন"—এর কোন্ ছিল সে কথা গ্রন্থকার খুলিয়া লেখেন নাই। গ্রন্থকার কিন্তু একটা অস্বাভাবিক কথা আনিয়া ফেলিয়াছেন, তিনি লিখিয়াছেন যে, চন্দ্রমুখীর বাড়ীর "কি, রূপা-বাঁধানো হুঁকায় তামাক সাজিয়া আনিয়া দিল।" কলিকাতায় সাধারণতঃ বেশ্যা বাড়ী

কি থাকে না এবং থাকিলেও তাহারা বিবির ঘরে বাবু বসিলে তাহাকে সাজিয়া আনিয়া দেয় না। কলিকাতার বেশ্যা সমাজ সাধারণতঃ চাকর রাখিয়া থাকে এবং এই পুরুষ-নিয়োগের কারণ পরে যথা সময়ে বিবৃত করিব। দ্বিতীয় কথা যে বেশ্যা কিছুদিন ব্যবসায় করিয়াছে সে কখনও চন্দ্রমুখীর মত অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করে না।

"চন্দ্রমুখী সহসা উত্তর দিতে পারিল না। আজ তার চব্বিশ বৎসর বয়স হইয়াছে। এই নয়-দশ বৎসরের মধ্যে কত বিভিন্ন প্রকৃতির লোকের সহিত তাহার ঘনিষ্ঠ পরিচয়; কিন্তু, এমন আশ্চর্য্য লোক সে একটি দিনও দেখে নাই। একটু ইতস্ততঃ করিয়া কহিল,—"আপনার যখন পায়ের ধুলো পড়েছে—"

দেবদাস কথাটা শেষ করিতে না দিয়াই বলিয়া উঠিল, "পায়ের ধুলোর কথা নয়। টাকা নাও ত?"

"তা' নিই বৈ কি! না হ'লে আমা হেন জনে কিসে?"

"থাক্,—অত শুনতে চাইনে।" বলিয়া সে পকেটে হাত দিয়া একখানা নোট বাহির করিল, এবং চন্দ্রমুখীর হাতে দিয়াই চলিতে উদ্যত হইল—একবার চাহিয়াও দেখিল না, কত টাকা দিল।

"চন্দ্রমুখী বিনীতভাবে কহিল,—"এরি মধ্যে যাবেন?"

"দেবদাস কথা কহিল না—বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল।

"চন্দ্রমুখীর একবার ইচ্ছা হইল, টাকাটা ফিরাইয়া দেয়; কিন্তু কেমন একটা তীব্র সঙ্কোচের বশে পারিল না; বোধ করি বা একটু ভয়ও তাহার হইয়াছিল। তা' ছাড়া, অনেক লাঞ্ছনা, গঞ্জনা ও অপমান সহ্য করা অভ্যাস তাহাদের আছে বলিয়াই নির্ব্বাক, নিস্পন্দ হইয়া চৌকাঠ ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।"

তাহার পরে যেভাবে চন্দ্রমুখীকে কবি চিত্রিত করিয়াছেন তাহাও অস্বাভাবিক, তাহার টাকা ফিরাইয়া দিবার ইচ্ছা ও চুণীলালের সহিত তাহার কথোপকথন বেশ্যা-নীতি বিরুদ্ধ।

"চুণীলাল উপরে আসিয়া দেখিল, চন্দ্রমুখী তখনও সেইভাবে চৌকাঠ ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

"তাহাকে দেখিয়া কহিল, "বন্ধু চলে গেল?"

"হাঁ"।

"চন্দ্রমুখী হাতের নোট দেখাইয়া কহিল, এই দেখ। কিন্তু ভাল বোধ কর ত নিয়ে যাও, তোমার বন্ধুকে ফিরিয়ে দাও"।

"চুণীলাল কহিল,—"সে ইচ্ছে ক'রে দিয়ে গেছে, আমি ফিরিয়ে নিয়ে যাবো কেন"?

"এতক্ষণ পরে চন্দ্রমুখী একটুখানি হাসিতে পারিল, কিন্তু হাসিতে আনন্দ ছিল না। কহিল,—"ইচ্ছে ক'রে নয়, আমরা নিই ব'লে বাপ ক'রে দিয়ে গেছে। হাঁ, চুণিবাবু, লোকটি কি পাগল?"

কিছুদিন কাটিয়া গেল, দেবদাস পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইল, তাহার পর চুণীলাল আবার দেবদাসকে লইয়া চন্দ্রমুখীর বাড়ীতে গেল। তখন "অবনতির এক সোপান নীচে নামাইয়া দিয়া চুণীলাল কোথায় সরিয়া গিয়াছে। একা দেবদাস চন্দ্রমুখীর ঘরে নীচে বসিয়া মদ খাইতেছে। অদূরে বসিয়া চন্দ্রমুখী বিষণ্ণমুখে চাহিয়া সভয়ে বলিয়া উঠিল—"দেবদাস, আর খেয়ো না।"

"দেবদাস মদের গ্লাস নীচে রাখিয়া ভ্রূকুটী করিল,—কেন?"

"অল্প দিন মদ ধরেচ, অত সইতে পারবে না।"

"সহ্য করব ব'লে মদ খাইনে। এখানে থাকব ব'লে শুধু মদ খাই।"

"একথা চন্দ্রমুখী অনেকবার শুনিয়াছে। এক একবার তাহার মনে হয়, দেয়ালে মাথা ঠুকিয়া সে রক্তগঙ্গা হইয়া মরে। দেবদাসকে সে ভাল বাসিয়াছে। দেবদাস মদের গ্লাস ছুঁড়িয়া ফেলিল। কৌচের পায়ায় লাগিয়া সেটা চূর্ণ হইয়া গেল।"

চন্দ্রমুখীর এই পরিবর্ত্তন অস্বাভাবিক, বেশ্যা যখন নায়ক পরিত্যাগ করিয়া একচারিণীব্রত অবলম্বন করে বটে কিন্তু সে অন্য কারণে। পরলোকগত অভিনেত্রী সুশীলা তাহার অন্যতম দৃষ্টান্ত। বারাঙ্গনা বেশ্যাবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া বৃদ্ধ বয়সে তপশ্চরণ করিয়া থাকে, সুবিখ্যাত

অভিনেত্রী তারাসুন্দরী তাহার আদর্শ। সহসা প্রবৃত্তি-মার্গ পরিত্যাগ করিয়া নিবৃত্তিমার্গও বেশ্যার অবলম্বিত পথ বলিয়া শুনিতে পাওয়া যায়। ৺গিরীশচন্দ্র ঘোষের "চৈতন্যলীলা" অভিনয়কালে বিখ্যাত অভিনেত্রী বিনোদিনী ভক্তিমার্গ অবলম্বন করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় চন্দ্রমুখীর বেশ্যাবৃত্তির যে কারণ দেখাইয়াছেন তাহা তাঁহার প্রকৃত বেশ্যাচরিত্র অনুশীলনের অভাবমাত্র। অনেকদিন পরে দেবদাস যখন চন্দ্রমুখীর গৃহে ফিরিয়া গেল তখন সে চন্দ্রমুখীর শয্যায় উপবেশন করিয়া দেখিল, "ঘরটির একেবারে আগাগোড়া পরিবর্ত্তন হইয়াছে। গৃহস্বামিনীর মত তাহারও দুর্দ্দশার সীমা নাই। একটীও আসবাব নাই—আলমারি, টেবিল, চেয়ারের স্থান শূন্য পড়িয়া আছে। শুধু একটি শয্যা; চাদর অপরিষ্কৃত—দেয়ালের গায়ে ছবিগুলি সরাইয়া ফেলা হইয়াছে—লোহার কাঁটা এখনো পোতা আছে, দুই একটায় লাল ফিতা এখনও ঝুলিতেছে। উপরের সেই ঘড়িটা এখনো ব্রাকেটের উপর আছে, কিন্তু নিঃশব্দ। আশে-পাশে মাকড়সা মনের মত করিয়া জাল বুনিয়া রাখিয়াছে। এক কোণে একটা তৈল প্রদীপ মৃদু আলোক বিতরণ করিতেছে—তাহারই সাহায্যে দেবদাস নূতন ধরণের গৃহসজ্জা দেখিয়া লইল। কিছু বিস্মিত, কিছু ক্ষুব্ধ হইয়া কহিল, "চন্দ্র, এমন দুর্দ্দশা কেমন ক'রে হ'ল?" চন্দ্রমুখী ম্লান হাসি হাসিয়া কহিল, "দুর্দ্দশা তোমাকে কে বল্‌লে? আমার ত ভাগ্য খুলেচে।" ইহার পরে চন্দ্রমুখী আর বেশ্যা রহিল না, সুতরাং তাহার পরিচয় অনাবশ্যক।

অধ্যাপক নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের "শুভা" একটি কুলবধূর জীবনী। শুভা মধ্যবিত্ত গৃহস্থের বধূ, সে পিতৃগৃহে সুশিক্ষা পাইয়াছিল। "যৌবনের উন্মেষে শুভার প্রেমাকাঙ্ক্ষী হৃদয় নিবারণের স্থূল চেষ্টাহীন জড় দেহ ও তাহার স্বাস্থ্যভাব সত্ত্বেও তাহার প্রতি ধাবিত হইয়াছিল। এই রকম 'ধাওয়া ধিয়াটা' তরুণ চিত্তের পক্ষে স্বাভাবিক ইহা আকর্ষণের অপেক্ষা রাখে। তাই ধারণার বিষয়ীভূত ব্যক্তিটির আকর্ষণ করিবার ক্ষমতা থাকারও বিশেষ প্রয়োজন থাকে না। কিন্তু নিবারণের চিত্ত সেরকম কোনও উদ্বেগ কখনও পায় নাই। তাহার মানসিক আসনটা এত সম্পূর্ণ ও পরিপক্ক ছিল যে, প্রেমে পড়িবার জন্য যে রজোগুণের প্রয়োজন তাহাও তাহার ছিল না। শুভার রূপ যৌবনে যে সে তৃপ্ত হয় নাই তাহা নহে? তাহাকে তাহার দরকারও যথেষ্ট ছিল। কিন্তু এই যে আকর্ষণ ছিল সেটা সম্পূর্ণ দৈহিক, ইহা তাহার মনের ভিতর একটুও সাড়া দেয় নাই। যখন তাহার প্রয়োজন হইত তখন সে শুভাকে লইয়া নাড়াচাড়া, এমন কি আদর পর্য্যন্ত করিতে কুণ্ঠিত হইত না, কিন্তু ঐ পর্য্যন্ত।"

শ্বশুরবাড়ী আসিয়া, বিশেষতঃ শাশুড়ীর মৃত্যুর পর হইতে, শুভার সঞ্চিত আদর্শগুলি একে একে ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। তাহার স্বামী নিবারণ নিজ বৈবর্ত্তের যুবতী ভার্য্যার নিকট একদিন শতমুখীর আস্বাদন পাইয়াছিল, কবি স্পষ্ট করিয়া তাহার কারণ নির্দ্দেশ না করিয়াও ইঙ্গিতে আত্মবোধ জন্মাইয়া দিয়াছেন। নিবারণ "মদ খাইত না এ কথা বলা যায় না কিন্তু ঠিক মাতাল কখনো হইত না।" নিবারণ বড় স্বার্থপর, সে অত্যন্ত কৃপণ, তাহার আয়েসের জন্য শুভাকে প্রাণপণ পরিশ্রম করিতে হইত, এহেন স্বামী যখন শুভাকে কৃতজ্ঞচিত্তে পদাঘাত করিল তখন সে ভাবিল যে তাহার "বালির প্রাসাদ একেবারে চুরমার হয়ে গেলে……শেষ রাত্রে নিদ্রাভঙ্গে সে দেখিল সে স্বামীর আলিঙ্গনবদ্ধ। মুহূর্ত্তের জন্য একটা তৃপ্তির অবসাদে তাহার শরীর এলাইয়া পড়িল সেও স্বামীকে আলিঙ্গন করিবার জন্য হাত বাড়াইল। সহসা তাহার হৃদয় দারুণ ঘৃণায় পূর্ণ হইল, সে যেন চাবুক খাইয়া লাফাইয়া উঠিল।" এই তাহার প্রথম স্বামীকে অবহেলা. ইহার পরে দ্বিতীয় স্তর, তাহাতে তাহার পরপুরুষ কামনা দেখিতে পাওয়া যায়—"এই বাড়ীর উত্তরদিকে একটা জানালায় একটি যুবক এক দৃষ্টে অনেক-ক্ষণ ধরিয়া শুভাকে দেখিতেছিল। শুভা একবার চোখ তুলিতেই দেখিতে পাইল, যুবকটি একাগ্রভাবে তাহাকে দেখিতেছে। চোখে চোখে দেখা হইতেই যুবক অন্য-দিকে চাহিল। শুভাও লজ্জায় মুখ নত করিল।" ইহার পরে পরপুরুষ নায়ক সম্ভুক্ত হইবার পূর্ব্বেই শুভা স্থির করিয়া বসিল যে, সে বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন করিবে।

পরম শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধু ডাক্তার শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত কুলনারীকে পথান্তর প্রদর্শন করিতে মোটেই নহেন এবং এ কার্য্যে তাঁহার অভিজ্ঞতা নাই, সেইজন্যই তিনি কুলনারীর রাজবিলাসিনী বৃত্তি অবলম্বন প্রদর্শন করিতে গিয়া উপরের ও নিম্নের দুইটি স্তর মিশ্রিত করিয়া ফেলিয়াছেন। কুলনারী কখনও অন্নের অভাবে বা অত্যাচারে পতিগৃহ পরিত্যাগ করে না। তাহার স্বল্প-সূত্রে স্বভাব সঙ্গত কুমিকার তাহার চিত্ত বিদ্রূপ ঘটাইয়া তোলে এবং নিরুপায় উন্মত্তা হইয়া কুলনারী গৃহত্যাগ করে। ইহাই ভারতবর্ষে সনাতন কুলত্যাগ বিধি। পরকীয় সংসর্গে কিছুদিন পরিতৃপ্ত হইয়া নারী যখন অনুতাপ আরম্ভ করে তখনই তাহাকে বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন করিতে হয়, কারণ তাহার তৃপ্ত উপনায়ক উপনায়িকাকে ছিন্ন বস্ত্রের মত পরিত্যাগ করিয়া যায় এবং নারীকে তখন কলিকাতার বা মফঃস্বলের চির পরিচিত "বাড়ীওয়ালির" আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। "হঠাৎ একটা দুর্দ্দম ইচ্ছা তাহার বুক ঠেলিয়া উঠিতে লাগিল—তাহার সমস্ত শরীর ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল—তাহার বড় ভয় হইল, কিন্তু সে ইচ্ছাকে সে দমন করিল না। তাহার মনে হইল তাহার রূপ আছে যৌবন আছে তাহার খাইবার ভয় কি? ঘরে থাকিলেও শরীর বেচিয়া বাঁচিয়া থাকিতে হইবে বাহিরেও না হয় তাহাই হইবে।"

ডাক্তার নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত শুভার মনের যে বিকার দেখাইয়াছেন তাহা বিলাতী, দেশী নহে, শুভার মত দরিদ্র মধ্যবিত্ত বাঙ্গালীর গৃহের কন্যা বা বধূদের শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ লেখকগণের সহস্র চেষ্টা সত্ত্বেও বিলাতী ধাঁচের মনস্তত্ত্বের বিকার এখনো হয় নাই, সেইজন্যই বেহুলা-দীঘি, গোলদীঘি এখনও দীঘিই আছে, তাহা লণ্ডন বা নিউইয়র্কের পার্কগুলির মত রিরংসা প্রপীড়িত নর নারীর প্রকাশ্য অনঙ্গলীলার ক্ষেত্র হইয়া দাঁড়ায় নাই। শুভা পতিগৃহ ত্যাগ করিল। "রাত্রি বারটার সময় শুভা স্বামীর ঘরে বাহির হইতে শিকল টানিয়া দিয়া আস্তে আস্তে পা টিপিয়া বাহির হইয়া সদর রাস্তায় গেল।" এই কথাটি লিখিবার দুইপাতা পরেই গ্রন্থকার লিখিতেছেন—"গাড়োয়ান সম্মত হইল, না, কিন্তু চেঁচামেচি না করিয়া সে নিকবর্ত্তী একটা পোদ্দারের দোকান দেখাইয়া দিল। শুভা সেই দোকানে গিয়া আংটী ও একগাছা চুড়ী বেচিয়া দশটাকা পাইল।" রাত্রি বারটার সময়ে কলিকাতার কোন স্থানে গ্রন্থকার পোদ্দারের দোকান খোলা দেখিয়াছেন? রাত্রিকালে কলিকাতার বা বিদেশের কোন পোদ্দারই সোনা খরিদ করে না। গ্রন্থকার বিলাতী Gin palace এর সম্মুখের Pawn shop বাঙ্গালায় আনিতে গিয়া থিয়েটারের সম্মুখে রাত্রি বারটার সময়ে পোদ্দারের দোকানের পরিকল্পনা করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

শুভার প্রথম রঙ্গমঞ্চে আবির্ভাবের ব্যাপারটাও সম্পূর্ণ কাল্পনিক, এদেশে কোন পেশাদার থিয়েটার শুভার মত অনভিজ্ঞা রমণীকে রঙ্গমঞ্চে আবির্ভাব হইতে দেয় না। কিছুদিন পূর্ব্বে কলিকাতার একটি বিখ্যাত থিয়েটারে হঠাৎ একজন অভিনেত্রী অত্যন্ত পীড়িতা হইয়া পড়ে, সেখানে তখন নিকর্ম্মা দুই চারিটি অভিনেত্রী বসিয়াছিল, তাহাদের চাকরী গিয়াছে বলিয়া তাহারা চাকরীর সন্ধানে আসিয়াছিল, সে থিয়েটারের ম্যানেজার বাবু, অধ্যাপক নরেশচন্দ্রের পরিকল্পিত কমলা থিয়েটারের ম্যানেজারের ন্যায় সুন্দরী স্ত্রীলোক ভালবাসিতেন এবং বাসেন তথাপি তিনি বাহিরের লোককে দিয়া পীড়িত অভিনেত্রীর অংশ অভিনয় করাইতে সম্মত হইলেন না, তাঁহার নিজের থিয়েটারের একজন সুদক্ষা অভিনেত্রী সেই রাত্রিতে ও তাহার পরের দুই তিন রাত্রিতে একা দুই অংশ অভিনয় করিয়াছিল।

নরেশচন্দ্রের শুভা নামক উপন্যাসের দ্বিতীয় বেশ্যা চরিত্রও সম্পূর্ণ কাল্পনিক। চাঁপা বেশ্যার মেয়ে। চাঁপা কিন্তু তাহার স্বামীটিকে ভালবাসিত। সে ভাল বাসিবার মত এমন কিছু ছিল না, তবু চাঁপা তাহাকে ভালবাসিত। মা যখন তাহাকে বাড়ী হইতে বাহির করিয়া দিলেন তখন চাঁপা কয়েকদিন খুব কাঁদিল।" বেশ্যাকন্যার বিবাহ হয়, কিন্তু তাহারা প্রায়শঃ স্বামী লইয়া ঘর করে না, কারণ শিশুকাল হইতে তাহাদের অভিভাবিকারা তাহাদিগকে শিখাইয়া থাকে যে, তাহাদিগের জীবনে "স্বামী" সকল সুখের পথের কণ্টক এবং "বাবু" সকল সুখের মূলাধার। যে

দুই একটি বেশ্যাকন্যা মাতার তাড়না সহ্য করিয়াও স্বামী সংসর্গ রক্ষা করিতে পারে তাহারা কিন্তু পরে পর-পুরুষ সংসর্গ করে না এবং যখন করে তখন সাধারণ বারাঙ্গনার ন্যায় বহুল নায়ক সংসর্গ করিয়া থাকে। ডাক্তার নরেশচন্দ্র বলিয়াছেন,—"শেষে মাকে বাধ্য হইয়া জামাইয়ের খোঁজ করিতে হইল। কিন্তু জামাইকে পাওয়া গেল না।...মাতা চাঁপার মন ভুলাইবার জন্য তাহার সঙ্গে এক মস্ত বড় জমীদারের ছেলের আলাপ করাইয়া দিল। কিন্তু তাহাতে চাঁপা বড় গোলযোগ উপস্থিত করিল।..... চাঁপা সুন্দরিকা, সহজেই তাহার থিয়েটারে একটা চাকরী জুটিয়া গেল। থিয়েটারে অভিনয় করিতে করিতে চাঁপা একটি অভিনেতার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল। চাঁপা সুশ্রী, বুদ্ধিমতী, সুন্দরিকা, কাজেই সে যে পুরুষের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল তাহাকে আপনার করিতে তাহার বিশেষ কষ্ট হইল না। কয়েকদিন চাঁপার একটি প্রেমের স্বপ্নের ঘোরের ভিতর দিয়া কাটিয়া গেল। কিন্তু একদিন তার সে স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল। চাঁপা দেখিতে পাইল যে প্রেমাস্পদ তাহাকে ভালবাসে না। কেবল রূপের মোহে মুগ্ধ হইয়া সে তাহার পঙ্ক চরিত্র দিয়া চাঁপাকে গ্রহণ করিয়াছে, তাহাকে ভালবাসিতে পারে নাই।" চাঁপার মত নারীকে যে জাতির পুরুষ ভালবাসে, থিয়েটারের অভিনেতারা তদ্বংশজাত হইলেও থিয়েটারে গিয়া যে জাতীয় অভিনেত্রীর প্রেমে পড়ে তাহারা পবিত্র প্রেমের জন্য সে স্থানে যায় না, একথা বর্ত্তমান রঙ্গমঞ্চে যাহারা প্রবেশ করিয়াছেন তাঁহারা সকলেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবেন। শুভার কমলা থিয়েটারের অভিনেতার নিকট পবিত্র প্রেমের বাসনা অত্যন্ত অস্বাভাবিক, ডাক্তার শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত বাঙ্গালা দেশের আধুনিক পেশাদার থিয়েটারের কোন কথা না জানিয়াই চাঁপার প্রেমাকাঙ্ক্ষা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহার মনের আদর্শটা বিলাতী, বাস্তবজীবনে তিনি বেশ্যা জাতীয়া কোনও অভিনেত্রীর ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আসিয়াছেন কিনা সন্দেহ, আমাদের দেশের অভিনেত্রীতে আর বিলাতী থিয়েটারের অভিনেত্রীতে আকাশপাতাল প্রভেদ আছে, কারণ বেশ্যা না হইলেও বিলাতী থিয়েটারে অভিনেত্রী হওয়া যায় এবং বেশ্যাও বিবাহ করিয়া ভদ্রসমাজে মিশিতে পারে কিন্তু বাঙ্গালার হিন্দু সমাজে তাহা অসম্ভব। এই জন্যই অভিনেতা অভিনেত্রীর প্রেম আমাদের দেশে নিরংশা মূলক, পরে তাহা পবিত্র হইতে পারে কিন্তু প্রথমে নহে। এই জন্যই ডাক্তার নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের অঙ্কিত চাঁপার চিত্র সম্পূর্ণ রূপে অস্বাভাবিক হইয়াছে।

চাঁপার ও শুভার পরিণতিও সেইরূপ অস্বাভাবিক। শুভা বাড়ী হইতে বাহির হইল রূপ যৌবন বিক্রয় করিয়া অর্থোপার্জ্জন করিতে কিন্তু খানদানী বেশ্যা চাঁপার বাড়ীতে বসিয়া সতীত্ব হঠাৎ আবার তাহাকে আক্রমণ করিল এবং চাঁপার কথামত পুলিশ কোর্টে দরখাস্ত করিয়া বেশ্যাবৃত্তি আরম্ভ করিতে তাহার একটু উদ্বেগ দেখা দিল। এইখানে গ্রন্থকার বোধ হয় তাহার প্রচ্ছন্ন উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিয়াছেন, অর্থাৎ—তরুণতরুণীর নিরংশা বৃদ্ধির চেষ্টা করিয়াছেন কিন্তু গ্রন্থকারের বাস্তবজীবনে বেশ্যার সহিত পরিচয় না থাকায় চিত্রটা অত্যন্ত অস্বাভাবিক হইয়া বৈষ্ণের কর্পূর ভোজনের ব্যবস্থার অনুরূপ হইয়াছে। "শুভা স্থির করিল বেশ্যাবৃত্তি করিতে হয় করিবে। সেটা যে দারুণ অপমান তাহা সত্য, কিন্তু যদি অন্য উপায় না থাকে তবে সে অপমানও সহিতে হইবে।"

"শুভা এখন প্রতিমুহূর্ত্তে আশঙ্কা করিতেছিল যে, এই পুরুষগুলি এখনি তাহাকে টানিয়া লইবে। সেই আশঙ্কায় সে অসহায় ছাগশিশুর মত ভিতরে ভিতরে কম্পিত হইতে-ছিল। তাই এ গান গাইবার প্রস্তাব শুনিয়া সে আশ্বস্ত হইল।"

এই দুইটি উক্তিই সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক। আমাদের দেশে বিলাতী আমদানীর পূর্ব্বে চুম্বন রতি প্রকরণের একটা অঙ্গ ছিল, বিলাতী সমাজে চুম্বন যত প্রচুর, আমা-দের সমাজে এখনও ততটা প্রচুর হয় নাই এবং তদ্বিশেষে এখনও অনঙ্গরঙ্গের রঙ্গমাত্রই আছে। শুভা অবশ্য যেম মিশনারীর স্কুলে পড়িয়াছিল অতএব এতদ্দেশীয় প্রাচীন নখরদশন জাতীয় রতিচক্রের প্রকরণ বিশেষ অনাবশ্যক বলিয়া পরিত্যাগ করিয়া বিলাতী চুম্বনবিধি অবলম্বন করিয়াছিল। সেই জন্যই "নগেন অমনি তাহাকে বুকের কাছে চাপিয়া ধরিয়া চট করিয়া তাহাকে চুম্বন করিল।

শুভা আপাদগোড়া লাল হইয়া উঠিল, কিন্তু তাহার হৃদয়ে বিদ্রোহের কোনও চিহ্ন দেখা গেল না।" "শুভা লজ্জায় ও আনন্দে রঙ্গিন হইয়া উঠিল, এবং যখন নগেন তাহাকে বুকের ভিতর টানিয়া তাহার রঙ্গিন গণ্ডে একটি গভীর চুম্বন দিল, তখন সে শরীর সম্পূর্ণ এলাইয়া দিয়া তাহার বুকের সঙ্গে মিশিয়া গেল।"

"আহারের পর দুইজনে দুইঘরে গিয়া বসিল, সেখানে অনেকক্ষণ গান বাজনা, হাস্য পরিহাস, রঙ্গরস হইল! রাত্রি এগারটার সময় নগেন শুভার কাছে বিদায় লইল। শুভা নগেনকে ফটক পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া যখন তাহার দুইঘরে ফিরিল তখন তাহার সমস্ত শরীর দিয়া যেন রক্ত ছুটিয়া বাহির হইতে চাহিতেছে।" সকল দেশে সকল সময়েই শুভা ও নগেনের চুম্বন আলিঙ্গন ব্যাপার রতিচক্রের উপক্রমণিকা মাত্র, এই চক্রে প্রবৃত্ত হইলে নরনারীর দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া থাকে, তখন শান্তভাবে বিদায় লইয়া চলিয়া যাওয়া নগেনের পক্ষে অত্যন্ত অস্বাভাবিক—

"শাস্ত্রানাং বিষয়স্তাবদ্‌যাবন্নরসনা নরাঃ।
রতিচক্রে প্রবৃত্তে তু নৈব শাস্ত্রং ন চ ক্রমঃ॥"

গ্রন্থকার শুভার যে অবস্থার বর্ণনা করিয়াছেন সে অবস্থায় নারী তাহার বিবিধ কণ্ডূতির অপনোদন না হইলে নায়ককে পরিত্যাগ করে না।

"কণ্ডূত্যপনয়াৎ স্ত্রীণাং করণাচ্চ সুখং যিথা।
তস্মনঃ চ বিসৃষ্টিশ্চ তদ্বদুক্তকরণং যিথা॥
ক্রিয়তা কেবলস্তস্মাদ্বিসৃষ্টের্ধনাৎ সুখম্।
অন্তে ত্যাক্ষিপ্তবেগায়া বিস্মৃতির্বৎ স্মৃতা।"

Tumescent অবস্থায় বিবিধ কণ্ডূতির অপনোদন না হইলে নারী নায়ককে পরিত্যাগ করিতে পারে না, গ্রন্থকার অপরিচিত পথে বিচরণ করিতে গিয়া হিংসা পীড়িতা শুভার চরিত্রাঙ্কণে কৃতকার্য্য হন নাই। এই জাতীয় নারী বেশ্যা নহে, পরকীয়া এবং শরৎচন্দ্রের পরকীয়া চিত্রে যে স্বভাবসিদ্ধ পটুতা দেখিতে পাওয়া যায়, নরেশচন্দ্রের অঙ্কিত পরকীয়ায় তাহার নিতান্ত অভাব। নরেশচন্দ্রের পরকীয়া বিলাতী পরকীয়ার হিসাবেও তাহার বস্তুতন্ত্রতার অভাবে নিতান্ত অস্বাভাবিক হইয়া পড়িয়াছে।

রূপের-নেশা।

[শ্রীদ্বিজেন্দ্রচন্দ্র দত্ত।]

আমায় তুমি ধরবে বলে
　　নিত্য কর কতই না ছল,—
দিনে দিনে এমন করেই
　　আমায় তুমি করবে পাগল!
ষড় ঋতু আমার দ্বারে,
ঘুরে বেড়ায় বারে বারে;
এমন রূপের হাটে আমি
　　সাধ্য কি যে রইব অচল—

আজ এসেছে কোন্ রূপসী
　　এই শরতের পূবো হাওয়ায়?
কাশের শাদা ফুলগুলি ঐ
　　নদীর ধারে দোল্ খেয়ে যায়!
ভেবেছিলাম আপন ঘরে,
এবার আমি রইব পড়ে;
ঐ শিহরণ তুলিয়ে দিল,
　　আমার গোপন চিন্তা সকল।

দুষ্টু ছেলে

[শ্রীযতীন্দ্রমোহন দত্ত]

আইভান আইভানিচ্ লেপ্‌কিন্ যুবক, বেশ সুন্দর কিটফাট চেহারা, সেদিন আনা জেমট্রিকি বলে তার প্রতিবেশী এক তরুণীর সহিত নদী তীরে বেড়াইতে বেড়াইতে একটা বেঞ্চের উপর বসিয়া পড়িল। সবুজ উইলো কুঞ্জের ভিতর জলের ধারে বেঞ্চটা পড়িয়াছিল। ভারী চমৎকার। সেখানে বসিলে বাহির হইতে মোটেই কিছু দেখা যায় না। শুধু ছোট্ট নদীটির অস্ফুট কলরোল ও মাছের খেলা হৃদয় স্পর্শ করে। তরুণ তরুণী দুইজনেই ছিপ, হুইল, থলি ও আধার সব প্রয়োজনীয় জিনিস সাথে লইয়া গিয়াছিল। সেখানে বসিয়াই তারা বড়শী ফেলিল।

চারিদিকে চাহিয়া লেপকিন বলিয়া উঠিল—"সুখের বিষয় যা হ'ক, অবশেষে আজ আমরা একটু নিরিবিলিতে আলাপের সুযোগ পেয়েছি, আনা, তোমাকে আজ অনেক কথা বলবার আছে। যখন তোমাকে প্রথম দেখলাম···তোমার বড়শীকে ঠোকরাচ্ছে, তখনই বুঝলাম কেন আমি আজও বেঁচে রয়েছি, মনে হল আজ সত্যই আমার মানসীপ্রতিমার দেখা পেয়েছি,—যার চরণে আমার এই ভারাক্রান্ত জীবনটা উৎসর্গ করে দেব... মাছটা বেশ বড় বলে মনে হচ্ছে, দেখ কেমন জোরে ঠোকরাচ্ছে।

যখন তোমার চল চল চাঁদপানা মুখখানি প্রথম দেখলাম তখন থেকেই তোমাকে ভালবাসতে সুরু করেছি,—টেনো না, টেনো না, আরো ঠোকরাক্...প্রিয়ে বল, আমার কোন আশা আছে কি? অবশ্য; আমি উপযুক্ত নই, এ চিন্তা যে আমার পক্ষে অসম্ভব।..... টান, টান।"

আনা তখন দুই হাতে সজোরে ছিপে টান দিয়াই, আনন্দে অস্ফুট চীৎকার করিয়া উঠিল, চক্‌চকে সাদা একটা মাছ বড়শীতে গাথিয়াছে।

"বেশ, বেশ, সুন্দর শিকারটাত, খুব তাড়াতাড়ি খুলে ফেল, নইলে পড়ে যেতে পারে।" কিন্তু মাছটা হঠাৎ বড়শী থেকে ছিঁড়ে, সবুজ ঘাসের উপর পড়িয়া ধড়ফড় করিয়া জলে পড়িয়া গেল। মাছটাকে ধরিবার চেষ্টা করিতে গিয়া দৈবাৎ অতর্কিতে লেপ্‌কিন্ আনার হাতটা ধরিয়া ফেলিল ও ধীরে ধীরে আপনার ওষ্ঠাধরের কাছে লইয়া গেল। আনা একটু সরিয়া গেল, কিন্তু আর সময় ছিল না। হঠাৎ তাহাদের পরস্পরের ওষ্ঠাধর এক সাথে মিলিয়া গেল, হা দোষ্টা যে দৈবাৎ তার আর ভুল কি? চুমোর পালা শেষ হইল, অঙ্গীকার ও আশ্বাসের কথা আসিয়া পড়িল। হায় সে কি শুভ মুহূর্ত্ত।

কিন্তু এ সংসারে চিরসুখ কারো কপালে নাই, যদিও সুখের ব্যাপারে কোন বিষাক্ত জিনিসের গন্ধ নাই, তবুও বাহির হইতে যেন নানা বিঘ্ন আসিয়া উপস্থিত হয়। ঘটনাটা হল এই, তারা যখন বেশ মনের সুখে উভয়ে উভয়ের অধর-সুধা পানে ব্যস্ত ছিল, তখন হঠাৎ একটা হাসির শব্দ শোনা গেল। নদীর দিকে চাহিয়া তারা একেবারে থতমত খাইয়া গেল। দুষ্টু ছেলে কমলা! আনার ছোট ভাই কমলা জলে দাঁড়াইয়া, তাদের দেখিয়া দুষ্টু হাসি হাসিতেছিল। "আঃ চুমো খাওয়া! তা বেশ, বেশ, আমি আজই মাকে সব বলে দেব কিন্তু!"

লেপ্‌কিন্ ঘামিয়া গিয়া বলিয়া উঠিল—"ভগবানের দিব্যি, আশা করি, তুমি এসব বলবে না? কেমন লক্ষ্মীটি আমার? চোরের মত চুপি চুপি আমাদের কাজ দেখা, এ বড় বিশ্রী, ছি, ছি, এসব কি ভদ্রলোকের কাজ।"

"আমায় একটা শিলিং দাও, তবে আর কিছু বলব না. আর যদি না দেও, তা হ'লে, সব কথা বলে দেব।"

লেপ্‌কিন্ তাড়াতাড়ি পকেট হইতে একটা চক্‌চকে শিলিং বাহির করিয়া তৎক্ষণাৎ ছেলেটাকে দিয়া দিল। সে তা মুহূর্ত্তে তার ভিজা পকেটে ফেলিয়া শিষ্ দিতে দিতে চলিয়া গেল। কিন্তু প্রণয়ী যুগল তখনই আবার পরস্পরের মুখচুম্বন করিতে সাহস পাইল না।

পরদিন সহর হইতে লেপ্‌কিন্ তার জন্য সুন্দর সুন্দর

ছবি ও খেলার বল আনিয়া দিল, তার বোনও তাকে, বাক্স খালি করিয়া তার সব খেলনা দিয়া ফেলিল। কুকুরের মাথার মত বড় কত সুন্দর মোতাম আনিয়া দিল। দুই ছেলের আহ্লাদের সীমা নাই। আরো পাওয়ার আশায়, সে যেন আরও বেশী করিয়া এই তরুণ তরুণীর গতিবিধি ভাল করিয়া নজর রাখিতে লাগিল।

যখনই আনা ও লেপকিন একত্র মিলিত হইত, কয়লা তখনই সেখানে গিয়া উপস্থিত। এক মুহূর্ত্তের জন্য সে তাদের ছাড়িয়া যাইত না। লেপ্‌কিন্ ভাবিতে লাগিল ছেলেটা কি বজ্জাত বাবা! এতটুকু বয়সেই যে বদমাইস, বড় হলে না জানি কেমন হবে এ সংসারে কোনি কাজই যে তার অসাধ্য থাকবে না! সমস্ত ঘুণাই মাস ভরিয়া এই দু'টি যুবক যুবতী আর একটুকুও নিরিবিলি থাকিবার অবসর পাইল না। প্রায়ই সে সব বলিয়া দিবে বলিয়া, তাদেরে ভয় দেখাইয়া ছলে নানা উপহার আদায় করিত। কিন্তু কিছুতেই তার আর তৃপ্তি হইতেছিল না। অবশেষে সে একটা সোণার ঘড়ির জন্য ধরিয়া বসিল। বাধ্য হইয়া তখন তারা তাকে সোণারি ঘড়ি কিনিয়া দিতে প্রতিশ্রুত হইল। একদিন খাবার টেবিলে, যখন বিস্‌কিট্ খেওয়া হইতেছিল, কয়লা তখন হাসিয়া উঠিল ও লেপকিনকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিল—"আজ সব বলে দেব! দেব? হিঃ হিঃ—

লেপ্‌কিন্ লজ্জায় লাল হইয়া উঠিল এবং বিসকিটের পরিবর্ত্তে, সে টেবিল মুছিবার গামছাটাই চুষিতে লাগিল। আনা তড়াক করিয়া টেবিল ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িল ও ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল। এভাবে আগষ্টের শেষ পর্য্যন্ত চলিতে লাগিল. অবশেষে লেপ্‌কিন্ আনার নিকট বিবাহের প্রস্তাব লইয়া উপস্থিত হইল। ওহো, সে কি সুখের দিন! যখন লেপকিন আনার বাপমায়ের অনুমতি পাইল, তখনই ছুটিয়া গিয়া বাগানে, কয়লাকে ধরিল। ছেলেটাকে পাইয়াই, লেপকিনের ভারী স্ফূর্ত্তি হইল। তার কানটি ধরিয়া হিড় হিড় করিয়া টানিতে লাগিল, তার দিদিও অনেকক্ষণ ধরিয়া, ভাইটির খোঁজ করিতেছিল হঠাৎ তাকে দেখিতে পাইয়াই, ছুটিয়া কাছে আসিল,এবং আর একটা কান ধরিয়া বেশ জোরে টানিতে লাগিল। ওহো, আপনারা যদি তরুণ তরুণীর সে সময়কার আনন্দোজ্জ্বল, শান্ত মুখচ্ছবি একটিবারও দেখিতে পাইতেন—সে মুখে কি গভীর তৃপ্তি. কি মিষ্টি হাসি!

কয়লা চেঁচাইতে লাগিল—"দোহাই তোমাদের, ক্ষমা কর, আমায় আজ ছেড়ে দাও, আর কখনও আমি এ কাজ করব না, করব না, এই আমি প্রতিজ্ঞা করছি।"

তখন সেই নব প্রেমে মাতোয়ারা প্রণয়ীযুগল স্বীকার করিতে বাধ্য হইল, এই সুদীর্ঘ কালের এ প্রণয়লীলায়, তারা কখনও এমন আমোদ, এমন সুখের আস্বাদ পায় নাই, আজ এই কয় মুহূর্ত্তে তারা যেরূপ বিমল আনন্দ উপভোগ করিল।*

* বিখ্যাত রুশ লেখক এন্টন্ চেকভের গল্প হইতে অনুদিত।

বানরের খেদ।

(তুলসীদাস)

[শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী]

আমার যত পূর্ব্বপুরুষ
　　লঙ্ঘে হ'ল সাগর পার,
কেউ লঙ্কিল রামের কাছে
　　মিতার মতন ব্যবহার,
কেউ করিল বাহুর বলে
　　বৃক্ষ গিরি উৎপাটন,
শিক্ষা ছিল কেউবা সবে
　　নীতির সার ও সুবচন।
কি কহিব রামকে আমি?
　　আমি কিরে হ'লাম চোর!
রজ্জু ধ'রে টান্‌ছে যেবে!
　　সেই কুলেতে জনম মোর॥

ব্যতিক্রম

(উপন্যাস)

[শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ]

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

পরদিন মোহিনী অতিপ্রত্যূষে নদীতে স্নান করিতে গিয়াছিল। সেবার আশ্বিনের শেষে পূজা পড়িয়াছিল, সুতরাং রাত্রি শেষে শীত পড়িয়াছিল। নিচলা নদীর জল শীতের আরম্ভে শুষ্ক হইয়াছিল। মোহিনী জলে নামিয়া অত্যন্ত সঙ্কুচিতা হইয়া তিনটা ডুব দিয়াই ঘাটে উঠিয়া পড়িল। তখনও গাছপালার মধ্যে ঘন অন্ধকার ছিল, ঘাটের পাশে একটা গাছ নড়িয়া উঠায় সে ভয় পাইল এবং আবার জলে নামিল। ঘাটে উঠিয়া ঠাণ্ডা হওয়ায় তাহার বড়ই শীত লাগিয়াছিল, জলে নামিয়া আকণ্ঠ অবগাহন করিয়া তাহার একটু আরাম বোধ হইল। গাছের পাতা নড়ায় তাহার ভয় হইয়াছিল, শৃগালকে সে বড় ভয় করিত তাহার মনে হইল যে হয়ত একটা ক্ষ্যাপা শিয়াল তাহাকে কামড়াইবার জন্য দাঁড়াইয়া আছে। সে স্থির করিল যে আর একটু পরিষ্কার না হইলে ঘাটে উঠিবে না।

অনেকক্ষণ পরে মোহিনীর মনে হইল যে ঘাটের উপরে লোকে কথা কহিতেছে। সে তখন উচ্চকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "ঘাটের উপরে কে গা?" বিনয় উত্তর "আমি বিনয়। তুই কি নেড়ী?" বিনয়ের গলার আওয়াজ চিনিয়া মোহিনী ভরসা পাইয়া বলিল, "বিনু দাদা তুমি জলের কাছে নেমে এস না? আমার বড় ভয় কোরছে।" বিনয় ও নির্ম্মল দুটীয়া জলের কাছে আসিল, নির্ম্মল যে আসিবে মোহিনী সে প্রত্যাশা করে নাই, সুতরাং সে ভাল করিয়া গায়ে কাপড় দেয় নাই। এখন তাড়াতাড়ি ভিজা কাপড় গায়ে জড়াইতে না পারিয়া গামছা খানা মাথায় ও গায়ে জড়াইয়া লইল অর্দ্ধস্ফুট উষালোকে নবতের স্নিগ্ধ শান্ত প্রভাতে মোহিনীর মোহন রূপ নির্ম্মলকে এতটাই অভিভূত করিয়া ফেলিল যে সে নির্নিমেষ নয়নে তাহার আননের দিকে চাহিয়া রহিল। বিনয় তাহা দেখিয়া তাহাকে একটা চিমটি কাটিয়া বলিল, "কি বাঁদরামো করছিস?" নির্ম্মল তাড়া খাইয়া তাড়াতাড়ি চোখ ফিরাইয়া লইল। তখন বিনয় জিজ্ঞাসা করিল "কি হয়েছে রে নেড়ী?" মোহিনী অস্ফুটস্বরে কহিল, "বোধ হয় একটা ক্ষ্যাপা শিয়াল, ঐখানে ঐ বনের ধারে।" তাহা শুনিয়া বিনয় বলিল, "তোর কোন ভয় নেই, আমি এখনই শিয়াল তাড়িয়ে দিচ্ছি।" নির্ম্মল ও বিনয় এক একটা গাছের ডাল ভাঙ্গিয়া লইয়া বনের ভিতরে ঢুকিল, তখন মোহিনী তাড়াতাড়ি গায়ে কাপড় জড়াইয়া ঘাটে উঠিল।

অল্পক্ষণপরে বিনয় ও নির্ম্মল যখন ফিরিয়া আসিল তখন ও মোহিনী দাঁড়াইয়াছিল কারণ তখনও তাহার ভয় কমে নাই। বিনয় তাহাকে দেখিয়া বলিল "নেড়ী তোর সঙ্গে আমার গোটা কতক কথা আছে, তুই উপরে উঠে আয়।" নির্ম্মল ও বিনয় আগে আগে চলিল, মোহিনীও তাহাদের পিছনে নদী তীরের উপরে উঠিল। নদীর তীরে পাশাপাশি দুইটি শিবমন্দির ছিল, এবং মন্দিরের আশে পাশে অনেক স্থলপদ্ম আর কলিকা ফুটিয়াছিল। মন্দিরের রোয়াকের উপরে বসিয়া বিনয় নির্ম্মলকে বলিল, "নিরু, তুই ওপাশে যা, নেড়ীর সাজিটায় স্থলপদ্ম তুলে নিয়ে আয়।" একটা কাজ পাইয়া নির্ম্মল বাঁচিয়া গেল, সে সকালবেলায় স্নানের পরে পট্টবস্ত্র পরিয়া ফুল তুলিতে আসিয়াছিল, এখন সে তিন জনের তিনটী সাজি লইয়া চলিয়া গেল।

নির্ম্মলের পায়ের শব্দ থামিয়া গেলে বিনয় মোহিনীকে জিজ্ঞাসা করিল "নেড়ী ঠানদি তোকে কিছু বলেছে?" মোহিনী প্রথমে লজ্জায় মাথা হেঁট করিয়াছিল, এখন সে মাথা তুলিয়া বলিল "বলেছে।" বিনয় জিজ্ঞাসা করিল "সমস্ত কথাই কি বলেছে?" মোহিনী তখন আবার মাথা হেঁট করিয়া বলিল "সমস্ত কথাই বলেছে

বিনুদাদা।" "তুই এখন কি কোরবি?" "আমি আর কি কোরব।" "তবে কি ঐ বুড়োকেই বিয়ে করবি?" বিবাহের কথা শুনিয়া মোহিনী মাথা নিচু করিয়া পায়ের আঙুল দিয়া মাটি খুঁড়িতে লাগিল, সে উত্তর দিল না দেখিয়া বিনয় আবার জিজ্ঞাসা করিল, "তোর মনের ভাবটা কি খুলে না বললে আমি কি করে কি করব?" সেবারও মোহিনী উত্তর দিল না সে সহজে উত্তর দিতে পারিবে না দেখিয়া বিনয় আবার জিজ্ঞাসা করিল, "তুই কি জেঠা মহাশয়ের কথা শুনে বুড়োকে বিয়ে করবি না ঠানদিদির কথা শুনে চলবি? তোর নিজের কি মত আমাকে তা খুলে বল।" লজ্জায় মুখখানি রাঙা করিয়া মোহিনী বলিল, "আমি ঠানদিদির কথা মত চলবো।" মোহিনীর কথা শুনিয়া বিনয়ের হৃদয় আনন্দে নাচিয়া উঠিল। সে বলিয়া উঠিল, "তবে ঠান্‌দি তোকে নির্মলের কথাও বলেছে?" অবনত মস্তকে মাথা নাড়িয়া মোহিনী জানাইল যে নির্মলের অবস্থার কথা সে শুনিয়াছে। তখন ভরসা পাইয়া বিনয় বলিল, "দেখ নেড়ী তোকে আমার ছোট বোন বলে জানি তুই যদি আমার কথা শুনে চলিস্ তাহলে ঐ বুড়োর হাত থেকে আমিই তোকে রক্ষা কোরব। জেঠামহাশয় খুব চোটবেন বাবাও খুব রাগ করবেন কিন্তু তাতে আমার দুঃখ নেই। তোকে যদি সুখী করতে পারি তাহলে জেঠামহাশয়ের অভিশাপ আর বাবার গাল আমার মাথায় আশীর্বাদের মত এসে পরবে। তুই আমার কাছে লজ্জা করিস নি। তুই সত্যি করে বল তুই কি নির্মলকে ভাল বাসিস্?" মোহিনী মাথার কাপড় টানিয়া দিয়া অস্ফুটস্বরে বলিল, "ছিঃ।" তাহার মনের ভাব বুঝিতে না পারিয়া বিনয় বলিয়া উঠিল, "নেড়ী তুই কথাটা একটু তলিয়ে বুঝে দেখ, নির্মল বড় বংশের ছেলে, সে বংশের সেই শেষ বংশধর, সে তোর জন্য পাগল হয়ে উঠেছে। তুই তাকে বিয়ে না করলে সে হয়ত বিয়ে করবে না; নির্মল বাপের এক ছেলে তোর জন্য তাদের হয়ত বংশলোপ হয়ে যাবে। তুই একবার ভেবে চিন্তে বিবেচনা করে দেখ?"

মোহিনী বিনয়ের কথা শুনিয়া বুঝিল যে সে তাহার অন্তরের ভাব কিছুই বুঝিতে পারে নাই। তখন সে সাহসে বুক বাঁধিয়া বলিল, "ওরা নাকি মোছলমান?" বিনয় চমকিয়া উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিল "ওরা মোছলমান হতে যাবে কেন! একথা তোকে কে বললে নেড়ী?" মোহিনী তখন মুখ তুলিয়া বিনয়ের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "একথা বাবার মুখেই শুনেছি।" তখন বিনয় বলিল, "নেড়ী বিরানীরা মুছলমান নয় হিন্দু, হিন্দু না হলে কখন দুর্গাপূজার ফুল তুলতে পারে? দেখছিস্ না ওর গলায় এক গোছা পৈতা?" মোহিনী তখন বিনয়ের মুখের দিকেই চাহিয়া বলিল, "তবে তুমি যা বলবে বিনু দাদা তাই কোরবো।" বিনয় মন্দিরের রোয়াক হইতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "দিদি, এ কাজের ফল ভগবান তোমার একদিক দেবেন, নির্মল যে আমার কতদূর আপনার, সে যে আমার কে তা তুমি জান না। দরকার হলে তার জন্যে আমি নিজের হাতে নিজের মাথাটা কেটে ফেলতে পারি।, নেড়ী অঘ্রাণ মাসেই তোর বিয়ে, বিয়ের পাঁচ সাত দিন আগে ঠানদিদি তোকে কোন রকমে অন্য যায়গায় নিয়ে যাবে সেখান থেকে আমি তোকে কলকাতায় নিয়ে গিয়ে নির্মলের সঙ্গে তোর বিয়ে দেবো। নির্মল তিনটা ফুলের সাজি ভরিয়া লইয়া আসিয়া একটা মোহিনীর হাতে দিতে গেল কিন্তু মোহিনী মাথার কাপড় টানিয়া দিয়া এক পাশে সরিয়া দাঁড়াইল। বিনয়ের মুখের ভাব আর মোহিনীর সঙ্কোচ দেখিয়া নির্মল সাজি তিনটা মাটিতে রাখিয়া প্রাণের আবেগে বিনয়কে আলিঙ্গন করিয়া চুম্বন করিয়া ফেলিল।

ষড়ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

পূজা শেষ হইয়া গেল আনন্দোৎসবের সহিত বাঙ্গালীর প্রধান উৎসব শেষ হইয়া গেল। একাদশীর দিন সমস্ত ব্যবস্থা শেষ করিয়া নির্মল কলিকাতায় চলিয়া গেল কিন্তু তাহারই নির্দ্দেশমত বিনয় হরিহরপুরে থাকিয়া গেল। নির্মল চলিয়া যাইবার দুই তিনদিন পরে একদিন সকাল বেলায় সে গ্রামের বাজারে দাঁড়াইয়াছিল এমন সময়ে একজন পিয়ন আসিয়া তাহাকে একটা রেজিষ্টারি

করা পত্র দিল, পত্রখানা লইয়া বিনয় খুলিবার চেষ্টা করিল কিন্তু সহজে পারিল না। তখন সে একটা দোকানে ঢুকিয়া একখানা কাঁচি চাহিয়া লইয়া পত্রের একটী কোণ কাটিল এবং দেখিল যে তাহার ভিতরে অনেকগুলি একশত টাকার নোট রহিয়াছে। প্রেরক স্বয়ং গৌরমোহনবাবু, তিনি লিখিয়াছেন যে পত্রের ভিতর ২০০০৲ টাকা পাঠান হইল, আবশ্যক হইলে আরও টাকা পাঠান হইবে। নোটগুলি গোণা শেষ হইবার পূর্ব্বেই বিনয় যেখানটায় দাঁড়াইয়াছিল সেখানটা হঠাৎ অন্ধকার হইয়া উঠিল। বিনয় তাড়াতাড়ি মুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখিল যে পরেশচন্দ্রের বিশালবপু দোকানে আলোক প্রবেশের পথ একেবারে রোধ করিয়া ফেলিয়াছে। পরেশকে দেখিলেই কাশীর কথা মনে করিয়া বিনয়ের একটু ভয় হইত, সে তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করিল, "কি পরেশ বাবু যে?" পরেশবাবু বিকট হাস্যে ক্ষুদ্র দোকান কম্পিত করিয়া বলিলেন, এজে গিন্নিমা তলব দেছেন। হুজুর কিছুমাত্র চিন্তিত হবেন না কারণ এবার কর্ত্তাবাবুর পেন্নামি হাজার এক, জামাই মজ্জেষা হাজার এক যেনঠাকরুণের মজ্জেষা—" কথা গুলিয়া বিনয়ের আপাদ মস্তক জ্বলিয়া উঠিল সে বলিল, "সে সব কথা দোকানে পসারে বাজারে প্রয়োজন কি পরেশবাবু? বাড়ীতে চলুন বাবা বৈঠকখানাতেই বসে আছেন।" বলিতে বলিতে বিনয় যে খাম খানায় টাকা আসিয়াছিল তাহা ফেলিয়া দিল, পরেশচন্দ্র কিছুমাত্র অপ্রস্তুত না হইয়া বলিল, "সেইখানেই যাওয়া হোচ্ছিল পথে হুজুরকে দেখে সুসংবাদটা দিতে এলুম।" বিনয় অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া বলিল, "সে সুসংবাদ বাবাকেই দেবেন চলুন।" এই বলিয়া নোটগুলি ও গৌরমোহনের পত্র টেঁকে গুঁজিয়া বিনয় দোকান হইতে বাহির হইয়া পড়িল। পরেশচন্দ্র খালি সেপাকাখানা তুলিয়া লইয়া সঙ্গে সঙ্গে চলিল।

একাদশীর দিন হরসুন্দর কতকগুলি ব্রাহ্মণের দ্বাদশীর পারণের ব্যবস্থা করিতেন, তিনি তখন বৈঠকখানায় বসিয়া নিমন্ত্রণের ফর্দ্দ করিতেছিলেন। দূর হইতে পুত্রকে আসিতে দেখিয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন, "বিনু এই ফর্দ্দটা নিয়ে যা নিমন্ত্রণ কোরে আয়।" বলিয়াই পুত্রের পশ্চাতেই পরেশচন্দ্রের বিশালবপু দেখিয়া হরসুন্দরের মুখ অপ্রসন্ন হইয়া উঠিল, পিতার মুখের ভাব পুত্র মুদ্রিত পুস্তকের পত্রের ন্যায় পড়িয়া ফেলিল সুতরাং তাহার মুখখানা ভয়মিশ্রিত প্রসন্ন হইয়া উঠিল। পরেশচন্দ্র আসিয়া বহুকষ্টে প্রণাম করিয়া ব্যাগ হইতে তিনটি টাকার তোড়া বাহির করিয়া হরসুন্দরের সম্মুখে রাখিল। হরসুন্দর বিরক্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল "এ সব কি পরেশ?" পরেশবাবু আকর্ণবিস্তার দন্তপংক্তি বিকশিত করিয়া বলিল, "এজে ইটি হাজার এক হুজুরের মজ্জেষা, ইটি হাজার এক গিন্নিমার মজ্জেষা আর ইটি হাজার এক জামাইবাবুর মজ্জেষা।" সহসা বিনয়ের মাথা ঘুরিয়া উঠিল, "সে মনে করিল যে একসঙ্গে তিন হাজার তিন টাকার লোভ পিতা যদি সম্বরণ করিতে না পারেন তাহা হইলে হয়ত তাহাকে তাহার স্বর্গগতা স্নেহময়ী শ্বশ্রূর স্বর্গগতা প্রেমাতিনয় দেখিতে যাইতে হইবে। সে পিতাকে জিজ্ঞাসা করিল "বাবা আমার কি এখানে কোন দরকার আছে না আমি নিমন্ত্রণ করতে যাব?" পরেশচন্দ্র সেই অবসরে টাকা গুণিতে বসিয়া গিয়াছিল তাহাকে বাধা দিয়া হরসুন্দর বলিলেন, "পরেশ ও টাকা গোণবার প্রয়োজন নেই, তোমার মনিব যখন মেয়ে পাঠান নি তখন ওঁর সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই। আমার ছেলে তোমাদের জামাই, সে যদি তোমার মনিবের টাকা নিতে চায় তাহলে ঐ ফটকের বাইরে গিয়ে টাকা গোণো। আমার ছেলে যদি তোমার মনিবের টাকা স্পর্শ করে তা হলে আমি জানবো যে আমার পিণ্ড লোপ হয়েছে আমার ছেলে মরেছে।"

এতক্ষণে পরেশের মুখ একবারে শুকাইয়া গেল, সে ভাবিয়াছিল যে নগদ কোম্পানির সিক্ত হাজার একটাকা বোঝাইয়া সে মনিবের বৈবাহিক বৈবাহিকাকে বশ করিয়া ফেলিবে, মানুষ যে এক সঙ্গে তিনহাজার তিন টাকা ফিরাইয়া দিতে পারে ইহা তাহার ধারণার অতীত। ম্লানমুখে পরেশ চন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল, "তবে টাকাটার কি হবে?" হরসুন্দর বলিলেন ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হবে, তোমার মনিবকে বোলো যে আমি ছেলের বিয়ে

দিয়েছিলুম বটে ছেলে বিক্রি করিনি।" পরেশ আবার বলিল, "গিন্নিমা স্ত্রীলোক, অন্নদিদি ছেলে মানুষ, হুজুর আপনি এখন গিন্নিমার অভিভাবক আর অন্নদিদির বাপ মা। মেয়ে মানুষে যদি ভুল করে একটা অপরাধ করে থাকে তার দোষ ধরা কি আপনার মত বিচক্ষণ লোকের উচিত? হুজুর ধর্ম্মাবতার লঘু পাপে গুরুদণ্ড দেবেন না।" অনেকদিন ধরিয়া অভ্যাস করিয়া পরেশচন্দ্র চাটু বাক্যে সিদ্ধ হইয়াছিল, তাহার কথায় হরসুন্দরের মন ভিজিল তিনি বলিলেন "বহুরকার দিন বেয়ানঠাকরুণ যে আমাকে এত বড় অপমানটা ঘোরলেন এটা কি উচিত হয়েছে পরেশচন্দ্র?" বিশাল বপু ঘন-ঘন কাঁপাইয়া পরেশ বলিল, "কখনই না, নিশ্চয়ই না। হুজুর যা বলছেন সকলই ঠিক আমি গিন্নিমাকে ঢের বলিছিলুম কিন্তু হাজার হলেও মেয়ে মানুষের একহাত কাপড়ের কাছা নেই হুজুর। কি বলবো হুজুর আমি হাজার হলেও চাকর, মনিবের মুখের উপর কি ওকথা বলতে পারি?" হরসুন্দর কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন, "বিনু, তোমায় এখন নিমন্ত্রণ করতে গিয়ে কাজ নেই। দেখ পরেশ, টাকাটি ফিরে নিয়ে যাও, বেয়ান ঠাকরুণকে বোলো যে আমার বাড়ী যোয়ে মেয়ে ভুলে দিয়ে যেতে হবে তা নইলে তাঁর সঙ্গে আমার সম্পর্ক এই পর্য্যন্ত শেষ।"

পরেশ ভবসুন্দরীকে চিনিত; তিনি যে কন্যাকে শ্বশুরগৃহে পাঠাইবেন না তাহাও সে জানিত, সৌন্দর্য্য মদমত্তা সদ্যঃযৌবনোদ্ভিন্না অন্নদা যে কৃষ্ণকায় পতিকে গ্রহণ করিবে না তাহাও সে জানিত। গৌরবর্ণ বেল্লা পুত্র পূর্ব্ব সম্বন্ধেও সে অনেক কথা শুনিয়াছিল, সুতরাং সে বুঝিল যে এ গৃহে তাহার আর পদার্পণ করিতে হইবেনা। তখন সে সাহসে মন বাঁধিয়া হরসুন্দরকে বলিল, "হুজুর যখন অনুমতি কচ্ছেন তখন গিন্নিমাকে তাই কোত্তে হবে। তবে হুজুর বোল্বেনত মেয়ে মানুষেরও সাতহাত কাপড়ে কাছা নেই। টাকাটা এখন হুজুরের কাছারিতে আমানত জমা থাক, আমি ফিরে গিয়ে গিন্নিমাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে বলি, তারপর জামাই বাবু একদিন গিয়ে অন্নদিদিকে নিয়ে আসবেন।" হরসুন্দর হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "সেটি হচ্চেনা পরেশ বাবু, ওটাকা আমার সেরেস্তায় আমানত জমা হবে না—আর আমার ছেলেও তোমার মনিব বাড়ী যাবে না। আজ একাদশী এই দেবীপক্ষের মধ্যে যদি বৌমা এখানে এসে পৌঁছান তবেই ভাল তা নইলে আমার সঙ্গে তাঁর কোনই সম্পর্ক নেই। কিন্তু তুমি কি শ্বশুর বাড়ী যেতে চাও? বিনয় হাসিতে হাসিতে বলিল, "আজ্ঞে না, আপনি হুকুম করেছিলেন বলেই বিবাহ করেছিলুম তা নইলে যারা অত সুন্দর, যাদের সব সুন্দর তাদের ঘরে আমার মত কাল লোকের বিবাহ করা উচিত নয়।" পুত্রের উত্তর শুনিয়া হরসুন্দর সগর্ব্বে হাসিলেন।

সেই সময়ে একজন হরকরা একখানা তার আনিয়া বিনয়ের হাতে দিল, পল্লিগ্রামে তারে প্রায়ই সুসংবাদ আসেনা সুতরাং তার দেখিয়া বৈঠকখানা শুদ্ধ লোকের মুখ শুখাইয়া গেল। হরসুন্দর ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তারে কি লেখা আছে বিনু?" বিনয় পড়িল "Indu Disappeared come sharp. Nirmal" (ইন্দু নিরুদ্দিষ্টা, শীঘ্র এস, নির্ম্মল)। শুনিয়া হরসুন্দর বলিলেন "কি সর্ব্বনাশ! বিনু তুই এখনই চলে যা, নির্ম্মল বড় বিপদে না পড়লে তোকে তার করতো না।" বিনয় বলিল, "যে আজ্ঞে।"

সেইদিন অপরাহ্নে ঠানদিদিকে সমস্তটাকা বুঝাইয়া দিয়া এবং তাহার হস্তে মোহিনীকে সমর্পণ করিয়া বিনয় পরেশ চন্দ্রের সহিত ষ্টেশনে চলিয়া আসিল, পরেশ চন্দ্র সারাটা পথ অন্নদার গুণ কীর্ত্তন করিয়া কাটাইল কিন্তু বিনয় তাহার একটি কথারও উত্তর দিল না। ট্রেন আসিলে পরেশচন্দ্র উত্তরে ও বিনয় দক্ষিণে চলিয়া গেল। (ক্রমশঃ)

সংগ্রহ

(শ্রীমতী শোভা রুদ্র)

বায়োস্কোপে বড়লোক ঃ—বায়োস্কোপ দেখেননি, এমন লোক দুনিয়ায় বোধ হয় খুব কমই আছে, কিন্তু বায়োস্কোপের অভিনেতা বা অভিনেত্রীদের আয়ের কথা শোনেন নি এমন লোক যথেষ্ট দেখতে পাওয়া যায়। তাঁদের এক এক জনের আয় দেখলে হিংসে তো হয়-ই, তা-ছাড়া জানবারও একটা আগ্রহ আসে। অভিনেত্রীর মধ্যে প্রধান ও প্রথম নাম কোরতে হলে নাম কোরতে হয়—মেরী পিকফোর্ডের, দ্বিতীয়তঃ সিসিল-ডি-মাইলস। তার পরেই আমাদের সুপরিচিত বন্ধু চার্লি চাপলিনের নাম কোরতে হয়। ওগলাস ফেয়ারব্যাঙ্ক যদিও কম উপায় করেন না, তবে তাঁর প্রায় সমস্ত টাকাই খরচ হয়ে যায়—ফিল্ম তুলতে।

আফি কুগানের নাম অভিনেতাদের নামের তালিকায় দেখে-অনেকে বায়োস্কোপ কোম্পানীর কর্ত্তাকে বহরমপুর পাঠাবার বন্দোবস্ত কোরতেও কসুর করেন নি!—'আরে ছ্যা। ন বছরের খোকা, সে কখন অভিনয় কোরতে পারে? সব ফাঁকি'!.....কিন্তু কথাটা সম্পূর্ণ খাঁটী। বায়োস্কোপ করে সে এত টাকা উপায় করেছে, যে অত টাকা অনেক ষাট বছরের অভিনেতারাও উপায় কোরতে পারেন নি। কিন্তু তার খেয়াল—পৃথিবীতে যত রকমের মোটরকার আছে, একখানা করে কিন্‌তেই হবে। এঁদের মত টাকা জমাতে পারেন নি কেবল—মিঃ গ্রিফিথ। কিন্তু তা বলে এঁদের চেয়ে নীচু টনি কিছুতেই ন'ন। মিঃ গ্রিফিথের সম্পত্তির মধ্যে চোদ্দ একার জমীর ওপর একটা বাগান আর তিনটী পোষাক। ওগলাসের মত ফিল্ম তুলতে তুলতে—এঁর টাকা কড়িও পটল তুলে বসে!

চুল দেখে স্বভাব জানা ঃ—চুল দেখে লোকের স্বভাব জানা যায়—এ কথা শুনলে অনেকে—অন্ততঃপক্ষে আজিকালের-বস্তিবুড়ির', মত লোকেরা হাসেন বটে, কিন্তু আমেরিকার চার্লস কাসেল নামে একটী ভদ্রলোক তা সত্যি বলে পরীক্ষা করেছেন। তিনি বলেছেন—যে যারা প্রতিভাবান্ তাদের চুল কালো, মসৃণ আর কোঁকড়ান। যাদের খাড়া খাড়া চুল তারা ভারী ঠক আর বদমায়েস হয়। কোঁকড়ান চুল কবিত্বের পরিচয়ও দিয়ে থাকে। উদাহরণও তিনি যথেষ্ট দিয়ে গেছেন যথা,—Browning, Tennyson, Ibsen, Thomas moore প্রভৃতির চুল ছিল খুব কালো আর Keats, Konsey, Milton, Napolean প্রভৃতির চুল লালাভ ছিল। কোন বিদ্বান লোকের চুল কটা দেখা যায় নি। আমাদের দেশেও চুলের সঙ্গে চরিত্রের সাদৃশ্য আছে কি-না, কে জানে। তবে অনেক সময়ে সাদৃশ্যটা দেখা যায় না।

অদ্ভুত প্রথা ঃ—জাপানী বা 'নাক-টেপা'দের দেশে এত রকম প্রথা আর সব অদ্ভুত যে শুনলে—মাথা ঘুরে না গেলেও অবাক হতে হয়-ই। তাদের একটা অদ্ভুত প্রথার কথা আজ আমি বলব। সেখানে এক রকম পোকা পাওয়া যায়, যারা জলের স্বাদ বা স্পর্শ পেলেই গান গাইতে সুরু করে দেয়। বিশেষতঃ বৃষ্টি যখন পড়ে—সমস্ত স্থানটা একেবারে তাদের ডাকে মুখরিত হয়ে পড়ে। জাপানীরাও জিনিষটাকে বৃথা যেতে দেয় না, যখন দূরদেশ থেকে তাদের কোন আত্মীয় বন্ধু আসে, তারা তখন তাদের এই গান শুনিয়ে অভ্যর্থনা করে।' কিন্তু তখন যদি বৃষ্টি না পড়ে, পোকার গান হবেই না। জাপানীরা তার ব্যবস্থাও করেছে, আত্মীয় স্বজন এলেই তারা খাঁচার ওপর থেকে জল ঢালতে সুরু করে দেয়। অদ্ভুত দেশের প্রথাগুলোও ভারী অদ্ভুত অদ্ভুত!

বৃহত্তম দল ঃ—পৃথিবীর মধ্যে বড় বড় জিনিসগুলোর নাম সকলেরই জানা উচিত। যেমন পৃথিবীর মধ্যে ইংলণ্ডের ব্যাঙ্কই সব চেয়ে বড়। প্যারীর 'অপেরা হাউস' পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে বড় থিয়েটার। প্যারীর জাতীয় পাঠাগারটাও পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বড় পাঠাগার। এতে প্রায় ৩০০০০০০ পুস্তক আছে। পেট্রোগ্রাডে জগতের মধ্যে বড় প্রতিমূর্ত্তি আছে। সেটা Peter the Greatএর ওজনে প্রায় ১,১০০ টন হবে। পৃথিবীর মধ্যে

সবচেয়ে বড় কলেজ আছে Cairoতে। প্রায় ১০,০০০ ছাত্র আর ৪০০ শিক্ষক সেখানে বাস করেন।

ওলট কম্বল:—ওলট বম্বল এক প্রকার ভারতবর্ষীয় বৃক্ষ বিশেষ। এই বৃক্ষ ভারতবর্ষের সমুদয় পার্ব্বত্য প্রদেশে ও বঙ্গদেশে স্বাভাবিক অবস্থায় প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। ইদানীং উদ্যানের শোভা-বর্দ্ধনার্থ বঙ্গদেশের নানাস্থানে যত্নপূর্ব্বক রোপিত হইতেছে। ইহা আট হইতে ১২ ফিট পর্য্যন্ত উচ্চ হইতে দেখা যায়। ইহার পত্র স্থূল শতপত্রের ন্যায়, তবে তদপেক্ষা কিছু বড়। বৈশাখ মাস ইহার পুষ্পিত হইবার সময়। ফলগুলি বেশ সুদৃশ্য ও লালবর্ণ। তাহাতে ৪।৫টী পাবড়ী থাকে, ফলগুলি অর্জ্জুন ফলের ন্যায় শিরা বিশিষ্ট হয়। এই ফলের মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীজ থাকে। তাহা হইতেই চারা উৎপন্ন হয়। ইহার সমস্ত শিকড়, শিকড়ের ছাল, পত্রের ডাঁটা ঔষধার্থ ব্যবহৃত হয়। ইহার মোটা শাখা-গুলি কর্ত্তন করিয়া ফেলিলে তাহা হইতে সরু সরু শাখা নির্গত হয় ঐ শাখাগুলি কাটিয়া জলে পচাইয়া পাটের গাছ হইতে যে প্রণালীতে পাট প্রস্তুত করে, সেইরূপ করিলেই একপ্রকার চাকচিক্যশালী সূত্র পাওয়া যায়। ইহা কোমল ও বেশ শক্ত। ইহার ক্রিয়া—বেদনা ও আক্ষেপ নিবারক, রক্তঃ নিবারক, জরায়ু সংশোধক, মূত্রকারক, প্রমেহ, ও দাহ পিপাসা নিবারক এবং বলকারক। বাধক বেদনা রোগের ইহা এক অদ্বিতীয় মহৌষধ। এদেশের কেহ কেহ বাধক বেদনার স্বপ্রাস্ত দৈব মহৌষধ বলিয়া ইহার শিকড় কয়েকটী গোলমরিচের সহযোগে বাঁটিয়া ঋতুকালে খাইতে দেন, ইহার পত্রের শুষ্ক ডাঁটা কুটিয়া রাত্রিকালে জলে ভিজাইয়া রাখিয়া প্রাতে ছাঁকিয়া চিনির সহিত সেবন করিলে বিবিধ প্রকার মূত্ররোগ ও দাহ পিপাসাদির নিবারণ হয়। উক্ত প্রকার সিদ্ধ পানীয় গ্রীষ্মপ্রধান দেশবাসীর পক্ষে বিশেষ হিতকর। ওলট কম্বলের উপরি উক্ত গুণের বিষয় এদেশের অনেক ডাক্তার স্বীকার করিয়াছেন। ইহার সুস্ক শিকড়ের গুঁড়া ২০ গ্রেণ গোলমরিচের গুঁড়া ৫ গ্রেণ সহ মিশাইয়া প্রাতে একবার করিয়া ক্রমে তিন দিন সেবন করিতে হয়। ইহাতেই জরায়ুর সমস্ত দোষ দূর হইয়া গর্ভধারণে সক্ষম হয়।'স্বরাজ' শ্রীগুরুচরণ রক্ষিত।

রঙ্গালয়

(শ্রীনাট্যপ্রিয়)

'বৈশ্বানর "মিনার্ভা"কে আত্মসাৎ করিয়াছে, বেঙ্গলের ভিটামাটিতে ডাকঘর মৌরসী পাট্টা লইয়া বসিয়াছে। বীণা রঙ্গালয়ও এখন সুদূর অতীতের লুপ্তপ্রায় স্মৃতি হইয়াছে, 'কর্ণোয়ালিশে'র কর্ত্তাদের থিয়েটারের সখ মিটিয়া গিয়াছে এবং বিডনষ্ট্রীটে একলা বসিয়া মনোমোহন 'সেণ্টাল অ্যাভিনিউ'র হাওয়া খাইতে খাইতে কেবলমাত্র চর্ব্বিত চর্ব্বণেই খুসি হইয়া আছে। নূতন আবহাওয়াতে এবং বিনা প্রতিযোগিতার সুযোগে যা-কিছু যৌবনের লক্ষণ তা দেখিতে পাইতেছি শুধু 'ষ্টারে'র ভিতরে-বাহিরে! কাজেই বলিতে হয়, বাংলাদেশে রঙ্গালয়ের গতিক বড় সুবিধার নয়—যদিও এখানে নাট্য-রসিকের সংখ্যা অগুন্তি।

মনোমোহন ও ষ্টারের একঘেয়ে 'প্লাকার্ড' দেখিয়া দেখিয়া চোখ ক্রমেই শ্রান্ত হইয়া পড়িতেছিল, ইতিমধ্যে হঠাৎ এক খোসখবরে খুসি হইয়া উঠিয়াছি! নাট্য-জগতে অনেকদিন পরে যিনি নূতন রসের তিয়ান চড়াইয়াছিলেন, সেই শিশিরকুমার ভাদুড়ী এম-এ মহাশয় কলিকাতার প্রদর্শনীতে আগামী শনি ও রবিবার হইতে আবার অভিনয় সুরু করিবেন!

নূতন আয়োজনে শিশিরকুমার পুরাতন কাসুন্দি ঘাঁটেন নাই,—অভিনীত হইবে নূতন নাটকই,—স্বর্গীয় কবি-নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলালের "সীতা"! যখন কোন প্রকাশ্য রঙ্গালয়ে অভিনীত হয় নাই, তখন "সীতা"কে নূতন নাটক বলিলে সত্যের অপলাপ করা হইবে না। শিশিরকুমার নিজে রামের ভূমিকায় অবতীর্ণ হইবেন। অন্যান্য বিভিন্ন ভূমিকা গ্রহণ করিবেন শ্রীযুক্ত নির্ম্মলেন্দু

লাহিড়ী, শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ ভাদুড়ী, শ্রীযুক্ত শশিভূষণ লাহিড়ী (ওল্ড ষ্টাবের) ও শ্রীযুক্ত রবীন্দ্র রায় প্রভৃতি সুপরিচিত অভিনেতাগণ। এই সঙ্গে আরো কয়েকজন নবীন ও নিপুণ অভিনেতা "সীতা"র অভিনয়ে প্রকাশ্য রঙ্গালয়ে প্রথম সাক্ষাৎ দিবেন। অভিনেত্রীরাও অপরিচিত নন, নানা ভূমিকায় তাঁহারাও এর আগেই প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিয়াছেন।

দ্বিজেন্দ্রলালের "রাম" পৌরাণিক চরিত্র হইলেও পুরাণ নির্দ্দিষ্ট ধরা-বাঁধা ছাঁচে গড়া নয়। রাম যে মানুষ ছিলেন, দ্বিজেন্দ্রলাল এ সত্য একবারও ভুলেন নাই—মানুষ রামকে তিনি রাজনৈতিক, প্রেমিক ও প্রজারঞ্জক রাজার মূর্ত্তিতে দেখিয়াছেন এবং তাঁহার চরিত্রে রক্তমাংসের সবলতা ও দুর্ব্বলতা দুইই ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। শিশিরকুমারের অপূর্ব্ব প্রতিভার রামের এই উপভোগ্য মানবতা আরো কতটা চমৎকাররূপে বিকসিত হইয়াছে, "সীতা"র 'রিহার্সালে' গিয়া আমরা তাহা দেখিয়া আসিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছি। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, শিশিরকুমার ছাড়া এখনকার আর কোন অভিনেতা দ্বিজেন্দ্রলালের অঙ্কিত "রাম" চরিত্রে এমন নূতন ভাবের লীলা দেখাইতে পারিবেন না। নিত্য-বৃত্তের অনুকরণেই অভিনয়-কলার জন্ম হইলেও শ্রেষ্ঠ নট কখনো অনুকারী নন,—তাঁহারা নূতন সত্যের স্রষ্টা ও নূতন সৌন্দর্য্যের দ্রষ্টা! 'রিহার্সালে' শত অপূর্ণতার মধ্যেও শিশিরকুমারের আংশিক অভিনয়ে শ্রেষ্ঠ নটের এই বিশিষ্ট লক্ষণ বার বার আমাদের চক্ষে পড়িয়াছে। না-জানি রঙ্গালয়ের সম্পূর্ণ অভিনয়ে রামের ভূমিকা আরো কতটা উপভোগ্য হইয়া উঠিবে। "সীতা" নাটকখানি আমরা আগেই পড়িয়াছিলাম। কিন্তু শিশির-কুমারের অভিনয় দেখিবার আগে আমরা জানিতাম না যে, এর মধ্যে এত বৈচিত্র্য, এত সৌন্দর্য্য, ও এত কবিত্ব প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে! পাঠকদের কাহারও যদি সন্দেহ হয় যে, আমরা অত্যুক্তি করিতেছি, তবে প্রদর্শনীতে একদিন মাত্র গিয়া চক্ষুকর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করিয়া আসিবেন! দেখিবেন, এর চেয়ে নিখুঁৎ ভাবে আর কোন নাটক বাংলা দেশে অভিনীত হইয়াছে কি না! দেখিবেন, ভাব-ভঙ্গি আবৃত্তি ক্ষমতায় নব্য অভিনেতাদের মধ্যে শিশিরকুমার সত্যই অদ্বিতীয় কিনা! দেখিবেন, দ্বিজেন্দ্রলালের লিখিত নাটক শিশিরকুমারের অভিনয়গুণে বাস্তবিকই অধিকতর ভাবাভিরাম হইয়া উঠিয়াছে কিনা!—আমরা খাঁটি কথাই বলিতেছি, কারণ অত্যুক্তি আমাদের ব্যবসায় নয়!

প্রদর্শনীর রঙ্গমঞ্চ নির্ম্মাণের ও সাজপোষাকের পরিকল্পনার ভার লইয়াছেন খ্যাতনামা চিত্রকর শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র রায় বি-এস-সি ও ঊর্ণীয়মান আর্টিষ্ট শ্রীযুক্ত রমেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। শুনিলাম, রঙ্গমঞ্চ ও সাজপোষাকেও কালোপোযোগী বিশেষত্ব ও নূতনত্বের সৌন্দর্য্য থাকিবে—অস্থায়ী রঙ্গমঞ্চে যা থাকে না।

বলা বাহুল্য, শিশিরকুমারের এই আবির্ভাব মাত্র কয়েক দিনের জন্য। তিনি বাংলা নাট্য-জগতে নব-যুগের সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বপ্রধান অগ্রদূতরূপে যশস্বী হইলেও, আপাততঃ কোন প্রকাশ্য রঙ্গালয়ের সঙ্গে তাঁহার সম্পর্ক নাই, নাট্যরসিকদের পক্ষে এটা একটা মস্ত দুর্ভাগ্যের কথা! তাঁহার অভিনয়-পদ্ধতির অনুকারী অনেক নট আজকাল দস্তুরমত আসর জমাইয়া তুলিয়াছে, অথচ তিনি কিন্তু যবনিকার অন্তরালে, এ দুঃখ আমরা ভুলিতে পারিতেছি না! খদ্যোতের দীপ্তি সূর্য্যের বিশ্রাম-কালে, কিন্তু সে দীপ্তিতে কি সূর্য্যের অভাব মিটিতে পারে?

নানা-কথা

(শ্রীযতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়)

বর্ণ-বৈষম্য ঃ—অনেকের মনে ধারণা আছে যে শাদা ও কালোর পার্থক্য ক্রমশঃ তিরোহিত হইতেছে—এবং শীঘ্রই ইহার সন্তোষজনক অবসান হইবে। কিন্তু কার্য্যে দের হত্যাকারিণী তাঁহার বিলাসিনী কন্যাসিনী শ্রীর বিচার সময়ে বৃটিশ বিচারক, জুরী ও সংবাদপত্রে বৃটিশ মনোভাবের প্রচুর নমুনা পাওয়া গিয়াছে এবং বৃটিশ

আদর্শ যে কি পদার্থ তাহা জগতের চক্ষে উজ্জ্বলরূপে প্রতিভাত হইয়াছে। ন্যায় বিচার সম্বন্ধে বৃটেনের অধিবাসীগণের যে কোন একটা সুস্বধারা অপক্ষপাতিত্ব আছে বলিয়া যাঁহারা এখনও বিশ্বাস করেন তাঁহাদের সতর্ক হওয়া আবশ্যক। প্রবলের নিকট দুর্ব্বলের ন্যায় বিচারের আশা—অসার, অসম্ভব। বিলাতের সাপ্তাহিক একসপ্রেস পত্রে এচ্, ডি, ষটন নামক লেখক এ সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধের বলিয়াছেন "প্রাচ্যের সহর ও অধিবাসীগণ প্রতীচ্যকে নকল করিতে পারে কিন্তু তার অন্তরতলে প্রাচ্যের সেই অকথনীয়, অবর্ণনীয় প্রাচ্যই গুপ্ত থাকে। যাঁহারা হাইকোর্ট পরে নেকটাই ঝুলিয়ে ভাবেন "সাহেব হয়েছি" তাঁদের এ শুনে কি চৈতন্য হবে।

বাবু ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের খার্ত্তস্বরে ইউরোপীয়ান কামরার ভ্রমণ ও তজ্জনিত অর্থদণ্ড যাহা হাইকোর্ট পর্য্যন্ত গড়াইয়াছিল সেটা এখনও বোধহয় পাঠকবর্গের স্মৃতি হইতে মুছিয়া যায় নাই—অধুনা শুনিতেছি বেঙ্গল নাগপুর রেলের কর্ত্তৃপক্ষগণ নিয়ম করিয়াছেন যে ভারতবাসীগণ ইউরোপীয়ের মত পরিষ্কার থাকিলে তৃতীয় শ্রেণীর ইউরোপীয়ান কামরায় সিংহচর্ম্মাবৃত গর্দ্দভের ন্যায় সম্মুখে বিচরণ করিতে পারিবেন। এ সংবাদে হাটকোটধারীগণ নিশ্চয়ই পুলকিত ও রোমাঞ্চিত হইবেন।

শ্বাসীন্ন সম্মান:—কামীরে'র মামলার সম্বন্ধে উহকলী ডেসপ্যাচ নামক সংবাদপত্রে লিখিত হইয়াছিল, আমাদের দেশে নারীর স্থান অনেক উপরে কিন্তু ইজিপ্টে অন্তরূপ ……স্ত্রী-পুরুষের অবস্থার পার্থক্যেই প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের বৈষম্য সুপরিস্ফুট।"

সম্প্রতি বিলাতে নূতন নির্ব্বাচনের যে সকল সংবাদ আমরা পাইতেছি তন্মধ্যে একটী ঘটনা নিম্নে লিখিত হইল:—গ্লাসগোর সেন্টরোলস নামক স্থানে ইউনিয়নিষ্ট দলভুক্তা কুমারী ভাসলেট রবার্টসন একটী জনসঙ্ঘে বক্তৃতা দিতেছিলেন এই সময় পুনঃ পুনঃ তাঁহার গাত্রে নিষ্ঠিবণ নিক্ষেপ করা হয় ও তাঁহাকে পদাঘাত করা হইয়াছিল। তিনি অস্ত্র সন্ন্যাসারি এবং আঘাত ও মনোকষ্ট জনিত দুঃখে কাতরা।"

নারী মর্য্যাদার উজ্জ্বল নমুনা দেখিলেন তো। নারী জাতির উপর এইরূপ আরও অনেক লজ্জা ও শিষ্টাচার প্রদর্শনের ঘটনা সম্প্রতি সংঘটিত হইয়াছে। নারী স্বাধীনতাকামী ও কামিনীগণ যাঁহারা সদা গুরুমহাশয়ের পাঠশালে এই শিক্ষালাভের জন্য বড়ই ব্যাকুল তাঁহারা কি বলিতে চাহেন! কিন্তু ইহার চেয়ে অতি সামান্য অভদ্রতা যদি প্রাচ্যের লোকে করিত তাহা হইলে শ্বেতবর্ণ শিষ্টগণ তাহাদের কি করিতে অনুমান করতে পারেন?

কোন অসভ্য বর্ব্বরেও সাধারণ সমক্ষে নারীর প্রতি এত হেয় ব্যবহার করিতে লজ্জাবোধ করে—আবার এঁরাই আমাদের সভ্যতা শিখাইতে আসিতে সঙ্কুচিত হন না।

দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতবাসী—দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতবাসীদিগের হীনাবস্থার প্রতিবিধানে অসমর্থ হইয়া ভারতে দক্ষিণ আফ্রিকাবাসীগণকে ব্যবসা বাণিজ্যের সুযোগ দেওয়া বন্ধ করিবার জন্য সার ভেঙ্ক যাহাদুর সাম্প্রতি যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন তাহা শুনিয়া ঐ দেশের শ্বেতাঙ্গ চালিত পত্র বলিতেছেন "হা—হা—কর কি এমন কাজও করে এখনও এখানে আমাদের মধ্যে অনেক ভারত হিতৈষী আছেন—তাঁহারা এ কথা শুনিলে—বিষম চটিয়া যাইবেন ফলে ভারতবাসীর পক্ষে কোনও কালে কোন সুবিধা পাওয়া তো অসম্ভব হইবেই অধিকন্তু উপস্থিত তাহাতে ভীষণ অমঙ্গল সাধিত হইবে।

আহা কি ধরণ—যেন পুতনা মাসী!

নারীর অধিকার:—মহীশূরের মহারাজ তৎরাজ্য বাসিনী মহিলাগণকে ভোটাধিকার দান করিয়াছেন। ভোট সম্বন্ধে মহীশূরে স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ের অধিকার সমতুল্য বলিয়া বিঘোষিত হইয়াছে।

যন্ত্রণা বিহীন প্রসব—প্রসব যন্ত্রণার ভয়ে বিলাসিনী ফরাসি সমাজে 'গর্ভরোধ' প্রথা প্রচলিত ছিল—অধুনা বিখ্যাত মেটারলিঙ্ক সার্জ্জন প্রফেসার ফ্রেনটানো প্রসব করাইবার একটী যন্ত্রণাহীন উপায় আবিষ্কার করিয়াছেন। এই প্রক্রিয়ার দ্বারা গর্ভিণীকে একেবারে অজ্ঞান করিতে হয় না—অথচ তিনি প্রসবের সময় কোন কষ্ট অনুভব করেন না এমন কি পরেও দৌর্ব্বল্য, অবসাদ

প্রভৃতিতে কাতর হয়েন না। ফলে ফ্রান্সে সমস্ত প্রসব হাসপাতালে অতঃপর এই প্রক্রিয়ায় প্রসব করান হইবে। ফ্রান্সের জনসংখ্যা স্বভাবতঃই অল্প তদুপরি বিগত যুদ্ধে অনেক লোকক্ষয় হওয়াতে পুরুষের সংখ্যা অনেক হ্রাস হইয়া গিয়াছে অতঃপর নারীগণের মন হইতে প্রসব যন্ত্রণার ভয় দূরীভূত না করিলে ফ্রান্সের শক্তি হীন হইয়া পড়িবে। 'গর্ভরোধ'র জন্য আমাদের দেশের যে তথা কথিত বিজ্ঞান কথিত প্রচারিত হইতেছে তাঁহার প্রকাশক ও সম্পাদকের ইহা জানিয়া আতঙ্ক হইবে না তো?

আমেরিকান দৃষ্টিতে ভারতবাসী :—সুপ্রসিদ্ধ রাজনৈতিক পণ্ডিত ও সুলেখক মিঃ লাজপৎরায় সিংএর ভারতবর্ষ সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধ নিউইয়র্কহেরাল্ডে প্রকাশিত হইয়াছিল উহা আলোচনা কালীন মিঃ আর্থার ব্রিসবেন নামক সংবাদপত্র লেখক ওয়াশিংটন হেরাল্ডে লিখিয়াছেন —"আজকালকার দিনে সুবিচার সেই পায় যে জোর করিয়া উহা আদায় করিয়া লইতে পারে। ভারতবর্ষের গলদ তাহার ভিতরেই আছে নতুবা ১০০,০০০ ইংরাজ কখন ৩০০০০০০০ ভারতবাসীকে শাসন করিতে পারিত না। অর্থাৎ ১ জন ইংরাজ ৩০০০ ভারতবাসীকে শাসনে রাখে। বিগত ৩ হাজার বৎসর মধ্যে ভারতে লক্ষ লক্ষ পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু তাহাতে 'স্বাধীনতা'র উল্লেখ নাই।"

কথাগুলি আংশিক সত্য হইলেও সম্পূর্ণ মানিয়া লওয়া যায়না সম্ভবতঃ মিঃ ব্রিসবেন ভারতবর্ষীয় ভাষাদির সম্বন্ধে ততদূর অভিজ্ঞ নহেন রঙ্গলাল, হেমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথ, গোবিন্দচন্দ্র দাস, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রভৃতির রচিত সঙ্গীতে ও কাব্যের অনেকস্থলে যে স্বাধীনতার প্রচণ্ড আকাঙ্ক্ষা ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহা বাঙ্গালী মাত্রেই জানেন। তবে স্বাধীন দেশের লোকেরা আমাদের উপর বিরূপ কটাক্ষ করেন যে আমরা নিরস্ত্র ও আমরা অহিংস আন্দোলন করি।

মাসিক-সাহিত্য সমালোচনা

বঙ্গবাণী—কার্ত্তিক, ১৩৩০। অনেক দিন পরে বুড়া রবীন্দ্রনাথের ভাঙ্গা গলার সাধের ভজনের আওয়াজ শোনা গেল, বয়স গেছে আর সঙ্গতভাবে কবির ভাষার সঙ্গে যে অনুপ্রাসের অভাবটা দেখা দিয়েছিল সেটা হয় তো "অধিকার" বজায় ফিরে এসেছে।

"• • • • • • কবি,
সে ভরসা কি তুমি রাখ মনে, যেথা অস্তরবী রবি
সন্ধ্যাবেশে মগ্ন যেথা শব্দহীন কর্ম্ম-সভায়,
যেথা তার সর্ব্বশেষ রশ্মিটির রঙ্গিম প্রভায়
সাজায় অন্তিম অর্ঘ্য ; যেথায় নিঃশব্দ রেণুপুরে
সঙ্গীত স্তম্ভিত থাকে হৃদয়ের বিস্তৃত অন্তরে ?"

এ কবি "আকাশী" আর "সুপ্তির পাথার" এর। বাঙ্গালী অনেক দিন কবির এ আওয়াজ শোনে নি এবং যে বাঙ্গালোরায় পড়তে পারে সেই অল্পশিক্ষিতকে ভগবানকে ডেকে বলবে, কবির ভাষা যেন পূর্ব হতে বিদায় হয়।

"আমি তব সাথী—
যে বেদনা, শরৎ-নিশির, করুণ, নিশির-সিক্তিত
এলায়িত বিস্তৃত কেশের। মোর মুষ্টিমধ্যে
অসমাপ্ত সঙ্গীতের তালি বাঁধি দেব অকস্মাৎ
সমাপিব নির্ব্বাকের বাণীর নির্ব্বাণ-মোহনায়।"

বঙ্গবাণীর মুখপত্রের রবিবর্ম্মি "শিবের অন্নপিণ্ড।" পাথরের উপর যে লোকটি ঘুমে আছে সে বোধ হয় শিব কিন্তু শিল্পী শ্রীকিতীন্দ্র নাথ মজুমদার বিতীয় মূর্ত্তিটির নির্দ্দেশের উপায় রাখেন নি। যাঁরা হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর ভাষে 'মুখার সম্ভব' পড়েন নি, তাঁরা ছবির ভিতর সহজে খুঁজতে পারবেন না। এ সংখ্যায় কাব্যরথানি ফরাসী ভাষা। প্রথমেই শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি ফরাসী গল্পের অনুবাদ। গল্পটি সুন্দর। মুদুলিকা বালিকা বয়সে ফরাসী বালিকা কেমন করে আত্মহত্যার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেছিল এবং সেই সঙ্গে তার অপরিণামদর্শী বাপ-মায়ের সারাজীবনব্যাপী প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ হয়েছিল, ফরাসী কবি তাঁর মূর্ত্তিগুলি তাই দেখিয়েছেন। এইরূপ অনুবাদেই ভাষার উন্নতি হয়, আমাদের দেশে বালিকা আর সাপ্তাহিকে এখন যে শ্রেণীর অনীর্ঘর উপায় adaptation আমরা চলে তা বন্ধ করে যে সব লেখক ফরাসী বা অন্য বিদেশী ভাষা থেকে সাদাসাদি তর্জ্জমা করতে পারেন তাঁদের লেখাই ছাপা উচিত। লেখাটিতে ঠাকুরবাড়ীর বিদেশ অনেক উপসর্গ রক্তকণিকা আছে কিন্তু জ্যোতিরিন্দ্রনাথের আর যদি বাই থাকুক

বাঙ্গালী পাঠককে লক্ষ্য করে চলতে হবে। শ্রীযুক্তা সুধাময়ী দেবী গ্রন্থখানি তাঁহার "শেষ গমন" নাম দিয়ে যে গল্পটি লিখেছেন সেটি উপন্যাসের হিসেবে তেমন সুন্দর হয় নি। গল্পের Refrainটি তাহে সুন্দর হলেও তাহার গঠনের জন্য সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয় নি।

"সখি। ভালবাসার জন্ম যায়,
আর পরিচয় নয় আলাপের মধ্য দিয়ে
নয়ন ভঙ্গী মাত্রায়।"

শ্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের "বন্ধে পাখী" গল্পটি "দুইজনের গল্প লেখক পেয় ফরাসীতে লিখিত একটি গল্প অবলম্বনে"। এটি এবারকার adaptation জাতের গল্প, তুর্কি পাঠকে যা বোঝেন, কোন রাজপাখী তাহারবর্ষে ইহলে ঘুরাতে, পাখে যা হবে Game Law ছিল না একথা এবারকার শ্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় জানেন কিনা বলতে পারিনে কিন্তু Game Laws অভাবে গল্পটার adpatation সম্পূর্ণ unnatural হয়েছে। তাহাও অবশ্য রামশিঙা হয়ে উঠেছে, যখন— শিকারীরা শিকার ফেলার ফুলঝরা ফুঁ ছাড়িয়া দিল। এর মানে কি তা বুঝা কঠিন, আমাদের দেশ থেকে হয় পর্যন্ত উপলেট বাজিয়ে বাঘের শিকার হত বা এর এরকম হয় না। মোটের উপর গল্পটি ভাল হোয়েছে, adaptation জাতীয় গল্প এরকম কমই ফোটে না। শ্রীযুক্ত যাদের "যাদের মরণ" কবিতাটি লঘু হৃদয়ের রচনা, লেখক যখন কবি তখন আবোলতাবোল বকতে বলতে পারেন, তার কোন উপায় নেই, কিন্তু এই অবসরে প্রকাশকে প্রকাশক বাক্য বলে ধরে নেওয়া বড়ই শক্ত। শ্রীযুক্তি দেবীর "বিদেশের ফুল" গল্পটির আরম্ভ ভাল, শেষটা একেবারেই লেখা হয় নি, লেখিবার ভাব আছে, ভাষা আছে, কেবল লেখার ঘোরে গল্পটা জমে নি। শ্রীবিমল দেবীর "পরদের প্রথম দিনের খাপছাড়া। আরম্ভ—

"আজ বিদীথে পুরাণ ঘরে
জ্বাললে যিনি সন্ধ্যা দীপ
সন্ধ্যাতারার ললাট হতে
মুছিয়ে নিয়ে সোণার টিপ !"

বড়ই আশাপ্রদ কিন্তু শেষটা একেবারে বিতিকিচ্ছি হয়ে "উদুম্বর পোকে ধরা কাতর"—

"বয়স বিনে জল ধরে না
কমল মুকুর শতদল ভাসে,
যদে আছে বৈরাগী বক
বৎসে নিত্য আসার আশে।"

শ্রীবারিক ভট্টাচার্য্যের "বেতাল ও জীবিত" গল্পটি একটি সুন্দর গল্পের আরম্ভমাত্র। পুত্রের বিরহকাতরে ভরে ভবানীধন রায় বেতাল্যাস করে গেলেন, তারপরে গল্পটা একেবারে গৌণাবিক হয়ে উঠল। ভবানীধন যে ভরে করে সন্ন্যাসী সাজে তাঁর স্ত্রী বিদ্যাবাসিনীকে নিয়ে যত গোঁ মেরে উঠিয়ে নিয়ে ফেলেন তাতে ঐক ভূমার Deus ex Machina কথা মনে পড়ে। গল্পটি একেবারেই ফোটেনি এবং ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের মত শক্তিশালী লেখকের লেখা হয়নি। শ্রীরমণীকান্ত ঘোষের "অভিসারিকা" নামে অপ্রকাশিত গল্পটি মন্দ হয়নি। "উপলতা" নামক বিমাতা গল্পটি একেবারে পারাড়, এটি যোগেশ অন্ধকবি বিমলচন্দ্র মজুমদারের লেখা, কারণ ছাত্র ও ব্যাধাদুরী পেয়ে শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র সেন অধীর হোয়ে ঘুমিয়েছেন। তাঁর গল্পটির ভাষার কথা বলব ইচ্ছা হয় না। এ সংখ্যার কবিতার মধ্যে "শাহ" নামক যেমনা কবিতাটি ছাপার অযোগ্য। বিদেশে মানুষ কতদূর আত্মবিস্মৃত হয়, লব্ধপ্রতিষ্ঠ ঔপন্যাসিক শ্রীপ্রভাত মুখার মুখোপাধ্যায় "ঔপন্যাসিক" নামে তার পরিচয় দিয়েছেন। এই গল্পের লেখোক্তিগুলি প্রভাত বা কেউ বড়ই বেশী স্পষ্ট হয়েছে কিন্তু সেই জন্যই ঔকে ক্ষমা করে এই পত্রিকের ছোঁড়া হয়েছে তিনি কিছুমাত্র ধৈর্য্য বা অপমান বোধ করবেন না। বঙ্গবাণীর ছোড়া সম্পাদক গল্পটি না ছাপিলেই ভাল করেন। "পাঞ্জেরী" সঙ্গীত", শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায়ের প্রবন্ধ। এ সংখ্যায় একটিমাত্র প্রবন্ধ স্থান হয়েছে। বাঙ্গালী এই পারস্যের সঙ্গীতের সুর রামপ্রসাদ হইতে আরম্ভ হইয়া রাধাকৃষ্ণ ও ব্রজরসের পর্যায় পুরাযমে পৌঁছিয়াছিল কিন্তু তারপর হইতেই উহার সুর বিগড়াইয়াছে। তারপর হইতেই বাঙ্গালী কবি টপ্পের আমদানী, সুরোপ্পা কিন্তু, প্রথম প্রভাত পাশ্চাত্য গন্ধ হইতে মাসের অপব্যয় সমাচার ও বিসর্জনের বার্ত্তা লইয়া কবিতা, তাহাই প্রথমেরকে প্রকাশ করিয়া আসিতেছেন। কেন এমন হইল? বাঙ্গালার সে খাঁটি সুর বাঙ্গালী ভুলিল কেন? এ সম্বন্ধে যে ভোগৎ-তত্ত্ব ও ব্রাহ্ম সমাজের সাম্পর্কে আসিয়াই বাঙ্গালী সে সুর ভুলিতে আরম্ভ করিয়াছিল।" লেখক কিন্তু বাঙ্গালীর সুর জ্ঞান পরিবর্ত্তনের আসল কারণটা বলেন নি, তিন বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালী আমাদের গীত বাদ্যির আধমরা সুরে কেউ উঠে আর এখন তাও তাও না, বাস্তবিক যাঁকিতে গিয়ে দেখে অঙ্গলৌকিকী Suggestive হয়েছে কিনা এর প্রকৃত কারণ লেখক জানেন অথচ খুলে বলেন নি। এর প্রকৃত কারণ বাঙ্গালী সাহিত্যিকের সর্ব্বনাশ পরিত্যাগ করে আধি হয়ে যায়, আর অপরিণামদর্শী পাঠকপাঠিকার সর্ব্বনাশ বিবর্দ্ধিত হয়ে মনস্তত্ত্ব (ফরাসী মেদীর) অনুশীলন। অধ্যাপক শ্রীযুক্তেন্দ্রনাথ মিত্র এখন আর "নীলাম্বরী" মত গল্প লেখেন না, ঔর "অন্ধের তাল" গল্পটি এবারকার ছবি অনুসারে আধি রসের মনস্তত্ত্ব বিষয়ক, সেটি কিন্তু মিত্র মহাশয় ঠিক ধরতে পারেন নি। লেখাবে চুম্বনের সময়ে পরস্পরের বয়সে ঘরটা এসে যায়েছে। গল্পটি একটি ছাঁকা বিলেতী গল্প ভাবে মনে হয়। শ্রীযুক্তা সুধাময়ী বসুর "প্রতিবেশ" কবিতাটি ভাল, অর্থাৎ— সেকেলে, কারণ এ ভাব বুঝতে পারা যায়, মনস্তত্ত্বের অলিলায় লেখিকা মনের অজ্ঞাত কতগুলি পথ আবিষ্কার করেন নি অথচ সাদা সোজা কথায় মনের গভীর ভাব ব্যক্ত করেছেন। শ্রীপ্রথম চৌধুরীর "সম্পাদক ও লেখক" গল্পটি অতি উপাদেয়, এতে গালাগাল আর ঠেঁয়ো আছে বটে কিন্তু মনের খুঁটিয়ে তা মন্দ কথা বলা যায়। অবতারণী লেখক ঐতিহাসিক উপন্যাস থেকে আরম্ভ করে আধুনিক বিলিতী জাতীয় অধিকাংশ adaptation গুলিকে চাবুক দিয়েছেন। শ্রীমণীন্দ্রলাল বসুর "অভিথি" একটি প্রকাণ্ড গল্প, এই গল্পটি ছোট গল্পের আকারে না লিখে বড় উপন্যাসে পরিণত করাই উচিত ছিল। লেখকের লেখার আধুনিক আট নেই, কারণ মাঝে বাড়ী ছেড়ে গেল কিন্তু "ওরপী ধরণা পার হইল না, ধরণা ধরণ করিল না, চৌকাঠের উপর মুখ গুঁজিয়া লুটাইয়া পড়িল। "শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের "দু আইনী" গল্পটি একেবারে লেখেনে। গরীব গাত ধোঁয়ের মৈয়ে মেধুর বিয়ে হয়েছিল কলকাতার বড় লোকের বাড়ী। শ্বশুর-বাড়ীর আদর যত্নে মেয়েটি

বরবর হয়ে পালিয়ে এল কিনা বাপের সঙ্গে? এমন গল্পও বসবার সম্পাদকদের ছাপা উচিত হয় নি। সৌম্যেন্দ্রবাবু কি কলকাতার প্রবীণার রাজ্যের অভিযেক দেখেছেন? এমন পাড়া কি কলকাতার আছে যেখানে পাশের অন্ধকারে বুড়ো বাপের সঙ্গে যণ্ডাদের ভিড়ে দাঁড়তে হয়। "তৃপ্তি" নামক কবিতাটি দু লাইনের হলেও ভদ্র নয়। লক্ষ্মণ ভট্টাচার্য্য শ্রীবসিকচন্দ্র পালের "পাগলা", মরজগতের নয়। একজন Somnumbulist ঘুমের ঘোরে বৈষ্ণবীকে বলাৎকার করলে, এই বৈষ্ণবীটি বয় বছর বয়সে বিধবা হয়েছিল সুতরাং অন্তত যৌনি অন্তত বলাৎকারের সময় তিনি টের পেলেন না এবং তাঁর সাহায্য ব্যতিরেকে ক্রিয়াটি সুসম্পন্ন হয়ে গেল—এই এত বড় অসম্ভব বিভিন্নটী লিখিবার আগে পালবপাইও একজন ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করলেই পারতেন। আমি ধরে নিচ্ছি যে পরিচয় Hymen-এর ঝুল্লরার কথাটা পালবপাই জানেন না এবং তিনি Rape case-এ ধাত্রীর সাক্ষ্যপ্রার্থী হোলেন কি। গল্পটা আধুনিক সাহিত্যে পাঠকপাঠিকাকে উপহার—এটা গল্প নামের অযোগ্য, লেখক যা লিখেছেন তা সম্ভবই অসম্ভব। পরবর্তী দল তিনি কিছু পেয়েছেন বটে কিন্তু তথা সাহিত্যের আকারে ব্যক্ত করবার ক্ষমতা তাঁর নেই। "নদী" শ্রীঅনুরূপা দেবীর এবং "দেবত্র"—শ্রীনিরুপমা দেবীর ক্রমশঃ প্রকাশ্য উপন্যাস।

কার্ত্তিকের বসবাঙ্কে, সম্পাদক মূল বোধহয় গল্পের সংখ্যা কমাতে চেষ্টা পেয়েছিলেন কিন্তু গল্পগুলি কার্ত্তিকের "ভারতবর্ষে" তুলনায় নিকৃষ্ট। এদের প্রভাবে এই সংখ্যার বসবাণী আশ্বিনের সংখ্যার মত সুন্দর হয় নি।

দেশ-বিদেশ

এ সপ্তাহে সমালোচনার জন্য আমরা গ্রন্থকার ও প্রকাশকের অনেক পুস্তক পাইয়াছি। ক্রমে সেই সব পুস্তকের সমালোচনা বাসন্তীতে বাহির হইবে।

— — —

বাসন্তীর বর পূজার বিশেষ সংখ্যা একখানিও নাই। এ সম্বন্ধে আমরা পূর্ব্বেই জানাইয়াছি। তবু সহর মফঃস্বলের অনেকেই আমাদের পূজার সংখ্যা পাঠাইবার অনুরোধ করিতেছেন। তাঁহাদের অবগতির জন্য আবারও সেই পূজা সংখ্যা আর পাইবার উপায় নাই।

বাসন্তীর আগামী সংখ্যাও পূজা সংখ্যার মতই বিশেষ ভাবে হইবে, তেমনি ছবি, গল্প থাকিবে। যিনি এই বিশেষ সংখ্যা চাহেন এখন হইতেই যেন ।/১০ আনা পঁচ আনার ষ্টাম্প পাঠাইয়া দেন।

মাইকেল লাইব্রেরী, বিলিয়নপুর :—আগামী ১০ই ফেব্রুয়ারী ১৯২৩ অভিনাট মধুসূদনের স্মরণার্থ উক্ত পাঠাগারের উদ্যোগে সমর ধারিক "মধু-মিলন" উৎসব অনুষ্ঠিত হইবে। তদুপলক্ষে বিষয়ভিত্তিক বিষয়ে শ্রেষ্ঠ কবিতা লেখককে একটি রৌপ্য পদক প্রদত্ত হইবে। বিষয়—"মধু-স্মৃতি"। কবিতা ২০০ ছত্রের অনধিক হওয়া আবশ্যক এবং আগামী ১০ই জানুয়ারীর মধ্যে উক্ত লাইব্রেরীর সম্পাদকের নিকট প্রেরিতব্য।

আমরা 'সচিত্র লিপির' প্রথম চারি সংখ্যা পাইয়াছি। এই সাপ্তাহিক পত্রখানি কলেজস্ট্রীট মার্কেট লিপির পাবলিশিং হাউস হইতে শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ অধিকারী কর্তৃক সম্পাদিত হইয়া বাহির হইতেছে। ইহার মূল্য ও গল্প চিত্রগুলি উপভোগ্য, বার্ষিক মূল্য ৬৲।

বিকাশ

[শ্রীচণ্ডীচরণ মিত্র]

লহরীর পরে লহরী আসিছে
নাচিছে সাগর তালে তালে,
কুসুমের পাশে কুসুম হাসিছে
দুলে দুলে শোভা ভালে ভালে।
বহিতেছে ধীরে সমীর মন্দ
সারিকা-মুখের সুখের ছন্দ,
আসে একে একে এ কি আনন্দ,—
অনুরাগ ভরা চালে চালে।

নভ ঘিরি' ওড়ে নভোরেণুগুলি
কভু নামে বারি ঝরঝরে কভু,
ঠমকে ঠমকে উথলে বিজুলি
সুষমার নাই সীমা যে তবু।
নিখিলের এই বিকাশ-ধারায়
আসে পর পর কিছু না হারায়,
জ্বলে দীপমালা তারায় তারায়,—
নিয়মে যে বাঁধা কালে কালে।

Printed by Bijoy Krishna Dass at the Lakshmibilas Press,
14, Jagannath Dutta Lane, Calcutta.

শিল্পী—শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বাসন্তী আবরণে

সচিত্র সাপ্তাহিক পত্রিকা

২য় বর্ষ] ৬ই পৌষ শনিবার ১৩৩০, ইং ২২শে ডিসেম্বর [২৩শ সংখ্যা

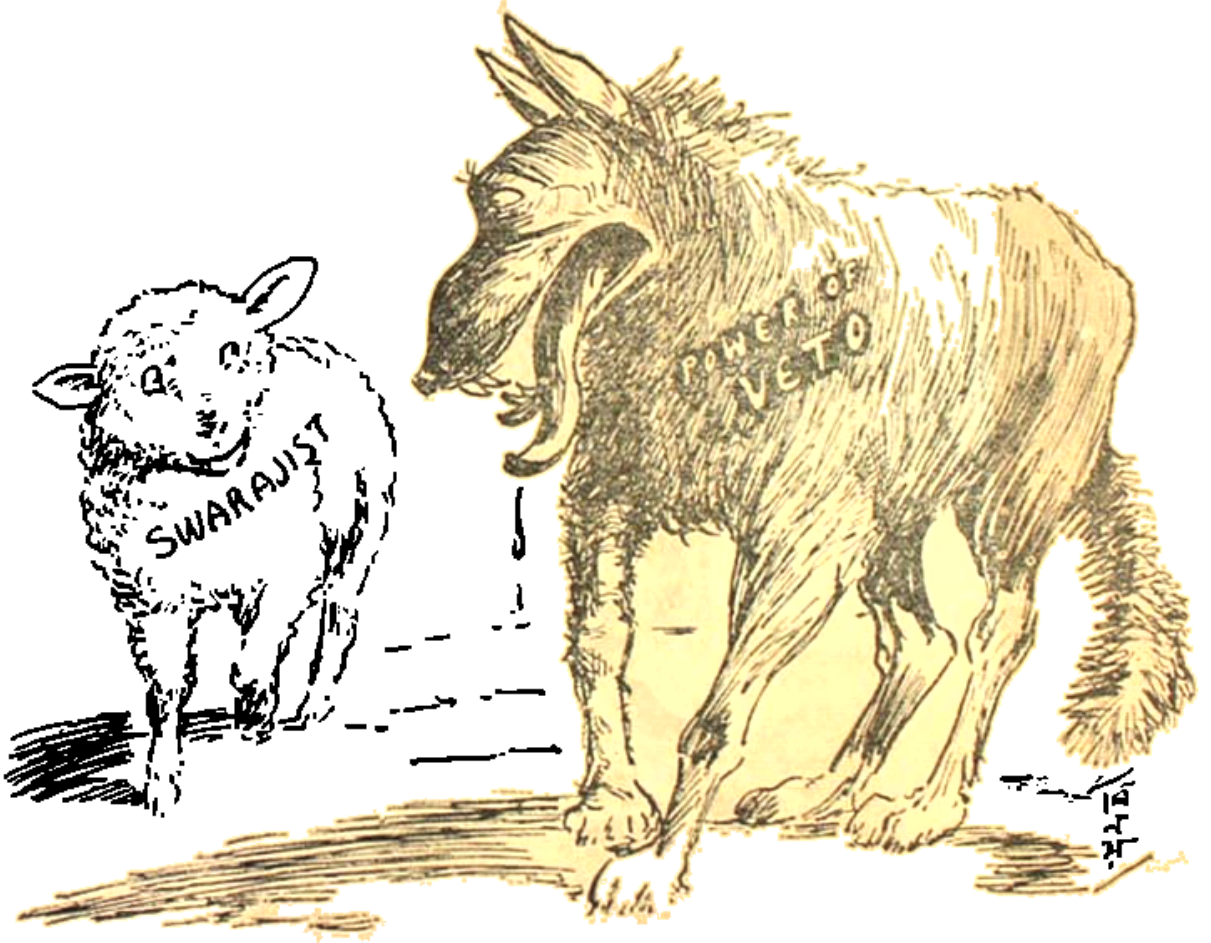

ভিটো—কাউন্সিলে আসছ—মনে রেখো এখানে আমি আছি।

কুমারী কোমলতা ব্যানার্জ্জি

ভারতীয় মহিলা কুমারী কোমলতার সঙ্গীত খ্যাতি আজ পাশ্চাত্যে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। বিখ্যাত রুশীয় নর্ত্তকী ম্যাডাম প্যাব লোভা সম্প্রতি কুমারী কোমলতার

রচিত দুইটি সঙ্গীত সহযোগে নৃত্য করায় তাঁহার খ্যাতি আরও বিস্তৃত হইয়াছে। কুমারী কোমলতা মহীশূরের বাঙ্গালী দেওয়ান মি এ আর ব্যানার্জ্জির কন্যা, তাঁহার মাতা ভূতপূর্ব্ব কমিশনার স্যার কে-মি- গুপ্তের কন্যা। এই সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্ম গ্রহণ করিয়া কুমারী কোমলতা তরুণ বয়সেই সঙ্গীতে পারদর্শীতা লাভ করিয়াছেন।...

সঙ্গীত রচয়িতা হিসাবে কুমারী কোমলতা অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন। মিঃ হারবার্ট অটক্সিন্ মিউজিকাল নিউজে ও হেরাল্ডে হিন্দু বিবাহ এবং কৃষ্ণ রাধা নামক দুইটি দৃশ্যের কথায় বলিতেছেন ইহার সঙ্গীতের ভার ছিল মিস্ কোমলতা ব্যানার্জ্জির উপর। এই দৃশ্যের অন্যান্য যে যেশ হইতে গৃহীত কুমারী সেই যেশেই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন-যদিও তাঁহার সঙ্গীত শিক্ষা ইওরোপেই হইয়াছে। টাইমস্ পত্রও কুমারীর সঙ্গীতপ্রতিভার অনেক প্রশংসা করিয়াছেন। পাশ্চাত্যে ভারতীয় সঙ্গীত প্রচার করিয়া প্রাচ্য সঙ্গীতকে উচ্চ আসন দেওয়াই কুমারীর লক্ষ্য। কুমারী কোমলতা আশা করেন তাঁহার এ আশা সফল হইবে। মেক্সপিয়ার সমিতি কর্ত্তৃক শকুন্তলা অভিনীত হইতেছে এই নাটেও কুমারীর কয়েকটা সঙ্গীত গীত হইবে। আমেরিকায় ও ইহার সঙ্গীতের বহুল প্রচলন হইয়াছে।

সীতা অভিনয়

(শ্রীঅতুল সেন)

গত রবিবার প্রদর্শনীতে সীতা নাটকের অভিনয় দেখতে গিয়েছিলাম। Theatre godown ও তার পারিপার্শ্বিক দেখে আত্মহত্যার ভাব জাগলেও ভিতরে গিয়ে ক্ষতিপূরণ হয়ে গেল।

দৃশ্যপট দেখেই বুঝে নিলাম শিল্পীরা বহু শতাব্দী অতীতের একটি পৃষ্ঠা খুলে দিয়েছেন। মেঠো রং দিয়ে আঁকা বাহুল্য বর্জিত ছবিগুলি দেখেই মনে হয় অতীতের মধ্যে প্রবেশ করলাম। প্রসিনিয়মে দুইদিকে নৃত্যপরা উর্ব্বশী উপরে বীণাবাদনে রতা হংসাসনা বীণাপাণী চারিদিকে পদ্ম। উর্ব্বশী অরূপের শ্রেষ্ঠ পরিকল্পনা। আধুনিক কবিদের মধ্যে অরূপ রচনায় সিদ্ধহস্ত সেলি ও সুইন্‌বার্ণ রবীন্দ্রনাথের উর্ব্বশী কবিতার কাছে হীনপ্রভ। এখানে কবির শ্রেষ্ঠত্ব কতটা রচনা নৈপুণ্যে আর কতটা বিষয়নির্ব্বাচনে বলা সুকঠিন। পদ্ম সৌন্দর্য্যের পরিকল্পনা। বাগ্‌দেবী বাণীও সঙ্গীতের অধিষ্ঠাত্রী দেবী।

দুই পাশের gate wingsএ শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম, তার উপরে হংস ও পদ্ম। শঙ্খ চক্রাদির ব্যাখ্যা এখানে বাহুল্যমাত্র। হংসও পদ্মদ্বারা জীবন ও মৃত্যুকে পরিকল্পনা করা হয়েছে বলে মনে হয়। দক্ষিণে হংস গ্রীবা উঁচু করে সঙ্গীতে রত পদ্ম স্ফোটনোন্মুখ—জীবন। বামে হংস শ্রান্ত গ্রীবা নমিত পদ্মও পরিম্লান হয়ে ঝুলে পড়েছে—মৃত্যু। হংসের পরিকল্পনাটী বেশ সুসংগত হয়েছে—হংস আত্মহারা হয়ে গান করতে করতে মৃত্যুকে বরণ করছে ইহা বহুকাল ধরে কবির কল্পনা। পদ্ম নিত্য প্রভাতে আসে নিত্য সন্ধ্যায় বিদায় নেয়—এইত জীবন ও মৃত্যু।

wingsও অন্যান্য দৃশ্যপটে যে সকল মূর্ত্তির অঙ্কণ দেখলাম সবই—খৃঃ পূঃ ৩০০ হইতে ৬০০ বৎসর পূর্ব্বেকার।

পরিচ্ছদ, অলঙ্কার, এবং অন্যান্য সরঞ্জাম সকল যথাসম্ভব অতীতের সাক্ষ্য দিচ্ছিল। প্রসিনিয়ম থেকে আরম্ভ করে অডিটোরিয়মের যবনিকা পর্য্যন্ত দৃশ্যপট, পরিচ্ছদ, অলঙ্কার, অভিনয় সবই যেন সামঞ্জস্য রক্ষা করে একটা সুরে বাঁধা। মানব হৃদয়ের এক বিরাট বিরহ প্রত্যেক দিক থেকে ধ্বনিত হচ্ছিল। বাস্তবিকই অভিনয়ের তিন ঘণ্টাকাল বর্ত্তমান পারিপার্শ্বিক বিস্মৃত হয়ে বহু যুগ অতীতে এসে দাঁড়িয়েছিলাম।

অভিনয়ের বিষয় ছিল সীতা। রাম সীতার উপাখ্যান ভারতবাসীর অস্থিমজ্জার সহিত সংযুক্ত অতএব এখানে যেটুকু বিশেষত্ব দেখেছিলাম সেইটুকুই আলোচনা করবো। অভিনয় হয়েছিল দ্বিজেন্দ্রলালের সীতা তথাপি ইহার ভিতর আর একটী সিদ্ধহস্তের স্পর্শ বিশেষভাবে অনুভব করেছিলাম। নাটক হিসাবে দ্বিজেন্দ্রলালের সীতা চিবাইতে দাঁত ভেঙ্গে যায়—কোন বাদ্যযন্ত্রের স্পর্শে যে ইহাতে রস সঞ্চার হ'লো বলতে পারি না। প্রকৃতি থেকে আমরা আহার সংগ্রহ করি বটে কিন্তু সেই আহার গ্রহণোপযোগী করবার জন্য রন্ধনকার্য্য আবশ্যক। সূপকারের কৃতিত্ব সেখানে যেখানে তিনি রন্ধনগুণে যে কোনও খাদ্য সুস্বাদু করে তোলেন। কবি বাণীর মন্দিরে যে অর্ঘ্য রচনা করেছেন তা সাহিত্যহিসাবে যতই মূল্যবান হউক না কেন তাকে রঙ্গমঞ্চে প্রকাশ করতে হ'লে কোনও সিদ্ধহস্তের স্পর্শে কাট ছাঁট করে উল্টে পাল্টে নিতে হয় এই বৃটান্ত বোধ হয় প্রথম দিয়েছেন আমাদের শিশির-কুমার। অস্ত্র যিনি তৈরী করেন তিনি সেখানেই ক্ষান্ত হন—যোদ্ধা সেই অস্ত্র নিজের সুবিধামতো প্রয়োগ করে। আমাদের এই নিমন্ত্রণের সূপকার কে আমি না সম্ভবতঃ শিশিরকুমার। সূপকারের কাজ যে অতীব মধুর হয়েছিল একথা অস্বীকার করবার যো নেই। অভিনয়ের সময় প্রতি মুহূর্ত্তেই মনে হচ্ছিল কি চমৎকার নির্ব্বাচন কি চমৎকার সামঞ্জস্য। শিশিরকুমার যদি রঙ্গমঞ্চের শ্রেষ্ঠ অভিনেতা তাই জানতাম রচনানৈপুণ্যও তার অসাধারণ নতুবা দ্বিজেন্দ্রলালের সীতা নিংড়ে রস বের করা সোজা হ'তো না।

ক্রৌঞ্চমিথুন বধ দেখে যে শোকগীতি রামায়ণের সৃষ্টি তাতে মহর্ষি বাল্মিকী রাম সীতার উপাখ্যানে দেবত্ব আরোপ করেছেন। দ্বিজেন্দ্রলাল রাম সীতাকে মানুষ করে তৈরী করে, অলৌকিকত্বকে বাস্তবের আকার দিয়ে আমাদের অত্যন্ত কাছে এনে দিয়েছেন। কবি তুলসীদাস এই রাম সীতা উপাখ্যানকে সার্ব্বকালীন, সার্ব্বমানস ও সার্ব্বজনীন করে দেশ ও কালের অতীত এক চিরন্তন সত্যরূপে প্রকাশ করেছেন। আমাদের শিশিরকুমার এই তিনেরই মধুরতা বজায় রেখে চিরন্তন সত্যকে প্রকাশ করেছেন—রবীন্দ্রনাথের "কথা কও" গানেই তার আভাষ। রাম সীতা মানুষ হলেও দেবতাবাপন্ন, রাম সীতার ভিতর যে সত্য প্রকাশিত হয়েছিল তা চিরন্তন কালের সত্য—প্রতি মানব হৃদয়েই তার মূর্চ্ছনা চলেছে।

আমি জন্মেছি জনকের গৃহে (জনক-পিতা-সীতা)

তিনি চাষ করতে গিয়ে আমায় পেয়েছিলেন তাই আমার নাম সীতা (চাষ-কর্ষণ Culture) আমি কর্ষণ বা অনুশীলনেরই অভিনব ফল। আমি দেহধারী হ'লেও দেহের অতীত তাই আমার নাম বৈদেহী। আমি বৈদেহী অতএব অহঙ্কারের বক্রতার অতীত। সীতার ঘরে বলতি করি—আমার ঘরে অহঙ্কারের বক্রতারূপ হরধনু ছিল। আমাকে যিনি গ্রহণ করবেন তিনি অহঙ্কারের অতীত রাবণরূপী পাপ এসেছিল.হরণ করে কিন্তু হরধনু ভঙ্গ তার অসাধ্য। তিনি এলেন অবলীলাক্রমে ভাঙ্গলেন ধনু তাঁর সঙ্গে গেলাম অযোধ্যার ঐশ্বর্য্যের মধ্যে—চারিদিকে মধুময় দেখলাম। তাঁর সঙ্গে গেলাম দণ্ডকারণ্যের দৈন্যের মধ্যে সেখানেও দেখলাম বনবাস মধুময়। তাঁকে ছেড়ে গেলাম লঙ্কার ঐশ্বর্য্যের মধ্যে—চারিদিকে বিষবৎ দেখলাম। তাঁকে ছেড়ে গেলাম বাল্মিকীর তপোবনে বেদনায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠ্‌লাম। তখন বুঝে নিলাম আমার সুখ দুঃখের কারণ বৈভব বা অভাব নয়, সবই তাঁর স্পর্শের তারতম্য। তাঁর স্পর্শ পেলে সবই সুখের তিনি যখন দূরে তখন সবই দুঃখের। তিনি যখন আমার কাছে তখনই "মধুরাদ্যা গুতারন্তে মধুকরন্তি সিন্ধবঃ।" এই অনুভূতি যখন আমার হ'লো তখনই বেদনায় আমি ভরপুর তখন আমি নিজেকে চিনে নিলাম আর চিনে নিলাম তাঁকে। তখনই আমি তাঁর উপযুক্ত হ'লাম তাই প্রয়োজন হ'লো আমার স্বর্ণ-মূর্ত্তির। তিনিই কি নিশ্চিন্ত ছিলেন? না, তিনিও যে আমার জন্য পাগল। আমি ছাড়া যে তাঁর আর কেউ নেই—তাই তিনি গ্রহণ করলেন আমাকে হরধনু ভঙ্গ করে, যাদুমন্ত্রের মোহে দূর করে দিলাম তাঁকে—পেলাম তার শান্তি, তিনিই আবার উদ্ধার করলেন, রাবণ বধ করে তখনও আমার অনুভূতি পূর্ণ হয়নি তাই আমার বনবাস। তিনি আমায় ছেড়ে যেননি তার স্মৃতিতে আমি ছাড়া কিছু নেই কেউ নেই।

এইত নিত্যকালের সত্য—তিনি চান আমাকে আমি চাই তাঁকে। এইটীইত বিশ্বের একমাত্র সঙ্গীত—

"অসীম সে চাহে সীমার নিবিড় সঙ্গ
সীমা হ'তে চায় অসীমের মাঝে হারা।"
"সীমার মাঝে অসীম তুমি বাজাও আপন সুর
আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ তাই এত মধুর।"

চিরন্তনকালের বিরহিনী সীতা, চিরন্তন বিরহী রাম। বিশ্বে নিত্যকালের সঙ্গীত এক বিরাট বিরহ।

সমস্ত অভিনয়ের ভিতরই এই সঙ্গীতটী করুণ সুরে বেজে উঠ্‌ছিল। এমন শ্রোতা কেউ ছিল না যার চোখের পাতা দুটি ছিল না ভিজা।

চপলচটুল নৃত্যগীতে শিশিরকুমার এই সঙ্গীতটী বেসুরো করে তোলেন নি। মধু জিহ্বাতে মিষ্ট লাগে বটে কিন্তু তা অঙ্গে লেপন করা চলে না। নৃত্যগীতের স্থান কলাহিসাবে যেখানেই থাকুক না কেন স্থান কালের সঙ্গে তাকে সামঞ্জস্য রেখে প্রয়োগ করতে হবে। শ্রোতাদের হৃদয়ের তন্ত্রীতে যে মূর্চ্ছনার করুণ সুর বেজে উঠ্‌ছিল চপল নৃত্যগীতে পাছে তা নষ্ট হয় এই আশঙ্কায়ই বোধহয় শিশিরকুমার সেই সব অবতারনা করেননি। অঙ্কের ব্যবধানে বাঁশীর একটা করুণ সুর শ্রোতাদের মন ভারাক্রান্তই করিতেছিল। সীতার বিরহকাতর সজল নয়ন দুটী যখন শ্রোতাদের মনে শোকের ঝঞ্ঝার তুলিতেছিল তখন কনসার্টের "সেও সখি সেও তব পেয়ালা"র অবতারনা না করাতে শিশির-কুমারকে আমরা ধন্যবাদ দি।

যা দেখলাম, নাটকীয় শাস্ত্র হিসাবে যদি তাতে কিছু অসামঞ্জস্যও থাকে তবু শাস্ত্র রক্ষা করতে গিয়ে এই সঙ্গীতটী নষ্ট করতে আমরা মোটেই রাজী নই। ইহাকে অভিনয় বলুন, সঙ্গীত বলুন, একটা মূর্চ্ছনা বলুন আপত্তি নেই। যবনিকার পর মনে হ'লো বিরহের একটা সুন্দর ভাষা দীর্ঘশ্বাস যেন সঙ্গীত হয়ে বেজে উঠেছিল।

অভিনয় সম্বন্ধে দুটো একটা কথা বলবো। এককথায় বলতে গেলে বলতে হয় অভিনয় এতই উচ্চ অঙ্গের হয়েছিল যে কখনও এরূপ অভিনয় বঙ্গ রঙ্গমঞ্চে হয়েছে কিনা সন্দেহ। কোনও পাত্র বা পাত্রীর অভিনয় ত্রুটীই এমন ছিল না যাহাতে মনে হয়—জলের হাঁস ডাঙ্গায় এসে সপ্‌সপ করে চল্‌ছে। শিশির কুমারের অভিনয় যাহা আশা করেছিলাম তাই হয়েছে—শুধু নিখুঁত নয়—superb. ললিতবাবু আমাদের ওস্তাদের খ্যাতনামা অভিনেতা ইহাঁর যুধিষ্ঠিরের অভিনয় দেখে মুগ্ধ হয়ে ছিলেম ঠাণ্ডা—ভূমিকায়—তিনি নিজেও ইনি ভাল করবেন আগেই জানতাম। বাল্মিকী শ্রীযুত মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য এই কাজে নূতন ব্রতী—। কিন্তু তিনি এমনই কৃতিত্ব দেখিয়েছেন যে মনে হয় ইনি একজন অভিজ্ঞ শিল্পী। শ্রোতাদের সহানুভূতি বাল্মিকীর জন্য আছেই তার উপর তাহার অভিনয় ভাল হওয়াতে মণিকাঞ্চন যোগ হইয়াছিল। লক্ষ্মণ (তারাকুমার বাবু) অগ্রজানুগামী। কাজেও তাই করেছিলেন—ইহার মূক অভিনয় উপভোগ্য। ভরতটী (বিভুবাবু) যেন শিশির বাবুরই—একটু cheap Edition ইহাপেক্ষা বড় প্রশংসা কিছু নেই। লব কুশ ছেলেটীকে (জীবনবাবু) ওরা কোথায় পেলে আহা হা ক্ষত্রিয় কুমার ও তাপস বালকের সামঞ্জস্য—কি সুন্দর ফুটেছিল। কুশ ও যেন ফুটেছিল, এই লব-কুশের সহজ চপলতা, বলকল পরিহিত—

নগ্ন-দেহ কি চমৎকার—শ্রোতারা মুগ্ধ হয়েছিল। শূদ্রক-রাজ ও দুর্মুখ (রবিবাবু) যিনি অভিনয় করেছেন তিনি বেশ কৃতি—অভিনেতা শিশির বাবুর কণ্ঠ—ও অভিনয় ভঙ্গী উহার মধ্যে—উঁকি ঝুঁকি মারে। সৈনিক চানীবাবু খুব সহজ ভাবে অভিনয় করেছে একটু হাস্য রস থাকাতে শ্রোতাদের একটু relief দিয়েছে। শত্রুঘ্ন ও সুরো অভিনয় করেন নি। অন্যান্য সব ছোট ছোট ভূমিকায় যারা ছিলেন তারাও বেশ অভিনয় করেছেন কেউ কিছু নষ্ট করেন নি।

এখন নারী ভূমিকা। নারী ভূমিকায় যারা ছিলেন তারা যে অঙ্গের অভিনয় করেছেন রঙ্গমকে দু'একজন ছাড়া এমন অভিনয় আর দেখা যায় নি। সীতার শোককাতর সজল নয়নযুক্ত মুখখানা ছবিতে তুলে রাখবার মত। "তোমারে পেয়েছি নাথ কত বর্ষপরে" এই কথা বলবার সময় সীতা দেবী যেন নারী কণ্ঠের সমস্ত সঙ্গীত একেবারে উপুর করে ঢেলে দিলেন। সীতার ভিতর বিরহ যে সজীব মূর্ত্তি পরিগ্রহ করেছিল তার কম্পন নয়ন, ঘর ঘর বিগলিত অশ্রু প্রত্যেক শ্রোতার অশ্রু টেনে এনেছে। সীতার অংশে ছিলেন শ্রীমতী প্রভা।

শূদ্রক পত্নী ও কৌশল্যার ভূমিকায় ছিলেন খ্যাত নাম্নী—অভিনেত্রী শ্রীমতী নিরোদা। একথায় বলতে গেলে তারা সুন্দরীর পর আর কেউ এরূপ অভিনয় করেছেন কিনা সন্দেহ। শান্তা বেশ সহজ স্বাভাবিক ভাবে অভিনয় করেছেন। বাসন্তী আশ্রম বালিকার মতনই ছিল।

চিত্ররাগবিজ্ঞানে ছাত্র হিসাবে এই কথা জোরের সঙ্গে বলতে পারি যে রাম ও ভরতের মূক অভিনয় গুলি এত সুন্দর হয়েছিল কথা বললেও এত স্পষ্ট প্রকাশ হতো না।

খোলা মাঠে অস্থায়ী মঞ্চে অভিনয় করা যে কি দুরূহ ব্যাপার তা বোধহয় সকলেই জানেন—এইসব নানা অসুবিধা সত্ত্বেও যে এরূপ অভিনয় দেখলাম ইহাতেই—আশ্চর্য্য হইলাম।

শুনিলাম এই ব্যাপারে শিশিরকুমারকে সাহায্য করিয়াছেন সাহিত্যিক যমিলাল বাবু, প্রভৃতি শ্রীযুত শিল্পী চারুবাবু ও দেবুবাবু—তাহাদের পরিশ্রম সার্থক হইয়াছে। আমাদের পয়সা শুধু সার্থক হয় নাই—বহুগুণ ফিরিয়া পাইয়াছি।

তারপর—স্বরাজ কোন পথে ?

(অধ্যাপক শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার এম-এ)

ইংলণ্ড প্রভৃতি গণতন্ত্র শাসনের দেশে আইন সভায় মন্ত্রীরা কোন একটা আবশ্যক আইন প্রস্তাবে পরাজিত হলে বা বিভাগ বিশেষের ব্যয়ের জন্য আবশ্যক অর্থ চেয়ে মঞ্জুরী না পেলে, অথবা সভাদের কাছে পরিবাদি মত (Vote of censure), প্রতিবাদি মত (Adverse vote) ও অনাস্থার মত (Vote of no confidence) পেলে পদত্যাগ করেন। তবে যদি তাঁরা মনে করেন যে সভ্যদের মতামত দেশের নির্ব্বাচক মণ্ডলীর মতামত নয় তো তাঁরা গভর্ণরকে সভা ভেঙে দিয়ে নব নির্ব্বাচনের জন্য বলতে পারেন। সে নির্ব্বাচনে নূতন সভায় যদি তাঁরা দলভারী করে ফিরতে পারেন তো টিকে যান, নচেৎ তাঁদের সরতে হয়। দেশ মতের সঙ্গে সভার মতের সামঞ্জস্য রাখা গণতন্ত্র শাসনে বিশেষ দরকারী। তাই সভা ভঙ্গের আসল প্রয়োজনীয়তা হল এই সামঞ্জস্য সাধনে। জনমতের সঙ্গে সভার মতের একতা বা সামঞ্জস্য আছে জেনেও মন্ত্রীরা সভার সঙ্গে তাঁদের ঘোরতর অমিল ঘটলে সভাভঙ্গের আবেদন করতে পারেন; আর তা যদি করেন তো কেবল নিজেদের মান রাখার জন্য। তখন আর তাঁরা ফিরে নির্ব্বাচনে জনমতের কাছে নিজেদের সমর্থনের আশা রাখেন না। সভাভঙ্গের জন্য মন্ত্রীদের এই আবেদন বিষয়ে রাজা, প্রেসিডেণ্ট বা গভর্ণর, যে দেশে যেমন ব্যবস্থা, যদি মনে করেন যে শুধু মন্ত্রী বদলালেই ফল ভাল হবে তো সভা ভঙ্গ নাও করতে পারেন। তাতে অধিকাংশ সভ্যদের অনভিমত মন্ত্রীদের বাধ্য হয়ে পদত্যাগ করতে হয়। এই সভা ভঙ্গ বিষয়ে কোন দলবিশেষের সুবিধা, পুষ্টি বা বর্দ্ধনতার দিকে নজর না রেখে কেবল দেশহিত বুদ্ধিতেই কাজ করা নিয়ম। এই সব ব্যবস্থা ইংলণ্ডের মত জনতন্ত্র দেশের বেলাতেই খাটে। এ দেশের বেলায় নয়; তার কারণ, প্রথমে,—এখানে মন্ত্রীসভা বা ক্যাবিনেটের আধখানাকে 'অচল' (Irresponsible) বললেও চলে; তাঁর নাম হল শাসন পরিষৎ (Executive council); আর আধখানা হল জন মন্ত্রীগণ (Ministers), তাঁরা হলেন কতকটা 'চল' (Responsible), অবশ্যই তা পরে হতে পারেন আশা করা যায়। আমাদের মিশ্র মন্ত্রীসভাকে (cabinet) সে জন্য এক রকম চলাচলের খেঁচুরি বললেও চলে; তবে এতে অচলের ভাগটাই কিছু বেশী মাত্রায়

পড়ে গিয়েছে। এক্ষেত্রে এখানে মিশ্র মন্ত্রীসভার আর অন্য দলমন্ত্রীরা সভাভঙ্গ চাইলেও, আর আধখানা পারিষদেরা (Executive councilors) হয়তো অচল হয়ে বসে থাকবেন, তা চাইবেন না। আবার তাঁদেরও অধিকাংশ যদি মন্ত্রীদের সুরে সুর মিলান গভর্ণর দেশের দলের হিতবুদ্ধিতে সে আবেদন গ্রাহ্য নাও করতে পারেন। যেহেতু আমাদের মন্ত্রীরা পুরাপুরি রকমের 'চল' এখনকার অবস্থায় হতে পারেন না, সেজন্য মন্ত্রীদের পদত্যাগ সম্বন্ধেও বাঁধা বাঁধি কিছু থাকতে পারে না। আর এক কথা এখনি বলে' রাখা বোধ করি ভাল। কোন বিভাগের খরচ চালানর জন্য মিশ্র-মন্ত্রি-সভার Cabinet চাওয়া টাকা সভা না-মঞ্জুর করলে রক্ষিত বিষয়ের বেলায় গভর্ণর সে টাকা নিজের জোরে দিয়ে দিতে পারেন, আর হস্তান্তর বিষয়ের বেলায় সেই বিভাগ—বন্ধ করে দিয়ে তা রক্ষিত বিষয়ের সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে কেবল তাঁর পরিষদের Executive council) সাহায্যে বা অন্য রকমে কাজ চালাতে পারেন; তবে একেবারে হস্তান্তর বিভাগ বন্ধ না করে নিজে হাতে টাকা মঞ্জুর করে দিয়ে বিভাগ চালানই মন্ত্রের ভাল বলে' ধরা হয়।

এখন স্বরাজ-দল দেশের আইন সভায় ঢুকছেন। এ সভার ১৪০ জন সভ্যের মধ্যে ১১৪ জন নির্ব্বাচিত সভ্য। অপক্ষ বা বেসার্কা (Independent) সঙ্গে মিতালি করে তাঁরা সভায় স্বরাজ-মিতালির প্রাবল্য স্থাপন করতে পারবেন খুবই মনে হয়। তা ছাড়া দু'চার জন অন্য দল থেকেও টেনে নিয়ে পাঁচ-মিশালিতে (Coalition) দল ভারী করে তুলতে পারেন। তাহলে এই মিতালি বা পাঁচ মিশালি ভারী দল হতে মন্ত্রী-নিয়োগেই স্বাভাবিক, কারণ এই গণ-তন্ত্রের রীতি। ইংলণ্ডে বর্ত্তমান নির্ব্বাচনে রক্ষণ-শীল (Cnservative) দলের সভ্য-সংখ্যা বেশী হয়েছে বটে, কিন্তু উদার (liberal) ও শ্রমিক (labour) দল মিললে রক্ষণ শীলের প্রাবল্য (majority) ঘটে না; এক্ষেত্রে শ্রমিক দল থেকে কেউ মন্ত্রী সভা গড়নের জন্য আহূত হবেন বলে মনে হয়; কারণ শ্রমিক উদার মিললে দুয়ের মধ্যে তাঁরাই ভারী তা না হলে রক্ষণ-শীল-দলের জয়তাই বজায় থাকবে বোধ হয়। আমাদের, এখানে, স্বরাজ-দল গভর্ণমেণ্ট না মোয়ালে মন্ত্রী পদ নেবেন না এই মন্ত্র নিয়ে সভায় ঢুকেছেন। তবে নিতান্তই যদি—কাজের খাতিরে তা নিতে হয় তো তাঁদের মিতাদের মধ্যে কেউ কেউ তা করলে বিশেষ আপত্তির কারণ হবে বলে মনে হয় না। যদি স্বরাজ মিতালি বা মিশালি মন্ত্রীত্ব গ্রহণ না করেন তো প্রথম যুদ্ধিল এখানেই। তবে দলের হিতের বা রাজ্যের স্বার্থের দোহাই দিয়ে গভর্ণর অন্য দল থেকে মন্ত্রী নিয়ে কাজ চালাতে পারেন। শেষের কথাটা সংস্কার আইনের নিয়মাবলীতেও নাই, আছে কেবল হস্তান্তর বিষয়ে টাকা না-মঞ্জুরীর বেলায় শেষ উপায় হিসাবে। এতে কার্য্যতঃ সংস্কার আইনের গলাটিপে দেওয়া হয়, যদিও আইন সভার সভ্যেরা এ ঘটনার পরেও সভা-আলো করে বিরাজ করতে পারেন; কেন না প্রবল বা ভারী দল থেকে মন্ত্রী নিয়ে হস্তান্তর বিভাগগুলি চালানর কথাই আইনে ও নিয়মাবলীতে আছে। এখন যদি দলান্তর হতে মন্ত্রী পছন্দ করে গভর্ণর কাজ চালান তো সভার মাঝে স্বরাজ মিতালির চৈমাসি অত্যাচারের বড়ই সুযোগ ঘটে। তাঁরা পদে পদে অর্থ বিষয়ে অমত (Refusal of grant) প্রতিবাদি মত (Adverse vote) ও পরিবাদি-মত (Vote of Censure) প্রভৃতি দিয়ে মন্ত্রীদের উদ্বাস্ত করে তুলতে পারেন। মন্ত্রীরা সভাভঙ্গ চাইলেও গভর্ণর হয় তো শুনবেন না কারণ ফিরে যাবে স্বরাজ দলের অধিকতর প্রবল হয়ে ঢোকার আশঙ্কা আছে। মন্ত্রীরা হাল্কাহীন হলে তাঁদের পদ ছাড়বেন না। তাঁরা ছাড়তে চাইলেও পদলক্ষ্মী কম্‌লি তাঁদের যে ছাড়বে না। স্বরাজ-মিতেরা তখন একযোগে পদত্যাগ করতে পারেন। তাহলে পড়ুয়া শূন্য ঘর পরিত্যক্ত মাষ্টার মশায়ের বেঞ্চি পড়ানর মত মুস্ত কতকটা হয়। কিন্তু সেও কি আচ্ছা! স্বরাজ চুলায় যাক্, নিজের পাওনা গণ্ডা ছাড়ে কে? আর স্বরাজ দলের মিতাদের মধ্যে কেউ কেউ যদি কাজের সুবিধার জন্য দলের শিখণ্ডি হয়ে মন্ত্রী হন তো কি হতে পারে দেখা যাক্। এমন্ত্রীত্ব স্বীকারে তাঁরা হস্তান্তর বিষয়ের বেলায় পরিবাদি মত, অনাস্থামত প্রভৃতি অস্ত্র তেমন চালাতে পারবেন না; কারণ নিজের পায়ের উপর একবারের বেশী দু'বার কুড়ুল মারতে পারেন সে কোন পণ্ডিত? তা পারবেন কেবল তাঁরা অনবরত যত ইচ্ছা তত রক্ষিত বিষয়ের বেলায়। জন-মন্ত্রীরাই তখন অনেক সময়ে পরিষদের সঙ্গে ঠোকাঠুকি বাধিয়ে কিছু কিছু বাধা সৃষ্টি করতে পারেন; কিন্তু সে ভাবে সুবিধা করতে পারার আশা খুবই কম। মন্ত্রীরা দলের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সভাভঙ্গও ঘটাতে পারবেন না। কারণ এ বিষয়ে বিচার গভর্ণরের হাতে। তাঁরা পদত্যাগ করতে চাইলে সাধারণতঃ ও সম্ভবতঃ দলের সকল সভ্যদের পিছনে করেই সরে আসবেন। তখন পুরক নির্ব্বাচন (By-election) করে তাঁদের স্থান পূরণ করা হবে। বেশীর ভাগ সভ্য পদত্যাগ করলেও সভা-অধিবেশনের জন্য নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক সভ্য (Quorum) পেতেও বাধা হবে বলে মনে হয় না; তাই পুরক-নির্ব্বাচন হওয়ার আগেও সভা বসতে বোধ হয় বাধা হবে না। এ উপায়ে

পুনর্নির্ব্বাচনের হাঙ্গামার হাত এড়ান যেতে পারে। এই পূরক নির্ব্বাচনের পরও যদি এ খেলা বার বার চলতে থাকে তো শেষে কি দাঁড়াবে দেখা যাক্। এ ক্ষেত্রে গভর্ণর অস্থায়ী-ভাবে আইন-সভা ভেঙে দিয়ে কেবল মাত্র পরিষদের (Executive council) সাহায্যে কাজ চালাতে পারেন। কারণ সভার ও মন্ত্রীদের যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পরিষদের উলবার কথা নাই, বরং আরও শক্ত হয়ে বসবার কথা; তাঁদের আয়ু একরকম স্থির, পাঁচ বছর। আর সভা-ভঙ্গের রব না যেলে সংস্কার আইন কিছু সময়ের জন্য বা এককালীন বন্ধ করার ব্যবস্থা গভর্ণর করতে পারেন। তাতে করে দেশ-শাসনে তাঁর ক্ষমতা যথেচ্ছ ও অবাধ হয়। তার পরেও যদি প্রশ্ন হয়—'স্বরাজ কোন পথে?' উত্তর মিলবে তার উপেক্ষিতের প্রচণ্ড অন্তরাত্মার মাঝে।

আধুনিক সতীত্ব

[শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ]

নাট্যাচার্য্য অমৃতলালের "হরবালা" নাটকের নায়ক আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিল যে, বেঙ্গার মধ্যে সতী নাই, কথাটা এতদিন সত্য ছিল বটে কিন্তু আধুনিক সাহিত্যে মিথ্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আধুনিক সাহিত্যের বেঙ্গার মধ্যে প্রথম শ্রেণীর সতী, শরৎচন্দ্রের "শ্রীকান্তের" রাজলক্ষ্মী। রাজলক্ষ্মী কুলীনের কন্যা, অধিক বয়সে তার বিবাহ হইয়াছিল, "অনেক দিন পূর্ব্বে মায়ের সহিত সে তীর্থযাত্রা করিয়াছিল—আর ফিরে নাই। কাশীতে ওলাউঠা রোগে মরিয়াছে—এই কথা মা গ্রামে আসিয়া প্রচার করিয়াছিলেন।" রাজলক্ষ্মী ও তাহার ভগিনী সুরলক্ষ্মীর একসঙ্গে ভঙ্গকুলীনের সন্তান বিভিন্ন গ্রামের পাচক ব্রাহ্মণের সহিত বিবাহ হইয়াছিল। বিবাহের "দুইদিন পরে ৭০৲ নগদ লইয়া দু-পুরুষে কুলীন জামাই বাঁকুড়া প্রস্থান করিলেন। আর কেহ তাঁহাকে দেখে নাই। বছর দেড়েক পরে গ্রীষ্ম জ্বরে সুরলক্ষ্মী মরিল এবং আরও বছর দেড়েক পরে এই রাজলক্ষ্মী কাশীতে মরিয়া শিবত্ব লাভ করিল। এই ত পিয়ারী বাইজীর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।" স্ত্রীলোক মরে অনেক প্রকারে, কেহ নাভিশ্বাস হইয়া মরে, কেহ নিশ্বাস না ফেলিয়া মরে, কাহারও বা শিবত্ব প্রাপ্ত হয়। স্ত্রীলোকের শেষের দুই জাতীয় মৃত্যু—জীবন্ত মৃত্যু, কারণ তাহারা বাঁচিয়া থাকিয়াই বলে "আমি মরিয়া গিয়াছি।" শিবত্ব প্রাপ্তি আবার দুই প্রকারের, কেহ কেহ শিবরাজধানী গমন না করিয়াই লিঙ্গাশিব প্রাপ্তি অনুসারে শিবত্ব লাভ করে আর কেহ বা শিবলিঙ্গের একত্ব কামনায় শিবরাজধানীতে গমন করে। রাজলক্ষ্মী যখন দেশে মরিল না, তখন কবিকে বাধ্য হইয়া তাহাকে অনাদিলিঙ্গময় অবমুক্তক্ষেত্রে লইয়া গিয়া শিবত্ব প্রদান করিতে হইল। বাঁকুড়া নিবাসী দু-পুরুষে কুলীন যখন সত্তর টাকা মূল্যে তাহার গৌরী-সত্ত্ব বিক্রয় করিয়া আর দেখা দেয় নাই তখন শিবত্ব লাভের জন্য রাজলক্ষ্মীকে কেহ দোষ দিতে পারে না। এহেন রাজলক্ষ্মীর শিবত্ব লাভের ব্যাপারটা কবি বিচক্ষণের মত যবনিকার অন্তরালেই রাখিয়াছেন কিন্তু এইখানে পটক্ষেপণ না করিয়া উত্তোলন করিলে বোধহয় শ্রীকান্তের একটা সংস্করণ বৃদ্ধি হইত।

যাহাই হোক, রাজলক্ষ্মী শিবত্ব লাভ করিল, শ্রীকান্তের গ্রামের লোক তাহাকে ভুলিয়া গেল। সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্। অনেককাল পরে রাজলক্ষ্মী অনামা দেশের বেনামা হিন্দুস্থানী জমিদার পুত্রের শিকার আসরে "ভেড়ুয়া" সমেত আসিয়া উপস্থিত হইল। রাজলক্ষ্মী বা পিয়ারী তখন আর কেবল "কসবী" নহে, তখন সে "তওয়াইফ।" যাহারা পুরুষের কণ্ডূতি অপনোদনের জন্য আত্মবিক্রয় করিয়া থাকে তাহারা হিন্দী ও উর্দু ভাষায় "কসবী" নামে পরিচিত, পূর্ব্ববঙ্গে 'কসবীর' পরিবর্ত্তে "পেশাকর" ও পশ্চিমবঙ্গে "খানকী" শব্দ প্রযুক্ত হইয়া থাকে। ইহাদিগের মধ্যে যাহারা নৃত্যগীত শিক্ষা করিয়া নায়কের চিত্ত বিনোদন করিতে পারে তাহারাই "তওয়াইফ," বাঙ্গালাদেশে ইহারা "তয়কাওয়ালি" বা "বাঈজী" নামে পরিচিত। শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বর্ণিত রাজলক্ষ্মী তয়কাওয়ালি। লক্ষ্ণৌ-বেনারস সমাজে বিশ বৎসর পূর্ব্বে তয়কাওয়ালিদের মধ্যে দুইটি শ্রেণী ছিল। প্রথম শ্রেণীর নাম কলাবন্তীন্, ইহারা জাতিতে হিন্দু, ইহাদিগের কন্যারা বিবাহ করে, স্বামীসহবাস করে এবং অর্থের জন্য আত্মবিক্রয় করে না, তবে দুই চারিটি খণ্ডিত শীলা কন্যা যে এই সমাজে দেখিতে পাওয়া যাইত না তাহা নহে, এই জাতির স্ত্রীপুরুষ পুরুষানুক্রমে গায়ক ও বাদক। পূর্ব্বে কাশী বলরামপুর মহমুদাবাদ হইতে গোয়ালিয়র ও ইন্দোর পর্য্যন্ত ইহাদের সমাদর ছিল, মজলিস ও বৃহৎ অনুষ্ঠান উপলক্ষে ইহারা নিমন্ত্রিত হইত এবং সপরিবারে নিমন্ত্রণ সভায় যাইয়া নাচিয়া বাজাইয়া আসিত। দক্ষিণাঞ্চলে মহীশূর রাজ্যেও গর্ভশীল অধিকৃত গোয়া প্রদেশে এই জাতীয় "কলাবন্তী,"

দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদিগের প্রাচীন নাম "নাইকীন" এবং এখন ইহারা ক্রমে ক্রমে কলাবিদ্যা পরিত্যাগ করিয়া সামান্যা বেশ্যা হইয়া যাইতেছে। দ্বিতীয় শ্রেণীর তওয়াইফ—কলাবতী হইলেও বেশ্যা, তাহারা চিত্ত-বিনোদন ও অঙ্গ বিক্রয় একসঙ্গেই করিয়া থাকে। সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে বিচার করিয়া দেখিতে গেলে বুঝিতে পারা যায় যে, রাজলক্ষ্মী এই দুই জাতীয় এক জাতির ও অন্তর্গত নহে। সে তওয়াইফ, কিন্তু তাহার যখন শিবত্ব প্রাপ্তি হইয়াছিল এবং সে যখন বাঙ্গালী ব্রাহ্মণের কন্যা, তখন সে কলাবন্তীন নহে।

এইস্থানে একটা প্রশ্নপাত আনিতে বাধ্য হইলাম। নক্ষত্র দেখিয়া এবং নৌকার পাল গুণিয়া প্রতাপ ও শৈবলিনীর প্রেমের অঙ্কুরোদ্গম যে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় অনুভব বলিয়াছেন তিনিই কিন্তু শ্রীকান্তের প্রতি রাজলক্ষ্মীর আকর্ষণের ভূমিকা লিখিতে গিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন, "আমার মায়ের ভয়ে এই মেয়েটা বঁইচির বনে চুকিয়া প্রত্যহ এক ছড়া পাকা বঁইচি-ফলের মালা গাঁথিয়া আনিয়া আমাকে দিত। সেটা কোনদিন ছোট হইলেই, পুরণো পড়া জিজ্ঞাসা করিয়া, ইহাকে ত্রাণ করিয়া চপেটাঘাত করিতাম। মার খাইয়া এই মেয়েটা ঠোঁট কামড়াইয়া গোঁজ হইয়া বসিয়া থাকিত; কিন্তু কিছুতেই বলিত না—প্রত্যহ পাকা ফল সংগ্রহ করা তাহার পক্ষে কত কঠিন। তা সে যাই হোক, এতদিন জানিতাম, মারের ভয়ে সে এত ক্লেশ স্বীকার করিত।" বুঝিতে পারা গেল যে, নৌকার পাল গুণিয়া প্রেম না জন্মিলেও বঁইচি-ফলের মালা গাঁথিয়া প্রেম জন্মে।

পিয়ারী বাইজীরূপে দেখা দিয়া রাজলক্ষ্মী যখন শ্রীকান্তের কাছে আত্মপ্রকাশ করিল তখন সে বেশ্যা। কৈশোরের নায়কের প্রতি তাহার আকর্ষণের পুনরাবির্ভাব অত্যন্ত স্বাভাবিক কিন্তু তাহার পর হইতেই রাজলক্ষ্মী বা পিয়ারী বাইজী একটা অস্বাভাবিক মূর্তি ধারণ করিয়াছে। শ্রীকান্ত যখন রোগে আক্রান্ত হইয়া পিয়ারীকে খবর দিল তখন হইতে রাজলক্ষ্মী এই অস্বাভাবিক মূর্তি পরিগ্রহ করিল। অস্বাভাবিকতার প্রথম লক্ষণ তাহার সপত্নীর পুত্র বহুর আবির্ভাব। বহুর আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই কবি পিয়ারীর মুখ দিয়া পাঠকপাঠিকার বিরক্তি উৎপাদনের জন্য বলাইয়া রাখিয়াছেন,—

"তিন চার দিনে না হোক দশ বারো দিনে এ রোগ সারবে তা জানি, কিন্তু আসল রোগটা কতদিনে সারবে, আমাকে বলতে পারো?"

"আসল রোগ আর কি?"

"পিয়ারী কহিল, "ভাববে একরকম, বলবে এক রকম, করবে আর এক রকম—চিরকাল ঐ এক রোগ। তুমি জানো যে, এক মাসের আগে তোমাকে চোখের আড়াল করতে পারব না—তবু বলবে—তোমাকে কষ্ট দিলুম, তুমি যাও।"

তাহার পরেই রাজলক্ষ্মী তাহার প্রাণকান্ত শ্রীকান্তকে নোটীশ দিল,—

"পিয়ারী কহিল, "কিন্তু আমার ছেলে প্রায়ই আজ-কাল বাঁকিপুর থেকে আসছে। বেশীদিন থাকলে সে হয় ত কিছু ভাবতে পারে।"

রাজলক্ষ্মী বা পিয়ারী বাড়ীতে "বাবু" বলাইত, একথা প্রথম পর্ব্বে একপ্রকার অস্বীকার করিলেও কবি দ্বিতীয় পর্ব্বে তাহার বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি শ্রীকান্তের প্রথম পর্ব্বে লিখিয়াছেন, "আরও একটা ব্যাপার আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। এমন একটা নামজাদা বাইজীর গৃহে গান-বাজনার কোন আয়োজন কোথাও নাই।" কিন্তু দ্বিতীয় পর্ব্বে কবি বলিতেছেন, "উপরে উঠিয়া ঠিক পাশের ঘরটাই বসিবার ঘর। ভিতর হইতে একটা উচ্চ হাসির শব্দ এবং অনেকগুলি লোকের গলা কাণে গেল। একটু বিস্মিত হইলাম। কিন্তু পরক্ষণে দ্বারের সম্মুখে আসিয়া নির্ব্বাক হইয়া গেলাম। আগের বারে এ ঘরটার ব্যবহার হইতে দেখি নাই। নানাপ্রকার আসবাবপত্র, টেবিল, চেয়ার প্রভৃতি অনেক জিনিষ একটা কোণে গাদা করিয়া রাখা থাকিত, বড় কেহ এ ঘরে আসিত না। আজ দেখি, সমস্ত ঘরটা জুড়িয়া বিছানা। আগাগোড়া কার্পেট পাতা, তাহার উপর শুভ্র জাজিম ধপ্ ধপ্ করিতেছে। তাকিয়াগুলোয় ওয়াড় পরানো হইয়াছে, এবং তাহারই কয়েকটা আশ্রয় করিয়া জনকয়েক ভদ্রলোক আশ্চর্য্য হইয়া আমার পানে চাহিয়া আছেন। তাঁহাদের পরণে বাঙালীর মত ধুতি পিরাণ থাকিলেও মাথার উপর কামদার মস্লিনের টুপিতে বেহারী বলিয়া মনে হইল। একজোড়া বাঁয়া-তবলার কাছে একজন হিন্দুস্থানী তবলচি এবং অদূরে বসিয়া পিয়ারী বাইজী নিজে। এক পাশে একটা ছোট হারমোনিয়ম। পিয়ারীর গায়ে মূল্যবান পোষাক ছিলনা বটে, কিন্তু সাজসজ্জারও অভাব ছিল না। বুঝিলাম, এটা সঙ্গীতের বৈঠক—ক্ষণকাল বিশ্রাম চলিতেছে মাত্র। এইবার বাবুটি আমার পরিচয় গ্রহণের উপলক্ষে নিজের পরিচয় দিতে লাগিলেন। তাঁর নাম রামচন্দ্র সিংহ। তিনি পূর্ণিয়াজেলার একজন জমিদার, দারভাঙ্গার মহারাজা তাঁর কুটুম্ব, পিয়ারী বিবিকে তিনি ৭।৮ বৎসর হইতে জানেন। সে তাঁর পূর্ণিয়ার বাড়ীতে ৩।৪ বার মুজরো করিয়া আসিয়াছে। তিনি নিজেও অনেকবার এখানে গান শুনিতে আসেন

কখন কখন ১০।১২ দিন পর্য্যন্ত থাকেন—মাস তিনেক পূর্ব্বেও একবার আসিয়া একসপ্তাহ বাস করিয়া গিয়াছেন, ইত্যাদি ইত্যাদি।"

তাহার বিমাতা যে ঘরে "বাবু" বসাইত তাহা—কি বন্ধু জানিতে পারিত না? গীতের মজলিসে রাজলক্ষ্মীর কুচর-নীতির ছলিত-কিনা সে সংবাদ কি তাহার সপত্নী-পুত্রের নিকট গোপন থাকিত? তাহাতে কি বন্ধু কিছু মনে করিত না! এই বিহারী জমিদারটি যে রাজলক্ষ্মীর গৃহে বাস করিত, রাজলক্ষ্মীর সৃষ্টিকর্ত্তা তাহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন কিন্তু বন্ধু তাহাতেও দোষ ধরিতে পারে নাই।

"আজ রাত্রে এখানেই থাকবে ত?

"থাকতে বল," থাকব।

"আমার আর বলাবলি কি। তবে তোমার হয়ত অসুবিধে হবে, যে ঘরটায় তুমি শুতে, সেটাতে—

"বাবু শুবেন?—বেশ আমি নীচে শোবো, তোমার নীচের ঘরগুলোওতো চমৎকার।"

এই বেহারী জমিদারটির সহিত রাজলক্ষ্মীর অনিন্দ্য নৈসসম্পর্কটা বোধহয় প্রথম পর্ব্ব লিখিবার সময় কবির মনে উদয় হয় নাই। রাজলক্ষ্মীর কুণ্ঠা জন্মিল কেবল শ্রীকান্তকে বসাইতে কিন্তু বেহারী জমিদারটির সহিত একত্র সহবাস করিবার সময়ে গ্রন্থকার এই বেশ্যা সতীর মনে কোন প্রকার কুণ্ঠা বা লজ্জা জন্মিতে দেন নাই। এই জাতীয় বেশ্যা-সমাজের সহিত যাহাদিগের পরিচয় আছে তাহারা মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করেন যে, এই সমাজে রাজলক্ষ্মীর মত চরিত্রের আবির্ভাব নিতান্ত অসম্ভব।

আধুনিক সাহিত্যের আর একটি সতীর চরিত্র শ্রীকান্তের দ্বিতীয় পর্ব্বে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার নাম অভয়া, নিবাস বালুচর, জাতিতে উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থ। যাহাদিগের মুর্শিদাবাদে নিবাস তাহারা সকলেই স্বীকার করিবে যে, মুর্শিদাবাদের মত রক্ষণশীল জেলা বাঙ্গালা দেশে আর নাই এবং সাহিত্যের প্রেম উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থসমাজে একেবারে নাই বলিলেই চলে। শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মুর্শিদাবাদের বালুচরের এই উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থ কন্যাটিকে বিংশতি শতাব্দীর "মডেল ভগিনী" সাজাইয়া উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থ সমাজকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করিয়াছেন সন্দেহ নাই। কিন্তু এখনও যাহারা মুর্শিদাবাদে বাস করে তাহারা হয় ত মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিবে যে, পরকীয়া প্রেম এখনও এই রক্ষণশীল জেলায় সাবেকীভাবের আছে, অভয়ার মত প্রোষিত ভর্ত্তিকা পতি বর্ত্তমানে উপপতি গ্রহণ করে কিন্তু তাহারা সাধারণ ভাবেই তাহা করে, অর্থাৎ—গোপনে নায়ক সমাগম আবশ্যক হইলে ভ্রূণহত্যা, লোকাপবাদে গৃহ-ত্যাগ এবং কলিকাতা অথবা কাশীগমন—ইহাই বাঙ্গালা দেশের পরকীয়া প্রেমের সনাতন রীতি এবং মুর্শিদাবাদ জেলায় এখনও এই রীতিই চলিয়া আসিতেছে। কবি শরৎচন্দ্রের কল্পিত এই উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থ কন্যা যে ভাবে উপপতির সহিত তুলসীপত্রের ব্যবধান রাখিয়া স্বামী-সম্ভাষণে বাঙ্গালা দেশ হইতে বর্ম্মায় গিয়াছিল তাহার বর্ণনা পাঠ করিলে সেকালের ধর্ম্ম যুদ্ধের কথা মনে পড়ে। অভয়ার স্বামীসন্ধান ও স্বামীগৃহে গমন অনেকটা মডেল ভগিনীর স্বামী চিকিৎসার অনুকরণ। সে বলিতে গিয়াছিল, "রে স্বামী পাষণ্ড, তুই যদি এখনই বর্ম্মীকে পরিত্যাগ করিয়া শান্ত-শিষ্ট কুকুরের মত আমার প্রত্যাগমন না করিস তাহা হইলে এখনই স্বর্গীয় প্রেমের নিদর্শন স্বরূপ রোহিণী দাদাকে আমার দেহ তক্ক-রূপ স্বর্গের সোপান দেখাইয়া দিব।" শরৎচন্দ্রের রোহিণীদাদার অভয়া বিরহ বর্ণন বড়ই মুখ রোচক এবং বিরহের বিদেহ উদ্যোতক, মদনানন্দ মোদক অথবা রাজকীয় ইয়াকুতি শুদ্ধ করিলেও ব্যক্তিবিশেষের এই রূপ উপকার হয় কিনা সন্দেহ।

অভয়ার স্বামী "ইতর" আর অভয়া "ধার্ম্মিকরোচি ভক্তমহিমা।" কবি অভয়ার এই "ইতর স্বামীকে মহিম আখ্যায় আখ্যাত করিয়াছেন, তাহার আচরণ ভদ্র বা অভদ্র কোন বাঙ্গালীই সমর্থন করিবে না, কিন্তু কবি শরৎচন্দ্র যাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহাও কোন বাঙ্গালী সমর্থন করিবে কিনা সন্দেহ, অবিবাহিত বাঙ্গালী হয়ত করিবে কিন্তু দেশের বা বিদেশের বিবাহিত ব্যক্তিমাত্রেই কবির এই উক্তিটি সমর্থন করিতে পারিবেনা:—

"আরও আছে। সে লিখিয়াছে, শুধু যে তাহার অর্দ্ধাঙ্গিনী এখনও পরের বাটীতে বাস করিতেছে তাই নয়; সে আজ পরম-বন্ধু পোষ্টমাষ্টারের কাছে জ্ঞাত হইয়াছে যে, কে একটা রোহিণী তাহার স্ত্রীকে পত্র লিখিয়াছে এবং টাকা পাঠাইয়াছে। ইহাতে হতভাগ্যের কি পর্য্যন্ত যে ইজ্জৎ নষ্ট হইতেছে, তাহা লিখিয়া জানানো অসাধ্য।"

ইহার পরেই অভয়ার রোহিণী "দাদা"র মাথুর গাহিয়া আধুনিক কবি ধন্য হইয়াছেন:—

"সেটা মাঘ ভাদরও নয়, শ্রাবণ ফাগুনও নয়,—কিন্তু শূন্য মন্দিরের চেহারা যদি কিছু থাকে তো, সেই আলো-অন্ধকারের মাঝখানে সেদিন যাহা চোখে পড়িল, সে যে এ ছাড়া আর কি, সে তো আজও জানি না। সব কটা

ঘরের ঘরণী হাঁ-হাঁ করিতেছে। শুধু রান্নাঘরের একটা জানালা দিয়া ধুঁয়া বাহির হইতেছে। তাহারই একটু আগাইয়া উঁকি মারিয়া দেখিলাম, উনান জ্বলিয়া প্রায় নিবিয়া আসিয়াছে এবং অদূরে মেঝের উপর রোহিণী হাঁটু পাতিয়া একটা বেগুন দুখানা করিয়া বসিয়া আছে। আমার পদশব্দ তাহার কাণে যায় নাই; কারণ কর্ণেন্দ্রিয়ের মালিক যিনি, তিনি তখন আর যেখানেই থাকুন, বেগুনের উপর যে একাগ্র হইয়াছিলেন না, তাহা নিঃসংশয়ে বলিতে পারি। আরও একটা কথা এমনি নিঃসংশয়ে বলিতে পারি। কিন্তু, নিঃশব্দে ফিরিয়া গিয়া একে একে সেই ঘরগুলার মধ্যে যখন দাঁড়াইলাম তখন মেঝের উপর স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম, সমস্ত সমাজ, সমস্ত ধর্মাধর্ম, সমস্ত পাপ পুণ্যের অতীত একটা উৎকট বেদনাবিদ্ধ রোহিণী সমস্ত ঘর জুড়িয়া যেন দাঁতে দাঁত চাপিয়া স্থির হইয়া আছে।' ইহাই আচার্য্য শরৎচন্দ্রের 'মাধুরী' কিন্তু এ মাধুরে রোহিণীর অবশ্য কামনা গোপন নাই কারণ বৈকুণ্ঠ কবি যে তাহে পূর্ণ পতির আকাঙ্ক্ষা পরমাত্ম ধ্যানে বিলীন করিয়া দিয়াছেন, আধুনিক কালে তাহা আর সম্ভব নহে। শরৎচন্দ্রের বর্ণনাটি অতি সুন্দর। কিন্তু তিনি এক তরফের কথা বলিয়াছেন, প্রতিবাদী দুশ্চরিত্র কুরূপ মহিষাকার স্বামীর কথাটা বলেন নাই। তাহার স্ত্রী যখন তাহার আশ্রয়ে গিয়াও উপপতির আকাঙ্ক্ষাটা পরিত্যাগ করিতে পারে নাই তখন সে সেই সতী সাধ্বীকে কশাঘাত করিয়া দূর করিয়া দিয়াছিল কিন্তু তাহার মানসিক অবস্থা কবি নিপুণ উকিলের মত ঘুরে রাখিয়া গিয়াছেন। সেই মহিষের মত অবস্থা যদি আমার হইত তাহা হইলে আমি মহিষের আচরণ অনুকরণ করিতাম। জগতে এইরূপ অবস্থায় স্বামী মাত্রেই সুচরিত্র দুশ্চরিত্র নির্ব্বিশেষে এইরূপ ব্যবহার করিয়া থাকে এবং ইহাই স্বাভাবিক কথাবার্তাটাও কিছু পরিমাণে অস্বাভাবিক হইয়াছে। কবি কিন্তু তাঁহার রসনিপুণতার সুমিষ্ট ঝঙ্কারে পাঠকের মনে "সাধ্বী সতী" অভয়ার, প্রতি যে শ্রদ্ধাকর্ষণ করিয়া দিয়াছেন তাহা অস্বাভাবিক তাহা অন্যায় এবং অমানুষিক।

ছলনাময়ী।

শ্রীমতি প্রভাবতী দেবী।

এদিন তার কদম তলায় বাজিয়ে উঠেনি বাঁশী।
দারুণ এ প্রেম-বিরহের জ্বালা,
বহিবে রাধিকা কতকাল আর,
বোঝেনাকি শ্যাম প্রেয়সী নহেসে, চরণ যুগের দাসী।
দূর হ'তে শুধু চাহিয়া রহে সে,
চোখে চোখ প'লে, কথা না কহে সে,
কদমের বনে লুকায় ছলায় মৃদুল মধুর হাসি।
রাধার পরাণ জ্বলে পুড়ে যায়,
বোঝেনা নিঠুর একি খেলা হায়।
দেখা দিয়ে তবু দেখিতে না দেয়, গলায় জড়ায় ফাঁসী।
তাই রাধা আজ কলসী ঠেলিয়া,
দিয়াছে ছলিয়া জলেতে ফেলিয়া,
যেন তাহা আজ যমুনা সলিলে আপনি গিয়াছে ভাসি।
নীরবে বসিয়া ঘাটের সোপানে,
রয়েছে কপট কাঁদিবার ভাণে,
ভাবিছে তাহার প্রাণের বঁধুয়া কখন সহসা আসি,
কাঁপায়ে পড়িবে সেই কাল জলে,
সাঁতার কাটিয়া যাবে অবহেলে,
কলসী তাহার আনি দিবে পুনঃ ঘষিয়া সলিল রাশি।
মুছাবে তাহার মিছা আঁখি জল,
চুমিবে তাহার কপোল কোমল,
বাঁধিবে তাহারে বাহুপাশে, তার বিষাদ আঁধার নাশি।

একটু পরিবর্ত্তন।

[শ্রীকালিদাস রায়।]

চর্ম্মলাগি হরিণীর মরণ,
দন্তলাগি মরছে হাতী
কেশের লাগি শিকারীরা চমরীদের মারছে বনে
তিনের জন্যই শ্বশুর বাড়ে জামাইয়েরা ঘরের কোণে।

বাসন্তী—

"হতাশ্বাস"

[চিত্র-শিল্পী—শ্রীযতেন্দ্রনাথ ঘোষ]

সহমরণ

(শ্রীমতি প্রভাবতী দেবী)

(১)

একটা 'ফাষ্ট কন্‌ফাইন্‌মেণ্টের সিরিয়স্ জেলিভারি কেসে' 'কল্' পেয়ে বাইরে বেরিয়ে গেছলুম, ফিরলুম রাত্তির দশটায়। কাপড় চোপড় বদ্‌লে কেলে হাত পা ধুয়ে এসে পরিশ্রম দেহটাকে সবে মাত্র ইজিচেয়ারে এলিয়ে দিয়েছি, এমন সময় মা ডাক্‌লেন, "সরো! ও সরো!"

আমি বোল্লুম, "কি মা?"

"একবারটী এসে শুনে যেতিস্ যদি।"

আলস্যভরে চোখ দুটী বুজে আস্‌ছিল, বোল্লুম, "আমি আর এখন উঠ্‌তে পার্‌ছিনে মা, শরীরটা ভাল নেই, তুমি এসে বোলে যাও বরং।"

মা-র প্রাণ, তখনি ছুটে এলেন; বোল্লেন, "হ্যাঁরা অসুখ কোরেছে তোর? কত বলি যে এত মেহনৎ করিস্‌নে, তাতো শুন্‌বিনে তুই!"

মৃদু হেসে বোল্লুম, "না মা, অসুখ করেনি কোনো, শরীরটা যেন কেন এলিয়ে প'ড়্‌ছে। সে যাক্, ডাক্‌ছিলে কেন তুমি?"

মা বোল্লেন, "ডাক্‌ছিলুম তোর জন্যে যে একটী মেয়ে অনেকক্ষণ ধ'রে দুইংরুমে ব'সে আছে।"

সবিস্ময়ে বোল্লুম, "মেয়ে!"

"হাঁ মা, ভদ্রঘরের মেয়ে বোধ হ'ল।"

আপ্রাণ চেষ্টা ক'রে গোয়াতীকে বাঁচিয়ে রাখ্‌লেও দিতীয়কে কিছুতেই বাঁচাতে পারিনি ব'লে মনটা বড্ড খারাপ ছিল, তাই বিরক্তিভরে মাকে বোল্লুম, "আমি এত রাত্তিরে আর কোথাও যেতে পার্‌বোনা মা, ব'লে দাওগে।"

"আমিতো ব'লেছিলুম মা! তা মেয়েটী বোল্লে তার কোন কেস্ নেই, শুধু তোমার সাথে দেখা কোত্তে চায়। দেখা না কোরে কিছুতেই যাবেনা সে।"

আমি চুপ ক'রে ভাব্‌তে লাগলুম; উঠ্‌তে যেন প্রাণ আর চাইছিল না।

মা আবার বোল্লেন, "মেয়েটীর মুখখানা বড্ড শুক্‌নো শুক্‌নো বোধ হ'ল। এই এক ঘণ্টার ভেতর আমায় পাঁচ বার তোর খবর জিজ্ঞেস কোরেছে। দেখ্‌গেনা মা একটী বার, কি চায়।"

উঠ্‌তেই হ'ল। বিরক্তিভরে আস্তে আস্তে দুইংরুমে চ'ল্লুম। মেয়েটী পেছন ফিরে জান্‌লা দিয়ে বাইরে চেয়ে ছিল, আমার পায়ের শব্দ পেতেই মুখ ফিরিয়ে চাইল।

এক মুহূর্ত্ত স্তব্ধ হ'য়ে থেকে আমি সবিস্ময়ে ব'লে উঠ্‌লুম, "অ্যা—অনু যে।"

অনিমা একটু ম্লান হাসি হেসে বোল্লে, "হ্যাঁ ভাই, আমি ভেবেছিলুম তুমি চিন্‌তে পার্‌বে না।"

আহ্লাদে তাকে বুকের ভেতর জড়িয়ে ধ'রে বোল্লুম, "চিন্‌তে পার্‌বো না! কিন্তু সত্যি ভাই, কতকাল পরে দেখ্‌লুম তোকে! আচ্ছা তুই ভেতরে না গিয়ে দুইংরুমে বসেছিলি কেন বল্‌তো?"

"এম্‌নি, তুই ছিলিনে তাই। সে যাক্, একটা বিশেষ কথা আছে তোর সাথে।"

তার হাত ধ'রে টেনে আমি বোল্লেম, "সে সব হবে'খন, আগে ভেতরে যাবি চল্। খেয়ে মেয়ে তারপর—"

বাধা দিয়ে অনিমা বোল্লে, "না ভাই, না। এক্‌নি যেতে হবে আমায়; বিশেষ কাজে তোর কাছে এসেছি।"

অনিমার পাংশুবর্ণ মুখখানা এতক্ষণ লক্ষ্য ক'রিনি, হঠাৎ দেখে চম্‌কে উঠ্‌লুম। বোল্লুম, "কি কাজ? তোর মুখখানা অমন দেখাচ্ছে কেন?"

"আমায় একখানা 'ইন্‌ট্রোডাক্‌সন্ লেটার' দিতে হবে ভাই।"

"ইন্‌ট্রোডাক্‌সন্ লেটার'। কিসের?"

"হাসপাতালে একজন রোগীর শুশ্রূষা কোর্‌বো।"

আশ্চর্য্য হ'য়ে বোল্লুম, "হাঁসপাতালে তোর কোন আত্মীয় আছেন নাকি! কত নম্বর ওয়ার্ডে?"

"আত্মীয় ঠিক্ নয় ভাই; ওয়ার্ড নং তিন।"

আমি ভাব্‌তে ভাব্‌তে বোল্লুম, "৩নং ওয়ার্ডে বোধ হয় একজন 'অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান' আছে, 'স্নব পক্স্'কেস্'; লোকটার 'ওয়াইফ' 'আনাটোরিয়ামে' ফেলে রেখে পালিয়েছিল। আর কেউ নেই তো!"

মুখ খানা নীচু ক'রে অনিমা বোল্লে, "তিনিই ভাই।"

আমি সবিস্ময়ে বোল্লুম, "তিনি! সেকি! ব্যাপারটা কি বল্‌তো?"

অধীরা হ'য়ে অনিমা বোল্লে, "সে সব এখন বল্‌বার সময় নেই ভাই, কাল হাঁসপাতালে গিয়ে সব শুনিস্। আমি আজ্‌কে এখানে পৌঁছেই হাঁসপাতালে গেছ্‌লুম। হাঁসপাতালের ডাক্তার একজন অপরিচিতাকে রোগীর কাছে থাক্‌তে দিতে ইতস্ততঃ কোর্‌ছিল, তাই তোর কাছে এয়েছি ভাই। চিঠিখানা লিখে যে এক্‌নি, শুধোশুধি দেরি করিস্‌নে।"

আমি আর বাক্যব্যয় না কোরে ডাক্তার বাবুর কাছে একখানা চিঠিলিখে দেল্লুম। এও লিখে দিলুম, যেন রোগীটার সাধ্যমত চিকিৎসার কোন ত্রুটী না হয়। চিঠি খানা অনিমার হাতে দিয়ে বোল্লুম, "কিন্তু না খেয়ে থাক্‌তে পার্‌বেনা ভাই, আমি খাবারটা পাঠিয়ে দেবো'খন, খেয়ো কিন্তু।"

অনিমা কোন কথা না ব'লে যাবার উপক্রম কোর্‌লো। আমি তাড়াতাড়ি বোল্লুম, "ওকি! যাচ্ছ যে? এই আঁধারে একা যেতে পার্‌বে কেন। দাঁড়াও না একটু, চাকরটাকে—"

যেতে যেতে মুখ ফিরিয়ে অনিমা বোল্লে, "কোন দরকার নেই ভাই, আমার কৃপা দেরি করাস্ নি। আসি তাহ'লে, কাল হাঁসপাতালে যাস্।"

বিদ্যুতের মত ছুটে অনিমা বেরিয়ে গেল। আমি ভাব্‌তে ভাব্‌তে বাড়ীর ভেতর চল্লুম "তাইতো। সেই 'অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান্‌টার' সাথে অনিমার কি সম্পর্ক থাক্‌তে পারে?"

(২)

অনিমার সাথে আমার প্রথম পরিচয় বেথুন কলেজে। আমরা দুজন এক সাথে আই এ ক্লাসে প'ড়্‌তুম। প্রথম দিন ক্লাসে এসে আমার পাশেই ব'সেছিল সে; আর সেই দিন থেকে আমাদের আলাপটা ক্রমে বন্ধুত্বে পরিণত হ'য়েছিল। আমরা রোজই এক সাথে ক্লাসে আস্‌তুম, এক জায়গায় ব'স্‌তুম, ছুটির পর আবার এক সাথে বেরিয়ে যেতুম; তাই ক্লাসের মেয়েগুলো ঠাট্টা ক'রে আমাদের নাম রেখেছিল 'জোড়াফুল'।

অনিমা আমাদের ক্লাসে লেখা পড়ায় সব চেয়ে ভাল মেয়ে না হ'লেও স্বভাব চরিত্রে তার মত ভাল আর একটীও ছিল না। তার স্বভাব ছিল ভারী মিষ্টি, ভারী নম্র। অন্যান্য মেয়েদের মত সে হাসাহাসি লাফালাফি কোত্তে মোটেই ভাল বাস্‌তো না; চপল কথাবার্ত্তায় ও ঠাট্টা বিদ্রূপে সে মোটেই অভ্যস্তা ছিল না; তাই আর কোন মেয়ের সাথে সে তেমন মিশ্‌ও খেতো না। আমি যে ক্লাসে খুব শান্ত মেয়েটী ছিলুম তা নয়, কিন্তু কি জানি কেন আমার সাথে তার বড্ড ভাব হ'য়ে গেছ্‌লো। স্বভাবটীর মত তার মুখখানাও ছিল ক্লাসে সবাইর চেয়ে সুন্দর।

অনিমার কাছে শুনেছিলুম, তার বাপ রেঙ্গুনে একটা মোটা মাইনের চাকরী করেন, আর দাদা কোল্‌কাতায় ব্যারিষ্টার। এতদিন সে রেঙ্গুনে বাপের কাছেই ছিল। সেখান থেকে প্রাইভেটে এণ্ট্রান্স পাশ ক'রে বেথুন কলেজে এসে আই এ ক্লাসে ঢুকেছে। এখন সে কোল্‌কাতার বাড়ীতে দাদার কাছেই থাকে।

একদিন ক্লাসে আস্‌তে একটু দেরি হ'য়ে গেছ্‌লো। সেদিন আমাদের প্রথম ঘণ্টায় রচিন অনুযায়ী ইংরিজি সাহিত্য ছিল। ইংরিজি পড়াতেন একজন ছোকরা প্রফেসর, নাম পরমেশ্বর বাবু। দেখতেও ঠিক্ তাই। তবে আমরা সাধারণতঃ তাকে ছোকরা বাবুই বোল্‌তুম। তাড়াতাড়ি ক্লাসে ঢুকে দেখ্‌লুম 'লেক্‌চার' আরম্ভ হ'য়ে গেছে; কিন্তু সেদিকে কারো বিশেষ হুঁস নেই। একটা চাপা হাসি ও ফিস্‌ফাস্ আওয়াজ ক্লাসে ভেসে বেড়াচ্ছে। আর এক পাশে অনিমা মুখ খানি রাঙ্গা ক'রে চুপচাপ

ব'লে আছে। আজ আর তার পাশে আমার বস্‌বার জায়গা ছিল না। আস্তে আস্তে গিয়ে যে মেয়েটীর পাশে ব'স্‌লুম তার নাম চপলা। সে নামেও চপলা কাজেও চপলাই বটে; চটুল হাসিতে ও কথা বার্ত্তায় তার সাথে কারো পার্‌বার যো ছিল না।

আমি তাকে জিজ্ঞেস কোর্‌লুম, "ব্যাপারটা কি ভাই? ক্লাসশুদ্ধ এত চাপা হাসি কেন?"

চপলা মুচকি হেসে বোল্লে, "জানো না? ছোকরা বাবুর সাথে তোমার অনিমার 'আশ্‌নাই' হ'য়েছে যে।"

সবিস্ময়ে আমি বোল্লুম, "কি রকম।"

"অনিমার আজকে আর 'রোল্ কল্' কোত্তে হয় নি; ছোকরা বাবুর সাথে চোখে চোখে একটু হাসির তেতর দিয়েই 'প্রেজেণ্ট স্যার'টা টেলিগ্রাফি হ'য়ে গেছে।"

কথাটা বিশেষ হ'ল না; অনিমা তেমন মেয়ে নয় তো।

ক্লাশের ছুটির পর অনিমাকে নিরিবিলি ডেকে নিয়ে বোল্লুম, "সত্যি ভাই?"

হাসিমাখা চোখে চেয়ে অনিমা বোল্লে, "কি সত্যি?"

"ছোকরা বাবুর সাথে নাকি তোর 'আশ্‌নাই' হ'য়েছে।"

অনিমার মুখখানা লজ্জায় রাঙ্গা হ'য়ে উঠ্‌লো; মৃদুস্বরে সে বোল্লে, "সত্যি।"

আমি হেসে বোল্লুম, "বটে! কি ক'রে 'লভ্'টা হ'ল শুনি? শুধু চোখে চোখেই না কি?"

মুখখানা নামিয়ে অনিমা বোল্লে, "না, উনি আমার 'প্রাইভেট্ টিউটর' যে।"

আমি সবিস্ময়ে বোল্লুম, 'প্রাইভেট্' টিউটর'! লেখা পড়ার সাথে সাথে প্রেমের পাঠও 'প্রাইভেট্লি' শিখিয়ে-ছেন বুঝি?"

অনিমা একটু হেসে আমার গাল টিপে দিলে।

আমি বোল্লুম, "তোর দাদা এ সব জানেন তো? না-কি লুকোচুরি চ'ল্‌ছে।"

"বাবা, দাদা, সবাই জানেন।"

"সবাই জানেন! তাহ'লে শুভকার্য্যটা নিশ্চয়ই শিগ্‌গির হ'চ্ছে; কবে হ'চ্ছে শুনি?"

অনিমা মৃদুহেসে বোল্লে, "তা এখনো ঠিক্ নেই ভাই, বোধ হয় বি-এ পাশ কর্‌বার আগে নয়।"

"আগে নয় কেন?"

আস্তে আস্তে অনিমা বোল্লে, "বাবার ভাই মত ভাই। বাবা ভাবেন, তার মেয়েটীর এখনো বিয়ের বয়েস হয় নি! সেকি। সে যে এখনো দুটী বছর রে। কোর্টশিপ্‌টা এতদিন চালাতে হবে?"

অনিমা একটু হাস্‌লো।

আমি গম্ভীর হ'য়ে বোল্লুম, "তা কিন্তু মন্দ নয়। The days of courtship are more pleasing than those of married life. আশায় আশায় দিনগুলো বেশ কেটে যাবে। আপাততঃ প্রেমের পাঠশালায় 'প্রাই-ভেট্‌লে'—"

আমার মুখ চেপে ধ'রে অনিমা বোল্লে, "কেষ্ট! চুপ কর্ ব'ল্‌ছি।"

আমি হেসে বোল্লুম, "কিন্তু এ সব কথা তো তুই এত-দিন আমায় বলিস্ নি ভাই।"

অনিমা চোখ ঘুরিয়ে বোল্লে, "ব'লিনি—বেশ ক'রেছি। এখন বোল্লুম তো?"

এমন সময় অঙ্কের প্রফেসরকে ক্লাসে ঢুক্‌তে দেখে আমরা তাড়াতাড়ি উঠে প'ড়্‌লুম।

(৩)

তারপর আই-এ পাশ ক'রে আমি মেডিকেল কলেজে ঢুকে পড়্‌লুম, অনিমা বেথুনেই বি-এ পড়্‌তে লাগ্‌লো। আমি কলেজ হোষ্টেলে থাক্‌তুম, কাজেই অনিমার সাথে দেখাশুনো হবার বিশেষ কোন সম্ভাবনা ছিল না। মাঝে মাঝে তার দু একখানা ছোটখাট চিঠিতে কিছু কিছু খবর পেতুম মাত্র। তাতে জেনেছিলুম, শরদিন্দু বাবু তখনো তার প্রাইভেট্ টিউটর ছিলেন এবং অনিমা বি-এ পাশ না করা অবধি থাক্‌বেন। কিন্তু বছর দুই পরে তার চিঠির সংখ্যা আস্তে আস্তে কমে একদিন একেবারে বন্ধ হ'য়ে গেল; দুই তিন খানা লিখেও একছত্র, উত্তর পেলুম না। মনটা খুব খারাপ হ'য়ে গেল, কিন্তু রোজ গিয়ে দেখা ক'রে আস্‌বো ভাব্‌লেও কার্য্যগতিকে ঘটে উঠ্‌তো না।

সবেমাত্র ডাক্তারি পাশ করে বেরিয়েছি এমন সময়

হঠাৎ একদিন অনিমার সাথে দেখা হ'য়ে গেল। সেদিন রোববার। মেডিকেল কলেজের কয়েকটী মেয়ে 'ইডেন-ফ্রেণ্ড' সাথে বিকেল বেলা 'ইডেন গার্ডেনে' হাওয়া খেতে গেছলুম। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ব্যাণ্ডের বাজনা শুনছি, এমন সময় হঠাৎ দেখলুম একটু দূরেই অনিমা বেড়িয়ে বেড়াচ্ছে, পাশে একটী সাহেব-বেশী ভদ্রলোক। সঙ্গিনীদের দাঁড়াতে ব'লে তাড়াতাড়ি এগিয়ে পেছন্ থেকে অনিমার হাতখানা চেপে ধ'রলুম। চম্‌কে উঠে মুখ ফিরিয়ে অনিমা হেসে বোল্লে, "ও—তুই।"

আমি হেসে বল্লুম, "তাও যে ভাল ভুলে যাস্‌নি! মাইরি! কতকাল্ পরে দেখা হ'ল তোর সাথে বল্ দেখি?"

অনিমা মৃদু হেসে বোল্লে, "ঠিক্ দু'টী বছর।"

পাশের ভদ্রলোকটীর পানে একবার চেয়ে অনিমার কাণে কাণে বোল্লুম, "সঙ্গে ইনি কে ভাই? দাদা?"

মৃদুস্বরে অনিমা বোল্লে "হুঁ।"

"চল্‌না ভাই, একটু নিরিবিলি গল্প করিগে।"

অনিমা আস্তে আস্তে বোল্লে, "আচ্ছা দাঁড়া, দাদাকে ব'লছি। "তারপর মুখ ফিরিয়ে বোল্লে, "তুমি একটু একলাটী বাজনা শোনগে দাদা; না হয় বরং বেকে বোসোগে যাও। আমরা দুজনে একটু বেড়াতে যাচ্ছি কিন্তু।"

অনিমার দাদা বোল্লেন, "ইনি কে অনি? চিন্‌তে পাল্লুম না তো!"

অনিমা হেসে বোল্লে, "তুমি চিন্‌বে কোত্থেকে শুনি? এ আমার 'ক্লাস মেট্' যে। বেথুনে এক সাথে পড়তুম।"

অনিমার দাদা হেসে বোল্লেন, "হু—বুঝেছি, তোর বন্ধু। বেশতো, যা না বেড়িয়ে আয়গে, আমি ঐ বেঞ্চটায় ব'স্‌ছি।"

"কিন্তু কোথাও যেও না যেন।"

"না রে পাগলি! কোথাও যাব না, তুই যা।"

একটা গাছের আড়ালে একখানা ছোট বেঞ্চে দু'জন এসে নিরিবিলি ব'স্‌লুম। অতদিন পরে দুজনে দেখা,—কত হাসি গল্প হ'ল, কত ছোট বড় মনের-কথা সুখ দুঃখের কথা হ'ল। অনিমা বোল্লে, তার তখনো বিয়ে হয়নি, কারণ শরদিন্দুবাবু প্রায় তিন বছর হ'ল বিলেত গেছেন। তাঁর বাবার প্রথমতঃ মত ছিল অনিমা বি এ পাশ কোরেই শরদিন্দুবাবুর সাথে বিয়ে দেবেন; কিন্তু শেষে তিনি মতটা বদ্‌লে ফেলেছিলেন। অনিমা বি এ পাশ কোরে তিনি ভাবী জামাইটীকে ব্যারিষ্টার ক'রে আন্‌বার জন্য উৎগ্রীব হ'য়ে পড়লেন। শরদিন্দুবাবুরও বার্-এট-ল হবার বিশেষ আকাঙ্ক্ষা ছিল বটে, কিন্তু তার ও অনিমার মায়ের দুজনেরই ইচ্ছে ছিল বিয়েটা যাতে আগে হ'য়ে যায়। অনিমার বাবা একটু একগুঁয়ে প্রকৃতির লোক। তিনি গোঁ ধ'রলেন ব্যারিষ্টারী পাশ না কোরে বিয়ে কিছুতেই হবে না; কাজেই শরদিন্দুবাবু ভাবী শ্বশুরের কথামত বিলেত গেছেন। খরচপত্র সবই দিচ্ছেন অনিমার বাবা।

সব শুনে আমি হেসে বোল্লুম, "তাহলে তোর হারানো মাণিকটী আবার কবে ফিরে আস্‌ছেন ভাই?"

অনিমা হেসে বোল্লে, "পরীক্ষে তো হ'য়ে গেছে; বোধহয় এই আস্‌ছে জানুয়ারীতে আস্‌বেন।"

"নেমন্তন্নের চিঠিটা দিতে ভুলিসনি যেন।"

অনিমা হেসে বোল্লে "না না ভুল্‌বো না। তুই এখানেই থাকবি তো?"

"না ভাই, আমি ৪।৫ দিনের ভেতর ওয়াল্‌টেয়ার যাচ্ছি যে; সেখানে চ্যারিটেব্‌ল্ ডিস্‌পেন্‌সরিতে কাজ পেয়েছি একটা। তুই চিঠি লিখিস্ কিন্তু।"

অনিমা মাথা নেড়ে বোল্লে, "আচ্ছা।"

"হ্যাঁ ভাল কথা, তোকে চিঠি লিখ্‌লে উত্তর দিস্‌নে কেন বল্ দেখি? মনটাতো থাকে বিলেতে, হাতটাতো কাছেই থাকে, না—কি?"

"সময় পাইনি ভাই, কিছু মনে করিস্ নি।"

আমি হেসে বোল্লুম, "সময় পাওনি! বরের কাছে লম্বা লম্বা 'লভ্ লেটার' লিখ্‌তে খুব সময় পাও, না? এক সঙ্গে কখানা করে 'রঙ্গের মেল্' এসে থাকে শুনি?"

মুখখানা শুক্‌নো কোরে অনিমা বোল্লে, "অনেক দিন পাইনি ভাই—প্রায় তিন মাস।"

আমি সবিস্ময়ে বোল্লুম, "তিন মাস! কেন ভাই অতদিন চিঠি লেখেন নি কেন?"

"কি জানি ভাই বুঝ্‌তে পাচ্ছিনে কিছু।"

আমি অনিমাকে প্রবোধ দিয়ে বোল্লুম, "ও কিছু নয়, তুই ভাবিস্‌নি। পড়াশুনোর বন্ধে লিখ্‌তে পায়েন নি বোধ হয়।"

• • • •

তার ঠিক এক বছর পরে অনিমার সাথে দেখা হ'ল এই আশ রাস্তিরে।

(৪)

পরদিন ভোরে উঠে হাসপাতালে চ'ল্লুম। অনিমাকে অত রাস্তিরে ওরকম অবস্থায় হঠাৎ আস্‌তে দেখে মনটা ভারী খুৎ খুৎ কোচ্ছিল। কত রকম ভাব্‌না চিন্তে এসেই যে বুকটা তোলপাড় করে তুলছিল তার ঠিক নেই।

হাসপাতালে গিয়ে আগেই সোজা ৩ নং ওয়ার্ডে গেলুম। আমি ঘোরের কাছে যেতেই ডাক্তারবাবু ও একজন পুলিশ ইন্‌স্পেক্টর এগিয়ে এলেন। ডাক্তারবাবু শুদ্ধস্বরে বোল্লেন, "রোগীটি কাল রাস্তিরে মারা গেছে। আর আপনি যাকে পাঠিয়েছিলেন, সেই মেয়েটী 'প্রুসিক এসিড' খেয়ে 'সুইসাইড' (আত্মহত্যা) কোরেছে।"

আমার মাথাটা ঘুরে উঠ্‌লো, চোখে অন্ধকার দেখ্‌লুম। অনেক কষ্টে নিজেকে সাম্‌লে নিয়ে জোর করে দাঁড়িয়ে বোল্লুম, "সুইসাইড!' কেন?"

ডাক্তারবাবু বোল্লেন, "ব'লতে পারিনে। কাল রাস্তিরে ৩টার সময় ওষুধ খাওয়াতে এসে একজন নার্স দেখ্‌লে, ঐ অ্যাম্পুলো ইঞ্জিয়ান্‌টা আর ঐ মেয়েটী পাশা-পাশি ক'রে প'ড়ে র'য়েছে।"

আমি বজ্রাহতের মত চুপ ক'রে র'ইলুম।

ইন্‌স্পেক্টরবাবু আমার হাতে একটা খামে আঁটা চিঠি দিয়ে বোল্লেন, মেয়েটী মরবার আগে এই চিঠিখানা লিখে রেখে গেছে। চিঠিটা আপ্‌নারই নামে বোধহয়?"

অনিমার হাতে লেখা আমার নামটার চোখ বুলিয়ে নিয়ে আমি বোল্লুম, "হাঁ—আমারই।"

"প্রাইভেট কিছু থাক্‌তে পারে ভেবে আমি এটা খুলিনি, আপ্‌নার অপেক্ষা কোর্‌ছিলুম। পড়ে দেখুন তো, এর ভিতর কিছু পাওয়া যায় কি না।"

আমার হাতটা কাঁপ্‌ছিল। কোন রকমে খামটা ছিঁড়ে চিঠিটা বের্ ক'রে নিয়ে আমি মনে মনে পড়্‌লুম :—

ওয়ালটেয়ার
হাসপাতাল।

ভাই দরোজ,

আমি আত্মহত্যা ক'রেছি শুন্‌লে তোর বোধহয় খুব কষ্ট হবে; কিন্তু সব কথা ভেবে তুই বুঝ্‌তে পার্‌বি যে এ ছাড়া আর কোন উপায় আমার ছিল না। আমার জীবনের অনেক কথাই তুই জানিস্ ভাই, শেষের কটা কথাও তোকে বলে যাই; সব শুনে আমায় ক্ষমা করিস্।

আট বছর ধ'রে তাকে স্বামী ব'লেই মেনেছিলুম। সবার সাম্‌নে শুধু মন্ত্রটা প'ড়ে নেয়াই বাকী ছিল, তাকে আর কিছুই দিতে বাকী রাখিনি তো! মনে মনে দিন রাত কত সুখের ছবি আঁকলুম, কত সোণালী স্বপনে প্রাণটাকে ভরপুর করে রাখলুম তা তুই জানিস্। কিন্তু তার ভেতর যে এতটুকু অনিশ্চয়তার ছায়াও থাক্‌তে পারে তা কোনদিন কল্পনায়ও ভাব্‌তে পারিনি।

ভাই, তোর বোধ হয় মনে আছে একদিন 'ইডেন গার্ডেনে' তোকে ব'লেছিলুম তিন মাস তার চিঠি পাইনি। তাই আমাকে সান্ত্বনা দিবার চেষ্টা ক'রেছিলি, কিন্তু আমার মন তাতে একটুও প্রবোধ মানেনি। সেই থেকেই একটা অজানা আশঙ্কায় আমার বুকটা কেঁপে কেঁপে উঠ্‌ছিল। চিঠি দিতে কোনদিনই তিনি অমন অবহেলা করেননি তো! যাহোক্ কুভাবনাগুলি দুহাত দিয়ে ঠেলে ধরে তার আসার আশায় উৎগ্রীব হ'য়ে দিন কাটাতে লাগ্‌লুম।

জানুয়ারী মাসে তিনি এলেন। কিন্তু একা নয়। সাথে এল তার চিরসঙ্গিনী এক বিদেশিনী যুবতী! আমার প্রাণে যে আঘাত লাগ্‌লো তা তোকে আমি লিখে বোঝাতে পার্‌বো না। আমার বিয়ে হ'ল। সত্যি আমার বিয়ে হ'ল! কিন্তু তার সাথে নয়, জীবন ভরা দুঃখ, কষ্ট, অশান্তির সাথে। একবার ভাব্‌লুম, মরণকে বরণ ক'রে নি; কিন্তু তা পারিনি, কারণ তাহ'লে তাকে আর দেখ্‌তে পাবো না তো। কিন্তু তাকে আমি কিছুতেই দোষী ক'র্‌তে পারিনি ভাই! তার ওপর আমার ভালবাসা তাকে দোষী কোর্‌তে দেয়নি।

আমার মনে হ'ত বাবাই এজন্য দোষী। বিলেত যাবার আগে বিয়ে হ'লে তো এমনটা হ'তে পারতো না; আর তিনিও তো তাই চেয়েছিলেন।

'এল্‌গিন রোডে, একটা মস্ত বাড়ী ভাড়া নিয়ে তিনি হাইকোর্টে প্র্যাক্‌টীস্ আরম্ভ করেন। বাবার মোটর নিয়ে আমি রোজ তার বাড়ীর পাশে বেড়াতুম, যদি তার মুখখানা একবারটী দেখতে পাই। মাঝে মাঝে নিমেষের জন্য দেখতে পেতুম তাকে। মাঝে মাঝে ভাবতুম, দূর ছাই আর ঘোরোনা, ঐ অতটুকু দেখে কি লাভ। কিন্তু নিজেকে কিছুতেই সাম্‌লে রাখতে পারতুমনা। কি একটা প্রবল আকর্ষণ মন্ত্রমুগ্ধের মত আমায় রোজ টেনে নিয়ে যেতো। হঠাৎ একদিন শুনলুম তিনি সেখানে নেই; মেমসাহেবের স্বাস্থ্য খারাপ হওয়ায় তাকে ওয়াল্‌টেয়ারে হাওয়া বদ্‌লাতে নিয়ে গেছেন। মাঝে মাঝে একটু চোখের দেখা থেকেও বঞ্চিতা হ'য়ে হতাশ হ'লুম, মনকে প্রবোধ দিলুম তার সুখেই আমার সুখ।

আমার বাবার এক বন্ধু ওয়াল্‌টেয়ার বেড়াতে এসেছিলেন। তিনি কোল্‌কাতায় ফিরে গিয়ে কালকে যা বল্লেন তাতে আমার মাথায় বাজ ভেঙ্গে পড়্‌ল, আমার পায়ের তলা থেকে পৃথিবীটা যেন আস্তে আস্তে কোথায় সরে গেল। তিনি বল্লেন সেই বিদেশিনী রাক্ষসীটা আমার তার স্বামীকে বসন্তের মুখে ফেলে রেখে কোথায় পালিয়েছে। তিনি এখন ইন্দোরাতালে। আমি থাকুমনা, কিছুতেই থাকতে পারুমনা তাই! বাবা কোর্টে চ'লে গেলে আমি সাবলের মত ছুটে বেরুলুম। আসবার সময় খানকটা প্রুসিক্ এসিড্ নিয়ে এসেছিলুম; কি জানি যদি—যদি দরকার হয়। তারপর কি হ'ল তুই এসেই দেখতে পাবি ভাই।' মনুবার আসে উনি আমায় চিন্‌তে পেরেছিলেন। আশীর্ব্বাদ করিস্ ভাই ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করিস্ যেন পরজন্মে আমাদের মিলন হয়। ইতি

তোর অণিমা

চিঠির সাথে আর একখানা ছোট 'কন্‌ফেসন্ লেটার' ছিল তাতে লেখা ছিল :—

ওয়াল্‌টেয়ার ইন্‌সাভাল

আমি স্বইচ্ছায় প্রুসিক এসিড্ খেয়ে আত্মহত্যা কোরুম। এজন্য আমি ছাড়া আর কেউ দায়ী নয়।

শ্রীমতী অণিমাবালা বসু

'কন্‌ফেসন লেটার' খানা ইন্‌স্‌পেক্‌টরের হাতে দিয়ে আমি মুক্ত দ্বার বন্ধ ঘরের ভেতর ঢুকে পড়লুম। দেখলুম শরদিন্দুবাবুর মৃত দেহটাকে বুকের ভেতর জড়িয়ে ধ'রে অণিমা নিশ্চল পাথরের মত প'ড়ে রয়েছে; তার মুখের ওপোর একটা প্রচ্ছন্ন শান্তির আলো। হায়রে অভাগিনী।

পেছন্ থেকে ইন্‌স্‌পেক্‌টরবাবু জিজ্ঞেস কোরেন, "এই মেয়েটী ওই 'আংলো-ইণ্ডিয়ানের কে হন?"

রুমাল দিয়ে চোখের সাগর মুছ্‌তে মুছ্‌তে আমি কেঁদে উঠে বোলুম, "স্ত্রী।"

পারস্য-পরাগ

(সা'দীর ফারসী হইতে)

[মহম্মদ আব্‌দুল হক]

সজ্জন সাথে মিত্রতা যদি চাহ তুমি করিবার,
যত করিলে মন্দ করিলে করো তার উপকার।
তিক্তের মুখে শুনিবে না কভু মিষ্ট মধুর কথা,
সেই আচারে তুষ্ট করিয়া নষ্ট করো সে তিক্ততা।

নারীর সৌন্দর্য্য

(Pope)

[শ্রীচণ্ডীচরণ মিত্র।]

সৌন্দর্য্য সে নয় অধরে
কিম্বা নারীর চোখের কোণে।
একটি-শুধু সাহচর্য্য তার
থাকা যে'যায় মধুর ব'লে।

লটারী

(শ্রীশ্রীপতিপ্রসন্ন ঘোষ)

(প্রভাত)

"রমেশদা, একখানা ডার্বির টিকেট কেন।"

"গরীবের আবার হাউয়োগ। আমি কিনব লটারীর টিকেট। তুই পাগল হলি না কি বিনয়।"

"বরাতের লেখা কে বলতে পারে? হতে পারে তুমিও দশ লাখ মেরে দিতে পার। আমি জানি তুমি কিনবে না। তোমার নামে আমিই একখানা টিকেট কিনেছি। এখানা বন্ধ করে রেখে দিয়ো কিন্তু রমেশদা।"

"ওগো সুরেশের মা, দেখে যাও তোমার বিনয়ের পাগলামো। সে আমার নামে একখানা লটারীর টিকেট কিনেছে। এই নাও টিকেট, খুব যত্ন করে সাবধানে ট্রাঙ্কে এক্ষুণি রেখে যাও। ও কি কর, হাতটা ভাল করে পুছে নাও, টিকেটে যেন আবার জল না লাগে।...

বরাত-টরাত আমি মানিনে। বরাতের খেলা খেলে খুনো করে ফেলেছি—দেখেছি—ওটা আর কিছুই নয় ভাহা ফাঁকিবাজী। তবে আজকে তোর এ টিকেটের দাম আমার কাছে হাজার কোটী টাকা। ওর ভেতর ভাই বিনয়, তোর মহত্বের কি ছাপ ফুটে উঠেছে সে শুধু আমার প্রাণই জানে তোকে আশীর্ব্বাদ করবার অধিকার আমার নেই। জীবনটা যার সব দিক দিয়ে ব্যর্থ হয়েছে তার আশীর্ব্বাদে তোর অমঙ্গলই হতে পারে। তবে ভগবান্ বলে যদি কেউ থাকেন, তিনি যেন তোর মহত্বের সম্মান করেন।"

"তুমি যদি রোজ রোজ ঐ একই কথা বল তাহলে আর কক্ষণো তোমার বাড়ীতে আসবো না রমেশদা। ভুলে যেও না তুমি যে আমার দাদা।"

• • • •

বরাতের ওপর রমেশের একটা বিজাতীয় ক্রোধ থাকা অসঙ্গত নয়। ওই জীবনটা নিয়ে বরাত অনেক খেলা খেলেছে এবং সব খেলাতেই রমেশ নির্দ্দয়ভাবে পরাজিত। ওই জীবনের ওপর এখন আর বরাতের কোন লোভ নেই—জীবনটার সব রস সে শুষে নিয়ে নেমে গেছে মাত্র কয়েক খানা হাড়। ওই পাঁজরগুলিই দারিদ্রের চাপরাশ এঁটে খুব ঘটা করে জীবনটাকে মরণের মুখের কাছে আগলিয়ে ধরে বসে আছে। ডাক আসবে শুধু কখন?

(মধ্যাহ্ন)

"রমেশ দা, বাজীমাৎ। একেবারে দশ লাখ টাকা। এই দেখ ইংরাজী কাগজে বড় বড় হরফে বের হয়েছে—

Derby winner Ticket No 3333

দেবদেবতা কেউ বলতে পারে না কখন কার বরাত ফাটে। এখন আর কি তোমার জীবনের সব হায় আপশোষে গঙ্গার জলে ভাসিয়ে দাও।"

"আরে থাম বিনয় থাম। আগে টিকেটের নম্বরটাই ভাল করে দেখে নি।.....ও গো সুরেশের মা, এদিকে একবার এস। কাণে কি কথা যায়ই না। রান্না কোরছ না—আমার শ্রাদ্ধের পিণ্ডি যোগাচ্ছ। ওসব চুলোয় যাক সেই টিকেটটা বের কর।

কি? টিকেট পাওয়া যাচ্ছে না। হায় হায় সর্ব্বনাশ হল। ট্রাঙ্কের ভেতর হতে টিকেট যায় কি করে। খোঁজ খোঁজ ভাল করে খোঁজ। তোমাকে ঘরে আনার পর যদি এক দিনও শান্তি পেয়ে থাকি। কি লক্ষ্মীই কপালে আমার জুটেছে—যে কাজে হাত সে কাজই পণ্ড।

পাওয়া গেছে? দেখি দেখি। এইত নম্বর "৩৩৩৩" হাঁ কত টাকা দিয়ে ভাই বিনয় টিকেটটা কিনেছিল? দশ টাকা? সত্যি বলছি টাকাটা পেলেই তোর টাকাটা দিয়ে দেব। তোর ওই দশ টাকা ফাঁকি দেওয়ার মানুষ রমেশ সরকার নয়।"

"সে কি কথা রমেশ দা, তুমি কেন ওই দশ টাকা আমাকে ফিরিয়ে দেবে। ওটা যে টিকেট কেনার সঙ্গে সঙ্গেই শোধ হয়ে গেছে।"

"তাকি হয় বিনয়! তোর এমন ভরা সংসার। আর

এমন কিছুই জমা নেই। এভাবে চললে যে দুদিনেই ফতুর হয়ে যাবি।"

• • • •

সুরেশের মা আদরের সুরে স্বামীকে জানাইল—"আমি মানত করেছি এবার ভাল করে মা'র পুজো কোরব—জোড়া মোষ বলি দোব।"

"তা, আমি কি কোন আপত্তি করেছি। টাকাটা হাতে পেয়ে নি;—এক জোড়া মোষ বলি দিয়ো। আমার বেশ ছেলেটা বাই ধরেছে একটা সোনার রিষ্ট ওয়াচ চাই। ছেলে বড়লে এবার সখও হবেই। টাকাটা পেয়ে নি সব হবে,—দেখো কিছু বাদ যাবে না।"

বেণী ঘোষালের কাছে সে দিন তিনটি টাকা ধার চেয়েছিলেম,—ব্যাটা কিনা ত্রিশটা মুখ ভেংচী দিলে। এখন চাদ। দেখে নেব—সব দেখে নেব। কিছু ভুলি নি। আর বিনয়ের কাণ্ডটা দেখেছ। দুদিনের ভেতর একবারও আসেনি। কাল বাজারে দেখা হয়েছিল—আমাকে দেখেই মুখখানা আমসী করে চলে গেল। জলুলে হবে কি? ধার পাওয়ার বরাত সে পাবেই। বিনয় ভেবেছিল, সে ছাড়া আমাদের ত্রিসংসারে আর কেউ নেই। আরে টাকার অমন অনেক বিনয় মেলে। টাকা কি এমনি চিজ, দুনিয়া হয় উনিশ বিশ।"

(সন্ধ্যা)

"এই যে বিনয়। হাতে ওটা কি কাগজ রে? ভাল কথা, আমাদের টাকাটা কিগ্‌গির পাব না?"

"রমেশ দা, কাগজে আজ একটা বড় দুঃসংবাদ আছে।"

"দুঃসংবাদ? আমাদের টাকা যে ব্যাঙ্কে থাকে সেটাত ফেল হয় নি?"

না, কোন ব্যাঙ্ক ফেল হয় নি। তবে আজ কাগজে বেরিয়েছে তোমার টিকেট লটারীর টাকা আর নি, ওটা ভুল সংবাদ। এই দেখ কাগজে আছে—

Derby winner

Ticket No 13333 and not 3333."

"শত্রুতা বিনয় শত্রুতা। গ্রামের লোক শত্রুতা করে এতটা করেছে। বিনয়, সত্যি আমি টাকা পাব না? আমি যে অনেক আশা করে ছিলেম ভাই। কি হবে তবে?.....আমার কেমন যেন করছে আমাকে ধর বিনয়। উঃ.....ও....."

• • • •

তারপর অনেকদিন চলে গেছে। রমেশের কথা স্মরণ করবার মত তেমন অবসর বড় কারুর নেই। নিয়তির কথা কেউ বলতে পারে না; ওভাবে মৃত্যুই হয়ত রমেশের কপালে লেখা ছিল—হয়ত সে নিয়মের ব্যতিক্রম হওয়ার কোন উপায় ছিল না। কিন্তু তবু লটারীর নাম শুনলেই বিনয়ের মনটা কেঁপে ওঠে। কেবলই মনে হয় ঐ টিকেটটাই ওর কাল হয়েছিল। ওটা কিনে না দিলেই হয়ত অভাগা ক'দিন বাঁচতে পারত। বাঁচত কি? কে জানে।

বুড়ো ক্লাব:—বুদাপেষ্টে বুড়োরা একটা ক্লাব করেছেন। সত্তর বছরের উপরে যাদের বয়স তেমনি বুড়োরাই এই ক্লাবের সভ্য হতে পারবেন। সেখায় বাল্য জীবনের সুখের দিনের গল্প করা হবে। আমাদের দেশে এমনি ক্লাব অনেক আছে, কলকাতা সহরে হেদো, গোলদীঘিতে যে কোন দিন গেলে, এই বুড়োদের ক্লাবের মজা দেখতে পাওয়া যায়। বাংলার গ্রামে গ্রামেও বুড়োদের এমনি ক্লাব দেখা যায়—তামাকের সঙ্গে সেখায় অনেক খোস গল্প আর অতীত জীবনের সুখ দুঃখ, সমাজ সভ্যতার কথা আলোচনা হয়ে থাকে।

চীন দেশে বিবাহ বিচ্ছেদের একটা নূতন আইন হয়েছে। স্বামী, শাশুড়ী দুর্ব্যবহার করলে এ জন্য বহু বিবাহ বিচ্ছেদ পেতে পারেন, আগে একটা আইন ছিল তার নাম ই-লি, এই আইন অনুসারে কোন স্ত্রী বেশী কথা বললে ঝগড়া করলে, শাশুড়ীর সম্মান না করলে, ও ঈর্ষাপরায়না হলে তার বিবাহ-বিচ্ছেদ হতে পারতো, সেই আইনের জায়গায় এই নূতন আইন হোল। কিন্তু এই বিবাহ বিচ্ছেদ হবার আগে পিতা মাতার অনুমতি নিতে হবে।

—•—

বসন্তী

শিল্পী—শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মজুমদারের সৌজন্যে.

"অন্ধের দৃষ্টি।"

শ্রীবিনয় চক্রবর্ত্তী

তুমি কাঁদছো কেন তারা?

আমার কি উপায় হবে অনিল? বড় ভয় হচ্ছে কি জানি কোন দিন কি হয়ে যায়।

কিসের উপায় তারা? কেন মিছে ভয় পাচ্ছো তুমি মনের মধ্যে ও-সব আলোচনা কোরোনা—ভয়ের কোনই কারণ নেই তোমার.....থাক থাক আমি আর শুনতে চাই না, আমার ভারী লজ্জা পাচ্ছে!

কিন্তু এ-যে একটা বড় ভীষণ পাপের কথা অনিল। তখন বুঝতে পারিনি—এখন যে সারা দেহটা 'ভরে' আমার একটা কুৎসিত গ্লানি জমে উঠেছে! কি করে এখন বাঁচাই নিজেকে কিছুই ভেবে উঠতে পারচি না।

যার উল্লেখ করচো সেটা যে খুবই খারাপ তা' আমিও এখন বেশ ভাল করে বুঝতে পেরেচি, কিন্তু কি করবো তারা তখন যে আমরা একেবারে অন্ধের মতো দুজনে দুজনকে ঠেলে বসেছিলাম!...যা হবার তা' তো হয়েই গেছে, এখন আমাদের পৃথক হওয়াই মঙ্গল নইলে শেষটা আর বাঁচবার কোন উপায়ই থাকবে না তা' বলে দিচ্ছি।

এখনি যা কি আছে তাও জানিনা। উনিশ বছরটাই দেখচি বিদ্রোহী হয়ে উঠে আমার এমন সর্ব্বনাশ করলে। ইচ্ছে করচে, এই মুহূর্ত্তে আমার এই ছাপিয়ে পড়া রূপ যৌবনটাকে নখের আঘাতে ক্ষত বিক্ষত করে' ফেলি। এ-সব কেন আমার গো!...তোমায় আর দোষ দেব কি আমি প্রথমে নিজেকে আড়া না দিলে তো তুমি অতখানি এগিয়ে আসতে সাহস পেতে না। তোমার পায়ে পড়ি অনিল, একটু জানি ভেবে দেখো কোন পথ আমার জন্য খোলা আছে কি না। কোথায় গেলে লোক-লজ্জার হাত হতে আমি নিস্তার পাব। ধরো, যদি আমার এই অভিশপ্ত গর্ভে একটা-কিছু এসে দেখা দেয়, তাহলে? আর সে যে খুবই সম্ভব অনিল। তুমি শুনলে হয় তো বিশ্বাস করবে না, সে দিনকার সেই বিজনের মুহূর্ত্ত থেকে আমি আহার নিদ্রা এক-রকম বিসর্জ্জন দিয়েচি—কেবলি মনে হয়েচে এই বুঝি আমার সর্ব্বনাশের পালা সুরু হোল, নরকের অতল তলে এইবার আমায় টেনে নিয়ে গেল গো! বল, বল অনিল, কি হবে আমার, কেমন করে' বাঁচবো আমি! তুমি পুরুষ, তোমার কোন কথাই নেই. যদি আমার বিশেষ কিছু ঘটতে দেখ, অনায়াসে দেশান্তরে গিয়ে নিজেকে লজ্জামুক্ত করতে পারবে। কিন্তু আমি মেয়ে মানুষ, অধীনা, আমি যাই কোথায় কার কাছে? এক আত্মহত্যা করা ছাড়া আর আমার কোন সুবিধাই নেই বোধ হয়! কিন্তু এই বয়সে মরতে যে ইচ্ছে করে না অনিল। তুমি যে প্রাণ দিয়ে আমায় ভালবেসেচ, সে তো আমি কোন দিনই ভুলতে পারবো না, মরতে আমি পারবো না অনিল, কিছুতেই না। আমার সাধ-ইচ্ছা এখনও যে সম্পূর্ণ সার্থক হয় নি গো।

তোমার প্রতি কথাই আমার মর্ম্ম স্থানে গিয়ে আঘাত করচে তারা, সবই বুঝতে পারচি আমি তবু তোমায় সাহায্য করবার কোন ক্ষমতাই আমার নেই।

নেই বল কি? যদি কিছু থাকে তাহলে সে এক মাত্র তোমারই আছে!

আমারই?

হ্যাঁ শুধু তোমারই। তোমার ভালবাসায় কি আমি অবিশ্বাস করতে পারি অনিল! তুমি এত করে' ভালবেসেচ বলেই না আজ তোমার ওপর আমার যা কিছু অধিকার। এখন তুমিই আমার স্বামী, আমার ইহ-কালের দেবতা।...আমাদের এই গুপ্ত মিলনে যে বিষ উঠেচে, যে পাপের লীলা প্রকট হয়েছে, তাকে আজ তোমারই কণ্ঠে সঞ্চিত রাখতে একান্ত অনুরোধ করচি আমি। ওগো আমার নারী-জন্মের সার্থকতা, আমাদের এ পাপকে, কলুষতার কাহিনীকে, গুপ্ত গুহ্য করে' তোল গো...আমাদের দুজনার গভীর ভালবাসা প্রাণ পেয়ে বাঁচুক।

সে কি কথা তারা? এ-সব হেঁয়ালীর মতো কি বলে' যাচ্ছ তুমি! আমি তোমার কি করতে পারি...তোমার দুটি হাতে ধরি আমার আর কিছুতে জড়িয়ো না···আমি ভুল করে দোষ করে ফেলেছি, ক্ষমা চাইচি তার জন্যে। এমন কি প্রতিজ্ঞা করচি যে, তোমার চোখের সামনে কিছুতেই নিজেকে প্রকাশ করবো না। তাহলেই সব চুকে গেল, কেমন?

চুকে গেল তার মানে! অনিল, প্রাণের অনিল, তুমি কি আমার একটা কথা ঠাওরালে? সব কথা মুখ ফুটে বলতে যে কত কষ্ট হয়, তা তো বুঝবে না—পাষাণ কি না! হা'রে, তবুও সে সব বলতে হবে! বলতে হবে—বলতে হবে—ওগো, তোমায় কি সমস্ত জীবন দিয়ে ভালবাসিনি? কত যে বেসেচি, তারই বিপুল আবেগে আমার জীবনের যা সব চাইতে বড় তাকে পর্যন্ত তোমার কাছে উৎসর্গ করে দিয়েচি! সেই তাদি প্রতিদান আজ এমন নিষ্ঠুরের মতো আমায় এই অসহায় অবস্থায় ফেলে যেতে চাইচো! যদি পরে কোন দিন তোমার অনুরাগের সৃষ্টি আমার মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পায়, তখন তাকে নিয়ে অবলা আমি কি করে' রক্ষা করবো! বড় হ'লে যখন সে তার জন্ম-দাতার কথা জানতে চাইবে, তখন কার কাছে তাকে এগিয়ে দেব আমি, কোন পুরুষের কোলে উঠে সেই নিষ্পাপ প্রাণীটি তার ন্যায্য আদর-অভ্যর্থনার দাবী করতে পারবে! আর সত্যই যদি তুমি আমায় ফেলে রেখে পালিয়ে যাও—ওঃ সে কি ভীষণ! আমি হব কলঙ্কিনী, আমারই বুকের রক্ত-দিয়ে-গড়া নিমিস আমাকেই ঘৃণা করতে শিখবে, তার নিজের জীবনকে সে ধিক্কার দিতে থাকবে, আর বলবে—পাষানী মা আমার আপনার পাপে পেটের ছেলেটাকেও অমনি করে' সমাজের বাইরে এনে ফেলেছে! ভাব দেখি, সে কি দুর্বহ অভিশাপ তাকে আজীবন ভোগ করতে হবে। ইহ-জীবনে কোন দিন-ই সে আর সমানের পাত্র হয়ে উঠতে পারবে না। আমার দুঃখের বোঝা যে কত ভারী আর অসহ এখন বুঝতে পারচো কি অনিল! তুমি স্বাধীন, তোমার ভয় কাকে? তুমি আমায় বিয়ে করে অনায়াসে আমাদের সকল কলঙ্ককে মহিমান্বিত করে তুলতে পারো! এই বুকের সবটা জুড়ে তোমার জন্যে যে মিনিস আছে, তার সমান তুমি দেখাতে পারবে না কি? ঐ যে তোমার চোখের কোণে দীর্ণ কাতরতার চিহ্ন ফুটে উঠেছে, ওকে কি আমি চিনি না, খুব চিনি। শুধু আমার দেহটাকে তো তুমি ভালবাসনি, মনে প্রাণেও এখথা আমি বিশ্বাস করতে পারবো না। ওগো আমার একমাত্র দরদী এত ছোট, এত হীন, তুমি নও। এমন তুচ্ছ রূপ ইচ্ছে করলে তুমি হাজার হাজার পেতে পারতে। তবে? তবে, জোর করে' এটুকু বোলবো যে, আমার মতন করে তোমায় কোন মেয়েই—। জাননা কি, কুমারীর অধম আমি! আমার এই বুকটা দশ বছর বয়েস থেকে তৃষিত হয়ে হাহাকার করে' মরেচে!

বিয়ে করবো; তোমায়? সে কি করে' হয় তারা? হিন্দু ঘরের বিধবা তুমি তা ছাড়া আমার দিকটাও একবার ভেবে দেখ। তোমায় বিয়ে করলে সংসার, সমাজ আত্মীয় পরিজন সকলকে ত্যাগ করে' আমায় অকূলে ভাসতে হবে যে! বিয়ে আমি কি করে—"

অনিল! অনিল!! কে বলে বিধবা আমি, কবেই বা আমার স্বামী ছিল? সে তো একটা স্বপ্ন, বোধ হয় তার চাইতেও অস্পষ্ট অর্থ শূন্য একটা কিছু! আমায় বিয়ে করতে কেন পার না তুমি? সমাজ সংসার সবাই তোমায় ত্যাগ করবে! আমাকেও তো তাই! আর সমাজই বা কিসের অনিল? নৈতিক বুদ্ধনে অবিদ্ধ হয়ে এখনও যদি সত্যের পথে চলতে পারি, সমাজের বুকের মাঝেই আমাদের স্থান করে' নেব আমরা! যা মানুষের ধর্ম, যা ন্যায়, কোন সমাজই তাকে ঠেলে ফেলতে পারে না!

সে না হয় বুঝলাম তারা, কিন্তু—

এর ভিতরে আর 'কিন্তু' নেই অনিল। শুধু একটা সন্দেহ তোমার প্রাণে জাগতে পারে আর তার জন্যে তোমায় কোন দোষও দেওয়া যায় না।

ভাবচো, হয়তো আমি তোমায় কাছে আসবার আগেও—। অনিল, আমার অন্তরের ইতিহাস যদি তোমায় খুলে দেখান সম্ভব হোত তাহলে দেখতে পেতে কার আসন সেখানে চির-প্রতিষ্ঠিত হয়ে রয়েছে...তুমি

তো বাইরের লোক নও, বছরের পর বছর আমায় দেখে এসেচে—তোমারই চোখের সামনে আমার যৌবন, সংসারিক অভিজ্ঞতা সকলি ধীরে ধীরে মুকুলিত পুষ্পিত হয়ে উঠেচে...উন্মুখ জীবনের নিগূঢ় আনন্দে অন্ধ দিশে-হারা হয়ে শেষটা তোমারই কাছে ছুটে গিয়েছিলাম আমার এই নারী-সুলভ অপূর্ণতাকে পূর্ণ করে নিতে। এ-জীবনের মাধুর্য্যমহিমা যা কিছু সবই নিঃশেষে তোমায় পান করিয়েচি, তোমার অন্তরের সৌরভটুকু পরিপূর্ণ ভাবে উপভোগ করেচিও! পরকাল আছে কি না জানিনা অন্ততঃ ইহকালটার জন্তে আমি একান্ত ভাবে তোমারই! ...আমায় তুমি ভুল বুঝোনা অনিল!

বেশ, তোমার কথাই না হয় মানলাম তারা। আমিও তো তোমার অগোচরে অনেক কিছুই—

সে হয় না অনিল, কিছুতেই হতে পারে না! তিল তিল করে' তোমার প্রাণের পরিচয় পেয়েচি আমি··· তুমি যে কত সুন্দর, আর কত পবিত্র ঘন ঘন তার উল্লেখ করে তোমার অপমান করতে চাই-না আমি। শুধু এইটুকু জানাতে চাই যে, তুমিই আমার ধ্যানের দেবতা তোমায় না পেলে আমি বাঁচতে পারবো না!...একটু একটু করে নরকের অন্ধকারে ডুবতে হবে আমাকে! এইযে পদস্খলন আমার আরম্ভ হয়েচে এরি প্রগাঢ় পঙ্ক থেকে প্রেমের মুক্তির পঙ্কজকে আমার উদ্ধার করতে চাই...ভেবেছিলুম, আমার প্রতি তোমার যখন এত অনুরাগ, তখন তোমার কাছে সরল ভাবে সকল কথা প্রকাশ করে' আমাদের দুটি জীবনকে এক সূত্রে গেঁথে তুলবো। কিন্তু সময় পেলুম কই? বুকের ভিতরে যে আমার এত বড় একটা বিষপ্রাসি সুপ্ত ঘুমিয়েছিল, আমি নিজেও বুঝি তা' জানতুম না। তাই সে দিনের সেই নির্জ্জন নিভৃত অবসরটা আমাকে একেবারে উন্মাদ করে ফেলেছিল... জ্ঞানের উন্মেষের প্রথম দিন থেকেই দাম্পত্য-জীবনের গভীর সান্নিধ্যে থেকে পিয়সী চাতকিনীর মতো কাটিয়ে এসেচি, কত সময়ে তার মধুর উত্তাপ আমার গায়ে এসে লেগে পাগল করে তুলেচে আমায়—অতি কষ্টে নিজেকে শান্ত করেচি। উপবাসী হৃদয় আমার তোমার মধোৎসবে দীন ভিখারীর মতো দুঃসহ বুভুক্ষা বুকে নিয়ে সাধারণের উপেক্ষা কঠিন দৃষ্টির সামনে বিনীত-নত হয়ে কেবলই ঘুরে মরেচে আর মাঝে আপনার দৈন্যটাকে-যশের কাছে এমন সুপরিস্ফুট দেখতে পেয়ে আপনার ভিতরে আপনি চমকে উঠে গাঢ় বেদনায় অভিভূত হয়ে মুখ গুজরে পড়েচে... তাই না সেই কাল রাত্রিতে আমি বিহ্বল হয়েছিলাম অমন উত্তেজনায় আমার সর্ব্বশরীর কাঁপছিল! উঃ সে কি বিপুল ভ্রান্তি, সংসার, সমাজ, জীবনের প্রতিষ্ঠা সব ভুলে গিয়ে লালসার ঘূর্ণাবর্ত্তে ঝাঁপিয়ে পড়া! আমার সে দিনকার সেই কামনার বহ্নিমূর্ত্তি মনে করে আমি নিজেই পরে শিউরে উঠেছি! রসাতলে যাবার সে এক দুর্জ্জয় আকর্ষণ...জ্ঞান হতে দেখলাম, কে যেন আমাকে সকল অঙ্গে লজ্জার কাল আবরণ জড়িয়ে দিয়েচে!

থাম, থাম তারা, আমিও যে অনুশোচনায় মরে যাচ্ছি! তুমি এতক্ষণ যে পাপের কথা বল্লে তার অর্দ্ধেক অংশের জন্ত আমিও যে দায়ী···আমার ভিতরেও যে তখন ঐ রকমই একটা প্রলয়-লীলা চলছিল! দোষী তুমি একাই নও—সমাজ না মানলেও আমি তা মানবো, এক-শ-বার! কিন্তু সে যা হোক, আমার উপর তোমার এই ঐকান্তিক বিশ্বাস দেখে আশ্চর্য্য হয়ে যাচ্ছি তারা'! দেখ, আমি শিক্ষিত হলেও আমার চেয়ে তোমার মনের জোর ঢের বেশী। পাপ কাজ করে ফেলে আত্ম-গোপন করবার জন্তেই আমি ব্যস্ত ছিলাম...বলতে কি তোমার কাছে আজ বিদায় নিতেই,—

বিদায় নিতে এসেছিলে! কিন্তু এখন আমার মুখে সব শুনে আর কি বিদায় নেবার প্রবৃত্তি আছে তোমার? আজ যা চরম কদর্য্যতার রূপ ধরে আমাদের চোখের সামনে জেগে রয়েছে, ইচ্ছে করলে কালই তো তাকে আমরা পবিত্রতার মঙ্গলের আবরণে ঢেকে ফেলতে পারি! এতে চাই শুধু তোমার অনুগ্রহ। এই জন্ম অভিশপ্তাকে তোমার চরণে একটু স্থান দাও, ওগো আমার ব্যর্থ জীবনের সফলতা! দেখ, তোমায় আমি সুখী করতে পারি কি না। বিনিময়ে কিছুই চাই না আমি, চাই শুধু সেই অমূল্য জিনিসটা যা আমাকে পাগল করে আশ্রয়চ্যুত করেচে, যা দিয়ে নারীর সকল রিক্ততা

পূর্ণ হয়! এর বেশী আর কিছুই নয়। বল, বল অনিল, প্রাণের গভীর সুখ আমার! কি উপায় আমার করতে চাও তুমি বল?

বলচি তারা, আগে আঁচল দিয়ে তোমার চোখেরকোণ দুটো মুছে ফেল। তোমার এই ব্যাকুলতা দেখে আমারও বুকের ভেতরটা বেদনায় আকুল হয়ে উঠচে—বেশ বুঝচি যে তোমায় ছেড়ে কিছুতেই দূরে থাকতে পারতুম না আমি। আমার প্রতি তোমার এই গভীর শ্রদ্ধা, একান্ত নির্ভরতা হৃদয়ে তোমার যে গভীর সুনিশ্চিত ভালবাসার প্রতিষ্ঠা করেচে, সারা-জীবন ধরে সাধনা করলেও এ রকম অপার্থিব বস্তু আর কোন নারীর কাছে পেতাম কি না সন্দেহ। কোন সংস্কার, সমাজের কোন অনুশাসনই তোমায় আমার প্রতি নিষ্ঠা-পরায়ণ হতে শিক্ষা দেয়নি বাধ্যও করেনি, দিয়েচে শুধু তোমার হৃদয়ের ধর্ম। অজানা তোমার নারী-প্রতিকার সন্ধানে বার হয়ে নিজেকে তো মুক্ত করলেই, সঙ্গে সঙ্গে আমাকেও বুঝিয়ে দিলে পাপের সুকঠিন শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়েও মানুষের শুদ্ধ পবিত্র হবার শক্তি কত বেশী!...আমিও তোমায় ভালবেসেচি তারা কিন্তু সে বড় সঙ্গোপনে, লজ্জার পরিমাণ তাতে বেশী ছিল, অবৈধ একটা কিছু করচি, এই চিন্তাটাই আমাকে খোঁচা দিয়ে এসেচে। যতই দিন যাচ্ছিল, নিজের কাছে এমন কি তোমার কাছে হয়ে পড়ছিলাম নীচ আর প্রতারক। বুকের ভেতরে যে ভালবাসা আমার ধীরে অঙ্কুরিত হচ্ছিল তার আর পুষ্টি সাধন হোল না কিন্তু সব জেনেও কি জানি কেন তোমার আকর্ষণকে কাটিয়ে উঠতে পারছিলাম না। মাঝে মাঝে তোমায় জড়িয়ে আমার ভবিষ্যৎ একটা ব্যাকুল অন্ধতৃপ্তি দিয়ে বুঝে উঠবার চেষ্টা পেতাম কিন্তু গোড়াতেই ভয়ে বুকটা আমার কেঁপে উঠতো—আমার স্বার্থ, সম্ভ্রম, লোক-লজ্জা, আগত জীবনের প্রতিপত্তি সমস্ত জিনিস-গুলোর শিকড় পর্য্যন্ত নড়ে উঠতো। তোমার মুক্তির কোন উপায়ই আমি ঠাহর করতে পারতুম না...আর তুমি, আমার চাইতে কত নিঃসহায়, কত সঙ্কটাপন্ন অথচ প্রাণের পরিচয়ে কত স্নেহপ্রবণ কত একনিষ্ঠ। পাপের অনুশোচনা তোমার প্রাণে পাপকে জয় করবার প্রবৃত্তিই এনে দিয়েচে শক্তি-হীনতায় তার মৃত্যু কবলে ঠেলে দেয়নি। বেশ তারা, তাই হবে। তোমায় আমার যে সম্বন্ধের সূত্রপাত হয়েচে একটা জলন্ত অগ্নিকুণ্ডের পাশে তা সহজ সুন্দর আর সুপ্রতিষ্ঠিত হবে পবিত্র বিবাহ জীবনের শীতল অবগাহনে। ...তারা, তারা, কি আর বলবো তোমায়, আমার মহুয়াটাকে পর্য্যন্ত তুমি ফিরিয়ে এনে দিলে। তুমি—

তারা?

কি, আমায় ডাকছিলে?

—হ্যাঁ ডাকছিলাম। তোমায় একটা কথা জিজ্ঞেস করবো ঠিক উত্তর দেবে তো, বল আমায় গা ছুঁয়ে।

দেব গো দেবো। এই তো ছুঁয়েচি...বিশ্বাস হয়ে গেল অমনি, এখন যদি সত্যি না বলি।

—সে হয় না তারা, এবার তোমায় আসল কথাটা বলতেই হবে।

—যাঃ, কেন?

—আমায় গা ছুঁলে যে!

—ছুঁয়েচি তো ছুঁয়েচি, তা' হয়েচে কি...তুমি তো আর ঠাকুর—দেবতা নও।

—আমি কিছুই নই তারা! তবু নিশ্চয় করে' বলচি, মিথ্যে আর তুমি বলতে পারবে না, কিছুতেই!

—কেন পারবোনা?

—কেন যে, সে তোমায় আমি বুঝিয়ে উঠতে পারবো না হয়তো, তোমার মনের কাছে জিজ্ঞেস্ করলেই তার ঠিক উত্তর পাবে, কিন্তু পারবেনা যে এ আমরা উভয়েই সমানভাবে জানি!

—বেশ পারবো না তো পারবো না! আমি তোমার সঙ্গে বাজে কথা নিয়ে তর্ক করতে চাই না, আমায় ডেকেচ কেন, এখন তাই বল!

—বলচি, আচ্ছা—

—ওই, ও-ঘরে খোকা বুঝি কাঁদচে, একটু দাঁড়াও গো, তাকে এখানে নিয়ে আসি.....খোকামণি, ওই পাজী লোকটাকে খুব করে বকে দাও। ও তোমার বাবা সঙ্গে দুষ্টুমি করে, তোমাকেও কিছু ভালবাসে না। এ্যা, এ্যা,

এ্যা...বকা হয়ে গেল। এবার আমার নাকটা খেতে আরম্ভ করে!...হ্যাঁ, কি বলছিলে, বলনা গো!

—বলছিলুম যে, তোমার আজকাল খুব কষ্ট হচ্ছে, না তারা?

—হ্যাঁ, খুব হচ্ছে...আমি এখন যাই!

—শোন, শোন।

—কি, আমার মাথামুণ্ডু শুনবো?

দেখদিকি, তোমার মুখ চোখ কি রকম ক্যাকাশে হয়ে গেছে। পরিশ্রমের তো আর কম নেই! এই মাসকতক আগে—একটা বছরও পার হয় নি, কত বড় একটা যাতনা ভোগ করে' উঠলে, কোথায় একটু বিশ্রাম নেবে, না, দিন দিন আরো অসুর হয়ে উঠচো তুমি...যদি কষ্টই বোধ করতো বলই না কেন, সমস্ত গোপন রেখে আমায় পীড়ন করে' কি সুখ পাও...মুখে যদিও কিছু বলনা, কিন্তু তোমার মুখের দিকে একবার তাকালে আমি সব বুঝে' ফেলতে পারি তা জানো? এখানে এসে পর্য্যন্ত এক দিনের জন্যেও তোমার সাধ-ইচ্ছার কথা আমায় জানাও নি, মুখটি বুজে কেবল আমারই সুখ স্বচ্ছন্দের বিধান ক'রে এসেচ! প্রথম প্রথম যখন অর্থের অভাবে কষ্টের একশেষ হয়েছে—রাগে তোমায় কত কটু কথা শুনিয়েচি, তোমার জন্যেই নাকি আমার এই দুর্ভোগ, এই কষ্ট,—মুহূর্ত্তের জন্যেও তখন তোমার মুখে দুঃখের বিরক্তির, অবসাদের কোন কিছুরই চিহ্ন দেখতে পাইনি। কত সময়ে এমন হয়েচে যে, আত্মীয় স্বজনের কাছে অবজ্ঞাপূর্ণ পত্র পেয়ে প্রকারান্তরে তোমারই ওপরে আমার সেই অপমানের শোধ নিয়েচি! আজ যদি বা একটু স্বচ্ছলতা আমাদের সংসারে দেখা দিয়েচে—তোমার তাতে কিছুই পরিবর্ত্তন দেখতে পাই না, না পরিশ্রমের, না পরিচ্ছদের! কেবলি শুনে আসচি—ওগো আমরা বড় অসহায়, টাকা কড়ি কিছু বেশী হাতে থাকাই ভাল, খোকাকে মানুষ করে' তুলতে হবে তো!...কেন তুমি নিজেকে এমন বঞ্চিত করে' রাখবে, কিসে অন্তে? তোমায় দীন হীন বেশে, দুখে স্বচ্ছন্দে থাকতে আমার মোটেই ভাল লাগে না...না না, ও হাসি আমি চিনি, ওর তলে একটা লুকানো ব্যথা আছেই আছে। লক্ষ্মীটি তারা, অমন অবাধ্য হ'য়োনা...দেখতো, তোমার চুলগুলোর আজকাল কি দুর্দ্দশা হয়েচে...সাধারণের মতো তুমিও আমোদ প্রমোদ নিয়ে থাকতে চাও না কেন?...আর, কি ছেলেমানুষ তুমি, শুধু শুধু চোখে জল এসে পড়লো অমনি!

—ওগো, এত সুখ, এত তৃপ্তি বুঝি আমার কপালে সহ্য হবে না! এ যেন একেবারে—

—ছাই সুখ!

—এই ছাই পেয়েই আমার সব পাওয়া পূর্ণ হয়েচে? তোমার আদরে, তোমার সোহাগে আমার শূন্য বুকটা একেবারে ভরাট হয়ে গেছে! ছোট ছোট জিনিষগুলোর উল্লেখ ক'রে আর আমায় দুঃখ দিয়ো না গো, তোমার পায়ে পড়ি আমি! নিঃশব্দে পূর্ণভাবে তোমায় আমি ভোগ করতে চাই, শুধু সেই অবসরটুকুই আমাকে দাও... আনন্দে, আবেশে আমার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসুক... তোমার বুকের কাছে আছি, এই আজ আমার সব চাইতে বড় তৃপ্তি, চরম চরিতার্থতা! ওগো, তুমি বুঝবে না, কিছুতেই তোমায় বোঝাতে পারবো না আমি—কেন আমি এত সুখী, কার অনুগ্রহে আমার এই বিরাট ঐশ্বর্য্য আমাকেও আজ ধন্য করেচে। ওগো, আমি নারী, আমি মা, আমি বিজয়িনী, আমার বুকের এই আনন্দকে তুমি আশীর্ব্বাদ কর!

ইণ্ডিয়ান সোপ কোম্পানীর
মেসিনে প্রস্তুত
চন্দন, রয়েলবকুল, মাস্ক ও ভেলভেট সাবান
ব্যবহার করুণ। টেলিফোন, ২৪৯৬

বাঁশী।

(শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী)

(১)

শুভ্র জ্যোৎস্না পুলকিত যামিনী, দশদিশি জ্যোৎস্না স্নিগ্ধ হইয়া হাসিতেছে। সম্মুখে পুষ্করিণীর কালো জলের উপর রজত জ্যোৎস্নাধারা আসিয়া পড়িয়াছে, চারপাশের কালো গাছের ছায়া মাঝে মাঝে পড়িয়া অন্ধকার করিয়া রাখিয়াছে।

ঘাটের উপর বসিয়া ননী বাঁশী বাজাইতেছিল। বাঁশীর মিষ্ট সুর সেই জ্যোৎস্নামাখা রাত্রে আরও মিষ্ট শুনাইতেছিল, নিস্তব্ধ রাত্রে দূরে দূরে বাঁশীর সুর বাতাসের মুখে ভাসিয়া যাইতেছিল। শূন্যমণ্ডল বাঁশীর মধুর সুরে ভরিয়া উঠিয়াছিল। ঘাটের পাশে বেলাফুলের গাছটা আগাগোড়া ফুলে বিভূষিত হইয়া উঠিয়াছে তাহার গন্ধ, জ্যোৎস্নালোক আর বাঁশীর সুর, সত্যই সেখানে এক অভিনব রূপ, অভিনব গন্ধের সৃষ্টি করিয়াছে। বাঁশী বাজাইতে বাজাইতে ননী একেবারে বিভোর হইয়া গিয়াছিল, তাহার বাহ্যজ্ঞান আর মোটেই ছিল না। চাঁদ যে আকাশের গায়ে দোলা খাইতে খাইতে একেবারে মাথার উপর চড়িয়া বসিল, সে দিকে তাহার মোটে দৃষ্টিই ছিল না। এমনই ছিল আশুতোষা সে, বাঁশী বাজাইতে বসিলে আর তাহার জ্ঞান থাকিত না, তাহার নিকট হইতে জগৎ তখন বিলুপ্ত হইয়া যাইত, নিজেকে সে ভুলিয়া যাইত তাহার মোটেই মনে থাকিত না তাহার ও সংসার আছে, তাহার বিধবা বোনটী আছে।

অদূরে জমিদার বাটীর মুক্ত ত্রিতল ছাদের উপর জমীদার পুত্র সুরেন ক্ল্যারিয়োনেট সাধনায় ব্যস্ত। বাজাইতে বাজাইতে সে একবার থামিয়া গেল, বাতাসে কানে বাঁশের বাঁশীর সুর ভাসিয়া আসিল। কাণ পাতিয়া সুরেন শুনিতে লাগিল—হাঁ, এই সুর বটে। যথার্থ প্রাণ ঢালিয়া বাজানো ইহাকেই বলে। সুর যেমন ঊর্দ্ধে উঠিতেছে, তেমনি খাদে নামিতেছে, ক্ল্যারিয়োনেট হার মানিলে, এই নিস্তব্ধ জ্যোৎস্নাপুলকিত যামিনীতে সে বাঁশের বাঁশীর সমকক্ষতা লাভ করিতে পারিল না। কণ্ঠের ভাষা এ সুরের কাছে নির্ব্বাক। এই ক্ষুদ্র বাঁশীতে কি শক্তি আছে তাহা বলিয়া বুঝাইতে পারা যায় না। একদিন এই বাঁশীর সুর শুনিতে এমনি জ্যোৎস্না পুলকিত রাত্রে যমুনা উজান বহিয়াছিল, এমনি জ্যোৎস্না পুলকিত রাত্রে এই বাঁশীর সুর শুনিয়াই ব্রজগোপীগণ কুল মান লাজ ভয় ভুলিয়া ছুটিয়াছিল। শুদ্ধ সুরেনের হাতের ক্ল্যারিয়োনেট হাতেই রহিয়া গেল, সে নির্ব্বাক হইয়া সেই বাঁশীর গান শুনিতে শুনিতে কখন ঘুমাইয়া পড়িল।

যখন ঘুম ভাঙ্গিল তখন কোথায় নীল আকাশে চাঁদের হাসি, কোথায় বাঁশীর গান! শুক্লাসপ্তমীর চাঁদ তখন পশ্চিমে অস্ত গিয়াছে, সে দিককার আকাশটা সামান্য একটু উজ্জ্বল মাত্র; চাঁদ যে তাহার কোল বহিয়াই বিশ্রামার্থে গিয়াছে তাহার চিহ্ন সে ধরিয়া আছে। বাঁশীও থামিয়া গিয়াছে, বাদক বোধ হয় চলিয়া গিয়াছে। কাল হইতে এই অজানিত বংশীবাদকের নিকট বাঁশী বাজানো শিখিতে হইবে, সুরেন তাহা ঠিক করিয়া রাখিল।

(২)

খোঁজ লইয়া সে জানিতে পারিল তাহাদেরই রাখাল সে, গরু চরায়। একটু হাসি সুরেনের মুখে ভাসিয়া উঠিল। হাঁ, ঠিকই তো, সেই কোন অতীত যুগে একটা রাখাল ছোঁড়াই এমনি করিয়া বাঁশী বাজাইয়াছিল না? এটা বোধ হয় রাখালের জন্যই একচেটিয়া করা আছে। কিন্তু হোক রাখালের কাজ, তবু শেখা চাই। এমন করিয়া বাঁশী বাজাইতে না পারিলে জীবনই বৃথা।

ননীর ডাক পড়িল। সে আসিয়া প্রণাম করিয়া দাঁড়াইতেই সুরেন আদেশ করিল বাঁশী বাজাও। বাঁশী বাজাও কথাটা শুনিয়া ননী একেবারে আশ্চর্য্য হইয়া গেল। গরুগুলিকে এখন মাঠে লইয়া যাইবার সময় চারিদিক ঘর রৌদ্র ভরিয়া উঠিয়াছে, এখন কি বাঁশী বাজানো যায়? বাঁশীর সুর আসিবে কেন? সুরেনের

কঠোর আদেশ, সে কিছুতেই মানা মানিবেনা, বাঁশী বাজাইতেই হইবে। কম্পিত হস্তে বাঁশী ধরিয়া ননী বাজাইতে গেল কিন্তু হায়, বাঁশীতে মোটেই সুর ফুটিল না। সুরেন রুদ্ধ কণ্ঠে বলিল "সুর উঠছে না কেন ?"

ননী প্রাণপণে চেষ্টা করিল, তাড়নায় বালকের দুইটি চোখ অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল। অতি কষ্টে সুর ফুটিল কিন্তু কাল রাত্রের সে প্রাণময় সুর কিছুতেই বাঁশীর মধ্যে ফুরত হইয়া উঠিল না। সুরেন তাহার হাত হইতে বাঁশী কাড়িয়া লইয়া দুই গালে, দুই চড় বসাইয়া দিল—কেবল বলিলে, যা দূর হ ! চোখের জল ফেলিয়া সে চলিয়া গেল।

(৩)

সে রাত্রিতে আর বাঁশী বাজিল না। সে রাত্রেও আকাশে চাঁদ ভাসিয়া উঠিল, অনাবিল শুভ্রজ্যোৎস্না ধারায় সারা ধরা স্নিগ্ধ হইয়া গেল। প্রস্ফুটিত হেনার সৌরভ বুকে লইয়া উন্মাদ পবন মৌতাতোড়ি আরম্ভ করিয়া দিল, কিন্তু সবই যেন প্রাণহীন। দক্ষ যখন যজ্ঞ করিয়াছিলেন, সকল বিশ্ব সেখানে নিমন্ত্রিত কিন্তু কেবল শিব বিনা যেমন সেই যজ্ঞ একেবারেই অসম্পূর্ণ হইয়াছিল আজ বাঁশী অভাবে তেমনি এই সৌন্দর্য্য পরিপূর্ণ হইয়া ফুটিয়া উঠিতে পাইল না, প্রাণহীন প্রতিমার মত সব রহিয়াও কিছু রহিল না।

যে বাঁশী বাজাইবে সে তখন অন্ধকার ঘরের মধ্যে শুইয়া পড়িয়া আছে। আজ সে বাঁশী বাজাইতে পাইল না, তাহার আজ যে কি দিন তাহা বলিয়া বুঝাইবার নহে। অনুতপ্ত সুরেন পরদিন সকালে তাহার দুই পয়সা দামের বাঁশের বাঁশী কিনাইয়া দিল। সেই রাত্রে আবার তেমনি প্রাণভরা সুরে বাঁশী বাজিয়া উঠিল। বাঁশীর সুরে রক্ত চঞ্চল হইয়া উঠে, ক্রুত চলাচল করে ; সুরেন স্তিমিত নেত্রে স্তব্ধ হইয়া বসিয়া শুনিতে লাগিল।

এইখানেই তাহার সুর ফুটিয়াছে। বাঁশী চায় নির্জ্জন সেই খানেই সে ফুটিয়া উঠে। মানুষের উপর জোর জবরদস্তী চলিতে পারে কিন্তু বাঁশীর উপর তো চলিতে পারে না। তাহার প্রাণ আছে অতি সঙ্গোপনে লুকাইয়া —সে প্রাণের অনুভূতি পাওয়া যায় বাদলের মধ্যে। আশুতোষ সুরেন স্থির থাকিতে পারিল না, দ্রুতপদে নামিয়া আসিল। শুভ্র ঘাটের উপর শুইয়া পড়িয়া চাঁদের পানে চাহিয়া ননী বাঁশী বাজাইতেছিল, তাহার জ্ঞান ছিল না তাহার মনিব তাহার পিছনে দাঁড়াইয়া আছে। 'ননী !'

ননীর বাঁশীর সুর থামিয়া গেল, সে ধড় ফড় করিয়া উঠিয়া বসিল,—দেখিল সুরেন। কালকার কথা মনে করিয়া বালক ভয়ে কণ্টকিত হইয়া উঠিল, তাহার মুখ হইতে বাঁশী খসিয়া পড়িল। বাঁশী কুড়াইয়া তাহার হাতে দিয়া সুরেন আবেগে তাহাকে বুকের মধ্যে টানিয়া লইল—যথার্থ বাঁশী বাজাতে শিখেছিস ননী, প্রাণের গোপনকথা যথার্থই বাঁশীর মধ্যে দিয়ে ফুটাতে পেরেছিস। বাছা ভাই, তোর বাঁশী বাছা যতক্ষণ আকাশে চাঁদ থাকবে, যতক্ষণ চাঁদের আলো ধরার বুকে লেগে থাকবে, ততক্ষণ বাঁশী বাজা। ভয় করিস নে, আমার দিকে চাস নে শুয়ে পড়ে চাঁদের পানে চেয়ে যেমন করে বাঁশী বাজাচ্ছিলি তেমনি করে বাঁশী বাজিয়ে যা, তোর ঐ বাঁশের বাঁশী আজ বিশ্বকে স্তম্ভিত করেছে ; বিশ্ব আজ তোরই বাঁশীর সুরে সুর মিলিয়ে এই চাঁদের আলোয় গান গাইবে। গা ভাই যে তোর বাঁশীতে সুর দে।" মধুর চাঁদনী নিশায় ননীর হাতে বাঁশের বাঁশী আবার বাজিয়া উঠিল, বিশ্ব সেই বাঁশীর সুরে আপনা হারাইয়া ফেলিল। মুগ্ধ সুরেন রাখাল বালকের পাশে বসিয়া বাঁশী শিখিতে লাগিল।

ম্যাজিষ্ট্রেট :—লোকটা তোমার কাজে কোন বাধা দেয় নি তো ?

পুলিশ :—শুধু একটা আঙুলি দিতে এসেছিল হুজুর আমি সে দিকে ফিরেও চাই নি।

চুল আঁচড়াবার ব্রাশ গুলো মাঝে মাঝে পরিষ্কার করতে হয়। সাবান দিয়ে পরিষ্কার করে তার পর যদি জলে ভিজিয়ে রোদে শুকিয়ে নেওয়া যায় তবে ব্রাশ খুব ভাল পরিষ্কার হয়।

শিল্পীর প্রেম

(রোসেটি)

[শ্রীখুরসিদ জাঁহা বেগম]

সুবিখ্যাত চিত্রকর এলিজাবেথ সাস্তে গেব্রিয়েল রোসেটির পত্নী শ্রীমতী রোসেটি পরমা সুন্দরী নারী ছিলেন। পত্নীর রূপ ও গুণমুগ্ধ চিত্রকর স্বামী নিজ পত্নীর চিত্র নানা ভাবে অঙ্কিত করিয়া পত্নীকে চিত্রে অমর করিয়া গিয়াছেন। পত্নীর চিত্র ভিন্ন অন্য চিত্রও যখন চিত্রকর আঁকিয়াছেন তাহাতেও তাঁহার পত্নীর রূপ ও গঠন সৌষ্ঠব অনেকটা পড়িয়াছে।

এই নারী অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য-শালিনী ছিলেন। শ্রীমতীর চোখ দুইটির সৌন্দর্য্য এ পর্য্যন্তও কেহ সে ভাবে বর্ণনা করিতে পারেন নাই কারণ সে চোখ এত সুন্দর ছিল তাহাতে পরিবর্ত্তনের এমন বিদ্যুৎ খেলিত যে কেহ তাহাকে দুইবার এক ভাবে দেখে নাই। সে চোখের বর্ণ পরিবর্ত্তন, তাহার স্বপ্নাবেশ মণ্ডিত ভাব, তাহার সুগভীর রহস্য যে দেখিত সেই মুগ্ধ হইয়া যাইত। তাঁহার ঠোঁট দু'খানি ছিল রসে পূর্ণ বিধা বিভক্ত। সুন্দর সুগঠিত মস্তকে কোমল কুঞ্চিত সোনার বরণ কেশ-দাম এলাইয়া পড়িত। কেশদাম প্রায়ই আলগাভাবে এলায়িত থাকিত তাহাতে সুন্দরীর সৌন্দর্য্য আরও সুন্দর দেখাইত।

বিবাহের পূর্ব্বে শ্রীমতী রোসেটির নাম ছিল এলিজাবেথ এলিনোর সিডাল। সুন্দরীর পিতা সেফিল্ডে বাস করিতেন। কিন্তু ইঁহার পিতা সম্বন্ধে বিশেষ কোন কথা জানা যায় না। ভ্রাতা ভগিনীদের মধ্যে এলিজাবেথই সকলের চেয়ে বুদ্ধিমতী ছিলেন। তাঁহারা অত্যন্ত দরিদ্র ছিলেন। এলিজাবেথ কোন দোকানের সহকারী বিক্রয়িত্রী ছিলেন। লিনেটার ষ্ট্রোয়ারে সেই দোকান ছিল এই খানেই চিত্রকর রোসেটির সঙ্গে তাঁহার প্রথম সাক্ষাৎ হয়।

১৮৫০ খৃষ্টাব্দে এই সাক্ষাৎ। ওয়াল্টার হাওয়েল ডেভরেল মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে Twelfth night এ ভায়োলার মডেল করিতে ইচ্ছা করেন। চিত্রকর ডেভরেল এ সময়ে এই চিত্র অঙ্কনে নিযুক্ত ছিলেন। চিত্রকর এলিজাবেথের মাতার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া—তাঁহার কন্যাকে মডেল রূপে লইবার প্রস্তাব করেন ও মাতার সম্মতি পান। সুন্দরী চিত্রকরের চিত্রশালায় যাইতে লাগিলেন, এখানে রোসেটি ও তাঁহার বন্ধুর অপর একখানি ছবির মডেল হইয়াছিলেন। এই চিত্রশালায়ই দুই মডেলের মধ্যে গভীর প্রণয় হয়। এই ভালবাসা হওয়ার প্রায় একবৎসর পরে তাঁহাদের উভয়ের পরিণয়ের কথা স্থির হয়।

দু'জনের পরিচয় ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হইতে রোসেটি দেখিলেন, এলিজাবেথ যে শুধু অসাধারণ সুন্দরী তাহাই নহে, তাঁহার অন্যান্য গুণাবলীও সেই সৌন্দর্য্যেরই অনুরূপ। ইঁহার চরিত্রে মাধুর্য্য ও সারল্য ছিল। প্রথমে খুব ভাল শিক্ষা না পাইলেও লেখা পড়ায় ও কলাশিল্পে ইনি খুব অনুরাগিনী ছিলেন—অল্প দিনের মধ্যেই ইনি শিল্প কলা ও সাহিত্যে দক্ষতা লাভ করিলেন। তাঁহার প্রেমিকও সুন্দরীকে শিল্প ও কাব্য চর্চ্চায় উৎসাহ ও শিক্ষা প্রদান করিতে লাগিলেন।

রোসেটি তাঁহার প্রিয়তমার বহু চিত্রই আঁকিয়াছেন কিন্তু তাঁহার মধ্যে সব চেয়ে সুন্দর ও চিত্রকরের মনোমত হইয়াছিল সেই চিত্র খানি যে চিত্রে বিবাহ সভায় বিরাজিত রঙ্গিনী শ্রীমতী রোসেটি মাস্তের অভিবাদন অস্বীকার করিতেছেন।

ইঁহাদের বিবাহের কথাবার্ত্তা একরকম পাকা হইয়া থাকিলেও রোসেটির অর্থাভাবে এবং শ্রীমতী সিডালের শারীরিক অসুস্থতার জন্য বিবাহ ক্রমেই পিছাইয়া যাইতে লাগিল। এলিজাবেথের স্বাস্থ্যও ভাল ছিল না, রোসেটি অনেক সময়েই তাঁহাকে লইয়া স্বাস্থ্যকর স্থানে থাকিতেন তাই কর্ম্ম অভাবে অর্থেরও অভাব দিনে দিনেই বাড়িতে লাগিল। ধন রাশির প্রতিভাশালী তরুণ চিত্রকরকে

বাসন্তী—

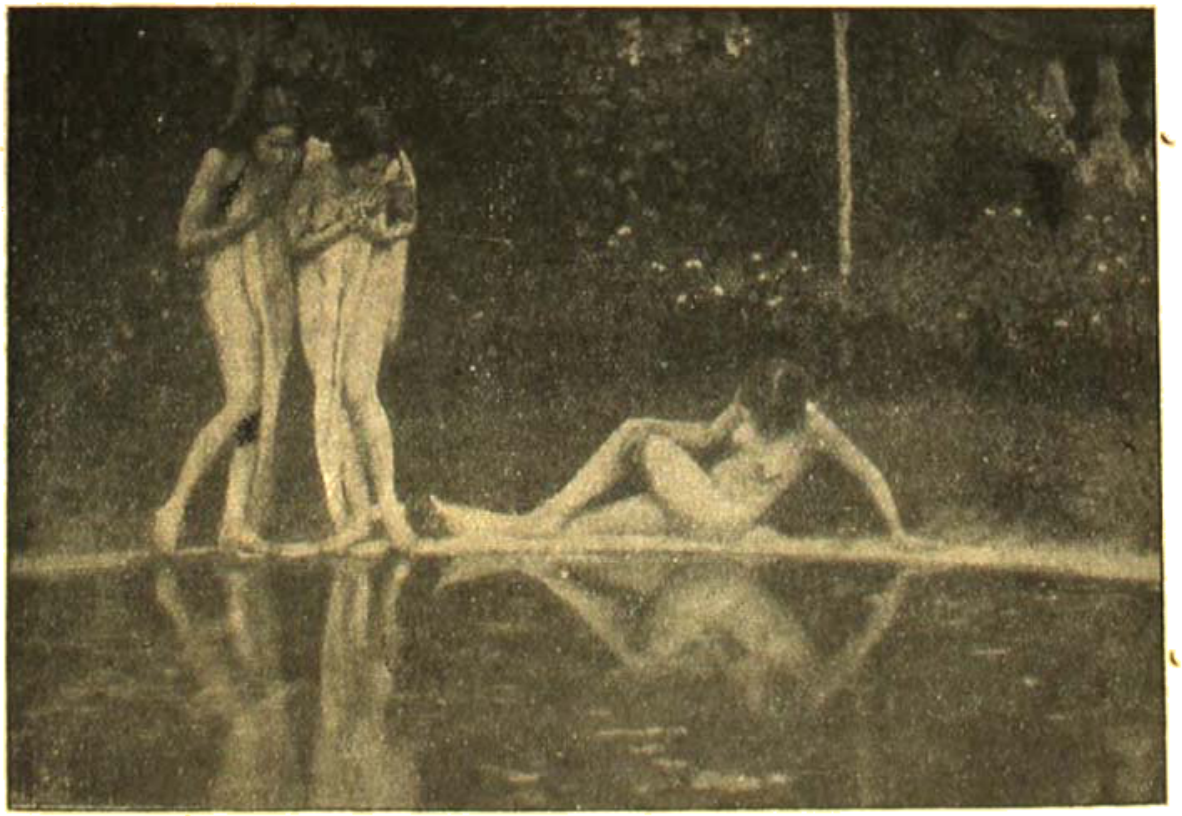

"প্রতিবিম্ব"

একটি বিলাতী চিত্র হইতে

অত্যন্ত ভাল বাসিতেন—এ সময় তিনিই রোসেটিকে অর্থ কষ্ট হইতে মুক্ত করিয়া সংসারে দাঁড়াইবার সাহায্য করেন।

রাস্কিন কুমারী সিডালকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন এবং তাঁহার প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিলেন। রাসকিন এই কুমারীকে "Noble, glorious creature" বলিয়াছেন। রোসেটি ও শ্রীমতী রোসেটিকে ইনি পিতার চোখে দেখিতেন এবং সেইরূপ স্নেহই করিতেন। শ্রীমতী রোসেটিকে দিয়া নিজের নানা টুক-টাক কার্য্য করাইয়া লইয়া রাসকিন এই সুন্দরীকে বৎসরে বেড়শত পাউণ্ড দিতেন। দুই বৎসর এই ভাবে কার্য্য করার পর শ্রীমতী রোসেটির শরীর এমন ভাঙ্গিয়া পড়িল যে এই সামান্য কাজটুকু করিবারও আর তাঁহার সামর্থ্য রহিল না। রাসকিন বিনা কার্য্যেই অর্থ দিতে চাহিয়াছিলেন কিন্তু রোসেটি ও তাঁহার পত্নী তাহা লইতে স্বীকার করেন নাই।

১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে ভাল ডাক্তার দ্বারা শ্রীমতীর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করাইবার জন্য অক্সফোর্ডের ডাক্তার অকল্যাণ্ডের নিকট এক পরিচয় পত্র দিয়া দেন। শ্রীমতী রোসেটির শরীর প্রায়ই অসুস্থ থাকিত, পত্নীর অসুস্থতার জন্য রোসেটির কার্য্যেরও অত্যন্ত বিঘ্ন হইত। কিন্তু সুন্দরীর এইরূপ শারীরিক অসুস্থতার মধ্যেই রোসেটি ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে ইঁহাকে বিবাহ করেন। বিবাহের পর রোসেটি কিছুদিন বোলোনে কোন বন্ধুর গৃহে সস্ত্রীক থাকিয়া নগরীতে ফিরিয়া আসেন। এই সময়ই তাঁহার বিখ্যাত চিত্র How they met themselves সমাপ্ত হয়। এই চিত্রের সুন্দরীর মডেল হইয়াছিলেন শ্রীমতী রোসেটি। বিবাহের পর তাঁহাদের সুখের দাম্পত্য জীবন দু'বৎসর মাত্র ছিল। দু'জনেরই অনেক বন্ধু-বান্ধব ছিল তাঁহারা অবসর সময়ে সকলে মিলিয়া একত্রে আনন্দে কাটাইতেন। রাসকিন ছিলেন ইঁহাদের সব চেয়ে ওপ্তরঙ্গ বন্ধু। বিবাহের অল্প দিন পরে রাসকিন রোসেটিকে লিখিয়াছিলেন :—

আমার মনে হয় ইলার (শ্রীমতী রোসেটিকে কবি ইলা বলিয়া ডাকিতেন) চিত্র তুমি যেরূপ সুন্দর নির্দ্দোষ ভাবে কোমলতার সঙ্গে আঁকিয়াছ তাহাতে সে খুবই খুশী হইবে। শ্রীমতীর চিত্র আঁকিতে তোমার সব দোষ দূর হইয়া যায়, শ্রীমতীর চিত্র তোমার হাতে নির্দ্দোষ হইয়া ফুটিয়া উঠে।

কবি সুইনবার্ণ ছিলেন ইঁহাদের অন্যতম বন্ধু। কবি শ্রীমতী সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—তাঁহার স্বামীর আর আর বন্ধুদের মধ্যে একজন যে তাঁহাকে ভাল ভাবে জানিত—সেই মোহিনী মূর্ত্তির মনের ও দেহের মাধুর্য্য তাঁহার অপূর্ব্ব কমনীয়তা, সৌন্দর্য্য, সাহস ও সহন ক্ষমতা, রস বোধ যে দেখিয়াছে ও মুগ্ধ হইয়াছে লেখনীতে ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়া সে এই অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যকে ম্লান কলঙ্কিত করিবে না।

এক শীতের রাত্রে চিত্রকর রসেটী ও কবি সুইনবার্ণ রেষ্টোরাঁকে নৈশ ভোজ সমাপনান্তে বাসায় ফিরিলেন। রোসেটি সেই রাত্রেই আবার শিকা দিতে বাহির হইয়া রাত্রি এগারটার সময় ফিরিয়া দেখেন পত্নী শয্যায় অজ্ঞান। তখনি ডাক্তার ডাকা হইল। কিন্তু রোসেটির জ্ঞান আর ফিরিল না—ভোরের সময় তাঁহার মৃত্যু হইল। পত্নীর মৃত্যুতে রোসেটি শোকে অধীর হইলেন। কিন্তু এ শোকের সান্ত্বনা কি—যে গিয়াছে সে তো আর প্রাণের সহস্র ব্যাকুল আহ্বানেও ফিরিয়া আসিবে না! শ্রীমতী রোসেটি সর্ব্ব বিষয়ে স্বামীর সঙ্গিনী ও সহধর্ম্মিনী হইয়াছিলেন। শ্রীমতী চিত্র-বিদ্যায় স্বামীর ন্যায় দক্ষতা লাভ না করিলেও এত অল্প বয়সে তাঁহার মৃত্যু না হইলে তিনিও স্বামীর মতই চিত্র বিদ্যায় খ্যাতি লাভ করিতেন সন্দেহ নাই।

কে ভাল স্বামী—এই কথার উত্তরে ২০০০ ফরাসীর মধ্যে ১০০০ বলেছেন ব্যবসায়ীরাই ভাল স্বামী হয়। কিন্তু অভিনেতারা ১৩০০ ভোট পেয়েছেন। বিমানচারী ৩০০, গায়েরা ৫১ ভোট পেয়েছেন।

শেষ।

[শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার গুপ্ত]

এখনও তা'র কান্না থামে নি ?···এখনও তা'র বুক-ফাটা আর্ত্তনাদের সুর অনন্তের কোলে বিলীন হয়ে যায় নি ? তবে—ওই আবার কে ধীরে ধীরে আমার বিছানার পাশে এসে দাঁড়াল, না ?...হাঁ, হাঁ তাই ত—ঐ যে সে তা'র বিশ্ব-মাখানো ছুরীখানা নিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। মারলে—মারলে—না! পালিয়েছে।.....

লোকে বলে আমি পাগল হয়ে গেছি, ডাক্তারে আমার মৃত্যুর পরওয়ানা দিয়ে গেছে। কিন্তু তাই কি ?...তাই যদি হয় তবে জগদীশ্বর, হে ভীষণ অদৃশ্য মরণদেবতা, আজ তোমায় কোটী কোটী নমস্কার।...এ বিশ্বের অতিথিশালায় আমার স্থান আজ পূর্ণ—এ বিশ্বের দরবার বন্ধ।...কিন্তু কেন ? কেন আজ·····বাঃ বেশ দেখ্‌তে ত মেয়েটীকে! অস্তগামী সূর্য্যের বিদায় রাঙা আলোটী ওর মুখে পড়ে কেমন ঝিক্‌মিক্ কোরছে!—ওই আবার কে চলেছে নয় ? ওই যে সূর্য্য নেবে যাচ্ছে—রাত্রি আস্‌বে—তারপর—তারপর ?···পৃথিবীর সঙ্গে-এ দু'দিনের-চেনা দুনিয়ার সঙ্গে আমার সমস্ত সম্পর্ক এক নিমেষেই চুকে যাবে! পিতার স্নেহ ?...মায়ের ভালবাসা ?...পত্নীর প্রেম ?... হা, হা, হা, এর কোনটাই আজ আমার নেই—সব হারিয়েছি—ওগো সব হারিয়েছি। জীবনের—কে অজিত ?···এসেছিস্ ভাই ?—আয়, আয় একটু কাছে... হাঁ, হাঁ, হয়েছে !...এ জীবনে যদি কাউকে বন্ধু বলে. ভাই বলে ডাকে, বুকের কাছে পেয়ে থাকি—তবে এই অজিতকে-ই পেয়েছি।···ওর অবস্থা-ও কি তবে আমার মতন ?—এও কি তবে—না, না, এ কি বল্‌ছি আমি ? অমন বাপ...অমন স্নেহময়ী মা...অমন স্ত্রী...ওগো, না, না, ওর জীবন—অজিত, পিয়ের জানালাটা একবার খুলে দে' না, ভাই ? দুনিয়ার সঙ্গে একবার শেষ দেখা করে নিতে হবে !...

অরুণদা, ভালবাসা কি পাপ ?···

পাপ ?...হাসি পায় অজিত তো'র কথা শুনে !··· ভালবাসা যদি পাপ হয়—তবে জগতে থাকা পাপ ? এ বিশ্ব দুনিয়ায় যা আছে সব পাপে ভরা ? ইঃ, এখনও মনে পড়ছে তা'র কথা !...তা'র জন্যেই ত আজ আমার এই দশা। সেই রাক্ষুসী-ই ত আজ আমায় পৃথিবী থেকে ঠেলে বার করে দিচ্ছে! সে-ইত—না, না এ আমি কি বল্‌ছি ? আমিই ত প্রথম তাকে দেখেছিলুম, সে এক ঘনঘোর সন্ধ্যার স্তিমিত আগমনের সাথে-সাথে !··· নীহার ছিল আমার বন্ধু—আমার কপট প্রতিদ্বন্দ্বী !... বাঃ বেশ বাতাস আস্‌ছে ত ? এরের সঙ্গেও আজ আমার শেষ দেখা—শেষ বিদায়—অভিনন্দন।···না, না, নীহারই ত আমার জীবনটাকে সুখের হিল্লোল থেকে টেনে এনে এই অসীম ধূ ধূ প্রান্ত মরুভূমির বুকে ফেলে দিয়ে চলে গেল। কেন ?...সেই জানে। আমি তা'কে দিয়েছিলুম, আমার নিভৃত অন্তরের প্রাণঢালা ভালবাসা, অগাধ বিশ্বাস আর সে তা'র প্রতিদান দিয়েছে আমায়—সেই বিশ্বাস একেবারে পিষে মেরে বিশ্বাসঘাতক সে !···সে আজ কতদিন আগের কথা। আমিই এনেছিলুম তাকে,—সুদূর বেল্‌গাছিয়ার কোন এক অতি দরিদ্র কুটীর থেকে। সে আসতে চেয়েছিল বলে আনি নি, তা'র দুঃখ দেখে তা'কে আনি নি—এনেছিলুম তাকে ভালবাসি বলে! রূপের গর্ব্ব—সৌন্দর্য্যের পূর্ণচ্ছটা আত্মগরিমার নিষ্ফলতা সমস্তই তা'র অ-ব্যর্থ হয়েছিল—যখন সে জীর্ণ কুটীর থেকে চলে এল আমার প্রাসাদতুল্য অট্টালিকায়।·····

পত্নীর রূপ ছিল, গুণ ছিল কিন্তু আপনার বলতে তা'র কেউ ছিল না !...জগতে যদি কাউকে পত্নী তা'র একমাত্র কাম্য বলে মেনে নিয়ে থাকে—তবে সে আমাকে !... বাড়ীতে আমার মা থাকতেন আর তাঁর সাক্ষী হয়ে থাক্‌তেন আমার স্ত্রী চপলা ! বড়লোকের মেয়ে হলে কি হয় প্রাণের বিনিময় দিতে আমার স্ত্রী জান্‌তেন না। তাঁর বুকপোরা ছিল গর্ব্ব, অন্তরভরা ছিল কলুষতা আর হৃদয়-হীন ছিল তাঁর দেহখানি।...আর পত্নী ?...সে সত্যিই ছিল স্বর্গের পরী। শুভ্র প্রভাতে স্নিগ্ধ কোমল হিমানীর মত তা'র লাবণ্যমণ্ডিত দেহলতা, চপল হরিণীর মত তা'র

সঙ্কোচহীন চলে-যাওয়া, সত্যিই আমায় পাগল করে তুলেছিল।.. বেশ ছিলুম, আমরা। সংসারে সুখ দুঃখের মধ্য দিয়ে লাজ-সঙ্কোচের সব বাধা বন্ধন এড়িয়ে বেশ সহজে দিনগুলো কেটে যাচ্ছিল। হঠাৎ নীহার একদিন পাগলের মত ছুটে এলো—বললে,—মা তোর যায়-যায়, শীগ্‌গীর ছুটে যা অরুণ, নইলে—

...সেই দিনই তৎক্ষণাৎ ছুটলুম হাওড়া ষ্টেশনের দিকে। শীগ্‌গীর যেতে হবে নইলে আর বুঝি তাঁকে দেখতে পাব না।...ছুটলুম্—কিন্তু সব ব্যর্থ। চলন্তট্রেণে উঠ্‌তে গিয়ে লাইনের-পাশে পড়ে গেলুম্।...ওই একটা কি রাস্তার ওপর দিয়ে যাচ্ছে না? বাঃ বেশ্‌তো গোরাকটী। কেমন লাল জামা গায়ে—মাথায় পিতলের টুপী! ঐ—ঐ চলেছে ঘণ্টা বাজাতে বাজাতে!—কে রে? ...না লক্ষ্মী-টি ভাই এখন তুই যা, এখন আর কিছু খাব না। যা?...যাবি নে?—ওই যে চলে গেছে।...

যেদিন জ্ঞান হো'ল—হাসপাতালে। শত মরণ আর্ত্ত-নাদের মধ্যে আমার আকুলতা, আমার বুভুক্ষু হৃদয়ের ক্রন্দন সব ব্যর্থ হয়ে ডুবে গেল! এদিকে মনে হো'ল মায়ের অন্তিম শয্যা আর একদিকে ছুটে উঠ্‌ল পত্নীর কথা, বিচ্ছেদের প্রারম্ভেই তার কান্নার কথা!.....

হাসপাতালে শুয়ে শুয়েই শুনলুম, মা আমার চলে গেছেন কোন্ সুদূর অজ্ঞাত দেশের উদ্দেশে। হায় রে কপাল? শেষ দেখাটাও হোল না।...মাসখানেক পরে আবার ফিরে এলুম। কিন্তু একি? সব অন্ধকার। পত্নী নেই, ওগো পত্নী আমার ফেলে রেখে চলে গেছে। তবে কি সে আমায় ভালবাসত না?...হা, হা, হা, এ কথা আমি কেমন কোরে বিশ্বাস করি? একটা প্রবল অট্টো-চ্ছ্বাস এসে পৃথিবীটাকে ঘুরে নিয়ে গেছে শুনলেও হয়ত বিশ্বাস কোরতুম কিন্তু ওগো, এ আমি কেমন কোরে বিশ্বাস করি?...যাক্ সব মুছে যাক্!...

তারপর?...ভিখিরীর মত পথে ঘুরতে লাগ্‌লুম্ সেই দিন থেকে। যদি তা'র দেখা পাই!...

—'যদ হরি হরিবোল'—

ওকে চলেছে?...মৃতদেহ? বড় সুন্দর, বড় সুখী ও। সংসারের সুখ, দুঃখ, জটিলতা সমস্ত ছাড়িয়ে আজ সে চলেছে।...অজিত?...অজিত?—ঘুমিয়ে পড়েছে, ঘুমোক্, তবু যতক্ষণ শান্তি পায়!

...বায়োস্কোপে সেদিন খুব ভীড়! লোকের অন্ত নেই। জলপ্রবাহের মত অসংখ্য জনস্রোত। চুপ করে সিড়িটীর পাশে দাঁড়িয়ে আছি হঠাৎ একখানি বেশ বড় মোটরকার এসে দাঁড়াল। চাপরাশ-আটা দরওয়ান এসে আমায় সরিয়ে দিলে।...তা থেকে ধীরে ধীরে নাম্‌ল—ওকি? একি আমার পত্নী, আর ও ওকে?...নীহার? বিশ্বাসঘাতক? ...আর দাঁড়াতে পারলুম্ না, মাথা ঘুরে পড়ে গেলাম। তবুও একটা ক্ষীণ কণ্ঠধ্বনির মত পত্নীর স্বরটা আমার কাণে এসে ঠেক্‌ল—লোকটার হয়ত মিরগীর ব্যামো আছে, নয় নীহারবাবু?.....

ভগবান, জগদীশ্বর, যদি তোমার রাজ্যে সুবিচার থাকে বল দাও—ও, চিন্‌তেও পারলে না? একদিন যে বুকের ওপর বুক মিলিয়ে স্থির দৃঢ়কণ্ঠে বলেছিল 'আমি তোমার' —আজ অর্থের মোহে, রূপের গর্ব্বে, সৌন্দর্য্যের অহঙ্কারে তা'র এত পরিবর্ত্তন?...টল্‌তে টল্‌তে কোন রকমে বাসায় ফিরলুম্...সমস্ত জগতটা একটা ছোট্ট লাট্টুর মত আমার চোখের সাম্‌নে ঘুরতে লাগল।.....

তারপর দিনের পর দিন গেছে। কেবলই মদ খেয়েছি।...কি, খাব না? প্রাণের ভেতর যার দিনরাত্রির মরুভূমির তপ্ত বালুকার মত জলন্ত তরল অগ্নিস্রোত বয়ে যাচ্ছে—ওয়েসিসের মত শীতল বিষও তা'র কাছে অমৃত, পূতিগন্ধময় নরকও তা'র কাছে স্নিগ্ধ শীতল-স্বর্গ। আঃ! ...কে, অজিত? জল?...একটু জল, দে?...ঐ ঐ আবার তারা আসছে, ওই ছুরি, ওই—অজিত, অজিত?—না, না পালিয়েছে!...কি ওষুধ?... দে ভাই!...হাঁ, প্রতিশোধ নিচ্ছি আমি।...কিন্তু কা'র ওপর? নীহার?...না, না, নিজের ওপর প্রতিশোধই আমি নিচ্ছি এখন, ইস্! কেন ভালবেসেছিলুম্?...ওই যে রাতের তারাগুলো আবার জ্বলে উঠেছে। আর একটু পরেই আমার এই বিশবছরের চেনা ধরণীটীকে চিরদিনের জন্যে ছেড়ে যেতে হবে। হে জাগ্রত বিরাট মরণদেবতা, তোমায় আমি শত শত নতি কোরছি ধরণীর এপারে দাঁড়িয়ে! তোমার আহ্বানকে সগৌরবে মাথায় নিয়ে যাবার জন্যে আজ আমি প্রস্তুত!...কী ভীষণ কালো ঐ যমুনাটা!.....

পুনর্জন্ম

(শ্রীকৃপেন্দ্র চন্দ্র লাহিড়ী)

(১)

ওমা আমার সাটের বোতাম এখনও লাগান হল না! আমায় যে এখনি বেরুতে হবে।'

পাশের ঘর হইতে উত্তর আসিল, 'এই আসি, যাচ্ছি, এই-এই আসি।'

খানিক পরে, ডান হাতে এক খানা রেকাবে খাবার এবং বাঁ হাতে এক গেলাস জল লইয়া একজন বর্ষীয়সী বিধবা ঘরে প্রবেশ করিলেন। ঘরের মধ্যে এক কোনায় একখানা টেবিল, টেবিলের পাশে একটা শেলফের মধ্যে, —ছোট, বড় মাঝারি, লাল, নীল কাল মলাট ওয়ালা খান পঞ্চাশেক বই। এক পাশে একখানা তক্তপোষের উপর বিছানা, তাহার উপর কয়েকখানা বই এলোমেলো হইয়া পড়িয়া আছে। ঘরের মধ্যে একখানা চেয়ারে একটী যুবক বসিয়াছিল, তার কোলে ধোপা বাড়ী হইতে সদ্য আগত একটী সার্ট। যুবকের নাম শশী। যে বিধবা ঘরে ঢুকিলেন, তাঁহার বয়স চল্লিশের উপর হইবে নাম কল্যাণী। কল্যাণী ঘরে আসিয়া রেকাব খানা শশীর হাতে দিয়া তাহার হাত হইতে সার্টটা লইয়া তাহাতে বোতাম লাগাইতে লাগিলেন। বোতাম লাগান সারা হইলে বিছানার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "এই সকালে বইগুলি গুছিয়ে গেলাম, আর এখনই এই দশা!

শশী শেষ রসগোল্লাটা নিঃশেষ করিয়া কহিল, "আমার কোনও দোষ নেই, মা। বইগুলিতে আমার হাত পড়লে ও গুলি আপনা আপনিই ছড়িয়ে পড়ে।'

কল্যাণী বইগুলি গুছাইতে গুছাইতে বলিলেন,—ছেলের কথা শোন।' তারপর একটু সস্নেহ হাসি হাসিয়া কহিলেন, "বেরুচ্ছিস কোথায় এত তাড়াতাড়ি?"

শশী কহিল, "বীডনষ্ট্রীটে হরিশ বাবুদের বাসায়। বেল-গাঁ থেকে হরিশ বাবুরা এসেছেন, তা' তোমায় বলিনি বুঝি?"

কল্যাণী যেন এই অপ্রত্যাশিত সংবাদে একটু চমকিয়া উঠিলেন। মুখে কিছু বলিলেন না, শুধু ঘাড় নাড়িলেন। শশী জল খাইয়া মুখ মুছিতে মুছিতে কহিল, ওঁরা পাঁচ সাত দিন হল বেল-গাঁ থেকে কল্‌কাতায় এসেছেন। বীডনষ্ট্রীটে বাসা নিয়েছেন।

কল্যাণী যেন একটু বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ওদের সঙ্গে তোর চেনা-শোনা হল কবে থেকে রে?

শশী কহিল, 'কাল। ওঁর ছেলে অমরের সঙ্গে আগে থেকেই একটু জানাশোনা ছিল। কলেজে আমার দু'তিন ক্লাস নীচে পড়ত কিনা। কাল হঠাৎ রেসের ধারে তার সঙ্গে দেখা। টেনে একদম বাসায় নিয়ে গেল। বল্লে, 'বাবা এসেছেন, চলুন আপনার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব।' শশী একটু থামিয়া হঠাৎ বলিয়া উঠিল, "আর দেখ মা, একটা বড় মজা হয়েছে।"

কল্যাণী কহিলেন, "কিরে?"

"না, তা বলব না। আচ্ছা, বলিই,—অমর আমার পরিচয় দিবার পর, হরিশ বাবু যখন জিজ্ঞেস করলেন, ইনি কি রাজমোহনবাবুর বড় মেয়ের ছেলে?" অমর বল্লে, হাঁ। আমিও কিন্তু তার কোনও প্রতিবাদ করি-নি।"

কল্যাণী বাস্তবিক শশীর মা নন—মাসিমা। তবে অতি শৈশবে মাতৃহারা শশী তাঁহারই কোলে মানুষ হইয়াছে। তিনি হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কেন-রে?'

শশী ঘাঁ করিয়া একটু গাম্ভীর্য্যের ভাণ করিয়া কহিল, "তাও কি আমায় বলতে হবে মা। তুমি যে আমার মা নও একথা বল্লে যে পাপ হয়। একথা আমার মনে থাকে না, জিহ্বায় আসে না।'

কল্যাণী তাঁহার এই ভাব-প্রবণ ছেলেটীর সময় অসময়ে এরূপ উচ্ছ্বাসে অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছিলেন। তিনি হাসিয়া বলিলেন, 'ছেলের বক্তৃতা শোন। তারপর কথা। জামাই-বাবু অত করিলেন, "কেমন বোধ হল রে হরিশ বাবুকে?'

'খুব ভদ্রলোক মা। যেমন চেহারা, দেখে মনে হয় পায়ে লুটিয়ে প্রণাম করি; আর তেমনি ব্যবহার। আমায় ত খুব অনুযোগ দিলেন; বল্লেন, 'আপনারা দেশের সঙ্গে সম্বন্ধ একেবারে ত্যাগ করলেন।

'তাই নাকি?

'হাঁ! তুমি যে কেন দেশে যাওনা, তাত আমি জানি। তাই, কি আর বলবো চুপ করে রইলাম।"

কল্যাণী জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কেন দেশে যাই-না-রে।"

তা বুঝি আর জানি নে।' তারপর একটু সলজ্জ হাসির সহিত কহিল, 'ছেলের বিয়ে না দিয়ে দেশে ফিরে যাবে না এই-ত। সেটি কিন্তু হচ্ছে না জেনো।"

বলিয়া শশী হাসিতে হাসিতে বাহির হইয়া গেল।

কল্যাণী চুপ করিয়া ঘরের মধ্যে দাঁড়াইয়া রহিলেন। বোধ হয় আজ দীর্ঘ দিন পরে পিতৃ-গৃহের শৈশব-স্মৃতি তাহার চিত্তকে উতলা করিয়া তুলিয়াছিল।

(২)

কর্ম-জীবনের প্রথম কয়-বৎসর মুন্সেফী এবং শেষ চারি বৎসর সাবজজী করিয়া রাজ-মোহন বাবু-বচন পেনসন লইয়া আপনার জন্মভূমি বেল-গাঁয়ে ফিরিয়া আসিলেন, তখন তাঁহার মনে সাধ ছিল যে, যে আবহাওয়ার বাতাসে তিনি তাঁহার প্রথম নিশ্বাস গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই আবহাওয়ার বাতাসেই শেষ প্রশ্বাস ত্যাগ করিবেন। সে প্রায় আটাশ বৎসর আগের কথা।

রাজ-মোহন বাবুর পরিবারের মধ্যে ছিল দুই মেয়ে কল্যাণী ও নলিনী। স্ত্রী বহু-পূর্ব্বেই মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন। বেল-গাঁয়ের ঘর-বাড়ী মেরামত হইলে রাজ-মোহন তাঁহার প্রাপ্ত যৌবনা কিন্তু অবিবাহিতা কন্যা নলিনীকে লইয়া আসিলেন। কল্যাণীর বিবাহ আগেই হইয়া গিয়াছিল। বার্দ্ধক্যের একমাত্র সম্বল, এই কন্যাকে কাছ ছাড়া করিবার ভয়েই হউক আর তাহাকে সুশিক্ষিতা করিবার জন্যই হউক, যে বয়সে সাধারণতঃ বাঙ্গালী মেয়ের বিবাহ হইয়া যায় তাহা পার হইয়া গেলেও রাজ-মোহন কন্যার বিবাহ দেন নাই।

রাজ-মোহনের দেশে ফিরিয়া আসিবার কয়েক মাস পরেই গ্রামে একটা কাণাঘুষা শোনা গেল। ইহার কিছু দিন পরেই গ্রামের লোক এক দিন সকালে উঠিয়া শুনিল যে রাজ-মোহন হঠাৎ আগের রাত্রে নলিনীকে লইয়া কলিকাতায় চলিয়া গিয়াছেন। তার-পর ও গ্রামের লোক কিছু দিন এই সব কথা লইয়া আলোচনা করিয়াছিল। কিন্তু মানুষের রসনা যেমন দ্রুত, স্মরণ শক্তি যেমন প্রখর, স্মরণ-শক্তি তেমন প্রবল নহে।

বিশেষতঃ ইহার কিছু দিন পরেই নলিনীর বিবাহের সংবাদ আসায় এবং রাজ মোহন আর দেশ-মুখী না হওয়ায় লোকে শীঘ্রই তাঁহার পরিবারের কথা ভুলিয়া গেল।

কলিকাতায় ফিরিয়াই রাজ-মোহন একটী দরিদ্র যুবকের সহিত নলিনীর বিবাহ দিলেন। কিন্তু দুগ্রহ বোধ হয় রাজ-মোহনকে শিকার করিয়া ফিরিতেছিল। বিবাহের পরই জামাতাটীর স্বভাব চরিত্র বিগড়িয়া গেল। নিত্য তাহার নূতন অপকীর্ত্তির কাহিনী রাজমোহনের কানে পৌঁছিতে লাগিল। অবশেষে একদিন সে সুরাপানে উন্মত্ত হইয়া এক গণিকার বুকে ছুরি মারিয়া এক বৎসরের জন্য জেল খাটিতে গেল। রাজ-মোহন তাঁহার প্রিয়-কন্যার মুখ চাহিয়া জামাতাকে বাঁচাইবার জন্য অনেক অর্থ ব্যয় করিলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না।

ইহার কিছু দিন পরেই নলিনী একটী পুত্র-সন্তান প্রসব করিল। তারপর, প্রসবের কয়েক দিনের মধ্যেই বিবাহের পর এক বৎসর না ঘুরিতেই নলিনী সূতিকার জ্বরে ইহলোক ত্যাগ করিল।

কন্যার মৃত্যুর পর, রাজ-মোহন, জেল খেরৎ জামাতার ভরণ-পোষণের জন্য কিছু অর্থের বন্দোবস্ত করিয়া, বাকি সমস্ত বিষয় সম্পত্তি জ্যেষ্ঠা কন্যা কল্যাণী ও নলিনীর ছেলে শশীর নামে উইল করিয়া দিয়া কাশী বাসের উদ্যোগ করিলেন। বাবা বিশ্বনাথ তাঁহাকে পায়ে স্থান দিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার ইজারা মহাল কাশী ধামে নহে, খাস রাজধানী বৈকুণ্ঠে। তাহার মৃত্যুর আগে রাজ-মোহনের আর একটা আঘাত পাওয়া বাকি ছিল। কাশী যাওয়ার উদ্যোগ চলিতেছে এমন সময় এক দিন সকালবেলা হঠাৎ এক খানা গাড়ী আসিয়া রাজ-মোহনের বাড়ীর দ্বারে দাঁড়াইল এবং তাহার মধ্য হইতে কল্যাণী, হাতের শাঁখা ভাঙ্গিয়া সিঁথির সিন্দুর মুছিয়া ও বাবা গো বলিয়া উঠানে আসিয়া আছড়াইয়া পড়িল। রাজ-মোহন ইহার পর আর কয়েক দিন মাত্র জীবিত ছিলেন।

প্রকৃতির রাজ্যে শূন্যতা থাকিতে পারে না। তাই শশী শীঘ্রই এই নিঃসন্তান বিধবার মৃত কোল এবং কল্যাণী এই মাতৃহারা স্নেহ বুভুক্ষু শিশুর মৃত হৃদয় অধিকার করিয়া বসিল। কল্যাণীর অজস্র স্নেহে শশী মানুষ হইতে লাগিল। কিন্তু অপরিসীম আদর যত্নের মধ্যেও যাহাতে শশীর শিক্ষার কোনও ব্যাঘাত না হয় সে দিকে কল্যাণী তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতেন। বেল-গাঁয়ের সম্পত্তি ও পিতার জীবন-বীমার টাকার সুদ হইতে যে আয় হইত তাহাতে এই ক্ষুদ্র সংসার বেশ সচ্ছল ভাবে চলিয়া যাইত। সুতরাং কল্যাণী অখণ্ড মনোযোগে তাঁহার পালিত পুত্রের দেহ ও মনের উৎকর্ষ সাধনে ব্যাপৃত রহিলেন। মায়ের অপরিমিত যত্ন ও অবিরাম সাহচর্য্যে শশী কিছু নির্ভর শীল ও ভাবপ্রবণ হইয়া উঠিল। বাহিরে তাহার বন্ধু-বান্ধব ছিল না বলিলেই হয়; এবং পরিচিত লোকের সংখ্যাও খুব কম ছিল। গ্রামে সকলে তাহাকে মুখচোরা বলিত। কিন্তু মায়ের কাছে আসিলেই এই মুখচোরা ছেলেটীর মুখের বাঁধ এবং হৃদয়ের উৎস খুলিয়া যাইত।

এইরূপ সুদীর্ঘ পঁচিশ বৎসর কাটিয়া গেল। শশী খ্যাতির সহিত ডাক্তারী পরীক্ষায় পাশ করিল। কিন্তু, নানা প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া স্বাধীন ভাবে একটা পসার গড়িয়া তুলিবার মত ক্ষমতা শশীর হাতে ছিল না। ইহা কল্যাণীও জানিতেন, শশীও বুঝিত।

সুতরাং সে আর এ সব ঝঞ্ঝাটের দিকে না গিয়া কলিকাতার একটা মেডিক্যাল কলেজে অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করিল। মাতা-পুত্রের জীবন এত দিন গতানুগতিক ভাবে একটানা পথে চলিতেছিল; এখন এক সমস্যা উপস্থিত হইল,—তাহা শশীর বিবাহ।

"সংসারে এক শ্রেণীর লোক আছে যাহারা নূতন কোনও অবস্থার মধ্যে নিজকে সহজে খাপ খাওয়াইতে পারে না, নূতন সঙ্গের মধ্যে পড়িলে ত্যাবাচ্যাকা খাইয়া যায়! যাহা কিছু আজ্ঞাত অথবা অনিশ্চিত তাহাকে তাহারা যতদূর সম্ভব এড়াইয়া চলে। শশীও ছিল অনেকটা সেই ধরণের লোক। বিবাহ করিতে তাহার যে অনিচ্ছা বা অমত ছিল তাহা নহে, তবুও, কার্ত্তিক মাসের দিনে শেষ রাত্রে শীত শীত করে অথচ গায়ের কাপড় খানা টানিয়া লইতে ইচ্ছা করে না,—তেমনি একটা আলস্য,—নূতন ঘাটে স্নান করিতে নামিবার আগে যেমন একটু ভয় ভয় করিতে থাকে, তেমনি একটা অনিশ্চিত আতঙ্ক এতদিন তাহাকে বিবাহ হইতে বিরত করিয়া রাখিয়া ছিল।

বি-এ পাশ করিবার পর হইতেই কল্যাণী শশীকে বিবাহের কথা বলিতেছিলেন। কিন্তু শশী এটা ওটা সেটা নানা ছুতা করিয়া তাহা কাটাইয়া আনিতেছিল। অবশেষে এম-এ পাশ ও হইয়া গেল, চাকরীও হইল তখন আর কল্যাণীর অনুরোধ উপরোধ এড়াইবার উপায় রহিল না। শশী স্বীকার হইয়া বিবাহে সম্মতি দিল। সুতরাং কল্যাণী এবার কোমর বাঁধিয়া শশীর বিবাহের খোঁজে লাগিয়া গেলেন।

(৩)

শ্রাবণ মাস। বেলা তিনটা বাজিয়া গেলেও বোধ হইতেছে যেন ঠিক দুপুর। কল্যাণী নিজের ঘরে বসিয়া ধোপাবাড়ীর কাপড় বাছিতেছিলেন। কি একটা কারণে স্কুলের বন্ধ ছিল, শশী পাশের ঘরে ঘুমাইতেছিল। কাপড় বাছা শেষ হইল কল্যাণী কতগুলি ধোয়া জামাও কাপড় লইয়া শশীর ঘরে ঢুকিলেন এবং র‍্যাকের উপর হইতে ময়লা কাপড় গুলি নামাইয়া ধোয়া কাপড় আস্তে-আস্তে ঝুলাইতে লাগিলেন। এমন সময় শশী ঘুম হইতে উঠিয়া বসিয়া চোখ রগড়াইতে লাগিল এবং মধ্যে মধ্যে এক একবার জানালা দিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া রৌদ্র-রশ্মির তরঙ্গ দেখিতে লাগিল। কতক্ষণ পরে হাতের কাজ সারা হইলে, কল্যাণী বলিলেন,—

"আজও সকালে আমার অনন্ত বাবুর পিসি এসেছিলেন।

অনন্ত-বাবুর মেয়ের সঙ্গে শশীর বিবাহ এক-রকম স্থির হইয়া গিয়াছিল—কয়েকদিন হইল শশী নিজেই গিয়া মেয়েটীকে দেখিয়া আসিয়াছে।

কল্যাণী বলিয়া যাইতে লাগিলেন, 'তিনি বল্লেন যে অঘ্রান মাসে বিয়ে হ'লে তাঁদের কিছু অসুবিধে হয়। আমি কিন্তু অঘ্রাণ মাসের কথাই পীড়াপীড়ি করে ব'লে দিয়েছি।"

শশী কহিল, "এত দিনই যদি অপেক্ষা করে যা, তবে আর দু'এক মাসের জন্য তাঁদের অসুবিধে—

কল্যাণী একটু কৃত্রিম কোপের ভাণ করিয়া কহিলেন, পরের সুবিধে অসুবিধের দিকে তোর ভারি দৃষ্টি দেখ্‌ছি। আমার বুঝি আর সুবিধে অসুবিধে নেই।

শশী কথা কহিল না। সে অর্দ্ধ নিমিলিত চোখে বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিল। বোধ করি তার মনে একখানা সুন্দর মুখের দু'টী সলজ্জ চাহনী উঁকি মারিতেছিল।

কল্যাণী কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া আবার বলিলেন, "এখন আর আর বন্দোবস্ত"———

এই সময় নীচে দরজার কড়া নাড়ার শব্দ এবং সঙ্গে সঙ্গে "বাসায় কে আছেন?" রব শোনা গেল!

"নীচে কে ডাকছে, দেখে আসি বলিয়া শশী সিড়ি দিয়া নীচে নামিয়া গিয়া দরজা খুলিয়া যাহা দেখিল তাহাতে সে অবাক্ হইয়া গেল।

দরজার বাহিরে অল্প বেশী একজন লোক দাঁড়াইয়া আছে। চেহারা দেখিয়া তাহার বয়স অনুমান করা শক্ত; রোগ ও দারিদ্র্য তাহার মুখে অকাল বার্দ্ধক্যের ছাপ মারিয়া দিয়াছে। তাহার গায়ে একটা চিতি পরা শক্ত ইস্ত্রিকরা লংক্লথের সার্ট, তাহার স্থানে স্থানে ছেঁড়া; তাহার মধ্যে দিয়া তাহার সর্ব্বাঙ্গের অসংখ্য ক্ষত-চিহ্ন উঁকি মারিতেছে। তাহার নাসিকার ডগাটী বাম দিকে ঈষৎ হেলিয়া পড়িয়াছে। চোখ দু'টি কোটর গত, তাহার নীচ দিয়া কালশিরা দাগ। তাহার মুখের প্রত্যেক রেখায়, শরীরের প্রত্যেক অঙ্গে অসংযম ও ইন্দ্রিয় পরায়ণতা, হীনতা ও অত্যাচার লেখা রহিয়াছে।

আগন্তুক শশীকে দেখিয়া একটু থত মত খাইয়া গেল। আমূতা আমূতা করিয়া বলিল, 'আপনার—তোমার মাসিমা বাসায় আছেন?

শশী দরজা হইতে নামিয়া একেবারে আগন্তুকের সামনা সামনি গিয়া দাঁড়াইয়াছিল। তাহার মুখনিসৃত তীব্র সুরার গন্ধে টিকিতে না পারিয়া পিছু হটিয়া একটু আশ্চর্য্য হইয়া উত্তর করিল,—'হাঁ'।

তাঁর সঙ্গে একবার দেখা করা দরকার, যদি একবার খবর দাও"—

শশী কুণ্ঠিত ভাবে জিজ্ঞাসা করিল, আপনার পরিচয়টা—

'পরিচয় দিয়ে আর কি হবে? দু'চার মিনিটের কথা। বলগে তাঁর একটী আত্মীয় দেখা করতে চান্।"

বলিতে বলিতে লোকটা হঠাৎ কাশিতে লাগিল। কাশিতে কাশিতে তাহার গলা হইতে খানিকটা রক্ত উঠিয়া তাহার সার্টের উপর দিয়া গড়াইয়া গেল। সে পকেট হইতে একখানা আধময়লা রুমাল বাহির করিয়া রক্তটা মুছিয়া ফেলিল।

শশী আর উচ্চবাচ্য না করিয়া আগন্তুক কল্যাণীর শ্বশুর বাড়ীর কোনও লোক হইবে ভাবিয়া, বলিল, চলুন আপনি।"

তারপর তাহাকে সঙ্গে লইয়া কল্যাণীর ঘরে পৌঁছাইয়া দিয়া নিজের ঘরে গিয়া বসিল।

কল্যাণী তক্তপোষের উপর বসিয়াছিলেন। আগন্তুক-কে দেখিয়াই তাঁহার মুখ শক্ত ও বিবর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং সে তক্তপোষের উপর বসিতেই তিনি একটু সরিয়া গিয়া অদূরে দাঁড়াইলেন।

শশী তাহার ঘরে ঢুকিতেই কল্যাণী খাট গলায় কিন্তু ক্রুদ্ধস্বরে বলিলেন, "আবার তুমি এসেছ! তোমার লজ্জা করে না— শশী যে বাড়ীতে!

আগন্তুক কহিল, 'শশী যে বাড়ীতে তা জান্তাম না। ভেবেছিলাম সে কলেজে আছে। আর আমার দোষ কি দিদি, সেদিন শেষ কথা দিলে ত আর আজ আসতে হ'ত না।"

কল্যাণীর মুখ রাগে লাল হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন, "আমি আমার শেষ কথা ত সেদিন-ই ব'লে দিয়েছি।"

আগন্তুক এবার একটু উচ্চভাবে বলিল, 'আমিও আজ আমার শেষ কথা বলতে এসেছি। আমার এখন থেকে কিছু কিছু টাকা দেবে কি না জানতে চাই।

"আমিত সেদিনই বলেছি যে সম্পত্তি আমার হ'লে আপত্তি ছিল না। তবে শশীর সম্পত্তি—'

'আগন্তুক কল্যাণীর মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া একটু বিদ্রূপের সুরে কহিল, সম্পত্তি শশীর কি করে, তা আমার চেয়ে জানা আছে। এখন কাজের কথা বল।'

কল্যাণী অধোমুখে বসিয়া রহিলেন। তাঁহার মুখে যুগপৎ ক্রোধ ও ঘৃণা, ক্ষোভ ও উপায়হীনতা ফুটিয়া উঠিয়াছিল।

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কল্যাণী বলিলেন, "আচ্ছা তাই হবে। কিন্তু তার আগে প্রতিজ্ঞা কর—

'এ বাসায় আর পদার্পণ করব না এইতো! তা টাকা পেলে আর কোন্ শালা-এ বাড়ীর মাটি মাড়ায়!"

তারপর কিছুক্ষণ থামিয়া আবার বলিতে লাগিল, "মামলা মোকদ্দমা করলে এর চেয়ে অনেক বেশী পাওয়া যেত, তবে কিনা মামলা মোকদ্দমা খরচের কাজ। আর নলিনীর ছেলের প্রতিও আমার একটা কর্ত্তব্য আছে— বলিতে বলিতে উঠিয়া দাঁড়াইল।

কল্যাণী শুধু একবার বলিলেন, উঃ একেবারে অধঃপাতে গেছ।"

আগন্তুক যাইতেছিল; এই কথা শুনিয়া থামিল। কল্যাণীর দিকে ফিরিয়া বলিল, "অধঃপাতে, হাঁ অধঃপাতেই গেছি বটে। কিন্তু দোষ কি শুধু আমার একলারই, আর কারও কি দোষ নেই, আর কেউ কি এর জন্য দায়ী নয়—

বলিতে বলিতে সে ভয়ানক কাশিতে লাগিল। গলা হইতে আবার খানিকটা রক্ত উঠিয়া তাহার ঠোঁট রঞ্জিত করিয়া ফেলিল।

কল্যাণী শিহরিয়া উঠিলেন। রুমাল দিয়া মুখ মুছিয়া সে আবার কি বলিতে যাইতেছিল। কল্যাণী দরজার দিকে হাত বাড়াইয়া অস্ফুট-গর্জ্জনে কহিলেন—'যাও।' ক্রোধে তাঁহার কণ্ঠরোধ হইতেছিল।

আগন্তুক একবার কল্যাণীর মুখের দিকে চাহিল। তারপর আর কথা বলিতে সাহস না করিয়া আস্তে আস্তে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

কল্যাণী কিছুক্ষণ স্তম্ভিতের মত দাঁড়াইয়া রহিলেন। তারপর ধীরে ধীরে আপনার আসনে ফিরিয়া আসিয়া, বসিয়া পড়িয়া, শূন্য দৃষ্টিতে বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

'ওকে এসেছিল, মা' বলিতে বলিতে শশী ঘরে ঢুকিল। তার চোখে কৌতূহল, ঘরে উৎসুক্য।

কিন্তু ঘরে ঢুকিয়া কল্যাণীর মুখের দিকে চাহিয়া সে চমকিয়া উঠিল। সে মুখ মরা মানুষের মুখের মত বিবর্ণ।"

শশী কল্যাণীর দিকে অগ্রসর হইয়া,বলিল, "তোমার হয়েছে কি মা! বলনা ও লোকটা কে! এবার তাহার চোখে ভীতির ছায়া, কণ্ঠস্বরে উৎকণ্ঠা।

কল্যাণী শূন্য দৃষ্টিতে একবার শশীর মুখের দিকে চাহিলেন—যেন শশীর প্রশ্ন তাঁহার কাণে ঢুকিতেছিল না!

শশী আবার প্রশ্ন করিল। কল্যাণী এবারে তাঁহার সমস্তখানি শক্তি কেন্দ্রীভূত করিয়া হঠাৎ বলিয়া ফেলিলেন, 'ও, ও তোর বাপ।' তুমি পাগল হলে নাকি মা; বলনা ও কে এসেছিল?" এবার শশীর স্বরে যন্ত্রণা ফুটিয়া উঠিয়াছিল।

'সত্যই বল্‌ছি, শশী, সত্যই ও তোর বাপ, বলিতে

বলিতে কল্যাণীর ঘর আসী হইয়া আসিল। পরমুহূর্ত্তেই তাহার দুই কপোল ভাসাইয়া অশ্রুর ধারা ছুটিল।

শশী কিছুক্ষণ বজ্রাহতের মত দাঁড়াইয়া রহিল। তারপর টলিতে টলিতে নিজের ঘরে গিয়া বিছানার উপর গড়াইয়া পড়িল।

(৪)

এই ঘটনার পর তিন দিন অতীত হইয়াছে। শশী সেই দিন যে ঘরে ঢুকিয়াছে তারপর আর নেহাৎ দরকার না হইলে বাহিরে আসে নাই। কলেজে চিঠি লিখিয়া কয়দিনের ছুটি লইয়াছে।

আগেই বলা হইয়াছে যে নলিনীর বিবাহের কিছুদিন পরেই তাহার স্বামী সতীশের, একটা পতিতা রমণীকে ছুরি মারিবার অপরাধে এক বৎসরের কারাদণ্ড হয়। তাহার জেল হইতে ফিরিবার পূর্ব্বেই রাজমোহনের মৃত্যু হয়। জেল হইতে ফিরিয়া, শ্বশুরের প্রদত্ত টাকা লইয়া সে কিছুদিন উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন করিয়া অল্পদিনের মধ্যেই সে টাকা উড়াইয়া দিল। তারপর দারুণ দুর্দ্দশায় পতিত হইয়া সে একদিন কোথায় নিরুদ্দেশ হইয়া গেল!

তারপর এই সুদীর্ঘ পাঁচশ বৎসর তাহার আর কোনও খোঁজ পাওয়া যায় নাই। এই ঘটনার কয়েকদিন আগে হঠাৎ সে ফিরিয়া কল্যাণীর নিকট টাকা চাহিয়া বসিল। শশী তখন বাসায় ছিল না। কল্যাণী তাহাকে টাকা দিতে অস্বীকার করিয়া ফিরাইয়া দিয়াছিলেন। তারপর আবার সেদিন টাকা চাহিতে আসিতেই সে শশীর সামনে পড়িয়া গেল।

শশীর নিকট আর সকল কথা গোপন করিবার চেষ্টা বৃথা জানিয়া কল্যাণী তাহাকে তাহার পিতার পরিচয় দিলেন, আর সেই সঙ্গে তাহার চরিত্রও অতীত ইতিহাসের কথা বলিতেও বাধ্য হইলেন। ইহাতে শশী দারুণ আঘাত পাইবে তাহা কল্যাণী জানিতেন; তবে এই আঘাতে যে সে একেবারে মুষড়িয়া যাইবে তাহা আগে ভাবিতে পারেন নাই। তিনি দুই একদিন শশীকে নানা কথায় ভুলাইতে গিয়াছিলেন, কিন্তু শীঘ্রই বুঝিতে পারিলেন যে তাঁহার কথা শশীর কাণে ঢুকিতেছে না। তিনি সময়ের উপর এই রোগের আরোগ্যের ভার দিয়া নিজেকে নানা গৃহকার্য্যে ব্যাপৃত করিলেন। কিন্তু শশীর সেই বিবর্ণ মুখখানা মনে পড়িয়া তাহার মায়ের অন্তর হাহাকার করিয়া ফিরিতে লাগিল।

জন্মের পর শশী এর পূর্ব্বে তাহার পিতাকে দেখে নাই বলিলেও চলে। বড় হইয়া একটু জ্ঞান হইতেই শশী, কল্যাণী ও আর পাঁচ জনের নিকট শুনিয়াছিল যে তাহার পিতা দেশত্যাগী হইয়াছেন। দেশত্যাগী বলিতে আমাদের দেশে সাধারণতঃ সন্ন্যাসী হওয়া বুঝায়। শশীও অনেকটা তাহাই বুঝিয়াছিল। একদিন তাহার পিতা তাঁহার তপস্তাক্লিষ্ট, তেজঃপুঞ্জ কলেবর লইয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইবেন এরূপ কল্পনাও সে মাঝে মাঝে করিত। কিন্তু হায়, কল্পনার রাগ ছিন্ন করিয়া তাহার পিতার বাস্তবমূর্ত্তি যখন তাহার সম্মুখে দাঁড়াইল, তখন আর যাহাই হউক, তিনি যে জপ তপ উপাসনায় তাঁহার জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন এরূপ সন্দেহ করিবার কোনও অবকাশই রহিল না।

তাই সারা অঙ্গে জীবনব্যাপী নানা দুষ্কর্ম্মের সহস্র সাক্ষী লইয়া তাহার পিতার মূর্ত্তিখানার কথা যখন তাহার মনে পড়িতে লাগিল, তখন সর্ব্ব দেবতাকে প্রীত করিবার লোভ ও পিতার প্রতি তাহার শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে পারিল না। তাহার বারে বারে মনে পড়িতে লাগিল তাহার পিতার চক্ষের একটা অতৃপ্ত লালসার অস্বাভাবিক বুভুক্ষু দৃষ্টি,—যে লালসা তাহাকে পুড়িয়া খাক্ করিয়াছে কিন্তু নিজে নির্ব্বাপিত হয় নাই। এই লালসাই শশীর দেহে প্রাণের সঞ্চার করিয়াছে, হৃদয়ে স্পন্দন তুলিয়াছে, শিরায় রক্তস্রোত বহাইয়াছে। মুহূর্ত্তমধ্যে শশীর বোধ হইতে লাগিল যেন তার সমস্ত পরাণে অসংখ্য কৃমি কীট বিচরণ করিতেছে। নিজের প্রতি দারুণ ঘৃণায় তাহার নিশ্বাস রোধ হইবার উপক্রম হইল।

আর এই পিতার সমস্ত হীনতা, সমস্ত পাপ ও ব্যাধি তাহাতেও বর্ত্তিয়াছে। সন্তান যে পিতার উত্তরাধিকারী, শুধু ধন সম্পত্তির নহে,—দেহ ও মনেরও বটে। তাহার দেহের প্রত্যেক রক্তাণুতে এই পশুত্বের বীজ সে বহন করিতেছে। সত্য বটে শিক্ষা ও আবেষ্টনের গতিকে এই বীজ অঙ্কুরিত হইতে পারে নাই। কিন্তু যদি কখনও সামান্য মাত্র অনুকূল অবস্থা পায় তবেই ত এই বীজ হইতে শত শত বিষবৃক্ষ উঠিয়া তাহার জীবনাকাশ ছাইয়া ফেলিবে। আর ভাগ্যক্রমে সে যদি বাঁচিয়াই যায়, তবেও কি এর শেষ হইল? তাহা ত নহে। আজ বাদে কাল সে বিবাহ করিতে যাইতেছে। দেহ ও মনের এই রোগ বীজ যে বংশানুক্রমে তাহার পুত্র পৌত্রাদির মধ্যে সংক্রামিত হইবে আর যেখানে একটু উর্ব্বরক্ষেত্র পাইবে সেখানেই এই সুপ্ত বীজ হইতে শত শত রক্তবীজ জন্মিয়া উঠিবে। যে গরলের প্রস্রবণ তাহার মধ্যে শুরু হইয়া আছে, সেকি তাহার মুখ খুলিয়া দিয়া অগণ্য লোকালয়ের মধ্য দিয়া বিষের ধারা বহাইবে? সংসারের পাপের ভার, দুঃখের ভার বৃদ্ধি করিবার জন্যই কি তাহার জন্ম হইয়াছিল?

বিবাহের কথা মনে পড়িতেই একখানা সুন্দর মুখের দুটি সলজ্জ চোখের চাহনি, অন্ধকার রাত্রে সুদূর দিগন্তে

"সঙ্গিনী"

[একটি বিলাতী চিত্র হইতে]

দৃষ্টি সার্চলাইটের মত, তাহার মনের এক কোণে, ক্ষণেকের জন্ত উঁকি মারিয়া বিলীন হইয়া গেল। না, না, বিবাহ তাহার পক্ষে অসম্ভব। সে কি তুচ্ছ ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির জন্ত এক অভিশপ্ত বংশের সৃষ্টি করিবে? সে কি সব জানিয়া শুনিয়াও তাহার ভবিষ্যৎ বংশীয়দের মধ্যে ব্যাধি ও অকালমৃত্যুর বীজ বপন করিয়া যাইবে? মুহূর্ত্তের জন্ত তাহার কাণের কাছে, কত পুত্রহারা জননী, কত স্বামী-হীনা বালবিধবার অন্তরন্তম আর্ত্তনাদ ধ্বনিত হইয়া উঠিল; সে শিহরিয়া উঠিল। না, না, তাহার স্পর্শে ব্যাধি, নিশ্বাসে পাপ, সংসর্গে মৃত্যু। মানব সমাজে আর তাহার স্থান নাই।

তখন শশীর মনে হইতে লাগিল, ব্যর্থ! ব্যর্থ তাহার জন্ম, ব্যর্থ তাহার জীবন, ব্যর্থ তাহার শিক্ষা দীক্ষা। তাহার জীবন যাত্রার মধ্য পথে ব্যর্থতার এক বিরাট পাষাণ প্রাচীর মাথা তুলিয়াছে; পার হইবার উপায় নাই, শুধু এই পাষাণে মাথা ঠুকিয়া জীবনের বাকি দিন কয়টা কাটাইয়া দেওয়া।

ব্যর্থ, কিন্তু কার দোষে? কোন্ অপরাধে তাহার এই উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ মরীচিকার মত দিগন্তে মিলাইয়া গেল? হায় কবে কোন্ নিষ্ঠুর অদৃষ্টদেবতার একতরফা বিচারে তাহার চির নির্ব্বাসনের হুকুমজারি হইয়া গিয়াছে। সে নিজের পক্ষ সমর্থন করিতে ত পাইলই না, কোন অপরাধে তাহার এই কঠোর শাস্তি তাহাও জানিতে পারিল না।

মুহূর্ত্তের জন্ত একটা অক্ষম ক্রোধে, শশীর গা হইতে মাথা পর্য্যন্ত জ্বলিয়া উঠিল। চোখ দান দিয়া যেন আগুনের হল্কা বাহির হইতে লাগিল। সমস্ত শরীরের রক্ত যেন চোখ দুইটার মধ্যে আসিয়া ঘুটিয়া বাহির হইবার পথ পাইতেছে না। চোখ দুইটা যেন এখনই ফিকরাইয়া বাহির হইয়া যাইবে। সে 'মা গো' বলিয়া একটা অস্ফুট আর্ত্তনাদ করিয়া দুই হাতে সবলে বালিশ আঁকড়াইয়া ধরিয়া তাহার মধ্যে মুখ গুঁজিয়া পড়িয়া রহিল।

পরমুহূর্ত্তেই কল্যাণী ধীরে ধীরে গৃহে প্রবেশ করিয়া শশীর পাশে বসিয়া নীরবে তাহার মাথায় হাত বুলাইতে লাগিলেন। অন্তর বন্যা তখন যেন বাঁধ ভাঙ্গিয়া হু হু শব্দে বাহির হইয়া আসিল। শশী কল্যাণীর কোলে মাথা গুঁজিয়া বালকের মত লুটাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

* * * *

কয়দিন পরে কল্যাণী একদিন বলিলেন, "শশী, অনন্ত বাবু কাল আবার লোক পাঠিয়েছিলেন। পাকা দেখার একটা দিন ঠিক করতে হয়।

শশী স্থির কণ্ঠে কহিল, 'আমি বিয়ে করব না, মা; তুমি অনন্ত বাবুকে বলে পাঠাও।"

কল্যাণী এ আশঙ্কা অনেকটা করিয়াছিলেন। তিনি কিছু বলিলেন না, শুধু শশীর মুখের দিকে চাহিলেন।

শশী শান্তভাবে বিবাহে তার আপত্তির কারণ বিবৃত করিয়া কহিল, "সংসারে পাপ তাপ, দুঃখ কষ্ট বহু আছে, মা; আমি আর তা বাড়াতে চাই না।"

তখন কল্যাণী তাহাকে নানা কথায় বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন; বিবাহ না করার পক্ষে তাহার যুক্তিগুলি যে অত্যন্ত ছেলেমানুষী তাহা দেখাইয়া দিলেন; দৃষ্টান্ত স্বরূপ ওপাড়ার হরিহর চক্রবর্ত্তীর সর্ব্বাঙ্গে কুষ্ঠরোগে খসিয়া গেলেও, তাহার কেমন সোণারচাঁদ ছেলে হইয়াছে তাহার উল্লেখ করিলেন, এবং সে যে অত্যন্ত বাড়াবাড়ি করিতেছে তাহাও একবার বলিলেন। পরিশেষে একে একে রাগ, অভিমান, আহার ত্যাগ, শ্বশুর বাড়ীতে চলিয়া যাওয়া এবং কাশীবাস করার ভয় প্রদর্শন ইত্যাদি সমস্ত নিষ্ফল হইলে কল্যাণী অনন্ত বাবুকে না করিয়া পাঠাইলেন।

(৫)

ইহার পর আরও কয়েকদিন চলিয়া গেল। শশী প্রথমে একবার, পড়াশুনা ও কলেজের কাজে নিজেকে ব্যাপৃত করিয়া নিজের জীবনকে আবার অভ্যস্ত পথে চালাইতে চেষ্টা করিল। কিন্তু শীঘ্রই সে বুঝিতে পারিল যে লক্ষ্য যখন বদলাইয়াছে, তখন পথও বদলাইতে হইবে! অভ্যস্ত কোনও কাজেই সে মন বসাইতে পারিল না। অবশেষে কলেজের কাজ একান্ত অসহ্য হইয়া উঠায়, সে একদিন কাজে ইস্তাফা দিয়া আসিল। মনে মনে বলিল, সংসার আমার কাছে কিছু চায় না, আমিও সংসারের কাছে কিছু চাই না। তবে আর এ ছুতের বেগার কেন!

হাল হাঁড় না থাকিলে নৌকা যেমন অনুকূল স্রোতে ভাসিয়া চলে, শশীর জীবনও তেমনি সংসারস্রোতে ভাসিয়া চলিল। আশা নাই, উৎসাহ নাই, সংগ্রাম নাই,—শুধু একটানা চলিয়া যাওয়া; গন্তব্যস্থান না থাকে, নাই থাকুক, তবুও চলিতে হইবে,—যে পর্য্যন্ত না মহাসমুদ্রের অনন্ত নিশ্চলতার মধ্যে সমস্ত গতির অবসান হয়।

কল্যাণী মধ্যে মধ্যে এক এক বার শশীর ঘরের দিকে যাইতেন। দেখিতেন, শশী হয় সামনে একখানা বই খুলিয়া চুপ করিয়া চেয়ারের উপর বসিয়া আছে, নয়, জান বাহুতে মুখ ঢাকিয়া বিছানার মধ্যে শুইয়া আছে। একটা অব্যক্ত বেদনায় তাঁহার মায়ের অন্তর টন্-টন্ করিত। তিনিও নীরবে গৃহকোণে চোখের জল এবং দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া দিন কাটাইতে লাগিলেন। অবশেষে একান্ত দুঃসহ হইয়া উঠিলে, শশী একদিন কল্যাণীকে বলিল, "মা, আমি কয়দিন একটু ঘুরে আসি।"

এ অবস্থায় শশীকে কাছ-ছাড়া করিতে কল্যাণীর মন উঠিতেছিল না। তথাপি নূতন দেশের নব নব দৃশ্য এবং

নূতন আবহাওয়ায় শশীর দেহ ও মনের স্বাস্থ্য অনেকটা ফিরিয়া আসিতে পারে ভাবিয়া তিনি অনিচ্ছা-সত্ত্বেও সম্মতি দিলেন। অবশেষে যাত্রার সময় উপস্থিত হইলে কল্যাণী শশীকে গাড়ীতে তুলিয়া দিবার জন্য বাড়ীর দরজায় দাঁড়াইলেন। শশী ইহার আগে কল্যাণীকে ছাড়িয়া নানা জায়গায় গিয়াছে। কিন্তু আজ তাহার শুকনা মুখের উদাস দৃষ্টি কল্যাণীর বুকে শত শত হাতুড়ী মারিতে লাগিল। শশী যখন তাঁহার পায়ের উপর উবুড় হইয়া প্রণাম করিল, তখন ক্রন্দন তাহার বুক ঠেলিয়া উঠিতেছিল। অবাধ্য চোখের জল পাছে শাসন না মানে, সেই ভয়ে তিনি কথা বলিতে পারিলেন না। শুধু আপনার শীতল হস্ত শশীর উত্তপ্ত ললাট ও মস্তকে একবার বুলাইয়া দিলেন। তারপর "তবে আসি মা, বলিয়া শশী, গাড়ীতে চাপিয়া বসিল। গাড়োয়ান গাড়ীর দরজা আটকাইয়া দিয়া কোচবাক্সে চড়িয়া বসিয়া ঘোড়া হাঁকাইয়া দিল। কিন্তু গাড়ী গলির মোড়ে অদৃশ্য হইয়া যাইবার পূর্ব্বেই কল্যাণীর চোখের জলে খোলা দৃষ্টির সম্মুখে সমস্ত কলিকাতা সহর ঝাপ্‌সা হইয়া উঠিল।

(৬)

কলিকাতা হইতে বাহির হইয়া শশী পুরীতে গেল। সেখানে সমুদ্রের অস্ফুট গর্জ্জন শুনিয়া শশীর মনে হইল, বুঝি তাহারই মত সিন্ধুরও বুকে কি একটা অব্যক্ত বেদনা যুগান্তকাল হইতে দিন রাত গুমরিয়া মরিতেছে, বাহির হইবার পথ পাইতেছে না। যদি কখনও পথ পায় তবে যেন এক বিরাট আর্ত্তনাদে সমস্ত পৃথিবী কাঁপাইয়া তুলিবে। পুরীতে কয়েক দিন থাকিয়া শশী একদিন চিল্কার গেল এবং সেখানে ঘুমন্ত হ্রদকে সূর্য্যাস্তের বিচিত্র বর্ণচ্ছটা দেখিয়া সে আবার ছোট-নাগপুরের দিকে ফিরিল। ছোট-নাগপুরের দ্রষ্টব্য স্থান গুলি একে একে দেখা হইয়া গেল। কিন্তু কোনও স্থানেই শশী পাঁচ সাত দিনের বেশী টিকিতে পারিল না। জায়গায় নূতনত্ব চলিয়া যাইতেই তাহার মনের বেদনা আবার নূতন করিয়া জাগিয়া উঠিত। সে আবার পাগলের মত নূতন স্থানের উদ্দেশে ছুটিয়া বাহির হইয়া পড়িত। অবশেষে সে একদিন ছোট-নাগপুর অতিক্রম করিয়া বিলাসপুর হইতে, মধ্য-প্রদেশের গিরি ও অরণ্যের ভীষকান্ত শোভা দেখিতে দেখিতে জব্বলপুরের দিকে চলিল। জব্বলপুর হইতে কিছুদূরে যেখানে নর্ম্মদা-তপ্ত অট্টহাসিনী নর্ম্মদাকে বল নিঃশেষে দান করিয়া আপনি পাষাণ হইয়া গিয়াছে তাহারই সন্নিকটে শশী একটা বাঙ্গলা ভাড়া লইল; ইচ্ছা,—কিছু দিন সেখানে থাকিবে। নর্ম্মদার জল-প্রপাতঃ ধুয়ন-মহল, দেওতাল প্রভৃতি জব্বলপুর ও আশে পাশের দ্রষ্টব্য স্থান গুলি দেখিতে দেখিতে কয়েক দিন কাটিয়া গেল। তারপর শশীর মন আবার অস্থির হইয়া উঠিল। কিন্তু ঘোরা ঘুরিও আর ভাল লাগিতেছিল না। বিশেষতঃ পথশ্রমে, অনিয়মে এবং উদ্বেগে তাহার স্বাস্থ্য ও ক্রমে ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল। তাই শশী অনেকটা জোর করিয়াই জব্বলপুরে কিছু দিন রহিল। অবশেষে একান্ত অসহ্য হইয়া উঠিলে, শশী একদিন জব্বলপুর ছাড়িয়া বোম্বাই-এর দিকে যাইতে প্রস্তুত হইল। সে তাহার মারাঠা চাকরটার সাহায্যে জিনিষ-পত্র বাঁধাবাধি করিতেছে এমন সময় ডাক-পিয়ন আসিয়া একখানা চিঠি দিয়া গেল। চিঠি খুলিয়া শশী দেখিল কল্যাণী লিখিয়াছেন। এ পর্য্যন্ত শশী যেখানেই গিয়াছে সেখান হইতেই কল্যাণীকে নিয়ম মত চিঠি পত্র লিখিয়াছে। কিন্তু সে কখন কোথায় থাকে তাহা ঠিক না থাকায় কল্যানী তাহাকে দীর্ঘ কাল পত্রাদি লিখিতে পারেন নাই। আজ দীর্ঘ দিন পরে কল্যাণীর এই পত্র খানার মধ্যে শশী যেন মায়ের সস্নেহ হস্তের শীতল স্পর্শ অনুভব করিল। সে তাড়াতাড়ি হাতের কাজটুকু সারা করিয়া চেয়ার খানা দরজার কাছে টানিয়া লইয়া চিঠি খানা খুলিয়া পড়িতে লাগিল।

চিঠি খানায় লেখা ছিল :—

বাবা শশী,—

যাইবার সময় তুই যে বিষম ঘুঁষ লইয়া গিয়াছিস্ তাহা অহরহ আমার প্রাণে বাজিতেছে। তাই এখানে একটুকু ও শান্তি পাইতেছি না। তোর এই কষ্ট আমাকে আরও বেশী আঘাত করিতেছে এই জন্য যে এর জন্য আমার দায়ীত্ব বড় কম নয়। আমি যদি সে দিন, তুচ্ছ সংস্কার এবং ততোধিক তুচ্ছ সমাজের ভয়ে মিথ্যার আশ্রয় না লইতাম। সত্যিই শশী,—তোর মায়ের দুর্ব্বলতা ক্ষমা করিস্, আমি সে দিন মিথ্যা কথা বলিয়াছি। শুধু সে দিন নয়, আজ পঁচিশ বৎসরের বেশী আমি এই মিথ্যাকেই হৃদয়ে পোষণ করিতেছি। বোধ হয় এইরূপই চলিত, যদি সে দিন আমার অন্তরের মিথ্যাই যেন সত্যের রূপ ধরিয়া আমার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত না হইত। আমি আমার চিরকালের মিথ্যাকে তাহার নিজ মূর্ত্তিতে দেখিয়া শিহরিলাম। কিন্তু তখনও সত্যের আশ্রয় লইতে পারি নাই। কিন্তু মানুষের মন অন্তর্যামী, মানুষের স্নেহ ভক্তি যে নদী-প্রবাহের মত আপনার পথ আপনিই খুঁজিয়া লয়। তাই আমি তোর জন্ম-কাহিনীর যে কথাটা গোপন করিয়া গিয়াছি, তাহা তোর অন্তরের মধ্যে আপনা হইতেই ধরা পড়িয়া গিয়াছে। তাই এই লোকটাকে পিতা বলিয়া মানিয়া লইতে বিদ্রোহ করিতে চাহিতেছে। তোর মন তোকে ঠিকই চালাইয়াছে, শশী; সত্য ও তোর পিতা নয়। তোর পিতা,—আমার মনে হয় ও জগবান্,

তুইও মনে বল কর শশী, তোর পিতা আমার বেল-গাঁয়ের জমিদার হরিশ-বাবু।——

পড়িতে পড়িতে শশীর মনে হইতে লাগিল, অক্ষর-গুলি যেন হঠাৎ সারা চিঠিময় ছুটাছুটি আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। ক্রমে তাহাদের বেগ এত বাড়িয়া উঠিল, যে সমস্ত চিঠি খানা যেন কালিতে লেপিয়া গেল। তার পর সব আপনা হইয়া উঠিল; যেন সমস্ত কালির দাগ মুছিয়া গিয়া কাগজ খানা আবার সাদা হইয়া গিয়াছে। সে কিছুক্ষণ অভিভূতের মত বসিয়া রহিল। তারপর দুই হাতে আপনার চোখ রগড়াইয়া দৃষ্টি আবার অনেকটা সাফ করিয়া লইল। আবার পড়িতে লাগিল:—

'তোর জন্মের সব কাহিনী আমি সবিস্তারে বলিতে পারিব না। তবে এই-টুকু জানিয়া রাখ্ যে তোর মায়ের বিবাহের বছর-খানেক আগে বাবা তাকে লইয়া বেল-গাঁয়ে যান। জমিদারের ছেলে হরিশ—সে তখন যুবক—আমাদের বাড়ী প্রায়ই আসিত। এই উচ্চ-শিক্ষিত প্রিয়-দর্শন যুবক বাবার হৃদয়ে পুত্রের স্থান অধিকার করিয়াছিল। তাই ঘরে বাইরে তার অবাধ গতি ছিল। তোর অভাগিনী মা মজিল। বাবা একথা টের পাইতেই নলিনীকে কলিকাতায় লইয়া আসিয়া হাতের কাছে সতীশকে পাইয়া তারই সঙ্গে ওর বিবাহ দিলেন। কিন্তু বাবা বোধ হয় তখন জানিতেন না,—আর তোর মা—সে তখন বালিকা—বোধ হয় বুঝিতে পারে নাই যে হতভাগিনী তার পূর্ব্বেই আপনার দেহ মাতৃত্বের কলঙ্ক ধারণ করিয়াছে। মাতৃত্বের মত গৌরব নারীর আর নাই। যে নারীর সেই গৌরব কলঙ্কে পরিণত হয় তাহার সেই বিরাট-লজ্জা মৃত্যুর অন্ধকার ব্যতীত আর কিছুতে ঢাকিতে পারে না। ইহা অভাগিনী বুঝিয়াছিল। কিন্তু ভগবান তাহার মধ্য দিয়া যাহাকে এ সংসারে পাঠাইয়াছিলেন তাহাকে পৌঁছাইয়া দিবার জন্যই সে কিছু দিন ধৈর্য্য ধরিয়া রহিল। কিন্তু আত্মহত্যা করিয়া তাহাকে আর পাপের বোঝা বাড়াইতে হয় নাই। তোর জন্মের কয়েক দিন পরেই ভগবান তাঁর এই বিপথ-গামিনী কন্যাকে আপনার কাছে টানিয়া লইলেন। তোকে আজ তোর মায়ের শেষ অনুরোধ জানাইয়া আজকার মত বিদায় লইব। তিন দিন অজ্ঞান থাকিবার পর মৃত্যুর কয়েক ঘণ্টা আগে যখন তার জ্ঞান হইল তখন সে চোখের জলে ভাসিয়া আমার কোলের দিকে তোকে ঠেলিয়া দিয়া বলিয়াছিল, 'দিদি,' আমার এই ভাঁড়া টুকু যদি বাঁচে আর বড় হইয়া সে যদি তার জন্ম-কাহিনী শোনে তবে যেন সে তার দুঃখিনী মাকে ক্ষমা করে। সত্যই, শশী, সত্যই তোর মা বড় দুঃখিনী। তার মত দুঃখিনী আর নাই বুঝিবে। মা হইবার যে বেদনা তাহা সে ভোগ করিল, কিন্তু মাতৃত্বের যে গৌরব তাহা সে পাইল না। তুই যেন তার প্রতি কোনও বিরুদ্ধ ভাব পোষণ করিস্ না। সে, আর যাই হউক, তোর মা; মা হইবার যে সাধনা, যে ব্যথা তার কোনটা হইতেই যে সে রেহাই পায় নাই। সে যে নিজের রক্তিম নাড়ীর বন্ধন-ছিন্ন করিয়া এই সংসারে আনিয়াছে, তার নিজের রক্ত দিয়া তোর শিরায় রক্তের স্রোত বহাইয়াছে, নিজের নিশ্বাসের তাপ দিয়া তোর দেহে প্রাণের স্পন্দন আনিয়াছে। সে যে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, তোরই জন্য তার বুকে ক্ষীর এবং হৃদয়ে স্নেহ সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছিল। আমার শেষ অনুরোধ এই, তুই তোর দুঃখিনী অভাগিনী মাকে ক্ষমা করিস্।

আর শশী, তুই তোর জন্ম-কাহিনী লইয়া আর মন খারাপ করিস্ না। তুই তোর জন্মের কথা ভুলিয়া যা, মনে কর তুই আমার কুড়ানো ছেলে। তোর শুকনা মুখ খানা মনে করিয়া আমার বুক যে কাটিয়া যাইতেছে। তুই আমার কোলের ছেলে, কোলে ফিরিয়া আয়। তোর মুখের হাসি দেখিয়া আমার প্রাণ জুড়াক। ইতি—

তোর মা—অকল্যাণী।

পড়া শেষ হইলে শশী কিছুক্ষণ চোখ বুজিয়া চিঠিখানার ভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে লাগিল। উত্তেজনার পর উত্তেজনা আঘাতের পর আঘাত তাহার বুদ্ধিবার শক্তিকে ভোতা করিয়া ফেলিয়াছিল। তারপর হঠাৎ তাহার মনে হইল, সে কথা দেখিতেছে না ত! সে নিদ্রিত না জাগ্রত পরীক্ষা করিবার জন্য টেবিলের উপর হইতে কাগজ চাপা দেওয়ার একখানা পাথর লইয়া নিজের বাম বাহুতে নিষ্ঠুর-ভাবে আঘাত করিতে লাগিল। তারপর আঘাতে যন্ত্রনায় অভিভূত হইয়া গৃহময় ছুটিতে লাগিল।

এই অপ্রত্যাশিত আঘাতের প্রথম ধাক্কা অনেকটা সামলাইলে সে আবার চেয়ারের উপর বসিয়া পড়িল। আজ কয়েক দিন হইল তাহার মনে হইতেছিল, যদি সে তাহার অতীতটা মুছিয়া ফেলিয়া দিয়া জীবনটা নূতন করিয়া আরম্ভ করিতে পারিত! তাহার বাসনা, তাহার প্রার্থনা সফল হইয়াছে; আজ তাহার পুনর্জন্মই হইল বটে।

সে দিন কল্যাণীর সহিত সতীশের কথাবার্ত্তার সময় সতীশের একটা কথা তাহার কানে ঢুকিয়াছিল। সতীশ 'নলিনীর ছেলে' এই কথা বলিয়া শশীর উল্লেখ করিয়াছিল। এই কথা যখনই শশীর মনে পড়িত তখনই সে একটু বিস্মিত হইত। আজ সে বুঝিতে পারিল যে, নলিনীর ছেলে হইলেও সে সতীশের কেহই নহে! এই কথাটা মনে পড়িতেই শশী একটা গভীর আরামের নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। এই লোকটা তাহার

পিতা নহে! ওর সমস্ত রোগ সমস্ত হীনতা উত্তরাধিকার সূত্রে তাহাতে বর্ত্তে নাই। তাহাকে ত আর তার পিতার পাপের জন্য জীবন ভরিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে না। তা, হউক সে পিতামাতার অবৈধ সন্তান। বৈধ-বৈধের কথা ভাবিতে যাইয়া সে দেখিল যে, যাহার উপর সন্তানের জন্মের বৈধতা নির্ভর করে সেই বিবাহ সমাজের একটা অর্থ-হীন অনুষ্ঠান ব্যতীত আর কিছুই নহে। যাহা প্রচণ্ড শক্তিতে বিশ্বের নর-নারীকে পরস্পরের দিকে টানিতেছে, যাহা মধ্যাকর্ষণের মত বিশ্বব্যাপী ও সার্ব্বজনীন সেই প্রেম যাহাকে স্থির করিতে পারিল না,—গুটি-কতক অর্থহীন মন্ত্র যাহা ভাষাভেদে ভিন্ন, এবং তদোধিক অর্থহীন অনুষ্ঠান যাহা দেশ-ভেদে পৃথক্—তাহার সিদ্ধতা সম্পাদন করিবে? যেখানে নর-নারীর অন্তরে মিলন হয় নাই, শুধু দৈহিক মিলনের ফলে সন্তান উৎপন্ন হইয়াছে। বিধাতার রাজ্যে অবৈধ সন্তান বলিয়া যদি কিছু থাকে, তবে সেই তাহা।

কিন্তু মানুষের একটা পৃথক রাজ্য আছে এবং তাহা আইন দ্বারা শাসিত। সেই আইন তাহার শরীরে অবৈধতার ছাপ মারিয়া দিয়াছে। যাহার কথা মনে পড়িতে তাহার শরীর ঘৃণায় কণ্টকিত হইয়া উঠিতেছিল, সে যদি সেই সতীনের বিবাহিতা পত্নীর সন্তান হইত তবে বোধ হয় অন্ধ সমাজ তাহাকে সাদরে গ্রহণ করিত। কিন্তু এই জন্ম-বিপর্য্যয়ের জন্য আজ সমাজের সদর দরজা, তাহার সম্মুখে চির তরে বন্ধ হইয়া গিয়াছে। উৎসব গৃহের দ্বারে ভিখারীর মত তাহাকে চির কাল সমাজের বাহিরে পড়িয়া থাকিতে হইবে; যদি কখনও ভিতরে ঢুকিতে পায় তাহা পরের অনুগ্রহে নির্ভর করিয়া, নিজ অধিকারে তর করিয়া নহে। ভাবিতে ভাবিতে শশীর মনে একটা বিদ্রোহের ভাব ঘনাইয়া আসিল। সে হাত মুষ্টিবদ্ধ করিয়া মনে মনে বলিল, বালক-বালিকা যখন পুতুলের বিবাহ দেয় তখন তাদের বাপ মা হাসে। কিন্তু কি আশ্চর্য্য, তাহাদের মনে হয় না যে বিবাহের মত একটা অর্থহীন অনুষ্ঠান, যেখানে প্রাণহীন পদার্থ লইয়া বারবার সেই পুতুল খেলাতেই সাজে। যাহাদের ভিতরে প্রাণের লীলা নাই তাহাদিগকে সচেতন করিতে হইলে, বাহিরের শক্তির দরকার। কিন্তু যেখানে নর-নারী চুম্বক ও লৌহের মত নিজ নিজ অন্তঃধর্ম্মের প্রভাবে একত্র হইয়াছে, সেখানেও কি এই বাহ্য অনুষ্ঠান অপরিহার্য্য? হউক আইনের চক্ষে সে অবৈধ সন্তান। হইতে পারে মানুষ কুসংস্কারে অন্ধ হইয়া তাহাকে ঘৃণা করিবে। কিন্তু নিজকে ত সে নিজে শ্রদ্ধা করিতে পারিবে। যদি তার জন্ম ব্যাপারে কোনও পাপ স্পর্শ করিয়াও থাকে, তবে ও সে পাপ তাহাতে বর্শে নাই। জন্মের পর মুহূর্ত্ত হইতেই নবঃ বিকশিত পদ্মটীর মত সে পবিত্র, নির্দ্দোষ অপাপ-বিদ্ধ সমাজের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে তাহার আর স্থান নাই, কিন্তু বিশ্ব-মানবের বৃহত্তর পরিবারের মধ্যে সে আপনার স্থানও অধিকার করিয়া পাইয়াছে। তখন সমস্ত দ্বিধা সংশয় দূর হইয়া গিয়া শশীর দেহ ও মন লঘু হইয়া গেল। তাহার বুকের উপর হইতে যেন সহস্র মণ ওজনের পাষাণ ভার নামিয়া গেল। যাবজ্জীবন নির্ব্বাসন দণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত ব্যক্তি যেন আপীলে খালাস পাইয়াছে—আবার উন্মুক্ত আকাশ মুক্ত বায়ু, স্বাধীন অব্যাহত গতি। গ্রীক-পুরাণ বর্ণিত ফিনিক্সের ন্যায় তাহার জীবনের আশা, উদ্যম ও উৎসাহের ভস্মাবশেষের মধ্যে নূতন আশা, নবোদ্যম, নবোৎসাহ লইয়া নূতন জীবন জন্ম লাভ করিয়াছে। তাহার এলবামের মধ্যে তাহার মায়ের মৃত্যুর কিছু দিন পূর্ব্বে তোলা একখানা ফটো ছিল। সে এলবাম খুলিয়া সেই ফটোখানার দিকে চাহিয়া রহিল। তারপর বহু বৎসরের অস্পষ্ট প্রায় সেই ফটো খানা, তাহার চোখের জলে ঝাপসা দৃষ্টির সম্মুখে যখন আরও অস্পষ্ট হইয়া উঠিল তখন সে একটা দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, হায় মা, তুমি যদি জানিতে তুমি যাহাকে তোমার জীবনের সর্ব্ব-প্রধান পাপ বলিয়া মনে করিয়াছিলে, তাহাই তোমার সন্তানের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মুক্তিতে পরিণত হইয়াছে।

তারপর চিঠির কাগজ লইয়া সে কল্যাণীকে লিখিল:—

মা,

সত্যই আমি তোমার কুড়ানো ছেলে। আমার বাপ নাই, মা নাই, জন্ম নাই, জাতি নাই, বংশ নাই, সমাজ নাই, আছে কেবল তোমার কোল। তোমার কোলের ছেলে কোলে ফিরিতেছে। ইতি—

সেবক—শশী।

পিয়ানোর চাবী পরিষ্কার করতে হলে একখানা ন্যাকড়া দুধে ভিজিয়ে তা দিয়ে ঘসলেই পরিষ্কার হবে। ছবির ফ্রেম ও আয়নার কাচও এই ভাবেই পরিষ্কার করা যায়।

লেসের পর্দ্দা পরিষ্কার করবার সময় তাতে দুধ দিলে একেবারে ধব ধবে হয়।

জলের বদলে গরম দুধে চা করলে সে চা রোগীদের পক্ষে খুব উপকারী হয়।

বাসন্তী—

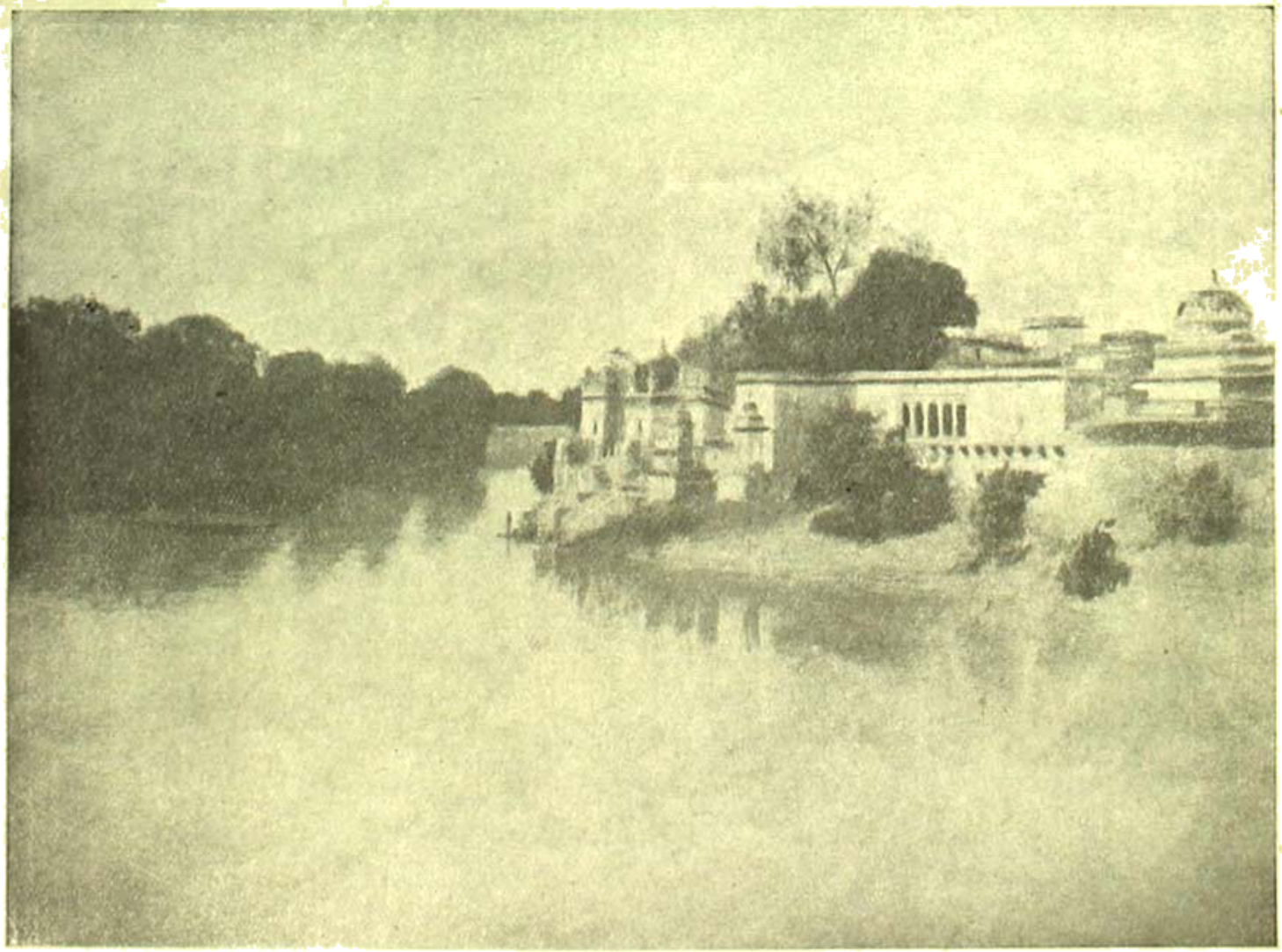

রেওয়া ষ্টেটের মন্দির সংলগ্ন একটি স্রোতস্বিনী।

ব্যতিক্রম

(উপন্যাস)

[শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্-এ]

সপ্তত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

প্রকাশ্য দিবালোকে রামবাগানের মোড়ে এক-দ্বিতল অট্টালিকার বারান্দায় সুরা-রক্ত-নেত্র নলিনাক্ষ তাহার বারনারী বন্ধুর সহিত কথা কহিতেছিল। সুন্দরী কহিল, "এতটা টাকার লোভ ছাড়তে পার্ব্বি না ভাই, তুমি হয় টাকার জোগার দেখ না হয় সঙ্গে পড়।" নলিনাক্ষ সজল নয়নে কহিল, "এই কি ধর্ম্ম হলো ভাই?" সুন্দরী বলিল, "বেস্তার ধর্ম্মই ত এই নলিনাক্ষ বাবু।" "একেবারে বাবু হয়ে গেলুম?" "তা নয়! তো কি? সেই মাড়য়াড়ী বাবুটি আজ সন্ধ্যাবেলায় আসবেন তুমি যদি রোজকার মত আজ সন্ধ্যাবেলায় এসে মাতলামি কর তা হলে ভাল হবে না বলে দিচ্ছি। বড়-মানুষের জামাই আছ নিজের ঘরে আছ, তাতে আমাদের কি?" "দেখ ভাই আমি যেমন করে পারি তোকে আজকে দু'শ টাকা এনে দিচ্ছি, তুই মেড়ো-বেটাকে বসাস্-নি।" "তোমার দুশো টাকার লোভে আমি অমন বাবু ছাড়তে পার্ব্বি-না। সে মাসে আড়াই-শো টাকা দেবে দু-জোড় গয়না দেবে, আর ঘর সাজিয়ে দেবে বলে দিয়েছে, আর তুমি আজ দুটি-শো টাকা দিয়ে তারপর ছ-টি মাস কাউ চাইবে। তার উপর বাবুর মদের খরচ চাটের খরচ সব যোগাব আমি। কেন বল দিকি মিন্‌সে? আমি কি তোর ঘরের মাগ নাকি? টাকা আনতে পারিস্ তো আসিস্ তা নইলে এ-মুখো হলে তোর ভাল হবে না বলে দিচ্ছি।" "সে কথাতো অনেক বার বলেছ যোনা নতুন করে আর কি বলবে? দেখ যোনা তোমাকে আমি বড্ড ভালবাসি? পরিবারের চাইতে বেশী ভাল বাসি, তুমি পঞ্চাশ-টা টাকার জন্যে আমাকে তাড়িও না।" "এত যদি ভাল বাসিস মুখপোড়া মিন্সে তবে মাগের গায়ের গয়না গুলো এনে দিতে পারিস না। তোর মাগ্ পরী সেজে বেড়াচ্ছে আর আমার বাউটি দুটের গয়না তোর মদের দেনার শুড়ীর দোকানে বাঁধা আছে, অমন বাঙ্গালী বাবুর ভালবাসা আমি ঢের দেখেছি।"

"আমি যেমন কোরে পারি আজ তোকে আড়াই-শো টাকা এনে দেবো। মাগের গায়ের এক খানিও গয়না নেই যদি থকতো তাহলে কোন শালা-না তোর কাছে এনে হাজির কোরতো। আজ যদি বড় মানুষের বেটীকে বাঁধা দিতেও হয় তাহলেও ছাড়বো না। তোর পায়ে পড়ি তুই আজকের দিনটি আমায় সময় দে, মেড়ো শালাকে তুই আজ বসাস্ নি!" "ঠিক বলছিস্?" "মাইরি বলছি তোর দিব্বি, কালিঘাটের, মা কালীর দিব্বি।" "আর যদি না পারিস্?" "তা যদি না পারি, তাহলে বড়-মানুষের বেটিকে সোনাগাছিতে যা রামবাগানে বাঁধা দিয়ে তোর খরচ যোগাবো।" "পারবি?" "সন্ধ্যা লাগোদ্ দেখে নিস্?" "তবে যা, এখুনই যা। তোর অনেক খেয়েছি বুকলি নলিনাক্ষ! নেহাৎ অধর্ম্মটা কোরবো না, আজ আমার অষ্টমীর উপোষ মেড়-বাবুকে আজ বসাবো না, কিন্তু সন্ধ্যা-লাগাদ যদি টাকা না আনতে পারিস্ তাহলে তোর সঙ্গে আমার কারখৎ।" "তাহলে তুই ত আজ আর মদ খাবিনি, ঘরে যে টুকু মাল আছে, আমায় দে।" সুন্দরী মনোরমা ঘর হইতে আধ বোতল বিলাতী মদ লইয়া আসিল, নলিনাক্ষ তাহাতে সোডা না মিশাইয়াই অর্দ্ধেকটা নিজের গলায় ঢালিয়া দিল এবং বোতলটা পকেটে লইয়া বলিল, "প্রাণ এস্পার কি ওস্পার হবলে প্রাণ।"

নলিনাক্ষ মাথায় চাদর জড়াইয়া রাস্তায় বহির হইয়া পড়িল। সে যখন গৌর মোহনের বাটীতে আসিয়া পৌছিল, তখন পাশের বাটীতে সন্ধি-পূজার বাজনা বাজিয়া উঠিয়াছে। নলিনাক্ষ টলিতে টলিতে অন্দর-মহলে ঢুকিয়া সম্মুখেই তাহার শাশুড়ীকে দেখিতে পাইল, তিনি জামাতার অবস্থা দেখিয়া ঘুরে সরিয়া যাইতেছিলেন, কিন্তু তাঁহাকে ডাকিয়া বলিল, "আমার ঠাকরুণটি কোথায় গেলেন, শাশুড়ী ঠাকরুণ?" স্বামীর সুরা-বিজড়িত কণ্ঠের আওয়াজ পাইয়া ইন্দু পাশের ঘর হইতে বাহির হইয়া

আসিল। তাঁহার মাতা তাহার হাত ধরিয়া বলিয়া উঠিলেন, "এখন ওকে ছুতে পেয়েছে মা, এখন তুই যাস্‌নি।"

নলিনাক্ষ তাহা শুনিতে পাইল, সে বলিল, "ছুতে অনেক দিন পেয়েছে ঠাকরুণ, সেটাতো বিয়ে দেবার সময় জানা ছিল? এখন যাবে না বল্লে চলবে কেন?" এই বলিয়া সে টলিতে টলিতে শাশুড়ীর দিকে অগ্রসর হইল। তাহার অবস্থা দেখিয়া ইন্দু মায়ের হাত ছাড়াইয়া ছুটিয়া আসিয়া বলিল, "ঘরে চল, যা বলতে হয় ঘরের ভিতরে বোলো।" এই বলিয়া সে নলিনাক্ষের হাত ধরিয়া শয়ন কক্ষে গেল।

ঘরের ভিতরে গিয়া নলিনাক্ষ স্ত্রীর হাত ধরিয়া এক খানা চেয়ারের উপর শুইয়া পড়িল। ইন্দু তাহাকে যত্ন করিয়া শোয়াইয়া দিল। অল্পক্ষণ পরে সে উঠিয়া বলিল, "দেখ আমার আজ টাকা চাই।" ইন্দু অঙ্গের সমস্ত অলঙ্কার বিক্রয় করিয়া এতদিন স্বামীর খরচ যোগাইয়াছে, সে পিতা-মাতাকে প্রতারণা করিবার জন্য স্বর্ণের অলঙ্কারের পরিবর্ত্তে গিল্টির অলঙ্কার পরিয়া থাকিত, সে দিন তাহার হাতে একটি পয়সাও ছিল না। ইন্দুকে নিরুত্তর দেখিয়া নলিনাক্ষ আবার বলিয়া উঠিল, "বড় মানুষের বাড়ীর ছেনালী আমি ঢের দেখেছি, টাকার জন্য আমার সোনা প্রাণ পর হয়ে যাচ্ছে। আমার টাকা চাই-ই চাই।" ইন্দু মৃদু স্বরে কহিল, "আর ত গয়না নেই? কোথায় টাকা পাব?" নলিনাক্ষ চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, "সে কথা আমি শুনতে চাই না, জেনে শুনে যখন খান্‌কী বিয়ে করেছি তখন আমার টাকা চাই।" এক মুহূর্ত্তের জন্য ইন্দুর চক্ষু জ্বলিয়া উঠিল, কিন্তু তাহার পরই সে শান্ত হইয়া কহিল, "আমি সোনা নই, তোমার মনে যাই থাক্ আজ আর অকথা কু-কথা বোলোনা। একেবারে অত টাকা কোথায় পাবো?" নলিনাক্ষ বলিল, "তা আমি জানিনা, আমি সোনার কাছে দিব্বি করে এসেছি যে, আজ যদি তুই টাকা দিতে না পারিস্ তাহলে তোকে বজ্জাত রেখে সোনার খরচ যোগাবো।" স্বামীর কথা শুনিয়া ইন্দু ভয়ে শিহরিয়া উঠিল, তাহার মুখ শুখাইয়া গেল, হাত পা ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল। নলিনাক্ষ চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, "আমার টাকা চাই-ই তোর মত পরিবারের জন্য আমি আমার সোনা প্রাণকে ছাতুখোর মেড়োর হাতে তুলে দিতে পার্ব্বো না।" ইন্দু তখন সাহসে ভর করিয়া বলিল, "আমি যেমন করে পারি তোমায় টাকা এনে দিচ্ছি তুমি ঠাণ্ডা হয়ে ঘুমাও।" নলিনাক্ষ তাহার কথা শুনিয়া আশ্বস্ত হইল এবং কম্পিত হস্তে পকেট হইতে মদের বোতলটা টানিয়া বাহির করিয়া মুখে ঢালিয়া দিল এবং একটা বালিশে মুখ গুঁজিয়া শুইয়া পড়িল।

ইন্দু অনেকক্ষণ তাহার পাশে বসিয়া রহিল। সে যখন দেখিল যে স্বামী সত্য-সত্যই ঘুমাইয়া পড়িয়াছে তখন সে আস্তে আস্তে উঠিয়া গেল। মাতাকে সমস্ত কথা খুলিয়া বলিতে তিনি সন্ধান করিয়া দেখিলেন যে ঘরে অত টাকা নাই তখন তিনি কোন রকমে পঞ্চাশটি টাকা কন্যার হাতে দিয়া বলিলেন, "মদের ঝোঁকে হয়ত অমন করেছে মা, হয়ত নেশা ছেড়ে গেলে ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। যদি নেহাৎ না বোঝে তাহলে তাকে বুঝিয়ে বলিস্, একাদশীর দিন বাকি টাকা দেব।"

মায়ের অবস্থা বুঝিয়া ইন্দু উঠিয়া গেল!

নলিনাক্ষের যখন ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল তখন কার্ত্তিকের বেলা পড়িয়া আসিয়াছে, কিন্তু তাহার নেশা তখনও ছাড়ে নাই, সে উঠিয়াই বলিল, "টাকা?" ইন্দু তখন ঘরের দুয়ারে পিঠ দিয়া একখানা বই পড়িতেছিল, সে ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া নলিনাক্ষের পাশে আসিয়া বসিল, এবং তাহার হাত দুইটি ধরিয়া বলিল, "দেখ আজ ঘরে টাকা নেই এই পঞ্চাশটি টাকা মা দিয়েছে আর বলেছেন যে একাদশীর দিন বাকি দু'শো টাকা বেলা বারটার মধ্যে পৌঁছে দেবেন।" নলিনাক্ষ ক্রোধে অন্ধ হইয়া উঠিল, সে টাকাগুলা ঘর ময় ছড়াইয়া দিয়া চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, "তবে তোকে সোনাগাছিতে বসাবো বসাবো তবে ছাড়বো।" ইন্দুর মাথা ঘুরিয়া গেল, সে চারিদিক অন্ধকার দেখিল কিন্তু সে অল্প ক্ষণের মধ্যে সামলাইয়া লইয়া বলিল, ওগো তুমি চেঁচিয়োনা তুমি স্বামী, তুমি যা বলবে আমি তাই কোরবো।" তখন সন্ধ্যার অন্ধকার ঘন হইয়া আসিয়াছে, ইন্দুর মাতা

প্রতীবেশীর গৃহে ঠাকুরের আরতি দেখিতে গিয়াছেন, সর্ব্বাঙ্গে একখানা মোটা চাদর জড়াইয়া ইন্দু স্বামীর সহিত খিড়কীর দুয়ার দিয়া বাহির হইয়া পড়িল।

অষ্টত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

দ্বাদশীর দিন বিনয় যখন কলিকাতায় আসিয়া পৌঁছিল তখনও রাত্রি শেষ হয় নাই। অনিদ্রায় সমস্ত রাত্রি কাটাইয়া বিনয় তখন তাহার চোখ দুইটা জবা ফুলের মত লাল করিয়া তুলিয়াছিল, সে মাতালের মত টলিতে টলিতে যখন জোড়াসাঁকোর গিয়া পৌঁছিল, তখন মাত্র পূর্ব্ব দিকে উষার শুভ্র-আলোকের রেখা দেখা দিয়াছে। নির্ম্মলদের বাড়ীর দুয়ারের কড়া ধরিয়া নাড়িতে গৌর-মোহন বাবু স্বয়ং আসিয়া দুয়ার খুলিয়া দিলেন। বিনয়কে দেখিয়াই তিনি কাঁদিয়া উঠিলেন, বিনয় নিজে কাঁপিতে কাঁপিতে তাহাকে বৈঠক-খানায় লইয়া গেল। সংবাদ পাইয়া নির্ম্মল ও তাহার মাতা উঠিয়া আসিল। বিনয় শুনিল অষ্টমীর দিন সন্ধ্যার পরে নলিনাক্ষ বা ইন্দুকে আর দেখিতে পাওয়া যায় নাই, নবমী দশমী দুই দিন কোন সন্ধানই মিলে নাই। পুলিশে সংবাদ দেওয়া হইয়াছে। একাদশীর দিন সকালে আসিয়া নির্ম্মল লোকজন লইয়া মনোরমার বাড়ী গিয়াছিল কিন্তু সেখানেও তাহাদের পাওয়া যায় নাই। মনোরমা বলিয়াছে সে অষ্টমীর দিন সন্ধ্যাবেলায় নলিনাক্ষ বাবু একটি অল্প বয়সের স্ত্রীলোক সঙ্গে করিয়া তাহার বাড়ীতে আসিয়াছিল বটে কিন্তু সে হাঙ্গামার ভয়ে তাহাদের থাকিতে দেয় নাই। এখন সে আর নলিনাক্ষ বাবুর রক্ষিতা নহে, এক মাড়োয়ারী বাবু তাহাকে বাঁধা রাখিয়াছে সুতরাং সে নলিনাক্ষকে আর ঘরে ঢুকিতে দিবে না। নলিনাক্ষ বড় অসভ্য মাতাল, তাহার জন্য মনোরমা বেশ্যাপল্লীতে মুখ দেখাইতে পারে না সুতরাং হাজার টাকা দিলেও সে আর নলিনাক্ষ বাবুকে বসাইবে না।

বিনয় স্থির হইয়া সমস্ত শুনিল তাহার পরে গৌর-মোহন বাবুর নিকট বিদায় লইয়া নিজের বাসায় ফিরিল। যাইবার সময় সে নির্ম্মলকে বলিয়া গেল নির্ম্মল যেন সাতটার পূর্ব্বে তাহার বাসায় যায়। বিনয় যখন বাহুড়-বাগানে তাহার বাসায় পৌঁছিল তখনও ভোরের আলো স্পষ্ট হইয়া উঠে নাই। অনেকক্ষণ ধরিয়া দুয়ারের কড়া নাড়িয়া তবে সে বাসার দুয়ার খোলা পাইল। বাসার চাকর আসিয়া জানাইল যে বাসার ঠাকুর ষষ্ঠীর দিন সন্ধ্যাবেলায় পলাইয়া গিয়াছে সে জন্য সে বাসা ছাড়িয়া যাইতে পারে নাই, বাবুর দেশ হইতে এক মা-ঠাকরুণ আসিয়াছেন, তিনি কাল সন্ধ্যাবেলায় আসিয়া বাবুকে তার করিতে বলিয়াছিলেন কিন্তু রবিবার বলিয়া ছোট তার ঘরে তার লয় নাই। "মা-ঠাকরুণ" আসিয়াছেন শুনিয়া বিনয় আশ্চর্য্য হইয়া গেল। সে প্রথমে ভাবিল যে হয়ত তাহাকে লইয়া যাইবার জন্য শ্বশ্রূঠাকুরাণী আসিয়াছেন। সে বাসার দুয়ারে দাঁড়াইয়াই চাকরকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল যে "মা-ঠাকরুণ" বিধবা নহেন কিন্তু তাহার হাতে অলঙ্কার নাই, তাঁহার বয়স অল্প সঙ্গে কেহ লোক জন নাই। তিনি যে কাপড় পরিয়া আসিয়াছেন তাহাতে অনেক রঙ্গের দাগ ছিল কিন্তু সঙ্গে দ্বিতীয় বস্ত্র ছিল না বলিয়া কাপড় কাচিয়া ঝিয়া কাপড়ে শুইয়া আছেন। বিনয় বুঝিতে পারিলনা কে আসিয়াছে।

সে বাসার ভিতরে ঢুকিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া চাকরকে বলিল, "তাঁকে ডেকে নিয়ে আয়।" প্রকাণ্ডের অস্ফুট আলোকে একটা প্রদীপ ধরিয়া একটি নারী উপর হইতে নিচে নামিয়া আসিল। কলিকাতার বাসায় একতলের অন্ধকারের প্রদীপের ক্ষীণ আলোকে ইন্দুর দীর্ঘ স্নিগ্ধ পাণ্ডুবর্ণ মুখখানি দেখিয়া বিনয় স্তম্ভিত হইয়া গেল। অনেকক্ষণ তাহার মুখে কথা সরিল না, ধীরে ধীরে অতি কষ্টে ইন্দু যখন উঠানে নামিয়া আসিল তখন সহসা বিনয়ের বুকের বাঁধ ছুটিয়া গেল, সে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "ইন্দু, ইন্দু,——ইন্দু বলিল, হাঁ—'আমি।" সে বিনয়ের পায়ের কাছে প্রদীপটি রাখিয়া প্রণাম করিতে গিয়া মাটিতে লুটাইয়া পড়িল, দারুণ প্রহারে তাহার সর্ব্বাঙ্গ জ্বর-জ্বর হইয়া উঠিয়াছিল, সে মূর্চ্ছিতা হইয়াছিল।

বিনয় প্রথমে বুঝিতে পারে নাই যে ইন্দু মূর্চ্ছিতা হইয়াছে কিন্তু বার বার ডাকিতেও ইন্দু যখন উত্তর দিল না তখন সে ইন্দুর মাথা কোলে তুলিয়া লইয়া বসিয়া চীৎকার করিয়া পাড়ার লোককে জাগাইয়া তুলিল।

অনেকক্ষণ ধরিয়া মুখে জল দিবার পরে ইন্দু যখন চক্ষু মেলিল তখন বিনয় তাহাকে কোলে তুলিয়া উপরে লইয়া গেল। ইন্দুকে ধুলি-ধূসর বাসায় তক্তাপোষের উপর শোয়াইয়া দিয়া বিনয় উঠিল কিন্তু ইন্দু ইঙ্গিত করিয়া তাহাকে বসিতে বলিল। বিনয় চাকরকে ডাক্তার ডাকিতে পাঠাইয়া দিয়া নিজে মাথার শিয়রে বসিয়া রহিল। বেলা বাড়িয়া উঠিল তখনও চাকর ফিরিল না দেখিয়া বিনয় অস্থির হইয়া উঠিল। আলোক স্পষ্ট হইলে সে দেখিতে পাইল যে ইন্দুর সর্ব্বাঙ্গে প্রহারের দাগ চুলের ভিতরে স্থানে স্থানে তখনও রক্ত জমিয়া আছে। তাহার কলেবর অতিক্ষীণ, বোধ হয় দুই তিন দিন তাহার আহার হয় নাই। বিনয় ইন্দুকে ঔষধ পথ্য দিবার জন্ত বড়ই ব্যস্ত হইয়া উঠিল। তাহার বাড়ী বাসাবাড়ী, সে অনেক দিন উপস্থিত ছিল না সুতরাং ঘরে খাবার জিনিষ কিছুই ছিল না। অনেকক্ষণ পরে চাকর আসিয়া বলিল, যে ডাক্তার ঘণ্টার পরে আসিবে। বিনয় তখন তাহাকে, দুধ ও ব্রাণ্ডি কিনিতে পাঠাইল। সে যে নির্ম্মলকে সাতটার পূর্ব্বে আসিতে বলিয়াছিল সে একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছিল।

চাকর যখন দুধ লইয়া ফিরিয়া আসিয়া বলিল যে ডাক্তারের হুকুম ব্যতীত ডাক্তারখানার ব্রাণ্ডি দিবে না। তখন বিনয় ক্ষেপিয়া উঠিল। ইন্দুর মুখে যখন সে দুধ তুলিয়া দিতে গেল, তখন ইন্দু ক্ষীণস্বরে বলিল, "না, খাবো না, স্বামী বলে গিয়েছেন বেশ্যাবৃত্তি করে খেতে, তা পারব না।" সে দাঁতে দাঁত পিসিয়া রহিল, বিনয় যে দুধ তাহার মুখে ঢালিয়া দিতেছিল তাহা তাহার ওষ্ঠ বাহিয়া গড়াইয়া পড়িয়া গেল। সেই সময় ঘরের দুয়ার অন্ধকার হইয়া উঠিল, "ইন্দু—ইন্দু—" বলিয়া নির্ম্মল ইন্দুর বুকে ঝাঁপাইয়া পড়িল। চোখের জলে বিনয় অন্ধ হইয়া গেল।

অনেকক্ষণ পরে নির্ম্মল যখন কতকটা শান্ত হইল তখন বিনয় তাহাকে বসাইয়া রাখিয়া ব্রাণ্ডি আনিতে গেল। তাহার ফিরিতে অনেক বিলম্ব হইল। নির্ম্মল সেই অবসরে তক্তপোষের উপরে বিছানা পাতিয়া ইন্দুকে শোয়াইল এবং তাহাকে বুঝাইয়া একটু দুধ খাওয়াইবার চেষ্টা করিল। ইন্দু কিছুতেই দুধ খাইল না। একমাত্র আদরের বোন ধীরে ধীরে অতি ধীরে বড় ভাইকে তাহার জীবনের গত চারি দিবসের ইতিহাস শুনাইল, শুনিয়া নির্ম্মল স্তম্ভিত হইয়া উঠিল।

বিনয় যখন ফিরিয়া আসিল তখন নির্ম্মল উঠিয়া দাঁড়াইয়া চীৎকার করিতে আরম্ভ করিয়াছে, সে বিনয়কে দেখিয়া বলিয়া উঠিল, "বিনু শুনেছিস্ কি হয়েছে? আমার সেই পাজি হারামজাদা ভগিনীপোত ইন্দুকে এখানে দিয়ে গেছে, ইন্দুকে এখানে দেখে বড়ই লজ্জা হয়েছিল—সে বলেছে যে তুই নাকি ইন্দুর উপপতি—অমন স্ত্রী সে চায় না। ইন্দুকে এখানে দেখে বড় ভয় হয়েছিল, বড় লজ্জা হয়েছিল, সে বাড়ী না গিয়ে তোমার বাসায় এসেছে দেখে বড় সন্দেহ হয়েছিল। সব সন্দেহ ঘুচে গেছে আমার বোনের স্বামী দেবতা তোমাকে তার উপপতি মনে করে বেশ্যাবৃত্তি দেখবার জন্ত তোমাকে তার কাছে দিয়ে গেছে। আরও কি বলে গেছে জানি? ইন্দু যখন বেশ্যাবৃত্তি করে পয়সা রোজগার করবে তখন তার স্বামী দেবতা তার পৈশাচিক সম্পত্তির উপভোগ করবার জন্ত মনোরমাকে নিয়ে আসবে। বিনু আমি তাকে খুন কোরবো আমার সহোদরা ভগ্নীকে বিধবা কোরবো।" বিনয় আস্তে আস্তে নির্ম্মলের হাত ধরিয়া বসাইয়া বলিল, "তার খুন হতে আর বড় বেশী বাকী নেই।" নির্ম্মলকে বসাইয়া বিনয় ইন্দুর বিছানার পাশে বসিয়া বলিল, "ইন্দু, আমার আশ্রয়ে এসে তুমি যে আত্মহত্যা করবে তা আমি সহ্য করতে পারব না। যতক্ষণ তুমি না খাবে ততক্ষণ আমি জলস্পর্শ কোরবো না।" অনেক কষ্টে চোখ মেলিয়া ইন্দু বলিল, "আমি খাবো কিন্তু আমার কতকগুলো কথা আছে তা রাখবেন কিনা বলুন তবে খাব। এ মুখ আর বাপের বাড়ীতে দেখাতে পারবো না—শ্বশুর ঘর নেই—স্বামী বলে গিয়েছেন বেশ্যাবৃত্তি করে খেতে—তাই খাব—বাবা বড় সাধ করে লেখা পড়া শিখিয়েছিলেন, আমি মেয়ে স্কুলে মাষ্টারী করতে পারবো। আপনি আমায় চাকরী কোরে দিন।" বিনয় বলিল, "আচ্ছা তাই হবে।" ইন্দুর ক্ষীণ-প্রভ চক্ষু দুইটি হঠাৎ জ্বলিয়া উঠিল, সে বলিল, "কেবল হবে বোললে হবে না, আমি বড় আশা করে আপনার কাছে এসেছি। আপনি কিরে কোরে বলুন তা নইলে আমি অন্নের মত মুখ বুজলুম।" বিনয় বাধ্য হইয়া শপথ করিল। যখন ডাক্তার আসিল তখন পথ্য পাইয়া ইন্দু ক্লান্ত শান্ত শিশুর মত ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। (ক্রমশঃ)

Printed by Bijoy Krishna Dass at the Lakshmibilas Press,
14, Jagganath Dutta Lane, Calcutta.

বিদেশী নৃত্যকলার বিভিন্ন ভঙ্গী।

সচিত্র সাপ্তাহিক পত্রিকা

২য় বর্ষ] ১৩ই পৌষ শনিবার ১৩৩০, ইং ২৯শে ডিসেম্বর [২৪শ সংখ্যা

দুর্বোধ্য।

শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী।

(১)

তোমায় শুধু ভালবাসি তাহাই যদি চাও,
তবে কেন মায়ায় রাখ জড়িয়ে?
তবে কেন বিষের ভরে বুকের মাঝে দাও,
দ্বেষ, ঘৃণা, প্রণয়, প্রীতি ভরিয়ে?

(২)

তোমার পানে চেয়ে থাকি তাহাই যদি চাও,
তবে কেন তোমায় রাখ ভুলিয়ে?
কেন আমার নয়ন দুটী অন্ধ করে দাও,
রূপ-মধুর সুখের ছবি ভুলিয়ে?

(৩)

তোমার কাছে যাব আমি তাহাই যদি চাও,
তবে কেন আমায় রাখ বাঁধিয়ে?
জীবন ভরা সকল প্রয়াস বিফল ক'রে দাও,
আমায় কেন এমন ক'রে কাঁদিয়ে?

(৪)

তোমার পায়ে লুটিয়ে পড়ি তাহাই যদি চাও
তবে কেন দূরে যাও সরিয়ে?
হৃদয় মাঝে ক্ষণেক তরে চমক্ শুধু দাও,
রহনা গো জীবন আলো করিয়ে?

সাহিত্যের প্রগতি ও সামাজিক মতির গতি।

(শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ)

এক বন্ধু জিজ্ঞাসা করিয়াছেন যে, দেশে এত লোক থাকিতে আধুনিক সাহিত্যে পরকীয়া ও বৈশিক রস সম্বন্ধে আলোচনা করিবার প্রবৃত্তি তোমার হইল কেন? তাহার উত্তরে যাহা বলিয়াছিলাম সে কথাগুলি আমাদের বাঙ্গালা দেশের জনসাধারণের বিচার্য্য। প্রথম কথা, লোকের অধিকার। সাহিত্যে সকলের সমান অধিকার. সুতরাং সাহিত্য এবং কথাসাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনার অধিকার সকলেরই আছে। আমি কথাসাহিত্যের আলোচনা না করিয়া কেবলই যে ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্বের আলোচনা করিব এ কথা যাঁহারা বলিতে চাহেন তাঁহারা অনধিকার চর্চ্চা করিয়া আমার ব্যক্তিগত স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করিতে উদ্যত। সমাজের অল্প দশ জনের মত কথাসাহিত্য পাঠ করিবার ও সে সম্বন্ধে আলোচনা করিবার অধিকার আমারও আছে, কোন গ্রন্থ সম্বন্ধে মতামত মুখে অথবা লিখিয়া প্রকাশ করিবার অধিকার অন্য সকলের যেমন আছে, আমারও তেমনই আছে কিন্তু তাহা মুদ্রিত হইবে কি না সে বিচার পত্রের সম্পাদকের হস্তে ন্যস্ত এবং দেশের লোকে তাহা গ্রহণ করিবে কি না সে বিচার সমাজের মতিগতির উপর নির্ভর করে।

সামাজিক মতির প্রবাহ বর্ষা জলস্ফীত নদীর প্রবাহের ন্যায় অপ্রতিহত। কোন শক্তিই তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া তাহাকে ফিরাইতে পারে না। তবে বন্যার জল যেমন অবাধ, সামাজিক মতি সেরূপ নহে, তাহা সমাজ বিশেষের আচার ও ব্যবহার নামক উচ্চ কূলের মধ্যে প্রবাহিত হইয়া থাকে। সকল নদী যেমন সকল সময়ে উচ্চ কূল স্পর্শ করে না এবং বর্ষার স্ফীতকায় ও গ্রীষ্মে অতি শীর্ণকায় হইয়া প্রবাহিত হয়, সামাজিক মতি গতিও সেইরূপ কখনো প্রবল কখনো দুর্ব্বল। নদীর গতি একেবারে রুদ্ধ করা যেমন অসম্ভব, সামাজিক মতি গতির সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হওয়া সেইরূপ অসম্ভব। বর্ষা অথবা গ্রীষ্মে অতি প্রাচীন কাল হইতে মানব আত্মরক্ষা ও শস্য রক্ষার জন্য অল্প বা বহু আয়াসে নদীর প্রবল বা দুর্ব্বল গতি পরিবর্ত্তিত করিয়া আসিতেছে। সামাজিক মতি গতির প্রবাহেও বুদ্ধিজীবি মানব মানবসভ্যতার আদিম যুগ হইতে নানা উপায়ে সামাজিক মতি গতির প্রবাহের পরিবর্ত্তন করিয়া থাকে। মানব সভ্যতার শৈশবে ধর্ম্মযাজক বা দলপতি আবশ্যক মত কৌশলে সামাজিক মতির প্রবাহ পরিবর্ত্তিত করিত। পূর্ণ বিকশিত মানব সভ্যতার যুগে সামাজিক প্রগতি পরিবর্ত্তনের জন্য ধর্ম্ম বিশেষ সাহায্য করে না, কারণ তখন সমাজের শীর্ষস্থানীয় বুদ্ধিজীবিগণ সে ভার গ্রহণ করিয়া থাকেন। আধুনিক যুগে সমাজে এই শ্রেণীর মতামত মুদ্রিত হইয়া সাহিত্য আখ্যা লাভ করিয়াছে।

সাহিত্য কি?—তাহা মানব ও পাশব সমাজের differentia. মানবের মানসিক শক্তি যতদূর বিকশিত, পশুর ততদূর নহে, সেই জন্য মানব তাহার চিন্তাশক্তির বলে জগৎ জয় করিয়াছে। কেবল তাহাই নহে, মানব তাহার অতীত যুগের চিন্তার ফল বর্ত্তমান, ভবিষ্যতের ব্যবহারের জন্য লিপিবদ্ধ করিয়া যাইতে পারে, তাহাই সাহিত্য। সাহিত্য বলিতে আমাদের দেশে যে সঙ্কীর্ণ বিভাগ বুঝায়, আমি আজ তাহার কথা বলিতেছি না, আমি বিশ্বমানবের চিন্তাপ্রসূত বিশ্ব সাহিত্যের কথা বলিতেছি। ভাল হোক, মন্দ হোক, সাহিত্যের সর্ব্ব বিভাগ, মানবের আদরণীয়, সমষ্টিহিসাবে তাহা কোন-না-কোন উপায়ে সমাজের শিক্ষায় ব্যবহৃত হইবে। শিক্ষা কেবল বিদ্যালয়ের শিক্ষা নহে। মানবের সমস্ত জীবন একটা সুদীর্ঘ ছাত্রজীবন, শৈশবের ও কৈশোরের বিদ্যালয় ছাড়িয়া মানুষ যখন গার্হস্থ্য অবলম্বন করে তখন সে একটা বৃহত্তর পোষ্ট গ্রাজুয়েট বিভাগে প্রবেশ করে। ইহাই তাহার প্রকৃত শিক্ষার আরম্ভ, কারণ তখন সে কেবল পুঁথিগত বিদ্যার অনুশীলন করে না—সে অন্যের সঙ্গে মেশিয়া শিখে, ঠেকিয়া শিখে ও বুঝিয়া শিখে। পশুর মত মানবের জীবনেও কতকগুলা কার্য্য আছে তাহা পাশব, আহার নিদ্রা ও মৈথুন পাশবক্রিয়া, মানুষ

তাহার মানসিক শক্তির প্রভাবে অতীত যুগের চিহ্ন-স্বরূপ মানব জীবনের এই পাশব-ক্রিয়া তিনটি লালসা অনুসারে তারতম্যের বিভাগে প্রয়োগ করে। মানুষের সমাজে প্রকৃত মানুষ কে?—যে সমাজে থাকিয়া পাশব-জীবন যথা সম্ভব সংক্ষিপ্ত করিয়া মানবের নিজস্ব চিন্তা শক্তির ব্যবহার করে। তাহাদিগের মধ্যেও মাত্রাভেদ আছে, অতি-মানব কে? যে বর্ত্তমানের চিন্তায় অভিভূত হইয়া পড়ে না, অতীতের দৃষ্টান্ত সর্ব্বদা সম্মুখে রাখিয়া যে বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের চিন্তা করে, যে তাহার সমস্ত শক্তি চিন্তায় নিয়োজিত করিয়া তাহার ফল সমাজের মঙ্গলের জন্য নিবেদন করে। প্রতিদেশে ইতিহাসের প্রতিস্তরে অতিমানবের দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়।

মানুষ যেমন নদীতীরের শস্যক্ষেত্র রক্ষা করিবার জন্য কৌশলে নদীগর্ভের প্রবল বন্যার গতি পরিবর্ত্তিত করে, চিন্তাশীল মানবও সেইরূপ সমাজের মতির প্রবাহ উদ্দাম হইয়া উঠিলে কৌশলে তাহা পরিবর্ত্তন করে। যে যন্ত্র সেই পরিবর্ত্তন সাধিত করে তাহার নামই সাহিত্য এবং সমাজবদ্ধ মানবের যে সম্প্রদায় সেই পরিবর্ত্তনের ভার গ্রহণ করে তাহারাই সাহিত্যিক এবং সেই জন্যই যে দেশে সাহিত্য আছে সেই দেশেই সাহিত্যের প্রকৃত পরিসেবক সমাজের শীর্ষস্থানীয়। সমাজের প্রতি স্তরে প্রত্যেক বিভাগে যেমন ভাল মন্দ আছে, ক্ষুদ্র বৃহৎ আছে, সাহিত্যসেবী সম্প্রদায়ের মধ্যেও সেইরূপ তারতম্য আছে। সাধারণ মানুষের মত চিন্তাশীল সাহিত্যিকও নিজের শক্তি অনুসারে সাহিত্যের সেবা করিয়া থাকে। এই বিংশতি শতাব্দীর মধ্যভাগে সাহিত্যের প্রগতি সামাজিক মতির প্রবাহ নির্দ্দেশ করিয়া থাকে এবং সমাজও সাহিত্যের সাহায্যেই সমাজিক ব্যাপারে নিজের অভিমত প্রকাশ করিয়া থাকে। উদাহরণের বোধ হয় প্রয়োজন নাই, আমাদের সমাজের ব্যক্তিগত দোষ অত্যাচার বা ব্যভিচার আমাদের সাহিত্যের উপাদানেই প্রকটিত হইয়া থাকে। একদিন বিধবাবিবাহের প্রয়োজনীয়তা কুন্দনন্দিনীর আকার ধারণ করিয়া চিন্তাশীল বাঙ্গালীর সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছিল। তাহার পরে কন্যাদায়ে প্রপীড়িত দরিদ্র বাঙ্গালী গৃহস্থের নৈরাশ-ব্যঞ্জক হাহাকার কথাসাহিত্যের আশ্রয়ে চিন্তাশীল বাঙ্গালীকে স্তম্ভিত করিয়া দিয়াছিল। সামাজিক ব্যাপারের জটিলতর রহস্য ক্রমশঃ রবীন্দ্র নাথের ছায়ায় বিশ্ব-সাহিত্যে স্থান লাভ করিতেছে, রবীন্দ্র নাথের 'প্রায়শ্চিত্ত' হইতে 'মুখিত পাষাণ' পর্য্যন্ত বহু বিদেশীয় ভাষার আশ্রয়ে বহু দেশে মানবের চিত্ত বিনোদন ও শিক্ষার উপাদান হইয়া উঠিয়াছে।

সহসা বাঙ্গালা সাহিত্যের পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। সে পরিবর্ত্তনের জন্য দায়ী কয়েক জন প্রতিভাশালী লেখক। অধঃপতনের পথে ফরাসী জাতি যে বিলাসের উত্তেজক কথাসাহিত্য সাহিত্যের একমাত্র উপজীব্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিল তাহার উচ্ছিষ্ট পরিপুষ্ট একটা স্বতন্ত্র সাহিত্য জীবন্ত ফরাসী জাতির প্রবল উত্তেজনার আঘাতে দেশে ও বিদেশে ছড়াইয়া পড়িতেছিল। হিউগো বা ডুমা যে পথে কালে তত্ত্বে চলিতেন, আনাতোল ফ্রাঁস ও আলফোঁস দোঁদে তাহাই সাহিত্যের লীলা-ক্ষেত্র রূপে গ্রহণ করিয়া ছিলেন। ফরাসী একদিন ইউরোপীয় সভ্যতার দীক্ষা গুরু ছিল, সেই জন্য আধুনিক ইউরোপ ফরাসী জাতির এই দুশ্চিকিৎস্য রোগ আদর্শ বলিয়া কিছু দিনের জন্য গ্রহণ করিয়াছিল। ফরাসী জাতির সহিত অন্যান্য ইউরোপীয় জাতি যে আদর্শ গ্রহণ করিয়াছিল তাহা ঘৃণ্য হেয় উদ্দাম লালসার নগ্ন চিত্র। মহাযুদ্ধ বজ্রাঘাতের ন্যায় ফরাসীর সহিত অধিকাংশ ইউরোপীয় জাতিকে নগ্ন নারীর অতৃপ্ত লালসার ধ্যানের পথ হইতে বিচ্যুত করিয়া দিয়াছে। আজ ফরাসী সাহিত্য যে পন্থা পরিত্যাগ করিয়াছে অসভ্য বলিয়া বুঝিয়াছে, বোধ বলিয়া সামাজিক ও সাহিত্যিক আদর্শের দৃষ্টান্ত রূপে পরিগণিত করিতে চাহে না, আমরা কিন্তু তাহা বুঝিতে পারি নাই, কারণ আমরা মানবের মত উচ্ছিষ্ট ভোজী নহি—কুক্কুরের মত উচ্ছিষ্ট ভোজী। প্রভুর ভুক্তাবশিষ্ট অন্ন ভৃত্য ভোজন করে, কর্ত্তব্য বলিয়া সে যাহা পথিপার্শ্বে নিক্ষেপ করে, কুক্কুর তাহাই পায়। আমরা পরাধীন জাতি, স্বাধীন মানব কেমন করিয়া চলে তাহা আমরা এতদূর ভুলিয়া গিয়াছি যে, বর্ত্তমানে

চোখের উপর দেখিয়াও তাহা বুঝিতে পারি না। কথায় কথায় আমরা ইংরাজ বর্জ্জিত ইউরোপীয় সাহিত্যের অনুকরণ করি। কেমন করিয়া করি? Continental Literature বলিয়া আমাদের দেশে যাহা চলে তাহা চর্ব্বিতের চর্ব্বন, কুহুরদত্ত উচ্ছিষ্ট। আমাদের রাজা ইংরাজ ইউরোপের অন্যান্য দেশের সাহিত্যের যে অনুবাদ ইংরাজী ভাষায় প্রকাশ করেন তাহাই আমাদের ইউরোপীয় সাহিত্য চর্চ্চার একমাত্র উপাদান। সাহিত্যের প্রগতি আমরা অনুবাদের অনুবাদ হইতে বুঝিতে চাহি। একটা জীবন্ত জাতির জীবন্ত সাহিত্য কি ভাবে অনুপ্রাণিত তাহার স্পন্দন আমাদের দেশে পৌঁছিতে পৌঁছিতে স্পন্দন শক্তির প্রভাবে আরব্ধ কার্য্য শেষ হইয়া যায়। ইউরোপীয় সাহিত্য যখন একটা নূতন স্পন্দনের ফলভোগ করিয়া তাহা জীর্ণ বস্ত্রের ন্যায় দূরে নিক্ষেপ করে তখন আমরা সেই স্পন্দন অনুভব করিয়া তাহার শক্তি আমাদের দেশে ও আমাদের সাহিত্যে প্রয়োগ করিতে চাহি। ভেদাভেদ জ্ঞান এখন আমাদিগের নাই; তাহার প্রধান পরিচয় আমাদের অসহিষ্ণুতা। ফরাসী সাহিত্য এখনও ইউরোপীয় সাহিত্যে শীর্ষ স্থানীয়, ইউরোপীয় জাতি সমূহের যে ভাগ্য বিধাতা ফরাসী জাতি যে শক্তি বলে খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্য ভাগে চিন্তাশীল মানব সমাজের শীর্ষ স্থান অধিকার করিয়াছিল, মানবের ক্রম বিবর্ত্তনের পর্য্যায়ে সে শক্তি-হীন হইলেও লুপ্ত হয় নাই। ইউরোপের মধ্য যুগের সমাজ বন্ধন যে আধুনিক যুগে চলিবে না, তাহা ফরাসীই প্রথম অনুভব করিয়াছিল এবং ফরাসী সাহিত্যিক Le contract Social আখ্যা দিয়া তাহা মানব সমাজে প্রকাশ করিয়া ছিল এবং বর্ত্তমান জগতে গণতন্ত্রের মূল প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। এইরূপে যে শক্তি বিশ্ব-মানবের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছিল, আধুনিক যুগে সেই মৃতকল্প শক্তি সহসা জাগিয়া উঠিয়া শত বর্ষের পাপ চিন্তার প্রায়শ্চিত্ত করিয়া পবিত্র হইয়া উঠিয়াছে। মহাযুদ্ধে হীনবল ফরাসী সমস্ত দেশের সমগ্র শক্তি পুঞ্জীভূত করিয়া স্বাধীনতার স্বাধীন চিন্তার ও রাষ্ট্রীয় আদর্শের চিত্ত অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। ভল্‌তেয়ার ও রুশোর আদর্শ পরিত্যক্ত হইয়া ফরাসী জাতির সম্মুখে নূতন করিয়া জাগিয়া উঠিয়াছে, ফরাসী হিংসা মূলক আদর্শ পরিত্যাগ করিয়া নিত্য-সুন্দর স্বাভাবিক আদর্শে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছে। ফরাসী স্বাধীন, কখনও পরাধীন হয় নাই কিন্তু আমরা, কবে স্বাধীন ছিলাম তাহাও ভুলিয়া গিয়াছি; সেই জন্যই ফরাসী ও তাহার অনুকরণে অনুপ্রাণিত অন্যান্য ইউরোপীয় জাতির পরিত্যক্ত আদর্শ দুরারোগ্য কুষ্ঠ রোগের ন্যায় আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যকে আচ্ছন্ন করিয়াছে এবং তাহা ক্রমশঃ পরিব্যপ্ত হইয়া উঠিয়াছে।

বাঙ্গালা সাহিত্যে ফরাসীর অনুকরণ অনেক দিন হইতেই চলিয়া আসিতেছে কিন্তু ফরাসী কখন কি ভাবে চলে, কি কারণে সে ভাবে চলে তাহা হয় তো আমরা পূর্ব্বে তাহা বিচার করিয়া দেখিতাম এখন আর দেখি না। বঙ্কিমচন্দ্রে বা রবীন্দ্রনাথে যে সংযম দেখিতে পাওয়া যায়, শরৎচন্দ্রে ও তাঁহার অনুচরবর্গের রচনায় সে সংযমের নিতান্ত অভাবের একমাত্র কারণ চিন্তাশক্তির অভাব ও অসদ্ব্যবহার। আমরা পরাধীন ইংরাজ রাজের আশ্রয়ে সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করি। আমাদের মাতা ভগিনী ও কন্যা, ফরাসী ও বেলজিয়ানের মাতা ভগিনী বা কন্যার ন্যায় জর্ম্মান সৈনিকের বিলাসের উপাদান হয় নাই, আমাদের শস্যক্ষেত্র বিদেশীয় সৈন্যের পদদলিত হয় নাই, মহাযুদ্ধে রক্তের সামান্য অংশ আমাদের বিদেশীয় রাজার উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছে, তাহার সহস্র ভাগের এক ভাগও আমরা বহন করি নাই, সেই জন্য উদ্দাম লালসার অনুসরণে আধুনিক ইউরোপ যে শিক্ষা লাভ করিয়াছে তাহা এখনও উচ্ছিষ্টরূপে কুহুরের নিকট আসিয়া পৌঁছে নাই কিন্তু আমরা কি তাহা আমরা মনে করি না। ইউরোপের স্বাধীন জাতি সমূহ যে রক্তস্রোতের প্রবল আক্রমণ সহ্য করিয়াছে তাহা সহ্য করিবার শক্তি আমাদিগের কতটুকু আছে তাহা বিবেচনা করিবার শক্তি পর্য্যন্ত আমাদের নাই; আমরা পরিণাম চিন্তা করি না।

আমরা একদিন মানুষ ছিলাম, একদিন স্বাধীন ছিলাম, প্রাচীন ভারত একদিন প্রাচীন প্রাচ্যকে গৌরব প্রভায় উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়া ছিল, একথা বিদেশীয়ের

মুখে শুনিয়া গৌরব অনুভব করি কিন্তু যখন মানুষ ছিলাম, যখন স্বাধীন ছিলাম তখন কেমন করিয়া চলিতাম তখন ভারতের চিন্তাশক্তি কোন্ পথে প্রবাহিত হইত, তখন সমাজের শীর্ষস্থানীয় সাহিত্যসেবী ভারতীয় চিন্তা-শক্তিকে কোন্ পথে পরিচালিত করিত তাহা কোন দিন ভাবিয়া দেখি না। অথচ যে দিন আমরা মানুষ ছিলাম সেই দিনও আমাদের সাহিত্যিকবৃন্দ বর্ত্তমানের সজীব জাতিসমূহের ন্যায় সামাজিক মতিগতির এবং রাষ্ট্রীয় প্রগতির পথনির্দ্দেশক ছিলেন। সেদিনে বাঙ্গালী ও ভারতবাসী কি চিন্তা করিত, জাতির চিন্তাশক্তি কোন্ পথে প্রবাহিত হইলে জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় বিবর্ত্তন কি আকার ধারণ করিত তাহার রেখা ভারতের মানচিত্র হইতে এখনও বিলুপ্ত হয় নাই। বিদেশীয় রাজার অধিকার আসিবার পূর্ব্বে ভারতের উপর দিয়া কালের বহু-যুগ কাটিয়া গিয়াছে, তাহার প্রতিযুগে বহুতর বিজ্ঞান ছিল, প্রতিস্তরে চিন্তা শক্তি সমুদ্রতরঙ্গের ন্যায় উঠিয়াছে ও পড়িয়াছে, তাহার অধিকাংশ বিলুপ্ত হইলেও তাহার চিহ্ন এখনও একেবারে মুছিয়া যায় নাই। তখন বিদ্যসাহিত্য ছিল, কারণ ভারতবর্ষের সাহিত্যিক কল্যাণ কামনার কালে কখনও দেশবিদেশের কল্যাণ কামনা করে নাই, সমস্ত বিশ্বটাকে একত্র করিয়া মানবের সমস্ত জাতিকে সমান ভাবিয়া তাহারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কল্যাণ কামনা করিয়া গিয়াছেন। সে সাহিত্যে বিভাগ ছিল, কাব্য কথা-সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, ধর্ম্ম, শাস্ত্র—সমস্তই ছিল। কবি কেমন করিয়া কাব্য রচনা করিবে, নাট্যকার কেমন করিয়া নাটক রচনা করিবে, সূত্রধর কেমন করিয়া নাটকের অভিব্যক্তি প্রকাশ করিবে, ভাস্কর কেমন করিয়া প্রতিমা গঠন করিবে—সে শাস্ত্র সজীব ভারতবাসী তাহার জীবদ্দশায় রচনা করিয়া গিয়াছে। কিন্তু আধুনিক ইউরোপীয় জাতি তাহা এখন করিতেছে। সাহিত্যে কাব্যে ও কথাসাহিত্যে বিভিন্ন বিভাগ ছিল, তাহার নাম ছিল রস। মানবের সহিত মানবীর সম্পর্ক পাশব হইলেও সমাজ গঠনে, রক্ষণে ও বর্দ্ধনে যে নিত্য প্রয়োজনীয় তাহা সজীব ভারতবাসী বুঝিত, তাহা অপরিহার্য্য বলিয়া তাহার নাম দিয়াছিল আদিরস, তাহার মাত্রা পর্য্যন্ত তাহারা নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছে। বৌদ্ধ তান্ত্রিকের সহজ সুখ এবং তাহার গুরুশিষ্য বামাচারী শাক্তের অমৃত, বামাচারীর উত্তরাধিকারী সহজিয়া বৈষ্ণবের পরকীয়া প্রেম সমস্তই আমাদের দেশেই ছিল; দেশের ইতিহাস প্রতিপত্রে আদিরসের মাত্রা প্রয়োগের পরিণাম অক্ষয় অক্ষরে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে! কিন্তু বর্ত্তমান যুগের বাঙ্গালী সাহিত্যিক দেশের আদর্শ বিকৃত করিয়া আর্টের ছলনায় বিরংসার প্রবল বন্যায় পাঠক পাঠিকার স্বাধীন চিন্তার শক্তি লোপ করিবার, পূর্ব্বে সে পরিণাম চিন্তা বা অতীত যুগের ফলাফল নির্ণয় বা নির্দ্দেশ করিবার সময় পান নাই। আধুনিক সাহিত্যের একমাত্র কারণ উচ্ছিষ্ট ভোজন। কুকুরের ন্যায় উচ্ছিষ্ট ভোজন এই বাতুল চিন্তাহীনতার একমাত্র কারণ, আর তাহার পরিণাম সকল সাহিত্যের সকল রস পরিত্যাগ করিয়া আদিরসের বিরংসামাত্র গ্রহণ।

আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যে অন্য রসের আলোচনা পর্য্যন্ত রুদ্ধ হইয়াছে। বীররস বীভৎস বলিয়া পরিগণিত, করুণ রস উপপতি রোহিণী ধামার উপপত্নী ভগিনী-বিরহের অশ্রুক মর্ম্মভেদী হাহাকারে পর্য্যবসিত হইয়াছে। প্রেম ও বিরংসার প্রভেদ লুপ্তীকৃত হইয়াছে, আধুনিক সাহিত্যের প্রতিপত্রে প্রতিছত্রে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। আজ যে সময় বিশেষে অন্যায় প্রতি আকৃষ্ট হয়, আধুনিক সাহিত্যাচার্য্য সে কথা বিস্মৃত হইয়াছেন, মানব কেমন করিয়া পাশব ও মানব ধর্ম্ম বিস্মৃত হইয়া পরস্পর নারীর নগ্নরূপের ঐকান্তিক চিন্তায় মগ্ন থাকে—ইহাই আধুনিক সাহিত্যিকের একমাত্র প্রতিপাদ্য, সাহিত্যের বিভাগহীন একমাত্র বিষয়। পাঠকের জন্য চিন্তা নাই সাহিত্যে পথ্য বিষয়ে গ্রন্থ নাই, সাহিত্যসেবীর জন্য আদর্শ নাই। অথচ বাক্যে আমরা রাজ্য জয় করি, বিদেশীয় রাজাকে বাক্যবাণে বিদ্ধ করিয়া লুপ্তীকৃত করি, প্রতিপদে স্বাধীন হইতে চাহি।

স্বাধীন হইবার শক্তি আমাদের ছিল এবং এখনও আছে, বিদেশীয় রাজার অধিকারে মুসলমান ইংরাজের-আমলে স্বাধীন চিন্তার অবসর ও শক্তি যথেষ্ট পরিমাণেই ছিল এবং এখনও কতক পরিমাণে আছে কিন্তু আধুনিক

যুগে সামাজিক মতিগতির পথ প্রদর্শক সমাজের শীর্ষস্থানীয় সাহিত্যিকবৃন্দ সেই শক্তি কি কার্যে নিয়োগ করিয়াছেন, কি পরিমাণে নিয়োগ করিয়াছেন তাহা ভাবিয়া দেখিব কবে? সে সময় কি এখনও আসে নাই? যদি না আসিয়া থাকে তাহা হইলে আবার কবে আসিবে সে কথা কোন দিন ভাবিয়া দেখিয়াছি কি? যে আদর্শে বঙ্কিম চন্দ্র "আনন্দমঠ" রচনা করিয়াছিলেন একদিন সেই আদর্শে রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলালের গীতমালায় স্বদেশে স্বদেশীয় ভাব জাগরিত হইয়া উঠিয়াছিল, আমরা এখনও মনে করি যে আমরা সে আদর্শ বিস্মৃত হই নাই, মনে ভাবি যে সে সঙ্গীতের ঝঙ্কার এখনও আমাদিগকে মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। কিন্তু তাহা নহে, সেটা অতীতের স্বপ্ন, গৌরবের যুগের প্রতিধ্বনি, অধঃপতনের পথে যে দ্রুত বেগে আমরা অগ্রসর হইয়াছি তাহাতে পরিণাম চিন্তার অবসর অধিক কাল নাই। যে সামান্য অবসর আছে তাহাতে অভয়ার রোহিনী দাদা বিরহ ও গোপার সতীত্ব বিবেচনা করিয়া পরিণাম চিন্তা না করিলে শীঘ্রই পৃথিবীর মানচিত্র হইতে মুছিয়া যাইব।

আধুনিক সাহিত্যের প্রেম এক পথেই চলে, সে সাহিত্যে মাতৃমূর্তি খুঁজিয়া পাওয়া যায় না সুতরাং স্বর্গাদপি গরীয়সী জন্মভূমির উল্লেখ মাত্র নাই। যে কবি মাতৃনাম বিস্মৃত হইয়া কাব্য রচনায় প্রবৃত্ত তাহার কাব্যে পরিকল্পিত মাতা জন্মভূমির চিত্রসন্ধান করিতে যাওয়াও মূর্খতা, সে কাব্যের রসিক মাতৃমূর্তির সন্ধান পর্য্যন্ত করে না, পরন্তু প্রাচীন যদি মাতার সন্ধান করে অর্ব্বাচীন তাহাকে উপহাস করে। অর্ব্বাচীন কোন দিন পরিণামের চিন্তা করে না, চিরদিন সে প্রাচীনকে উপহাস করে, তাহার যৌবনের অভাব দেহের শিথিলতা, উত্তেজনার সংঘম অর্ব্বাচীনের প্রতিপাদ্য বস্তু। প্রাচীন তখন ইতিহাস ও আদর্শের সাহায্য গ্রহণ করে, এইরূপে চিরদিন প্রাচীন অর্ব্বাচীনকে প্রবুদ্ধ করিয়া আসিয়াছে। কিন্তু প্রাচীন যখন অর্ব্বাচীনের শিক্ষক ভাব পরিত্যাগ করিয়া বিগত যৌবনে অক্ষমতায় আপনাকে ক্ষমবান মনে করিয়া নিরুৎসাহ সাধনায় উন্মত্ত হইয়া ছুটিয়া বেড়ায় তখন দেশের কি পরিণাম, জাতির কি পরিণাম, ধর্ম্মের কি পরিণাম হয় তাহা কি কেহ ভাবিয়া দেখে? ইতিহাসের পত্রে পত্রে অগ্নির অক্ষরে যে পরিনাম লিপিবদ্ধ আছে তাহা একবার ভাবিয়া দেখ কোন পথে চলিয়াছ আর কোন পথে যাইতে চাহ তাহা চক্ষুষ্মিলন করিয়া দেখ। পরিণাম চিন্তা আমাদের উদ্ধারের একমাত্র উপায়, আমরা শক্তিহীন, আমাদের যুদ্ধের অস্ত্র অপরের প্রাণে তু'লয়া দিয়াছি বলিয়া আমরা অস্ত্র হীন। নিরুৎসাহ তাড়নায় আমরা দিন দিন জনহীন। এখনও ভাবিয়া দেখ আমরা কোন পথে চলিতে গিয়া কোন পথে যাইতেছি। সাধক কবির কথায় পরিণাম চিন্তা কর—

'মনে কর মনে কর শেষের সে দিন ভয়ঙ্কর।'

সাধক যে ভাবে এই বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলেন সে ভাব সে পরমার্থ চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া স্বার্থ ও পরার্থ চিন্তায় সে ভাব নিয়োজিত কর।

বাসী কেক্ ঠাণ্ডা দুধে ডুবিয়ে নিলে উহনের মুচ্ মাঁচে একটু রাখলেই আবার তাজা হয়।

—•—

চন্দ্রের চেয়ে সূর্য্য ৮০০,০০০ গুণ বেশী আলো দেয়।

সুইডেনে পুরুষ ভোটারের চেয়ে নারী ভোটারের সংখ্যা বেশী।

—•—

কশ দেশে প্রতি ১০০০ পুরুষে ১২২৯ টি নারী আছে। আয়র্লণ্ডে প্রতি হাজার পুরুষে ১১৫০ নারী অষ্ট্রীয়াতে প্রতি হাজার পুরুষে ১০৬০ টি মেয়ে আছে।

কোন মেয়ে লোকের কি দোষ আছে তা জানতে হলে অন্য কোন মেয়ের কাছে তার প্রশংসা করতে হয়।

—•—

ভামশশি :—ওঃ কি আর বলবো ভাই কৌশশি আজ এই দশটা টাকা ধার দিয়ে তুমি আমার একশ টাকার কাজ করলে। জানি না—জীবনে এ ঋণ আর পরিশোধ করতে পারবো কি না।

কৃষ্ণশশি :—এ্যাঃ—এতথা তুমি আগে বললে না কেন আমায়।

স্বরাজ-যাত্রা

নব মন্ত্রী সভা

(অধ্যাপক শ্রীপ্রফুল্ল-কুমার সরকার এম্-এ)

মণ্টেগু সংস্কার প্রস্তাবের (Montagu-Chelmsford Recommendations) মিশ্র-স্বরাট নীতি Dyarchy অনুসারে মিশ্র-মন্ত্রী-সভায় (mixed cabinet) একজন মন্ত্রী (Minister) থাকলে একজন পরিষদ (Executive Councillor) দিয়ে সমতা রাখার ব্যবস্থা ছিল। ভারত আইন সংস্কারে (Government of India Act) কিন্তু মন্ত্রীর সংখ্যা দুয়ের কম হবে না, এই আছে ; তার মানে বেশীও হতে পারে। সংস্কার আইনের যুক্ত সমিতি (Joint select Commi ttee) পরিষদদের সংখ্যা ঠিক করে দিয়েছেন, তা দুয়ের কম নয় ও চারের বেশী নয়, আর পরিষদের (Executive Council) গঠন এমন হওয়া চাই যে তাতে এক জন ইংরেজ রাখলে একজন ভারতীয় রাখতেই হবে। গত মন্ত্রী-সভায় মন্ত্রী সংখ্যা ছিল মাত্র তিন আর পরিষদের সংখ্যা ছিল চার। সেখানে পরিষদের সংখ্যা তাঁদের জন্য নির্দিষ্ট পুরাপুরি চারেতেই উঠে ছিল, কিন্তু মন্ত্রীদের সংখ্যা, যদিও দুই এবং অনির্দিষ্ট তবুও রাখারও বিধান দেওয়া আছে. পরিষদের সমান উঠতে তাঁতো দূরের কথা বরং তাঁদের চেয়ে এক সংখ্যা নীচুতেই ছিল। এটা দেখবার বটে। গত নির্ব্বাচনে দেখা গেল, লোকে রাজ নীতির চোখ মেলেছে। এদিকে নব-মন্ত্রী-সভা গড়তে চলল। এখন তো তার গঠনের দিকে সকলেরই একটু চাইবার সময় এসেছে। যথাপূর্ব্ব তথাপর নীতি অনুসারে এবারেও যদি মিশ্র-মন্ত্রী-সভা (Mixed cabinet) গড়া হয় তো সে সভাতেও জন-মন্ত্রীরা, হাজার স্বাধীন-চেতা হলেও বিশেষ এঁটে উঠতে পারবেন না, জন সভার (Legislature and the people) কাছে দায়িত্ব মূলক মন্ত্রী সভার সভাভঙ্গ (A Dissolution of the Legislatutre) প্রভৃতি অস্ত্রও যথাযথ প্রয়োগের আশা নাই। মিশ্র মন্ত্রী সভার অর্দ্ধাঙ্গ পরিষদের (Executive Council) কাছে জন-মন্ত্রীরা তাদের স্বরাট্-নীতির পোষকতার আশা রাখতে পারেন কেমন করে? সুতরাং আমাদের উচিত এখন সংখ্যায় সমান সমান মন্ত্রী ও পরিষদ না চেয়ে পরিষদ কমিয়ে মন্ত্রীর সংখ্যা এমন কি চারের বেশীও বাড়িয়ে নেওয়ার উপায় দেখা। এই সংস্কার আইনের বাইরে বেশী কিছু আশায় করতে যাওয়ার কথা তো আসেনা। তবে এর মধ্যে থেকেই যে টুকু বেশী পাওয়া যায় তার কথা তুলতে আপাততঃ হয়তো কারও আপত্তি থাকতে পারে বলে মনে হয় না। প্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত সত্যানন্দ বসু মহাশয় পরিষদ কমানর সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্রী কমানর ব্যবস্থাও দিয়েছেন। আমাদের মনে হয় মন্ত্রী সংখ্যা যতটা পারা যায় বাড়িয়ে নেওয়াই ঠিক তাতে জন-তন্ত্রের অনেকটা সুবিধা হতে পারে। জাপানে ও কানাডায় মন্ত্রীদের সংখ্যা এখানকার চেয়ে অনেক বেশী ; কিন্তু সে সব দেশে যদিও আমাদের দেশের থেকে টাকা অনেক বেশী, তবুও মন্ত্রীরা বেতন নেন সেখানে আমাদের মন্ত্রীদের তুলনায় খুবই কম। এক্ষেত্রে আমাদের মন্ত্রীদের বেতনের হার বেশ রকম কমিয়ে তাঁদের সংখ্যা বাড়ানর চেষ্টা করাই সুসঙ্গত। নবমন্ত্রীরা যদি মাত্র ভাতা (Allowance) নিয়েই সন্তুষ্ট থেকে দেশ সেবা চালান তো সে সুখের কথা। জনতন্ত্রে মন্ত্রীর সংখ্যা খুব কম হলেই স্বেচ্ছাচারের বড় সুযোগ হয় ; সে জন্য মন্ত্রীর সংখ্যা খুব কম করতে দেওয়া কোন মতেই উচিত নয়। তা ছাড়া, এখানে পরিষদ দিয়ে মন্ত্রীর পাষাণ ভাঙার ব্যবস্থা যখন রয়েছে তখন তাঁদের শক্ত লোক হওয়া ছাড়া দলে পুরুও হতে হবে। সবটুকু আশাদের কথা না ধরলেও এই আইনের মধ্যে থেকেই যেটুকু সুবিধা হয় সেটুকু আমরা ছাড়ি কেন? মন্ত্রী সংখ্যা বেশী হলে লোকের জন তন্ত্রের কাজের দিকে আরও নজর পড়বে, আলোচনাও হবে ভাল রকম, আর জন প্রতিনিধিদের দেশ সেবার সুযোগও কিছু বাড়বে বলে মনে হয়। আমাদের স্বরাট্ নায়কেরা অন্ততঃ খেচুনী মন্ত্রী সভার বাধায় পুরাপুরি মন্ত্রী সভা করতে না পারলেও এই মিশ্র-সভার ভিতরেও অগত্যিকে মন্ত্রীদের দলে

পুরুত ভারী করার কথাটা যেন ভুলে না যান। অবশ্য পারিষদ দু'জন ও গভর্ণর বাহাদুরকে নিয়ে তিন জন হলেও মন্ত্রী যদি চার জনও হয় মিশ্র-সভার পাল্লায় কোন রকমে মন্ত্রীদের ভার রাখা যায়।

ভারত সংস্কার আইনের পরম বন্ধু শ্রীযুক্ত লর্ড লিটন মহোদয় তাঁর আসরে স্বরাজ-যাত্রা লাগিয়ে দেওয়ার এমন সুবর্ণ-সুযোগ ছাড়বেন কি? যদি না ছাড়েন তো দেশের তরফ থেকে তাঁর সাথের দরা 'স্বরাট-বন্ধু' খেতাবটা পাকা করার কথাও উঠতে পারে। গান্ধী-অসবন্ধু, দেশবন্ধু আমলে 'বন্ধু' পদবীর সম্মান লাভটাও বড় কম লোভনীয় নয়!

অমূর্ত্ত ঈশ্বর।

শ্রীমন্মথ নাথ গুপ্ত।

(কবীর)

পাথর পূজিলে যদি হরি মিলে
পূজিব পাহাড় আমি,
ও পাথর হতে হয় মোর মতে
যাঁতার পাথর দামী।
যাঁতার পাথরে নিষাদ পিসিয়া
কত লোক সুখে খায়,
কিন্তু ও পাথরে ভেবে দেখ দেখি
কোন্ কাজ করা যায়।
পাথর পূজিলে হরি নাহি মিলে
হরি নহে ছেলে খেলা,
জল-স্থল মাঝে সতত যা রাজে
তায় তারে ছাড়ি হেলা।

নকলে।

শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায় বি-এ

আমার বুকটা ভেঙে রেখে গেছে
আর ও লাগ্‌বে নাক জোড়া,
আমি, সত্যিকার ফুল ফেলে আজি
ডাকড়ার ফুলে বাঁধ্‌ছি তোড়া।
পথের হুড়ি কুড়িয়ে এনে
তারে দেবতা বলে' মেনে,
ভক্তির সুষম চন্দনেতে
সাজাই তারে আগা গোড়া।
'মমির' মাঝে প্রাণের আরোপ
করে আজি মিটাইরে ক্ষোভ—
হায়রে সজীব সীতা বিসর্জ্জিয়ে
স্বর্ণ সীতার মূর্ত্তি গড়া।

পত্নী :—(রেগে) বিয়ের আগে না কত বলেছিলে তুমি মস্ত একজন সাহিত্যিক হবে, কত নাম করবে। অত হাওয়া খাওয়া গল্প করা, আমোদ করা সব দেখছি ধার করে করেছ—এখন ধারই শোধ দেবে না বিখ্যাতই হবে?

স্বামী :—তোমার মত নারীর স্বামী হওয়ার চেয়ে আর কি সৌভাগ্য পুরুষে কামনা করতে পারে বলতো?

[পত্নী শান্ত হলেন]

—•—

বিনয় :—আপনার সঙ্গে এই একটা সন্ধ্যা কাটিয়ে কত যে জ্ঞান লাভ করলুম। সত্যি বলছি এমন আলাপে মেশা মেশিতেই আনন্দের সঙ্গে যথেষ্ট শিক্ষাও হয়। আপনি নিশ্চয়ই কবিতা কি বই টই লেখেন? একজন সাহিত্যিক—

বিনীতা :—[লজ্জিতভাবে] আজ্ঞে না না—আমি ঐ ছোট মেয়েদের ইস্কুলের নূতন মাষ্টার হয়ে এসেছি।

—•—

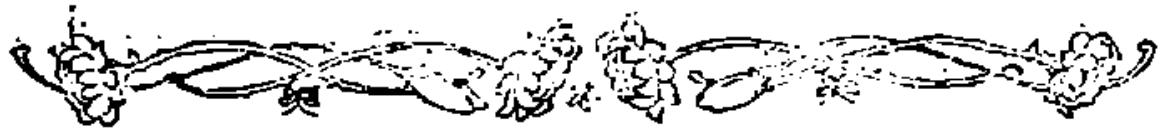

ব্যতিক্রম

(উপন্যাস)

[শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্-এ]

ত্রয়স্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

পরেশচন্দ্র আসিয়া ভবসুন্দরীকে বলিল, যে বৈবাহিক টাকা ফিরাইয়া দিয়াছে আর অন্নদাকে শ্বশুরবাড়ী না পাঠাইলে তাঁহার রাগ পড়িবে না তখন তাঁহার সংসারে একটা ভীষণ গোল বাঁধিয়া গেল। অন্নদা বলিয়া বসিল যে সে কিছুতেই শ্বশুরবাড়ী যাইবে না। সারদা বলিল যে তাহাদের বংশের মেয়ে শ্বশুরঘর করিতে গেলে সমাজে তাহাদের বংশের অপবাদ হইবে কিন্তু তাহাদের কথা ভবসুন্দরীর মনঃপূত হইল না। সারদা বিবাহের পরেই বিধবা হইয়াছিল সুতরাং ভবসুন্দরীর হৃদয়ের সঞ্চিত পুত্র স্নেহ সমস্তটাই কাল নূতন জামাইটির উপর গিয়া পড়িয়াছিল। তিনি বলিয়া বসিলেন যে অন্নদাকে একবার শ্বশুর বাড়ী যাইতেই হইবে। মাতার কথা শুনিয়া সারদা পা ছড়াইয়া মৃত পিতার নাম করিয়া কাঁদিতে বসিয়া গেল, অন্নদা ঘরে গিয়া দুয়ারে খিল দিল, তখন পূর্ণ আসিয়া ঘরের দুয়ারের কপাট ভাঙ্গিয়া চেঁচাইয়া উঠিল। সকলে গিয়া দেখিল যে অন্নদা টানা পাখার দড়ি গলায় বাঁধিয়া বসিয়া আছে। গতিক দেখিয়া ভবসুন্দরী সে বেলাটায় আর কোন কথা কহিলেন না।

বিকালবেলায় সারদা আসিয়া মাতাকে বুঝাইল যে অন্নদা যখন গলায় দড়ি দিতে গিয়াছিল তখন তাহাকে কোন মতেই হরিহরপুরে পাঠান উচিত নহে, তাহার মতে সকলে কলিকাতায় গিয়া বাসা করিয়া কিছু দিন থাকা উচিত, কোন রকমে একবার জামাইকে বশ করিতে পারিলে হরশঙ্করবাবু আপনা হইতে নরম হইয়া আসিবেন। পরামর্শটা ভবসুন্দরীর ভাল বলিয়াই বোধ হইল। মাতার মন ভিজিয়াছে দেখিয়া সারদা আবার বলিল, যে অন্নদার এখন প্রথম যৌবন, সে অপরূপ সুন্দরী তাহার সংস্পর্শে দুই চারি দিন আসিলে বিনয় নিশ্চয়ই বশ হইয়া যাইবে। দ্বিতীয় পরামর্শটা ভবসুন্দরীর ভালই লাগিল। তিনি তখনই পরেশকে ডাকাইয়া কলিকাতায় গিয়া বাড়ীভাড়া করিতে হুকুম দিলেন। পরেশচন্দ্র তখন হরিহরপুরে যাতায়াতের খরচের কর্দ্দ করিতেছিল, রাগে আদায়খাত ভুলিয়া সে হঠাৎ সত্য খরচ লিখিয়া ফেলিল। রাত্রির গাড়ীতে রওয়ানা হইয়া সে যখন বিনয়ের বাসায় আসিয়া পৌঁছিল তখন গৌরমোহনবাবু ও নির্ম্মলের মাতা বিনয়ের বাসায় আসিয়া পৌঁছিয়াছেন কিন্তু বিনয় ও নির্ম্মল দুইজনেই বাহির হইয়া গিয়াছে।

বাসার চাকর পরেশকে চিনিত কারণ পূজার পূর্ব্বে ভবসুন্দরীর আদেশ মত সে দুই টাকা বখ্‌শিস্ পাইয়াছিল সুতরাং সে পরেশকে খাতির করিয়াই বসাইল। বুদ্ধিমান পরেশচন্দ্র নিচের ঘরে চাকরের মাদুরের উপর বসিয়া ইন্দুর আগমন হইতে সস্ত্রীক গৌরমোহনের আগমন পর্য্যন্ত সমস্ত ঘটনাই শুনিয়া লইল। বেলা দুইটা পর্য্যন্ত বিনয় ফিরিল না দেখিয়া সে স্নানাহার সমাপন করিয়া বাড়ী খুঁজিতে বাহির হইল। বাড়ী পাইতে তাহার অধিক বিলম্ব হইল না। বিনয়ের বাসার কাছেই অপার সার্কুলার রোডের উপরে সে মাসিক দুই শত টাকা ভাড়ায় প্রকাণ্ড একটা বাসা ঠিক করিয়া ফিরিয়া আসিল। বেলা পাঁচটা—কার্ত্তিকের বেলা পড়িয়া আসিয়াছে। পরেশ আসিয়া খবর পাইল যে ইন্দুর প্রবল জ্বর আসিয়াছে, ডাক্তার আসিয়া বলিয়া গিয়াছেন যে তাহাকে এখন স্থানান্তরে লইয়া যাওয়া অসম্ভব। ইন্দুর স্বামীর অবস্থা শক্তটাপন্ন, নির্ম্মল ও বিনয় তাহাকে হাঁসপাতালে লইয়া গিয়াছে তাহারা একবার ফিরিয়া আসিয়াছিল আবার চলিয়া গিয়াছে। গৌরমোহনের বাড়ীর চাকর দাসী আসিয়া বাসার উপরের মহল দখল করিয়াছে সুতরাং বিনয়ের চাকরের আর উপরে উঠিবার উপায় নাই। সন্ধ্যার পরে আর একবার বাহির হইয়া পরেশচন্দ্র যখন ফিরিল তখন রাত্রি প্রায় দশটা। তখন বিনয় ও নির্ম্মল দুই জনেই ফিরিয়া আসিয়াছে এবং বাসার ধরজায় বসিয়া আছে। অনেক দিন পরে দেখিয়াও পরেশচন্দ্র নির্ম্মলকে চিনিল কিন্তু ভয়ে তাহাকে বড় বাবাজী বলিয়া সম্বোধন করিতে পারিল না। সে দুই জনকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল, বিনয় তাহাকে দেখিয়া অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি পরেশবাবু আবার এখানে কি মনে করে?" পরেশচন্দ্র অতিশয় বিনয় সহকারে নিবেদন করিল, "যে ভবসুন্দরী দেবী অত্যন্ত পীড়িতা হইয়া পড়িয়াছেন, ডাক্তার

রোগ কঠিন বলিয়া চিকিৎসার জন্য কলিকাতায় আনিতে পরামর্শ দিয়াছে, সেই জন্যই সে বিনয়ের নিকট আসিয়াছে। পরেশের কথা শুনিয়া বিনয়ের বিরক্তির ভাবটা মুখে স্পষ্ট ফুটিয়া উঠিল, সে বলিয়া ফেলিল, "ভাল আপদ, বিপদ কখন একা আসে না। আমরা এখন নির্ম্মল বাবুর বোন আর তার স্বামীকে নিয়ে বড়ই বিপদে পড়েছি। পরেশবাবু আপনি একটা বাড়ী টাড়ী দেখে রাখুন, আমার এখন মোটেই সময় নেই।" "আজ্ঞে একটা বড়গোছের বাড়ী ঠিক করে এসেছি এখন হুজুরের হুকুম হলেই হয়।" "আমার হুকুমের অপেক্ষা কেন?" "হুজুর গিন্নিমার হুকুম।" "তবে আপনি যা হয় ঠিক করুন আমার এখন মোটেই সময় নেই।" "আপনি একবার স্বচক্ষে দেখবেন না হুজুর?" "নলিনাক্ষবাবুর অবস্থা যে রকম তাতে তিনি বাঁচেন কি না সন্দেহ তাঁর অবস্থা একটু ভাল না হলে আমি কোথাও নড়তে পারছি না। তাঁরা কবে আসবেন?" "এই কাল পোরশু নাগাদ।" "আমি যদি পারি কাল বিকালে একবার বেরুবো।"

বাসা ঠিক করিয়াই পরেশচন্দ্র ভবসুন্দরীকে তার করিয়া দিয়াছিল সুতরাং সে জানিত যে একাদশীর দিন রওয়ানা হইয়া সকলে চতুর্দ্দশীর দিন সকালে কলিকাতায় আসিয়া পৌঁছিবেন; সে কথা বিনয়ের কাছে না ভাঙ্গিয়া সে অতি সংক্ষেপে বলিল, "যে আজ্ঞে।"

মদের দোকানে ইন্দুর জন্য ব্রাণ্ডি কিনিতে গিয়া বিনয় সেই দিন সকাল বেলায় দেখিয়াছিল যে একটা লোক অজ্ঞান হইয়া মদের দোকানের সম্মুখে পড়িয়া আছে। লোকটা তাহার পরিচিত বলিয়া বোধ হওয়ায় সে নিকটে গিয়া দেখিল যে সে নলিনাক্ষ। নলিনাক্ষ সন্ধ্যা হইতে মদ্যপান করিয়া রাত্রিকালে কোন সময়ে অচেতন হইয়া গিয়াছিল তাহা দোকানের লোকে জানিতে পারে নাই। তাহারা সকালে দোকান খুলিতে আসিয়া দেখিয়াছে যে লোকটা সেই ভাবেই পড়িয়া আছে, তখন তাহারা পুলিশ ডাকিয়া আনিয়াছে। বিনয় যখন দেখিল যে নলিনাক্ষের অবস্থা ভাল নহে তাহার শ্বাস প্রশ্বাসের কষ্ট আরম্ভ হইয়াছে তখন সে আর স্থির থাকিতে পারিল না সে পুলিশের সহিত নলিনাক্ষকে লইয়া মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চলিয়া গেল। এই জন্যই তাহার ব্রাণ্ডি লইয়া ফিরিতে বিলম্ব হইয়াছিল। হাসপাতালে গিয়াও নলিনাক্ষের চৈতন্য ফিরিল না, সুরা তাহাকে গ্রাস করিয়াছিল, সে গ্রাস তাহাকে পরিদিন উষাকালে জীবনের সমস্ত সুখ দুঃখ ভুলাইয়া দিয়া নলিনাক্ষকে লোকান্তরে প্রেরণ করিল। ইন্দু সে সংবাদ জানিতে পারিল না। কারণ সে তখন সুখ দুঃখের অতীত।

চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

সকালবেলায় বিনয়কে না বলিয়া পরেশ ষ্টেশনে চলিয়া গেল। সে যখন চারিখানি গাড়ী বোঝাই করিয়া দল সমেত ভবসুন্দরীকে আনিয়া বিনয়ের বাসার দুয়ারে হাজির করিল তখন বিনয় ও নির্ম্মল চাকরের ঘরে পড়িয়া ঘুমাইতেছে, তাহারা ত্রয়োদশীর দিন রাত্রিতে নলিনাক্ষের দেহ শ্মশানে লইয়া গিয়াছিল এবং অল্পক্ষণ পূর্ব্বে ফিরিয়া আসিয়াছে। বাসার চাকর বিনয়কে ডাকিতে ভরসা করিল না কিন্তু গোলমালে নির্ম্মল উঠিয়া বসিল। ভবসুন্দরীর আগমনের কথা শুনিয়া নির্ম্মল বলিল, "পরেশ বাবু আপনি এখন ওঁদের বাসায় নিয়ে যান আমরা শেষ রাত্রিতে শ্মশান থেকে ফিরে এসেছি, এখন বিনুকে টেনে নিয়ে গেলে তার অসুখ করতে পারে।" সারদা ষ্টেশনে পরেশের মুখে ইন্দুর অসুখের কথা শুনিয়াছিল, সে আরও শুনিয়াছিল যে ইন্দু সুন্দরী, সম্ভবতঃ তাহা অপেক্ষাও সুন্দরী, সুতরাং সে স্থির করিয়াছিল যে তাহারা সকলে মিলিয়া বিনয়কে ইন্দুর সংস্পর্শ হইতে উঠাইয়া লইয়া যাইবে, আর আসিতে দিবে না। তাহার মতলব ফাঁসিয়া গেল দেখিয়া সারদা পরেশের উপর অত্যন্ত রাগিয়া গেল কিন্তু নির্ম্মল বাসার দুয়ারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল সুতরাং সে কিছু বলিতে পারিল না। সারদা রাগে ফুলিতে ফুলিতে বাসায় চলিয়া গেল।

সন্ধ্যা হইয়া আসিল তখনও বিনয় আসিয়া পৌঁছিল না দেখিয়া সারদা তাহার মাতাকে বলিয়া বসিল, "মা আমি জামাইকে ধোরে আনতে যাই।" ভবসুন্দরী তখন জপ করিতে ছিলেন। জামাইবাড়ী যাওয়ার প্রস্তাবটা তাঁহার মোটেই পছন্দ হইল না, তিনি বলিলেন "আসবে এখন বাছা, এত তাড়াতাড়ির দরকার কি? বরঞ্চ পরেশকে আর একবার পাঠিয়ে দে।" কথাটা সারদার মনঃপুত হইল না কারণ ভিতরের অবস্থাটা সে সত্য সত্যই বুঝিয়াছিল। সারদা তাঁহার মাতাকে বলিল, "মা তুমি ভিতরের কথা বুঝচো না সে রাক্ষসীর মুখ থেকে বিনুকে বার কোরে আনা পরেশের কর্ম্ম নয়। আমি বরং হিমির মাকে নিয়ে যাই, দেখি আন্‌তে পারি কি না?" ভবসুন্দরী মুখ বাঁকাইয়া বলিলেন, "তোর মত অনাছিষ্টি কথা সারি, জামাই আমার কাল হলে কি হয় সে ছুঁড়ির

ছেলে, আর ইন্দু ভদ্রলোকের মেয়ে, শুনছি তার বাপ মাও এসেছে। না খেনে শুনে ভদ্রলোকের মেয়ের নামে অত বড় কথা বোলতে নেই।" সারদা মায়ের কথা শুনিয়া হাসিয়া বলিয়া উঠিল, "কোলকেতার মেয়েরা বড় সতী তুমি তো জান? জামাইটাকে যদি বিষ খাইয়ে না মেরে থাকে তাহ'লে আমি পার্ব্বতী বুধুর্দ্দোর মেয়ে নই। জামাইটাকে বিষ খাইয়ে মেয়ে ওঁড়ীর দোকানে ছেলে এসেছিল তারপর রাটিয়ে দিয়েছে সে মদ খেয়ে মোরেছে। কোলকেতায় টাকা থাকলে কি না হয় তুমি না বুঝে সুঝে আমার সর্ব্বনাশ কোরছো মা। তোমরা মেকেলে মেয়ে-মানুষ একালের লেখা পড়া জানা মেয়েদের ধরণ ধারণ তোমরা কিছুই জান না।" ভবসুন্দরী বলিলেন, "তবে যা ইচ্ছা হয় করো বাছা।"

সারদা স্নান করিয়া একখানা পাতলা দেশী সাদা ধুতী পরিয়া গাড়ী ডাকাইয়া হিমির দ্বার সহিত বিনয়ের বাসায় চলিয়া গেল। তাহার গাড়ী যখন বিনয়ের বাসার দরজায় গিয়া পৌছিল তখন নির্ম্মল সেখানে বসিয়াছিল। সারদার তাহাকে চিনিতে বিলম্ব হইল না সে নির্ম্মলকে বুঝিল এবং কোথায় তাহার সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল; কিন্তু বড় বাবাজী যে নির্ম্মলেন্দু মুখোপাধ্যায় তাহা সে জানিত না। সুতরাং বিনয়ের বাসার দরজায় নির্ম্মলেন্দুকে দেখিয়া সারদা তাহাকে বড় বাবাজী বলিয়াই চিনিল কিন্তু নির্ম্মলেন্দু বলিয়া চিনিল না। অথচ এই সারদা বিনয়ের সহিত দুই দিন দুই রাত্রি একত্রে বসবাস করিয়াও তাহাকে চিনিতে পারে নাই।"

সারদার হুকুম মত দাসী গাড়ী হইতে নামিয়া নির্ম্মলকে বলিল, "বাবাজি, বড় দিদিমণি এসেছেন, আপনি একটু উঠে ঘরের ভেতরে চলুন, "নির্ম্মল উঠিয়া দাঁড়াইতেই সারদা গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িল। নির্ম্মলকে দেখিয়া তাহার মন এতদূর উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল যে সে তাহার উদ্দেশ্য ভুলিয়া গেল, সে তখন হারানিধি পাইয়া তাহাকে তাহার পূর্ণ যৌবনের রূপের ও সুন্দর সুগঠিত অবয়বের চঞ্চলতার মোহে মুগ্ধ করিবার চেষ্টা করিতেছিল। নিম্ন চাকরদের ঘরটায় কেহছিল না বিনয়ও নির্ম্মল সেখানে শুইত বলিয়া একখানা তক্তপোষ পাতিয়া রাখা হইয়াছিল, সারদা নির্ম্মলের হাত ধরিয়া ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িয়া তক্তপোষীর উপরে ধপ্ করিয়া বসিয়া পড়িল। পথের ধারের জানালা দিয়া গ্যাসের আলো আসিয়া সারদার মুখের উপর পড়িয়াছিল, নির্ম্মল দেখিল তাহার মাথার কাপড় খুলিয়া গিয়াছে, তাহার সুন্দর মুখখানা লাল হইয়া উঠিয়াছে আর কপালে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম দেখা দিয়াছে। সারদার অবস্থা দেখিয়া নির্ম্মলের ভয় হইল, সে বলিয়া উঠিল, "তাই ত আপনার শরীরটা যে বড়ই খারাপ হয়েছে। আমি এক খানা পাখা নিয়ে আসি।" সারদা এতক্ষণ নির্ম্মলের এক খানা হাত ধরিয়াছিল এখন সে তাহার দুইখানা হাত ধরিয়া বলিল, "না না পাখা চাই না এইবার কেমন ধরেছি?" বলিতে বলিতে সারদার মুখখানা যেন রক্ত করিয়া ফাটিয়া যাইবার উপক্রম হইল, সে ভীষণ সৌন্দর্য্য দেখিয়া অনভিজ্ঞ নির্ম্মল মুগ্ধ হইয়া গেল, সারদা তখন তাহাকে জোর করিয়া তক্তপোষের উপর বসাইয়া বলিল, "এবার আর ছাড়ছি না পরেশটাকে ভ্যাবাকান্ত পেয়ে বড় পালিয়েছিলে এবার বেঁধে রাখবো।" বলিতে বলিতে সারদা অঞ্চল দিয়া নির্ম্মলের দক্ষিণ হস্তটা বাঁধিয়া ফেলিল, নির্ম্মল হতবুদ্ধি হইয়া বসিয়া রহিল। সারদা যখন তাহার হাত বাঁধিতেছিল তখন সে তাহার তপ্ত হস্ত স্পর্শেই মনে করিয়াছিল যে সারদার ভয়ানক জ্বর আসিয়াছে কিন্তু সেই তপ্ত স্পর্শ তাহার মনের অজ্ঞাতে তাহাকে উত্তেজিত করিয়া তুলিতেছিল, তাহার সারদার সুন্দর রাগরক্ত মুখের দিকে চাহিয়া থাকিতে ইচ্ছা করিতেছিল, সারদার অজ্ঞাতে তাহার অঙ্গ স্পর্শ করিতে ইচ্ছা করিতেছিল। ঝিটা এতক্ষণ বাহিরে দাঁড়াইয়াছিল সে এই সময়ে বলিয়া উঠিল, "দিদিমণিগো জামাইবাবু এসেছেন।" সারদা তাহার কথা শুনিয়া তাড়াতাড়ি নির্ম্মলের বাঁধন খুলিয়া দিতে গেল সেই সময়ে তাহার বুকের কাপড়টা সরিয়া গেল কিন্তু বাঁধন খুলিতে খুলিতে সারদা তাহা যথাস্থানে সরাইয়া দিল না তখন নির্ম্মলের মাথার ভিতরে ধপ্ করিয়া আগুন জ্বলিয়া উঠিল, সে হাত কাড়িয়া লইয়া জানালার কাছে চলিয়া গেল। ঠিক সেই সময়ে ঘরের দুয়ারে দাঁড়াইয়া বিনয় বলিল, "দিদি যে আপনি এতক্ষণ!" বিনয়কে দেখিয়া অঙ্গের অলিত বস্ত্র যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট করিয়া সারদা

বলিল, "এস ভাই, তুমি যাওনি বলেই আস্‌তে হয়েছে।" তোমার বাসায় এসেই বড় বাবাজীর দেখা পেলুম উনি কাশীতে আমাদের বাসায় গিয়েছিলেন।" বিনয় সারদাকে প্রণাম করিয়া বলিল, "আমিও গিয়েছিলুম দিদি।" সারদা তাহা শুনিয়া স্তম্ভিতা হইয়া গেল।

একচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

সারদা যখন বিনয়কে লইয়া আবার গাড়ীতে উঠিল তখন নির্ম্মল রাগিয়া বাহিরে চলিয়া গিয়াছিল সুতরাং সারদা ফিরিবার সময় তাহাকে খুঁজিয়া পায় নাই। ইতি-মধ্যে সে উপরে গিয়া ইন্দুকে দেখিয়া আসিয়াছিল এবং নির্ম্মলের মাতার সঙ্গে পরিচয় করিয়া আসিয়া ছিল। গাড়ীর ভিতরে বিনয় এক পাশে বসিয়া রহিল, সারদা উঠিবার সময়ে তাহা দেখিয়া কিছুতেই বসিল না, সে বিনয়কে উঠাইয়া তাহার পাশে বসাইয়া বিটাকে সম্মুখে বসিতে হুকুম করিল, আর গাড়ী ছাড়িয়া দিলে দক্ষিণ হস্ত দিয়া বিনয়ের গলদেশ বেষ্টন করিয়া রহিল। তাহার উত্তপ্ত অঙ্গ স্পর্শে বিনয় প্রথমে শিহরিয়া উঠিল কিন্তু সারদা যখন তাহাকে কিছুতেই মুক্তি দিল না তখন তাহার অঙ্গ সহসা পাষাণের মত শীতল হইয়া গেল, সারদার লালসা দীপ্ত হুতাশনের উত্তাপ তাহাকে বেষ্টন করিয়াও উত্তেজিত করিতে পারিল না। সারদা কিন্তু সহজে হটিবার পাত্রী নহে সে যতক্ষণ পারিল বিনয়কে আলিঙ্গন করিয়াই রহিল এবং গাড়ী তাহার বাড়ীর দুয়ারে আসিয়া দাঁড়াইলে একটা দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বিনয়কে মুক্তি দিল।

দ্বিতলের উপর উঠিয়া বিনয় যখন ভবসুন্দরীকে প্রণাম করিতে গেল তখন সারদা সরিয়া পড়িল। প্রণাম করিয়া বিনয় যখন জিজ্ঞাসা করিল, "মা, আপনার কি অসুখ করেছে?" তখন ভবসুন্দরী অবাক হইয়া গেলেন, পরেশ যে জামাইকে বলিয়াছে গিন্নিমার অসুখের চিকিৎসার জন্য সকলের কলিকাতায় আসা হইয়াছে তাহা তিনি জানিতেন না। তিনি আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার অসুখ? কৈ কিছু না বাপু, তবে মাথাটা চিরকালই একটু ঘোরে।" বিনয় তখন বলিল, "পরেশবাবু এসে বল্লেন যে আপনার অসুখ হঠাৎ বড় বেড়ে উঠেছে সেই জন্যই গ্রামের ডাক্তার কলিকাতায় আসতে পরামর্শ দিয়েছেন।" ভব-সুন্দরী তখন মনের ভাব গোপন করিয়া বলিলেন, "রঘু ডাক্তার কলকাতায় আসতে বলেছিল বটে কিন্তু আমি ত তখন আসিনি। এখন সারদার কথায় এসেছি; কি যে হয় আমার সকল কথা মনে থাকে না বাপু। এসে অবধি তোমার জন্যে ছট্‌ফট্ কোরছি তোমায় কি খবর দেওয়া যায় নেই বাপু, বুড়ো মার কথা কি তোমার একবার মনে পড়ে না বাপু?" বিনয় লজ্জায় নিরুত্তর হইয়া রহিল, সে সরল মনে ভবসুন্দরীর পীড়ার কথাটা বিশ্বাস করিয়া ফেলিল, কিন্তু সে যে কি জন্য তাহার পরিশীতা পত্নীর ছায়া স্পর্শ করিতে চাহে না তাহা সে মন খুলিয়া বলিতে পারিল না। ভবসুন্দরী মনে করিলেন যে সারদার বুদ্ধিবলেই জামাই আসিয়াছে সুতরাং তাহার ভরসা হইল যে কন্যার বুদ্ধি-বলেই অবশীকৃত জামাতা বশীভূত হইবে। তিনি বিনয়কে তাঁহার ঘরে একখানা বহুমূল্য কার্পেটের উপর বসাইয়া তাহার খাবার যোগাড় করিতে চলিয়া গেলেন।

ভবসুন্দরীর কক্ষে বসিয়া বিনয় শুনিতে পাইল অন্নদা বলিতেছে "ছোট ঘরে পুনু শুতে চায় না সে বলে তার হাঁপ্ ধরে তাই আমি ও মিন্সের বিছানা ছোট ঘরে নিয়ে যেতে বলেছি।" সারদা গর্জ্জন করিয়া বলিয়া উঠিল, "তোর এতটুকু লজ্জা নেই অন্নি আমার সম্মুখে তোর এ কথা বোল্‌তে লজ্জা হয় না? যাঁদীর বেটা রাজাবাহাদুর হোয়েছেন তাঁর ছোট ঘরে হাঁপ্ ধরে বিছানার চাদরে বাতাস না থাকলে ঘুম ধরে না তার আস্পর্দ্ধা তুই বাড়িয়ে তুলেছিস্। এত বাড়াবাড়ি ভাল না তুই কোন মুখে আমার কাছে বোলতে এলি না কালমুখি যে তোর স্বামীর বিছানা হবে চোরদুটুরিতে আর ঐ ভাঁতীর বিছানা হবে হলঘরের ছাপর খাটে?" অন্নদা এতক্ষণে মুখে চড়াইয়া বলিল, "তুমিও বড্ড বাড়াবাড়ি আরম্ভ করেছ দিদি, তুমি আর বিষয়ের অর্দ্ধেক আমার এখনও আর আমি কচি খুকীটি নেই যে তুমি চোখ রাঙ্গিয়ে আমায় শাসন কোর্ব্বে?" "তুই আর কচি খুকীটি নেই বলেই বোলছি আমি যে চলান্ চলাচ্ছিস্ তা আর সহ্য হোলোনা বলেই বোল্‌ছি, বড় যে বিষয়ের ভাগ দেখাতে এসেছিস্ যা যতক্ষণ বেঁচে আছে জানিস্ ততক্ষণ তুই কেউ নোস্?" এই সময়ে ভবসুন্দরী সেই ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন, "তুই পোড়ারমুখী

চেঁচিয়ে বাড়ী মাথায় তুলছো কেন? জামাই যে পাশের ঘরে বসে আছে?" সারদা তা শুনিয়া জিব কাটিয়া বলিল, "ওমা তাই বুঝি? আর আমি মোরছি চেঁচিয়ে। আজির কথা শুনে গা জলে যায় মা সে বলে যে বিনুর বিছানা হবে চোরকুটুরীতে আর ভাঁতীর বেটার বিছানা হবে বড় ঘরের ছাপর খাটে।" ভবসুন্দরী ধীর ভাবে বলিলেন, "সারি হিমির মাকে বল পুজো যেন আজ উপরে না ওঠে তার বিছানাটা নিচে পরেশের ঘরে দিয়ে আসে।" পাশের ঘর হইতে বিনয় শুনিতে পাইল যে রাগে অভিমানে ফুলিয়া অন্নদা ছুম্ ছুম্ করিতে করিতে চলিয়া গেল। বিনয়ের বড় হাসি আসিল সে স্পষ্ট বুঝিল যে ধনী কন্যার অযৌক্তিক প্রেমে বৈধতা আনিবার জন্যই তাহার কালবরণের মূল্য সহসা বাড়িয়া উঠিয়াছে। ভবসুন্দরী চলিয়া যাইবার পরে তাহাকে অনেকক্ষণ একা বসিয়া থাকিতে হইয়াছিল সে সেই সময়ে ভাবিয়া চিন্তিয়া স্থির করিয়া লইল যে তাহাকে অন্নদার সংস্পর্শ পরিত্যাগ করিতেই হইবে।

অনেকক্ষণ পরে ভবসুন্দরী যখন ফিরিয়া আসিলেন তখন সারদাও তাহার সঙ্গে সঙ্গে ফিরিয়া আসিল। দুই জনে বসিয়া নানা কথায় বিনয়ের মন ভুলাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। তাহারা দুটি অনাথা বিধবা বিনয় ছাড়া তাহাদের কোন অভিভাবক নাই, তাহাদের এত বড় বিষয় পাঁচ ভূতে লুটিয়া খাইতেছে দেখিবার কেহ নাই, বিনয় গিয়া সদরের কাছারিতে না বসিলে তাহাদিগের বিষয় রক্ষা হওয়া দুষ্কর, একই ছন্দে একই রাগিণীতে দুই জনে বার বার একই গান গাহিয়া তাহারা বিনয়কে বিরক্ত করিয়া তুলিল। রাত্রি বারটা বাজিলে দাসী আসিয়া খবর দিল যে খাবার দেওয়া হইয়াছে তখন বিনয় ভবসুন্দরীর সঙ্গে উঠিয়া গেল কিন্তু সারদা অন্যত্র চলিয়া গেল।

বিনয়ের আহার যখন প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে তখন পাচক ব্রাহ্মণ একবাটি গরম মাংস তাহার পাতের কাছে রাখিয়া গেল, বিনয় বড় মাংস ভালবাসিত সে সকল খাবার ছাড়িয়া মাংসের বাটিটা টানিয়া লইল। বাটিটা তখনও অত্যন্ত গরম ছিল বলিয়া সে একখানা মাংস হাতে তুলিয়া আবার পাতে ফেলিয়া দিতে বাধ্য হইল। সে অনেক কষ্টে সমস্ত বাটির মাংসটা থালে ঢালিয়া ফেলিল। বিনয় একখানা মাংস মুখে দিবামাত্র কোমরে কাপড় জড়াইয়া ছুটিতে ছুটিতে সারদা সেই ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং বিনয়কে জিজ্ঞাসা করিল, "বিনু মাংস কি খেয়ে ফেলেছো?" মাংসটা বিনয়ের ভালই লাগিয়াছিল সে হাসিতে হাসিতে বলিল, না দিদি বাটিটা বড় গরম ছিল বলে এই মাত্র পাতে ঢেলে একখানা মুখে তুলেছি।" "ভগবান রক্ষা করেছেন" বলিয়া সারদা বিনয়ের থালাটা হাতে তুলিয়া ঘরের এক কোণে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল, মাংসের ঝোল ঘরময় ছিটাইয়া পড়িল, ভবসুন্দরীর অঙ্গেও দুই চারি ফোঁটা পড়িল তিনি "রাধে গোবিন্দ, রাধে গোবিন্দ" বলিতে বলিতে উঠিয়া পড়িলেন, আর সারদা থর থর করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে বসিয়া পড়িল। ক্রমশঃ

তিনটী

(শ্রীসত্যেন্দ্র গুপ্ত)

তিনটি ভালবাসার জিনিষ :—সাহস, ঋজুতা, আর স্নেহ,

তিনটী ঘৃণার জিনিষ :—নিষ্ঠুরতা, অকৃতজ্ঞতা ও অহঙ্কার।

তিনটী কামনার ধন :—স্বাস্থ্য, সখা আর খোস মেজাজ।

তিনটী ভয়ের জিনিষ :—আগুন, সাপ, আর মূর্খতী স্ত্রী।

তিনটী ছাঁচরা ব্যক্তি :—নূতন কবি, নূতন প্রেমিক ও নূতন সঙ্গীত-শিক্ষার্থী,

তিন জন সহজে রাগ মানে না : দামড়া বলদ, ছাড়া-ঘোড়া আর কিশোরী-স্ত্রী।

তিনটী শাসন করবার জিনিষ :—মেজাজ, জবান ও ব্যবহার।

তিনটী প্রার্থিত জিনিষ :—বিশ্বাস, শান্তি আর মনের পবিত্রতা।

তিনটী সহজে নষ্ট করা যায় :—অর্থ, আত্ম-সম্মান আর চরিত্র।

পরিত্যক্তা

[শ্রীঅজিতকুমার দত্ত]

পদব্রজে ভারত ভ্রমণ করিব এই মানসে যাত্রা করিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে একদিন আসিয়া পূর্ব্ববঙ্গের প্রসিদ্ধ তীর্থ-স্থান সীতাকুণ্ডে পৌঁছিলাম, কিন্তু তখন জানিতাম না এই তীর্থস্থানেই তাঁহার সহিত দেখা হইবে অভিনব উপায়ে।

মন্দির, বড়বকুণ্ড প্রভৃতি দর্শনীয় সমস্তই যখন দেখা হইয়া গেল, আমি একদিন সীতাকুণ্ড পাহাড় ভ্রমণে বাহির হইলাম, তখন রাত্রির চিহ্ন দূরীভূত করিয়া তরুণ সূর্য্য নবীন রাগে পাহাড় চূড়া রঞ্জিত করিয়া উঠে নাই, একটা পাতলা কুয়াসা চারিদিকটাকে অস্পষ্টভাবে বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইয়াছিল, আমি পর্ব্বতচূড়ার মন্দির পথ ত্যাগ করিয়া এক বিভিন্ন অস্পষ্ট গুল্মাবৃত পথ দিয়া অগ্রসর হইলাম। কিয়ৎদূর গমনের পর অদূরে উপত্যকায় কতকগুলা কুটীর আমার দৃষ্টিপথে পতিত হইল, আমি দ্রুতপদে অগ্রসর হইয়া যখন সেখানে পৌঁছিলাম তখন সূর্য্য তাহার সমস্ত দীপ্তি লইয়া পর্ব্বতচূড়ায় উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে।

সেই কুটীরগুলা পর্ব্বতীয়দের। আমি তাহাদের সহিত আলাপ করিবার উদ্দেশ্যে অগ্রসর হইলাম। আমাকে দেখিয়া পাঁচ ছয়টী পর্ব্বতীয় পুরুষ ছুটিয়া আসিল। তাহাদের মধ্যে একজন ভাঙ্গা হিন্দীতে আমার আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিল। আমিও ভাঙ্গা হিন্দীতে উত্তর দিলাম। ক্রমে আলাপ জমিলে একজন পাহাড়ীয়া বলিয়া উঠিল এখানে একজন বাঙ্গালী 'আদমী বাবা বাস করেন। আমি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলাম। তাহারা এক জনে আমাকে সেই কুটীর দেখাইয়া দিল ও বলিল বাবা লোকের একটী লেড়কীও আছে, তাহারা তাহাকে "রাণী মাইজী" বলিয়া ডাকিয়া থাকে, আমি সেই দিকে অগ্রসর হইলাম। একটা কৌতূহল আমাকে উত্তেজিত করিতে লাগিল, বাঙ্গালী ভদ্রলোক, কে এই বিজন উপত্যকায় অসভ্য পার্ব্বতীয়দের সহিত কন্যাসহ বাস করেন? কুটীর দ্বারে উপস্থিত হইয়া যাহা দেখিলাম তাহাতে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া গেলাম। কুটীরাভ্যন্তরে একটী মৃত-দেহের উপর এলাইয়া পড়িয়া একটী রমণী নীরবে অথচ আকুল ভাবে ক্রন্দন করিতেছে, রমণীর বেশ-ভূষায় বুঝিলাম—বাঙ্গালীই বটে। দ্বারে পদ-শব্দ শুনিয়া রমণী রোদনারক্ত চক্ষু দুটী তুলিল ও আমাকে দেখিয়া প্রথমে অতি মাত্রায় বিস্মিত, পরে যেন ঈষৎ প্রসন্ন হইয়া উঠিল। একটা সলজ্জ আভায় তার সুন্দর মুখখানা মণ্ডিত হইয়া উঠিল। আমি কিন্তরে প্রবেশ করিলাম ও সঙ্কোচ ত্যাগ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—"ইনি বোধ হয় আপনার পিতা, ইনি কি—"

কথা সমাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই রমণী পিতার শবদেহের উপর পড়িয়া আকুল ভাবে কাঁদিয়া উঠিল। আমি বিব্রত হইয়া কি করা উচিত ভাবিতে লাগিলাম।

কিয়ৎ-কাল পরে রমণী আত্ম-সংবরণ করিয়া উঠিয়া বসিল তারপর দৃঢ় পরিষ্কার মৃদু-কণ্ঠে কহিল—"আপনি বোধ হয় বাঙ্গালী—অনুগ্রহ করে যদি এর সৎকারের ব্যবস্থা করে দেন তাহলে—।"

আমি পার্ব্বতীয়দের সাহায্যে সেই মৃতদেহ সৎকার করিলাম, তারপর রমণী স্নান করিয়া কুটীরে ফিরিলে জিজ্ঞাসা করিলাম এখন কি করিবেন?" রমণী নিরুত্তর। আমি মুহূর্ত্ত কাল উত্তর প্রত্যাশায় অপেক্ষা করিয়া করিয়া কহিলাম—যদি কিছু না মনে করেন তবে একটা কথা বন্ধু-ভাবে জিজ্ঞাসা করি—আপনারা এমন জনহীন স্থানে কেন এলেন এবং কেন এরূপ নিঃসহায় অবস্থায় আছেন।

তখন রমণী যাহা বলিল তাহার সংক্ষিপ্তসার এই—শ্বশুর ও শাশুড়ীর অকারণ অত্যাচার সহিতে না পারিয়া একদিন নির্জ্জোধ বালিকা দুই ক্রোশ মাত্র দূরবর্ত্তী পিত্রালয়ে পলায়ন করে। ইহাতে শ্বশুর শাশুড়ী তাঁহাকে কলঙ্কিনী চরিত্রহীনা বলিয়া গৃহে গ্রহণ করিতে চান না এদিকে পিত্রালয়স্থ ব্রাহ্মণগণও এই কন্যা, গৃহে রাখিতে হইলে প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ প্রত্যেক ব্রাহ্মণকে বেশ বড় বড় দক্ষিণা ও পরিপাটীরূপে ভোজন করাইতে হইবে নতুবা কলঙ্কিনী কন্যাকে গৃহে রাখিলে সে সমাজ চ্যুত হইবে। পিতা মাতৃ হীনা কন্যাকে ব্রাহ্মণ অত্যধিক স্নেহ করিতেন। তিনি বলিলেন তোমরা দান চাহ দান করিতে পারি কিন্তু এইরূপে দান করিলে আমার পবিত্র-মনা কন্যার অপমান করা হইবে সুতরাং তোমাদের সে আশা নাই, পিতা আমাকে লইয়া সহরে আসিলেন। কিন্তু হতাশায় ক্রুদ্ধ ব্রাহ্মণগণ এখানেও উৎপাত আরম্ভ করিল। তখন পিতা তাঁহাকে লইয়া সীতাকুণ্ডে আসেন। এবার লোক সমাজে না

যাইয়া সরল নির্দ্দোষ পাহাড়ীয়াদের সহিত বাস করিতে থাকেন, এবং আজ কয়েক দিন হইল আমাদের ভূমিতে ছিলেন,—এবং এই রোগে আজ মৃত্যু হইয়াছে।

সমস্ত ইতিহাস শুনিয়া আমার মনে একটা সন্দেহ হইল এবং তাহা মনে হইতেই আমার মনে একটা অবর্ণ্য লজ্জা ও ধিক্কার উপস্থিত হইল। আমি সসঙ্কোচে জিজ্ঞাসা করিলাম .."আপনার স্বামী প্রতিবাদ করিলেন না —"

সে বাধা দিয়া আমার মুখের উপর চোখ দুটী তুলিয়া কহিল—"তিনি ত ছিলেন না, কলকাতায় তখন তিনি পড়াশুনা কর্ত্তেন। পরে শুনে কি করেছিলেন তা আমি জানিনে। আমি কম্পিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলাম—আপনার শ্বশুর ও স্বামীর নাম অনুগ্রহ করে জানাবেন কি ?"

সে বিস্মিতা হইয়া আমার দিকে চাহিল, তারপর নীরবে দুটী নাম লিখিয়া দিল। আমি হতজ্ঞানের ন্যায় বসিয়া পড়িলাম। এ যে আমার ও পিতার নাম ? এই রমণী আমারই হতভাগিনী পরিত্যক্তা স্ত্রী।

আমার প্রিয়ে।

'শ্রীসম্মার্জ্জনী ভক্ত।'

দেখ্‌তে কেমন্ প্রিয়া আমার
কর্সা কিম্বা কালো,
হয় কি না হয় প্রেম আমাদের
বাসি কিনা ভালো ;
শুন্‌বে সবে নেহাৎ যদি
বলি তবে শোনো,——
বল্‌ব নাক মিথ্যা কভু
সব্‌টা সত্য জেনো।
পেয়েছে সে রঙ্‌টা 'শ্যামের'
অনেক পুণ্য ফলে ;
আমার বর্ণ তাই বলে কি
'রাধার সঙ্গে মেলে ?
খুব লম্বা নয়ক প্রিয়া
বেশ একটু বেঁটে ;
আমার কথায় তোমরা আবার
নিয়ো কিছু ছেঁটে।
চুলের গোছা ভারীও নয়
আছে দু'এক গাছা ;
প্রিয়ার আমার চেহারা খানা
যাচ্ছেতাই রকম বোকা ?
মুখি মেয়ে আনি না কে
বসিয়ে দেছে নাকটা।
সেই হতে সে চিরদিনই
রয়ে গেছে চেপ্‌টা !
মাঝারী-ভাব ফুটে আছে
ভ্যাব্‌রা দুটো চোখে,
মণি গেছে কটা হয়ে
আমায় দেখে দেখে।
গড়ে ছিল যেই বিধাতা
তাঁরই কথা বলি,—
জোড়া-ভুরু আঁকতে দেখেন,
রঙের বাটী খালি।
চোখ্‌টা যেন সে দিন থেকে
হয়ে আছে নেড়া,
প্রিয়া আমার ঐ দুখেতেই
কেঁদে কেঁদে সারা।
যদিও সে কাঁদলে পরে
মুক্তো নাহি ঝরে,
হাস্‌লে কিন্তু মুলোর মত
দাঁত বেরিয়ে পড়ে।
বায়স্ ডেকে যাবার আগেই
কোকিল গেছে হেরে,
কাজেই সে স্বর শুন্‌লে পরে
রজক্ আসে তেড়ে।

হাত দু'খানা কোমল কেমন
বোঝানোটাই শক্ত।
বুঝ্‌বে তখন হবে যখন
সম্মার্জ্জনীর ভক্ত।
সারা বিশ্ব কাঁপে যেন
পায়ের তালে তালে,
কোন দেবতার আশীস্ ফলে
মিলেছে মোর ভালে!
আমি কিন্তু বাজাইনিক
শ্যামের মোহন বাঁশী,
নিজেই প্রিয়া পাগল হয়ে
ধরা দেছেন আসি।
গিন্নী বলেন—"প্রাণবল্লভ!"
কর্ত্তা—"প্রাণেশ্বরি!
অত-দূরে রইলে কেন?
বিরহে যে মরি।
বাঁচল খানি কাতর হয়ে
ধরলেন কর্ত্তা শেষে,
অম্‌নি গিন্নী সোহাগ্ ভরে
বস্‌লেন কাছে ঘেঁসে।
এক মেয়ে এই প্রেম অভিনয়
দেখ্‌ছি খালি খা'লি,
আমাদের সব নূতন ধরণ,
শোনই সেটা বলি।
তিনি বলেন—"সোড়ার মুখো,
ন্যাকরা চোখো ছিল্‌সে,"
ব্যাপার গুরুতর দেখে
অম্‌নি পড়ি খসে।
বলব কি ভাই প্রিয়ার ওপর
এমনি আমার টান্,
দুই পা গিয়ে চরণ-ধূলি
আপনি খেয়ে যান্!
বলি হেসে ফিরে এসে
হাত দু'খানা ধরি,—
"ওগো প্রিয়া। তুমি যে মোর,
হৃদ্‌পিণ্ডে-শ্বরী!
আর কোথা যাব, বলব কি ভাই,
কাছেই থাকে ঘাঁটা,
আমার আবার যে ভুলো মন,
ভুলে যাই যে সেটা।
পিঠের ধুলো ঝাড়ন দিয়ে
ঝেঁটিয়ে ফেলেন ঝেড়ে,
ঠিক্ যেন কেউ হাত বুলিয়ে
দিচ্ছে 'ভেদু' জ্বরে।
প্রেম আমাদের এম্‌নি করে
গজায় দিনে দিনে;
লিখ্‌বো কেতাব জান্‌বে যদি
পোড়ে তখন কিনে।
তোমরা সবাই বন্ধু আমার
আবার যেন দেখো,
লেখার আগেই প্রকাশ না পায়
গোপন করে রেখো।
ভাব্‌ছো বোধ হয়, আবার আমি
কর্ত্তে যাব বিয়ে।
তা কখনো পোষায় আমার,
থাক্‌তে এমন্ প্রিয়ে?
সত্য কথা বল্‌তে, আমি
বেজায় অনুরক্ত।
এই খানেতেই ইতি তবে,
'শ্রীসম্মার্জ্জনী ভক্ত'

নৈকট্য

(মহম্মদ আবদুল হক)
(সা'দী হইতে)

প্রাণের কাছে মনটি যেমন হিয়ার অতি নিকট থাকে
তাহার চেয়ে নিকটতর বন্ধু আমার গোপন বুকে।
খুঁজি যখন বিশ্বমাঝে বন্ধু আমার কোথায় রাজে,
দেখি তখন নিত্য সাথে হৃদয়-পটে আঁকা যে যে।

নীরব পূজা

(শ্রীকৃষ্ণপদ দাস)

আমি তখন চাপরানী ভালহাউসী ঘুট দিলে "হাজিরী বাবু" অর্থাৎ "Time keeper" এর কাজ করি। মিল "কোম্পানীর বস্তীর টালীর ছাউনী পাকা ঘরে বাস, মেসের পঙ্কু-ঠাকুরের হাতের রান্নায় অমৃতের স্বাদ গ্রহণ, মাঝে মাঝে সন্ধ্যার গলায় মিঠে হাওয়া খাওয়া, এই ছিল তখন—কার দিনের ইতিহাস। সকাল ছয়টা হতে সন্ধ্যা ৭টা পর্য্যন্ত চাকরী, বাকী সময়টা বাসায় তামাক টেনে নভেল পড়ে তাস পিটিয়ে কাটে। শনিবার "হপ্তার দিন" অর্থাৎ ঐ দিন সকলে মাইনে পায়। রবিবার ছুটি থাকে। আমার কিন্তু রবিবারেও নিস্তার ছিল না। রবিবার সকালে বড় বাবু বাসা হ'তে পাকড়াও করে নিয়ে যেতেন তাঁর সঙ্গে—"ইন্‌চার্জের" কাজ শেখবার জন্তে। এমনই দিন কাটছিল।

সে দিন রবিবার। বড়-বাবুর বেগার দিয়ে বাসায় ফিরছি, কল হতে বেরিয়ে বড়-বাবু নিজের গাড়ীতে উঠে বল্লেন, "আয় যাবি সঙ্গে"—আমি বল্লাম—"না বাসায় যাব।"

মিলের কম্পাউণ্ড ছাড়িয়ে রাস্তায় পড়েছি, দেখি ওয়াইণ্ডিং ডিপার্টমেণ্টের ৭নং কলের কুলী মনিয়া আলু-থালু বেশে, আমার দিকে ছুটে আসছে—দূর হতেই সে বল্লে—"বাস্‌নে বাবু শুন্ শুন্।"

তার চলার ভঙ্গী চকল চরণের গতি ও ব্যস্ততা দেখে পথের মাঝে দাঁড়ালাম, "কি হয়েছে রে মনিয়া?"

হাঁফাতে হাঁফাতে মনিয়া উত্তর করলে, "বড়া বিপদ লেগেছে বাবু—"

"বিপদ!! বুকের ভেতর সজোরে কে যেন একটা ঘা মারলে। "বিপদ কিসের রে?"

"পনেরটো—রোপেয়া দিয়ে তুই আমাকে বাঁচাবে বাবু।"

মনিয়া আমাদের বাসাতে কাজ করে সময়ে অসময়ে টাকাটা—সিকেটা—দরকার পড়লে আমার কাছ হ'তেই নেয়। মেসের ম্যানেজার আমি, কাজেই ২৫।৩০ টাকা আমার হাতে প্রায়ই থাকে।

মনিয়া আজ হঠাৎ একেবারে ১৫৲ টাকা—চাওয়াতে আমি অবাক হয়ে গেলাম! "এতটাকা কি হবেরে মনিয়া?"

"বহুৎ জরুরী কাম আছে, দিতে হোবে বাবু—"

"জরুরী কাম ত আছে কিন্তু কামটা কি তাও শুনতে পাব না।"

"আজ আমাদের পঞ্চাইৎ হইছে, রঘুয়া সর্দ্দার বাপের পনের রোপেয়া জরিমানা করিয়েছে—টাকা তুই দেবে বাবু, নেই—আমাদের ইজ্জত যাবে জাতভি যাবে—।"

"এত টাকা কোথা পাব—আমার কাছে ত নেই।"

অনুনয়ের সুরে বল্লে, "তোর বহুত রোপিয়া আছে, দিবি বাবু গরীবকে বাচাবি, তোর গোর বরছে যে—আমি তুহার বাঁদী হোবে জনম তোর তুহার কাম করবে।"

সত্য সত্যই সে আমার পাদুটো জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেল্লে। তার হাত থেকে মুক্তি পেয়ে বল্লাম "জরিমানা কেন হোল রে—"

"সে হামি বলতে পারবে না। তুই রোপেয়া দিবি বল।

রাস্তার মাঝে এ ব্যাপারটা মোটেই আমার ভাল লাগছিল না। আপদকে সরাবার জন্তে বললাম "তুই এখন যা—মনিয়া—বিকেল বেলা—যা হয় হ'বে এখন।"

"দিবি, দিবি আঃ"—সে যেন তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেল্লে। "ভগবান তোর ভালা করবে বাবু, তুই রাজা হোবি।

পথে যেতে যেতে আবার আমার দিকে কাতর দৃষ্টিতে চেয়ে বল্লে—ভুলিস্‌না— দেখিস বাবু—।"

(খ)

বাসায় ঢুকতেই পঙ্কু-ঠাকুর বলে উঠল—"যোগেন, বাবু, মনিয়া যে খুঁজছিল আপনাকে; দেখা হয়েছে।"

"না—কেন?"

"টাকা কড়ি কিছু চাই বোধ হয়"

"তোমায় কিছু বলেনি।—তুমি কি আর না জিজ্ঞেস করেছ ঠাকুর বল না।"

"আজ ওদের পঞ্চায়েৎ কিনা, তাতে মনিয়ার বাপের ১৫৲ টাকা জরিমানা হয়েছে—"

বাধা দিয়া আমি বল্‌লাম "তা আমি জানি, কিসের জন্যে জরিমানা তাই বল।"

আজও মনিয়ার বিয়ে হয়নি এই হল প্রধান অপরাধ। রঘুয়া সর্দ্দার ওকে বিয়ে করতে চেয়েছিল—বড্ড মাতাল কিনা। তাই মনিয়ার বাপ রঘুয়ার সঙ্গে বিয়ে দিতে রাজী হয়নি—এই হল তার রাগ। আজ সর্দ্দারের বাসায় পঞ্চায়েৎ বসেছে—গঙ্গা জলিয়ার ১০৲ টাকা জরিমানা হয়েছে সে টাকা বাবা সর্দ্দার দিয়েছে—"

"আঃ কি জ্বালা। অত কথা শোনবার—আমার দরকার নেই—মনিয়ার জরিমানার কথা বল।"

তাইত বল্‌ছি বাবু—আজ সকলে মিলে মনিয়ার বাপ বাসুদেবকে ধরেছে—অত বড় মেয়ের আজও বিয়ে হয়নি কেন? কে বিয়ের চেষ্টা পর্য্যন্ত করছে না কেন? তারা—তারা বলছে" "পঙ্কু-ঠাকুর বল-তারা কি বলেছে।"

"তারা বলেছে, আপনি তার বাবু।"

রাগে সর্ব্ব-শরীর জ্বলে উঠল—মুখ থেকে আপনিই বেড়িয়ে গেল "খবর্দ্দার"—পরক্ষণেই—ভাবলাম গরীব বামুন ওরই বা দোষ কি? বেচারা তাদের কথা আমায় শুনিয়েছে মাত্র।—বললাম "দূর, আমি তার বাবু হতে যাব কেন?"

আমার ভারি লজ্জা হল, নিজেকে অনেক খানি অপমানিত বোধ করলাম। ঠাকুর মনে কর্‌বে কি। অপর লোকে শুনলেই বা বলবে কি? ছিঃ! ছিঃ!

যদি বা কোথাও হতে টাকাটা যোগার করে দিতাম, কিন্তু আর না, আর এক পয়সাও দেব না। বিপদে সাহায্য করার এই ত পরিণাম। ওঃ! কি ভয়ানক স্পর্দ্ধা। আমার সঙ্গে মনিয়ার নাম একযোগে থাকাতে—মনটা কেমন ভার হয়ে গেল। হয়-ত কুলী মহলে এই নিয়ে খুব আন্দোলন চল্‌ছে—তারা ভাবছে এই বাবুটা কি নীচ্। যদি বাবু মহলে ঘুনাক্ষরেও এই কথাটা প্রকাশ পায় তাহলে তারাই বা কি ভাব্‌বে! কই, মনিয়াকে ত কোন দিন সে রকম দেখিনি। সে সুন্দরী, তার কচি মুখ খানিতে লাবণ্য মাখান, চোখ দু'টি তার স্নিগ্ধ চাহনিতে ভরা। সরলতার ঢেউ খেলে যায় তার মুখের উপর দিয়ে। কই সেখানে ত লালসার কোন চিহ্ন নেই।

মনিয়াকে আমি ভাল বাসি কি? হয় তো বাসি, কিন্তু তাকে ত এমন ভাবে কোন দিন পাবার আশা করিনি। আচ্ছা মনিয়া আমাকে ভালবাসে কি? তার ভাবে ভাষায় আকার—ইঙ্গিতে কথা বার্ত্তায় কোন দিন-ত প্রকাশ পায়নি। হতে পারে সে আমার অনুরক্তা—তা বলে তাকে যে বিয়ে করতে হবে এমন ত কোন কথা নাই। মনিয়া কুলী কামিনী, তার সঙ্গে বাঙ্গালী আমি—শিক্ষিত সম্ভ্রান্তজাত আমার বিবাহ অসম্ভব। চট্-কলের একটা নগণ্য কুলী, তার মেয়ে আমার কি, তার সঙ্গে আমার বিয়ের কল্পনা, ধিক। ছিঃ! ছিঃ—কি লজ্জা! কি ঘৃণা।

সকাল সকাল খাওয়া দাওয়া শেষ করে নিয়ে বাসা হতে বেড়িয়ে পড়লাম। কি জানি বাসায় থাকলে মনিয়া এসে কাঁদা কাটি করে যদি মন নরম হয়ে যায়। উহুঁ বাসায় থাকা সুযুক্তি নয়।

বরাবর বৈদ্য-বাটী ষ্টেশনে এসে হাওড়ার একখানি টিকিট কিনে কলকাতায় হাজির হলাম।

(৭)

থিয়েটার দেখে পরের দিন সকালে জলখাবার সেরে বসে আছি, পঙ্কু-ঠাকুর বল্‌লে,—যোগেন বাবু, কাল বিকেলে মনিয়া আপনাকে খুঁজতে এসেছিল।"

"কি বল্লে তোমাকে—?"

সমবেদনার সুরে পঙ্কু-ঠাকুর বল্লে, "কত দুঃখের কথা। অনেক কাঁদা-কাঁটি করলে—টাকাটা দিলে না কেন?"

"টাকা কি খোলাম-কুচি ঠাকুর, যে নিয়ে এমনি ছিনি-মিনি খেল্‌লেই হোল।"

"সেত বলেছিল খেটে শোধ দেব।"

"হা আজ পর্য্যন্ত তাই দিয়ে এসেছে।"

"বাবু বড় লোক আপনারা, কত উপায় করেছেন—খরচ ও তেমনি করছেন। সত্যিই সে বিপদে পড়েছে, গরীব—মস্ত উপকার হত। পরে গলার স্বর একটু—নামিয়ে বল্‌লে "আর সে আপনাকে ভাল বাসে বাবু।"—

ধমক দিয়ে আমি বল্‌লাম, "কের সেই কথা, তোমাকে কাল মানা করে দিয়েছি যে।

তাড়া খেয়ে সে রান্না ঘরের দিকে চলে গেল,—ছুটির ভাবনা নিয়ে আমিও কাজে গেলাম।

কলে ঢুকেই চোখ দুটো—তার উৎসুক দৃষ্টি মেলে চারিদিক একবার ভাল করে দেখে নিলে। ঈপ্সিত জিনিষের দেখা না পেয়ে ক্ষুণ্ণ মনে ফিরে এল। কাজে আর মন লাগল না, মনিয়ার কথাটা থেকে থেকে কেবলই মনের মাঝে খোঁচা দিচ্ছিল। অতি কষ্টে সমস্ত দিনটা কাটিয়ে—কর্ত্তব্যের বোঝাটী খাতার সঙ্গে মাথিয়ে রেখে এ দিনকার মত চাকরীর শেষ করলাম। পিঁপড়ের সারের মত চলেছে শ্রম-জীবির দল—সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর কর্ম্মক্লান্ত দেহখানা টেনে নিয়ে বাসার পানে—একটু বিশ্রামের আশায়। গেটের সামনে দাঁড়িয়ে তাদের পানে চেয়ে রইলাম একে একে সকলেই চলে গেল, মনিয়া কিন্তু এলনা। বাসায় ঢুকতেই শুনতে পেলাম ঠাকুর বলছে,—"কি বলব বাবু, একা জল তুলে, কুটনো কুটে—বাটনা বেটে ত আর ৮টার সময় ভাত দিতে পারি না—মনিয়া ছুঁড়ী আজ আসে নি।

• • • •

সে দিন হাজিরী বইয়ের ওপর নোট পেপার খানা ফেলে এক খানা চিঠি লিখছি। রঘুয়া সর্দ্দার আমার পাশে দাঁড়িয়ে হাসিতে হাসতে বললে, "হামার সাদী হয়ে গেল বাবু।"

আমিও হেসেই জবাব দিলাম "বেশ-ত সর্দ্দার, আমাদের একদিন খাইয়ে দাও।

মনটা ছিল লেখার দিকে চিঠি খানা শেষ করে বললাম—"কার সঙ্গে বিয়ে হল সর্দ্দার।

অবাক হয়ে সর্দ্দার বললে "সিয়ে হুয়া মে—কাঁহে আপ্ জান্তা নেহি ?"

"না, আমি আর জানবুম কেমন করে, গেল হপ্তায় ত আমি বাড়ীতে ছিলুম না।

"আলবাত শুনা হোগা মনিয়াকা সাথমে।"

মনিয়ার সঙ্গে! সর্দ্দার বলে কি ? না এ হতেই পারে পারে না, মনিয়া ওকে অন্তরের সঙ্গে ঘৃণা করে। কত দিন রঘুয়ার প্রস্তাব সে ঘৃণায় প্রত্যাখান করেছে—এই কথা নিয়ে কতদিন ওদের মধ্যে খণ্ড যুদ্ধ হয়ে গেছে—সেত এই কলের ভিতরে, আমারই চোখের সাম্নে।

মনিয়া বলে ছিল—রঘুয়ার সঙ্গে যদি আমার বিয়ে হয় গলায় ছুরি দিয়ে মরব। সেই মনিয়া সেই রঘুয়াকেই বিয়ে করেছে। আশ্চর্য্য! কে জানে কেমন করে সম্ভব হ'ল।

(ঘ)

প্রায় এক বৎসর কেটে গেছে। গ্রীষ্মকাল,—সেওড়াফুলির হাটে বারোয়ারী হচ্ছে। বাসার সকলে যাত্রা শুনতে গিয়েছে। আমি গঙ্গার ধারে আম বাগানের গাছের নীচে চাদরখানা বিছিয়ে শুয়ে আছি। পঞ্চুঠাকুর এসে জিজ্ঞাসা করলে—যোগেনবাবু রাত্রে আপনি খাবেন কি ? ভাত রাঁধবো—বাসায় কিন্তু আপনি আর আমি।"

"বেশত এস দুজনে হরিঘটর করা যাক্।"

"তার চেয়ে চলুন না যাত্রা শুনে আসা যাক্।"

"না, যাত্রা আজকাল আর ভাল লাগে না, একদিন সখ ছিল বটে।"

"চলুন, এ যাত্রা সে রকম নয়—মথুরসাহের দল—'জয়লক্ষ্মী' বই হবে, বেশ ভাল বই, ছুরীর গান নেই—একেবারে থিয়েটারের মত।"

"তুমি সত্যি সত্যি যাবে নাকি ঠাকুর।"

"আপনি যদি যান—

"আর তুমি যদি যাও তাহ'লে আমিই বা বাসায় একলা থেকে কি করব বল।"

• • • •

আপিস হতে বেরিয়ে এসে একটা পানের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে সেজেনেড খাচ্ছি, দেখি মনিয়া ঠিক দোকানের পাশে দাঁড়িয়ে আমার দিকে চেয়ে আছে।

বাঙ্গালী ধরণে তার পরণে একখানা চওড়া পেড়ে শাড়ী হাতে গাছকতক কাঁচের চুড়ী, মাথায় সিঁদুর, কপালে এক খানা কাঁচপোকার টিপ জ্বলছে।

আমায় ডেকে বললে "আমার সঙ্গে তোকে যেতে হবে, যাবি ?"

"কোথায় রে—মনিয়া ?"

"আমার বাসায়—"

"কেন রে?"

"আমি তোকে কিছু ব'লবো।"

মনিয়ার সঙ্গে তার বাসায় গেলাম।

সেওড়াফুলীর গড়েরবাগানের কর্ষ্যা পল্লীর মধ্যে ঘরমা খেরা একখানি ছোট ঘর। ভাঁৎ সেঁতে মেঝের উপর একখানি খাটিয়া পাতা। দেওয়ালে দু এক খানা কাগজের ছবি। আর একটা দেওয়ালগিরি।

আলোটা জেলে মনিয়া বল্লে—"বোস বাবু—"

বসতে আমার মন চাইছিল না—ছিঃ এ জঘন্য জায়গায় কেন এলাম।—"তোর এমন দশা কি করে হ'লরে মনিয়া?"

সে ধীর ও সংযত স্বরে বল্লে, "তোর জন্যে—"

অবাক হয়ে তার মুখের পানে চেয়ে বল্লাম—"আমার জন্যে! কেন আমি তোর কি করেছি?

সে বলতে লাগল, "সেদিন তুই টাকা দিলিনে বাবু, বাবার ইজ্জৎ যায়—সেই ভয়ে বাধ্য হয়ে রঘুয়াকে বিয়ে করলাম। তোর উপর আমার রাগ হয়েছিল, অভিমান হয়েছিল, দুঃখও হয়েছিল। তাই—তোদের বাসায় কাজ করতে গেলাম না—সর্দ্দার আমায় কলের কাজেও যেতে দিলে না।

তোকে ভুলতে পারিনি বাবু—যখন তোকে দেখবার খুব বেশী ইচ্ছা হত তখন কারো নিষেধ না মেনে ছুটীর সময় দাঁড়িয়ে থাকতাম ফটকের পাশে—একবার তোকে দেখে ফিরে যেতাম। তোকে দেখা আমার একটা নেশা হয়ে গেছল।—বাবা বকত সর্দ্দার মারত তাদের কথা শুনতাম না। রোজই যেতাম।

সেদিন মদ খেয়ে রঘুয়া বড় মাতাল হয়ে এসেছিল। কুটীতে আমায় দেখতে না পেয়ে রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছিল। —আমি তখন ফটক হতে ফিরছি,—বাঘের মত আমার উপর লাফিয়ে পড়ে চুলের মুটী ধরে আছড়ে ফেলে দিলে, রাস্তার পাথরে মাথাটা কেটে গেল—ঝর্ ঝর্ করে রক্ত পড়তে লাগ্‌ল। তারপর জুতো শুদ্ধ আমার বুকে লাথি মেরে পথের পাশে ঠেলে রেখে গেল।"

বল্‌তে বল্‌তে সে কেঁদে ফেল্‌লে—আমার চোখও শুকনো ছিল না—একটু থেমে আবার বল্‌তে লাগল, "কত লোক এল গেল আমার পানে কেউ তাকালে না—কেউ মুখে একটু জলও দিলে না। কতক রাত্রে আমার জ্ঞান হোল। ঘরে ফিরতে পারলাম না। টলতে টলতে বড় রাস্তায় এসে সোজা চল্‌তে লাগলাম, পথে এই বাড়ী-ওয়ালীর সঙ্গে দেখা হল। একখানা গাড়ীতে করে আমায় এখানে নিয়ে এল। তারপর অনেক ভেবে এই পথ বেছে নিয়েছি পেটের দায়ে।—" আমি বললাম "আমায় একবার জানালি না কেন? তোর খাবার কষ্ট কোন দিনই ত হত না।"

তোর উপর যে রাগ হয়েছিল—তবু তোকে ভালবাসি বাবু। প্রথম যেদিন ভাল বেসেছিলাম সেদিন ভাবিনি যে তোকে পাব না। কত লোকে কত কথা বল্‌ত, বাবা বোঝাত, কারো কথা শুনিনি। তোকে পাবার আশা ছাড়িনি। এই একটা বছরে বাঙ্গলা শিখেছি গান শিখেছি—যদি কোন দিন তোকে পাই—সেই আশায়—"

বাধা দিয়ে আবেগে বলে উঠলাম, "মনিয়া আজও তুই আমায় চাস্।"

"হাঁ চাই বাবু, আগে যেমন চাইতাম ঠিক তেমনি। কিন্তু তুই যে আসমানের চাঁদ বাবু তোর নাগাল পাব না ত। তাই এই দেখ, তোর ছবি, তুই ভেবে একেই পূজা করি—"

"এ ছবি তুই কোথায় পেলি মনিয়া।"

"চুরি করেছিলাম তোর ঘর হতে। যেদিন প্রথম তোদের হোথায় কাজ করতে যাই সেই দিন। এই আমার দেবতা—" এই বলে ছবি খানা মাথায় ঠেকালে।

"মনিয়া"—"মনিয়া" বলে উঠে যেমন তাকে দুহাতে জড়িয়ে ধরতে যাব অমনি সরে দাঁড়িয়ে সে-বলে উঠল "ছুঁসনা বাবু ছুঁসনা, তুই দেবতা, দেবতার মতই থাক—"

স্ত্রী-পুরুষ রহস্য।

[শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য।]

মানুষ যে কোন নারীর কাছে গিয়ে সুখী হতে পারে—যতক্ষণ না প্রেমে পড়ে।

যোগাযোগের চেয়েও একটী জিনিসকে রমণী বেশী ঘৃণা করে সেটী হচ্ছে যোগাযোগের অভাব।

নারীরা নিজেদের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করবার জন্য এমন কষ্ট নেই যা সহ্য করতে পারে না।

রমণীর কাছে সেই ঠিক নিখুঁত স্বামী যার স্বভাব ঠিক সন্তের মত।

সাধারণ মানুষেরা রমণীর সহিত ফুলের উপমা দেয়—মধু খাবার লোভে।

বিবাহিত পুরুষদের হৃদয় বলে কোন পদার্থ নেই যেহেতু তারা সেটা অপরকে দান করে ফেলেছে।

অনেক দেশে বিয়ের আগে প্রেমে পড়া দুরারোগ্যের মধ্যে গণ্য।

স্ত্রী নিমন্ত্রণ থেকে বাড়ী ফিরে এলে সেদিন তার সহিত কথা বন্ধ রাখা বুদ্ধিমান স্বামীর কাজ। কারণ উহ!

স্ত্রীর কাছে সন্দেহ ও বিরাগ ভাজন হ'তে না চাও ত তার সামনে অন্য কোন রমণীর রূপের প্রশংসা করিও না।

সস্ত্রীক ঘোটরে যাইতে হইলে পর্দ্দার আড়াল দিয়ে যাওয়াই প্রশস্ত বিধি। ঘোড়ার গাড়ীতে খড়খড়ি না ওঠালেও ক্ষতি নাই।

বয়স্থা কুমারীদের সহিত যারা মিশতে ইচ্ছুক তাদের প্রথমে চোখের ডাক্তার হওয়া উচিত। কেন না তাদের মুখ যখন এক কথা বলবে, চোখ তখন অন্য কথা কইবে।

ইউনিভার্সিটী একজামিনে দশবার ফেল করেও যে আত্মহত্যা করে নি সেই শুধু প্রেম পরীক্ষায় আসরে নামবার উপযুক্ত পাত্র।

গ্রন্থ আলোচনা।

'কমলাকান্তের পত্র', চন্দননগর, প্রবর্ত্তক পাবলিশিং হাউস্ হইতে প্রকাশিত, মূল্য ১৲। বহিখানির প্রকাশক শ্রীচারুচন্দ্র রায় বিজ্ঞাপনে লিখিয়াছেন—যার 'মুখবন্ধ' লেখবার কথা ছিল তা'র মুখ এখন বন্ধ;...'মানুষটা নিতান্ত কেপিয়া গিয়াছে'—কমলাকান্ত সম্বন্ধে খোসনবীশ দুনিয়ার প্রভু এ সংবাদটা সত্যও হ'তে পারে; কিন্তু সে মরে নি এটা ঠিক। যুগে যুগে সে বেঁচে থাকবে আর তার বক্তব্য তা'রই মতন করে' বলে' যাবে, তার ভুল নেই।'

প্রকাশক মহাশয়ের এ কথা সত্য। অমর কমলাকান্ত হাসি ও সরল ব্যঙ্গের ভিতর দিয়া যে মর্ম্মবেদনা ঢালিয়া গিয়াছেন যুগে যুগে দেশের প্রাণের মধ্যে সে ভাবের অভিব্যক্তি চলিতেছে। সেই ভাব, প্রাণের সেই সত্য মর্ম্ম কথা লেখনী মুখে প্রকাশ করিয়া দেশের লোকের মনে দাগ দেওয়াতেই এমন লেখার সার্থকতা। এ যাহিত্য লইতে পারে সেই যে দেখবে, দেশের অসত্য সমস্যাগুলিকে মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিয়াছে—এবং সেই অনুভবের রূপ দিবারও শক্তি আছে। কমলাকান্তের সে শক্তি ছিল—তাই কমলাকান্ত যুগে যুগে প্রাণবান্ থাকিবে। বর্ত্তমান পত্রের লেখক 'কমলাকান্ত' নাম গ্রহণ করিয়া চির উজ্জ্বল কমলাকান্তকে ম্লান করেন নাই—বরঞ্চ সেই অমর লেখাতে আরও নূতন ভাব সম্পদ সংযোগ করিয়া একটা সরস উজ্জ্বল সাহিত্যের সম্পদ বৃদ্ধি করিয়াছেন। এই সুচিন্তিত সুলিখিত, রসরঙ্গে ভরা পত্রগুলির প্রত্যেকখানি পত্র পড়িতে পাঠক পাঠিকাকে ভাবিবার খোরাক যথেষ্ট দিবে কিন্তু মনকে এতটুকু ভারাক্রান্ত করিবে না। নিজেদের সত্য অবস্থা, দেশের সর্ব্বাঙ্গীন অবস্থা চিন্তা করিবার অবসর দিবে। পত্রগুলি পৃথক পৃথক নামে রচিত হইলেও সমগ্রভাবে বহিখানি পড়িতে এতটুকু খাপছাড়া বোধ হয় না। যাহারা জাতীয় জীবন, সমাজ জীবন, নিজের জীবন সম্বন্ধে কোন সময় একটুও চিন্তা করিবার অবসর পান এই 'কমলাকান্তের পত্র' অবশ্যই তাহাদের চিত্ত বিনো-

সন করিতে পারিবে। এই পত্রের খ্যাতনামা লেখকের মুখ আজ বন্ধ হইলেও তাঁহার সরল সবল, রস রঙ্গ ভরা নানা বিষয়ের মত গ্রহণ করিতে বাঙ্গালী পাঠক পাঠিকা শৈথিল্য করিবেন না—এ কথা জোর করিয়া বলা যায়। বহির বিষয় বস্তু যেমন সুন্দর, ছাপা কাগজও তেমনি সুন্দর বাঁধাইটিও মনোরম।

'খোকা' আখ্যায়িকা, শ্রীললিতলোচন দত্ত প্রণীত। প্রকাশক চ্যাটার্জ্জি এণ্ড চ্যাটার্জ্জি, ২১ হ্যারাণ্ড খাঁ লেন। মূল্যের উল্লেখ নাই। নানা ঘটনার মধ্য দিয়া খেয়ালী খোকার বাল্য জীবন হইতে বৃদ্ধ জীবনের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। কাহারও কাহারও বইখানি ভাল লাগিতে পারে।

বিভিন্ন জাতির আয়ুষ্কাল

অধ্যাপক তারকনাথ দাস চিকাগোর 'নেসনস্ হেলথ্' নামক পত্রিকা হইতে নিম্নলিখিত তালিকাটী সংগ্রহ করিয়াছেন। ইহাতে পৃথিবীর বিভিন্নদেশের জাতি-সমূহের আয়ুষ্কালের তুলনা করা হইয়াছে।

দেশের নাম	বৎসর	পুরুষ	স্ত্রী
নিউজিলাণ্ড	১৯০৬-১০	৫৯'১৭	৬১.৭৬
অষ্ট্রেলিয়া	১৯০১-১০	৫৫'২০	৫৮'৪৪
ডেনমার্ক	১৯০৬-১০	৫৪'৯০	৫৭'৯০
নরওয়ে	১৯০১-১০	৫৪'৮৪	৫৭'৭২
সুইডেন	১৯০১-১০	৫৪'৫৩	৫৬'৯৮
হল্যাণ্ড	১৯০০-০৯	৫১'০০	৫৩'৪০
আমেরিকা যুঃ প্রঃ	১৯০ -১০	৪৮'৩২	৫২'৫৪
সুইজারল্যাণ্ড	১৯০১-১০	৪৯'২৫	৭২.১৬
ইংলণ্ড	১৯০১-১০	৪৮'৫৩	৫২'৩৮
ফ্রান্স	১৮৯৮-১৯০৩	৪৫'৭৪	৪৯'১৩
জার্ম্মাণী	১৯০১ ১০	৪৪'৮২	৪৮'৩৩
ইটালী	১৯০১-১০	৪৪'২৪	৪৪'৮৩
জাপান	১৮৯৯-১৯০৩	৪৩'৯৭	৪৪'৮৫
ভারতবর্ষ	১৯০১-১০	২৩'৪৯	২৩'৬১

"নেসনস্ হেলথের" প্রবন্ধ লেখক ডাঃ ডাবলিন মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, বিভিন্ন দেশের এই আয়ুষ্কালের তারতম্য তথাকার জাতীয়, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় অবস্থার তারতম্যই সূচনা করে। যে জাতির সামাজিক, অর্থনৈতিক ও স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় অবস্থা যত শোচনীয়, তাহাদের আয়ুর পরিমাণ তত কম—দৈন্য, দুঃখ-দুর্দ্দশা, রোগ শোক তাহাদের মধ্যে তত বেশী। উপরের তালিকায় দেখা যাইবে যে, পৃথিবীর সমস্ত সভ্যদেশ অপেক্ষা ভারতবাসীর আয়ু পরিমাণে অস্বাভাবিক রূপে কম। তালিকার নিউজিলাণ্ড হইতে হলাণ্ড পর্য্যন্ত কয়েকটি দেশে লোকের আয়ুষ্কাল গড়ে ৫০এর কোটায়, আমেরিকা যুক্ত প্রদেশ, জার্ম্মাণী, ইংলণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশের লোকের আয়ুষ্কাল ৪০এর কোটায়। আর ভারত-বাসীদের আয়ুষ্কাল একেবারে ২০এর কোটায় অর্থাৎ অন্যান্য সভ্যজাতিদের আয়ুষ্কালের অর্দ্ধেকেরও কম। এর চেয়ে শোচনীয় অবস্থা আর কি হইতে পারে? আমরা আজ 'স্বরাজ', 'রাজনৈতিক স্বাধীনতা' প্রভৃতির নাম লইয়া পরস্পরে বাদবিতণ্ডা করিতেছি কিন্তু আমাদের ভিতরের অবস্থা যে কিরূপ, তাহা ঐ তালিকা হইতেই বুঝা যাইবে। যদি শীঘ্রই আমরা আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত না হই, দেশব্যাপী দারিদ্র্য, ব্যাধি ও অজ্ঞতা দূর করিবার জন্য সকলে মিলিয়া চেষ্টা না করি,—তবে ধরাপৃষ্ঠে আমাদের চিহ্নমাত্র থাকিবে না। অনেকে 'জাতি গঠন' শব্দের কোন অর্থই খুঁজিয়া পাননা, কিন্তু আমাদের সম্মুখে যে বিপুল কর্ত্তব্যের বোঝা রহিয়াছে, পৃথিবীতে তাহার তুলনা নাই।

আনন্দ বাজার।

গোপন

[শ্রীভক্তিসুধা রায়।]

মনের মতন মানিক রতন
গোপন থাকে অন্তরে,
হাজার যুগের সুখের স্বপন
ফুটায় নিতি মন্তরে,
মনের তলায় রয় সে গোপন
মনের মতন হয় সে আপন
গুপ্ত থেকে গোপনপুরে
স্বপন সুখে সকলে,—
বেড়ায় না সে বাহিরে ঘরে
রয়সে ঢাকা অন্তরে।
আন্‌তে তারে হয়নি কভু
সপ্ত সাগর সন্তরি
প্রাণের তালে দোলায় তবু
গুপ্ত এ মোর প্রেমতরী।
নয় এ সুখের আশার নিধি
আনন্দে যে ভরবে হৃদি,
মন্দাকিনী যখন ঝরি
দেয়নি সুধায় মন ভরি,
এনব খোঁজা অন্যপরি
সিন্ধু শত সন্তরি;
গোপাল আমার গোপন হিয়ার
আপন চির যুগধরি,
গোপন চুমার রসের ধারায়
দেয় সে মরু বুকভরি,
জীবন সাঁঝে বিদায় বেলা
ঘুচবে যখন লোকের মেলা
জ্বালবে আলো সে দিন ধীরে
নিবিড় কালো দূর করি
চন্দ্র তারা তারেই ঘিরে
নাচবে চির যুগ ধরি।

মাসিক সাহিত্য-সমালোচনা

ভারতবর্ষ, অগ্রহায়ণ, ১৩৩০ সন। ভারতবর্ষের প্রথম প্রবন্ধ সম্ভ্রান্ত শ্রীযুক্ত শর্মা মহাশয়ের "প্রবাসীর অধিকারী", একেবারে অপাঙ্‌ক্তেয়। লেখক অনেক শাস্ত্র-গ্রন্থের প্রকৃত ভুলে ঠিক করেছেন যে, মোক্ষ ইচ্ছা করলেই প্রবাস অধিকার করা যায়। লেখকটি বোধ হয় টুলো পণ্ডিত, দেশের ইতিহাসের খবর তিনি খুব কমই রাখেন। যে যাজ্ঞের ধর্ম গ্রন্থ ছিল তাহা যে যাজ্ঞা-যাজ্ঞিয় সংমিশ্রণে আচার ভ্রষ্ট হয়েছিল এবং সে জাতির এক প্রদেশ যে ভালো দেশে আসে নি, সেকথা ভুললে হয় তো তাঁর ভুল হবে। প্রকৃত পক্ষে বাংলা দেশের ব্রাহ্মণও দেশের অধিকারী নয়, কারণ তাদের মধ্যে শতকরা একজনের মধ্যেও ব্রাহ্মণের ধর্ম আছে কি না সন্দেহ। গো-বাহক আহম-জাতি যখন পাল বৈদ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে, তখন বাঙ্গলার অধিকাংশ ব্রাহ্মণ যে যে-মন্ত্র গ্রহণ করবে তাতে আর আশ্চর্য্য কি। আমাদের দেশের লোক বড় দিন না বুঝবে যে, যে-মন্ত্রে এখনকার ব্রাহ্মণের যতটা অধিকার, শূদ্রেরও ঠিক ততটা অধিকার আছে, ততদিন আমরা মোক্ষ মার্গ দেখতে পাব না। লেখক কথাটা বুঝেছেন অজ্ঞাতসারে কিন্তু তাঁর বিতীকতায় অন্তে তাঁকে বোঝান দেওয়া উচিত।

শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী সরস্বতীর "বিধিলিপি" উপন্যাসটি এ সংখ্যায় শেষ হল। লেখিকার শক্তি আছে এবং তিনি প্রকৃত মহিলা। গল্পকাহিনীর মধ্যে গল্প কেমন করে লিখতে হয় তা তিনি জানেন। "মায়া জাতির স্বভাব সাধনা"—শ্রীহরিহর শেঠের একটি প্রবন্ধ। শেঠ-মহাশয় লিখতে জানেন, লেখাটিও বেশ হয়েছে। শ্রীযোগেন্দ্র কুমার চট্টোপাধ্যায়ের "বিদিত" কবিতাটি বোধোদয়ে ছাপা উচিত ছিল, ভারতবর্ষের পাতায় পাতপূরণেও অযোগ্য। এই সংখ্যা থেকে শ্রীউপেন্দ্র নাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের "অমলা" ধারাবাহিক রূপে বার হতে আরম্ভ হল। পাবনার উকিল রায় প্রসন্ন নারায়ণ চৌধুরী বাহাদুর "অয়চন্দ্র" নাম দিয়ে একটি ঐতিহাসিক প্রবন্ধ লিখেছেন। লোকটির নাম ছিল অয়চন্দ্র, প্রতিপাদ্য বিষয় সম্বন্ধে লেখক নূতন তথ্যের খবর জানেন না। ওকালতি করতে করতে প্রত্নতত্ত্বের চর্চ্চা চলে না, প্রবীণ ঐতিহাসিক অক্ষয় কুমার মৈত্রের আর প্রসন্ন-বাবু তার নমুনা। ভাষার সরেস চন্দ্রের বিশেষত্ব চলেইছে। শ্রীরামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্যের "সিন্ধু প্রদেশে মুসলমান অধিকার" বেনামা লেখা বলেই বোধ হয়। শ্রীবীরেন্দ্র কুমার রায়ের "নারদের মহাদেব" এবারে শেষ হল। শ্রীসত্য-গোপাল গুহের "অভিসার" কবিতাটি লেখকের ভক্তির প্রবলী-রোগের পরিচায়ক। শ্রীঅনুরূপা দেবীর "মানব জন্ম" ছোট ছাট সুলিখিত প্রবন্ধ কিন্তু "অকাল-মৃত্যু ও বাল্য-বিবাহ" সম্বন্ধে শ্রীপঞ্চানন শর্মা যা বলেছেন তা বোধ হয় কতকটা ঠিক। আমাদের দেশে নূতন আর পুরাতন সামাজিক আদর্শ যত দিন পাশাপাশি দাঁড়িয়ে থাকবে তত দিন বাল্য-বিবাহ বা যৌবন বিবাহ নির্দ্বিষ্ট হবে না। শ্রীললিত মোহন চট্টোপাধ্যায় তাঁর "মায়া" প্রবন্ধে এই সামাজিক আদর্শের কথাই আলোচনা করেছেন। যে ভাবে আমরা এতদিন চলে এসেছি যে আদর্শে দেশ পাঁচ হাজার বছর কেটে গেছে, সে ভাবে যে

আমাদের লেখে যা পাশ্চাত্য ঘাত প্রতিঘাতের ফলেই বলুন আর যেমেই বলুন, আমাদের সামাজিক আদর্শটাকে একটু বদলে নিতে হবে—এটা আমরা সবাই হিসেবে যত দিন না বুঝব ততদিন আন্দোলনে কোনই ফল হবে না। ভারতবাসী অথবা বাঙ্গালী এই পঁচ-ছয়শো বছর যে ভাবে চলে এসেছে, সেটা কি একটা ভাব? আমি শুধু বাঙ্গালীর কথা বলেই বলছি, বাঙ্গালীর আদর্শ ঐতিহাসিক যুগে অনেক বার বদলে গেছে। তা গুপ্ত সাম্রাজ্যের সময় যে রকম ছিল, সপ্তম শতাব্দীতে সে রকম ছিল না। গোপাল আর ধর্মপালের বাঙ্গলা যেন স্বাধীন করে তা অন্য-রকম করে গড়ে তুলেছিলেন। রাজা-পালের সময়ে স্বাধীনতা হারিয়ে তা আবার অন্য রকম হয়েছিল। লক্ষ্মণ সেনের সময়ে হিন্দুত্বের নূতন প্রবাহ এসে পড়ে বাঙ্গালীর সামাজিক আদর্শ যে ভাবে গড়ে উঠেছিল, মুসলমান বিজয় স্রোত তাকে সে ভাবে থাকতে দেয় নি। তারপর বাঙ্গালী পরাধীন হয়ে সাতশ' বছর ধরে সমাজের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা সঙ্কীর্ণ করে বিদেশীর রাজার শক্তি আর মুসলমান রাজার শক্তি রোধ করবার চেষ্টা করেছে। তা না করলে এতদিনে বাংলা দেশে হিন্দু থাকত না। ইংরেজের রাজ্যে পাশ্চাত্য চিন্তার স্রোতের ঘাত ও প্রতিঘাত আমাদের সমস্ত প্রাচীন আদর্শ-গুলিকে এমন ভাবে গুলিয়ে দিয়েছে যে এখন কর্ম-কাণ্ড, জ্ঞান-কাণ্ড, আর সামাজিক আদর্শ—সবগুলি নূতন করে গড়ে তুলতে না পারলে আমাদের আর উপায় নেই। বিংশ শতাব্দীর শিক্ষিত বাঙ্গালী খুব জমাবার দু'হাজার বছর আগেও ফিরে যেতে পারবে না আবার একেবারে বর্তমান যুগেরও হতে পারবে না একটা মধ্য পথ চাই, সেটা কবে যে দেখাবে?

শ্রীযুক্ত লাল মুখোপাধ্যায়ের "লোক" একটি ক্রমশঃ প্রকাশ্য প্রবন্ধ-স্তরের প্রবন্ধ। অধ্যাপক শ্রীপ্রমথনাথ মুখোপাধ্যায়ের "মেয় ও বিজ্ঞান" অত্যন্ত দীর্ঘ হওয়ায়, স্থানের অভাবে বিশেষে আলোচনা করা গেল না। "বিবিধ প্রসঙ্গে" অধ্যাপক শ্রীবিনয় কুমার সরকারের "কল্পনা ও তড়িৎ, শ্রীযতীন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়ের উদ্ভিদের কথা" শ্রী যামিনী কান্ত সেনের "যাদের কথা" এবং অধ্যাপক শ্রীরাজ কুমার সেনের "মধুর অমর-গতি"—পাশা হয়েছে। শেষের প্রবন্ধটি ছাড়া আর বাকী তিনটি বড় অক্ষরে ছাপলেই সঙ্গত হত। শ্রীযুক্ত সেনের "মধুমা-সম্পদ-রূপে মানবের জীব" প্রবন্ধটি বোধ হয় ছবির খাতিরে ছাপা হয়েছে। এটি একেবারে অখাদ্য। শ্রীযুক্ত নাথ মুখোপাধ্যায়ের "নাথ বিধবা স্ত্রীলোকের অবস্থা" যেমন সমস্ত সম্বন্ধে যৎ-কিঞ্চিৎ, তেমন সময়-সম্বন্ধে বড় বেশী কেলানো হয়েছে। ইংরেজের আমলের ঘটনার প্রকৃত ইতিহাস লিখবার সময় এখনও আসে নি সুতরাং এ বিষয়ে অধ্যাপক যদুনাথ সরকার থেকে ব্রজেন্দ্র নাথ পর্যন্ত কারো বেশী বলা উচিত নয়। শ্রীবিষকর্মার "ইঙ্গিত"—এ সংখ্যায় এ্যালুমিনিয়ামের উপর বর্ষিত হয়েছে। "প্রবাসীর" অনুকরণে ভারতবর্ষের সম্পাদকও কাগজ-খানাকে একেবারে সংবাদ পত্র করে তুলতে চেষ্টা করছেন। "নাথ-হাওয়া" "সাহিত্য-সংবাদ" "সোক-সংবাদ" "ভারতের বিদেশী বাণিজ্য," "ভ্রমণ" এবং "সম্পাদকের বৈঠক"—সংবাদ পত্র-বিভাগের অন্তর্গত। শ্রীযুক্তা মেয়ো "আর্টেমিসা" প্রবন্ধটি আমার তিন পাতা কিন্তু এর ছবি ষোল পাতা। লেখক বা সম্পাদক কি বলতে চান যে, এই তিন পাতায় ষোল পাতা ছবির বর্ণনা ঠিক হয়েছে? এরকম করে ছাপে ছবি দিয়ে প্রবন্ধ পোয়ালে লেখকের পকেট ও মাসিক-পত্রের পাতা ভরতে পারে কিন্তু কাগজের উন্নতি পাঠকের তৃপ্তি হয় না। শ্রীযুক্তা সুধন্য ঠাকুরতার "ঘরাল ঘরি" আর শ্রীযুক্ত কুমার চট্টোপাধ্যায়ের "দুঃখের ফল" দুটিই পাতার পাশ-পুরণের অপূর্ব কবিতা

এ সংখ্যায় ভারতবর্ষে একটি মাত্র গল্প ছাপা হয়েছে, সেটি শ্রীপতীন্দ্র লাল রায়ের "বেঁয়ো"। এটি সরকারী আপিসের বড় রিপোর্টের Precisa মত একখানা বড় উপন্যাসের সংক্ষিপ্তসার। ভারতবর্ষের সম্পাদক কার্তিকের সংখ্যায় খুলে ফেলে সমস্ত গল্প যেমে অগ্রহায়ণের সংখ্যাটিকে ফিকে করে ফেলেছেন। পাঠক ও অপাঠ্য প্রবন্ধের চাপে এ সংখ্যায় ভারতবর্ষও একটি waste paper Basketএ পরিণত হয়েছে।

ফোটার বেদনা

(শ্রীলীলাবতী দেবী)

এই ফুটে থাকা।
পরিপূর্ণ চলচল অনিন্দ্য সুন্দর।
নধর বিটোল আহা। সারা কলেবর
পত্র দলে ঢাকা।
লালসা লোলুপ দৃষ্টি ভ্রমরে মোহিতে
শুধু ছুটে ছুটে আসে মুখ টাহনিতে
গরলের সুধা।
হায় এ কি নিদারুণ ফোটার বেদনা
শুধু চাওয়া, শুধু চাওয়া, পাসরি আপনা
অনন্ত সে সুধা।

সচিত্র সাপ্তাহিক পত্রিকা

বাসন্তী

কালীয়াদমন ঘাট, বৃন্দাবন।

বাসন্তী—

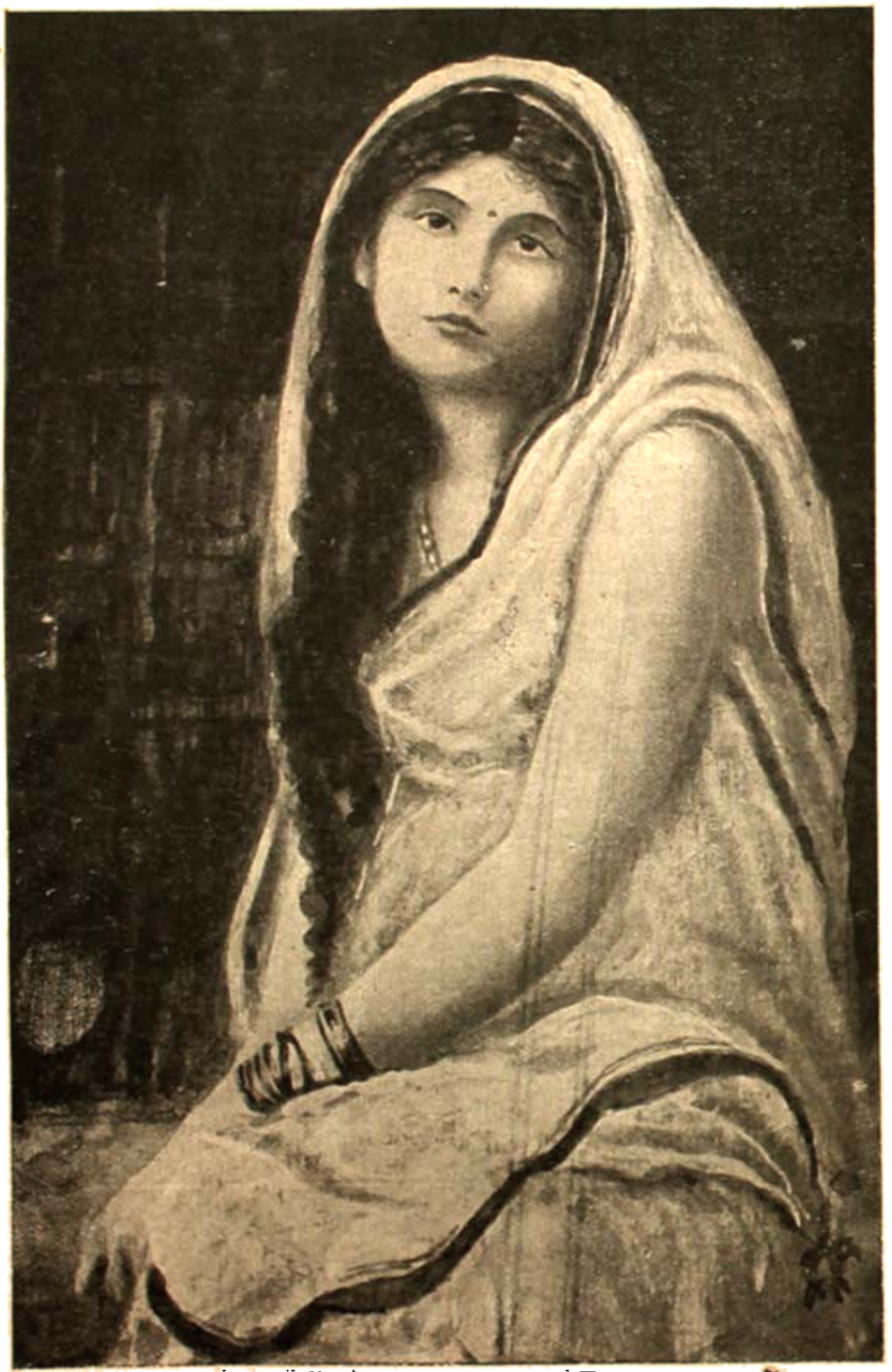

প্রিয়—চিত্রা